University of Rajshahi **Rajshahi-6205** **Bangladesh.**

RUCL Institutional Repository **http://rulrepository.ru.ac.bd**

Institute of Bangladesh Studies (IBS) PhD thesis

2020-10

An Ethnographic History of Film in Bangladesh, 1956-2015

Haider, Kazi Mamun

University of Rajshahi

http://rulrepository.ru.ac.bd/handle/123456789/1030

Copyright to the University of Rajshahi. All rights reserved. Downloaded from RUCL Institutional Repository.

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস, ১৯৫৬–২০১৫

পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ

কাজী মামুন হায়দার

অক্টোবর ২০২০

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস, ১৯৫৬–২০১৫

অভিসন্দর্ভটি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এ
পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হলো

কাজী মামুন হায়দার
পিএইচ ডি গবেষক

সেশন : ২০১৪–২০১৫

তত্ত্বাবধায়ক
ড. বখতিয়ার আহমেদ
অধ্যাপক
নৃবিজ্ঞান বিভাগ

সহ-তত্ত্বাবধায়ক
আবদুল্লাহ আল মামুন
সহযোগী অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

অক্টোবর ২০২০

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
বাংলাদেশ

প্রত্যয়নপত্র

জনাব কাজী মামুন হায়দার, পিএইচ ডি গবেষক, সেশন : ২০১৪–২০১৫, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী কর্তৃক পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস, ১৯৫৬–২০১৫' টাইটেলের অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম, যা আমাদের নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধায়নে সম্পন্ন হয়েছে। অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপিটি আমরা সতর্কতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পাঠ করেছি।

আমরা জনাব কাজী মামুন হায়দারকে অভিসন্দর্ভটি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. বখতিয়ার আহমেদ
অধ্যাপক
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহ-তত্ত্বাবধায়ক
আবদুল্লাহ আল মামুন
সহযোগী অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা

আমি ঘোষণা করছি যে, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহীতে পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস, ১৯৫৬–২০১৫' টাইটেলের অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। অভিসন্দর্ভটি আংশিক/পূর্ণাঙ্গভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানে অন্য কোনো ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/এসোসিয়েটশিপ/ফেলোশিপ-এর জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। বর্তমান গবেষণাকর্মটিতে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎস থেকে যা কিছু নেওয়া হয়েছে তা অভিসন্দর্ভে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাজী মামুন হায়দার
পিএইচ ডি গবেষক
সেশন : ২০১৪–২০১৫
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী, বাংলাদেশ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পিএইচ ডি গবেষণার সুযোগ দেওয়ার জন্য আইবিএস কর্তৃপক্ষকে প্রথমেই আমি বিনীত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আইবিএস-এ আমার শিক্ষক প্রফেসর ড. জাকির হোসেন, প্রফেসর ড. স্বরোচিষ সরকার, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নাজিমুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. এম মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক ড. মো. কামরুজ্জামান এর প্রতি। তারা নানা সময়ে আমাকে উদারভাবে উৎসাহ, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও আইবিএস গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের ইতিবাচক সহযোগিতার জন্য।

বর্তমান গবেষণাকর্মটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমাকে মাঠপর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। এজন্য আমাকে সারাদেশের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে প্রচুর মানুষ আমাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তথ্য দিয়েছে, সহযোগিতা করেছে। তাদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় বইপত্র ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করেছেন বন্ধু ড. মো. মাসুদ আলম, সহকারী অধ্যাপক, দর্শন, আলেকান্দা সরকারী কলেজ, বরিশাল। তার প্রতি আমার অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা।

কাজী মামুন হায়দার

সার-সংক্ষেপ

বাজার ব্যবস্থাপনা, বিপণন, বাজারিকরণ ও মান বিবেচনায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অন্য সব সময়ের চেয়ে বর্তমানে ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। এর সবচেয়ে বড়ো উপসর্গ সারাদেশে একের পর এক প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হওয়া। পরিবর্তন এসেছে দর্শক ও আধেয়তে। বিষয়টি সামাজিক স্তরবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শ্রেণির সঙ্গেও সম্পৃক্ত। এই পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্রের পরিসরকে নিচ থেকে মানে প্রান্তিক মানুষ যেমন, প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সমসাময়িক দর্শকের দিক থেকে অনুসন্ধান করা হয়েছে। সেই অনুসন্ধানে যেমন গবেষকের নিজের অভিজ্ঞতাকে মেলানো হয়েছে, তেমনই এ সংক্রান্ত বিদ্যমান যে তত্ত্ব, তথ্য ও বোঝাপড়া আছে, তারও সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এই তিনে মিলে যে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, তাই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস হয়ে উঠেছে। ১৯৫৬ তে *মুখ ও মুখোশ* দিয়ে পূর্ববঙ্গে যে চলচ্চিত্রযাত্রা শুরু হয়েছিলো তা দর্শকের কাছে প্রযুক্তির জাদু-বাস্তবতা হিসেবে হাজির হয়। এই সময়ের চলচ্চিত্রের দুইটি বিষয়কে মাথায় রাখতে হয়েছে। একটি গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের যে আখ্যান, উপাখ্যান, রূপকথা, পরিচিত সাহিত্য ও তাতে জাদু-বাস্তবতা প্রয়োগ এবং অন্যটি শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা তাদের নিজেদের গল্প চলচ্চিত্রে নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। জাদু-বাস্তবতা, মধ্যবিত্তের নিজের গল্প বলার চেষ্টা ও গ্রামীণ উপাখ্যান এই তিন মিলে ৬০ দশকে তখনকার রাজনৈতিক ইতিহাস ছাপিয়ে সামাজিক ইতিহাসের টানাপড়েন চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ৭০ দশকে রাষ্ট্রবিপ্লবের উচ্ছ্বাসে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলেও তা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বয়হীনতার কারণে ঠিক যা ঘটার ছিলো তা ঘটেনি। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় কিছু না হওয়ায় তা ৮০'র দশকে ইন্ডাস্ট্রি অর্থে চলচ্চিত্রের প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। একটা পক্ষ এ সময় ব্যাপক বিনোদন বাণিজ্য শুরু করেন, সফলও হন। ফলে ৯০ দশকে গিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহের ভিত্তি নষ্ট হতে থাকে। এছাড়া স্যাটেলাইট টেলিভিশন, সিডি প্লেয়ার চলচ্চিত্রের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে যায়। সব মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী দর্শক প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করেন। তখন কেবল অন্য প্রাযুক্তিক সুযোগ নেই এমন লোকজন প্রেক্ষাগৃহে আসতে থাকেন। ফল হিসেবে নারী দর্শকবিহীন প্রেক্ষাগৃহে সহিংস ও যৌনচলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়। শূন্য দশকে তা চরম আকার ধারণ করে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহ তার সর্বশেষ চরিত্রটুকু হারিয়ে ফেলে। এই পরিস্থিতিতে ৭০ ও ৮০'র দশকের উত্তরাধিকার বহন করা একটি পক্ষ নতুন ধরনের চলচ্চিত্র, সিনেপ্লেক্স বাণিজ্য ও ইন্টারনেট ভিত্তিক বিনোদনে সম্পৃক্ত হয়। সেই বিনোদনে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত প্রবলভাবে উপস্থিত থাকলেও গণমানুষ নেই বললেই চলে। এ রকম একটা বোঝাপড়ার আলোকে এই অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস লেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচি

প্রথম অধ্যায়

বিষয় ও উদ্দেশ্য : সময়, সমাজ ও চলচ্চিত্র

১.১ ভূমিকা ২
১.২ শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ও অভিনবত্ব ৫
১.৩ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯
১.৪ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের চরিত্র ও ঐতিহাসিক প্রবণতা ১১
১.৫ মধ্যবিত্ত, পুঁজি ও চলচ্চিত্র ১৫
১.৬ চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণের সমস্যা ও প্রবণতা ১৭
১.৬.১ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণ ২১
১.৬.২ প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণিকরণ ২৬
১.৭ প্রাসঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা ২৮
১.৮ চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস.... ৪১
১.৯ গবেষণা পদ্ধতি....৪৬
১.৯.১ নৃবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা আদিকল্প ও পদ্ধতিসমূহ ৪৬
১.৯.২ ন্যারেটিভ অ্যানালিসিস ৪৯
১.৯.৩ এথনোগ্রাফিক পর্যবেক্ষণ ও নিবিড় সাক্ষাৎকার....৫৫
১.৯.৪ গবেষণার প্রায়োগিক ক্ষেত্র, উপাত্তের উৎস ও বিশ্লেষণ.... ৫৭
১.১০ অভিসন্দর্ভের কাঠামো ৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ষাটের দশক : প্রযুক্তির জাদু-বাস্তবতা

২.১ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ৬৪
২.২ একনজরে ৬০ দশকের চলচ্চিত্র ৬৬
২.৩ চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর ৭০
২.৪ চলচ্চিত্রের সমান্তরাল শিল্পকলা ও গণমাধ্যম.... ৭৪
২.৫ হিন্দি ও অন্য ভাষার চলচ্চিত্র আমদানি ৭৭
২.৬ তারকা-কুশীলব ৭৯
২.৭ চলচ্চিত্রের দর্শক, ব্যবসা এবং প্রেক্ষাগৃহ....৮৩

২.৭.১ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহ ৮৭
২.৮ চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী ৯০
২.৮.১ চলচ্চিত্রের গান ১০২
২.৯ বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ ১০৩

তৃতীয় অধ্যায়
সত্তরের দশক : সমাজ বাস্তবতার পুনরাবিষ্কার

৩.১ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ১০৭
৩.২ একনজরে ৭০ দশকের চলচ্চিত্র ১০৮
৩.৩ চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর ১১৫
৩.৪ চলচ্চিত্রের সমান্তরাল শিল্পকলা ও গণমাধ্যম ১১৭
৩.৫ চলচ্চিত্র আমদানি ও অন্য ভাষার চলচ্চিত্র ১২১
৩.৬ তারকা-কুশীলব ১২৩
৩.৭ চলচ্চিত্রের দর্শক, ব্যবসা এবং প্রেক্ষাগৃহ ১২৮
৩.৭.১ প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ ১৩২
৩.৮ চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী ১৩৩
৩.৮.১ চলচ্চিত্রের গান ১৪৭
৩.৯ বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ ১৪৮

চতুর্থ অধ্যায়
আশির দশক : বিনোদন বাণিজ্য

৪.১ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ১৫১
৪.২ একনজরে ৮০'র দশকের চলচ্চিত্র ১৫৩
৪.৩ চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর ১৬২
৪.৪ চলচ্চিত্রের সমান্তরালে অন্যান্য গণমাধ্যম ১৬৪
৪.৫ তারকা-কুশীলব ১৭০
৪.৬ চলচ্চিত্রের দর্শক, ব্যবসা এবং প্রেক্ষাগৃহ ১৭৫
৪.৬.১ ক্যাপাসিটি ট্যাক্স ও প্রেক্ষাগৃহের ব্যবসা ১৮১
৪.৬.২ প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্টদের সামাজিক মর্যাদা ১৮৩
৪.৭ চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী ১৮৫
৪.৭.১ চলচ্চিত্রের গান ১৯৬
৪.৭.২ বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র ১৯৮
৪.৮ বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ ২০০

পঞ্চম অধ্যায়

নব্বই দশক : বিপর্যস্ত বাণিজ্য ও পুরুষালি বিনোদন

৫.১ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ২০৪
৫.২ একনজরে ৯০ দশকের চলচ্চিত্র ২০৫
৫.৩ চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর ২১২
৫.৪ চলচ্চিত্রের সমান্তরাল শিল্পকলা ও গণমাধ্যম ২১৮
৫.৫ চলচ্চিত্র আমদানি ও অন্য ভাষার চলচ্চিত্র ২২১
৫.৬ তারকা-কুশীলব ২২২
৫.৬.১ তিনি নায়ক সালমান শাহ্ ২২৬
৫.৬.২ নায়ক মান্না ২২৯
৫.৭ চলচ্চিত্রের দর্শক, ব্যবসা এবং প্রেক্ষাগৃহ ২৩৩
৫.৭.১ নতুন ট্যাক্স, নতুন সঙ্কট ২৪০
৫.৮ চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী ২৪১
৫.৮.১ চলচ্চিত্রের গান ২৫৫
৫.৯ বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ ২৫৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

একুশ শতকের পরিস্থিতি ও প্রবণতা

৬.১ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ২৫৯
৬.২ একনজরে শূন্য দশকের চলচ্চিত্র ২৬১
৬.৩ চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর ২৬৭
৬.৪ চলচ্চিত্রের সমান্তরাল শিল্পকলা ও গণমাধ্যম ২৭৭
৬.৫ চলচ্চিত্র আমদানি ও অন্য ভাষার চলচ্চিত্র ২৮৫
৬.৬ তারকা-কুশীলব ২৮৯
৬.৬.১ বাস্তব বনাম সেলুলয়েডের ডিপজল ২৯৪
৬.৬.২ একক নায়ক শাকিব খান ২৯৮
৬.৬.৩ নায়ক-নির্মাতা-প্রযোজক অনন্ত জলিল ৩০৬
৬.৭ চলচ্চিত্রের দর্শক, প্রেক্ষাগৃহ এবং ব্যবসা ৩০৯
৬.৭.১ প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ নিয়ে বিতর্ক ৩১৭
৬.৭.২ বিচিত্র দর্শক মন ৩২১
৬.৭.৩ প্রযোজক, পরিবেশক এবং প্রেক্ষাগৃহ ৩২৪
৬.৭.৪ বন্ধ প্রেক্ষাগৃহ ৩৩০
৬.৭.৫ প্রসঙ্গ সিনেপ্লেক্স ৩৩৩

৬.৭.৬ শিল্প (Industry) হিসেবে চলচ্চিত্র ৩৩৮
৬.৭.৭ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের সামাজিক মর্যাদা ৩৩৯
৬.৭.৮ যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র ৩৪৪
৬.৭.৯ চলচ্চিত্রের প্রচার-প্রচারণা ৩৫০
৬.৭.১০ পাইরেসির ভয়াবহতা ৩৫৩
৬.৭.১১ প্রযোজনায় টেলিভিশন চ্যানেল ৩৫৭
৬.৭.১২ প্রযোজনা-পরিবেশনা-প্রদর্শন নিয়ে জাজ মাল্টিমিডিয়া ৩৫৯
৬.৮ প্রেক্ষাগৃহে বোমা হামলা ৩৬৪
৬.৯ চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী ৩৬৬
৬.৯.১ চলচ্চিত্র নির্মাণ ও নির্মাতা ৩৭১
৬.৯.২ প্রসঙ্গ অভিনয় ৩৭৫
৬.৯.৩ চলচ্চিত্রের কাহিনি ৩৭৭
৬.৯.৪ ফারুকী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৩৮১
৬.৯.৫ কাটপিসের দৌরাত্ম ৩৮৩
৬.৯.৬ ডিজিটাল প্রযুক্তির চলচ্চিত্র ৩৮৪
৬.১০ বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ ৩৮৭
৬.১১ উপসংহার ৩৯০

গ্রন্থপঞ্জি ৩৯৪

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট ১ আখ্যানের তথ্য-উপাত্তের থিমেটিং ইনডেক্সিং ও প্রাবল্যের ক্রম ৪১০
নির্ঘণ্ট ২ বিষয় ধরে থিমের বিন্যাস ৪১৫
নির্ঘণ্ট ৩ আখ্যানের তথ্য-উপাত্তে দর্শক স্মৃতিতে থাকা তারকা-কুশীলবদের প্রাবল্য ৪২১
নির্ঘণ্ট ৪ এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা ৪২৪
নির্ঘণ্ট ৫ নিবিড় সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা ও পরিচয় ৪৩৭
নির্ঘণ্ট ৬ আখ্যানের দর্শক স্মৃতিতে থাকা চলচ্চিত্র ও তার প্রাবল্য ৪৩৮
নির্ঘণ্ট ৭ একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ন্যারেটিভের নমুনা ৪৪৭

প্রথম অধ্যায়

বিষয় ও উদ্দেশ্য : সময়, সমাজ ও চলচ্চিত্র

১.১) ভূমিকা

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের অভিযাত্রাকে সময় ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে সময়ের মধ্যে মানুষের বসবাস সেটা একরৈখিক নয়; একই সঙ্গে তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে ধারণ করে। এই গবেষণায় সময় একরৈখিক নয়, সময়ের দিন-তারিখ-সাল সাপেক্ষে যে ইতিহাসের চর্চা, তাও এর বিষয় নয়; বরং সেই ইতিহাস যে ধ্যান-ধারণা নির্মাণ করে তাকে সমাজের প্রাত্যহিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখা এর উদ্দেশ্য। এই গবেষণা চলচ্চিত্র আর সমাজের আন্তঃসম্পর্ককে উদঘাটন করতে চেয়েছে; অন্তত দুটি পরিসরকে মনযোগের কেন্দ্রে রেখে। **প্রথমটি** যেখানে চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয় তথা প্রেক্ষাগৃহ এবং তার পারিপার্শ্বিক সমাজ বাস্তবতার জমিনে বিচরণশীল দর্শক; **অন্যটি হলো** খোদ চলচ্চিত্রে সমাজ বাস্তবতার রিপ্রেজেন্টেশন। চলচ্চিত্রে নির্মিত সমাজ-বাস্তবতার সূত্র ধরে এই গবেষণায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের একটি ভিন্ন ভাষ্য তৈরি হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট করে গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে :

১) তৃণমূল দর্শক এবং প্রেক্ষাগৃহ কেন্দ্রিক জন-জীবনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে পুনঃপাঠ ও বিশ্লেষণ করা।

২) সমাজের ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর সাথে চলচ্চিত্রের বহুমাত্রিক সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা।

৩) সমাজ বাস্তবতা কীভাবে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয় এবং চলচ্চিত্র কীভাবে সমাজ বাস্তবতার পরিগঠনে ভূমিকা রাখে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তা ব্যাখ্যা করা।

৪) ক্ষমতা-সম্পর্ক কীভাবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রকৃতি ও পরিসরকে নির্ধারণ করেছে তার নিবিষ্ট অনুসন্ধান করা।

বাজার ব্যবস্থাপনা, বিপণন, বাজারিকরণ ও মান বিবেচনায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আজ যে কোনো সময়ের চেয়ে গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। এর সবচেয়ে বড়ো উপসর্গ হলো সারাদেশে একের পর এক প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হওয়া। পরিবর্তন এসেছে দর্শক ও চলচ্চিত্রের আধেয়তে। বিষয়টি সামাজিক

স্তরবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শ্রেণির সঙ্গেও সম্পৃক্ত। এই পরিস্থিতিতে গত ৬০ বছরের (১৯৫৬–২০১৫) চলচ্চিত্রে সমাজ-বাস্তবতা কীভাবে রিপ্রেজেন্টেড হয়েছে, আবার চলচ্চিত্র কীভাবে সমাজ-বাস্তবতাকে পুনর্নির্ধারণ করেছে সেটা জানা বোঝা জরুরি। একই সঙ্গে দর্শক ও প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্টদেরকে পর্যবেক্ষণ এবং এই পরিস্থিতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্থান থেকে তারা কীভাবে দেখছে সেটাও জানা দরকার।

চলচ্চিত্র এমন এক গণমাধ্যম যা বিনোদন-শিল্প হিসেবে শ্রুতিদৃশ্যরূপে কল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, আলোকচিত্র, নাট্যকলার সমাহারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বা সমাজ বাস্তবতারই আরেক প্রতিরূপকে উপস্থাপন করে। বয়সে অন্য সব শিল্পমাধ্যম থেকে নবীন হলেও গুরুত্ব, দর্শকের অভিগম্যতা ও বড়ো ধরনের সামাজিক ভূমিকার কারণে বেশিরভাগ মৌলিক শিল্পমাধ্যমকে ছাপিয়ে গেছে চলচ্চিত্র। মনে করা হয়, "চলচ্চিত্রের পুঁজিবাদী রূপ দর্শককে বিনোদন-বাজারের অক্রিয় ভোক্তায় অবিরত রূপান্তরিত করে, স্বপ্ন ও ভাবালুতায় মোহাচ্ছন্ন রেখে বিরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়ায় ঠেলে দেয় এবং ক্ষমতাবানের মতাদর্শিক হাতিয়ার হয়ে দর্শকমনে আধিপত্য কায়েম করে" (হক ২০১৩, পৃ১১)। শুধু আধিপত্য কায়েমই নয়, খোদ সমাজ-বাস্তবতা নির্মাণেও চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে "এই চলচ্চিত্রই হয়ে ওঠে জনসংস্কৃতি—যেসব সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূলধন নেই, যেসব সাধারণ মানুষদের নিজস্ব সংস্কৃতি; আধিপত্যশীল উচ্চকোটির সংস্কৃতির বিপরীতে গড়ে ওঠা গণসংস্কৃতি যা ঐ উচ্চ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে হাজির হয়" (হক ২০১৩, পৃ১১)। চলচ্চিত্রের সামাজিকীকরণের ভূমিকাটি সম্ভবত এ কারণেই অন্য সব শিল্পমাধ্যমের তুলনায় অনন্য। এছাড়া চলচ্চিত্র সব সময় একটি নির্দিষ্ট কালখণ্ড বা সময়কে তুলে ধরে। এর মধ্য দিয়েই সে ইতিহাস নির্মাণ করতে চায়, অথবা নিদেনপক্ষে সমাজ ইতিহাসের উপকরণ হয়ে ওঠে, সমাজ ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র ভাষ্য এবং পরিসর হয়ে ওঠে।

জন্মলগ্ন থেকেই চলচ্চিত্রকে তিনটি স্বার্থ নিয়ে চলতে হয়েছে : **প্রথমটি**, শিল্পী ও কলাকুশলীদের; যারা নতুন প্রচার-মাধ্যমটিকে আবিষ্কার করেছিলো এক অভিনব শিল্পকলা হিসেবে। **দ্বিতীয়টি**, ব্যবসায়িক স্বার্থ; যাদের কাছে এই মাধ্যমটি ছিলো ব্যবসায়িক পণ্য। **তৃতীয়টি**, মতাদর্শ, ক্ষমতা ও আধিপত্য; ক্ষমতাবানরা সেই শুরু থেকেই নিজেদের স্বার্থে এই মাধ্যমটিকে ব্যবহার করেছে। তবে এই তিনের মধ্যে ব্যবসায়িক স্বার্থ ও আধিপত্য সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে এই মাধ্যমটির ওপরে। চলচ্চিত্রের আদি থেকেই এর সঙ্গে আর্থিক মুনাফার প্রশ্নটা জড়িত ছিলো। তাই চলচ্চিত্রের আধেয় বিষয়বস্তু বাছাইয়ে হয়তো নির্মাতাদের সবসময় এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হয়েছে। এটা করতে গিয়েই হয়তো কখনো মধ্যবিত্ত, কখনো উচ্চবিত্ত, কখনো নিম্নবর্গের মানস ও রুচি চলচ্চিত্রের আধেয়কে নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিগত ৬০ বছর (১৯৫৬–২০১৫) পেরিয়ে একটা বড়ো ধরনের পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সামনের দিনে এই পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি অনুসন্ধানে তাই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক চরিত্র ও প্রবণতাগুলোকে জানা ও বোঝা জরুরি।

দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশে চলচ্চিত্রকে বোঝার অন্যতম প্রধান প্রবণতা ছিলো এর আধেয় বিশ্লেষণ। অন্যভাবে বললে, টেক্সট হিসেবে চলচ্চিত্র দর্শকের সামনে যা নিয়ে হাজির হয়েছে সেটাতেই মনযোগ নিবদ্ধ করা। চলচ্চিত্র যে সমাজ-বাস্তবতা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হয়, সেটাকেই বারবার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এর গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ চলচ্চিত্রের কেন্দ্রে যে দুটো জিনিস—দর্শক ও প্রেক্ষাগৃহ—তা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়নি বললেই চলে। যে সমাজ-বাস্তবতা চলচ্চিত্রে রিপ্রেজেন্ট হয়, তা দর্শকের কাছে গিয়ে কীভাবে পুনর্নির্ধারিত হয়, সেটা খুব কমই দেখা হয়েছে। ফলে চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলাদেশের বেশিরভাগ গবেষণা হয়ে উঠেছে খানিকটা একদিকদর্শী। কিন্তু দর্শক ও চলচ্চিত্রে নির্মিত বাস্তবতার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মূলত শিল্প ও ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে এই মাধ্যমটি এগিয়ে যায়।

সামাজিক আচার হিসেবে প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র দেখা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রযুক্তি হিসেবে চলচ্চিত্রের বিভ্রম বা প্রভাবনের যে ক্ষমতা তা তখনই যথাযথভাবে সক্রিয় থাকে, যখন দর্শক প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে একাগ্রচিত্তে সমাজ বা মনোজাগতিক বাস্তবতার রূপায়নকে শ্রুতিদৃশ্যের প্রবল আবহে প্রত্যক্ষ করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত শ্রেণি-বিন্যাসে সার্বজনীন অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠার যে চর্চা প্রেক্ষাগৃহ করে, তা দর্শককে চলচ্চিত্রে নির্মিত বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে যায়। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখার যে আচার ও চর্চা তা যেমন বিলীন হয়ে গেছে, তেমনি ৬০ বছরের (১৯৫৬–২০১৫) ইতিহাসে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র কোনো স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে একে একে প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হয়ে গেছে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত সারাদেশে প্রেক্ষাগৃহ ছিলো ১২০০। গত কয়েক বছরে সারাদেশে অসংখ্য প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রদর্শক সমিতির হিসাব অনুযায়ী ১৯৯০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে প্রায় ৫৫২টি প্রেক্ষাগৃহ (*সমকাল* ৩ জুলাই ২০১১)। ২০১৩ সালের হালনাগাদ হিসাব অনুযায়ী দেশে এখন মাত্র ৪১৫টি প্রেক্ষাগৃহ রয়েছে (ঝুমা ২০১৪, পৃ৮৫–১০১)।

এই ধরনের একটি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সমসাময়িক চলচ্চিত্রের বাস্তব সঙ্কট বোঝার জন্য এর ঐতিহাসিক রূপ বোঝা খুব জরুরি। এবং সেটা চলচ্চিত্রের আধেয় বা ব্যবসায়িক সাফল্য বিচারে বিশ্লেষণের চেয়ে প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট নানা পেশার মানুষ ও দর্শকের জায়গা থেকে বিশ্লেষণ করাটা বেশি জরুরি। সনাতন ইতিহাসবিদ্যা যে উপরিতল থেকে যেসব উপাত্তের ভিত্তিতে কাজ করে, তার বিপরীতে নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস মাইক্রো পর্যায়ের সমাজ-বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে চলচ্চিত্রের মতো সুবিশাল ও জটিল প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করে। ফলে সমাজ-রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা অংশের মানুষের অভিজ্ঞতা ও আখ্যানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস। ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তার জায়গা থেকে দেখা এই নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস খুব সহজেই সমস্যার এমন সব মূলে পৌঁছাতে পারে যা প্রথাগত ইতিহাসের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর এই সমস্ত কারণেই নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আত্মীকরণ এই গবেষণায় কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত প্রবণতা হয়ে উঠেছে খুব অনিবার্যভাবে।

১.২) শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ও অভিনবত্ব

কোনো কিছুকে উপস্থাপনে বড়ো ধরনের প্রাযুক্তিক ও শৈল্পিক ক্ষমতা আছে চলচ্চিত্রের। যা বাস্তবকে বোঝা বা নির্মাণ ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে একেবারে ভিন্ন একটি ধারা তৈরি করেছে। চলচ্চিত্র আবিষ্কারের আগে সমাজ-বাস্তবতা উপস্থাপনের এতো বিস্তৃত কোনো মাধ্যম ছিলো না। ফলে চলচ্চিত্রের আবির্ভাব একাধারে যেমন আধুনিকতার অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে, তেমনি সময়, সমাজ, রাজনীতি, ক্ষমতা-সম্পর্ক, মনন সবকিছুতে একটা নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। এতে করে অন্য সব গণমাধ্যমের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্র। ফলে পৃথিবীজুড়েই চলচ্চিত্র আর সমাজ চলছে একটি অনিবার্য মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

যে প্রেক্ষাপটে কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণ হয় সেটাই সমাজ-বাস্তবতা হয়ে ধরা দেয়। অর্থাৎ সমাজের অগ্রযাত্রায় চলচ্চিত্রের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে ওই সমাজ ও সময়কে নির্মাণের একটা প্রক্রিয়াও চালু আছে। তবে সেইঅর্থে "সময়কে যদি আমরা শুধুমাত্র ইতিহাস ও সালতামামির নজর দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি, তবে আমাদের অস্তিত্বই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের নামে খণ্ডিত হয়ে পড়বে। এই সময়বোধের আধারে সৃষ্টিক্রিয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে, ভবিষ্যৎ কল্পনা করার প্রজ্ঞাও আমরা হারিয়ে ফেলব। যে ভাব বা বাসনা আমাদের ইতিহাস বুঝতে বা লিখতে উদ্বুদ্ধ করে তা শুধু সত্যানুসন্ধান বা জ্ঞানচর্চার আকাঙ্ক্ষাই নয়, তা সৃজনের, ভবিষ্যৎ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। এখানেই হল ইতিহাসের আসল রস—সৃষ্টির আনন্দে আর ব্যথায়" (মুখোপাধ্যায় ১৯২৯, পৃ৩৯)।

সময়ের এই ধারণাকে মাথায় রেখে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাযুক্তিক মাধ্যম থেকে তা খুব দ্রুতই বিনোদন ব্যবসার পণ্যে পরিণত হয়। একই সঙ্গে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গল্প বলার যে নতুন একটা ধারা তৈরি হয়, সেটাকে অনেকে শৈল্পিক ও রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে থাকে। ফলত; চলচ্চিত্র যেকোনো সময়ই একই সঙ্গে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত এবং প্রযুক্তি, শিল্পকলা ও ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে কাজ করতে থাকে। প্রযুক্তি হিসেবে এডিসন হয়ে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে যে চলচ্চিত্র সফলতা পায়[১]; সেটাকে খুব দ্রুতই তারা প্রযুক্তি ছাড়িয়ে ব্যবসার পণ্য করে তোলে। ফ্রান্সের জাদুকর জর্জ মেলিয়ে সেই পথিকদের অন্যতম। তিনি চলচ্চিত্রে একই সঙ্গে কল্পনা, কাহিনি, রহস্য, জাদুময়তা, নাটকীয়তা,

---

[১]. এডিসনের কারখানায় তৈরি কিনেটোস্কোপ নামের যন্ত্রে ১৮৯৩ সালেমানুষ প্রথম চলমান ছবি দেখতে পায়। কিন্তু এই যন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিলো, ইমেজকে পর্দায় প্রক্ষেপণ করতে না পারা। ফলে বায়োস্কোপের মতো যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে একজন করে সেই চলমান ছবি দেখতে হতো। পরে লুমিয়ের ভাইয়েরা মায়াব্রিজ, ইস্টম্যান ও এডিসনের কিনেটোস্কোপের সারবস্তু নিয়ে পর্দায় চলমান ইমেজ ফেলার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ১৮৯৫ সালের মার্চে তারা ফ্রান্সের পারি শহরে এর প্রথম প্রদর্শন করেন। এর পর থেকেই ব্যবসায়িকভাবে চলচ্চিত্রের পথচলা শুরু হয়।

নান্দনিকতা ও কারিগরি কৌশলের উদ্ভাবক। মেলিয়ে ১৮৯৬ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে প্রায় এক হাজার চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং ব্যবসা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানিতে দারিদ্র ও নিরাপত্তাহীনতা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। ১৯১৮ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত জার্মান সমাজ-বাস্তবতায় নাগরিকদের মধ্যে চরম হতাশা দেখা যায়। যুদ্ধপরবর্তী খাদ্যাভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে নিরাপত্তাহীনতা বেড়ে যায়। এই সময় জার্মান চলচ্চিত্রে প্রভাব বাড়তে থাকে শিল্প আন্দোলনের অভিব্যক্তিবাদ ধারার। শিল্পকলা থেকে চলচ্চিত্রে এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিলো মানবিকতা ও যৌনতার শক্তিকে প্রকাশ করা। এই শৈলীর প্রথম প্রকাশ রবার্ট ভিন-এর *দ্য ক্যাবিনেট অব ডক্টর ক্যালিগারি* (১৯১৯) নামে চলচ্চিত্র দিয়ে। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় পরাবাস্তববাদ ধারার লুই বুনুয়েলের *আসিয়া আন্দালু* (১৯২৯)। বুনুয়েল চরিত্রের অন্তঃরস্থ দিকসমূহকে পরাবাস্তববাদী শিল্পভাবনার আলোকে চলচ্চিত্রে স্থান করে দিয়েছিলেন (আউয়াল ২০১১, পৃ৭০)। আর এভাবেই চলচ্চিত্রে মানুষ ও জীবন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। শিল্প মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রে পরিবেশিত হয় মানুষের সমাজ জীবনের বাস্তবতা। যদিও সে বাস্তবতায় একটা বিভ্রম ছিলো। কিন্তু অন্ধকার ঘরে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময়ের জন্য সেটাই হয়তো দর্শকের কাছে বাস্তব হয়ে ধরা দিতো। চলচ্চিত্রের এই শক্তিকে ক্ষমতাবানরা সব সময় ব্যবহারও করেছে।

অন্যদিকে চলচ্চিত্র তার বস্তুগত চরিত্রের কারণেই হয়তো সত্যের যে আবহ নির্মাণ করে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এভাবে 'সত্য উৎপাদনে'ও চলচ্চিত্র ব্যবহৃত হয়। আর সেই সঙ্গে কার্যকর হয় দর্শকের ইচ্ছাপূরণের বিভ্রম বিক্রির সম্ভাবনা। ফলে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অবাস্তব সুন্দর নারী, চরম সহিংসতা, বা চন্দ্রাভিযানের মতো আধুনিক রূপকথার উপাদানগুলি রক্ষণশীল নাগরিকদের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে বলেও মনে করেন অনেকে। একই সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হিসেবে দর্শকের ইন্দ্রিয়কে একধরনের আশ্বস্ত বা আরামবোধে রাখার কাজেও চলচ্চিত্র ব্যবহৃত হয় (হোসেন ২০১০, পৃ৮৫)। এছাড়া শ্রুতিদৃশ্যগত মাধ্যমের এই ক্ষমতা দর্শকের মধ্যে সব সময় একটা গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ তৈরিতেও ভূমিকা রাখে। যা ইতিহাস ও তার চর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫৬-তে বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের শুরু হয়ে ৭০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত আধুনিক বিনোদন শিল্প হিসেবে সে রেডিওকে ছাপিয়ে রাজত্ব করেছে। রেডিও কিংবা ঐতিহ্যিক যাত্রা, জারি, পালাগানের বাইরে তখন মানুষের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম ছিলো চলচ্চিত্র। ফলে সেই সময়ে গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের অবস্থান আর ৮০'র দশক পরবর্তী সময়ে—যখন টেলিভিশন ও ভিসিআর এর আগমন ঘটে—তখনকার চলচ্চিত্রের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। দুই সময়ের সমাজ-বাস্তবতাও ভিন্ন। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার তোড়ে ১৯৬৫ সালে ভারতীয় বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের আমদানি বন্ধ এবং

অন্যান্য কারণে *রূপবান*কে (১৯৬৫) নিজেদের চলচ্চিত্র মনে করে যে সব দর্শক প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করেছিলেন, সেই দর্শক কিন্তু পরিবর্তিত বাস্তবতায় একইভাবে *মনপুরা* (২০০৯) দেখতে যায়নি। কারণ দুই সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট একেবারে আলাদা। একইভাবে ২০১৫ সালে যখন প্রেক্ষাগৃহে *মহুয়া সুন্দরী* চলে আর তা দর্শক শূন্য থাকে, তখন সেখানে একেবারে ভিন্ন কারণ কাজ করে। তার মানে চলচ্চিত্রে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির সমাজ-বাস্তবতা রিপ্রেজেন্ট করলেই সেই শ্রেণি যে তার দর্শক হবে বিষয়টা মোটেও এমন নয়। তাহলে *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩) কিংবা *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৭৯) দর্শকপ্রিয়তা পাওয়ার কথা; অথচ তা হয়নি।

যা হোক, প্রযুক্তিগতভাবেই চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও বিপনণ বড়ো আকারে পুঁজি সঞ্চালনের উপর নির্ভরশীল। ফলে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে শিল্প ও বাণিজ্যিক পুঁজির একটি অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা আছে। পুঁজি দুইভাবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। **প্রথমত;** সরাসরি ব্যবসা মানে পুঁজি বিনিয়োগ করে সেখান থেকে মুনাফা তুলে আনা। **দ্বিতীয়ত;** ক্ষমতাতন্ত্রের চর্চার অংশ হিসেবে, মানে বিদ্যমান পরিস্থিতিকে যথাযথ হিসেবে নিয়ে স্বাভাবিক করা। অতীতে উপনিবেশগুলোতে এই নবীন আবিষ্কার জাহির করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোলের নিজ আখ্যানকে জোরদার করা হতো। উপনিবেশিতদের 'মানুষ' করে তোলার কাজেও ব্যবহৃত হতো চলচ্চিত্র। এভাবে গোড়া থেকেই চলচ্চিত্র শাসকদের সক্রিয় ব্যবহারে ছিলো এবং একশো বছর পরেও তার এই গুরুত্বে হেরফের হয়নি (হোসেন ২০১০, পৃ৮৬)।

এদিকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে হঠাৎই একধরনের নব্য প্রযোজক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এরা নতুন একটি দেশে প্রচুর টাকার মালিক হয় নানা উপায়ে। তাদের অর্জিত এই কালো টাকা সাদা করতে অনেকে চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ শুরু করে (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৫১)। এছাড়া তাদের কেউ কেউ চলচ্চিত্রকে অল্প সময়ে বেশি মুনাফার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকে। বিনিয়োগ ও মুনাফার এই গতি-প্রকৃতির কারণে ইন্ডাস্ট্রিতে নকল কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা প্রবণতা শুরু হয়। এই প্রবণতা আজ অবধি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান প্রবণতা হিসেবে কাজ করছে।

এই প্রবণতা মুনাফার জন্য যেমন বিরাজমান সমাজ পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে উপস্থাপন করে, তেমনই একই উদ্দেশ্যে প্রমিতকরণ (Standardization) ও ছদ্মপ্রাতিস্বিকীকরণের (Pseudo-indivisalization) আশ্রয় নেয়। ফলে বাংলাদেশে যখনই কোনো চলচ্চিত্র ব্যবসাসফল হয়েছে, তখনই নির্মাতারা একের পর এক সেই ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়েছে। এহতেশামের উর্দু ভাষার *চান্দা* (১৯৬২), *রূপবান* (১৯৬৫), *চাঁদনী* (১৯৯১) কিংবা কাজী হায়াতের *দাঙ্গা* (১৯৯২) তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে শুধু নকল ও একই ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণই নয়, কালো টাকার মালিকদের একটা বড়ো অংশ বর্তমানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে 'সংস্কৃতি-কলাকার' নামের আড়ালে 'সংস্কৃতি-দুর্বৃত্তায়ন'ও করছে (হায়দার

২০১৫)। এর সঙ্গে পরোক্ষ, কখনো কখনো প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র নিজে সম্পৃক্ত। আর এর মধ্য দিয়ে বিনোদন, বিকল্প চলচ্চিত্র, সুস্থ চলচ্চিত্র, সমাজ-বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি, ডিজিটাল চলচ্চিত্র ইত্যাদি নানা ধুয়া তুলে বার বার দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে ডেকে আনা হয়েছে।

যাত্রা দেখে আসা এই দর্শক বিভিন্ন সময় আশা নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে এসে কখনো কখনো আশাহত হয়েছেন, আবার ফিরে এসেছেন। কারণ বিনোদনের এই মাধ্যমটি বিশেষ করে প্রেক্ষাগৃহ সামাজিক পরিসর হিসেবে দর্শককে যেভাবে অধিকার চর্চার সুযোগ দেয় বলে মনে হয়, অন্য মাধ্যমগুলো অনেকক্ষেত্রেই তা দিতে পারেনি। ফলে সব শ্রেণি-ধর্ম-পেশা-বয়স-লিঙ্গের মানুষ এক সঙ্গে নিজেদের মতো করে টানা কয়েক দশক প্রেক্ষাগৃহে হাজির থেকেছেন। কিন্তু ৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে এই প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের উপস্থিতি মারাত্মক হারে কমতে শুরু করে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সরকার গত তিন দশকে চলচ্চিত্র থেকে প্রচুর রাজস্ব নিলেও এই সঙ্কটের সময় এর প্রতি খেয়াল রাখেনি। কেনো এবং কোন পরিস্থিতিতে এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি গণমাধ্যম এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান (প্রেক্ষাগৃহ) ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলো তা অনুসন্ধানও করেনি।

এদিকে আধা শতকের বেশি সময় গেলেও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র তার জাতীয় কোনো স্বাতন্ত্র্য তৈরি করতে পারেনি। অথচ চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তার জাতীয় পরিচয় গঠনের উপাদান থাকে। কারণ চলচ্চিত্র নিজ গুণেই তার পারিপার্শ্বিক ভৌত আবহকে ধারণ করতে পারে। যা কিছু দৃষ্টিগ্রাহ্য তা চলচ্চিত্রে ধরা পড়ে। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের আবশ্যিক আধেয় হয় স্থান এবং কাল। এ অবস্থায় নির্মাতার যদি কোনো বিশেষ পক্ষপাত না থাকে, তাহলে যে সময় ও কালে কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়, তার ভৌত সংকেতগুলোকে ওই চলচ্চিত্র থেকে পাঠোদ্ধার করা যায় (হোসেন ২০১০, পৃ৬৭)। কিন্তু যে জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, সেখানে কোথাও নিজেদেরকে আর আলাদা করে চেনার মতো কিছু থাকে না।

ফলে জাতীয় চলচ্চিত্রের ধারা নিয়ে এই মুহূর্তের বাংলাদেশে অসংখ্য আশঙ্কা ও শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর পিছনে যেমন বিশ্বায়ন প্রপঞ্চের এককেন্দ্রিক ধারণায়ন রয়েছে, তেমনই উত্তর-উপনিবেশ সমাজের যে বৈশিষ্ট্য তাও ভূমিকা রাখছে। “আমরা যোগ দিয়েছি, তাদের মতো করে ভাবতে, প্রকাশ করতে শিখেছি। আমাদের নিজস্ব কোনো ভাবনা আধুনিকতার মূলধারায় সংশ্লিষ্ট হয়নি” (হোসেন ২০১০, পৃ৬৫)। এর বাইরে অবশ্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বৃহৎ ‘চলচ্চিত্র-ইন্ডাস্ট্রির’ও একটি ভূমিকা আছে। যদিও ভারত নিজেও অভ্যন্তরীণ বহুমাত্রিকতা মানে ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রাদেশিকতার কারণে নিজেদের জাতীয় চলচ্চিত্রের পরিচয় নির্ধারণেও সঙ্কটে আছে।

১.৩) বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এদেশে চলচ্চিত্রের শুরু হয়েছিলো হীরালাল সেন ও পরে ঢাকার নবাব পরিবারের হাত ধরে ১৯৫৬ তে। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারিতে ঢাকার সচিবালয়ে স্থানীয় সংস্কৃতিসেবী, চলচ্চিত্র পরিবেশক ও প্রদর্শকদের নিয়ে সভা ডাকলেন পূর্ববঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ড. আব্দুস সাদেক। সভায় ড. সাদেক পূর্ব বাংলার ৯২টি প্রেক্ষাগৃহে বিদেশি চলচ্চিত্রের বদলে যাতে স্থানীয় চলচ্চিত্র চলে সেজন্য নিজেদের চলচ্চিত্র তৈরির কথা বলেন। তার এ বক্তব্যের পর অবাঙালি চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী ফজলে দোসানী বললেন, পূর্ববাংলার আর্দ্র আবহাওয়ায় কখনোই এখানে চলচ্চিত্র তৈরি সম্ভব নয়। দোসানীর বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে আব্দুল জব্বার খান বলেছিলেন, এক বছরের মধ্যে তিনি এখানে চলচ্চিত্র বানিয়ে দেখাবেন এ অঞ্চলেও চলচ্চিত্র বানানো সম্ভব (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ৩৬)। এরপর ১৯৫৪ সালে এ বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ*-এর শুটিং শুরু হয়, চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৫৬-তে।

ইতিহাসের এ কাহিনি অবশ্য অনেকের কাছে আব্দুল জব্বার খানকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী বীরে পরিণত করেছে। তবে এমনটি মনে করার কারণ নেই যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা উপনিবেশবাদ বিরোধী মনোভাব থেকে জব্বার খান এটি নির্মাণ করেছিলেন। বরং এটা বলা যায় যে, নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি প্রচার করতে সচেষ্ট ছিলো, *মুখ ও মুখোশ* সেই চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রয়াস ছিলো (রাজু ২০০২, পৃ২২৯)। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের আশীর্বাদ নিয়েই *মুখ ও মুখোশ*-এর জন্ম।

৫৬-তে পূর্ব বাংলার নিজস্ব চলচ্চিত্র হলো। এরপর ৭০ সাল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ইন্ডাস্ট্রির প্রমিতকরণ ও ছদ্মপ্রাতিসীকিকরণের সমন্বয়ে বাংলা ও উর্দু মিলে তৈরি হয়েছে বেশকিছু চলচ্চিত্র। এরপর ১৯৬৫ সালে *রূপবান*। নিজেদের ঐতিহ্য, চিন্তা ও বোঝাপড়ার চলচ্চিত্র; সঙ্গে মুনাফা, পুঁজি। এরপর মুক্তিযুদ্ধ। যা হওয়ার তাই হলো; এতো বড়ো অর্জন হয়ে উঠলো চলচ্চিত্রের অন্যতম আধেয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বিষয় হিসেবে চলচ্চিত্রকে খুব বেশি কিছু দিতে পেরেছে কিনা সেটা গবেষণার দাবি রাখে। স্বাধীনতা উত্তর দেশের যুদ্ধের নৃশংসতা আর নারী ধর্ষণের বাণিজ্যিক ব্যবহার চলচ্চিত্রের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এছাড়া স্বাধীনতা অর্জনের প্রারম্ভে চলচ্চিত্র বড়ো ধরনের একটা ক্ষতির মুখে পড়েছিলো জহির রায়হানের মৃত্যুতে।

শিল্প ও বাণিজ্যের সমঝোতার বাইরে গিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের প্রথাগত চলচ্চিত্রের বাইরে গিয়ে আলমগীর কবির *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩) নির্মাণ করেন। একজন ভারতীয় নারীর বাংলাদেশে আসার কাহিনি নিয়ে এই চলচ্চিত্র। ওই নারীর প্রেমিক ভারতীয় বিমানবাহিনীর অফিসার, যিনি মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারান। তার খোঁজে তিনি বাংলাদেশে আসেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মহাবিপর্যয়ের কাহিনি শুনে-দেখে তার ধারণা পাল্টে যায়। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হারুন অর রশীদের *মেঘের অনেক রঙ*

(১৯৭৬) এ দেখানো হয় যুদ্ধ কীভাবে মানবিক সম্পর্ককে এলোমেলো করে দেয়। কিন্তু এই চলচ্চিত্রগুলো জনপ্রিয়তা ও ব্যবসায়িক কোনো দিকেই সফল হতে পারেনি।

১৯৭৯ তে নির্মিত হয় স্বাধীনতা উত্তর সময়ের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র মসিহ উদ্দিন শাকের ও শেখ নেয়ামত আলীর *সূর্য দীঘল বাড়ী*। যদিও চলচ্চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নয়; তবে এটি বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেয়। আবু ইসহাকের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ইতালিয়ান নব্যবাস্তবধারা ধাঁচের এই চলচ্চিত্রে একজন গ্রামীণ নারীর টিকে থাকার কাহিনি উঠে এসেছে। কিন্তু সমস্যার কথা হলো, ভালো চলচ্চিত্র হলো, দেশের বাইরে প্রশংসাও পেলো, কিন্তু দেশের মানুষ এটা দেখতে পেল না। নাটোরের একটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়ার পর *সূর্য দীঘল বাড়ী* ঢাকায় মুক্তি দিতে সময় লেগেছিলো এক বছর। একই ভাবে *মেঘের অনেক রঙ* তিন দিন দেখিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো।

এভাবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সৃজনশীল চলচ্চিত্র ধারার প্রথম প্রজন্মের জহির রায়হান, আলমগীর কবির, বাদল রহমান, মসিহ উদ্দিন শাকের, শেখ নেয়ামত আলী ও সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকীকে তৎকালীন মূলধারার ইন্ডাস্ট্রিতে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছিলো।

১৯৮৩–১৯৮৪ অর্থবছরে সরকার প্রেক্ষাগৃহে ক্যাপাসিটি ট্যাক্স চালু করে (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪১২)। প্রেক্ষাগৃহের আসন সংখ্যার ভিত্তিতে এ কর দিতে হতো। ক্যাপাসিটি ট্যাক্স চালুর ফলে কর নির্ধারিত হয়ে যায়। ফলে অতিরিক্ত আয় থেকে সরকারকে কোনো কর দিতে হতো না। যার সুফলে প্রদর্শকের আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে কয়েক গুণ; বিস্তৃত হতে থাকে প্রদর্শন ব্যবসা। ১৯৮৩ সালে সবমিলে ৩৮৫টি প্রেক্ষাগৃহ থাকলেও ক্যাপাসিটি ট্যাক্স চালুর ফলে নির্মাণ হয় আরো ৩৫০টি প্রেক্ষাগৃহ (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪১৪)। এই সময়েই নির্মিত হয় বাংলাদেশে অন্যতম ব্যবসাসফল চলচ্চিত্র তোজাম্মেল হক বকুলের *বেদের মেয়ে জোসনা* (১৯৮৯)। এছাড়া *ফেরারী বসন্ত* (১৯৮৩), *রসের বাইদানী* (১৯৮৪), *রঙিন রূপবান* (১৯৮৫), *তোলপাড়* (১৯৮৮), *রাঙা ভাবী*র (১৯৮৯) ব্যাপক ব্যবসায়িক সফলতা চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিকে চাঙ্গা করে তোলে।

চলচ্চিত্রশিল্পে বড়ো ধাক্কা লাগে ১৯৮৮–১৯৮৯ অর্থবছরে; ক্যাপাসিটি ট্যাক্স বন্ধ করে আবারো পুরনো নিয়মে আবগারি স্ট্যাম্প (প্রত্যেক টিকিটের সঙ্গে স্ট্যাম্প লাগিয়ে কর আদায়ের প্রক্রিয়া) চালু করা হলে (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪২৫)। আগে ৮ থেকে ১২ শতাংশ থাকলেও ১৯৯০ সালে এসে থানা পর্যায়ে বিনোদন কর ধার্য করা হয় শতভাগ। ওদিকে প্রদর্শকরাও টিকিটের মূল্য বাড়িয়ে দেন। এতে করে বিরূপ প্রভাব পড়ে থানা পর্যায়ের ছয়শো ১৫টি প্রেক্ষাগৃহে (ঝুমা ২০১৩, পৃ৯); বন্ধও হয়ে যায় কিছু সংখ্যক। এরপর আসে ৯০ দশক; স্যাটেলাইট চ্যানেলের প্রাদুর্ভাবে প্রেক্ষাগৃহের দর্শক সংখ্যা কমতে থাকে।

এ সময় ঘরে বসে স্যাটেলাইট চ্যানেলে চলচ্চিত্র দেখার সুযোগে প্রেক্ষাগৃহের অনেক নিয়মিত দর্শকও ঝরে পড়ে। তাছাড়া শূন্যের দশকে এসে দুর্বল কাহিনি, যৌনতার বাহুল্য ও কদর্য উপস্থাপন, এবং প্রেক্ষাগৃহের নিম্নমান দর্শককে প্রেক্ষাগৃহবিমুখ করে। একে একে বন্ধ হতে থাকে বিভিন্ন এলাকার প্রেক্ষাগৃহ। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রচলিত ইতিহাস মোটাদাগে এই রকমের।

১.৪) বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের চরিত্র ও ঐতিহাসিক প্রবণতা

চলচ্চিত্র উদ্ভব-ইতিহাসে ‘ম্যাজিক লণ্ঠন’ আবিষ্কার হওয়ার কয়েকশো বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ কাজ করেছিলো ‘পটের গান’ নিয়ে। পটের গানের পুরো প্রক্রিয়ার বিশাল অংশজুড়ে চলচ্চিত্রের প্রদর্শন বৈশিষ্ট্যের ছোঁয়া পাওয়া যায়। অথচ পটের গান চলচ্চিত্র উদ্ভব-ইতিহাসে স্থান পায়নি। পটের গানে সেসময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হতো। পঞ্চম শতাব্দীর কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ ও ‘মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এ চিত্র শিল্প ও চিত্র দর্শনের কথা ছিলো (ঘোষ ২০০৪, পৃ৬৭)। ‘হর্ষচরিত’ ও ‘মুদ্রারাক্ষস’-এ যে যমপট্টিক অর্থাৎ যমপট ব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে, তারা সুদীর্ঘ পটের উপর ধর্ম্মরাজ যমের মূর্তি এবং যমালয়ের নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য লিখে গীতি সহযোগে গৃহস্থ-বাড়িতে দেখাতেন (দত্ত ২০০৮, পৃ৬)। যমালয়ে পাপী যে নিদারুণ শাস্তি ভোগ করে, চোখের সামনে একের পর এক ইমেজ উপস্থাপন করে পটগুলো গান সহকারে প্রদর্শন করা হতো। দৃশ্য, গান ও কথকতার সমন্বয়ে পটের যে উপস্থাপন কাঠামো তার সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রদর্শন কৌশলের হুবহু মিল রয়েছে (হায়দার, ২০১৩)। পরে অবশ্য চলচ্চিত্রের আধেয় ও অভিনয়ে আরো নানা লোক মাধ্যম যেমন, যাত্রা, জারি, পালা, হাটুরে কবিতা সংযুক্ত হয়।

লোকজ এই মাধ্যমগুলোর মধ্যে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টতায় এগিয়ে ছিলো যাত্রাপালা। এই উপমহাদেশে যাত্রার কাছে চলচ্চিত্রকে সব সময় যেতে হয়েছে। এটা মূলত গল্পের জন্য, উপাখ্যানের জন্য। কারণ যাত্রাপালায় জীবনের গল্পগুলো তুলে আনা হতো, যেগুলোতে ধর্মীয় ঐতিহ্য—‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’, কারবালার কাহিনিও উপস্থিত ছিলো। শুধু যাত্রা নয়, চলচ্চিত্র বিকাশে এখানে থিয়েটার, পালাগান, জারি, কেচ্ছা, রূপকথার গল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কারণ হীরালাল সেনের প্রথম চলচ্চিত্র কিন্তু মঞ্চনাটক থেকে শ্যুট করা। এছাড়া প্রথম দিকের চলচ্চিত্রের অভিনয়েও যাত্রার ঢঙ লক্ষণীয়। *নবাব সিরাজউদ্দৌলা*, *বেহুলা*, *জরিনা সুন্দরী*, *রূপবান*, *লাইলী-মজনু*, *কাশেম-মালার প্রেম*, *সোহরাব-রোস্তম*, *নছিমন*, *কমলার বনবাস*, *সিঁথির সিঁদুর* চলচ্চিত্রগুলো ছিলো মূলত জনপ্রিয় যাত্রাপালা। খোলা আসরে অভিনয়, গীতের প্রাধান্য, সোচ্চার কণ্ঠে অতিশয় অঙ্গ সঞ্চালনে অভিনয়, দেবমহিমাজ্ঞাপন এবং লোকশিক্ষা প্রচার—এগুলোই ছিলো যাত্রার মূল বৈশিষ্ট্য।

একপর্যায়ে যাত্রার ওপর শহুরে থিয়েটারের প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ যে যাত্রা ছিলো গ্রামজীবনে অনুষ্ঠিত লোকাভিনয় তা আস্তে আস্তে শহরের আনাচে-কানাচে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। যাত্রার পালাও নাটকে রূপান্তর হতে থাকে—নাটকের গতিশীলতা, দ্বন্দ্বসংঘাত, সঙ্গীতের পরিবর্তে নাট্যক্রিয়ার প্রাধান্য, সামাজিক ও ঐতিহাসিক কাহিনি গ্রহণ ইত্যাদি (ঘোষ ২০০০, পৃ২০)। আমাদের চলচ্চিত্র, এই যাত্রা থেকে অনেক কিছুই নিয়েছে—কথায় কথায় নাচ-গানের চলন, উচ্চকণ্ঠে অতি আবেগী অভিনয়, শেষ পর্যন্ত 'সত্যে'র (দেবমহিমা) জয় ইত্যাদি। চলচ্চিত্রের উপাদান হিসেবে এসব বিষয় সেই *মুখ ও মুখোশ* থেকে আজবধি দুই বাংলা, এমনকি বলিউডেও খুবই জনপ্রিয়। তাই যাত্রা থেকে শুধু উপাখ্যান কিংবা গল্প নেওয়ার বিষয়টি নয়, সঙ্গে যাত্রার মূল যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে, তার ছাপ আছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে।

উত্তর উপনিবেশ সময়ে অপ্রাশ্চাত্য দেশগুলোর কাছে এক অর্থে চলচ্চিত্র শুধুই একটা টেকনোলজি। কারণ টেকনোলজি ছাপিয়ে শিল্পমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে বোঝা বা উপলব্ধির ক্ষেত্রে এখানকার মানুষ আর ইউরোপ মানে যেখানে এগুলোর উদ্ভাবন, সেখানকার মানুষের চিন্তা কিন্তু এক নয়। আমরা এই টেকনোলজিকে খুবই উপরিতলে মানে ফোরগ্রাউন্ডে নিই। তাই চলচ্চিত্র নিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের বিস্ময় ছিলো! এই অর্থে চলচ্চিত্রটা অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের কাছে টেকনোলজির জাদু-বাস্তবতা হিসেবেই ছিলো।

অবশ্য ইউরোপেও একটা সময় পর্যন্ত চলচ্চিত্র টেকনোলজির খেলা মানে মোটাদাগে অর্থ রোজগারের হাতিয়ার হিসেবেই ছিলো। লুমিয়ের থেকে মেলিয়ে—এর বড়ো উদাহরণ। লুমিয়েররা আর্ট নয়, চলচ্চিত্রটিকে বিস্ময়কর টেকনোলজি হিসেবে নিয়ে ব্যবসা করেছেন। মেলিয়ের চলচ্চিত্রকে পুঁজি করে 'টেকনোলজির জাদু' দেখিয়েছেন। তবে ২০'র দশক থেকে চলচ্চিত্র একদিকে যেমন শিল্প মানে আর্ট হিসেবে বিকশিত হয়েছে, একইভাবে তা অন্যদিকে বৃহৎ পুঁজির উপাদান হিসেবেও এগিয়েছে। ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি ও রাশিয়ায় তার এক রূপ, আর আমেরিকায় তা অন্য রূপে হাজির হয়েছে। তবে ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে পুঁজি ও টেকনোলজির একটা সমন্বয় ঘটে। কিন্তু আর্ট হিসেবে তা এখানে বিকশিত হয়েছে অনেক পরে। কারণ ৬০'র দশকে লাতিন আমেরিকা হয়ে আসা 'থার্ড সিনেমা' আন্দোলনের আগে দৃশ্যত এখানে চলচ্চিত্রের কোনো আন্দোলনই হয়নি। ফলে চলচ্চিত্রটা টাকা কামাইয়ের একটা মাধ্যম ছাড়া আর বেশি কিছু হয়ে ওঠেনি। এছাড়া সত্যজিৎ যেটা করেছেন, সেটা সুদূর ইতালি থেকে ধার করা (আউয়াল ২০১১, পৃ৭৯-৮০) নব্যবাস্তববাদ ধারা।

১৯ শতকের একেবারে শেষের দিকে নাটক, যাত্রাপালা, জারিগান, পালাগানের পাশাপাশি ঢাকার অধিবাসীরা বিজ্ঞানের নব আবিষ্কার চলচ্চিত্রের প্রথম স্বাদ পায় ১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিল। ওই দিন সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ'-এর এক সংবাদে বলা হয়—

> অত্যত্র ক্রাউন থিয়েটারে অদ্য রাত্রি হইতে এক অদ্ভূত দৃশ্য প্রদর্শিত হইবে। ব্রেডফোর্ড সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানি এরূপ সজীব দৃশ্য প্রদর্শন করিবেন যাহা দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময় জাগিবার সম্ভাবনা। গত বছর গ্রীক ও তুরুস্কের যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছে তাহাও অন্যবিধ আশ্চার্য বিষয় যেন ঠিক কার্য্যক্ষেত্রে যাইয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া নাকি বোধ হইবে। আমরা আগামীবার ইহার বিশেষ বিবরণ পেশ করিব। আগামী বুধবার পর্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি আট ঘটিকা হইতে এই ক্রীড়া প্রদর্শনের কথা হইয়াছে (mediapage24.com)।

এই সংবাদে কয়েকটি শব্দগুচ্ছের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ—'অদ্ভূত দৃশ্য', 'বিস্ময় জাগিবার সম্ভাবনা' ও 'ক্রীড়া প্রদর্শন'। এই তিনটি শব্দগুচ্ছের ব্যবহার দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না 'নবীনতম শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্র' কীভাবে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়। তখন চলচ্চিত্রের মূল্যায়ন শুধু সাধারণ টেকনোলজি নয়, এর চেয়ে বেশি কিছু ছিলো।

কোনো দেশে বা সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন ঘটে তার ভিতরকার নিজস্ব তাগিদে বা চাহিদায়। চলচ্চিত্রের মতো প্রযুক্তি-নির্ভর শিল্পও নিশ্চয়ই সেই নিয়মেই উদ্ভাবিত হয়েছিলো পশ্চিমে। পরে অনুন্নত দেশের মানুষের কাছে যখন তা পৌঁছায়, তখন তার প্রাথমিক ব্যবহার অনেক সময়ই খেলনা সুলভ হয়। কারণ, সৃজনকর্মের যন্ত্র হিসেবে তাকে ব্যবহারের জন্য তারা তখনও তেমনভাবে প্রস্তুত ছিলো না, যেমন তারা বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার করতে শিখেছে ছেনি-হাতুড়ি, রঙ-তুলি কিংবা বাদ্যযন্ত্র। তাই গ্রিফিথ, ফ্ল্যাহার্টি কিংবা রবার্ট ভিনে যখন চলচ্চিত্রের ভাষার সন্ধান বা আবিষ্কারে ব্যস্ত, এদেশে তখন হীরালাল সেন, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ('ক্লাসিক থিয়েটার' খ্যাত), ধীরেন গাঙ্গুলিরা বায়োস্কোপিক থিয়েটার নিয়েই তুষ্ট। ক্যামেরার সামনে নড়াচড়া করলে সেটা ধরে রাখা যায় এবং পর্দায় দেখানো যায়, এটাই তখন অনেক। তাই নাটুকে দৃশ্যের গৃহীত চিত্রই হয়ে দাঁড়ায় তখনকার 'সিনেমা'। ক্যামেরা চালু, সামনে দাঁড়িয়ে অ্যাকটিং করে যাও—অভিনয়, পোশাক, মেক-আপ, সেট সবই থিয়েটারের মাপে (চক্রবর্তী ১৯৯৬, পৃ১৬৯-১৭০)।

পরবর্তী সময়ে সমাজ থেকে, সামাজিক ইতিহাস থেকে, পছন্দ হোক আর না-হোক চলচ্চিত্রকে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে। ঠিক এই কাজটা চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি এখনও করে যাচ্ছে। সংগৃহীত সেই উপাদান টেকনোলজির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে একটা জাদু-বাস্তবতা নিয়ে হাজির হয়, যা একটা রিয়েলিটি, একটা গল্প নির্মাণ করে। বেঞ্জামিনের ভাষায়,

> মঞ্চে নিজ অবস্থানটি দর্শকের পুরা নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাই নাটককে (যাত্রাকেও) সহসা মায়া বা বিভ্রম হিসেবে নেওয়ার অবকাশ থাকে না। কিন্তু সিনেমার জন্য ধারণকৃত কোনো দৃশ্যের ক্ষেত্রে এমনটা বলা যাবে না। এর বৈশিষ্ট্যই বিভ্রমপূর্ণ, আর কাটা ও জোড়া লাগানোর প্রক্রিয়ায় এই বিভ্রম আরও ঘনীভূত হয়। স্টুডিওতে যান্ত্রিক উপকরণসমূহ খুব নিবিড়ভাবে বাস্তবতার গভীরে প্রবেশ করে; কিন্তু সম্পাদিত হওয়ার পর সিনেমায় প্রতিফলিত বাস্তবতার মধ্যে যান্ত্রিক উপকরণের পীড়নটা আর বিদ্যমান থাকে না। ... কৃত্রিম কারিগরির ছোঁয়ামুক্ত বাস্তবতা প্রযুক্তি-শাসিত নির্মাণ-দক্ষতার উচ্চমাত্রা নির্দেশক; আর এভাবেই প্রাপ্ত সুসমঞ্জস দৃশ্যাবলি প্রযুক্তির শুষ্ক জগতে অর্কিডের মতো শোভমান হয় (বেঞ্জামিন ২০০৭, পৃ৬৬)।

আমাদের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, ট্রান্সফরমেশন। এই যে যাত্রার ঢঙ ও তার গল্প-উপাখ্যান পরিবর্তিত হয়ে শিল্পকলার একটা যান্ত্রিক পুরুৎপাদন হয়েছে। যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন মানে একটা টেকনোলজিকাল রেভুলেশন ঘটে যাওয়া। বেঞ্জামিন আরো বলেন, "যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন মূলের নকলকে এমন বাস্তবতায় নিয়ে আসতে পারে, যে-বাস্তবতায় মূল নিজে কখনো পৌঁছতে পারতো না। সর্বোপরি, আলোকচিত্র বা গ্রামোফোন রেকর্ড দর্শক শ্রোতাকে মূলের স্বাদটাই দিচ্ছে। ক্যাথিড্রাল নিজ অবস্থান ছেড়ে আসর গাড়ছে শিল্প-সমজদারের স্টুডিওতে, অডিটরিয়াম বা উন্মুক্ত প্রান্তরের কোনো সমবেত প্রযোজনা শোনা সম্ভব হচ্ছে ড্রয়িংরুমের চৌহদ্দিতে" (বেঞ্জামিন ২০০৭, পৃ৫৬)। পুনরুৎপাদনের ফলে একক বা অনন্য বস্তু মহিমা হারায় এটা যেমন ঠিক; তেমনি দর্শক, শ্রোতা বা ভোক্তা তার নিজের অবস্থানে থেকেই পুনরুৎপাদিত শিল্পকর্ম উপভোগ করতে পারেন। আর এই যোগ্যতাই পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার বৈধতার প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

মঞ্চে নাটক বা যাত্রা কিংবা অন্য কোনো অনুষ্ঠান যাই প্রদর্শন করা হোক না কেনো, প্রয়োজন নেই কিংবা না দেখালেও চলতো—এমন অনেক জিনিসই দেখাতে হয়। কিন্তু দৃক মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের একটা সুবিধা হচ্ছে, ঠিক যা দেখাতে চাওয়া হয়, তাই সেখানে দেখানো সম্ভব। ফলে যাত্রা কিংবা নাটক থেকে উপাখ্যান নিয়ে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়, সেখানেও কিন্তু উপাখ্যানের পাশাপাশি এই সঙ্কটটাও উতরে যায়। ফলে দর্শক একটা ভিন্ন মাত্রা মানে এক ভিন্ন বাস্তবতায় চলে যেতে পারে বলে ধরে নেওয়া যায়।

এছাড়া প্রযুক্তি হিসেবে চলচ্চিত্রের বাস্তবতার কাছাকাছি যাওয়ার একটি অসাধারণ ক্ষমতা আছে। চলচ্চিত্র রঙিন হওয়ার পর সেই ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। রুপালি পর্দা খ্যাত চলচ্চিত্রের একটা সামাজিক গুরুত্ব ছিলো। 'রঙিন-রুপালি' শব্দের ব্যবহার দর্শক মনে অন্যরকম চাঞ্চল্য তৈরি করেছিলো। কারণ চলচ্চিত্রের চকচকে, মসৃণ, স্বার্থপর জীবনের আকাঙ্ক্ষা দর্শককে হয়তো কামুক করে তুলেছিলো। যা দিয়ে একধরনের কৃত্রিম আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। কিন্তু চলচ্চিত্রের ওই দর্শকের ওই ধরনের অমানুষিক রকম সুন্দর স্ত্রী নেই, উড়তে ভাসতে এবং গাইতে পারার মতো অবাস্তব প্রযুক্তিও আয়ত্বে নেই। অথচ এর শক্তি দর্শককে তাৎক্ষণিকতার প্রবলতায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় বা যেতে পারে—এই মুহূর্তটি, যখন

দর্শক ভোগ করবে, যখন দর্শক বীর, যখন তার ইচ্ছায় শেষ কথা—চলচ্চিত্র এই সব, দর্শকের বোঝাপড়াকে বিনষ্ট করে দিতে পারে বা দেয়। দর্শক জানে এসব ছবি বাস্তবের প্রতিরূপ নির্মাণ করে না। এও জানে এসব হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন সুখের জগৎ, আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার জগৎ (হোসেন ২০১০, পৃ৯২)। তারপর তা হয়তো সাধারণের কাছে রুপালি জীবনের হাতছানি হয়ে ধরা দেয়। আর সেখানেই হয়তো পুঁজি অন্যভাবে তার সঞ্চালন গতি বৃদ্ধি করে।

১.৫) মধ্যবিত্ত, পুঁজি ও চলচ্চিত্র

আগে একটা যাত্রা দলকে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে যাত্রা দেখাতে হতো বা যাত্রা সামাজিকভাবে আয়োজিত হতো। সাধারণত কোনো যাত্রাদল এক মৌসুমের জন্য নির্ধারিত কিছু কাহিনি বা উপাখ্যান অনুশীলনের মাধ্যমে প্রস্তুত করতো। তারপর তা বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন হতো। সেখানে পৃষ্ঠপোষকতা করতো গ্রামের ধনী লোকজন। এটা তারা করতো মূলত নিজেদের প্রয়োজনেই, কারণ তারা যাদেরকে শাসন করছে তাদের চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজন ছিলো। ব্যাপারটা অনেকটাই আজকের জনকল্যাণ রাষ্ট্রের মতো। এটা সামাজিক স্তরে একভাবে ছিলো। কিন্তু যাত্রা যখন চলচ্চিত্রে ট্রান্সফর্ম হয়ে একেবারে বেনিয়া-পুঁজির কাছে চলে আসলো, মানে বেনিয়া-পুঁজির পৃষ্ঠপোষকতায় বাজার ব্যবস্থার মধ্যে; তখন এখানে একধরনের কন্ট্রাডিকশন/স্ববিরোধিতা দেখা দিলো। সেই কন্ট্রাডিকশনটা হলো, টেকনোলজি নিয়ে আদতে মধ্যবিত্তের একটা আকাঙ্ক্ষা আছে—সেটা পশ্চিম-ইউরোপেও একই—তারা এর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। ফলে টেকনোলজি কাম শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে। আজকে পর্যন্ত চলচ্চিত্রে 'সুস্থধারা'র তকমা লাগিয়ে যা টিকে আছে, সেটা মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণেই। অন্যদিকে যেটা হয়েছে, চলচ্চিত্রকে বাণিজ্যিকভাবে টিকে থাকার জন্য জনমানুষ থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে।

এই উপাদানগুলো একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, জনপ্রিয় যাত্রাপালাগুলো চলচ্চিত্রের প্রথম ৩০-৪০ বছরে চলচ্চিত্র ফরমেটে চলে এসেছে। সেটা বোধ করা যায় ভারতেও হয়েছে, বাংলাদেশের মতো। যাত্রাপালাকে চলচ্চিত্রে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে জনমানুষের ওই উপাদানগুলোকে চলচ্চিত্রে নিয়ে আসা হয়। যাত্রার ওই উপাদানগুলো তখন ব্যবহৃত হতে থাকলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য—সেটা একেবারেই আলাদা মাধ্যমে। এখানে রিপ্রেজেন্টেশনের তর্কটা গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রার কাহিনি চলচ্চিত্রে এসে নতুনভাবে পরিবেশিত হলো। সেখানে সমাজ কতোটা প্রতিফলিত হলো, সেটার আবেদন কীরকম হলো, তার ইমেজের শক্তিইবা কী ধরনের, কিংবা প্রেক্ষাগৃহে অন্ধকার একটা নতুন পরিবেশে এ ধরনের কাহিনি দেখতেই বা কেমন লাগে—এগুলো চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেলো। ফলে একদিকে টেকনোলজির ট্রান্সফরমেশনটা মানে যান্ত্রিক পুরুৎপাদন এখানে কীভাবে কাজ করলো; কীভাবে একটা 'মোড অব অ্যাসথেটিকস্ প্রোডাকশন' আগের 'মোড অব অ্যাসথেটিকস্ প্রোডাকশন'কে প্রতিস্থাপন করলো? এটাকে দুই পুঁজির যুদ্ধ কিংবা দুইটা আর্ট ফর্মের টিকে থাকার অবস্থা হিসেবেও দেখা যায়।

মূলত এই গল্পটাকে ধরার জন্য পুরো প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন-বিবর্তনগুলো কোথায় কোথায় হচ্ছে তা দেখা দরকার।

অনুমান যদি এমন হয়, **প্রথম ধাপে যেটা হচ্ছে**, যাত্রার ওইসব উপাখ্যান থেকে একটা সফল ট্রান্সফরমেশন মানে *রূপবান* থেকে শুরু করে *বেদের মেয়ে জোসনা* হয়ে আজকের অবস্থা। **দ্বিতীয়ত,** শহুরে একেবারে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তারা তাদের নিজেদের মতো করে আরেক ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চাইলো। এতে চলচ্চিত্রের দুইটা ধারা তৈরি হয়ে গেলো। সন্দেহ নেই, সেই ৬০-এর দশকে প্রেক্ষাগৃহে যেতো মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির দর্শকরাই। কারণ প্রেক্ষাগৃহের অভাবে অন্যদের দেখার সুযোগও কম ছিলো। কিন্তু তারপরও চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তির জাদুময়তায় নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সব দর্শক তখন চলচ্চিত্র দেখেছে।

এদিকে মধ্যবিত্ত দর্শকের প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে যাওয়া এবং বাংলা চলচ্চিত্রে 'অশ্লীলতা'র মাত্রা বেড়ে যাওয়া এই দুইয়ের মধ্যে অনেকেই যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেন। কিন্তু এভাবে যোগসূত্র খোঁজার প্রবণতা একটা প্রশ্ন উসকে দেয়। "রুচির অবনমন যদি মধ্যবিত্তের সিনেমা হল বিমুখতার প্রধান কারণ হয় তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, ১৯৬০ দশকের ছবিগুলো কী এমন মহত্বে উদ্ভাসিত ছিল যে তাতে মধ্যবিত্ত দলে দলে সিনেমা হলে যেতেন" (শুভ ১৪১৬, পৃ৪৮)? লোককাহিনি, ফ্যান্টাসি আর নাচ-গান ৬০-এর দশকের চলচ্চিত্রের প্রধান অনুষঙ্গ ছিলো। ২০ শতকের শেষ ও একুশ শতকের শুরুর বছরগুলোর মতো 'অশ্লীলতা' তখন না থাকলেও অল্পবিস্তর তো ছিলোই। কাজেই চলচ্চিত্রের মানের পতন কিংবা 'অশ্লীলতা'র মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মধ্যবিত্ত প্রেক্ষাগৃহ ছেড়েছে—এমন সিদ্ধান্ত টেনে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির রুচির ওপর মহত্ব আরোপের মনে হয় খুব একটা সুযোগ নেই।

৮০–৯০'র দশকে এসে চলচ্চিত্র মাধ্যমটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লো টেলিভিশনের দুর্দান্ত প্রতাপের। কারণ টেলিভিশন একটা মিশ্র মাধ্যম, এটা তার নিজস্ব কনটেন্টের বাইরে চলচ্চিত্রও দেখায়। অন্যভাবে বললে, টেলিভিশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কনটেন্ট হলো চলচ্চিত্র। টেলিভিশন যখন জাতি-রাষ্ট্রগত সীমানাগুলো পার হওয়া শুরু করলো, তখন এটার চাপ গিয়ে পড়লো চলচ্চিত্রের ওপরে। একদিকে মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্রকে টেক্কা দেওয়া, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত টেলিভিশনে আসক্ত হওয়ায় প্রেক্ষাগৃহের চলচ্চিত্রের উদ্দিষ্ট দর্শক হয়ে গেলো নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত। ফলে তাদের আকৃষ্ট করার জন্য স্বভাবতই চলচ্চিত্রগুলোতে যৌনতা সংক্রান্ত বিষয় যোগ হওয়া শুরু হলো।

এতে আরেকটা ধারা তৈরি হলো, যেটা খুব দুর্বলভাবে মধ্যবিত্তের মনের খোরাক যোগাতে গিয়ে হাস্যকর উপাদানে পরিণত হলো। এর সর্বশেষ উদাহরণ হলো অনন্ত জলিল ও তার অভিনীত চলচ্চিত্র। যখনই কেউ মধ্যবিত্তের ওই রুচির জায়গাটায় আসার চেষ্টা করছে, তখনই এই ঘটনা ঘটেছে। ফলে এই দ্বন্দ্বগুলোকে তুলে আনলে বোঝা যাবে—একদিকে শ্রেণি আরেকদিকে চলচ্চিত্রের টেকনোলজি।

৮০'র দশকের মাঝামাঝি বিকল্পধারা নামে যে ধারাটির সৃষ্টি হলো, সেটা বুঝতে গেলে মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক মানসচরিত্র বুঝতে হয়। এই বিকল্প বলতে মধ্যবিত্ত নিজেকেই আগে বিকল্প ঘোষণা

করেছে। যেখানে মধ্যবিত্তের গল্প বলার একধরনের চেষ্টা ছিলো, আর সেটাই হয়ে যায় বিকল্পধারার চলচ্চিত্র। অন্যভাবে মধ্যবিত্ত যখন যেভাবে নিম্নবর্গকে রিপ্রেজেন্ট করবে, সেই রিপ্রেজেন্টশনের মধ্য দিয়েও একটা বিকল্পভাব চলে আসে। এর সফল উদাহরণ হলো *সূর্যদীঘল বাড়ী*। এই চিন্তা কিন্তু একেবারে পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা। ধরুন, এই বিকল্প বলে যেসব পরিচালক সারা পৃথিবীতে কাজ করেছে, তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন বাদে প্রায় সবাই মূলধারার চলচ্চিত্রে সফল ছিলেন। যেমন জাপানের আকিরা কুরোসাওয়া কিন্তু মূলধারার চলচ্চিত্রেও সফল। আর এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ তো চার্লস চ্যাপলিন। কিন্তু বাংলাদেশের বিকল্পধারা নির্মাতারা কিন্তু নিজেদের সেই অবস্থানে নিয়ে যেতে পারেননি।

এছাড়া বাংলা চলচ্চিত্রে দর্শকের যে কল্পনাশক্তি এটার ওপর নির্মাতাদের নির্ভরতা অনেক বেড়ে গেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে একই সেট—যেমন, বিভিন্ন চলচ্চিত্রে বড়োলোকের একই ডুপ্লেক্স বাড়ি—বার বার ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা তখনই হয়, যখন দর্শকের এই কল্পনাশক্তির ওপর নির্মাতারা অনেক বেশি নির্ভর করতে থাকেন। ফলে প্রচুর দুর্বল চলচ্চিত্র দাঁড়াতে বাধ্য হয়। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই দর্শক কিন্তু যাত্রা দেখে আসা। যাত্রায় কিন্তু আরো বেশি অসঙ্গতি ছিলো। এই দর্শক একটা সময় কিন্তু অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে, তখন সে তার কল্পনাশক্তিকে আর দিতে চায় না। তখন বাস্তবতাকে আরো বাস্তব করে তুলে ধরার প্রয়োজন পড়ে।

১.৬) চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণের সমস্যা ও প্রবণতা

প্রযুক্তি হিসেবে উদ্ভাবনের পর থেকে অদ্যাবধি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলচ্চিত্র বর্তমান অবস্থায় এসেছে। এই দীর্ঘ পথচলায় চলচ্চিত্র মোড়ও নিয়েছে নানা দিকে। যান্ত্রিক কিংবা শিল্প যে মাধ্যম হিসেবেই চলচ্চিত্রকে দেখি না কেনো, প্রতিটি মোড়ের ভিন্ন ভিন্ন ছোঁয়া তার শরীরে লেপ্টে আছে। তাই চলচ্চিত্রকে এতো সহজে নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণি, জাতি বা genre এ ফেলা যায় না। গবেষক কিংবা তাত্ত্বিক তার আলোচনার স্বার্থে যে বিভাজনই করুন না কেনো, দেখা যাবে বহু সংখ্যক চলচ্চিত্র তাদের সেই বিভাজনের মধ্যে যথাযথভাবে পড়ছেই না। আবার এই বিভাজনের কোনো একটিতে নিষ্ঠাবান হলে কিংবা তা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে, চলচ্চিত্রকে কেবল যান্ত্রিক চলমান চিত্র হিসেবেই বিবেচনা করতে হয়। এমনকি দীর্ঘ প্রচেষ্টায় শিল্প মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে তা অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে।

কারিগরি বা প্রযুক্তিনির্ভর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতার কারণে চলচ্চিত্রের সংখ্যা এতোই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, চলচ্চিত্র পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন-পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে গবেষণার পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর শ্রেণিবিভাজন, জাতি নির্ণয় (ইসলাম ২০০৮, পৃ১০৩)। তাই আপাত বা প্রস্তাবিত যেকোনো শ্রেণিবিভাজন সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য না হলেও এ সংক্রান্ত যেকোনো চেষ্টা

চলচ্চিত্রের জন্য মূল্যবান বিবেচনার প্রয়াস হয়ে উঠতে পারে। এখন প্রশ্ন, কী এবং কীভাবে হবে এই বিভাজন বা শ্রেণিকরণ?

আগেই বলা হয়েছে, শত বছরের বেশি বয়সী এই মাধ্যম নানা মোড় ঘুরে আজকের অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। এই দীর্ঘ সময়ে রচিত চলচ্চিত্রের প্রবণতা, ভঙ্গি, রীতি, বিষয়বস্তু, রচয়িতার চলচ্চিত্রবোধ, তাত্ত্বিক পরিকাঠামো, চলচ্চিত্র আন্দোলনের চরিত্র, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদির নিরিখে চলচ্চিত্রের যে বিভাজন সেটাই তার শ্রেণিকরণ। ফলে প্রবণতা, ভঙ্গি, রীতি, বিষয়বস্তু, রচয়িতার চলচ্চিত্রবোধ, তাত্ত্বিক পরিকাঠামো, চলচ্চিত্র আন্দোলনের চরিত্র, প্রযুক্তি—প্রতিটি বিষয় ধরে চলচ্চিত্রকে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। বিষয়টি সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় এরকম, "লেখকের বিষয়বস্তু ও ভঙ্গি অনুযায়ী যেমন লেখার শ্রেণী বিভাগ হয়ে থাকে, চলচ্চিত্রেও তা সম্ভব। উপন্যাস, কাব্য, নাটক, জীবনী, শিক্ষামূলক বিবরণ এ-সবই চলচ্চিত্রে রচিত হয়েছে" (রায় ২০০২, পৃ৪৮)।

সেই শুরুতে অগাস্ত ও লুই লুমিয়ের যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে তারা বুঝে হোক আর না-বুঝেই হোক বিষয়বস্তু ও ভঙ্গি অনুয়ায়ী প্রামাণ্য, কাহিনিভিত্তিক, হাস্যরসাত্মক রীতির চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তারপর সেই ১৮ শতকের শেষে চলচ্চিত্রের ক্ষুদ্র মাঠে ফ্যান্টাসি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, আংশিক রঙিন চলচ্চিত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ফ্রান্সের জাদুকর জর্জ মেলিয়েঁ। তিনি ১৮৯৬ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে প্রায় এক হাজার চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এগুলোর দৈর্ঘ্য ছিলো এক থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে।

লুই ভ্রাতৃদ্বয় আর মেলিয়েঁ'র হাতে শুরু হওয়া সেই প্রচেষ্টা আর থামানো যায়নি পরবর্তী ১০০ বছরে। চলচ্চিত্র আপন মহিমায় নিজেকে গড়েছে আর নতুন নতুন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে। ১৯০৩ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রের নির্মাতা এডউইন এস. পোর্টার (১৮৬৯–১৯৪১) *দ্য গ্রেট ট্রেন রাবারি* নির্মাণ করেন, তখন চলচ্চিত্রের এক নতুন ঘরানার সৃষ্টি হয়, যার নাম কাহিনিচিত্র (feature film)। চলচ্চিত্র এর মধ্য দিয়ে নতুন করে গল্প বলতে শিখলো। অন্যদিকে এক থেকে ২০ মিনিট দৈর্ঘ্যে থাকা চলচ্চিত্রকে পূর্ণদৈর্ঘ্য রূপ দিলো চলচ্চিত্রের ইতিহাসের আরেক স্থপতি ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ তার *বার্থ অব এ নেশন* (১৯১৫) নির্মাণ করে। তিন ঘণ্টার কিছু বেশি সময় দৈর্ঘ্যের এই চলচ্চিত্রটি তখন বিস্ময় নিয়ে হাজির হয়েছিলো এই ভুবনে। এদিকে ঝিগা ভের্তভ, রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি ও জন গ্রিয়ারসনের হাত ধরে সৃষ্টি হলো বিশ্ব চলচ্চিত্রের এক নতুন ধারা প্রামাণ্যচিত্র (documentary film)। যদিও লুইয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ই তাদের চলচ্চিত্রগুলোতে প্রামাণ্যচিত্রের ধারণা দিয়েছিলেন। তারপরও তাত্ত্বিকভাবে বাস্তব অবস্থার সৃজনশীল পরিবেশনার লক্ষ্য নিয়ে সৃষ্টি হলো এ ধারার।

এছাড়া ১৯২৭ সালের ৬ অক্টোবর নিউইয়র্কের ওয়ার্নার থিয়েটারে প্রদর্শন হয় বিশ্বের প্রথম সফল সবাক চলচ্চিত্র *দ্য জ্যাজ সিঙ্গার*। অ্যালান ক্রসল্যান্ড নির্মিত এই চলচ্চিত্রে প্রথমবারের মতো চরিত্রের মুখে

সংলাপ, প্রয়োজনীয় সঙ্গীত ও আবহ ব্যবহার করা হয়। মেলিয়েঁ যদিও ১৯০২ সালেই তার *এ ট্রিপ টু দ্য মুন*-এ হাতে আঁকা রঙিন ছবি ব্যবহার করে আংশিক রঙের ছোয়া দিয়েছিলেন; কিন্তু এর পূর্ণাঙ্গতা আসতে আরও সময় লেগেছিলো। ১৯৩৯ সালে নির্মিত *দ্য উইজার্ড অব অ্যজ*-এ রঙের কলাকৌশল প্রয়োগ করা হয়। একই সময় *গন উইথ দ্য উইন্ড* নামের একটি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ইফেক্টে প্রয়োজনীয় ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কালার ফটোগ্রাফি মূর্ত হয়ে ওঠে। এভাবে সময়ের প্রয়োজনে চলচ্চিত্র নিজেকে আঙ্গিক, প্রাযুক্তিক দিক থেকে বিভাজন করেছে—স্বল্পদৈর্ঘ্য, পূর্ণদৈর্ঘ্য; কাহিনিচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র; সবাক, নির্বাক; সাদা-কালো, আংশিক রঙিন ও রঙিন নানা শ্রেণিতে। মূলত ১৮৯৫ থেকে শুরু করে ১৯৩০ দশকের মধ্যেই চলচ্চিত্রে মোটাদাগে এ ধরনের কয়েকটি শ্রেণিকরণ হয়ে যায়। পরে এর হাত ধরেই আরো নতুন শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে।

এতো গেলো অঙ্গিক ও প্রাযুক্তিক দিক। বিষয় বিবেচনায় চলচ্চিত্রের শ্রেণিতে রয়েছে নানা বিভাজন। সমগ্র চলচ্চিত্রকে একটি বিশাল পরিমণ্ডল হিসেবে কল্পনা করে, একেকটি চলচ্চিত্র নির্মাণের পিছনে যে সচেতন বা অচেতন উদ্দেশ্য থাকে তার ভিত্তিতে একে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেন চলচ্চিত্র সমালোচক ও তাত্ত্বিক গাস্তঁ রোবের্জ (রোবের্জ ১৯৮৪, পৃ৪১–৪২)। প্রথমত, **প্রমোদভিত্তিক চলচ্চিত্র**। বিশ্বব্যাপী নির্মিত চলচ্চিত্রের সিংগভাগই এই শ্রেণির অধীন। এতে সাধারণত জনপ্রিয় প্রচলিত কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণ করা হয়। এ ধরনের চলচ্চিত্রের অভিষ্ট লক্ষ্য থাকে প্রতিনিয়ত সাধারণ দর্শককে মানবিক আবেগের উপরিতলের আশা আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ এবং উত্তেজনাকে চলচ্চিত্র মাধ্যমে প্রতিফলিত করা। এ রীতির চলচ্চিত্রে প্রযোজক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী থাকেন (ইসলাম ২০০৮, পৃ১০৩)।

দ্বিতীয়ত, **কাব্যিক চলচ্চিত্র**। পৃথিবীর সব দেশেই এ জাতীয় চলচ্চিত্রের সংখ্যা খুবই কম। মূলত মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গের গভীর অনুসন্ধান ও গাঢ়তর উপলব্ধিকে বাস্তবতার আলোকে নব নবরূপে আবিষ্কারই এ রীতির চলচ্চিত্রের মৌল অন্বেষা। এখানে প্রযোজক নন, পরিচালকই সর্বাধিনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ থাকে। তৃতীয়ত, **বিজ্ঞানভিত্তিক চলচ্চিত্র**, এর সংখ্যা অল্প। এর বিষয়বস্তু প্রায় সর্বত্র কল্পকাহিনিনির্ভর হলেও এসব চলচ্চিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার কার্যকারণ সূত্রে চিত্রিত—উপরন্তু, প্রযুক্তিভিত্তিক ও স্পেশাল ইফেক্ট নির্ভর (ইসলাম ২০০৮, পৃ১০৪)। নৃতত্ত্ববিদ বা কোনো অভিযাত্রীর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরাই এ ধরনের চলচ্চিত্রের প্রধান কাজ। “এ রীতির চলচ্চিত্রে কখনো পরিচালকের ভূমিকাই মুখ্য আবার কখনো প্রযোজকও মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন। কিংবা উভয়ের ব্যবসায় স্বার্থগত সম্মিলিত মতৈক্যই এখানে মৌল বিবেচ্য বিষয়” (ইসলাম ২০০৮, পৃ১০৪)। গাস্তঁ রোবের্জের এ শ্রেণিকরণ একেবারে মৌলিক জায়গা থেকে করা।

এদিকে সারা পৃথিবীতে যতো শিল্প আন্দোলন হয়েছে তার ছোঁয়াও চলচ্চিত্রে লেগেছে। প্রায় সব আন্দোলনকে পুঁজি করেই চলচ্চিত্রের নতুন ধারা গড়ে উঠেছে। যেমন, **ন্যাচারালিজম, ফর্মালিজম, রিয়ালিজম, দাদাইজম, সুররিয়ালিজম, এক্সপ্রেশনিজম** ও **নিওরিয়ালিজম**। ইজম বা বাদ-এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এসব চলচ্চিত্র ধারার আয়ুষ্কাল পাঁচ থেকে ১০ বছর হলেও এর প্রভাব কিন্তু চলমান। এর বাইরে সারা পৃথিবীতে চলচ্চিত্র-রচয়িতাদের নানা চিন্তাভাবনার আলোকে কিছু ধারার জন্ম নিয়েছে—**নিও ওয়েভ, ফ্রি সিনেমা মুভমেন্ট, সিনেমা নোভো, সিনেমা ভেরিতে, ডিরেক্ট সিনেমা, ইন্ডিপেনডেন্ট ফিল্ম, অল্টারনেটিভ ফিল্ম, ফিল্ম নয়ার, কোয়ের সিনেমা, থার্ড সিনেমা, আন্ডারগ্রাউন্ড সিনেমা** ইত্যাদি। চলচ্চিত্রের এই ধারার সঙ্গে চলচ্চিত্র-রচয়িতার চিন্তাভাবনা যেমন জড়িত তেমনি স্থান-কাল এর প্রভাবও বিদ্যমান।

প্রত্যেক জাতির বা শ্রেণির চলচ্চিত্রের মধ্যে স্বতন্ত্র রীতি বা পদ্ধতি রয়েছে এটা যেমন ঠিক, তেমনি এর নিঃসংকোচ শ্রেণিকরণও ঠিক নয়। যৌথ শিল্প মাধ্যম হিসেবে এর মধ্যে যেমন শিল্পের নানা আঙ্গিকের যৌথতা আছে, তেমনই আছে বিষয়েরও। ফলে যেটা হয়েছে, বিষয় ধরে চলচ্চিত্রকে শ্রেণিকরণ করলেও সেটা একেবারে যথাযথ পর্যায়ে পড়ে না। তারপরও প্রথা, রীতি বা পদ্ধতি ধরে যেকোনো শিল্পধারাকে সনাক্ত করতে হয়। কারণ "শিল্পকলার সামগ্রিক ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় যে, প্রথা ছাড়া শিল্পকলার কোনো শাখাই কখনো সম্ভব হয়ে ওঠে নাই। চলচ্চিত্রে এই প্রথা বা জাতি বিচার চিন্তার আগমন মূলত সাহিত্য-সমালোচনার ধারা থেকেই উদ্ভূত" (ইসলাম ২০০৮, পৃ১০৪)।

চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণ বা প্রজাতি বিচারের বহুবিধ প্রসঙ্গ অবতারণা নিয়ে তাত্ত্বিক ও সমালোচক Tim Dirks এর আলোচনা বেশ প্রাসঙ্গিক। তিনি চলচ্চিত্রকে এই রূপ, ধরন, ভাগ, শ্রেণি বা দলে বিভাজনের ক্ষেত্রে '... settings (and props), content and subject matter, themes, period, plot, central narrative events, motifs, styles, structures, situations, recurring icons (e.g., six-guns and ten-gallon hats in Westerns), stocks characters (or characterizations), and stars'. (Tim Dirks n.d., *Film Genres* উদ্ধৃত, ইসলাম ২০০৮, পৃ১০৫) ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। Tim Dirks এর আলোচনায় নির্দেশিত শ্রেণি বা জাতিসমূহ নিম্নরূপ—১. **মারদাঙ্গা**, ২. **রহস্য**, ৩. **হাস্যরসাত্মক**, ৪. **অপরাধ/গ্যাংস্টার**, ৫.**নাটকীয়**, ৬. **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটনির্ভর**, ৭. **ভৌতিক**, ৮. **সঙ্গীতনির্ভর**, ৯. **বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিনির্ভর** ১০. **যুদ্ধভিত্তিক** ও ১১. **ওয়েস্টার্ন চলচ্চিত্র** (Tim Dirks n.d., *Film Genres* উদ্ধৃত, ইসলাম ২০০৮, পৃ১০৫)।

অন্যদিকে তাত্ত্বিক-সমালোচক Siegfried Kracauer চলচ্চিত্রের শ্রেণি বা জাতিকে দেখেছেন মোটাদাগে তিনটি ভাগে—১. **নিউজরিল**, ২. **প্রামাণ্যচিত্র** ও ৩. **শৈল্পিক চলচ্চিত্র**। তার শ্রেণিবিন্যাসে প্রামাণ্যচিত্র

ভাগটির মধ্যে '... including such subgenres as the travelogue, scientific films, instructional films etc.' (Kracauer 1965, p193) রয়েছে। আবার Allan Williams চলচ্চিত্র-আঙ্গিকের ফলে তৈরি ধারার তিনটি রূপের কথা বলেছেন—**১. ন্যারেটিভ, ২. আভঁ-গার্দ** ও **৩. প্রামাণ্যচিত্র** (Allan Williams n.d. উদ্ধৃত, Hayward 2000, p167)। গাস্তঁ রোবের্জে এর কাব্যিক চলচ্চিত্র, Siegfried Kracauer এর শৈল্পিক এবং Allan Williams এর আভঁ-গার্দ মোটাদাগে একই ধরনের চলচ্চিত্রের কথা বলে। একইভাবে গাস্তঁ-এর বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাকি দুজনের (Kracauer & Williams) প্রামাণ্যচিত্র বলে যে শ্রেণি তাও কাছাকাছি।

এর বাইরে গিয়ে আরো বেশি কিছু জাতি বা শ্রেণির চলচ্চিত্র পাওয়া যায় যেখানে নির্মাণ কৌশল, উপস্থাপনার ধরন, দর্শকানুকুল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ধরা দেয়। এ শ্রেণির চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে—**অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র, শিশুতোষ চলচ্চিত্র, যৌন** (Pornography) **বা উত্তেজক চলচ্চিত্র**।

১.৬.১) বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণ

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণকে দেখতে হলে এর বৈশ্বিক যে ধারা সেটাকে পুরোপুরি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত শ্রেণিবিন্যাস, প্রকরণ বা জাতিবিচার পদ্ধতির সঙ্গে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণ বা জাতিবিচারের অনেক ব্যবধান রয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক হয়, প্রযুক্তি ও শিল্প হিসেবে বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের যে উন্নয়ন ঘটেছে, তার ঐতিহাসিক বিকাশটাকে অনুসরণ করা। এই ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শ্রেণিবিন্যাস বা জাতিবিচার।

১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিল মোতাবেক ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৩ বৈশাখ ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয় সদরঘাটের পটুয়াটুলীর 'ক্রাউন থিয়েটারে'। কলকাতা থেকে আসা ব্রেডফোর্ড বায়োস্কোপ কোম্পানি এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ঢাকায় যখন চলচ্চিত্র প্রদর্শনী চলছে, কলকাতায় তখন ঢাকার মানিকগঞ্জের বগজুড়ি গ্রামের হীরালাল সেন 'দি রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানী' গঠন করে চলচ্চিত্র দেখাতে শুরু করেন। পরে ১৯০১ সালে কলকাতায় চলচ্চিত্র নির্মাণেরও শুরু করেন হীরালাল সেন।

তবে ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাস আরো পরে। ঢাকার নবাব পরিবার ১৯২৭–২৮ সালে *সুকুমারী*র মাধ্যমে শখের বশে ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশে নির্বাক চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাস সূচনা করে। এরপর ১৯৩১ সালে মুক্তি পায় ঢাকায় নির্মিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র *দি লাস্ট কিস*। চলচ্চিত্র নির্মাণের এই প্রয়াসে তখন শ্রেণি কোনো গুরুত্ব বহন করেনি এই উপমহাদেশে। তখন নতুন একটি প্রাযুক্তিক মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের মূল্যায়ন করা হতো। মূলত ১৯৫৬ সালে *মুখ ও মুখোশ*-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে পূণদৈর্ঘ্যের সবাক চলচ্চিত্রের যাত্রা হয়। এর মধ্য দিয়ে প্রাযুক্তিক দিক থেকে চলচ্চিত্রের একটা শ্রেণিকরণ হয়—**সবাক ও নির্বাক চলচ্চিত্র**।

সারণী ১.১.১ : দশক ধরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণ

দশক	**চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণ**
৫০ দশক	সবাক ও নির্বাক চলচ্চিত্র উর্দু, বাংলা ও হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্র সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র
৬০ দশক	সাদাকালো, আংশিক রঙিন ও রঙিন চলচ্চিত্র সামাজিক ও লোককাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্র প্রেমমুখ্য চলচ্চিত্র
৭০ দশক	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র
৮০'র দশক	পোশাকি-ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্র মূলধারা (বাণিজ্যিক) ও বিকল্পধারার চলচ্চিত্র
৯০ দশক	'সুস্থ' ধারা ও 'অসুস্থ'/'অশ্লীল' ধারার চলচ্চিত্র
শূন্য দশক	৩৫ মি মি নির্মিত চলচ্চিত্র, ডিজিটাল সিনেমা ও শহুরে জীবনকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র

মুখ ও মুখোশ-এর পর খানিকটা বিরতি দিয়ে ১৯৫৯ সালের ৮ মে মুক্তি পায় উর্দু ভাষায় এ. জে. কারদার-এর *জাগো হুয়া সাভেরা*। এরপর মুক্তি পায় বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র ফতেহ লোহানীর *আকাশ আর মাটি* (১৯৫৯) ও মহিউদ্দিনের *মাটির পাহাড়* (১৯৫৯)। তার মানে তখন ভাষার ভিত্তিতে—**উর্দু, বাংলা** ও **হিন্দি** (ভারত থেকে আমদানি করা) চলচ্চিত্রের একটি শ্রেণিকরণ দাঁড়িয়ে যায়। এদিকে ১৯৬৪ সালের আগে পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গ রঙিন চলচ্চিত্র ছিলো না। জহির রায়হান পরিচালিত উর্দু ভাষায় নির্মিত *সংগম* (১৯৬৪) পাকিস্তানের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র। এর মধ্য দিয়ে রঙ নিয়ে নতুন একটি শ্রেণির উদ্ভব হয় এখানকার চলচ্চিত্রে—**সাদাকালো** ও **রঙিন**। তবে এ দুটোর মাঝামাঝি আরেকটি শ্রেণি ছিলো সেটা হলো **আংশিক রঙিন**। মূলত এই শ্রেণিকরণটি সেসময় খুবই প্রভাব ফেলেছিলো দর্শকের ওপর। ফলে সাদাকালো ও রঙিনের মাঝামাঝি আংশিক রঙিন বলে একধরনের চলচ্চিত্র নির্মিত হতো। এর পেছনে অবশ্য স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রযোজক-পরিচালকদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছিলো। তখন চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনে এই বিষয়গুলোকে মানে **'আংশিক রঙিন'** কিংবা **'সম্পূর্ণ রঙিন'** বলে খুব জোরালোভাবে প্রচার-প্রচারণা চালানো হতো।

রঙিন চলচ্চিত্রের সঙ্গে স্বাপ্নিক পরিস্থিতির একটা সম্পর্ক আছে। চলচ্চিত্রকে অনেকে 'স্বপ্ন-কারখানা' বলে; কারণ অন্য যেসব মাধ্যম আছে তার থেকে চলচ্চিত্র একেবারেই আলাদা। স্বপ্ন দেখার সঙ্গে চলচ্চিত্র দেখার অভিজ্ঞতার একটা মিল রয়েছে। অন্ধকার ঘরে বসে একটা ফ্রেমের মধ্যে কোনো পরিস্থিতির পরিকল্পিত উপস্থাপনে দর্শক যা দেখে, এবং সেই সময় দর্শকের যে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, সেটাকে 'ড্রিম-সিক্যুয়েন্স' বলা যায়। ফলে প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র যে বাস্তবতা তৈরি করে, সেটা দর্শকের

কল্পনা যেভাবে কাজ করে তাকে নতুন করে ডিফাইন করে। কারণ দর্শক তো ফ্রেমের বাইরে কিছু দেখতে পারে না, ফলে ফ্রেমের বাইরে যা ঘটছে সেটা কল্পনা করে নিতে হয় দর্শককে।

এরপর ১৯৬৫ সালে মুক্তি পায় সালাউদ্দিন পরিচালিত লোককাহিনি নিয়ে *রূপবান*। চলচ্চিত্রটি সুপারহিট ব্যবসা করে। এর আগে পর্যন্ত লোককাহিনি ভিত্তিক কোনো চলচ্চিত্র হয়নি বললেই চলে। ফলে চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণ নতুন দিকে মোড় নেয়। কারণ গবেষক চিন্ময় মুৎসুদ্দীর মতে, প্রথম দশকে (১৯৫৬–১৯৬৫) বাংলা ও উর্দু ভাষায় নির্মিত অধিকাংশ চলচ্চিত্র সামাজিক হিসেবে চিহ্নিত ছিলো (মুৎসুদ্দী ১৯৮৭, পৃ৩২)। তার মানে হলো *রূপবান*-এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো চলচ্চিত্রের আধেয়কে ধরে শ্রেণিকরণ হয়—**সামাজিক** ও **লোককাহিনিনির্ভর**।

অবশ্য এই সময়ে আধেয়ভিত্তিক আরেকটি শ্রেণি অগোচরেই বিকাশ লাভ করে—**সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র**। যদিও শুরুটা বেশ খানিকটা আগেই। ১৯৫৯ সালে অবাঙালি পরিচালক আখতার জং কারদার উর্দুভাষায় নির্মাণ করেন *জাগো হুয়া সাভেরা*। এটি মানিক বন্দোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি' অবলম্বনে নির্মিত। এর চিত্রনাট্য লিখেছিলেন খ্যাতনামা উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ। চলচ্চিত্রটি ঢাকায় নির্মিত প্রথম কোনো চলচ্চিত্র হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পায় *জাগো হুয়া সাভেরা*। এছাড়া ১৯৬৫ সালে সাদেক খান নির্মাণ করেন *নদী ও নারী*। বিখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ূন কবীরের উপন্যাস 'নদী ও নারী' অবলম্বনে এটি নির্মিত। পরবর্তী সময়ে ৭০ ও ৮০ এর দশকে দেশে বেশকিছু সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয় এবং যা চলচ্চিত্রের শ্রেণি হিসেবে এর অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে।

১৯৬২ সালে বাঙালি হিসেবে প্রথম উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা করেন এহতেশাম। ওই বছরের ৩ আগস্ট মুক্তি পায় এহতেশামের **ত্রিভুজ প্রেমের** উর্দু চলচ্চিত্র *চান্দা*। চলচ্চিত্রটি পুরো পাকিস্তানে ভালো ব্যবসা করে। বিপুল ব্যবসায়িক সাফল্যের কাছে চাপা পড়ে যায় কাহিনির প্রেমমুখ্য বৈশিষ্ট্যের কথা। ফলে **প্রেমমুখ্য চলচ্চিত্র** শ্রেণি হিসেবে যে বিকশিত হলো তা তখনও বোঝা যায়নি। তবে এর মধ্যে ১৯৬৯ সালে কাজী জহির পরিচালিত *ময়নামতি*ও বেশ সাফল্য পায়। স্বাধীনতা উত্তর মিষ্টি প্রেমের চলচ্চিত্র হিসেবে *অবুঝ মন* ব্যবসায় রেকর্ড সৃষ্টি করে। এটির নির্মাতাও ছিলেন কাজী জহির। এরপর থেকে প্রত্যেক দশকেই প্রেমমুখ্য চলচ্চিত্র কমবেশি সাড়া ফেলেছে।

আন্তর্জাতিকভাবে যেটাকে যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র বলে বাংলাদেশে সেটি হয়নি বললেই চলে। কিন্তু ১৯৭১ সালের পর এখানে **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র** নির্মাণ হতে থাকে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যেই মূলত এ শ্রেণির চলচ্চিত্র বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি নির্মাণ হয়। এদিকে ১৯৭৩ সালে মুক্তি পাওয়া *রংবাজ* বিপুলভাবে দর্শকের কাছে সমাদৃত হয়। "জহিরুল হক পরিচালিত বিনোদনধর্মী এই ছবিতে

প্রথম পদ্ধতিগত মারপিটের দৃশ্য দেখা যায়। এই মারপিট পরবর্তী পর্যায়ে সকল ছবির জন্য প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অপরিহার্য হয়ে উঠে" (*সাপ্তাহিক বিচিত্রা* ১৯৭৯, পৃ৭৫)। এই চলচ্চিত্রের কল্যাণে মারপিটের দৃশ্য পরিচালনাকারীরা যেমন দামী তারকার মর্যাদা পায়, তেমনি মারপিট সব চলচ্চিত্রে ছড়িয়ে পড়ে। "শুরু হয় এ্যাকশন ধর্মী ছবির নির্মাণ" (কাদের ১৯৯৩, পৃ১৪৯)। মূলত এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মারপিট বা **অ্যাকশনধর্মী** বলে একটি শ্রেণির প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শুরু হয়।

হলিউডে প্রাচীন রাজা-রাণী কিংবা বিভিন্ন ধরনের মিথের কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। যেখানে জাকজমকপূর্ণ রাজকীয় পোশাক, সেই সময়ের ঐতিহ্য, কখনো কখনো যুদ্ধ খুব গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে এ ধরনের চলচ্চিত্রকে 'কস্টিউম এপিক' বলা হয়। ৭০ দশকের মাঝামাঝির কিছু পর থেকে বাংলাদেশে ওই শ্রেণির কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু এসব চলচ্চিত্রে কোনো "এপিক বা মহাকাব্যিক দ্যোতনা নেই।" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৫৬) এগুলোতে পোশাকি বৈশিষ্ট্য সামান্য থাকলেও ফ্যান্টাসি ছিলো পুরোদমে। ইবনে মিজানের *নিশান* (১৯৭৭), *শাহাজাদা* (১৯৭৮), এফ কবীর চৌধুরীর *বুলবুল-এ-বাগদাদ* (১৯৭৯) ও শামসুদ্দিন টগরের *হুর এ আরব* (১৯৮০) এ বৈশিষ্ট্যের পথিকৃত চলচ্চিত্র। পুরো ৮০ দশক জুড়ে **পোশাকি-ফ্যান্টাসি** শ্রেণির চলচ্চিত্র নেতৃত্ব দিয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে আলোচিত ও প্রশংসিত *সূর্য দীঘল বাড়ী* মুক্তি পায় ১৯৭৯ সালে। মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী পরিচালিত চলচ্চিত্রটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেলেও নিজ দেশে তা দেখানো নিয়ে সমস্যা হয়। তৎকালীন প্রদর্শকরা চলচ্চিত্রটি ব্যবসা করবে না—এমন কথা বলে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দিতে অনাগ্রহ দেখায়। এর আগে ১৯৭৬ সালে হারুন অর রশীদের *মেঘের অনেক রঙ* তিন দিন দেখিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে নামিয়ে দেয় পরিবেশকরা। আর *সূর্য দীঘল বাড়ি* নাটোরের একটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়ার পর ঢাকায় মুক্তি দিতে সময় লেগেছিলো পাক্কা এক বছর।

এই দুটো ঘটনার পর সেই সময়ের চলচ্চিত্র-শিক্ষিত কিছু তরুণ, যারা মূলত চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন থেকে আসা, তারা ১৬ মিলিমিটারে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। "এতে নির্মাণ খরচ কম হবে এবং বহনযোগ্য ১৬ মিমি প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিকল্প পরিবেশন-প্রদর্শনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যাবে, ছবির ওপর পরিচালকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬১) বলে তারা মনে করেছিলো। এই ধরনের চলচ্চিত্রের তারা নাম দিয়েছিলেন বিকল্পধারা। ১৯৮৪ সালে নির্মিত হয় এ ধারার প্রথম চলচ্চিত্র মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের *আগামী*। এর দুই মাস পর মুক্তি পায় তানভীর মোকাম্মেলের *হুলিয়া*। এ দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নতুন দুটি ধারার চর্চা শুরু হয়—**মূলধারা (বাণিজ্যিক) ও বিকল্পধারা**। বি এফ ডি সি'র বাইরে গিয়ে নির্মিত বিকল্পধারার এসব চলচ্চিত্র পরবর্তী দশকগুলোতে আন্তর্জাতিক সম্মান বয়ে নিয়ে আসে।

বাংলাদেশে বিশেষায়িত চলচ্চিত্র (যেমন, যুদ্ধ, রহস্য, হাস্যরসাত্মক, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি) নির্মিত হয়নি বললেই চলে। এখানকার চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে মূলত গল্পকে কেন্দ্র করে। এই গল্প যখন দর্শককে ধরে রাখতে পারেনি, তখন নির্মাতাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে যৌনতা ও সহিংসতার। এতে এফ ডি সি কেন্দ্রিক মূলধারার চলচ্চিত্র গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে। "চলচ্চিত্রের মানের চরম অবনতি, আধেয়তে সহিংসতা ও পর্নোগ্রাফিক উপাদানের ব্যাপক বৃদ্ধি, ব্যবসায়িক মন্দা, এফডিসি ও সেন্সরবোর্ডে চরম দুর্নীতি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যেখান থেকে ফিরে আসা খুব কঠিন" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬৭)। ঠিক এই ধরনের একটা সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নতুন একটি শ্রেণিকরণের যাত্রা শুরু হয়—**'সুস্থ'** ও **'অসুস্থ'/'অশ্লীল'** ধারা। বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শক না হয়েও একটা শ্রেণি, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, এই শ্রেণিকরণ নিয়ে বেশ মাতামাতি করতে থাকেন।

শূন্য দশকে এফ ডি সি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র ব্যবসার যখন খুবই খারাপ অবস্থা, তখন বেসরকারি টেলিভিশনগুলো চলচ্চিত্র নির্মাণে কাজ শুরু করে। "তারা উন্নত চলচ্চিত্র প্রযোজনা করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে, এবং চ্যানেল আইয়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইমপ্রেস টেলিফিল্ম এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ...। এটিএন বাংলা ও এনটিভিও কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছে" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৭৮)। এসব চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে বাংলাদেশের বিকল্প ও স্বাধীনধারার নির্মাতারা বিভিন্নভাবে যুক্তও হয়। "কিন্তু টেলিভিশন চ্যানেল প্রযোজিত চলচ্চিত্রগুলোর মান নিয়ে এবং সার্বিক চলচ্চিত্র সংস্কৃতিতে এর অবদান নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। কারণ যে প্রক্রিয়ায় এই চলচ্চিত্রগুলো নির্মিত এবং যেভাবে এর প্রদর্শন-পরিবেশন হয়েছে তা চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়নে কোনো বড়ো ভূমিকা রাখতে পেরেছে বলে মনে হয়নি। কারণ এই চলচ্চিত্রগুলো দর্শকনির্ভর নয়, কর্পোরেট পুঁজিনির্ভর" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৭৯-৮০)।

এছাড়া নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ দিকে প্রযুক্তিনির্ভর একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। ৩৫ মি মি ক্যামেরার বিপরীতে এসময় দেশে ডিজিটাল ক্যামেরার ব্যবহার শুরু হতে থাকে। প্রথমের দিকে সরকার এ ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্র সেন্সর সনদ দেওয়ার ব্যাপারে সমস্যা করতে থাকে। ফলে অনেকে ডিজিটাল ফরমেটে শুট করে পরে তা ৩৫ মি মি তে রূপান্তর করে সেন্সরে দেয়। কিন্তু ২০০৯ সালে প্রথমবারের মতো মোরশেদুল ইসলামের *প্রিয়তমেষু* (২০০৯) কে ডিজিটাল ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্র হিসেবে সেন্সর ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তারপরও দেশে পুরোপুরি ডিজিটাল ফরমেটের চলচ্চিত্র নির্মাণে বেশকিছু দিন সময় লাগে। তখন চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণ করা হয়, **৩৫ মি মি** ও **ডিজিটাল সিনেমা** হিসেবে। বর্তমানে বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণে ডিজিটাল সিনেমাকে অনেকে নতুন চলচ্চিত্র বলেও নামকরণ করেছে। এছাড়া আধেয়গত দিক থেকে চলচ্চিত্রে এই সময়ে আরেকটা ধারা লক্ষ করা

যায়, সেটা হলো **শহুরে জীবনকেন্দ্রিক** মানে শহুরে নাগরিক জীবনের আখ্যান নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে।

১.৬.২) প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণিকরণ

প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা থেকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আলমগীর কবির-ই প্রথম চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণ করেন তার 'Film In Bangladesh' গ্রন্থে। তিনি মূলত সত্তরের দশকে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোকে চারভাগে ভাগ করেছিলেন : **যুদ্ধ চলচ্চিত্র, নকল চলচ্চিত্র, সনাতন ফর্মুলার মৌলিক চলচ্চিত্র** ও **অফ-বিট চলচ্চিত্র** (Kabir 1979, p57)। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৭ পর্যন্ত মুক্তি পাওয়া ১৬৩টি চলচ্চিত্রের পরিসংখ্যান থেকে এ শ্রেণিকরণ করেন। আলমগীর কবিরের মতে, বাংলাদেশের দর্শক নিষ্ঠুরের মতো অফ-বিট এবং নকল দুই প্রকার চলচ্চিত্রকেই প্রত্যাখান করেছে। তবুও এতো এতো নকল চলচ্চিত্র নির্মাণের পেছনে কারণ হলো নির্মাতাদের মৌলিক কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণে অক্ষমতা এবং অল্প ব্যয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষা (Kabir 1979, p58)।

এছাড়া আহমেদ আমিনুল ইসলাম তার 'আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ১৯৭০ ও ১৯৮০ দশক' শীর্ষক পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণ করেছেন এভাবে—**১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র, ২. সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্র, ৩. সামাজিক চলচ্চিত্র, ৪. অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র, ৫. লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র, ৬. রূপকথাভিত্তিক চলচ্চিত্র, ৭. শিশুতোষ চলচ্চিত্র, ৮. ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর চলচ্চিত্র, ৯. পোশাকি বা ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্র, ১০. রহস্যমূলক চলচ্চিত্র, ১১. আধিদৈবিক** বা **অলৌকিক ঘটনানির্ভর চলচ্চিত্র, ১২. হাস্যরসাত্মক চলচ্চিত্র, ১৩. জীবনীমূলক চলচ্চিত্র, ১৪. সচেতনতা বা গণজাগরণমূলক চলচ্চিত্র** (ইসলাম, ২০০৮, পৃ১০৯)। কিন্তু স্বাধীনতা পূর্ব-উত্তর বাংলাদেশে শুধু অ্যাকশননির্ভর চলচ্চিত্র বলতে যা বোঝায় তা হয়নি বললেই চলে। এখানে অ্যাকশনের নামে যা হয়েছে, সেটা মূলত সামাজিক অ্যাকশন। সমাজের নানা অসঙ্গতিকে ঠিক করার দায়িত্ব নিয়ে নায়ক এসব চলচ্চিত্রে হাজির হয়েছে তার মারদাঙ্গা রূপ নিয়ে। কিন্তু পশ্চিমে অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র বলতে যা বোঝায় সেটা এখানে অনুপস্থিত। তাই শুধু অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র হিসেবে শ্রেণিকরণ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, এটাকে **'সামাজিক ও সামাজিক-অ্যাকশননির্ভর চলচ্চিত্র'** বলা যেতে পারে।

অন্যদিকে লোককাহিনি, রূপকথা, পোশাকি বা ফ্যান্টাসি, আধিদৈবিক বা অলৌকিক ঘটনানির্ভর বলে আলাদাভাবে চার ধরনের যে শ্রেণির কথা বলা হচ্ছে, তা মূলত ঘুরপাক খেয়েছে লোককাহিনি-রূপকথা ও পোশাকি বা ফ্যান্টাসি দুটি শ্রেণির মধ্যেই। কারণ *রূপবান* (১৯৬৫) থেকে শুরু করে *বেদের মেয়ে জোস্‌না* (১৯৮৯) এর পুরোটাই লোককাহিনি ও রূপকথা। এর বাইরে *কাঞ্চনমালা*, *চাঁদ সওদাগর*, *নাগ পূর্ণিমা*, *চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা*, *সুলতানা ডাকু*, *পাতাল পুরীর রাজকন্যা* ইত্যাদি নামে যেসব চলচ্চিত্র

আলোচিত হয়েছে তা মূলত ফ্যান্টাসি। এসবের মধ্যে আলাদা করে আধিদৈবিক কিছু চোখে পড়ে না। এছাড়া স্বাধীনতা পূর্ব ও উত্তর বাংলাদেশে 'রহস্যমূলক চলচ্চিত্র' হয়নি বললেই চলে। ১৯৭৪ সালে মাসুদ পারভেজের পরিচালনায় *মাসুদ রানা* বলে যে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় তা কিছু ব্যবসা করলেও পরে এখানে এই ধারার চলচ্চিত্র আর এগোয়নি। হাস্যরসাত্মক উপাদানকে প্রাধান্য দিয়ে চলচ্চিত্র যে একেবারে এখানে হয়নি এমনটি নয়। তবে তা নিয়ে একটি শ্রেণি করলে সেটা কেবল নামেই হবে। এগুলোকে মোটাদাগে ফেললে 'সামাজিক ও সামাজিক-অ্যাকশনের' মধ্যেই রাখা সম্ভব। আর জীবনীমূলক চলচ্চিত্র ও সচেতনতা বা গণজাগরণমূলক চলচ্চিত্র এখানে হয়নি বললেই চলে। তার চেয়ে বরং নিখাদ প্রেমের বেশকিছু চলচ্চিত্র বাংলাদেশে হয়েছে, তাই 'প্রেমনির্ভর চলচ্চিত্র' নামে একটি শ্রেণি হতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে খুব কম চলচ্চিত্রই এদেশে হয়েছে। তারপরও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের যেহেতু একটা শ্রেণি থাকছে, তাই এর বাইরে ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে *জীবন থেকে নেওয়া*, *নবাব সিরাজউদ্দৌলা*, *আধিয়ার*, *নাচোলের রানী*, *ফকির মজনু শাহ*, *শহীদ তিতুমীর* ছাড়া তেমন কোনো চলচ্চিত্র পাওয়া যায় না। তাই বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা নিয়ে আলাদা করে শ্রেণি করার মানে কেবল নতুন একটা শ্রেণি বাড়ানো ছাড়া কিছুই নয়! তারপরও চাইলে ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র বলে একটা শ্রেণি করা যায়।

সংখ্যায় কম থাকার পরও শিশুতোষ চলচ্চিত্র বলে একটি শ্রেণি রাখা যেতে পারে, কারণ মোট জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ এই শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। তাই চলচ্চিত্রের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাদের অবস্থান জানা জরুরি। সবমিলে বাংলাদেশে যে ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে তা মোটামুটি নীচের আটটি শ্রেণির মধ্যেই আছে—**১. লোককাহিনি**; ২. **ফ্যান্টানির্ভর**; ৩. **সামাজিক ও সামাজিক অ্যাকশনধর্মী**; ৪. **সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র**; ৫. **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র**; ৬. **ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর চলচ্চিত্র**; ৭. **শিশুতোষ চলচ্চিত্র**; ৮. **প্রেমনির্ভর চলচ্চিত্র**।

১৯২০ সালের দিকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি বৃহৎ পরিবর্তনের হাওয়ায় যে রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের সূচনা হয়েছিলো তা বাংলাদেশে তো নয়ই, সারাবিশ্বের কোথায়ই শক্ত উত্তরাধিকার তৈরি করতে পারেনি। লাতিন আমেরিকার কিউবায় ১৯৬০ সালে দিকে বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে 'থার্ড সিনেমা' বলে একটি ঘরানা দাঁড় হয়। থার্ড সিনেমার স্বরূপ দাঁড়ায় এরকম যে, "এই চলচ্চিত্র দর্শককে লড়াকু হতে উৎসাহী করে, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক বাস্তবতাকে নিরীক্ষণ করে এবং প্রচলিত নন্দনতাত্ত্বিক পরিকাঠামোকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করে" (আউয়াল ২০১১, পৃ৮৯)। যার ঢেউ গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ভারতবর্ষে আরো নির্দিষ্ট করে বললে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকজন (নিমাই ঘোষ, বিমল রায়, বারীণ সাহা, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন) পরিচালকের গায়ে লাগে। ওই শেষ। ফলে এখানে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র হয়নি বললেই চলে। তবে যেটা হয়েছে সেটা হলো, রাজনীতি সম্পৃক্ত চলচ্চিত্র। এসব চলচ্চিত্রে সমাজের একটা বড়ো ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত না করে, মূলত চলতি রাজনীতির একধরনের সমালোচনা করা হয়েছে। ফলে তা আলাদা করে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র হওয়ার পর্যায়ে যেতে পারেনি। তাই সামাজিক ও সামাজিক-অ্যাকশনভিত্তিক চলচ্চিত্রের মধ্যে **'রাজনীতি সম্পৃক্ত চলচ্চিত্র'** বলে একটি উপ-শ্রেণি করা যেতে পারে।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজের একক পরিবার এবং তার নানা টানাপড়েন চলচ্চিত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। **'পরিবার ও পারিবারিক টানাপড়েন'** নামে একটি উপ-শ্রেণি থাকতে পারে। এছাড়া সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে আছে **'অপরাধ, সন্ত্রাসভিত্তিক চলচ্চিত্র'** ও **'অর্থ-সম্পদ ও অর্থনৈতিক সঙ্কট'** বলে দুটি উপ-শ্রেণি। রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবারের সামগ্রিক একক যে ব্যক্তি-মানুষ তার মধ্যে থেকে কেউ কেউ কখনো কখনো অনন্য কিংবা আদর্শ চরিত্র হয়েছে চলচ্চিত্রে হাজির থেকেছে। তাদের নিয়ে থাকতে পারে **'আদর্শ চরিত্র'** নামে একটি উপ-শ্রেণি। তবে এই শ্রেণিকরণের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো, সব চলচ্চিত্রই যে যথাযথভাবে প্রতিটি উপ-শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে মোটেও এমন নয়। বিষয় হিসেবে একটির মধ্যে আরেকটি ঢুকে পড়েছে সবসময়। কিন্তু তারপর সামগ্রিক বিবেচনায় একটি শ্রেণিতে ফেলানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৭) প্রাসঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা

চলচ্চিত্র ও এর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা বহু দিনের। চলতি গবেষণাটি সেই আলোচনায় একটি নতুন সংযোজন হতে চায়। সেটা করতে চলচ্চিত্রের প্রচলিত ইতিহাসকে এই গবেষণায় সক্রিয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য এর প্রযুক্তিগত ইতিহাস, বিকাশ, আর্থ-রাজনৈতিক বিকাশ, উপনিবেশের প্রভাব, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধুনিকতার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়গুলো বুঝবার দরকার আছে। ফলে এই গবেষণার জ্ঞানগত প্রস্তুতি হিসেবে বিদ্যমান চলচ্চিত্র ইতিহাসের প্রচলিত যে ইতিহাস ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতিগতভাবে পাঠ করা হয়েছে। তার একটি সার-সংক্ষেপ প্রাসঙ্গিক হিসেবে উপস্থাপন করা হলো।

বাস্তবকে যথাযথভাবে রূপায়ণ, যান্ত্রিক রূপ দেওয়ার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছিলো মুভি ক্যামেরা—ফ্রান্সের লুমিয়ের ভাইয়েরা[২] অন্তত তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু লুমিয়েরদের পর দেশটির জাদুকর-নির্মাতা জর্জ মেলিয়ে[৩] চলচ্চিত্রে আর বাস্তবকে তুলে ধরার চেষ্টা করেননি, তিনি কল্পনার পুনর্নির্মাণের দিকে হাঁটলেন। মেলিয়ে-এর দেখানো পথে চলচ্চিত্রে যুক্ত হলো কল্পনাশক্তির প্রয়োগ। বিভ্রমের এই জগত ভরে উঠলো

[২]. ফ্রান্সে লুমিয়ের ভাইয়েরা যখন চলচ্চিত্র উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করছেন, তখন বাস্তবে যা দেখা যায় তাই পর্দায় দেখা যাবে, এই চিন্তাটিই বড়ো ছিলো। ফলে তখন শিল্পমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তা ভাবা হয়নি। লুমিয়েররা সেসময় ছোটো ছোটো যেসব ইমেজ ধারণ করেছিলেন তা থেকে অন্তত তাই মনে হয়। ফলে তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিলো যথাযথ যান্ত্রিক উপায়ে বাস্তবকে পর্দায় তুলে ধরা। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা এগুলো দিয়েই পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা করেছিলেন।

[৩].পর্দায় বাস্তব ধরার যে প্রবণতা চলচ্চিত্র উদ্ভাবনের শুরুতে ছিলো সেই চিন্তার পরিবর্তন আনেন ফ্রান্সের জাদুকর জর্জ মেলিয়ে। তিনি যেমন চলচ্চিত্রের আধেয়তে পরিবর্তন এনেছিলেন, তেমনি এর প্রাযুক্তিক দিকেও নানা বিষয় উদ্ভাবন করেন। মেলিয়ে চলচ্চিত্রে কল্পনা, কাহিনি, রহস্য, জাদুময়তা, নাটকীয়তা, নান্দনিকতা নিয়ে আসেন। এবং এগুলো বাস্তবায়নে চলচ্চিত্রে নানা কারিগরি কৌশল যেমন, স্টপ অ্যাকশন, কাট, ট্রিক ফটোগ্রাফি, ফেইড ইন, ফেইড আউট, ডিজলভ, সুপার ইম্পোজিশন, মাল্টি এক্সপোজার, স্লো মোশন, ফাস্ট মোশন ইত্যাদি চালু করেন। তার নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে *সিন্ডারেলা* (১৯০০), *অ্যান ইম্পোসিবল ভয়েজ* (১৯০৪), *দ্য কনকোয়েস্ট অব দি পোল* (১৯১২) ইত্যাদি।

কল্পনার সজীবতায়। সৃষ্টি হলো চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে শিল্প আন্দোলন অভিব্যক্তিবাদ, চলচ্চিত্র আন্দোলনে রূপ নিলে প্রথমবারের মতো চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মানুষ। আর তখনই এ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ততোদিনে মানে ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকে যুক্তরাষ্ট্রে গণমাধ্যম নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। গণমাধ্যম নিয়ে প্রথম পর্বের এ গবেষণাগুলো ছিলো মূলত প্রভাব সংক্রান্ত (Hovland et al. 1949)। সেখানে শিশুদের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে চলচ্চিত্রের প্রভাব নিয়ে কাজ হয়েছে। গবেষণা হয়েছে টেলিভিশন, রেডিওর প্রভাব নিয়েও। তবে জনপ্রিয় ধারার চলচ্চিত্রকে বৃহত্তর জনসংস্কৃতির অংশ হিসেবে তাত্ত্বিকভাবে পাঠের চলন ইউরোপ-আমেরিকায় শুরু হয় ৫০–৬০'র দশক থেকে। বাংলাদেশে অবশ্য গণমাধ্যম নিয়ে লেখালেখির শুরুই হয়েছে অনেক পরে। কারণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যম নিয়ে পড়াশোনা শুরু হয় স্বাধীনতার মাত্র কয়েক বছর আগে। এর আগে কেবল চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু লেখালেখি হতো পত্র-পত্রিকায়।

৬০ দশকের শুরু থেকে এ দেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন শুরু হয়। চলচ্চিত্রকে নিবিষ্টভাবে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তারা অগ্রবর্তী ছিলেন। "কিন্তু তাঁরা চলচ্চিত্রকে কেবলই আর্ট ও সুকুমার কলা হিসেবে বিবেচনা করেছেন, কখনও বা কেবলই রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ভাবতে চেয়েছেন এবং এর বাইরে সবকিছুকেই বাতিল বা অগ্রাহ্য করেছেন" (হক ২০১৫, পৃ৪৪)। ফলে তাদের আলোচনা ও লেখালেখি সীমাবদ্ধ থেকেছে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে, জনসংস্কৃতি হিসেবে চলচ্চিত্রকে অধ্যয়নের চর্চা তখন দেশে হয়নি। এদিকে ৬০ দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ অধ্যয়ন (বর্তমানে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ) শুরুর পর গণমাধ্যম নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের অবস্থান ছিলো অনেক পরে। তারপরও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নিয়ে বেশকিছু কাজ হয়েছে।

চলচ্চিত্র নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় বাংলাদেশে পথিকৃত আলমগীর কবির। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় তার লেখা গবেষণাগ্রন্থ 'Film in Bangladesh' (Kabir 1979)। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে এই গ্রন্থে তিনি পদ্ধতিগতভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তিনভাগে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে, স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের (১৯৭১–১৯৭৮) চলচ্চিত্রের আলোচনা ও বিশ্লেষণ। এই দুই ভাগে তিনি মূলত কিছু ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ ও ক্রিটিকাল বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। ফলে এতে যেমন চলচ্চিত্রিক ঘটনাবলির ঐতিহাসিক ধারাক্রম আছে, তেমনি তার সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণও আছে। তৃতীয় ভাগে আলমগীর কবির মূলত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র-ভাষার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম দিককার গবেষণা হিসেবে এটি পরবর্তী সময়ের গবেষকদের নানাভাবে পথ দেখিয়েছে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বি এফ ডি সি) উদ্যোগে ১৯৮৭ সালে প্রকাশ হয় অনুপম হায়াতের গবেষণামূলক গ্রন্থ 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস' (হায়াৎ ১৯৮৭)। মূলত এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বলতে যা বোঝায়, সেই সামগ্রিকতার একটা লিখিত রূপ উঠে আসে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের খুঁটিনাটি এবং অজানা তথ্যের সমাহার ও প্রচুর মূল্যবান স্থিরচিত্র রয়েছে এই গ্রন্থে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের আদি পর্ব বিশেষত প্রথম প্রদর্শনী, প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রথম দিককার প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদির বর্ণনা এতে যেমন রয়েছে, তেমনি দেশবিভাগের আগে কলকাতায় বাঙালি মুসলমানেরা কীভাবে হিন্দু নাম নিয়ে চলচ্চিত্রের চর্চা করেছিলেন তার বর্ণনাও রয়েছে। এছাড়া হীরালাল সেনের সময় থেকে গ্রন্থটি প্রকাশের বছর (১৯৮৭) পর্যন্ত বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত, এমনকি মুক্তিপ্রাপ্ত সব চলচ্চিত্রের তালিকা এতে স্থান পেয়েছে। সমস্যা হলো, তার এই গ্রন্থে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রচর্চার সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। এতে মূলত চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে একরৈখিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে ঘটনাপ্রবাহ নথিভূক্ত করা হয়েছে। তারপরও গ্রন্থটি গবেষণার প্রাথমিক উপকরণের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

চিন্ময় মুৎসুদ্দী একই বছর (১৯৮৭ সালে) 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সামাজিক অঙ্গীকার' (মুৎসুদ্দী ১৯৮৭) শিরোনামে আরেকটি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন। এখানে মূলত বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রের আন্তঃসম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। মুৎসুদ্দী এই আলোচনায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে শুরু থেকে পরবর্তী কয়েক দশকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সমাজ-বাস্তবতা চিত্রায়ণের সমালোচনাত্মক পাঠ উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো এজন্য তিনি বেছে নিয়েছেন জহির রায়হান, আলমগীর কবির, সুভাষ দত্ত ও আমজাদ হোসেন এই চার নির্মাতার চলচ্চিত্রকে। তার দাবি, এই কয়েকজন নির্মাতার কাজে সমাজ ভাবনা, রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক অঙ্গীকার সংক্রান্ত উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সমাজ-বাস্তবতা অনুসন্ধানে এই চারজন নির্মাতার চলচ্চিত্র যথাযথ কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্নের অবকাশ আছে। কারণ সামাজিক কিংবা সামাজিক অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্রের নির্মাতারা সবাই তাদের চলচ্চিত্রকে বাস্তবতার কাছাকাছি থেকে নির্মিত বলেই দাবি করেন। এছাড়া এই গবেষণায় মুৎসুদ্দী মূলত উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে যেসব নির্মাতা ও তাদের চলচ্চিত্র নিয়েছেন তা একান্তই ব্যক্তিক মতামতই বলা চলে। অথচ চলচ্চিত্রে সমাজ-বাস্তবতার উপস্থাপন কোন মাত্রায় আছে তা বিচারের বড়ো অংশের দাবিদার দর্শক নিজে; কারণ দিনশেষে তারাই চলচ্চিত্র দেখেন এবং কোনো না কোনোভাবে তাদের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি পর্দায় দেখা যায়। অথচ এই গবেষণায় দর্শককে কোনো পর্যায়েই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি। চলতি গবেষণায় চলচ্চিত্রে সমাজ-বাস্তবতার নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ কীভাবে হয় তা দেখা হয়েছে। এছাড়া এই গবেষণায় দর্শককে

সক্রিয় সামাজিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে, তাদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই বিশ্লেষণ এগিয়ে নেয়া হয়েছে।

১৯৯৩ সালে মির্জা তারেকুল কাদের 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প' (কাদের ১৯৯৩) শিরোনামে একটি কাজ সম্পন্ন করেন। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত এই গবেষণা গ্রন্থে ১৯১৩ সালে হীরালাল সেন থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি সরল ইতিহাস জানা যায়। কাদেরের এই কাজটির ধরন অনেকটা অনুপম হায়াতের মতো হলেও তথ্যগত দিক থেকে তা আরো সমৃদ্ধ। তবে বৃহৎ এই গবেষণাকর্মেও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-ইন্ডাস্ট্রির সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলির সঙ্গে চলচ্চিত্র-ইন্ডাস্ট্রির কার্যকারণ সূত্র অনুসন্ধানের কোনো প্রয়াসও গবেষক করেননি। গবেষক বইটির ভূমিকায় তার এই কাজকে মূল্যায়ন করেছেন 'বর্ণনাত্মক গবেষণা' (কাদের ১৯৯৩, পৃ১৪) হিসেবে। তবে গবেষণাকর্মটি এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, এতে প্রাথমিক তথ্য পদ্ধতিগতভাবে নথিবদ্ধ থাকায় চলচ্চিত্রের নানান দিক নিয়ে যেকোনো গবেষক গভীরভাবে কাজের সুযোগ পাবে।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট এন্ড আর্কাইভ। বিভিন্ন সরকারের কার্যকর সিদ্ধান্তের অভাবে চলচ্চিত্রশিক্ষণ বিষয়টি ছিলো অবহেলিত; আর গবেষণাও হয়নি বললে চলে। তবে শূন্য দশক থেকে ফিল্ম আর্কাইভ বেশকিছু গবেষণামূলক কাজ শুরু করে। এর উল্লেখযোগ্য গবেষণার মধ্যে রয়েছে, তপতী বর্মণ ও ইমরান ফিরদাউসের '**বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা**' (বর্মন ও ফিরদাউস ২০০৯); অদিতি ফাল্গুনী গায়েন ও হুমায়রা বিলকিসের '**বাংলাদেশের জনপ্রিয় ধারার চলচ্চিত্র ও সিনে সাংবাদিকতার আন্তঃপ্রভাব**' (গায়েন ও বিলকিস ২০০৯); বিকাশ চন্দ্র ভৌমিকের '**Women on Screen : Representing women by women in Bangladesh**' **(Bhowmick 2009); তপন** বাগচীর '**বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর : লোকজীবনের উপস্থাপনা**' (বাগচী ২০১১) এবং কাবেরী গায়েনের '**মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ**' (গায়েন ২০১৩), '**বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ**' (ঝুমা ২০১৪)।

ঝুমার গবেষণাটিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোর সার্বিক অবস্থা, দর্শকের ভাবনা, চলচ্চিত্রশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রেক্ষাগৃহের ভূমিকা ও প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ (অবকাঠামো, প্রযুক্তিগত ও নিরাপত্তাজনিত) নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়। তথ্য সংগ্রহে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয় জরিপ, সাক্ষাৎকার ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি। প্রতিনিধিত্বশীল তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে সাতটি বিভাগীয় শহরের প্রেক্ষাগৃহ এবং প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত একটি থানার প্রেক্ষাগৃহের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য নমুনা

হিসেবে নেওয়া হয়। এসব প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ২৭৩ দর্শকের ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, এফ ডি সি, প্রদর্শক সমিতি, চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব, প্রযোজক/পরিবেশকদের মধ্যে থেকে একজন করে মোট ছয়জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, বেশিরভাগ প্রেক্ষাগৃহের অবকাঠামোগত অবস্থা ভঙ্গুর। প্রেক্ষাগৃহে আগত ৮২ দশমিক ৭৮ শতাংশ দর্শক পুরুষ। আগত দর্শকের ৪৪ দশমিক ৩২ শতাংশের বয়স ২১ থেকে ৩৫ এর মধ্যে। ৪৮ দশমিক ০১ শতাংশ দর্শক মনে করে, প্রেক্ষাগৃহে তাদের না আসার কারণ সব চলচ্চিত্রের গল্প ভাবনায় একই জিনিস ঘুরেফিরে আসে। তবে ৪০ দশমিক ৩২ শতাংশ দর্শক বলেছে, ভালো মানসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণ হলে দর্শক আগের মতো প্রেক্ষাগৃহমুখী হবে।

প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে তারা দুর্বল মানের চলচ্চিত্র, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি জ্ঞানহীন চলচ্চিত্র, নিম্নমানের চিত্রনাট্য, অশ্লীলতা, সহিংসতা নির্ভর চলচ্চিত্র, স্যাটেলাইট চ্যানেল ও পাইরেসির কথা বলেছেন। এছাড়া নতুন চলচ্চিত্র না পাওয়া ও টিকিটের উচ্চমূল্যকেও তারা প্রেক্ষাগৃহ বন্ধের কারণ হিসেবে মনে করেছেন। তবে প্রেক্ষাগৃহকে ডিজিটালাইজড করাকেই দর্শক ও বিশেষজ্ঞরা চলচ্চিত্র উন্নয়নে স্থায়ী সমাধান মনে করছেন না। যদি বেশি হারে ভালো মানসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়, তবেই প্রেক্ষাগৃহ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচবে। প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে এ ধরনের গবেষণা প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঝুমা যদিও এটিকে গুণগত গবেষণা বলে দাবি করেছেন; তবে বিশ্লেষণে ক্ষেত্রে তিনি সংখ্যাত্মক তথ্য-উপাত্তের ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। যা প্রেক্ষাগৃহের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে খুব সাহায্য করে না। প্রেক্ষাগৃহকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরে দর্শকের সঙ্গে এর সামগ্রিকতা নিয়ে কাজের অবকাশ আছে। যেখানে প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর সামাজিক সম্পর্কগুলো বোঝা যাবে। চলতি গবেষণায় প্রেক্ষাগৃহকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তার প্রধান শক্তি দর্শককে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি নৃবৈজ্ঞানিক পাঠের অংশ হিসেবে এতে দর্শককে সক্রিয় সামাজিক সত্তা হিসেবে নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের ওপর এথনোগ্রাফি করা হয়। এবং তাদের দিক থেকে আসা তথ্য-উপাত্ত ও গবেষকের পর্যবেক্ষণ মিলে এই অভিসন্দর্ভের পাটাতন নির্মাণ করা হয়েছে।

চলচ্চিত্রে নারীর নির্মাণ নিয়ে কাবেরী গায়েনের গবেষণাটিও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে সেমিওলজি, নারীবাদী চলচ্চিত্রতত্ত্ব, রিপ্রেজেন্টেশন, সমালোচনাত্মক তত্ত্ব ও ন্যারেটোলজি ব্যবহারে চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলাদেশে এ ধরনের গবেষণা খুব কমই হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ দেখার জন্য তিনি ২৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও সাতটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। এই গবেষণাটি মূলত আধেয় কেন্দ্রিক। চলচ্চিত্রের টেক্সট বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই এখানে নারীর নির্মাণ দেখা হয়েছে। চলচ্চিত্রের যে দুটি দিক নির্মাণ এবং প্রদর্শন/দর্শক; দ্বিতীয় দিকটি এখানে অনুপস্থিত।

এছাড়া বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের অত্যন্ত সঙ্কটময় একটা সময়ে (৯০'র দশকের শেষ থেকে শূন্য দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প সংকটে জনসংস্কৃতি' (নাসরীন ও হক ২০০৮) শিরোনামে একটি গবেষণা সম্পন্ন হয়। নানা শ্রেণির দর্শকের সঙ্গে কথা বলে ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় গবেষণাটি সম্পন্ন হয়। মূলধারার চলচ্চিত্রকে গণমাধ্যম ও জনসংস্কৃতি হিসেবে মূল্যায়ন করে এই গবেষণার প্রথমে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব চলচ্চিত্র দেখার জন্য যে দর্শক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাও তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া চলচ্চিত্র-কারখানার সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি এবং সরকার ও সেন্সরবোর্ডের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখানে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি নির্দিষ্ট সময়কে বোঝার জন্য এই গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম এবং এ ধরনের গবেষণা আগে হয়নি বললেই চলে। তবে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নাগরিক-মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কারণ গবেষণার প্রেক্ষাপটে শ্লীলতা, অশ্লীলতার যে দ্বন্দ্ব তা অত্যন্ত আপেক্ষিক এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যেই এর বৈশিষ্ট্য লুকায়িত থাকে, যা সাদা চোখে দেখা যায় না। এই গবেষণায় সমসাময়িক চলচ্চিত্রের সঙ্গে তৎকালীন সমাজ-রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক তা এবং এর উল্টো সম্পর্কটিও যথাযথ উঠে আসেনি।

একই ধরনের বিষয় নিয়ে ২০১৪ সালে প্রকাশ হয় 'Cut-pieces: Celluloid Obscenity and Popular Cinema in Bangladesh' (Hoek 2014) নামে একটি গবেষণাগ্রন্থ। ডাচ গবেষক লোটে হুক (Lotte Hoek) বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে যে পিএইচ ডি গবেষণা সম্পন্ন করেন, তার ভিত্তিতে এই গ্রন্থটি রচিত। বাংলাদেশে প্রায় শূন্য দশক পুরোটা জুড়ে সহিংস চলচ্চিত্র নির্মিত হয়; এইসব চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের সময় মূল চলচ্চিত্রের সঙ্গে অননুমোদিত পর্নোগ্রাফিক 'কাটপিস' জুড়ে দেবার রীতি দেখা যায়। লোটে হুক এই সময়কালে (২০০৫ সাল) মুক্তি পাওয়া একটি চলচ্চিত্র *খুনী মিন্টু*র উৎপাদন, তার সম্পাদনা ও সেন্সরপ্রক্রিয়া, বিপণন ও সারাদেশে এর প্রদর্শন কৌশল অধ্যয়নের মাধ্যমে জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের একটি চিত্র তুলে ধরেন। এই গবেষণায় তিনি ওই সময়ের চলচ্চিত্রগুলোর অনন্য, অসমাপ্ত বা অ-স্থির রূপটিকে (গবেষকের ভাষায় Unstable Celluloid) হাজির করেন। যেহেতু ওই সময়ের চলচ্চিত্রগুলোর কাটপিস অংশটি সেন্সরবোর্ড অনুমোদিত ছিলো না, ফলে এগুলো আলাদা করে রাখা হতো এবং প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের সময় জুড়ে দেয়া হতো। এছাড়া নির্দিষ্ট কোনো চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ভিন্ন ভিন্ন কাটপিসও ব্যবহার হয়েছে। অনুমোদিত না হওয়ায় কাটপিসগুলোকে সব সময় প্রশাসনের নজরদারির মুখে থাকতে হতো। ফলে এগুলো অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের দোলাচলে দুলতে থাকতো। এর মধ্য দিয়ে লোটে হুক কাটপিস-সংস্কৃতি অনুসন্ধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রচর্চার অস্থির রূপের একটি তত্ত্বও দেন। এই গবেষণাটির নৃতাত্ত্বিক দিক আছে—উৎপাদন থেকে প্রদর্শন পর্যন্ত

পুরো প্রক্রিয়াটি এখানে হাজির থাকায় এর সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলো ও তাদের কর্মপদ্ধতিও এই গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে। এ ধরনের গবেষণা বাংলাদেশে হয়নি বললেই চলে। চলমান গবেষণায় চলচ্চিত্রকে ইভেন্ট ধরে প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শন ব্যবস্থাপনা, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকজন এবং দর্শকের আচরণ একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তাই এক্ষেত্রে হুকের গবেষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ১৯৭০ ও ১৯৮০ দশকের চলচ্চিত্র নিয়ে পিএইচ ডি গবেষণা করেছেন আহমেদ আমিনুল ইসলাম। পরবর্তী সময়ে তা 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : আর্থসামাজিক পটভূমি' (ইসলাম ২০০৮) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়। এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বকালের ২০৮টিসহ মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালের ৮৫৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং ২৭টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ গৃহীত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমকালীন সমালোচনা এবং ওই সব চলচ্চিত্রের আর্থ-সামাজিক ও নান্দনিক বিচার। এ কথা ঠিক যে, কোনো দশকই এককভাবে স্বয়ম্ভু নয় এবং যেকোনো দশকই তাই তার পূর্ববর্তীকালের ধারাবাহিকতায় বিচার্য। এই গবেষণায় তাই ১৯৭০ দশকের পূর্ববর্তী এবং ১৯৮০ দশকের পরবর্তীকালের চলচ্চিত্রধারার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মটি ইতিহাসনির্ভর, তবে এখানে চলচ্চিত্রের এক একটি ঘটনাকে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ফেলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর ফলে চলচ্চিত্রের ইতিহাস লেখার 'দিনপঞ্জি' পদ্ধতি থেকে গবেষক বেরিয়ে এসেছেন। তার মানে তিনি কেবল কোনো ঘটনার ধারাবাহিক কোনো বর্ণনাই তুলে ধরেননি বরং দুই দশকের চলচ্চিত্র ধরে তার সঙ্গে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের একটি সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্র ও সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কের যে সামগ্রিকতা তা এখানে অনুপস্থিত। এটা বুঝতে পরিবর্তিত দর্শক, চলচ্চিত্রের আধেয়, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক শ্রেণি এবং পুঁজি ও অন্যান্য বাজার ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণের প্রয়োজন। তা এই গবেষণায় হয়নি বললেই চলে।

ফাহমিদুল হক 'Representing Identity in Cinema: The Case Of Selected Independent Films of Bangladesh' (Haq 2010) শিরোনামে একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। ৮০'র দশকে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিলো বিকল্পধারা নামের চলচ্চিত্র আন্দোলন। আসলেই এই আন্দোলন বিকল্প কোনো ধারা তৈরি করতে পেরেছে নাকি মধ্যবিত্তের রোমান্টিসিজমে আটকে গেছে, সেটাই ফাহমিদুল দেখাতে চেয়েছেন এখানে। এই গবেষণাকর্মটি বর্তমান গবেষণার সামগ্রিকতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসের পুনর্পঠন নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন জাকির হোসেন রাজু। 'National Cinema, Cultural Identity and Public Sphere: Rewriting Bangladesh Film History' শিরোনামের পিএইচ ডি গবেষণার ভিত্তিতে ২০১৪ সালে প্রকাশ হয় 'Bangladesh Cinema

and National Identity: In Search of The Modern?' (Raju 2015) নামের গ্রন্থটি। গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসভিত্তিক, তবে সেই ইতিহাস ব্যাখ্যামূলক। এখানে রাজু বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের উৎসবিন্দু খোঁজার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে গবেষক উত্তর ঔপনিবেশিক ভূখণ্ডের একটি 'সামাজিক প্রতিষ্ঠান' হিসেবে বিবেচনা করে এবং একেকটি ঘটনাকে বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ফেলে বিশ্লেষণ করেছেন। ডেভিড বর্ডওয়েল, ক্রিস্টিন থম্পসন, রবার্ট অ্যালেন প্রমুখ চলচ্চিত্র-গবেষকরা আমেরিকার চলচ্চিত্রের ইতিহাসের 'সনাতনী' ধারার বিপরীতে যে 'সংশোধনবাদী' বা 'রিভিশনিস্ট' ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করেন; রাজুও তেমনই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের পুনর্লিখন করেছেন। এখানে রাজু বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে কেবল টেক্সট ও ডিসকোর্স হিসেবে না নিয়ে এর সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দর্শকের যে সম্পর্ক তা দেখার চেষ্টা করেন।

গবেষণাকর্মটির প্রথম অধ্যায়ে (Raju 2015, p15-39) ব্যাখ্যামূলক ইতিহাসচর্চার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনার শুরুতে গবেষক বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে প্রকাশিত যাবতীয় লেখালেখি ও বইপত্র পর্যালোচনা করেছেন। তিনভাগে বিভক্ত এই আলোচনার প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের লেখালেখি, দ্বিতীয় ভাগে বিশ্লেষণমূলক বিভিন্ন লেখা এবং তৃতীয় ভাগে ইতিহাসভিত্তিক বইপত্র ও লেখালেখি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এইসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের লিখিত যে ইতিহাস দাঁড়িয়েছে তাকে গবেষক প্রথাগত বলেছেন। এই ইতিহাসচর্চা মূলত একটি ঘটনা, ঘটনার নায়ক এবং ঘটনার সহজ কার্যকারণ সম্পর্ক—এই তিনের মধ্যেই আবর্তিত। এসব ক্ষেত্রে মূলত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অতীতের ঘটনার পরম্পরা গড়ে তুলে তাকে বর্তমান সময় পর্যন্ত টেনে আনা হয়। ইতিহাস রচনার এই teleological empiricist ধারা ১৯ ও ২০ শতকের অধিকাংশ সময় ধরে দুনিয়াজুড়ে রাজত্ব করেছে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ঐতিহাসিকরা এর বাইরে নন। ফলে তারা *মুখ ও মুখোশ* থেকে শুরু করে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি প্রশ্নাতীতভাবে নিশ্ছিদ্র ইতিহাস নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন।

অন্যদিকে সংস্কারবাদী ইতিহাসবিদরা সাধারণত দুটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেন; প্রথমত, ঐতিহাসিকভাবে কোনো কিছুর অন্বেষণ এবং দ্বিতীয়ত, ন্যারেটিভ রিপ্রেজেন্টেশন। অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে চলচ্চিত্রের ব্যবসার অপ্রকাশিত নানা দিকের প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত নিয়েও তারা কাজ করেন। সংস্কারবাদীরা একটি নির্দিষ্ট জাতি-রাষ্ট্রের জাতীয় চলচ্চিত্র-কারখানা সম্পর্কিত যতো সম্ভব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং তা রিপ্রেজেন্টেশনের ওপর জোর দেন। এখানে গবেষক বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি অরৈখিক (non-linear) কিন্তু এখনো মিথস্ক্রিয় ও যৌক্তিক ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এজন্য গবেষকে বলছেন, যখন কোনো চলচ্চিত্র নিয়ে তিনি কথা বলেছেন, সেখানে কেবল সেই চলচ্চিত্র নিয়ে

লিখিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেননি, সেই তথ্য-উপাত্ত বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে কী অর্থ তৈরি করে সেদিকেও খেয়াল রেখেছেন। যেমন, *মুখ ও মুখোশ*-এর কথাই ধরুন, গবেষক কেবল এই চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কিংবা এর প্রদর্শনী নিয়ে জব্বার খানের যে দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টা সেটাই তুলে ধরেননি; একই সঙ্গে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন; কেনো এবং কীভাবে এই চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র হলো? এছাড়া এর আগে চলচ্চিত্র নিয়ে ঠিক কী হয়েছিলো এবং কেনোইবা সেগুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে না। গবেষক *মুখ ও মুখোশ*-এর আধেয়কে পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতায় বাঙালি-মুসলমানের সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণের জন্য একটা সংগ্রাম কিনা তাও পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে রাজু পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে এর আগে পর্যন্ত কেউ তাত্ত্বিক ও যথাযথ গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে তুলে আনেননি।

এরপরের অধ্যায়ে (Raju 2015, p42-64) জাতীয় চলচ্চিত্রকে অপশ্চিমা দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আধুনিকতার আলোকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষক প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে মধ্যবিত্ত বাঙালি-মুসলমানের জাতীয় আধুনিকত্বের বাহন হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শুরু *মুখ ও মুখোশ* নাকি অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় তা নিয়ে বিস্তর অনুসন্ধান করেন। তৃতীয় অধ্যায়ে মূলত জাতীয় চলচ্চিত্রচর্চা এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শুরু নিয়ে কথা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষক বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সম্ভাব্য শুরুর জায়গাটি বাঙালি-মুসলমান পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক আধুনিকতার নানান ধারা থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শুরুর নির্মাণ, প্রদর্শন ও প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস যতোটা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায় তার চেষ্টাও করেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস সাধারণত শুরু হয়েছে, সে দেশে প্রথম কবে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে সেই তারিখ থেকে। গবেষকের মতে, চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে কেবল চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে এমনভাবে সংক্ষিপ্ত বা খর্বকায় আকারে পরিবেশনের কোনো যুক্তি নেই। কারণ গবেষক এখানে 'জাতি' ধারণার ভিন্নতর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, এ ভূখণ্ডে চলচ্চিত্রের আগমনের প্রায় সাত দশকেরও বেশি সময় পরে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্রের রূপ পেয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো তাই বাংলাদেশও একটি কল্পিত ও নির্মিত জাতিসত্তা। এই ভূখণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা 'জাতি' প্রতিষ্ঠার মূলে বীজ হিসেবে কাজ করেছে। পাকিস্তান জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬০'র দশকে ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ তাকে স্থানচ্যুত করেছে এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তুলেছে। একইভাবে ১৯৮০ ও ১৯৯০-

এর দশকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের জায়গায় রাষ্ট্রভিত্তিক রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উত্থান লক্ষ্য করা যায়। তার মানে ১৯৪০ থেকে ১৯৯০-এর দশকের মধ্যে বাংলাদেশের 'জাতীয়তা'র ধারণা তিনবার পুনর্সংজ্ঞায়িত হয়েছে। তাই একটি জাতির ইতিহাস এবং সে জাতির চলচ্চিত্রের ইতিহাসের বিকাশ নিয়ে সরলরৈখিক আলোচনা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে 'জাতি' কৃত্রিমভাবে নির্মিত ধারণা মাত্র। এই অবস্থান থেকে বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে দেখলে এর শুরু হয়েছে *মুখ ও মুখোশ* থেকে ছয় দশক আগে। ফলে চলচ্চিত্র নির্মাণের শুরুর এই ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে হীরালাল সেন ও ঢাকার নবাব পরিবার। একই সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিয়েও একেবারে নতুন চিন্তা পাওয়া যায়।

এর বাইরে গবেষক চলচ্চিত্রকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখলে তার শুরু বলেছেন ১৯৬৫ সালে নির্মিত চলচ্চিত্র *রূপবান*কে। তার কারণ হিসেবে তিনি যুক্তি দিয়েছেন, এটি লোককাহিনি নিয়ে পূর্ববাংলার প্রথম কোনো চলচ্চিত্র। *রূপবান*-এর তুমুল জনপ্রিয়তা সেসময় ঢাকা চলচ্চিত্র-কারখানাকে স্বস্তি দিয়েছিলো এবং কাঠামোগতভাবে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, এই চলচ্চিত্রটি কেবল চলচ্চিত্র-কারখানাকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তাই করেনি বরং কৃষিভিত্তিক-মুসলিম সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে চলচ্চিত্রকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণে সহায়তা করে। তিনি *রূপবান*কে ১৯৬০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ মানুষের অবস্থান থেকে নিয়ে কেস স্টাডিও করেছেন (Raju 2015, p65-90)।

চতুর্থ অধ্যায়ে (Raju 2015, p91-114) গবেষক উপনিবেশিক বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং বাংলা চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলেছেন। এখানে ১৯২০ ও ১৯৪০ এর দশকে উপনিবেশিক কলকাতার চলচ্চিত্র-কারখানার সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলায় মধ্যবিত্ত বাঙালি-হিন্দু লেখক ও সমাজ সংস্কারকরা কীভাবে সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণের সূচনা করেন সেটাও দেখানো হয়। এছাড়া এতে তুলে ধরা হয়েছে ২০ শতকের মাঝামাঝি কলকাতার বাংলা চলচ্চিত্র কীভাবে বাঙালি-হিন্দু দর্শকের মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে এবং কীভাবে তা সেই সময়ের উঠে আসা মধ্যবিত্ত বাঙালি-মুসলমানদের সাংস্কৃতিক-আধুনিকতাবাদী আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যাখান করেছে সেসব বিষয়। এই চলচ্চিত্রগুলোকে সেসময় মূলত বাঙালি-মুসলমান পরিচিতি নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

গবেষণাকর্মটির পঞ্চম অধ্যায়ে (Raju 2015, p115-142) বাঙালি-মুসলমান পরিচয় এবং ১৯৫০–১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত ঢাকাকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র-কারখানা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি-মুসলমান কেনো ও কীভাবে তাদের সামষ্টিক সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠনের জন্য চলচ্চিত্রকে ব্যবহারের চেষ্টা করছে সেটা গবেষক জানতে চেয়েছেন। এজন্য এই অধ্যায়ে গবেষক দুটি প্রধান ভাগে আলোচনা এগিয়ে নিয়েছেন। প্রথম ভাগে তিনি গ্রামে বেড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত বাঙালি-মুসলমান উনিশ

শতকের শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত স্বতন্ত্র বাঙালি-মুসলমান সাংস্কৃতিক পরিচয় গড়ে তোলার জন্য যে সংগ্রাম করেছে তার অনুসন্ধান করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে দেখেছেন, কীভাবে ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ দশক পর্যন্ত বাঙালি-মুসলমানের জাতীয় সাংস্কৃতিক আধুনিকতা গঠনে চলচ্চিত্র অবদান রেখেছে। এই আলোচনার জন্য গবেষক এখানে পাঁচটি কেস স্টাডি করেছেন। প্রথম কেস স্টাডিতে তিনি *মুখ* ও *মুখোশ* নির্মাণের প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলেছেন। কেস স্টাডি ২-এ উঠে এসেছে বাঙালি মুসলমান পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে টেক্সট হিসেবে *মুখ ও মুখোশ* এর আলোচনা। বাঙালি মুসলমানদের চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রথম স্টুডিও প্রতিষ্ঠা নিয়ে কেস স্টাডি ৩। পি এফ ডি সি'র প্রথম প্রযোজনা *আসিয়ায়* (১৯৬০) কীভাবে বাঙালি-মুসলমান পরিচয়কে প্রাথমিক পর্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে তা কেস স্টাডি ৪ এর বিষয়। এছাড়া কেস স্টাডি ৫-এ ১৯৭৫ সালে নির্মিত *সুজন সখি*তে কীভাবে বাঙালি মুসলমানের পিতৃতান্ত্রিক রূপটি তুলে ধরা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সমকালীন জনপ্রিয় চলচ্চিত্রধারা ও জাতি-রাষ্ট্রভিত্তিক আধুনিকতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উত্তর উপনিবেশ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে ১৯৮০–৯০ এর দশকে জাতীয়-আধুনিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে জনপ্রিয় ধারার চলচ্চিত্র কীভাবে কাজ করেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে দেখার চেষ্টা হয়েছে, বিশ্বায়নের এই কালে বাংলাদেশে জাতি-রাষ্ট্রভিত্তিক আধুনিকতা নির্মাণে এইসব চলচ্চিত্র কীভাবে একটি নির্দিষ্ট ধারার জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স তৈরিতে অবদান রেখেছে। এই আলোচনায় গবেষক ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-কারখানায় চলচ্চিত্র নির্মাণ ও মুক্তির বিশ্লেষণি পরিসংখ্যান হাজির করেন। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রতি পাঁচ বছরে ঢাকাই চলচ্চিত্র-কারখানায় চলচ্চিত্র নির্মাণ বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে ২৫–৩০ শতাংশ। ১৯৯৬ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে ৮০টি করে। অন্যদিকে কলকাতা চলচ্চিত্র-কারখানা ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ৪৬টি করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। তবে ১৯৬০–১৯৮০ এর দশকে এসে এই চলচ্চিত্র-কারখানায় চলচ্চিত্র নির্মাণ ৩৫ শতাংশ কমে যায় (বছরে গড়ে ৩৫টি)। তার মানে হলো, বাংলা ভাষার পাশাপাশি দুটি চলচ্চিত্র-কারখানার মধ্যে ১৯৭০–১৯৯০ এর দশক পর্যন্ত ঢাকাই কারখানা এগিয়ে ছিলো।

প্রেক্ষাগৃহের ব্যাপারেও এই সময়টাতে বাংলাদেশে একধরনের পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রেক্ষাগৃহ বৃদ্ধির হার ৪০০ শতাংশ। ২০০১ সালেও এফ ডি সি'র হিসাব অনুযায়ী দেশে ১৮০০ প্রেক্ষাগৃহ থাকার কথা বলা আছে। যদিও বর্তমান অবস্থা একেবারেই ভিন্ন। যাইহোক এই সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশি জাতি-রাষ্ট্র আধুনিকতা নির্মাণে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠে একদিকে যেমন উদীয়মান বাঙালি-মুসলিম পুঁজিপতিরা, অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতি-রাষ্ট্র নিজে। গবেষক এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ের একেবারে শেষে গবেষক

জনপ্রিয় ধারার সামাজিক ও অ্যাকশনধর্মী দুটি চলচ্চিত্র *বাবা কেন চাকর* (১৯৯৭) ও *আম্মাজান*'র (১৯৯৯) টেক্সট বিশ্লেষণ করেছেন।

এই গবেষণাকর্মটির শেষ অধ্যায়ে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় এবং আর্ট সিনেমা ডিসকোর্স নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর্ট সিনেমা বাংলাদেশের জাতীয় আধুনিকত্ব (national modernity) ধারণায় দুই ধরনের সংস্করণের কথা বলে; এর একটি হলো জাতি-রাষ্ট্রভিত্তিক আধুনিকত্ব ও অন্যটি জাতীয়-সাংস্কৃতিকভিত্তিক আধুনিকত্ব। গবেষক মনে করেন, বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ ১৯৭০ থেকে ৯০ দশকে জাতীয় আধুনিকত্ব ধারণায় তাদের পছন্দের সংস্করণটিকে প্রতিষ্ঠার জন্য আর্ট সিনেমার নানা ধরনের বিকাশ ঘটিয়েছে। সাংস্কৃতিক-আধুনিকত্ববাদীরা আর্ট সিনেমা ধারণাকে ব্যবহার করেছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, to produce a distinctly national modernity (Chatterjee 1997, p207).

গবেষক প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্ট সিনেমা বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের আর্ট সিনেমায় দুই ধরনের ডিসকোর্স চালু আছে। ১. মধ্যম (middle cinema) চলচ্চিত্র এবং ২. স্বাধীন চলচ্চিত্র। আর্ট সিনেমার এই দুই ধারা যে সবসময় আলাদাভাবে কাজ করে এমন নয়, অনেকক্ষেত্রে একটি আরেকটির মধ্যে ঢুকে যায়। তিনভাগে এই অধ্যায়ের আলোচনা এগিয়েছে। প্রথম ভাগে, বাংলাদেশ ও পশ্চিমের আর্ট সিনেমার ধারণায়নের মধ্যে পার্থক্য খোঁজা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে, মধ্যম চলচ্চিত্র ধারাকে জাতীয়তাবাদী চলচ্চিত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা জাতি-রাষ্ট্রভিত্তিক আধুনিকত্বকে সমর্থন করে। এছাড়া তৃতীয়ভাগে বেশকিছু কেস স্টাডি হাজির করে স্বাধীন চলচ্চিত্রধারার কাজের ধরন, বাংলাদেশে আর্ট সিনেমার অন্যান্য প্রধান প্রতিষ্ঠান এবং তারা কীভাবে সাংস্কৃতিক-জাতীয়তাভিত্তিক আধুনিকত্ব ধারণায়নের উন্নতি বর্ধন করে তা আলোচনা করা হয়েছে।

রাজুর এই গবেষণাকর্মে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের উৎস বিন্দু অনুসন্ধানের যে আলোচনা তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ঘটনাকে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ফেলে যে বিশ্লেষণের কথা তিনি বলেছেন, তা নিয়ে কিছু সমস্যা চোখে পড়ে। বিশেষ করে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পূর্ব ও উত্তর সময়ে বিভিন্ন ধরন বা genre সৃষ্টি হয়েছে। এসব ধরন সৃষ্টি এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেই সময় এবং তার পরিপ্রেক্ষিত খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে এসব চলচ্চিত্রের টেক্সট বিষয় হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজুর গবেষণায় *মুখ ও মুখোশ*সহ সাতটি চলচ্চিত্রের (*রূপবান*, *আসিয়া*, *সুজন সখি*, *বাবা কেন চাকর*, *আম্মাজান* ও *লাল সবুজের পালা*) টেক্সট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর বাইরে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ও আর্ট সিনেমাগুলো নিয়ে আলোচনা আছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম পর্বে স্বতন্ত্র বাঙালি-মুসলমান সাংস্কৃতিক পরিচয় গড়ে তোলার জন্য যে সংগ্রাম তার আলোচনা তাত্ত্বিকভাবে যথাযথ মনে হয়েছে। কিন্তু ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ দশক পর্যন্ত বাঙালি-মুসলমানদের জাতীয় সাংস্কৃতিক আধুনিকতা গঠনে চলচ্চিত্রের অবদান আলোচনা করতে গিয়ে গবেষক

কেবল *মুখ ও মুখোশ*, *আসিয়া* ও *সুজন সখি* নিয়ে কথা বলেছেন! সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে *মুখ ও মুখোশ* নিয়ে আলোচনা হয়তো যথাযথ। কিন্তু জাতীয় সাংস্কৃতিক আধুনিকতা গঠনে চলচ্চিত্রের অবদান বোঝার জন্য কেবল *আসিয়া* ও *সুজন সখি* যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। কারণ *রূপবান*-এর পর থেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ফ্যান্টাসিনির্ভর যে ধারাটির সৃষ্টি হয়, তা বাঙালি মুসলমানের মানসে জোরালো অবস্থান করে নেয়। এছাড়া এসময়ের সামাজিক-পারিবারিক চলচ্চিত্রগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৩ সালে নির্মিত *রংবাজ* স্বাধীনতা উত্তর বাংলা চলচ্চিত্রে নতুন ধারা সৃষ্টি করে। এর সফলতা ব্যাপকভাবে সামাজিক অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহিত করে। এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক ন্যায়-অন্যায়, আইন, ক্ষমা-প্রতিশোধ, ভালো-মন্দ নানা বিষয়ে সমাজে চর্চা শুরু হয়। ফলে নিঃসন্দেহে তা বাঙালি মুসলমানের জাতীয় সাংস্কৃতিক আধুনিকতা গঠনে অবদান রেখেছে। অথচ তা নিয়ে কোনো কথা হয়নি। এছাড়া ৯০-এর দশক ও একুশ শতকের শুরুর দশকে প্রেমমুখ্য চলচ্চিত্রগুলো সমাজে নারীর অবস্থান, বিয়ে, পরিবার ধারণায়নে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া একুশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শ্লীলতা-অশ্লীলতার যে উপস্থাপন তা জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরো কারণসহ এই ঘটনার পর থেকে সারাদেশে প্রেক্ষাগৃহ বন্ধের মিছিল শুরু হয় এবং এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সব শ্রেণির মানুষের যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের সূচনা হয়, সে পর্যন্ত এই গবেষণা এগোয়নি। সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হওয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের অবকাশ আছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার কারণ নেই যে, এই গবেষণা তাত্ত্বিকভাবে সমৃদ্ধ, পদ্ধতিগতভাবে কৌতূহলোদ্দীপক। তবে এই আলোচনায় গবেষক চলচ্চিত্রের সামগ্রিকতায় তার বাজারমুখী যে চরিত্র এবং তার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের গতিপ্রকৃতির যে পরিবর্তন সেটা যথাযথ তুলে ধরেননি। এছাড়া এই গবেষণায় চলচ্চিত্রের প্রধান দুটি উপাদান প্রেক্ষাগৃহ ও দর্শক নিয়ে কথা হয়নি বললেই চলে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত গবেষণাগুলোকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করেছেন ফাহমিদুল হক (হক ২০১৫)। তিনি দেখিয়েছেন, প্রথম পর্বটি দীর্ঘ কিন্তু সেই তুলনায় গবেষণা কম হয়েছে। এই পর্যায়ের গবেষণাকর্মের প্রায় সবটাই ইতিহাসনির্ভর (Kabir 1979, হায়াত ১৯৮৭, মুৎসুদ্দী ১৯৮৭, কাদের ১৯৯৫)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যাবতীয় কার্যক্রম নথিবদ্ধকরণের দায়িত্ব এই পর্যায়ের গবেষকরা পালন করেছেন। "পদ্ধতিগত ঘাটতি থাকলেও এই পর্যায়ের গবেষণাকর্মগুলো বিকাশমান বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-অধ্যয়নের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে" (হক ২০১৫, পৃ৫৩)। দ্বিতীয় পর্যায়ে গবেষকের সংখ্যা কম হলেও এদের কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও খানিকটা বৈচিত্র্য লক্ষণীয় (নাসরীন ও হক ২০০৮, Haq 2010, Hoek 2014, Raju 2015)। তৃতীয় পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স অভিসন্দর্ভ ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের পরিচালিত গবেষণা প্রকল্পগুলোর (বর্মন ও ফিরদাউস

২০০৯, Bhowmick 2009, গায়েন ও বিলকিস ২০০৯, বাগচী ২০১১, গায়েন ২০১২) কথা বলেছেন। এই পর্যায়ে বিচিত্র বিষয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশে চলচ্চিত্র গবেষণার বেশিরভাগই হয়েছে এর আধেয় ও প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় নিয়ে; এবং যতদূর সম্ভব চলচ্চিত্রের মূল্যায়ন করা হয়েছে এর ব্যবসায়িক সাফল্য দিয়ে। উদাহরণ হিসেবে তপতী বর্মণ ও ইমরান ফিরদাউসের 'বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা' (বর্মন ও ফিরদাউস ২০০৯); অদিতি ফাল্গুনী গায়েন ও হুমায়রা বিলকিসের 'বাংলাদেশের জনপ্রিয় ধারার চলচ্চিত্র ও সিনে সাংবাদিকতার আন্তঃপ্রভাব' (গায়েন ও বিলকিস ২০০৯); বিকাশ চন্দ্র ভৌমিকের 'Women on Screen : Representing women by women in Bangladesh' (Bhowmick 2009); তপন বাগচীর 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর : লোকজীবনের উপস্থাপনা' (বাগচী ২০১১) এবং কাবেরী গায়েনের 'মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ' (গায়েন ২০১৩), 'বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' (ঝুমা ২০১৪), 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' (হাসান ২০১৪), 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে বাণিজ্যিক স্বরূপ অনুসন্ধান' (রহমান ২০১৬), 'বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা' (খান ২০১৬), 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের বিবর্তন : চিত্রকলা থেকে ডিজিটাল পুনরুৎপাদনের স্বরূপ বিশ্লেষণ' (হোসেন ও সুলতানা ২০১৬), 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে পোশাক ও রূপসজ্জা : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা' (রায় ২০১৭), 'বাংলাদেশের সিনেমার ব্যানার পেইন্টিং : বিলুপ্ত-প্রায় শিল্পশৈলী'র (আকন্দ ২০১৭) কথা বলা যায়।

অথচ চলচ্চিত্রের পরিসরকে অবতল থেকে, মানে প্রান্তিক মানুষ, যেমন, প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমসাময়িক দর্শক, এদের দিক থেকে বুঝবার চেষ্টা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই করা হয়নি বললেই চলে। ফলে চলচ্চিত্র নিয়ে এই পরিসরে একাডেমিক জ্ঞানের একটা ঘাটতি ও শূন্যতা আছে। এই গবেষণা সেই সুবিশাল শূন্যতার একটি ক্ষুদ্র অংশ খানিকটা অভিনব ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে পূরণ করবার লক্ষ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

১.৮) চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস

বর্তমান গবেষণাটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস হিসেবে রচিত। এক্ষেত্রে একদিকে চলচ্চিত্রের আখ্যান বিশ্লেষণ করে যেমন সমাজ-বাস্তবতা দেখা হয়েছে, অন্যদিকে দর্শকের প্রাত্যহিক যাপিত জীবনে এই সমাজ-বাস্তবতা কীভাবে পুনর্নির্ধারিত হয় সেটার অনুসন্ধান করা হয়েছে। রাজু (Raju 2015) বাংলাদেশের জাতি-রাষ্ট্র ধারণা নির্মাণে চলচ্চিত্রের কার্যক্রমকে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সেখানে দর্শক একেবারেই অনুপস্থিত। এছাড়া লোটে হুক (২০১৪) তার গবেষণায় একটি বিশেষ সময়ের (৯০ দশকের শেষ থেকে ২০০৭

সাল পর্যন্ত সহিংস ও যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের সময়) একটি চলচ্চিত্রের নির্মাণ থেকে প্রদর্শন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন। মোটাদাগে এই গবেষণাটিতে নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে মনে হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত গবেষণায় নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস চর্চার ধারা দেখা যায় না বললেই চলে। চলতি গবেষণায় দর্শককে 'সক্রিয় সামাজিক কর্তা' (social actor) হিসেবে দেখা হয়েছে। দর্শককে নিষ্ক্রিয় না ভেবে উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে তার সক্রিয় সত্তাকে। একই সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহকে দেখা হয়েছে একটি সামাজিক আচার ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে। দর্শক, প্রেক্ষাগৃহ ও প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট মানুষদের অভিজ্ঞতা, বোঝাপড়া এথনোগ্রাফির মাধ্যমে তুলে আনা হয়েছে; সঙ্গে গবেষকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো রয়েছেই। গবেষণা-মাঠ থেকে উঠে আসা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা ও চলচ্চিত্রের টেক্সটে থাকা সমাজ-বাস্তবতা ও গবেষকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণার মূল অংশগ্রহণকারী চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ—যেমন, **দর্শক, প্রেক্ষাগৃহের মালিক, কর্মচারী, টিকেট কালোবাজারি, যৌনকর্মী, প্রেক্ষাগৃহের আশপাশের দোকানদার, চলচ্চিত্রের প্রতিনিধি**, এবং **নির্মাতারা** যারা বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্মাণ থেকে বিপণন পর্যন্ত সরাসরি ভূমিকা রাখছেন। বাংলাদেশে এই ধারার ইতিহাস এর আগে হয়নি বললেই চলে।

ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা, ধর্ম অধ্যয়ন এবং সংস্কৃতি অধ্যয়নের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের পার্থক্য বিষয়বস্তুর তুলনায় অনেক বেশি নির্ভর করে নৃবিজ্ঞানীদের ব্যবহার করা স্বাতন্ত্র্যসূচক পদ্ধতির ওপর। সে কারণে কীভাবে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথাগত ইতিহাসের বিপরীতে মাইক্রো সোশ্যাল রিয়েলিটিকে নথিভুক্ত করে নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস। মাইক্রো সোশ্যাল মানে ছোটো, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, কিন্তু সামাজিক বাস্তবতার খুব বিশদ বর্ণনা। এই ক্ষুদ্র পরিসরে ক্রিয়াশীল গ্র্যান্ড ন্যারেটিভকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে আসা হয় নৃবিজ্ঞানের এথনোগ্রাফিক গবেষণা আদিকল্পে।

সাধারণ ইতিহাসের লেখক তার সামনে থাকা সংগৃহীত তথ্য থেকে যা যা তার জন্য প্রাসঙ্গিক তা বেছে নিয়ে বাদবাকি মালমশলা ফেলে দিতে পারেন। কিন্তু নৃবিজ্ঞানী শুধু তথ্য সাজান এবং তার ব্যাখ্যা দেন ব্যাপারটা এমন নয়, তিনি তথ্যের স্রষ্টাও বটে (ইভান্স-প্রিচার্ড ২০০৯ (১৯৪৮), পৃ৮২–৮৩)। "আজকের নৃবিজ্ঞানী বিশাল ক্যানভাসে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে দায়িত্ব বলতে যা বোঝায় সেই ধারণার বিকাশ কাহিনি কিংবা রাষ্ট্রের বিকাশ কাহিনি অংকন করবার চেষ্টা করেন না। আজকের নৃবিজ্ঞানী কাজ করেন কিছু ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে যেগুলোর অনুসন্ধান সরাসরি তদন্ত ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে পরিচালনা করা সম্ভব" (ইভান্স-প্রিচার্ড ২০০৯ (১৯৪৮), পৃ৮৫)।

৭০ দশকে ইতালিতে মাইক্রো ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয় (Cassar n.d.)। এই ইতিহাস একেবারে সাধারণ মানুষের; এর মধ্যে রয়েছে—ক্ষুদ্র কৃষক, মায়েরা, সংখ্যায় ছোটো দল—এরা প্রত্যেকেই সমাজের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির ক্ষুদ্র অংশ। এই সাধারণ মানুষগুলো গোষ্ঠীগত, কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যায়, সেই পরিস্থিতিকে তুলে আনতে চায় মাইক্রো ইতিহাস। অনেক প্রথাগত ইতিহাসবিদ মনে করেন, মাইক্রো ইতিহাস লেখা সহজ। "মাইক্রো ইতিহাস বিষয়টি মোটেও কোনো গল্প খুঁজে পাওয়া এবং সেটা বলা—এরকম বিষয় নয়। যথাযথভাবে মাইক্রো ইতিহাস লেখার জন্য বিস্তারিত তথ্য ও প্রমাণাদি এবং histoire totale পাওয়ার আগ্রহ দরকার" (Cassar n.d.)।

ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তীর একটি প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা আছে এ বিষয়ে—"... আজকের ভারতবর্ষে যদি ইতিহাসের জনজীবন তৈরি করতে হয়, তা আর স্বদেশিযুগের জাতীয়তাবাদী চিন্তা দিয়ে করা সম্ভব নয়। এমনকী কেবলমাত্র বই লিখেও হবে না। ঐতিহাসিককে অন্য মিডিয়া—প্রদর্শনী, সিনেমা, টেলিভিশন, ইন্টারনেট—বুঝতে ও শিখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি শুরু হলে 'ইতিহাস' বিষয়টিও বদলাতে শুরু করবে। আমরা যাকে 'ইতিহাস-গবেষণা' বলে জানি, তা উঠে যাবে বলছি না। আমাদের পরিচিত ইতিহাসবিদ্যা থাকবে। তবে সেই উনবিংশ-শতাব্দীতে উদ্ভাবিত 'ইতিহাস-বিজ্ঞান' এর পাশাপাশি অন্য নানাবিধ 'অতীত'-এরও—ব্যক্তিগত ও বহুজনের স্মৃতির, মিথের, মিডিয়া-সৃষ্ট স্মৃতির-—চর্চা শুরু হবে" (চক্রবর্তী ২০১১, পৃ৪৬)। এই ব্যক্তিগত ও বহুজনের যে স্মৃতিকথা, তা কিন্তু মোটেও খুব সহজ কোনো বিষয় নয়।

> স্মৃতি বিষয়টি বলা বাহুল্য, একটি জটিল বিষয়। কখনও আমরা মনে করি, কখনও আমাদের মনে পড়ে। 'মনে করা' আর 'মনে পড়া' তো এক নয়। তা ছাড়া স্মৃতি কেবল 'মন' আশ্রয় করে বেঁচে থাকে না। আমাদের শরীরে, অভ্যেসে, প্রাত্যহিকতায়, শিক্ষায় জড়ানো থাকে স্মৃতি। স্মৃতির অনেকটা সামাজিক ব্যবহারেরও অংশ। কাউকে নিয়ে প্রদর্শনী তৈরি করা, শহিদ-মিনার গড়া—এ সবও তো স্মৃতিচর্চা। স্মৃতিচর্চার ইতিহাসও থাকে (চক্রবর্তী ২০১১, পৃ৯২-৯৩)।

এছাড়া স্মৃতির রাজনীতিও আছে। তাই ইতিহাস লেখার সময় সেই রাজনীতিকেও মাথায় রাখতে হয়।

এই ধরনের ইতিহাস লেখার ব্যাপারে নৃবিজ্ঞান খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদিও এই ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে সনাতন নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। একজন দক্ষ নৃবিজ্ঞানী অবশ্য ব্যক্তির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন, যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা বেরিয়ে আসে। এই ক্ষেত্রে ইতিহাস এবং নৃবিজ্ঞান অবশ্যই পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বললে, একজন নৃবিজ্ঞানী, একজন ইতিহাসবিদকে কোনো কিছুর নথি, পাণ্ডুলিপি, চিত্রকলা, দিনলিপি ও অতীতকে তুলে ধরে এমন উপাদানের ওপরই নির্ভর করতে হয়।

এই গবেষণাটি চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস এই কারণে যে, এইটি রচিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও দর্শকের কাছ থেকে চলচ্চিত্রের মাইক্রো সোশ্যাল রিয়েলিটির আখ্যান সুনির্দিষ্ট নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সংকলনের মধ্য দিয়ে। সেই অনুসন্ধানের সঙ্গে যেমন গবেষকের নিজের অভিজ্ঞতাকে মেলানো হয়েছে, তেমনই এ সংক্রান্ত যে বিদ্যমান তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত তার বোঝাপড়াও সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এই তিনের সমন্বয়ে যে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, তাই চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস হিসেবে প্রস্তাব করছে এই গবেষণাকর্ম।

চলচ্চিত্রের প্রারম্ভিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেহেতু পর্দায় শ্রুতিদৃশ্য ভাষায় গল্প বলা, সেহেতু চলচ্চিত্র মানেই কোনো না কোনো ন্যারেটিভ বা আখ্যান, যাকে খুব সহজ অর্থে আমরা গল্পই বলতে পারি। চলচ্চিত্রের বর্ণনায় আদি মধ্য অন্ত পরম্পরা, কাহিনির প্রকাশ, ক্রম পরিণতি ও সমাপ্তি, চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টি করে আবেগ তৈরি এবং চরিত্র ঘটনা আবেগের পরিপূর্ণতা থাকে, যা ন্যারেটিভের লক্ষণ। চলচ্চিত্রের এই ন্যারেটিভ বা কাহিনিচিত্র মানুষের চরিত্র, তাদের যাপিত জীবন ও সময়কে তুলে ধরে। এর চরিত্রগুলোর নিজস্ব অবয়ব থাকে, তারা সংঘাতের মুখোমুখি হয়, নানা ধরনের কাজ করে, নানা ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, যা তাদের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে সাহায্য করে বা প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। আর এর সবই ঘটে সমাজ-বাস্তবতাকে সঙ্গে নিয়ে। আর এর মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভ কেবল সমাজ-বাস্তবতার বয়ান নয়, একই সঙ্গে তা সমাজ-বাস্তবতার অংশ বা সেটাকে নির্মাণ করে। এই জটিল ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়াটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই গবেষণাকে ক্রমাগত নানাভাবে করতে হয়েছে।

ন্যারেটিভ হিসেবে চলচ্চিত্রের সবচেয়ে শক্তিমত্তার জায়গা হলো এর শ্রুতি-দৃশ্যমানতা। এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে চলচ্চিত্র একটা গল্প বলার চেষ্টা করে। ফলে জাতিরাষ্ট্র গঠন, মতাদর্শ পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকে। একই সঙ্গে কেবল রাষ্ট্র না, সমাজের ক্ষেত্রেও, রাজনৈতিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও চলচ্চিত্র ভূমিকা রাখে। চলচ্চিত্রের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্কটা অনেকখানি দ্বিমুখী—দুই পক্ষই নিজেদের স্বার্থে দুইজনকে চ্যালেঞ্জ করে না। ফলে একদিকে চলচ্চিত্র যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে রিপ্রেজেন্ট করে, অন্যদিকে এর গতি-প্রকৃতিও চলচ্চিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়।

আর এসব ঘটনা ঘটে মানে ন্যারেটিভটা যেখানে প্রদর্শিত হয়, সেটা হলো প্রেক্ষাগৃহ। এখানে সক্রিয় সামাজিক সত্তা (Social Actor) হলো দর্শক। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও বয়সের দর্শকের মিলন কেন্দ্র প্রেক্ষাগৃহ। এই প্রেক্ষাগৃহকে এথনোগ্রাফিকালি দেখা হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের মিথষ্ক্রিয়াটা কীভাবে ঘটে সেটা এই গবেষণার সবচেয়ে কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রানুসন্ধানের পরিসর। এই সংক্রান্ত

বোঝাপড়ার জন্য হেবারমাস-এর জনপরিসর (Public Sphere) সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রভাব রয়েছে এই কাজে। জারগেন হেবারমাস-এর ভাষ্যমতে, 'The public sphere is seen as a domain of social life where public opinion can be formed' (Habermas 1991, p398). ফলে প্রেক্ষাগৃহকে জনপরিসর হিসেবে দেখার অবকাশ আছে এবং এই গবেষণায় প্রেক্ষাগৃহকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরে নিয়ে জনপরিসর হিসেবে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। হেবারমাস এই জনপরিসরকে মানুষের মতামত বা চিন্তার একটি 'প্রজননস্থল' হিসেবে দেখেন। প্রেক্ষাগৃহের মতো জনপরিসরে সব ধরনের লোকজনের অবাধ যাতায়াতের সুযোগ থাকে এবং তারা যেকোনো বিষয়েই আলাপ করতে পারে। হেবারমাস-এর ভাষায়, "The citizen plays the role of a private person who is not acting on behalf of a bussiness or private interests but as one who is dealing with matters of general interest in order to form of a public sphere" (MWENGENMEIR, `17 HABERMAS' PUBLIC SPHERE). এই পরিসরে জনগণের ভীত বা আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু থাকে না, তারা অনেকখানি মুক্তভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে পারেন। এভাবেই প্রেক্ষাগৃহ একই সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও জনপরিসর হিসেবে চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার প্রথম ক্ষেত্র হিসেবে নিদারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনায় এই গণমাধ্যমটির রাজনৈতিক-অর্থনীতি বোঝাটাও জরুরি। কারণ চলচ্চিত্রে পুঁজি বিনিয়োগ হয়, একই সঙ্গে তা মুনাফাসহ ফেরত আসার বিষয় থাকে। এখানে রাজনৈতিক মতাদর্শ পুনরুৎপাদন প্রয়াসের সঙ্গে সেন্সরবোর্ডও সক্রিয় থাকে। পুঁজি বিনিয়োগ ও তার ব্যবসা বোঝার জন্য উপযুক্ত জায়গা হলো প্রেক্ষাগৃহ। কারণ বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের মূলধনের পুরোটাই ফেরত আসে দর্শকের কেনা টিকিটের টাকায়। ফলে সমাজ-বাস্তবতার কোন ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন হলে দর্শক চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করে সেটা জানা জরুরি। একই সঙ্গে ক্ষমতা-সম্পর্ক কী করে চলচ্চিত্রে সমাজ-বাস্তবতাকে রিপ্রেজেন্ট ও প্রভাবিত করে সেটা দেখা হয়েছে।

নৃবিজ্ঞান এমন একটি শাস্ত্র যেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণকে প্রতীক, রুপক আর আখ্যানের সূত্রাবদ্ধ বিশ্লেষণ পদ্ধতি দিয়ে ব্যাখ্যা করবার একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী ঐতিহ্য তৈরী হয়েছে। এই বিবেচনায় নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার জন্য প্রেক্ষাগৃহে এথনোগ্রাফিক মাঠ গবেষণার পাশাপাশি চলচ্চিত্রকে টেক্সট ধরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চেষ্টাও হয়েছে এই গবেষণায়। এথনোগ্রাফির মাধ্যমে প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট নানা পেশার মানুষ ও সমসাময়িক দর্শকের কাছ থেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের আখ্যানগুলোও যুক্ত হয়েছে এই বিশ্লেষণে। এইসবের সংশ্লেষণের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার এই প্রয়াস এগিয়েছে।

১.৯) গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টকোণ থেকে এথনোগ্রাফিক ধারায় সম্পাদিত একটি গুণগত একটি গবেষণা। এর পরিসর সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত বাস্তবতা যা চরিত্রে বাঙময় (Discursive)। তাই এখানে যেমন চলচ্চিত্রে অবলোকনযোগ্য ও শ্রুতিযোগ্য উপাদানের ব্যবহার আছে, তেমনি প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও দর্শকের মন-মানসের সাথে চলচ্চিত্রের বহুমাত্রিক সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা আছে। ফলে গবেষণা পদ্ধতি নির্বাচন ও নকশার ক্ষেত্রে এই গবেষণাকে গুণগত গবেষণার অধুনা ও অধুনান্তিক পদ্ধতিগুলোর আশ্রয় নিতে হয়েছে। বিষয় নির্বাচনের মতো পদ্ধতির প্রশ্নেও গবেষণাটি নৃবিজ্ঞান গবেষণার আদিকল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতা, প্রপঞ্চ ও নিরীক্ষাধর্মী চর্চার প্রতি সংবেদনশীল। তাই এখানে একদিকে যেমন ন্যারেটিভ অ্যানালিসিস করা হয়েছে; অন্যদিকে এথনোগ্রাফির অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ও নিবিড় সাক্ষাৎকারসহ আনুষঙ্গিক পদ্ধতিসমূহ বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৯.১) নৃবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা আদিকল্প ও পদ্ধতিসমূহ

গত কয়েক দশকে নৃবিজ্ঞান গবেষণায় বড়ো ধরনের পরিবর্তন এসেছে। নৃবিজ্ঞান গবেষণায় মাঠের অবস্থান ঠিক কী হবে এবং মাঠ বলতেই বা কী বোঝায়—দুই ক্ষেত্রেই একেবারে নতুন চিন্তা বিচরণ করছে। আগে মাঠ বলতে বোঝানো হতো একটি জনগোষ্ঠি এবং নৃবিজ্ঞানের কাজের পরিসর হতো তাদের জীবনযাপন। উনবিংশ শতকের নৃবিজ্ঞানীরা প্রধানত নির্দিষ্ট এলাকায় (মাঠ) গিয়ে জরিপ করতো, নেটিভদের প্রথা নথিভুক্ত করতো—এটা অনেকটা যাদুঘরের জন্য যেভাবে সামগ্রী জোগাড় করা হয় সেরকম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যেতো নৃবিজ্ঞানীদের এই প্রকাশনা নেটিভদের নানা ধরনের বিশ্বাস ও প্রথার একটি জ্ঞানকোষীয় সংকলন ছাড়া আর কিছুই হতো না। ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপবাসীদের নিয়ে ব্রনিস্ল ম্যালিনোস্কির কাজ নৃবিজ্ঞানীদের জন্য মাঠ-গবেষণার একটি নিদর্শন স্থাপন করে। এই গবেষণায় এথনোগ্রাফার একটি সমগ্রবাদী পন্থা অবলম্বন করে এবং সমাজের প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস ব্যবস্থা ও আচরণের নকশা বা প্যাটার্ন কীভাবে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল তা অনুসন্ধান করেন (আহমেদ ও চৌধুরী ২০০৩, পৃ২০–২১)। ম্যালিনোস্কির দৃষ্টিতে মনুষ্য প্রাণীর মৌলিক চাহিদা পূরণের যে ভূমিকা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো পালন করে, সেটাই হচ্ছে ক্রিয়া। তিনি 'চাহিদা' পূরণের এই ক্রিয়াকেই নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হিসেবে দেখার কথা বলেন। আর এই ক্রিয়া দেখার জন্য মাঠ ও মাঠ-গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এদিকে মানুষের মনোজগত কীভাবে কাজ করে তা বিভিন্ন সংস্কৃতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝার জন্য নৃবিজ্ঞানে কাঠামোবাদী চিন্তার আবির্ভাব ঘটে। নৃবিজ্ঞানে এর পথিকৃত ক্লদ লেভি-স্ট্রস। লেভি-স্ট্রসের

পূর্বানুমান হচ্ছে—মনুষ্য প্রজাতি মাত্রই অভিজ্ঞতাকে সাজায়, সেটির শ্রেণিকরণ করে। মানুষের মনোজগতের এই কাঠামো এবং এই প্রবৃত্তি সর্বজনীন। অর্থাৎ এক সংস্কৃতি হতে আরেক সংস্কৃতির প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভিত্তিস্বরূপ বিন্যস্ত মূলনীতি একই, মানে এটি বিশ্বব্যাপী। কিন্তু কাঠামোগত-ক্রিয়াবাদ ও কাঠামোবাদে যে ধারণা দেওয়া হয় তা অনৈতিহাসিক হিসেবে সমালোচিত হয়। কাঠামোবাদের সবচেয়ে বড়ো সমালোচনায় বলা হয়, সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানুষের যে ভূমিকা, কাঠামোবাদ সেটাকে গুরুত্ব দেয় না। তারা মনে করেন, মানুষ কাঠামো দ্বারা পরিচালিত (আহমেদ ও চৌধুরী ২০০৩, পৃ৩১)।

৬০ দশক থেকে শুরু করে ৮০'র দশক পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানে উত্তরাধুনিকতাবাদ ও উত্তর-কাঠামোবাদের প্রভাব দেখা যায়। একই সঙ্গে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান রিপ্রেজেন্টেশন বা উপস্থাপনের যে আলোচনা সেখানে দেখা যায়, কীভাবে নৃবিজ্ঞান তার গবেষণার বিষয়বস্তুকে এথনোগ্রাফিতে উপস্থাপন করে। এক্ষেত্রে এডওয়ার্ড সাঈদের 'প্রাচ্যবাদ'-এর কথা বলা যেতে পারে (Said 1977)। সেখানে পশ্চিমারা কীভাবে প্রাচ্যকে দেখে এবং তার রিপ্রেজেন্টশন কীভাবে হয়—এই আলোচনাগুলো নৃবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে ক্রিয়াবাদের মাঠ-গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে নৃবিজ্ঞানী ফ্রাঞ্জ বোয়াস এর 'ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতাবাদ' বা হিস্টোরিকাল পার্টিকুলারিজম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মার্কিন নৃবিজ্ঞানের জনক বোয়াস মূলত 'ঝট-পট সাধারণীকরণ' ও 'কল্পনাপ্রসূত ইতিহাস' রচনার প্রবণতার কঠোর সমালোচনা করেন। তার অভিমত ছিলো, কোনো সাধারণীকরণের পূর্বে জাতিতাত্ত্বিক তথ্য নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয় (আহমেদ ও চৌধুরী ২০০৩, পৃ৪০০)।

সবমিলে মাঠ-গবেষণার গুরুত্ব থাকলেও মাঠের ধারণাটা বদলাতে থাকে। কারণ বিশ্বায়নের ফলে নতুন ধরনের বাস্তবতার মধ্যে মানুষ বসবাস শুরু করে। পরিস্থিতি অনেকটা এরকম হয় যে, নির্দিষ্ট কোনো সমাজের সীমানা স্থাপন জটিল হয়ে পড়ে। গুপ্ত ও ফার্গুসনের ভাষায়, "একটি গতিশীল, পরিবর্তনশীল, বৈশ্বিকীকরণীয় বিশ্বের সাথে এমন একটি পদ্ধতি যেটি মূলত তথাকথিত ক্ষুদ্র-পরিসরের সমাজ অধ্যয়নের লক্ষ্যে সৃষ্ট হয়েছিলো সেটি মানানসই কি নয়, এই প্রশ্নগুলো নৃবৈজ্ঞানিক মহলে বারে বারে উচ্চারিত হচ্ছে" (Gupta and Ferguson 1997, p1-46)। সমালোচকদের মতে, এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র গোড়াতেই গলদ ছিলো না; সমস্যা এ কারণেও যে এথনোগ্রাফারদের বর্ণিত জগৎ নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু পদ্ধতি হিসেবে মাঠ-গবেষণা আগের মতোই আধিপত্যশীল থেকে গেছে; এতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

এদিকে ১৯৮৪ সালে জর্জ ই মার্কাস ও জেমস ক্লিফোর্ড তাদের *রাইটিং কালচার* (Clifford & Marcus 1986) গ্রন্থে দেখান যে, নৃবিজ্ঞান যে সমাজ-বাস্তবতাকে উপস্থাপন করে তা খণ্ডিত সত্য। ফলে একটি

সমাজের সামগ্রিক বা হলিস্টিক চিত্র আঁকার যে দাবি ক্রিয়াবাদে করা হতো, সেটা গুরুত্ব হারায় ও সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে উত্তরাধুনিকতাবাদ ও উত্তর-কাঠামোবাদ রিপ্রেজেন্টেশনকে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্রীয় আলোচনায় দাঁড় করিয়ে দেয়। সেখানে বলা হয়, মানুষ প্রতিদিন নিজের পরিচয় এবং একে অন্যের পরিচয় নির্মাণ করছে। এই পরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে ক্ষমতা কাঠামোর বিষয়টি যেহেতু জড়িত, তাই ডিসকোর্স ও বিনির্মাণ এর একটি বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে। ফলে যে নৃবিজ্ঞানী এথনোগ্রাফি লেখেন, তার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। তিনি যে অবকেজটিভ, সমগ্রবাদ এবং নেটিভ পয়েন্ট অব ভিউ থেকে গবেষণাটি সম্পন্ন করার ঘোষণা দেন, সেটিকেও সন্দেহ ও চ্যালেঞ্জ করা হয়। একই সঙ্গে বিকল্প হিসেবে ওইসব জনগোষ্ঠী যে টেক্সট উৎপাদন করে তা পাঠ করতে বলা হয়। কারণ ততোদিনে জ্যাক দেরিদার টেক্সটকে অ-কেন্দ্রীকভাবে দেখা ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি কার্যকর হয়ে ওঠে। রোলাঁ বার্থ যেমন লেখকের মৃত্যু উদ্‌যাপন করেন, একইভাবে দেরিদা এই নতুন অ-কেন্দ্রীভূত জগত-সংসারের অবির্ভাবকে স্বাগত জানান। ফলে উত্তর-কাঠামোবাদ মতে, যেহেতু কোনো কর্তৃত্বপূর্ণ কেন্দ্র নেই, সেহেতু এই জগতে কোনো সত্য নেই, আছে কেবল ব্যাখ্যা (আহমেদ ও চৌধুরী ২০০৩, পৃ৩৪)।

এই ব্যাখ্যার জন্য একটি জনগোষ্ঠী নিজেদের কীভাবে উপস্থাপন করে এবং তাদের মনোজগতের যে প্রতিভাস (reflection) সেটা বোঝা খুব জরুরি হয়ে ওঠে। ফলে মাঠ বলতে শুধু আর ভৌগোলিক জনগোষ্ঠিকে বোঝায় না; একই সঙ্গে সেই জনগোষ্ঠীর সামাজিক পরিসর, লৈঙ্গিক পরিসর, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের ভাষার মাধ্যমে তৈরি টেক্সট একটি নতুন নৃবৈজ্ঞানিক 'মাঠ' সৃষ্টি করে। সংস্কৃতিকে টেক্সট হিসেবে পাঠ করা শক্তিশালী তাত্ত্বিক প্রকরণ হয়ে দাঁড়ায় নৃবিজ্ঞানে। ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃতিবিদ্যার হাত ধরে নৃবিজ্ঞানে নতুন নতুন গবেষণার কৌশল সেমিওলজি, ডিসকোর্স বিশ্লেষণ, আধেয় বিশ্লেষণ, ন্যারেটিভ বিশ্লেষণ ইত্যাদি যোগ হয়। ফলে পরিবর্তিত ধ্যান-ধারণায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি এসব পদ্ধতি যুক্ত হওয়াতে গুণগত গবেষণার জন্য পরিচিত নৃবিজ্ঞান আরো শক্তিশালী হয়।

আগেই বলেছি, বর্তমান গবেষণাটি নৃবিজ্ঞান গবেষণার আদিকল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতা, প্রপঞ্চ ও নিরীক্ষাধর্মী চর্চার প্রতি সংবেদনশীল। গত শতকের গোড়ার দিকে বৃটিশ ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানের 'অপর বিশ্ব' মাঠ-কর্মের অভিজ্ঞতা নির্ভর, ঔপনিবেশিক প্রশাসনিকতার সম্পূরক শাস্ত্রীয় চর্চার মধ্য দিয়ে বিকশিত অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। কারণ গুপ্ত ও ফার্গুসনের ভাষায়, "অসমালোচকীয় দৃষ্টিতে, উদ্ভট জায়গার উপর ভিন্নতার প্রতিস্থাপন যেভাবে করা হয়, তাতে মনে হয় নিজ 'দেশ' ভিন্নতার চিহ্ন বহন করে না। উপরন্তু, 'অন্যতার' অর্থ হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ পশ্চিমা সত্তা হতে 'ভিন্ন' কিছু, যেহেতু সেটিই হচ্ছে স্বাভাবিক" (Gupta and Ferguson

1997, p1-46)। ফলে নিজ সমাজে অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষা নিরর্থক হয়ে পড়ে। আবার 'অন্য' সমাজে অংশগ্রহণও সামাজিক-সাংস্কৃতিক চৈতন্যের প্রশ্নে অংশগ্রহণলব্ধ জ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিকতাকে প্রশ্ন সাপেক্ষ করে তোলে। তাই গুপ্ত ও ফার্গুসনের প্রস্তাবনা হচ্ছে, "মাঠ-গবেষণা পুনর্তত্ত্বায়িত হোক; মাঠ একটি 'পরিসরগত নির্মাণস্থানের' পরিবর্তে পুনর্সংজ্ঞায়িত হোক 'রাজনৈতিক অবস্থান' হিসেবে" (Gupta and Ferguson 1997, p1-46)। কারণ ঔপনিবেশিক আমলে মাঠ হিসেবে 'অপর' সংস্কৃতির কল্পিত ভৌত অবয়ব পৃথিবীর সমসাময়িক কোনো সমাজের ক্ষেত্রেই আর প্রয়োগযোগ্য নয়।

এছাড়া যেকোনো টেক্সটকেই বুঝতে হলে তার কনটেক্সটের প্রয়োজন পড়ে। কোনো মানুষের সামাজিক চৈতন্য মূলত তার বেড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক পরিসর ও এর মধ্যে থাকা নানা প্রতীকী যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সমষ্টি। এই প্রতীকী যোগাযোগ ব্যবস্থাই সামাজিক মানুষ হিসেবে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণ ও পুনরুৎপাদন করে। চলচ্চিত্র নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। এটি একদিকে যেমন সমাজ-বাস্তবতাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, আবার অন্যদিকে তা সমাজ-বাস্তবতাকে পুনর্নির্ধারণ করে। ফলে এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে বুঝতে হলে গবেষণার পদ্ধতিটিও আবশ্যিকভাবে প্রতিবর্তী হলে ভালো হয়।

তাই বর্তমান গবেষণায় একদিকে যেমন চলচ্চিত্রে সমাজ-বাস্তবতার রিপ্রেজেন্টেশন দেখতে আধেয় বিশ্লেষণ (ন্যারেটিভ অ্যানালিসিস ও ডিসকোর্স অ্যানালিসিস) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে; অন্যদিকে তেমনি সমাজ-বাস্তবতার পুনর্নির্ধারণে দর্শক ও প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ততা অনুধাবনে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, নিবিড় সাক্ষাৎকারসহ আনুষাঙ্গিক পদ্ধতিসমূহ সমমাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে গবেষণার মাঠ হিসেবে থেকেছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাঠ হলো প্রেক্ষাগৃহ ও চলচ্চিত্রের সমসাময়িক দর্শক।

১.৯.২) ন্যারেটিভ অ্যানালিসিস

চলচ্চিত্র মাত্রই ন্যারেটিভ। চলচ্চিত্রের প্রারম্ভিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেহেতু পর্দায় গল্প বলা, সেহেতু এক্ষেত্রে ন্যারেটিভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণনায় আদি মধ্য অন্ত পরম্পরা, কাহিনির প্রকাশ, ক্রম পরিণতি ও সমাপ্তি, চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টি করে আবেগ তৈরি এবং চরিত্র ঘটনা আবেগের পরিপূর্ণতা—এসব ন্যারেটিভের লক্ষণ। তাই ৭০ দশকে Seymour Chatman ন্যারেটোলজির ধারণা দিয়ে চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের প্রস্তাব করার পর থেকে এটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসেবে আলোচিত হতে থাকে। চলচ্চিত্র ন্যারেটোলজিতে Chatman এর প্রধান অবদান হিসেবে ধরা হয় 'সিনেমাটিক ন্যারেটর'-এর ধারণাটি। 'চলচ্চিত্রে ন্যারেশন আছে, কিন্তু ন্যারেটর নেই'—Bordwell (১৯৮৫) এর এমন ধারণাকে প্রত্যাখান করেন Chatman। সিনেমাটিক ন্যারেটরকে চ্যাটম্যান একটি non-human agent হিসেবে অভিহিত

করেন; যার মধ্যে যোগাযোগের বৃহৎ ও জটিল সব উপাদান সন্নিবেশিত রয়েছে। এগুলো একাধারে শ্রবণসংক্রান্ত (শব্দ, কণ্ঠ, সঙ্গীত প্রভৃতি), আবার দর্শনসংক্রান্ত (যেমন : আলোকসম্পাত, মিজঁ-অ-সেন, ক্যামেরা-দূরত্ব, ক্যামেরার কোণ ও সম্পাদনা) (Horstkotte 2009, p2) বিষয়।

সাধারণভাবে যা কিছু একটা গল্প বলে তাই ন্যারেটিভ বা আখ্যান। তবে মনে রাখতে হবে, ন্যারেটিভ আর বর্ণনার (description) মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বাভাবিকের মধ্যে যখন আলাদা কোনো কিছু ঘটে, তখন সেটা আখ্যান হয়ে ওঠে। তদোরভ-এর মতে, সব ন্যারেটিভই কোনো না কোনো স্থিতাবস্থায় ব্যত্যয় ঘটায় (Todorov 1969, উদ্ধৃত, গায়েন ২০১৩, পৃ৫২)। আর স্বাভাবিকভাবে যা ঘটে তাই বর্ণনা। মূলত সবকিছুর মধ্যে ন্যারেটিভ রয়েছে। মানবজাতির ইতিহাসের সঙ্গেই ন্যারেটিভের শুরু। ন্যারেটিভ ছাড়া কোনো বস্তু, ব্যক্তি কিংবা স্থান নেই। মানুষের সব শ্রেণি, দলের গল্প আছে। বার্থ এর ভাষায়, "... narrative are articulated language, whether oral or written, pictures, still or moving, gestures, and an ordered mixture of all those substances; narrative is present in myth, legend, fables, tales, short stories, epics, history, tragedy, drame [suspense drama], comedy, pantomime, paint-ings (in Santa Ursula by Carpaccio, for instance), stained-glass win-dows, movies, local news, conversation" (Barthes and Duisit 1975, p237).

যখন গল্পকার কোনো গল্প বলেন, সেটা তিনি নিজ থেকেই বলেন; কিন্তু মনে রাখতে হবে কোনো গল্পই পুরোপুরি কারো একার নয়। আগের কোনো গল্পের নির্যাস নিয়েই নতুন কোনো গল্পের তৈরি হয়। আর একটা বিষয় গল্পের ক্ষেত্রে মনে রাখা জরুরি, "কোনো গল্প কারো কাছে বলার জন্য যেমন মানুষের প্রয়োজন; একইভাবে নিজের অভিজ্ঞতা কাউকে বলার জন্যও গল্পের প্রয়োজন। আর এই প্রক্রিয়া ততোক্ষণ পর্যন্তই অসম্পূর্ণ থাকে, যতোক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি গল্প বলায় ন্যারেটিভ ফর্ম যোগ না করে" (Frank, 2010 & Mattingly, 1998 উদ্ধৃত, Frank n.d., p36)। তাই "সামাজিকজীবনে ন্যারেটিভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সামাজিক জীবনই একটি আখ্যান" (Czarniawska 2004, p3)।

এখন পদ্ধতি হিসেবে ন্যারেটিভ অ্যানালিসিসের কাজ হলো যেকোনো ঘটনার একেবারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে যাওয়া। মূলত এখানে স্যোসুরের ভাষাতাত্ত্বিক মডেল নিয়ে কাজ শুরু হয়। পরে নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভি-স্ত্রস, ভাষাতাত্ত্বিক লিওনার্দ ব্লুমফিল্ডসহ অন্যান্যরা কাঠামোবাদের ক্ষেত্রকে আরো সম্প্রসারিত করেন। সাম্প্রতিক ন্যারেটোলজি নিয়ে যে কাজ চলছে তার শুরু রাশিয়ান ফোকলোরবিদ ভ্লাদিমির প্রপ (Vladimir Propp) এর Morphology of the Folktale (Propp 1958) নামে গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। প্রপ সেখানে ১০০ রূপকথার কাহিনি বিশ্লেষণ করে দেখান যে, একই চরিত্র নানা ধরনের

কার্যক্রম (action) সম্পূর্ণ করছে আবার উল্টোভাবে নানা ধরনের চরিত্র একই ধরনের কাজ করছে। আবার কোনো নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে ন্যারেটিভ সম্পূর্ণ হওয়ায় কিছু কাজের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রপ সিদ্ধান্ত নেন যে, কোনো রূপকথার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পুরো আখ্যান জুড়ে কোনো চরিত্র যে কাজগুলো সম্পূর্ণ করে তাই। এজন্য ন্যারেটিভ অ্যানালিসিসে মূলত এসব চরিত্রের আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় দৃশ্য পরম্পরায় তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ককে উন্মোচনের তাগিদ থেকে।

পরে রাশিয়ান আরেক কাঠামোবাদী ও পরে উত্তর-কাঠামোবাদী মিখাইল বাখতিন এ আলোচনাকে এগিয়ে নেন। ১৯৮৭ সালের দিকে Donald E. Polkinghorne (1987) ন্যারেটিভ নিয়ে জাতীয়ভাবে চারটি প্রথার কথা বলেন : রাশিয়ান আঙ্গিকবাদ, আমেরিকান নব্য সমালোচনা, ফ্রান্স কাঠামোবাদ ও জার্মান hermeneutics. (Czarniawska 2004, p2) অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স, রাশিয়ার আঙ্গিকবাদ ও প্রাগ স্কুলের ধারণাও ন্যারেটিভ অ্যানালিসিসের ভিত্তি তৈরি করে দিতে সহায়তা করে (Pettersson 2009, p12)। আর ন্যারেটিভ অ্যানালিসিসের ভিত্তি যেহেতু সাহিত্যকর্মের গবেষণায়, সেহেতু এর মূল নিহিত রয়েছে ফিকশনাল ন্যারেটিভ তত্ত্বে।

অবশ্য মিথ অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে ক্লদ লেভি-স্ত্রস কিছু সতর্কতার কথা বলেন। একটি মিথকে ধারাবাহিক পরম্পরা হিসেবে পড়ে বোঝা সম্ভব নয়। “আমরা যদি সংবাদপত্র বা উপন্যাস পড়ার মত লাইন ধরে ধরে ডান থেকে বায়ে কোনো মিথ পড়ার চেষ্টা করি, আমরা একটাকে বুঝতে পারব না। একে আমাদের বুঝতে হয় একটা সমগ্র হিসেবে, বুঝতে হয় যে, মিথটির অন্তর্নিহিত অর্থ এতে বর্ণিত ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব না, একে বুঝতে হলে এর ঘটনাগুচ্ছগুলো অনুসরণ করতে হবে, যদিও এই ঘটনাগুচ্ছ গল্পে বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়” (লেভি-স্ত্রস ২০০৭ (১৯৭৭), পৃ৫২)।

পদ্ধতিগতভাবে ন্যারেটিভ অ্যানালিসিসে দুই ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় : কখনো টেক্সটের উপর থেকে নীচ আবার কখনো নীচ থেকে উপরে আসা হয়। এই দুই পদ্ধতির ব্যবহার কোনো টেক্সটের মধ্যকার অবধারণগত অর্থ বুঝতে পার্থক্য সৃষ্টি করে। উপর থেকে নীচে আসার যে পদ্ধতি তা শিক্ষা এবং অবধারণগত মনস্তত্বে বিশেষ প্রভাব ফেলে (Rumelhart 1977, Rumelhart & Normam 1981, Manning & Cullun-Swan 1994, p464)। মিথ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেভি-স্ত্রস একই ধরনের কথা বলেন। তার ভাষায়, “আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হয় যে পৃষ্ঠার উপর দিকে যা লেখা আছে তা তখনই অর্থময় হবে যখন একে পৃষ্ঠার নীচের দিকে যা আছে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। এভাবেই প্রথম স্টেভের অচ্ছেদ্য অংশ হবে দ্বিতীয় স্টেভ, এরপর তৃতীয় স্টেভ ইত্যাদি। অর্থাৎ শুধু বাঁ

থেকে ডান দিকে পড়লে চলবে না, উল্লম্বভাবে অর্থাৎ ওপর থেকে নীচে পড়তে হবে। পুরো পৃষ্ঠাটিকে একটা সমগ্র হিসাবে বুঝতে হবে" (লেভি-স্ত্রস ২০০৭ (১৯৭৭), পৃ৫৩)।

চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভ বা আখ্যানভাগকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। নির্দিষ্ট স্থান-কালে সংঘটিত কোনো ঘটনাপ্রবাহের ইতিবৃত্ত বলা যেতে পারে আখ্যানকে। সাধারণভাবে ন্যারেটিভ বা কাহিনিচিত্র মানুষের চরিত্র, তাদের সংগ্রামকে তুলে ধরে। "চরিত্রগুলোর নিজস্ব অবয়ব আছে, আবার তারা সংঘাতের মুখোমুখি হয়, নানা ধরনের কাজ করে, নানা ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়, যা তাদের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে সাহায্য করে বা প্রতিবন্ধক হয়ে উঠে" (গায়েন ২০১৩, পৃ৫২)। আবার কখনো এই লক্ষ্য হয়ে উঠে ভালোবাসা পাওয়ার, মানসিকতা রক্ষার বা কোনো গন্তব্যে পৌঁছার।

ন্যারেটিভ অ্যানালিসিসে শুরুর দিকে কাঠামো ক্রিয়াবাদী ধারার প্রাধান্য থাকলেও তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে নানা ধরনের তত্ত্ব, ধারণা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির সমন্বয়ে। ফলে এটা আর এখন কোনো একক তত্ত্ব নয় বরং অনেকগুলো আন্তঃসম্পর্কিত তত্ত্বের সমাহার (Heinen & Sommer 2009, p2-3), যারা একই সঙ্গে তাত্ত্বিক ও গবেষণা উপচার হিসেবে প্রায়োগিকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এদিকে অনেক তাত্ত্বিক মনে করেন, ন্যারেটিভ অ্যানালিসিস একটি টেক্সটবিষয়ক তত্ত্ব, যার পরিধি ন্যারেটিভ তথা আখ্যানকে ছাড়িয়ে যায়। ন্যারেটিভ অ্যানালিসিস কোনো নির্দিষ্ট ধারার তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করে না বরং ভিন্ন ভিন্ন ধারার ন্যারেটিভ অ্যানালিসিস ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করে অ্যাখানে; যেমন, কনটেক্সটচুয়াল ন্যারেটিভ অ্যানালিসিস ন্যারেটিভের বিষয় আশয়গুলোকে নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, বিষয়ভিত্তিক এবং মতাদর্শগত প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংযোগ ঘটায় (গায়েন ২০১৩, পৃ৫১)।

এই গবেষণায় দুই ক্ষেত্রে ন্যারেটোলজি ব্যবহার করা হয়েছে—**প্রথমত**, নমুনায়িত চলচ্চিত্র এবং **দ্বিতীয়ত**, এথনোগ্রাফির মাঠ ও চলচ্চিত্রের সমসাময়িক দর্শকের সাক্ষাৎকার থেকে উঠে আসা আখ্যান বিশ্লেষণে। চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভে একটি কাঠামো এবং কিছু উপাদান থাকে। বিশ্লেষণের সময় এই দুটো বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হয়। ন্যারেটিভ বিশ্লেষণের শুরুতে তাই চলচ্চিত্রে যে কাঠামোটি ব্যবহার করা হয়েছে সে কাঠামোটি নিয়ে আলোচনা করে তা ধরে এগোতে হয়। আর এজন্য কিছু ধারণার সঙ্গে পরিচিত থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন Dino (2011) :

১. আখ্যানভাগ (Story line) : বিষয়বস্তু অর্থাৎ কাহিনিকে যা বলা হয়েছে।

২. চিত্রনাট্য (Plot line) : কাঠামো বা যেভাবে কাহিনিটি বলা হয়।

এই দুই ধারণার কাছাকাছি আরো দুটো ধারণা হলো Discourse and Story। কোনো ন্যারেটিভের প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহই ওই ন্যারেটিভের গল্প। আর ডিসকোর্স হলো ন্যারেটিভে ওই গল্পটিকে উপস্থাপনের সময় নির্মাতার অবস্থানের সাপেক্ষে পুনর্নির্মিত (গায়েন ২০১৩, পৃ৬১)। এই দুইটি উপাদানই আসলে ন্যারেটিভ কাঠামোর মৌল বিষয়।

চলচ্চিত্রের আখ্যান বিভিন্নভাবে শুরু হতে পারে। প্রথমত, উত্তম পুরুষের বর্ণনায় (First-Person Narration); এই ধরনের বয়ানকারী কাহিনির চরিত্র হিসেবে থাকতে পারে, আবার কাহিনির দর্শকও হতে পারে। এক্ষেত্রে একটি একক চরিত্রের সাপেক্ষেই কাহিনির মূল ফোকাস দেখানো হয়। দ্বিতীয়ত, নাম পুরুষের (Third-Person Narration) বর্ণনাও দেখা যায়। যখন কোনো তৃতীয় ব্যক্তি 'আমি' বা 'আমরা' ব্যবহার না করে অন্য কারো সম্পর্কে বর্ণনা করে সেটাকে নাম পুরুষে বর্ণনা বলা হয়। সম্ভবত এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বর্ণনারীতি। এর বাইরে আরেক ধরনের বর্ণনারীতি হলো Frame Narration। এক্ষেত্রে সাধারণত একটি কাহিনির মধ্যে অন্য একটি কাহিনি বর্ণনা করা হয় (গায়েন ২০১৩, পৃ৬২)।

৩. চরিত্র নির্মাণ (Character Construction) : মুখ্য চরিত্র, প্রতিপক্ষ ইত্যাদি।

৪. চরিত্র বিকাশ (Character Development) : যেহেতু যেকোনো ন্যারেটিভেই স্থিতাবস্থা পরিবর্তিত হয়, তাই চরিত্রের পরিবর্তন বা অগ্রায়ণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে অন্যান্য চরিত্রের আগমন, সমস্যা, সংঘাত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয়।

৫. কম্পোজিশন ও সেটিং : কীভাবে কাহিনির মুড তৈরি করা হয়েছে, কী রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, ছবির টোন, স্থান, আলোর ব্যবহার, পোশাক মেকআপ ইত্যাদির অন্তর্গত।

৬. সিনেমাটোগ্রাফি : ক্যামেরার দূরত্ব, ক্যামেরার সঞ্চালন, ক্যামেরার অবস্থান ইত্যাদি।

৭. সম্পাদনা : বিভিন্ন শট, মন্তাজ, মিজ-অঁ-সিনের ব্যবহার।

৮. অন্যান্য উপাদান : সঙ্গীত, গানের কথা, আবহসঙ্গীত।

ক্যামেরার এসব কৌশলকে ব্যবহার করে কাহিনিতে কে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, কীভাবে ঘটনাকে বিন্যস্ত করা হলো এর মাধ্যমে ওই কাহিনি সম্পর্কে দর্শক মনে একটি অর্থ তৈরি করে। একই সঙ্গে চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত জগৎ, এর সঙ্গে যারা অন্তর্ভুক্ত তাদের পরিচয় এবং তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক বিষয়ে অর্থ তৈরি হয় (গায়েন ২০১৩, পৃ৬৩)। চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কাবেরী গায়েন তার 'মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভে [পরে অবশ্য একই শিরোনামে তিনি একটি গ্রন্থ (গায়েন, ২০১৩) প্রকাশ করেন] Dino (২০১১) এর আলোচনা ব্যবহার করেন। এই গবেষণায় চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এসব বিষয় মাথায় রাখা হয়।

এই গবেষণায় এথনোগ্রাফিক মাঠ ও চলচ্চিত্রের সমসাময়িক দর্শকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য-উপাত্তগুলোকে আখ্যান আকারে সাজানো হয়েছে। এই বিশ্লেষণটি অনেকখানি ঋত্ব্রত ভট্টাচার্য পরিচালিত *সন্ধে নামার আগে* (২০১৫) চলচ্চিত্রটির আখ্যানের মতো। সেখানে একটি হত্যাকাণ্ডের ২০

বছর পর তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে নামেন একজন গোয়েন্দা। ততোদিনে অবশ্য সেই হত্যার দায়ে একজনের ফাঁসি কার্যকর হয়ে গেছে। কিন্তু দণ্ডপ্রাপ্ত খুনীর একটি চিঠির রেশ ধরে তার মেয়ে সত্য উদ্‌ঘাটনে সেই গোয়েন্দাকে নিয়োগ করেন। সেই গোয়েন্দা একে একে ঘটনা সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলেন। এবং প্রত্যেকের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধরে ধরে একটি করে আখ্যান তৈরি করেন। পরে ওই সবগুলো আখ্যান বিশ্লেষণ করে খুনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে একটি আখ্যান তৈরি হয়। এর মধ্য দিয়ে সত্য বেরিয়ে আসে।

এই গবেষণায় একইভাবে প্রেক্ষাগৃহে এথনোগ্রাফি ও চলচ্চিত্রের সমসাময়িক দর্শকের অনেকের কাছ থেকে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত নানা তথ্য নিয়ে আখ্যান তৈরি করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য : নির্ঘণ্ট ৭)। একই সঙ্গে নমুনায়িত চলচ্চিত্রের আখ্যানও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র নমুনায়নের ব্যাপারে প্রেক্ষাগৃহে এথনোগ্রাফি ও চলচ্চিত্রের সমসাময়িক দর্শকের তথ্য নিয়ে তৈরি ন্যারেটিভের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রথমে ওইসব ন্যারেটিভ থেকে **৩০৯টি চলচ্চিত্রের** নাম সংগ্রহ ও সেগুলোর প্রাবল্যের হিসাব রাখা হয়েছে (দ্রষ্টব্য: নির্ঘণ্ট ৬)। এরপর সেই নামগুলোকে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে দশক ধরে। প্রত্যেক দশকে যে চলচ্চিত্রগুলোর কথা ন্যারেটিভে সবচেয়ে বেশি সংখ্যকবার এসেছে সেখান থেকে দুটি করে পাঁচ দশকে মোট ১০টি চলচ্চিত্রকে (সারণী ১.১.২) ন্যারেটিভ অ্যানালিসিসের জন্য চূড়ান্তভাবে নমুনায়িত করা হয়েছে।

সারণী ১.১.২ : চলচ্চিত্রের চূড়ান্ত নমুনায়ন

চূড়ান্ত নমুনা	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য
৬০ দশক	
রূপবান	১০
এতটুকু আশা	৯
৭০ দশক	
অবুঝ মন	২৯
দোস্ত দুশমন	১১
৮০'র দশক	
নসীব	১৩
বেদের মেয়ে জোস্‌না	৩২
৯০ দশক	
কেয়ামত থেকে কেয়ামত	১১
আম্মাজান	১১
শূন্য দশক	
মনপুরা	২৭
কোটি টাকার কাবিন	৯

ভিন্ন ভিন্ন এইসব আখ্যান থেকে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক আখ্যান বা ইতিহাস।

১.৯.৩) এথনোগ্রাফিক পর্যবেক্ষণ ও নিবিড় সাক্ষাৎকার

নৃবিজ্ঞানের বহুল চর্চিত পদ্ধতির নাম এথনোগ্রাফিক মাঠ-গবেষণা। এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গবেষিত জনগোষ্ঠীর জীবনধারা প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে পর্যবেক্ষণ এবং সেটি নথিভুক্ত করা (আহমেদ ও চৌধুরী ২০০৩, পৃ২০)। বিচিত্র জায়গায় মাঠ-গবেষণা পরিচালনা ও তাত্ত্বিক আগ্রহের প্রকৃতির কারণে, নৃবিজ্ঞানীদের এথনোগ্রাফিক অনুসন্ধানে বিভিন্ন ধরনের প্রণালীর ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়ে। অধিকাংশ মাঠ-গবেষণাকারী তাদের উপাত্ত সংগ্রহে অন্তত কিছু আনুষ্ঠানিক কৌশল ব্যবহার করে—মাঠে ঘটতে থাকা ঘটনাবলী নিয়মমাফিক নথিভুক্তিকরণ, ফিল্ডনোট কিংবা প্রাথমিক ধারণা টুকে রাখা, অনানুষ্ঠানিক ও কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার এবং প্রধান তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ।

এছাড়া আধুনিক নৃবিজ্ঞানে গবেষক অপর নন, তার চির চেনা-পরিচিত মাঠেই গবেষণা সম্পন্ন করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়। ফলে গবেষক নিজে মাঠের অধিপতি না হয়ে, এর অংশ হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি নিজেও গবেষিত সমাজ বা মাঠে দীর্ঘ সময় ধরে বেড়ে উঠেছেন, এসব পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অভিজ্ঞতা নিয়েছেন। তাই তার নিজের জীবন-বাস্তবতাও এই মাঠ-গবেষণাকে প্রভাবিত করেছে।

চলতি গবেষণার বিষয় চলচ্চিত্র ও তার প্রদর্শনের জায়গা প্রেক্ষাগৃহ। ফলে এই দুটোকে মাঠ ধরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। দর্শকের জীবনের সমাজ-বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রে দর্শকের সমাজ-বাস্তবতার রিপ্রেজেন্টেশন আবার দর্শকের মধ্যে নতুন বাস্তবতা পুনর্নির্ধারণ করে; যদিও সেটা জাদু-বাস্তবতা হতে পারে। প্রক্রিয়াটিকে বোঝার জন্য এথনোগ্রাফিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এজন্য **প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থেকে চলচ্চিত্র দেখা, দর্শকের পর্যবেক্ষণ** এবং **২৫৮ জনের অনানুষ্ঠানিক ও কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার** নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুব গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়েছে—**প্রথমত**, চলচ্চিত্র নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট (প্রেক্ষাগৃহের মালিক, ব্যবস্থাপক, প্রজেক্টর অপারেটর, টিকেট বিক্রেতা, লাইনম্যান, গেইটম্যান, প্রচারকারী, টিকেট কালোবাজারি, সাইকেল গ্যারেজের মালিক, চা-পান দোকানদার, বাদামওয়ালা, ঝালমুড়িওয়ালা, যৌনকর্মী ও দর্শক) ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা, স্মৃতিতে[৪] থাকা তথ্য-উপাত্ত; **দ্বিতীয়ত**, চলচ্চিত্র নিয়ে তাদের সাম্প্রতিক ভাবনা। অভিজ্ঞতা

---

[৪]. স্মৃতি একটি জটিল বিষয়। কখনও আমরা মনে করি, কখনও আমাদের মনে পড়ে। 'মনে করা' আর 'মনে পড়া' তো এক নয়। তা ছাড়া স্মৃতি কেবল 'মন' আশ্রয় করে বেঁচে থাকে না। আমাদের শরীরে, অভ্যেসে, প্রাত্যহিকতায়, শিক্ষায় জড়ানো থাকে স্মৃতি। স্মৃতির অনেকটা সামাজিক ব্যবহারেরও অংশ। কাউকে নিয়ে প্রদর্শনী তৈরি করা, শহিদ-মিনার গড়া—এ সবও তো স্মৃতিচর্চা। স্মৃতিচর্চার ইতিহাসও থাকে। (চক্রবর্তী ২০১১, পৃ৯২-৯৩) এছাড়া স্মৃতির রাজনীতিও আছে। তাই ইতিহাস লেখার সময় সেই রাজনীতিকেও মাথায় রাখতে হয়।

ও স্মৃতি থেকে তথ্য-উপাত্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ডায়াক্রনিক মানে পরম্পরা বা ঐতিহাসিকতা যেমন মাথায় রাখা হয়েছে, তেমনি সিনক্রোনিক মানে সমসাময়িক বিষয় ধরা হয়েছে।

এছাড়া এথনোগ্রাফিক পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র দেখার সময় কোনো দর্শক ঠিক কোন দৃশ্যে কী ধরনের আচরণ (নীরবতা, শিস দেওয়া, তালি দেওয়া কিংবা চিৎকার) করে সেটা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এবং চলচ্চিত্র দেখে বের হওয়ার পর তাদের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টাও হয়েছে।

এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মে অংশগ্রহণকারী ২৫৮ জনের (সারণী ১.১.৩) মধ্যে প্রেক্ষাগৃহের মালিক, ব্যবস্থাপক, প্রজেক্টর অপারেটর, টিকেট বিক্রেতা, টিকেট কালোবাজারি, লাইনম্যান, গেইটম্যান, প্রচারকারী, চলচ্চিত্রের প্রতিনিধি, সাইকেল গ্যারেজের মালিক, চা-পান দোকানদার, বাদামওয়ালা, ঝালমুড়িওয়ালা, যৌনকর্মী ছিলেন মোট ২১০ জন। এর মধ্যে নারীকর্মী একজন, নারী যৌনকর্মী একজন ও নারী হকার ছিলেন একজন। ৪৮ জন দর্শকের মধ্যে নারী পাঁচজন (দুইজন শিক্ষার্থী) ও পুরুষ ৪৩ জন। দর্শকের বেশিরভাগই শিক্ষার্থী (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের); এছাড়া শ্রমিক, কৃষক, রিকশা-ভ্যান-অটোরিকশা চালক রয়েছেন।

মাঠকর্মে অংশগ্রহণকারী প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্টদের বেশিরভাগই দীর্ঘদিন ধরে এই পেশাতে আছেন, তাদের অনেকের এই বয়সে অন্য কোনো পেশায় যাওয়ার সুযোগ নেই। আবার অনেকে এই পেশা ছেড়ে প্রেক্ষাগৃহের আশপাশে অন্য কোনো কাজ করছেন। তবে তাদের বেশিরভাগেরই প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত যাতায়াত আছে। বেশ কিছু নতুন কর্মীও পাওয়া গেছে। কিন্তু তারা এই পেশায় স্থায়ী হবেন বলে মনে হয়নি। পুরনো কর্মীদের বেশিরভাগই প্রেক্ষাগৃহে আগে যে কাজ করতেন সেটাতে আর নেই; যেমন আগে যিনি ৩৫ মি মি প্রজেক্টর (কর্মীদের ভাষায়, এটা একসময় খুব সম্মানজনক পেশা ছিলো) চালাতেন এখন তিনি গেটম্যান হিসেবে কাজ করছেন। কিংবা আগে যিনি ব্যবস্থাপক ছিলেন, এখন একই সঙ্গে তাকে টিকেট বিক্রি, ডিজিটাল প্রজেক্টর চালানোর মতো কাজ করতে হচ্ছে। এছাড়া প্রেক্ষাগৃহের বেশিরভাগ কর্মীকে হতাশ এবং সামাজিকভাবে তারা নিজেদেরকে হেয় ভাবছেন বলে মনে হয়েছে।

প্রেক্ষাগৃহগুলোতে নারী কর্মী ও দর্শক নেই বললেই চলে। ৯০ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের বেশিরভাগ প্রেক্ষাগৃহে কমপক্ষে একজন করে নারী কর্মী ছিলেন। কারণ তখনও উপজেলা পর্যায়ের সব এবং জেলা পর্যায়ের কোনো কোনো প্রেক্ষাগৃহে নারী দর্শকের জন্য স্বতন্ত্র বসার জায়গা ছিলো। সেই জায়গাটির তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে থাকতেন নারীরা। কিন্তু ৯০ দশকের শেষের দিক থেকে নারী দর্শক কমতে থাকলে নারী কর্মীরাও কমতে থাকেন। সেটা এই গবেষণার মাঠকর্মের সময় প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিলো। ফলে এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মের অংশগ্রহণকারী হিসেবে প্রেক্ষাগৃহের কর্মী ও দর্শক হিসেবে নারীদের পাওয়া যায়নি বললেই চলে। এই গবেষণার অন্যতম সীমাবদ্ধতা মনে হয়েছে এটাকে।

সারণী ১.১.৩ : এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মে অংশগ্রহণকারীদের ধরন

এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মে অংশগ্রহণকারী ধরন	সংখ্যা
প্রেক্ষাগৃহের মালিক	১৪
ব্যবস্থাপক	১৯
সুপারভাইজার	৮
প্রজেক্টর অপারেটর	১৯
সাধারণ কর্মচারী	২২
টিকেট বিক্রেতা (বুকিং ক্ল্যার্ক)	১৬
টিকেট কালোবাজারি	৮
গেইটম্যান	৩৮
পাবলিসিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত	১০
চলচ্চিত্রের প্রতিনিধি	৮
সাইকেল গ্যারেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত	২
বুকিং এজেন্ট	১
নারী কর্মী	১
নৈশপ্রহরী	৫
ক্যান্টিন পরিচালনাকারী	১
প্রেক্ষাগৃহের পাশের চা-পান দোকানদার	৩০
বাদামওয়ালা ও ঝালমুড়িওয়ালা	৭
যৌনকর্মী	১
দর্শক (নারী ৫ + পুরুষ ৪৩)	৪৮

এছাড়া চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্রনির্মাতা, গবেষকদের পর্যবেক্ষণ ও অভিমত জানার জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। কোনো গবেষণা-পাত্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, জীবন ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এই ধরনের সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় (খালেক, সরকার ও অন্যান্য ১৯৯৮, পৃ৯৫)। এছাড়া নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণের সূত্র হিসেবে 'মানুষ'কে ব্যবহার করে। এই পদ্ধতি ব্যবহারের অন্যতম অগ্রণী ডরোথি হবসন (স্টোকস, জেন ২০০৩, উদ্ধৃত রহমান ও শওকতুজ্জামান ২০০৪, পৃ১৬৮)। এই গবেষণায় গবেষণা-মাঠ থেকে উঠে আসা তথ্যের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট **ছয়জনের নিবিড় সাক্ষাৎকার নেওয়া** (দেখুন নির্ঘণ্ট ৫) হয়েছে।

১.৯.৪) গবেষণার প্রায়োগিক ক্ষেত্র, উপাত্তের উৎস ও বিশ্লেষণ

এই গবেষণায় তথ্য-উপাত্তের উৎস হিসেবে প্রায়োগিক দুটি ক্ষেত্র নেওয়া হয়। এর একটি হলো প্রেক্ষাগৃহ ও তার সমসাময়িক দর্শক, নির্মাতা ও গবেষক; অন্যটি শ্রুতিদৃশ্যলোক (audio visual space) ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র। **প্রথমত,** সারাদেশের নমুনায়িত প্রেক্ষাগৃহে এথনোগ্রাফি করা হয়। সেই এথনোগ্রাফি থেকে প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে একটি করে আখ্যান তৈরি করা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** এথনোগ্রাফিতে যেসব চলচ্চিত্রের নাম পাওয়া গেছে, সেগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যকবার যে চলচ্চিত্রগুলো নাম এসেছে, তার ন্যারেটিভ অ্যানালিসিস করা হয়েছে।

প্রথম ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সব প্রেক্ষাগৃহকে সমগ্রক হিসেবে ধরা হয়। সেখান থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে দেশের মোট জেলাকে আটটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়—**রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, যশোর, রংপুর**। এসব সাংস্কৃতিক অঞ্চল নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিবেচনার বিষয় হিসেবে ভাষাকে রাখা হয়। কারণ এই অঞ্চলগুলো বাংলা ভাষার আটটি ভিন্ন ধারার আঞ্চলিক ভাষার প্রতিনিধিত্ব করে। এই আটটি অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও আছে। এদের প্রত্যেকের আকর ও লোকায়ত সংস্কৃতি একেবারে আলাদা। একটি নতুন মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র এসব অঞ্চলের পূর্বাপর যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলো ছিলো/আছে তার সঙ্গে একধরনের মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। এজন্য এই আটটি অঞ্চলকে আলাদা করে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এ গবেষণায়।

এই আটটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের প্রত্যেকটির জেলা সদরের সবকটি এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে অঞ্চলভুক্ত অন্য একটি জেলার একটি উপজেলার সব প্রেক্ষাগৃহে এথনোগ্রাফিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে (সারণী ১.১.৪)। যেমন : **রাজশাহী ও নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলা; চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার লাকসাম উপজেলা; রংপুর ও কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা; যশোর ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা; খুলনা ও সাতক্ষীরার দেবাহাটা উপজেলা; বরিশাল ও পটুয়াখালী সদর উপজেলা; সিলেট ও মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলা; ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা সদর উপজেলা**। এছাড়া চলচ্চিত্রে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছয়জনের নিবিড় সাক্ষাৎকার (দ্রষ্টব্য নির্ঘণ্ট ৫) নেওয়া হয়েছে। এরা হলেন : ১. **চলচ্চিত্রনির্মাতা, অভিনয়শিল্পী ও প্রযোজক কাজী হায়াৎ**; ২. **চলচ্চিত্রনির্মাতা, কাহিনিকার ও প্রযোজক দেলোয়ার জাহান ঝন্টু**; ৩. **চলচ্চিত্রনির্মাতা সোহানুর রহমান সোহান**; ৪. **চলচ্চিত্রনির্মাতা কামার আহমাদ সাইমন**; ৫. **চলচ্চিত্র গবেষক ও নির্মাতা অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন রাজু** ও ৬. **শিক্ষক, চলচ্চিত্রবিষয়ক লেখক ও অভিনয়শিল্পী অধ্যাপক ড. মানস চৌধুরী**।

সারণী ১.১.৪ নমুনায়িত সাংস্কৃতিক অঞ্চলের তালিকা

সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ক্রম	যে অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে
সাংস্কৃতিক অঞ্চল ১	রাজশাহী সদর ও নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলা
সাংস্কৃতিক অঞ্চল ২	চট্টগ্রাম সদর ও কুমিল্লার লাকসাম উপজেলা
সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৩	রংপুর সদর ও কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা
সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৪	যশোর সদর ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা
সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৫	খুলনা সদর ও সাতক্ষীরার দেবাহাটা উপজেলা
সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৬	বরিশাল সদর ও পটুয়াখালী সদর উপজেলা
সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৭	সিলেট সদর ও মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলা
সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৮	ময়মনসিংহ সদর ও নেত্রকোণা সদর উপজেলা

নমুনায়িত আটটি সাংস্কৃতিক অঞ্চল

প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের প্রেক্ষাগৃহে এথনোগ্রাফি থেকে পাওয়া তথ্য দিয়ে সেই অঞ্চলের চলচ্চিত্রের একটি করে আখ্যান তৈরি করা হয়। সেই আখ্যান থেকে প্রাথমিকভাবে ইনডেক্সিং করা হয়েছে তিন ধরনের। **প্রথম ইনডেক্সিংটি বিষয়ভিত্তিক,** মানে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যেসব বিষয় (যেমন :

অনেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নির্মাণশৈলী, তারকা-কুশীলব, ব্যবসা, দর্শক, পাইরেসি, নকল চলচ্চিত্র ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছেন) পাওয়া গেছে সেগুলো আলাদা করে এর প্রাবল্য হিসাব করা হয়েছে। **প্রথম ইনডেক্সিংয়ে বিষয় পাওয়া গেছে মোট ১৬৮ ধরনের। এই ১৬৮ প্রকার বিষয়কে প্রথমে থিম ধরে ১৮টি বিভাগে ভাগ করা হয়** (দ্রষ্টব্য নির্ঘণ্ট ১)। সেগুলো হলো : **চলচ্চিত্র নির্মাণ, চলচ্চিত্রের সমান্তরাল গণমাধ্যম, তারকা-কুশীলব, প্রেক্ষাগৃহ, চলচ্চিত্র ব্যবসা, পাইরেসি, চলচ্চিত্র বিপণন, প্রচার-প্রচারণা, দর্শক, চলচ্চিত্রের আধেয়, প্রযুক্তি, কাটপিস, চলচ্চিত্রের ধরন, রাষ্ট্র ও চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রশিক্ষা, বি এফ ডি সি, চলচ্চিত্র ও গবেষণা এবং চলচ্চিত্র পুরস্কার** (দ্রষ্টব্য নির্ঘণ্ট ২)। এই ১৮টি থিমকে তৃতীয় স্তরে নয়টি থিমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে মোট যে নয়টি থিম দাঁড়িয়েছে, সেগুলো হলো—

১. চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী;

২. তারকা-কুশীলব;

৩. চলচ্চিত্রের দর্শক, ব্যবসা ও প্রেক্ষাগৃহ;

৪. চলচ্চিত্রের সমান্তরালে শিল্পকলা ও গণমাধ্যম;

৫. হিন্দি ও অন্য ভাষার চলচ্চিত্র আমদানি;

৬. চলচ্চিত্র, রাষ্ট্র ও সেন্সর;

৭. চলচ্চিত্রের ধরন;

৮. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা;

৯. চলচ্চিত্রশিক্ষা।

এরপর পাঁচটি দশকে ভাগ করে এই থিম ধরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় গবেষকের নিজের অভিজ্ঞতা ও মাইক্রো ন্যারেটিভের বিন্যাস করা হয়েছে।

ইনডেক্সিংয়ের **দ্বিতীয় পর্যায়ে** আখ্যানে উঠে আসা তারকা-কুশীলবদের নামের প্রাবল্য (দ্রষ্টব্য নির্ঘণ্ট ৩) দেখা হয়েছে **তৃতীয় পর্যায়ের** ইনডেক্সিংয়ে (দ্রষ্টব্য নির্ঘণ্ট ৬) আখ্যানে উঠে আসা চলচ্চিত্রের নাম তালিকাবদ্ধ করে প্রাবল্য দেখা হয়েছে।

ইনডেক্সিংয়ের তৃতীয় পর্যায়ে তালিকাবদ্ধ করা চলচ্চিত্রে সবচেয়ে বেশি সংখ্যকবার যেসব চলচ্চিত্রের নাম এসেছে পাঁচ দশকে দুটি করে ১০টি চলচ্চিত্র চূড়ান্ত নমুনায়ন (সারণী ১.১.২) করা হয়েছে। নমুনায়িত এই ১০টি চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের একধরনের সুনির্দিষ্ট বোঝাপড়া নিয়ে এই গবেষণাটি শুরু করা হয়েছিলো। কিন্তু তা মোটেও গবেষণা-মাঠ থেকে উঠে আসা তথ্য-উপাত্তকে নির্ধারণ করেনি, বরং ইতিহাস সংক্রান্ত যে ধ্যান-ধারণা বা পূর্বানুমানগুলো ছিলো সেগুলো নিষিক্ত কিংবা পরিবর্তিত হয়েছে গবেষণা-মাঠ কর্মের সঙ্গে।

১.১০) অভিসন্দর্ভের কাঠামো

অভিসন্দর্ভটিতে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। 'বিষয় ও উদ্দেশ্য : সময়, সমাজ ও চলচ্চিত্র' শিরোনামের প্রথম অধ্যায়ে এই গবেষণার বিষয় বিবরণ, গবেষণা সমস্যা, গবেষণার উদ্দেশ্য, তাত্ত্বিক পরিসর, গবেষণার

যৌক্তিকতা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের চরিত্র ও প্রবণতাসমূহ, চলচ্চিত্রের শ্রেণিকরণ, চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ও গবেষণা পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের টাইটেল 'ষাটের দশক : প্রযুক্তির জাদু-বাস্তবতা'। পশ্চিম থেকে আসা নতুন মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক জাদুময়তা এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়। চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক জাদু-বাস্তবতার এই সময়ে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের অভাব ছিলো না; বরং সেসময় যথেষ্ট প্রেক্ষাগৃহ ও চলচ্চিত্রই নির্মাণ হয়নি। এই সময়ের চলচ্চিত্রের আধেয়ের ক্ষেত্রে দুইটা বিষয় মাথায় রাখতে হয়েছে। এর একটি গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের যে উপাখ্যান যেমন, যাত্রা-পালাগান, রূপকথা, পরিচিত সাহিত্য ইত্যাদিকে জাদু-বাস্তবতায় উপস্থাপন করা। অন্যটি শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি—যারা তখনো পুরোপুরি বিকশিত নয়—তারাও তাদের জীবনকে চলচ্চিত্রে নির্মাণের চেষ্টা শুরু করেন। জাদু-বাস্তবতা, গ্রামীণ উপাখ্যান ও শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিজের গল্প বলার চেষ্টা এই তিন মিলে ৬০-র দশকে তখনকার রাজনৈতিক ইতিহাস ছাপিয়ে সামাজিক ইতিহাসের টানাপড়েন চলচ্চিত্রে হাজির হয়েছে।

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে 'সত্তরের দশক : সমাজ বাস্তবতার পুনরাবিষ্কার'; 'আশির দশক : বিনোদন বাণিজ্য'; 'নব্বই দশক : বিপর্যস্ত বাণিজ্য ও পুরুষালি বিনোদন ' ও 'একুশ শতকের পরিস্থিতি ও প্রবণতা' টাইটেলে আলোচনা হয়েছে। ৭০ দশকে রাষ্ট্রবিপ্লবের একটা উচ্ছ্বাস ছিলো। কিন্তু এই দশককে বুঝতে হলে মুক্তিযুদ্ধের স্পৃহা, অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড-রক্তপাত-হানাহানি ও সামরিকায়নকে গুরুত্ব দিতে হয়। ফলে এই দশকে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ছিলো, তেমনি শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিজেদের সমাজ-বাস্তবতা নতুন করে আবিষ্কারের একটা আগ্রহ ছিলো। কিন্তু দুটোর সমন্বয় না হওয়ায় এই দশকের শেষে রাষ্ট্রীক প্রকল্প হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা দিনশেষে সফলতার দিকে এগোয়নি।

রাষ্ট্রপ্রকল্পের এই ব্যর্থতায় ৮০'র দশকে ব্যাপক বিনোদন বাণিজ্য শুরু হয়। তৎকালীন সামরিক শাসন দর্শক সত্তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। ব্যাপক বিনোদন বাণিজ্যের ফল হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহ তার ভিত্তি হারাতে থাকে। এর ফলে প্রেক্ষাগৃহ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী দর্শক কমতে শুরু করে। বিপর্যস্ত চলচ্চিত্র বাণিজ্যের এই ধারাকে ৯০ দশকের শুরুতে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকে আর সারিয়ে তোলা যায়নি। ফলে ৯০ দশকের শেষে নারী দর্শকবিহীন প্রেক্ষাগৃহে সহিংস ও যৌনবিনোদন শুরু হয়। শূন্য দশকে গিয়ে তা চরম আকার ধারণ করে। প্রেক্ষাগৃহ তার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চরিত্র পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। সারাদেশে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা কমে প্রায় শূন্যের কোটায় পৌঁছে, চলচ্চিত্র নির্মাণও কমে যায়। এর সমান্তরালে ৭০ ও ৮০'র দশকের একটি

পক্ষের উত্তরাধিকার নতুন ধরনের চলচ্চিত্র, সিনেপ্লেক্স বাণিজ্য ও ইন্টারনেট ভিত্তিক বিনোদনে সম্পৃক্ত হয়। সেই বিনোদনে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত প্রবলভাবে উপস্থিত থাকলেও গণমানুষের অবস্থান নেই বললেই চলে। এ রকম একটা বোঝাপড়ার আলোকে এই অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস নিয়ে একটি পরিসর গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে। যা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান, পর্যালোচনা অথবা নতুন কোনো গবেষণাকর্মে সহায়তা করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

এই অভিসন্দর্ভের শেষ অংশে সাতটি নির্ঘণ্টে ধারাবাহিকভাবে গবেষণা আখ্যানের তথ্য-উপাত্তের থিমেটিং ইনডেক্সিং ও প্রাবল্যের ক্রম; বিষয় ধরে সেই সব থিমের বিন্যাস; আখ্যানের তথ্য-উপাত্তে দর্শক স্মৃতিতে থাকা তারকা-কুশীলবদের প্রাবল্য; এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মের অংশগ্রহণকারীদের তালিকা; নিবিড় সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা ও পরিচয়; আখ্যান থেকে পাওয়া চলচ্চিত্র ও তার প্রাবল্য; এবং একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ন্যারেটিভের নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ষাটের দশক : প্রযুক্তির জাদু-বাস্তবতা

২.১) সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় ৫০ ও ৬০-এর দশক। ৫০ দশকের শুরুতেই ভাষা আন্দোলনের মতো একটি বৃহৎ ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষাকেন্দ্রিক একটি নতুন জাতিসত্তার বীজ বোনা হয়। বাঙালি মুসলমান মানে পূর্ববঙ্গীয় সংখ্যাগারিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের যে সংহতি, সেটা ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী কয়েক বছরে দানা বেঁধেছিলো। এই পরিক্রমার শুরুর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫০ সালে চারুকলা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫৪–৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে যে সাস্কৃতিক তৎপরতা, সংস্কৃতি সংসদের যে আন্দোলন, তার বেশিরভাগ ঘটেছে এই সময়টাতেই।

এদিকে ৪৭ পূর্ববতী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবস্থা সেখানে বাঙালি হিন্দু ছাত্রদের আধিপত্য ছিলো। কিন্তু ৫০ দশকের পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তরা মাইগ্রেট করে পশ্চিম বাংলা ও অন্যান্য জায়গায়; ফলে একটাবড়ো শিক্ষিত বাঙালি জনগোষ্ঠী—যারা বাঙালি হিন্দু, তারা চলে যাওয়াতে পূর্ববঙ্গে একধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। সেই ফাঁকা জায়গাটা দখল করে শিক্ষিত, ইংরেজি জানা বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত—যারা এসেছেন গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতির রূপান্তরের ফলে। ১৯২০-এর দশক থেকে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রভাবে মধ্যবিত্তের যে বিকাশ হচ্ছিল তার একটা পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ৫০-এর ঢাকায় পাওয়া যায়।

এসব ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব চলচ্চিত্রসহ আরো অনেক ক্ষেত্রেই পড়ে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় বিকশিত হচ্ছিল, তার ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্র একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়। এছাড়া শহুরে নতুন মধ্যবিত্তরাও নানাভাবে চলচ্চিত্রকে প্রভাবিত করতে থাকেন।

এই দশকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে স্থাপিত নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সবগুলোর মালিকানা ছিলো অবাঙালি মুসলমানদের হাতে। আর স্থানীয় মুসলমানদের হাতে ছিলো ছোটোখাটো দোকান আর ক্ষুদ্র ব্যবসা (আহমেদ ২০০৭, পৃ১৩৩)। বাঙালি মুসলমান যুবকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ফলে বহু

যুবক জাতীয় কর্মকাণ্ডের পুরোভাগে এগিয়ে আসতে থাকেন। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এদের অনেকেই উচ্চ সরকারি চাকুরিতে আসীন হন এবং অন্যান্য পেশাতেও উন্নতি লাভ করেন। তবে ১৯৬২ সালের মধ্যেই তরুণ মুসলমান বাঙালিরা সরকারি অফিস-আদালতে নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠা করে নেন (Dani 1962, p156)। শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ একটি নব্য পেশাদারি ও চাকুরিজীবী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম দেয়। ৫০ ও ৬০ দশকজুড়ে শহর ও নগরগুলোতে বাঙালি নতুন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই নানা দিকে প্রতিনিধিত্ব করেছে।

৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের যে বিজয় তা গ্রাম থেকে আসা ওই নতুন শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিদের বিজয়। তারা মূলত জয় পেয়েছিলো মুসলিম লীগের বিপক্ষে। সেই সময় মুসলিম লীগরা ছিলেন জমিদার, বনেদী পরিবার, তাদের প্রচুর ভূ-সম্পতি, টাকা পয়সা ছিলো, এমনকি অনেকে উর্দুতে কথা বলতেন। এটার একটা প্রভাব কিন্তু খুব বড়োভাবে পূর্ববঙ্গের কালচারাল ইন্ডাস্ট্রির ওপর পড়েছে। গবেষক, নির্মাতা জাকির হোসেন রাজুর সঙ্গে কথা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কক্ষে বসে। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি জোর দিয়ে বলেন, ৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের বিজয় যদি না হতো, তাহলে হয়তো আবদুল জব্বার খান 'ডাকাত' গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের সাহসই করতেন না (আখ্যানের ক্রম ৫.৩; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)। কারণ সাংস্কৃতিকভাবে যে সমর্থন সেসময় চলচ্চিত্রকে দেয়া দরকার ছিলো তা নব্য শহুরে মধ্যবিত্ত ছাড়া হয়তো সম্ভব ছিলো না।

১৯৬৪ সালে ঢাকায় আসে প্রথম টেলিভিশন। নতুন মাধ্যম হিসেবে তা প্রভাব ফেলতে শুরু করে। কিন্তু তখনো সেটা "বাঙালী শহুরে মধ্যবিত্তের অবসর বিনোদনের জন্য অন্তঃসারশূন্য এক ইলেকট্রনিক মাধ্যম" (মাহমুদ ১৯৯২, পৃ১০) হয়ে ওঠেনি। সরকারি নির্দেশে সরকারি সম্প্রচার মাধ্যমে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হয় ১৯৬৫ সালে। ৬০ দশকজুড়ে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের ফলে 'সমকাল' ও 'কণ্ঠস্বর' এর মতো প্রতিনিধিত্বশীল পত্রিকা পাওয়া যায়। যে পত্রিকাকে আশ্রয় করে ওই দশকে সাহিত্যের ধারাটি প্রবাহমান ছিলো।

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ছিলো পুঁজিবাদী এবং অর্থনীতি ছিলো মূলত ধনতান্ত্রিক। সেহেতু সরকারি চাপে শিল্পাঙ্গন একটি পুঁজিবাদী কাঠামোতে রূপ নিচ্ছিল। এই সময়ের পুঁজিপতিদের একটা অংশই মূলত চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ শুরু করে। স্বাভাবিক কারণেই নব্য এই প্রযোজকদের অধিকাংশেরই প্রধান লক্ষ্য ছিলো মুনাফা। তারা নতুন এই ব্যবসাটিকে ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই মুনাফা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এর একটা প্রভাব ৬০ দশকের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির ওপরে ছিলো।

এছাড়া নতুন গড়ে ওঠা এই শহুরে মধ্যবিত্ত তখনো সেই অর্থে কোনো পরিচয় নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। একদিকে তাদের চলচ্চিত্র নিয়ে যেমন ধর্মীয় ভয় ছিলো, আবার চলচ্চিত্রকে তারা নানাভাবে আপন করেও নিয়েছিলো। তবে সিংহভাগই শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য প্রেক্ষাগৃহ ছিলো একমাত্র বিনোদন

কেন্দ্র। আবার এটাও ঠিক যে দিনশেষে "মধ্যবিত্ত সবকিছুকেই একটা সীমার মধ্যে রাখতে চাইতো" (আহমেদ ১৯৯৮, পৃ৭৫)।

এই দশকেই ছয় দফা দাবি ওঠে। ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে সব মত ও আদর্শের ছাত্রদের নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এ ছাত্র আন্দোলন রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে বাহ্যিক সমর্থনের সঙ্গে শিল্পশ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্তসহ সমাজের সব স্তরের জনগণের সক্রিয় সমর্থন পায়। তারই ফল হিসেবে আসে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। যা চরম পরিণতির দিকে যায় এই দশকের শেষভাগে।

২.২) একনজরে ৬০ দশকের চলচ্চিত্র

মধ্য ৫০ থেকে ৬০-এর দশকে মুক্তি পেয়েছে মোট ১৬৩টি চলচ্চিত্র (আলম ২০১১ ও কাদের ১৯৯৩)। এর মধ্যে ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত পাঁচটি আর বাকিগুলো ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে মুক্তি পায়। মূলত মধ্য ৫০-এ আবদুল জব্বার খানের *মুখ ও মুখোশ* দিয়ে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান মানে পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চলচ্চিত্রযাত্রা শুরু হলেও এর বিকাশ ঘটেছে ৬০-এর দশকজুড়ে। তাই ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এই সময়টাকে আলাদা করে বিবেচনায় না নিয়ে ৬০-এর দশকের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে *মুখ ও মুখোশ* এর নির্মাণ সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। কারণ পূর্ববঙ্গে সাধারণ মানুষের যে চলচ্চিত্রিক উপস্থিতি সেটা প্রথমবার দেখা যায় *মুখ ও মুখোশ*-এ। সেটা কেবল শারীরিকভাবে নয়, সাংস্কৃতিকভাবেও এই বঙ্গের মানুষের এটাই সেলুলয়েডে প্রথম উপস্থিতি। গবেষক জাকির হোসেন রাজু *মুখ ও মুখোশ* এর গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে বলেন,

> লুঙ্গি পরা যে বাঙালি তারা নেই—এর আগে ভারতে যে ফিল্ম মেকিং হয়েছে ১৯১০–১৯২০ সালের দিক থেকে, ১৯১৯ সালে প্রথম ওদের ফিচার ফিল্ম হয়েছে, কিংবা কলকাতায় আমাদের ওবায়দুল হক যে ছবি করেছেন *দুঃখে যাদের জীবন গড়া* (১৯৪৩), সেখানেও সবাই ধুতি পরা বাঙালি। আমি বলতে চাচ্ছি, তারা হলো বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক। কিন্তু সত্যিকার অর্থে পূর্ববঙ্গের যে কাদামাটির বাঙালি, যারা লুঙ্গি পরে 'চাষা'র ভাষায় কথা বলে, সেই বাঙালির প্রথম দেখা আমরা পেয়েছি *মুখ ও মুখোশ*-এ। সেই জন্য আমাদের যে কালচারাল আইডেনটিটি, পূর্ববঙ্গীয় মেজরিটি বাঙালি মুসলমানের যে কালচারাল আইডেনটিটি সেটা প্রথমবার আমরা সিনেমার পর্দায় দেখতে পেলাম *মুখ ও মুখোশ*-এর মধ্য দিয়ে (আখ্যানের ক্রম ৫.৩; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

মধ্য ৫০-এ *মুখ ও মুখোশ* নির্মাণের পর থেকে ধীরে ধীরে চলচ্চিত্র মুক্তির হার বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৬ তে *মুখ ও মুখোশ* মুক্তির পর পরবর্তী চলচ্চিত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯৫৯ পর্যন্ত। সে বছর মুক্তি পায় চারটি; এরপর ১৯৬২ তে পাঁচটি, ১৯৬৪ তে ১৬টি এবং ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ এ মুক্তি পেয়েছে যথাক্রমে ৩৪ ও ৩২টি চলচ্চিত্র। এই দশকের চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো **উর্দু ভাষায় চলচ্চিত্রের আধিক্য** এবং **দেশীয় যাত্রা ও লোককাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ**। ১৯৬৫ সালের পর দেশীয় যাত্রা ও লোককাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ বেড়ে যায়।

ছবি : সংগৃহীত

এই দশকের ব্যবসা সফল প্রথম চলচ্চিত্র মুস্তাফিজ পরিচালিত *হারানো দিন* (১৯৬১)। (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৬৫) তবে এহতেশামের *এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯) ও *রাজধানীর বুকে* (১৯৬০) এর সাফল্য চলচ্চিত্রের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এই শিল্পে ব্যাপক আর্থিক সাফল্য নিয়ে নতুন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করে উর্দু ভাষার *চান্দা* (১৯৬২)। এই সাফল্যে নির্মাতারা আগ্রহী হলে পরের বছর মুস্তাফিজের

তালাশ (১৯৬৩) ব্যাপক ব্যবসা করে। এর মধ্যেও ১৯৬৪ সালে সুভাষ দত্তের *সুতরাং* দর্শকপ্রিয়তা পায়। এছাড়া নায়ক রহমান পরিচালিত উর্দু চলচ্চিত্র *মিলন*ও (১৯৬৪) ভালো ব্যবসা করে (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৬৬)। ১৯৬২-তে আরেকটি চলচ্চিত্র ব্যবসা করেছিলো, আব্দুল জব্বার খানের ফ্যান্টাসি ধারার *জোয়ার এলো* (১৯৬২) (কবির ১৯৮১, পৃ৭)। এছাড়া উর্দু ভাষায় মুস্তাফিজ নির্মিত *মালা*ও (১৯৬৪) ভালো ব্যবসা করে।

এই দশকের সবচেয়ে ব্যবসা সফল ও আলোচিত চলচ্চিত্র সালাহউদ্দিনের *রূপবান* (১৯৬৫)। *মুখ ও মুখোশ* যেমন পূর্ববঙ্গের চলচ্চিত্রে একটা নতুন মাত্রা এনেছিলো, *রূপবান* সেটাকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নেয়। কারণ *রূপবান*-ই প্রথম একেবারের পূর্ববঙ্গের নিজস্ব উপাদান নিয়ে চলচ্চিত্রে হাজির হয়। দর্শকও *রূপবান*কে গ্রহণ করে ভালোভাবে। আরো পরে খান আতাউর রহমানের *রাজা সন্ন্যাসী* (১৯৬৬), নজরুল ইসলামের *আপন দুলাল* (১৯৬৬), জহির রায়হানের *বেহুলা* (১৯৬৬) মোটামুটি ব্যবসা করে।

এছাড়া এহতেশামের উর্দু ভাষার *চকোরী* (১৯৬৭), রহমানের *দরশন* (১৯৬৭) ও খান আতাউর রহমানের ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র *নবাব সিরাজউদ্দৌলা* বিপুল ব্যবসা করে (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৬৭)। " ... খান আতাউর রহমানের *নবাব সিরাজউদ্দৌলা* (১৯৬৭) সম্ভবত প্রথম ছবি যেখানে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চেতনার লক্ষণ প্রথম চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করে" (মজহার ২০১১)। এছাড়া ১৯৬৮ সালে খান আতার প্রযোজনায় দিলীপ সোমের *সাত ভাই চম্পা* মুনাফার দিক থেকে রেকর্ড গড়ে।

এই দশকে মোটামুটি ব্যবসা সফল আরো কয়েকটি চলচ্চিত্র হলো—*কার বউ* (১৯৬৬), *ডাকবাবু* (১৯৬৬), *আনোয়ারা* (১৯৬৭), *আগুন নিয়ে খেলা* (১৯৬৭), *অরুণ বরুণ কিরণ মালা* (১৯৬৮), *এতটুকু আশা* (১৯৬৮), *ময়না মতি* (১৯৬৯), *নীল আকাশের নীচে* (১৯৬৯), *অবাঞ্ছিত* (১৯৬৯), *মনের মত বউ* (১৯৬৯)। অন্যদিকে ব্যবসায়িকভাবে ব্যর্থ হলেও নান্দনিক বিচারে এই সময়ে *জাগো হুয়া সাভেরা*, *কাঁচের দেয়াল*, *নদী ও নারী* সফল চলচ্চিত্র ছিলো (Kabir 1979, p41)। এই ধরনের চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা এতে খানিক হতাশ হন। সবমিলে এই দশকের চলচ্চিত্রে কয়েক ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়:

প্রথমত, পূর্ববঙ্গের নিজস্ব চলচ্চিত্র নির্মাণ ও সেটাকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা;

দ্বিতীয়ত, কিছু চলচ্চিত্র ব্যবসা না করতে পারায় প্রযোজক ও নির্মাতাদের হতাশা;

তৃতীয়ত, উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং কিছু চলচ্চিত্র ব্যবসা করা;

চতুর্থত, দেশীয় লোককাহিনি নিয়ে *রূপবান* (১৯৬৫) নির্মাণ এবং রেকর্ড পরিমাণ ব্যবসা;

পঞ্চমত, *রূপবান*-এর পরের বছরগুলো ঘুরেফিরে লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ।

৬০ দশকের শুরুতে নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যে যেমন সামাজিক ঘরানা ছিলো, তেমনই সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রও ছিলো। *মুখ ও মুখোশ* ও *আসিয়া*র ধারায় পরবর্তী সময়ে অল্প কিছু সামাজিক ধারার চলচ্চিত্র

নির্মাণ হয়। এসব চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে *আকাশ আর মাটি*, *মাটির পাহাড়*, *রাজধানীর বুকে*, *এদেশ তোমার আমার*, *সূর্যস্নান*, *কাঁচের দেয়াল*, *কখনো আসেনি*, *ধারাপাত*, *সুতরাং*, *নদী ও নারী*। চলচ্চিত্রগুলোতে সামাজিক মূল্যবোধ তুলে ধরার একটা চেষ্টা ছিলো। যদিও পূর্ববঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাণের একেবারে শুরুর দিকে তার সামাজিক ঘরানা নিয়ে সমালোচনা (মাহমুদ ১৯৯২) (মুৎসুদ্দী ১৯৮৭) করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু চলচ্চিত্রের এই ধরন নিয়ে সাধারণ দর্শকের খুব বেশি সমস্যা হয়েছিলো বলে মনে হয়নি; কারণ তারা এসব চলচ্চিত্র দেখেছিলো।

পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের কৃতিত্ব সাদেক খানের। হুমায়ন কবীরের উপন্যাস 'নদী ও নারী' নিয়ে তিনি নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র *নদী ও নারী* (১৯৬৫)। ১৯৬৫ সালে *রূপবান* নির্মাণের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্রের ধরন কিছুটা একমুখী মানে লোককাহিনিভিত্তিক হয়ে পড়ে। এর বাইরে ঐতিহাসিক কাহিনি নিয়ে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। *নবাব সিরাজউদ্দৌলা* (১৯৬৭) এবং *তিতুমীর* (১৯৬৮) এই ধারায় উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র। মোটাদাগে ৬০ দশকে **চার ধরনের চলচ্চিত্রের** প্রাধান্য দেখা যায়—**১. উর্দু ভাষার চলচ্চিত্র, ২. লোক-কাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র ৩. সামাজিক চলচ্চিত্র ও ৪. ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র**।

সারণী ২.১.১ : ৬০ দশকের চলচ্চিত্র ও দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
১.	চান্দা	৪	১৯৬২	এহতেশাম
২.	জোয়ার এলো	১	১৯৬২	আব্দুল জব্বার খান
৩.	সূর্যস্নান	১	১৯৬২	সালাহউদ্দিন
৪.	তালাশ	৪	১৯৬৩	মুস্তাফিজ
৫.	সুতরাং	৪	১৯৬৪	সুভাষ দত্ত
৬.	সঙ্গম	১	১৯৬৪	জহির রায়হান
৭.	**রূপবান**	**১০**	**১৯৬৫**	**সালাউদ্দিন**
৮.	বেহুলা	৫	১৯৬৬	জহির রায়হান
৯.	ডাকবাবু	১	১৯৬৬	মুস্তাফিজ
১০.	কাগজের নৌকা	২	১৯৬৬	সুভাষ দত্ত
১১.	আয়না ও অবশিষ্ট	১	১৯৬৭	সুভাষ দত্ত
১২.	চকোরি	১	১৯৬৭	এহতেশাম
১৩.	কাঞ্চনমালা	১	১৯৬৭	সফদার আলী ভূঁইয়া
১৪.	দুই ভাই	১	১৯৬৭	আমজাদ হোসেন, নুরুল হক, মুস্তাফিজ প্রমুখ
১৫.	নয়নতারা	২	১৯৬৭	কাজী জহির
১৬.	আবির্ভাব	২	১৯৬৮	সুভাষ দত্ত
১৭.	**এতটুকু আশা**	**৯**	**১৯৬৮**	**মিতা**
১৮.	সাত ভাই চম্পা	৩	১৯৬৮	খান আতাউর রহমান
১৯.	রাখালবন্ধু	৫	১৯৬৮	ইবনে মিজান
২০.	নীল আকাশের নীচে	৮	১৯৬৯	মিতা
২১.	ময়নামতি	৮	১৯৬৯	কাজী জহির
২২.	জোয়ারভাটা	১	১৯৬৯	খান আতাউর রহমান

এদিকে গবেষণা আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত থেকে ৬০ দশকে (সারণী ২.১.১) মোট ২২টি চলচ্চিত্রের নাম পাওয়া যায়। এই তালিকায় যেমন সামাজিক ঘরানার চলচ্চিত্র আছে, তেমনি লোককাহিনি, উর্দু ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রও আছে। দর্শক স্মৃতির প্রাবল্য বিচারে সবচেয়ে বেশিবার এসেছে *রূপবান*-এর নাম, দ্বিতীয় অবস্থানে আছে *এতটুকু আশা*। বাকি চলচ্চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের যে উপাখ্যান যেমন, যাত্রা, পালাগান ইত্যাদিকে জাদু-বাস্তবতা ব্যবহারে উপস্থাপন যেমন একদিকে হয়েছে। অন্যদিকে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত—যারা তখনো পুরোপুরি বিকশিত নয়—তারাও তাদের জীবনকে চলচ্চিত্রে নির্মাণ করতে শুরু করেছিলেন। প্রযুক্তির জাদু-বাস্তবতা, শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিজের গল্প বলার চেষ্টা ও গ্রামীণ উপাখ্যান এই তিনটি বিষয় ৬০ দশকের বাংলাদেশে তার রাজনৈতিক ইতিহাসকে ছাপিয়ে সামাজিক ইতিহাসের টানাপড়েন নিয়ে চলচ্চিত্রে হাজির হয়েছে।

২.৩) চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর

শুরু থেকেই রাষ্ট্র ও পুঁজির সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক বেশ গভীর। রাষ্ট্র যেমন নিজের স্বার্থে চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করেছে, আবার পুঁজি প্রাধান্যশীল মাধ্যম চলচ্চিত্রও প্রয়োজনে রাষ্ট্রের কাছে গেছে। এই সুযোগে রাষ্ট্র তার প্রয়োজন মতো নিয়ন্ত্রণ করেছে চলচ্চিত্রকে। বৃটিশ শাসিত ভারতেই চলচ্চিত্রের ওপর নেমে এসেছিলো কঠোর নিয়ন্ত্রণ। **১৯১৮ সালে ভারতে প্রথম সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট তথা সেন্সরশিপ ব্যবস্থা চালু হয়** (খান ১৯৭০, পৃ১২১)।

এই সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট অনুসারেই ১৯২০ সালে মুম্বাই, কলকাতা ও রেঙ্গুনে পৃথক পৃথক বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সর প্রতিষ্ঠা হয়। বৃটিশ সরকার অবিভক্ত ভারতে সেন্সরশিপ আরোপ করেছিলো তার উপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার্থে। এই সময়ে জাতীয়তাবাদের উত্থানে চলচ্চিত্রের প্রভাব সম্পর্কে বৃটিশরা সচেতন হয়। ফলে বৃটিশ সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চলচ্চিত্রের ছাড়পত্র দিতে শুরু করে।

বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সর ১৯২১ সালে কোহিনূর ফিল্মস এর *ভক্ত বিধুর* এবং ভারতীয় পটভূমিতে নির্মিত মার্কিন চলচ্চিত্র *ত্রিশত্রম সাহিক* নিষিদ্ধ করে। সেন্সরের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থেকে রেহাই পায়নি সোভিয়েত নির্মাতা আইজেনস্টাইনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র *ব্যাটলশিপ পটেমকিন*। মুম্বাইয়ের তৎকালিন পুলিশ কমিশনার *ব্যাটলশিপ পটেমকিন* দেখে মন্তব্য করেছিলেন—"এই ছবি বিশেষভাবে বলশেভিক বিপ্লবের সমর্থনে এবং সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষকে উচ্ছেদ করতে ইঙ্গিত দিচ্ছে" (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৮৫)।

১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতে নির্মাণ হয় সর্বমোট ২৭৫৩টি চলচ্চিত্র (খান ১৯৭০, পৃ১২৩)। এসব চলচ্চিত্রের ছাড়পত্র দেওয়া ছাড়াও এই সময় বেশ কিছু সংখ্যক চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার চলচ্চিত্রের প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণে ১৯১৮ সালের সিনেমাটোগ্রাফ আইনটি অভিযোজন করে নেয় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৮৫)। এসময় করাচিতে একটি সেন্সর বোর্ড ছিলো। ১৯৬০

সালে পাকিস্তান সরকার ‘চলচ্চিত্র তথ্যানুন্ধান কমিটি’ গঠন করে। কমিটি পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সেন্সর প্রথা প্রবর্তনের সুপারিশ করে (ফিল্ম ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট, ১৯৬১)। এই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬৩ সালের ১২ আগস্ট প্রণীত হয় পাকিস্তানের চলচ্চিত্র সেন্সর বিধি। সদ্য গঠিত সেন্সরবোর্ড পাকিস্তানের সর্বত্র প্রযোজ্য একটি সুসংহত নীতিমালা অনুসরণ করে।

এফ ডি সি'র প্রথম চলচ্চিত্র ফতেহ লোহানীর *আসিয়া* নির্মাণের পর ছাড়পত্রের জন্য সেন্সর বোর্ডে জমা দেওয়া হলে বোর্ড কয়েকটি জায়গা নিয়ে আপত্তি তোলে। বিশেষ করে নায়কের শৈশবের খেলার সাথী ও প্রেমিকা আসিয়ার বিয়ে হয় নায়কেরই চাচার সঙ্গে। বিয়ের পরও দুজনের প্রেম অব্যাহত থাকে। সেন্সর বোর্ড এই প্রেম প্রদর্শন নিয়ে প্রশ্ন তোলে, কিন্তু নির্মাতা ‘গোপন’ প্রেমের এই দৃশ্য কেটে ফেলতে রাজি হননি। তার যুক্তি ছিলো এতে চলচ্চিত্রটির বাস্তবতা ক্ষুণ্ন হবে (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ ৬১–৬২)। *আসিয়া* শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায় ১৯৬০ সালের ৪ নভেম্বর।

পূর্ব বাংলায় জাতীয় পর্যায়ে চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৯৬১ সালের এপ্রিলে। এই পুরস্কার ‘প্রেসিডেন্ট’স ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড’ নামে পরিচিত ছিলো। ১৯৬১ সালের জুনে পাকিস্তানের বাগে জিন্নাহতে এই পুরস্কার দেন তৎকালিন তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হাবিবুর রহমান। ‘প্রেসিডেন্ট’স ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড’ এ প্রথমবারের মতো শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কার পায় ফতেহ লোহানীর *আসিয়া*। *সাহেলী* শ্রেষ্ঠ উর্দু ভাষার চলচ্চিত্র হিসেবে এবং অন্যান্য সব পুরস্কার পশ্চিম পাকিস্তানের চলচ্চিত্র, শিল্পী ও কলাকুশলীরা পায়। “‘আসিয়া’র পুরস্কার প্রাপ্তি ছিল বাংলা ছবির প্রতি এক বিরাট স্বীকৃতি। এর ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্র শিল্পে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়” (কাদের ১৯৯৩, পৃ৫৬০)। তবে পূর্ব পাকিস্তানের একটি মাত্র চলচ্চিত্রকে পুরস্কার দেওয়ার এই প্রবণতা দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না পাকিস্তান সরকার এর মধ্য দিয়ে একটা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেছে। যদিও পরবর্তী সময়ে তারা পুরস্কারের এই ধারা আর অব্যাহত রাখেনি।

৫২'র ভাষা আন্দোলনের পর পূর্ব পাকিস্তানে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র স্টুডিও স্থাপনের দাবি জোরদার হয়। তবে পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ী নয় এমন চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা চাইতো না পূর্ব পাকিস্তানে কোনো চলচ্চিত্রশিল্প গড়ে উঠুক। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পতন হয়। ক্ষমতায় আসে যুক্তফ্রন্ট সরকার। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান শেখ মুজিবুর রহমান। ঢাকায় একটি স্থায়ী চলচ্চিত্র স্টুডিও স্থাপনের ব্যাপারে তার সঙ্গে আলোচনা করেন আবদুল জব্বার খান, ড. আবদুস সাদেক, নূরুজ্জামান প্রমুখ।

শেখ মুজিব তাদেরকে স্টুডিও স্থাপনের ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা পেশ করতে বলেন (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ৫৭)। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার চলচ্চিত্রশিল্প প্রসারের লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনার ঘোষণা দেয়। এরপর নানা ঘটনাার মধ্য দিয়ে ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল প্রাদেশিক আইন

পরিষদের অধিবেশনের শেষ দিনে শেখ মুজিব 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' বিল উত্থাপন করেন। সামান্য সংশোধনীর পর বিনা বাঁধায় বিলটি আইন পরিষদে অনুমোদন হয়।

এফ ডি সি প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগকে নির্মাতা আলমগীর কবির ব্যাখ্যা করেন খানিকটা ভিন্নভাবে। তার ভাষায়, এর "মূল উদ্দেশ্য ছিল অবশ্যই ষড়যন্ত্রমূলক। সীমিত কলেবরের এই শিল্পের উদ্দেশ্য হবে বছরে গোটাকয়েক যেনতেন ধরনের বাংলা ছবি করে কলকাতার বাংলা ছবি আমদানি বন্ধ করার সুযোগ তৈরি করা। চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রকরণে পূর্ণ অনভিজ্ঞতা এবং সীমিত প্রাদেশিক বাজারের কারণে এসব বাংলা ছবি কোনদিনই উর্দু ছবির প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে না—কেবল এ ধরনের একটা হিশেবই শাসকদের ছিল না, তাদের লক্ষ্য ছিল আরো সুদূরপ্রসারী" (কবির ২০১৮, পৃ১০৮–১০৯)। যদিও এর কোনোটিই পরে হয়নি। প্রতিষ্ঠান হিসেবে এফ ডি সি একটু দেরিতে হলেও পূর্ববঙ্গে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিলো।

প্রতিষ্ঠার পরপরই এফ ডি সি'তে চারটি চলচ্চিত্রের কাজ শুরু হয়—ফতেহ লোহানীর *আসিয়া* ও *আকাশ আর মাটি*, মহীউদ্দিনের *মাটির পাহাড়*, এ জে কারদারের *জাগো হুয়া সাভেরা*। মূলত এফ ডি সি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে শুরু করে ১৯৬০ সালের পর থেকে। শুধু চলচ্চিত্র নির্মাণে সুবিধা দেওয়া নয়, এই শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে এফ ডি সি বিভিন্ন সময় আরো কিছু পদক্ষেপ নেয়। ১৯৬৫ সালে এফ ডি সি চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য একটি ফিল্ম ইন্সটিটিউট চালু করে। কিন্তু পরে তা বন্ধ হয়ে যায় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩২৮)। একই বছর ঢাকায় আয়োজন করা হয় পাকিস্তান চলচ্চিত্র উৎসব। যৌথভাবে এর আয়োজক ছিলো চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি ও এফ ডি সি।

এছাড়া "নজির সাহেব[৫] দূরদর্শী ছিলেন বলে গোড়াতেই বুঝেছিলেন যে সিনেমাকে যদি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেয়া না যায় তাহলে বিভাগ-পরবর্তী কালের মুষ্টিমেয় কয়েকটি হল নিয়ে এ দেশের চলচ্চিত্র কোনদিনই অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারবে না। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এক রিবাট পরিকল্পনাও করেছিলেন, যেটা বাস্তবায়িত হলে আজ কেবল বাংলাদেশের সব শহর-বন্দরেই সিনেমা হল থাকত না, বরং বর্ষাকালে ডুবে যাওয়া লোকালয়ের মানুষও সিনেলঞ্চের দৌলতে নিজের এলাকায় বসেই ছবি দেখতে পারতেন। বলা বাহুল্য, সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি" (কবির ২০১৮, পৃ৭৪)। ফলে সরকার নিয়ন্ত্রিত এই প্রতিষ্ঠানটি দেশীয় চলচ্চিত্রকে খুব বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারেনি। আগেই উল্লেখ

---

[৫]. পুরো নাম নজীর আহমেদ। বেতার ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব নজীর আহমেদকে তৎকালীন সরকার পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার (ই পি এফ ডি সি) নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

করেছিলাম ১৯৬৫ সালে এফ ডি সি প্রশিক্ষণের জন্য একটি ফিল্ম ইন্সটিটিউট চালু করে। কিন্তু অভিজ্ঞ শিক্ষক, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও নানা কারণে সেই ইন্সটিটিউট অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩২৮) (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ১৬৪)। তবে পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্রশিক্ষা নিয়ে এর আগেও কথা হয়েছে। *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) এর পরিবেশক ইকবাল ফিল্মস লিমিটেড প্রথমে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ১৯৫৩ সালে এই সংস্থাটি ঢাকায় পুনর্গঠিত হয়। চলচ্চিত্র গবেষক অনুপম হায়াৎ জানান[৬], ইকবাল ফিল্মস ঢাকায় পুনর্গঠনের পর তাদের কোম্পানির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে নাটক ও চলচ্চিত্রের কলাকুশলীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি ইন্সটিটিউট গঠনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছিলো। যদিও পরে সেটা বেশি দূর এগোয়নি।

এছাড়া ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা হয় ‘কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লি.’, ঢাকা। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তৎকালিন পরিচালক ড. আবদুস সাদেক পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে হবে এই উদ্দেশে কয়েকজন নিয়ে গঠন করেন এই সমিতি। এই সমিতির নয়টি উদ্দেশের মধ্যে ৯ নম্বরটি ছিলো এমন—“শিল্প সাহিত্য বিষয়ক বইপত্র প্রকাশ ও ছবি নির্মাণের কারিগরি জ্ঞানার্জনের জন্য ইনস্টিটিউট স্থাপন” (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ৩৭)। অবশ্য এরাও পরে এ নিয়ে বেশি দূর এগোতে পারেনি।

অন্যদিকে **১৯৬১ সালে উপমহাদেশের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্রশিক্ষার যাত্রা শুরু হয় ভারতের পুনে শহরে ফিল্ম ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে**। এদিকে ১৯৬৯ সালে ঢাকায় বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা হয় ‘ঢাকা ফিল্ম ইনস্টিটিউট’। এই ইন্সটিটিউটের পরিচালনা বোর্ডে ছিলেন ইফতেখারুল আলম, ফরিদা হাসান ও সৈয়দ শামসুল হক এবং অধ্যক্ষ ছিলেন আলমগীর কবির (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ১৬৪)।

তবে প্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র শিক্ষা নিয়ে নানাজনের নানা মত রয়েছে। সত্যজিৎ রায় ১৯৭৫ সালে ভারতের পুনে’র ‘ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়া’র সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডিপ্লোমাধারীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘তোমরা যতই না শিক্ষা ও জ্ঞান আহরণ করে থাক এবং অন্যের উপদেশামৃততে অভিজ্ঞ হও—তোমাদের কাজ খুব সহজ হবে না। চলচ্চিত্রকারদের যাত্রাপথে কত যে চোরা গর্ত আর ফাঁদ পাতা আছে, সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার পন্থা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তোমাদের শেখাতে পারবে না” (রায় ১৯৮১)। অন্যদিকে নির্মাতা আলমগীর কবির বলেছেন, “চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ

---

[৬]. গবেষকের সঙ্গে লেখক ও গবেষক অনুপম হায়াতের ব্যক্তিগত আলোচনার সূত্র ধরে এই তথ্যটি পাওয়া গেছে। তবে এই আলোচনাটি পরে সাক্ষাৎকার হিসেবে অনুলিখন করা হয়েছে, কিন্তু এখনো তা কোথাও প্রকাশ হয়নি।

থাকা উচিত। অভিনেতা, ক্যামেরাম্যান, সম্পাদক—সবারই এই শিক্ষা থাকা প্রয়োজন। চলচ্চিত্র একটা কৌশল (ক্রাফট)। অন্তত কাঠামোগত পরিপূর্ণতার (স্ট্রাকচারাল পারফেকশন) জন্য এ শিক্ষা একান্ত দরকার" (কবির ২০১৮, পৃ২২৮)।

তবে প্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র শিক্ষা নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষে যতো মতই থাকুক না কেনো, প্রাযুক্তিক মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রে পদ্ধতিগত শিক্ষার প্রয়োজন আছে। ৬০ দশকে পূর্ব পাকিস্তানে যারা চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাদের বেশির ভাগেরই চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ ছিলো না। অবশ্য সেই অর্থে সুযোগও কম ছিলো। এছাড়া বিনোদন মাধ্যম চলচ্চিত্রের জন্য লেখাপড়া করতে হয় এধরনের চিন্তাভাবনাও তখনকার লোকজনের মধ্যে ছিলো না বললেই চলে। কারণ তৎকালীন প্রথাগত শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও সেসময় অনেককে বেকার থাকতে হয়েছে। ফলে প্রথাগত শিক্ষারই যখন এই অবস্থা, তখন চলচ্চিত্র নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়টি দূর পরাহতই ছিলো। তারপরও সেসময়ও কেউ কেউ এ নিয়ে ভেবেছেন। সেই অল্প সংখ্যক মানুষদের একজন সিনেমাটোগ্রাফার আবদুস সামাদ। তিনি ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে ছিলেন। সেখানকার 'লন্ডন স্কুল অব ফিল্ম টেকনোলজি'তে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি নিয়ে পড়ালেখা করেন (সামাদ ১৯৭৪, পৃ৫৬)। পরে দেশে ফিরে এসে তিনি বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন।

চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকায় যে সমস্যা হয়েছে, তা বোঝা যায় অনেকের কথায়। বাংলাদেশের শুরুর দিকের চলচ্চিত্র সম্পাদকদের একজন বশির হোসেন। তিনি চলচ্চিত্র জগতে যুক্ত হন ১৯৫৭ সালে। বশির সম্পাদনার কাজ শেখেন *আকাশ আর মাটি*'র সম্পাদক প্রণব মুখার্জির কাছে। ১৯৫৮ সালে বশির স্বাধীনভাবে চিত্র সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। তার প্রথম চলচ্চিত্র এহতেশামের *এদেশ তোমার আমার*। বশির ১৯৭৪ সালে 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "আমি নিজের পেশার প্রতি অনুগত। আমার যা কিছু চর্চা সব এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই। এছাড়া বই পড়া, উন্নতমানের ছবি দেখা, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে শটের গতিপ্রকৃতি ও ট্রিটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেও যথেষ্ট লাভবান হয়েছি। তবে আবার বলছি, **পদ্ধতিগত শিক্ষা থাকলে আমার কাজের উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি পেত। আমি আজ যেখানে পৌঁছেছি দশ বছর আগেই সেখানে পৌঁছাতে পারতাম"** (হোসেন ১৯৭৪, পৃ৫৫)। তার মানে ৬০ দশকে যারা কাজ করেছেন তাদের অনেকের কাছে চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে একটা আফসোস ছিলো। কিন্তু সেই শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ সেসময় ছিলো না।

২.৪) চলচ্চিত্রের সমান্তরাল শিল্পকলা ও গণমাধ্যম

৬০ দশক ও এর আগে চলচ্চিত্রের সমান্তরালে যে মাধ্যমটি সবচেয়ে সক্রিয় ছিলো সেটি যাত্রাপালা। যাত্রার সমান্তরালে দর্শক মনে চলচ্চিত্র জায়গা করে নিয়েছিলো। যাত্রা দেখা দর্শকই পরে চলচ্চিত্রে আগ্রহী হয়েছে। ফলে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা যাত্রা নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়েছে।

এই ভাবনার শুরু ১৯৫৫ সালের দিকে জনপ্রিয় পালা 'মহুয়া'কে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের চেষ্টার মধ্য দিয়ে। পালাগান কিংবা যাত্রার কাহিনিকে চলচ্চিত্রায়ণের এটিই ছিলো প্রথম প্রচেষ্টা (বাগচী ২০০৭, পৃ১৭৮)। "সামিরা স্টুডিওর মালিক জনাব আলী এই ছবির প্রযোজক ছিলেন। ওই ছবির নায়িকা ছিলেন রাণী সরকার, চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন সাধন রায়" (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ৩৮)। কিন্তু চলচ্চিত্রটি পরে মুক্তি পায়নি।

৬০ দশকের শুরু থেকে যাত্রাপালা হিসেবে 'রূপবান' ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুধু 'রূপবান' যাত্রাপালার অভিনয়ের জন্য বেশকিছু যাত্রাদল গড়ে ওঠে। **এই জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে 'রূপবান' যাত্রার গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয়। এই গ্রামোফোনের বিক্রির পরিমাণও ছিলো অবিশ্বাস্য** (বাগচী ২০১১, পৃ৩৬)। কবি জসীমউদ্‌দীন 'রূপবান' রেকর্ডের এই সফলতাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> শুনিতে পাইলাম গত কয়েক মাসে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) রেকর্ড বিক্রি হইয়াছে। গ্রামদেশের পথে-ঘাটে বিচরণ করিলে পাঠক শুনিতে পাইবেন কোথাও না কোথাও হইতে কেহ না কেহ রূপবান যাত্রার কোন গান গাহিয়া চলিয়াছে। একাধিক জায়গায় রূপবান যাত্রার অভিনয় দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। তাহাতে দেখিয়াছি, ২০/২৫ হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সারারাত জাগিয়া এই গান উপভোগ করিয়াছে। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে এই গান বাঙালির মনে কতটা স্থান লাভ করিয়াছে (জসীমউদ্‌দীন ১৯৯৭)।

কুড়িগ্রামের কাঠালির 'স্বর্ণমহল'-এর সহকারি প্রজেক্টর অপারেটর বিজয় অধিকারী বলেন, 'আমাদের বাপ-দাদারা শুনছি যাত্রা দেখবার গেছে, ঘরে তালা দিয়া সবাই মিলি। দেখেন কী একটা মজার গল্প! সেটাতে কোনো খারাপ কিছু ছিলো না। সেটা দিয়া জ্ঞান বাড়ছে। এখন মানুষ কী দেখবে, দেখার মতো জিনিসও নাই, পরিবেশও নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২)।'

যাত্রাপালা 'রূপবান'-এর এই জনপ্রিয়তা জোরালো প্রভাব বিস্তার করে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পে। চিত্রকর্মী সফদার আলী ভুঁইয়ার অনুপ্রেরণায় সালাহ্‌উদ্দিন 'রূপবান' চলচ্চিত্রায়িত করেন। চলচ্চিত্রটি সুপারহিট হয় যাত্রা-নাটকের মতোই (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ১১৭)। *রূপবান* মুক্তি পায় ১৯৬৫ সালে ৫ নভেম্বর ঢাকার ছয়টি প্রেক্ষাগৃহে একযোগে। *রূপবান*-এর জনপ্রিয়তা নিয়ে মজার তথ্য দেন বরিশালের এস এম ইকবাল। বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের সভাপ্রধান ও এক সময়ের নিয়মিত দর্শক এস এম ইকবালের সঙ্গে কথা হয় বরিশাল প্রেসক্লাবে বসে। তার ভাষ্যমতে—'সেই সময় আরেকটা সিনেমা খুব ব্যবসা করছে *রূপবান*। তখন তো *রূপবান* যাত্রাপালাও হতো। আমি শুনেছি, রূপবান যাত্রাপালার মঞ্চে যে বাঁশটা ধরে নায়িকা রূপবান কাঁদতো, সেটাও নাকি কয়েক শো টাকায় বিক্রি হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১৪) ।'

ঢাকার পত্রপত্রিকায় সেসময় *রূপবান* নিয়ে ব্যাপক আলোচনাও হয়। *রূপবান*-এর ব্যাপারে একটা বিষয় লক্ষণীয়, 'রূপবান' যাত্রাপালা থেকে ধীরে ধীরে যান্ত্রিক রূপান্তর ও পুনরুৎপাদন হয়েছে—প্রথমে

গ্রামোফোন রেকর্ড, এরপরে চলচ্চিত্রের সেলুলয়েডে। **চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক জাদুময়তার সঙ্গে 'রূপবান'-এর চির চেনা আখ্যানের সম্মিলনে দর্শক একদিকে যেমন অভিভূত হয়েছে, অন্যদিকে অচেনা এই মাধ্যমটিকে তারা প্রথম আপন করে নিতে পেরেছিলো**। পরে অবশ্য ব্যবসায়িক কারণে চলচ্চিত্রে *রূপবান*-এর পুনরুৎপাদন হয়েছে আরো নানা নামে—*রহিম বাদশা ও রূপবান*, *আবার বনবাসে রূপবান*ও *রঙিন রূপবান*।

পাকিস্তানের লাহোরে ১৯৬৪ সালের ২৫ নভেম্বর প্রথম টেলিভিশন স্টেশন চালু হয়। একই বছরের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় টেলিভিশন স্টেশন চালু হলেও চলচ্চিত্রের সঙ্গে সেসময় তেমন কোনো সম্পৃক্ততা টেলিভিশনের ছিলো না। প্রাথমিকভাবে ঢাকার ডি আই টি ভবনের (বর্তমানের রাজউক) নীচতলা থেকে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী ১০ মাইল ব্যাসার্ধভুক্ত এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে তিন মাসের জন্য টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। তখন প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা করে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হতো। ১৯৬৮ সালে ঢাকার রামপুরায় আধুনিক টেলিভিশন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। রামপুরার নতুন টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চে।

তবে ৬০ দশকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে রেডিওর একটি সম্পর্ক ছিলো। বিশেষ করে চলচ্চিত্রের গান সম্প্রচারে এগিয়ে ছিলো রেডিও। শহর ও গ্রামের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের বিনোদনের মাধ্যম ছিলো রেডিও। **উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তের রেডিওতে চলচ্চিত্রের গান কিংবা খবর শুনতে সেসময় গ্রামের লোকজন জড়ো হতো**। চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনও রেডিওতে সম্প্রচার করা হতো। রেডিও দর্শকের একটা বড়ো অংশের বিনোদনের উপাদান ছিলো চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন ও গান।

পূর্ব পাকিস্তানের দৈনিক সংবাদপত্রে ৫০ দশকের প্রথম ভাগেই আলাদা চলচ্চিত্র পাতা চালু হয়। মূলত শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চলচ্চিত্র নিয়ে আগ্রহের কারণেই এমনটি হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। কারণ তখন দর্শকের একটা বড়ো অংশই ছিলো এরা। ১৯৫২ সালে 'দৈনিক মিল্লাত' চলচ্চিত্র নিয়ে আলাদা পাতা শুরু করে। এর কিছু দিন পর 'ফিলমিস্তান' নামে অনুরূপ পাতা প্রকাশ করে 'দৈনিক আজাদ'। 'দৈনিক ইত্তেফাক' 'রূপবাণী' নামে চলচ্চিত্রবিষয়ক পাতা প্রকাশ করে ১৯৫৪ সাল থেকে (কাদের ১৯93, পৃ৬৩৩)। শুরুর দিকে অবশ্য কেবল বিদেশি চলচ্চিত্রের খবর প্রকাশ হতো। কিন্তু *মুখ ও মুখোশ* মুক্তির পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

দৈনিক পত্রিকার বাইরে অনেকগুলো মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাও তখন প্রকাশ হয়, যেগুলোর মূল আধেয় ছিলো চলচ্চিত্রবিয়ষক নানা উপাদান। এসব পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'। দৈনিক পত্রিকার আকারে চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি নিয়ে 'চিত্রালী' প্রথম পরীক্ষামূলক প্রকাশ হয় ১৯৫৩ সালের ১৩ জুন। ১৯৬০ সাল থেকে 'চিত্রালী' অবজারভার প্রকাশনীর পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ হতে থাকে (হায়াৎ

১৯৮৭, পৃ১৪১)। এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের জন্মের আগে থেকে এই পত্রিকাটি চিত্রনির্মাণ, চিত্র সাংবাদিকতা তথা এদেশের শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রবিষয়ক প্রথম গবেষণাধর্মী পত্রিকা 'ধ্রুপদী'র প্রকাশকাল ১৯৬৭ সাল। চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক, কারিগরি এবং অন্যান্য দিক নিয়ে গবেষণামূলক লেখা সমৃদ্ধ 'ধ্রুপদী' শুধু বাংলাদেশেই নয়, উপমহাদেশের অন্যতম উচ্চমানের চলচ্চিত্র পত্রিকা ছিলো। এই পত্রিকার অধিকাংশ লেখাই ছিলো তথ্য ও তত্ত্ববহুল, শিল্পগুণ সম্পন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত। তবে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ফসল এই পত্রিকায় দেশীয় চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা খুব কমই প্রকাশ পেয়েছে। কারণ এরা হয়তো শিল্প-নান্দনিক বিচারে এই চলচ্চিত্রগুলোকে আমলেই নেয়নি। যা পরবর্তী দশকগুলোতেও অব্যাহত ছিলো। এবং এর একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ছিলো পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে।

২.৫) হিন্দি ও অন্য ভাষার চলচ্চিত্র আমদানি

৪৭-এ দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গে প্রচুর বিদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয়। পাকিস্তান আমলে এসে বিতর্ক সৃষ্টি হয় এসব চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক প্রদর্শনী নিয়ে। দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্পের বিকাশের স্বার্থে বিদেশি চলচ্চিত্র আমদানি ও প্রদর্শন বন্ধের জন্য স্বাধীনতার আগে দেশে বহুবার ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ হয়, এমনকি বিষয়টি সেসময় আদালত এবং জাতীয় পরিষদ পর্যন্ত গড়ায় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪২৯)। তবে চলচ্চিত্রনির্মাতারা বিদেশি চলচ্চিত্রের বিরোধী হলেও পরিবেশক, প্রদর্শকদের কাছে এসব চলচ্চিত্রের কদর ছিলো। এছাড়া এই প্রতিবাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কতোখানি সম্পৃক্ততা ছিলো তা নিয়েও ভাববার অবকাশ আছে। কারণ এসব চলচ্চিত্র দর্শক খুব আগ্রহ নিয়ে দেখেছে বলেই ন্যারেটিভ থেকে পাওয়া তথ্য-উপাত্তে জানা গেছে। বরিশালের এস এম ইকবালের ভাষ্যমতে,

> উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা হলে তো কথাই নাই। তখন টিকেট খুব কালোবাজারি হতো। সেই সময় *হারানো সুর*, *পথে হলো দেরি*'র মতো সিনেমা খুব চলছে। আমি এমন দর্শকও পেয়েছি, যিনি দিন ১২টায় সিনেমাহলে ঢুকে একেবারে রাত ১২টায় বের হতো। একই সিনেমা চারবার দেখতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১৪)।

এই সময় দেশে বিদেশী চলচ্চিত্রের বাজার এতোই ব্যাপক ছিলো যে, ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের বড়ো বড়ো পরিবেশকদের অফিস ছাড়াও হলিউডের এম জি এম, ইউনিভার্সাল, প্যারামাউন্ট, টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরী ফক্স, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মতো বিশ্ববিখ্যাত নির্মাতা ও পরিবেশনা প্রতিষ্ঠানের শাখা অফিস ছিলো ঢাকা শহরে (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৩০)।

মূলত ১৮৯৬ সালে মুম্বাইয়ের (বোম্বের) ওয়াটসন হোটেলে যে চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শন হয় সেগুলোই ছিলো এই উপমহাদেশে প্রদর্শিত প্রথম বিদেশি চলচ্চিত্র। এর দুই বছর পর ১৮৯৮ সালে ঢাকায় প্রথম যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয় তাও ছিলো বিদেশি। আলমগীর কবিরের মতে, নির্বাক যুগে এদেশে প্রদর্শিত

চলচ্চিত্রের ৮০ ভাগই ছিলো যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের নির্মিত চলচ্চিত্র (Kabir 1969, p15)। পরে ভারতবর্ষের স্থানীয় চলচ্চিত্রের পাশাপাশি এখানে বিদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শন হতে থাকে। **দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে অন্যান্য বিদেশি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয় ভারতীয় চলচ্চিত্র, যা আগে দেশীয় চলচ্চিত্র হিসেবে স্বীকৃত ছিলো।** যশোরের 'যশোর ইন্সটিটিউট' এর সাধারণ সম্পাদক শেখ রবিউল আলমের ভাষায়, "আগে আমরা সব ভালো ভালো হিন্দি সিনেমা দেখতাম। তখন নায়ক ছিলো দিলীপ কুমার, রাজকাপুর, পৃথ্বীরাজ কাপুর। এই 'তসবির মহল'-এও আমি ওইসব সিনেমা দেখেছি (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৮)।" চট্টগ্রামের 'আলমাস' এর পুরনো কর্মী এ টি এম ফারুকের ভাষায়, 'তখন *মাদার ইন্ডিয়া* দেখে নেহরু কেঁদেছিলো। আর যতোবারই *মুঘল ই আযম* দেখেছি, মনে হয়েছে, এই বুঝি নতুন কোনো সিনেমা দেখছি। আমার মনে হতো, এই জিনিসটা বা সিনটা বোধ হয় গতবার ছিলো না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৯)।'

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার প্রথমবারের মতো ভারতীয় চলচ্চিত্রের কাস্টমস ডিউটি বৃদ্ধি করে (*সাপ্তাহিক চিত্রালী* ১৯৬৮, পৃ১৮)। এই সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রদর্শকরা ১৯৪৮ সালে পুরো এপ্রিল মাস প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ রেখে ধর্মঘট করে। ওই সময় মূলত ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানির কোনো সুষ্ঠু নীতিমালা ছিলো না। ভারতীয় চলচ্চিত্রের অবাধ প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণে ১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকার চলচ্চিত্রের আন্তঃপ্রাদেশিক চলাচল নিষিদ্ধ করে (আখতারুজ্জামান ১৯৭৮, পৃ২০৮)। ১৯৫২ সালে চালু হয়, চারটি ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানির পরিবর্তে একটি পাকিস্তানী চলচ্চিত্র ভারতে রপ্তানির নতুন পদ্ধতি। পরের বছর পশ্চিম পাকিস্তানের চলচ্চিত্রগুলো মুক্তি দেওয়ার সমস্যা দূর করতে নতুন ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানি-ই বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে আগে আমদানি করা ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী চলতে থাকে। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় পূর্ববঙ্গের দর্শক খুব আগ্রহ নিয়েই সেসময় সব ধরনের চলচ্চিত্র দেখেছে; কিন্তু সমস্যাটা ছিলো সরকারের। তারা নিজেদের স্বার্থে নানা অজুহাতে এটা বন্ধের চেষ্টা করে এবং করেছে। এরফলে যেটা হয়েছে, **শুরু থেকেই দেশীয় চলচ্চিত্র চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার সুযোগ নষ্ট হয়। যার নেতিবাচক ফল পেতে হয়েছে অনেক পরে।**

১৯৬০ সালের ১৯ জুন ঢাকার গুলিস্তান প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকদের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন পুরোপুরি বন্ধের দাবি জানানো হয়। একই বছর পাকিস্তান সরকার গঠন করে চলচ্চিত্র তথ্যানুসন্ধান কমিটি। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালে পাঁচ বছরের জন্য ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানি স্থগিত ঘোষণা করা হয় (আখতারুজ্জামান ১৯৭৮, পৃ২০৮)। কিন্তু **১৯৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে চলচ্চিত্র আমদানির ব্যবস্থা করা হয় মোট ২০০টি** (আখতারুজ্জামান ১৯৭৮, পৃ২১০)। এ সিদ্ধান্ত থেকে পরিস্কার বোঝা যায়, চলচ্চিত্র আমদানি নীতির এ

ধরনের সিদ্ধান্ত দর্শক নয়, ব্যবসায়ীদের চাপে সরকার নিয়ন্ত্রিত ছিলো। **এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, বিদেশি চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা নিয়েও সেসময়, এমনকি বর্তমানেও সমস্যা রয়েছে**। এদেশের ব্যবসায়িরা ভারতকে কখনো 'বিদেশ' ভাবতে পারেননি। ফলে তাদের দাবি ছিলো, ভারত ছাড়া অন্য দেশের চলচ্চিত্র আসলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমদানি হয়ে না আসলেও এদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্র দেখা কখনোই বন্ধ থাকেনি।

১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়ের ওপর ১৯৬১ সালে প্রবর্তিত আমদানি নীতির একটি সংশোধনী কার্যকরের প্রচেষ্টা নেয়। **সংশোধনী মোতাবেক যেসব রপ্তানিকারক তাদের আয়ের একটা অংশ এদেশের চলচ্চিত্রশিল্পে ব্যয় করবে, কেবল তারাই এদেশে চলচ্চিত্র রপ্তানির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে**। কিন্তু আমেরিকান মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন তাদের আয়ের অর্থ পাকিস্তানে ব্যয় করতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ওই সময় পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র আমদানি বন্ধ করে দেয়।

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে ১০ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সরকার ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে। অবশ্য এর দুই বছর পর পাকিস্তান সরকার ভাড়ার ভিত্তিতে বিদেশি চলচ্চিত্র (ভারতীয় ছাড়া) আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এতে ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট হতে পারে না। এরপর ১৯৬৯ সালে ব্যাপক আলোচনার পর পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র আমদানি শুরু হয়।

২.৬) তারকা-কুশীলব

ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের শুরুর দিকে ১৯২৯ সালের অক্টোবরে যখন *দ্য লাস্ট কিস* এর শুটিং শুরু হয়, তখন এর নায়িকা লোলিটা ও আরেক অভিনয়শিল্পী চারুবালাকে আনা হয়েছিলো যথাক্রমে বাদামতলী ও কুমারটুলী যৌনপল্লী থেকে। লোলিটার বয়স ছিলো ১৪ বছর। চলচ্চিত্রের কাজ শেষ হলে লোলিটা আবার আগের পেশায় ফিরে যান। আরেক অভিনয়শিল্পী হরিমতি ছিলেন ঢাকার নামকরা বাঈজী। তবে নায়ক খাজা আজমল ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য ছিলেন। তার বড়োভাই খাজা আদেলও এতে অভিনয় করেন। একেবারে শুরুতে চলচ্চিত্রের অভিনয়ে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে সমস্যা হলেও তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত ও অভিজাত পরিবারের শিক্ষিত নারীরা চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন।

৫০ দশকের মাঝামাঝি যখন বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* নির্মাণ হয়, তখনই অবস্থার অনেকখানি পরিবর্তন চোখে পড়ে। নির্মাতা আবদুল জব্বার খান অভিনয়শিল্পী নির্বাচনের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। **এতে উৎসাহিত হয়ে গোপনে চিঠি লিখে নির্মাতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের শিক্ষার্থী জহরত আরা ও ইডেন কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের পিয়ারী**

বেগম। এছাড়া ছিলেন চট্টগ্রামের পাথরঘাটার মেয়ে পুর্ণিমা সেনগুপ্তা (কাদের ১৯৯৩, পৃ১০৪)। পূর্ণিমাকে নায়িকা নির্বাচন করা হয়; তিনি কলকাতার ও চট্টগ্রামের মঞ্চে নাচ-গান করতেন। অন্য দুটি চরিত্রে নির্বাচিত করা হয় জহরত ও পিয়ারীকে। **আর চলচ্চিত্রের নায়ক হন নির্মাতা জব্বার খান নিজে। ১৯৫৯** সালে মুক্তি পাওয়া মহীউদ্দীনের *মাটির পাহাড়*-এর কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লেখেন কবি, কথাসাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক। এতে অভিনয় করেন নাটোরের মেয়ে সুলতানা জামান, মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী রওশন আরা, আবৃত্তিশিল্পী গোলাম মোস্তফা ও বেতারকর্মী কাজী খালেক প্রমুখ। পরে **অভিনয়ের পাশাপাশি রওশন আরা চিকিৎসা পেশায় নিয়েজিত ছিলেন**। এছাড়া তিনি ছিলেন কবি বন্দে আলী মিয়ার শ্যালিকা ও নায়িকা সুচিত্রা সেনের স্কুলজীবনের বান্ধবী। **এই শ্রেণি থেকে আসা অভিনয়শিল্পীরা তখন অর্থের চেয়ে চলচ্চিত্রের জাদুময়তাই বেশি আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয়েছে।** রংপুরের 'শাপলা'র ব্যবস্থাপক শাহাবুদ্দীন মোল্লার সঙ্গে কথা হয় তার অফিসে বসে। 'শাপলা'য় ঢুকেই হাতের বাঁয়ে ক্যান্টিন; ব্যবস্থাপক হলেও ক্যান্টিনও মোল্লাই দেখাশোনা করেন। চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে হতাশ মোল্লা বলেন—

> আগের আর্টিস্টরা অভিনয় করেছে, তারা কখনো অর্থকে গুরুত্ব দেয়নি। তারা চেষ্টা করেছে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের মনের ভিতর ঢুকে যাওয়ার। সেটা তারা পেরেছেও। এখন তো সবাই টাকার জন্য অভিনয় করে, তাই অভিনয়টা আর হয় না, কেবল সবাই স্টার হতে চায়। রাজ্জাক হওয়া কী এতো সহজ! চেহারা থাকলেই রাজ্জাক হওয়া যায় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২০)।

তবে এই দশকের অভিনয়শিল্পীরা সেই অর্থে তখনো তারকা হয়ে ওঠেননি। কারণ তারকা হয়ে ওঠার জন্য যে ধরনের বাজার-ব্যবস্থা দরকার ছিলো, সেটা ৬০-এর দশকে খুব বেশি ছিলো না বললেই চলে। তখন সারাদেশে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। শহরে দর্শক ছাড়া অন্যরা চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পেতো না বললেই চলে। অবশ্য অনেকে ৬০-এর দশকে অভিনয় শুরু করে পরের দশকগুলোতে তারকা খ্যাতি পেয়েছেন। তবে সেসময় নায়ক-নায়িকাদের শারীরিক সৌন্দর্যের চেয়ে অভিনয় দক্ষতাকেই বেশি মূল্যায়ন করা হতো বলে মনে হয়েছে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে চেহারা যে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, সেটা আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়। অভিনয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে খুলনার 'শঙ্খ' এর চলচ্চিত্র প্রতিনিধি শেখ মোতাহার হোসেনে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেন। এখনকার অভিনয়শিল্পীদের অনেককিছুই তিনি মেনে নিতে পারেন না। প্রেক্ষাগৃহের দোতলায় ডিসি'র গেইটের সামনে বসে কথা হচ্ছিলো তার সঙ্গে। তার ভাষ্য ছিলো এমন,

> দেখেন কেবল চেহারা থাকলে তো আর হয় না। অভিনয় মনের ভিতর থেকে আসতে হয়। আগের অ্যাক্টরদের তো চোহারা ওইরকম ভালো ছিলো না। কিন্তু তারা অভিনয় জানতো। তবে রাজ্জাক সাহেব দেখতেও সুন্দর ছিলেন অভিনয়ও ভালো করে গেছেন। যখন যে ভূমিকায় করতে বলছেন সেটাই করছেন। যদি বলেন, কাজের

লোক তাহলে কাজের লোক; যদি বলেন জমিদার তখন জমিদার হিসেবে ফুটাইয়া তুলছেন। আবার আনোয়ারা, শাবানা; যখন যে রূপ, উনারা তখন সেই রূপ ধারণ করছেন (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২)।

রাজশাহীর 'উপহার সিনেমা'র প্রবীণ গেইটম্যান আখলাক বলেন,

> আনোয়ার হোসেন কি দেখতে খুব সুন্দর? অথচ অভিনয় দেখেন, ওই যখন কাঁদে দর্শকও কাঁদে, ওই যখন হাসে দর্শকও হাসে। এর জন্য অভিনয় জানতে হয়। আর সুভাষ দত্ত তো দেখতে একেবারেই খারাপ ছিলো, কিন্তু তার সে কী অভিনয়! যেমন হাসাতে পারতো, তেমনি কাঁদাতেও পারতো। ওইসব নায়ক এখন আর নাই, এখন খালি চেহারার গৌরব (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১৭)।

প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যার সীমাবদ্ধতার পরও কোনো কোনো নায়ক-নায়িকা শহুরে দর্শকের খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষ করে নায়িকারা। সিলেটের 'নন্দিতা'র ব্যবস্থাপক মোস্তফা চৌধুরী বলেন, 'আগের সিনেমা ছিলো সামাজিক। পোস্টারে শাবানা, ববিতার ছবি থাকলেই মহিলা দর্শকের ভিড় লেগে যেতো। তারা এদেরকে আপনজন মনে করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৩)।' এ নিয়ে কড়া যুক্তি দেন চট্টগ্রামের 'আলমাস' এর ব্যবস্থাপক আবদুল আউয়াল। তার ভাষ্যমতে—

> আমাদের এখানে শাবানা, কবরী, সুচন্দা ছাড়া আর কোনো নায়িকা এক যুগ টিকতে পারলো না। কারণ তখন এরা ছাড়া বেশিরভাগ নায়িকাই ভালো অভিনয় করতে পারতো না। তখন টিকে থাকতে হলে অভিনয় জানতে হতো, শরীর দেখিয়ে কিছু হতো না। তাই তো রাজ্জাক-কবরী জুটির সেইসব সিনেমা সেসময় কী চলছে (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১)!

৬০-এর দশকে অভিনয়কে যে গুরুত্ব দেয়া হতো তার উদাহরণ হিসেবে *জাগো হুয়া সাভেরা*র একটা ঘটনা বলা যায়। নতুন প্রতিষ্ঠিত এফ ডি সি'তে উর্দু ভাষার প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুমতি পান এ জে কারদার; *জাগো হুয়া সাভেরা*। চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য তৈরির পর শুরু হয় নারী অভিনয়শিল্পী নির্বাচনের কাজ। প্রথমে *আসিয়া*র নায়িকা সুমিতা দেবী এবং শিরিন নামে একজনের স্ক্রিনটেস্ট নেওয়া হয়। কিন্তু এই দুইজনকে নিয়ে নির্মাতা সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরে তিনি কলকাতায় গিয়ে অভিনয়শিল্পী তৃপ্তি মিত্রকে নায়িকা হিসেবে মনোনীত করেন। তৃপ্তির স্বামী কলকাতার বিখ্যাত থিয়েটার অভিনয়শিল্পী শম্ভু মিত্র। এই চলচ্চিত্রে বাংলাদেশের খান আতাউর রহমানও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন।

চলতি গবেষণায় ন্যারেটিভে উপাত্তের থিমেটিক ইনডেক্সিংয়ে অভিনয়শিল্পীদের যে প্রাবল্য পাওয়া যায় সেখানে ৬০-এর দশকে অভিনয়ে আসা নায়ক-নায়িকাদের নামই সবচেয়ে বেশি এসেছে (সারণী ২.১.১)। পরবর্তী দশকগুলোতে আরো অনেক তারকা-কুশীলব থাকলেও তারা হয়তো দর্শকের মনে স্থান করে নিতে পারেননি। দীপেশ চক্রবর্তী যেমনটা বলেন, "কখনও আমরা মনে করি, কখনও আমাদের মনে পড়ে। 'মনে করা' আর 'মনে পড়া' তো এক নয়" (চক্রবর্তী ২০১১, পৃ৯২–৯৩)।

দীপেশের এই কথা এখানে খুবই যৌক্তিক, কোনো নায়ক বা নায়িকাকে 'মনে পড়ার' জন্য তাকে দর্শকের মনে স্থান করে নিতে হয়। যারা এটা পেরেছেন তারা দর্শকের স্মৃতিতে থেকেছেন, অন্যরা হারিয়ে গেছেন। আবদুল আউয়াল আরো বলেন,

> বাংলাদেশের মেয়ে শবনম টানা ২৫ বছর রাজত্ব করছেন বাংলা-উর্দু সিনেমায়, তার জন্য কেউ উঠতে পারে নাই। আর এটা হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে; শবনম দেখতে যেমন সুন্দর ছিলো, অভিনয়ও ছিলো অন্যরকম। তার চোখ-ঠোঁট সব কথা বলতো। সেসময় অভিনয়ে চোখের এতো ভালো ব্যবহার কম নায়িকাই করতে পারছে। এখনও আমি সুযোগ পেলে তার সিনেমা দেখি (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১)।

সারণী ২.১.১ : অভিনয়শিল্পীদের প্রাবল্য

অভিনয়শিল্পীর নাম	দর্শকের স্মৃতিতে প্রাবল্য	অভিনয়শিল্পীর নাম	দর্শকের স্মৃতিতে প্রাবল্য
শাবানা	৩৭	গোলাম মোস্তফা	২
রাজ্জাক	৩৪	খসরু	১
ববিতা	১০	মতি	১
আনোয়ার হোসেন	৫	সুভাষ দত্ত	১
কবরী	৫	শবনম	১
সুচন্দা	৪	রহমান	১
আজিম	৪	টেলিসামাদ	১
সুজাতা	৩	শওকত আকবর	১
খলিল	২		

১৯৬১ তে মুক্তি পাওয়া *তোমার আমার* চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে আনোয়ার হোসেনের অভিনয় জীবনের শুরু। পরে *নবাব সিরাজউদ্দৌলা* (১৯৬৭) চলচ্চিত্রে অভিনয় করে আলোড়ন তোলেন এই অভিনয়শিল্পী। একই চলচ্চিত্রে আলেয়া চরিত্রে অভিনয় করেন আনোয়ারা। নওগাঁর 'রংধনু'র ব্যবস্থাপক আবু মুসা বলেন, 'আলেয়া চরিত্রে আনোয়ারার সে কী অভিনয়! দেখতে অতো সুন্দর ছিলো না কিন্তু যেটা যখন করতো, সেটাই আমল মনে হতো, অভিনয় মনে হতো না। আজকের দিনে ওইরকম শিল্পী নাই। ববিতার অভিনয়ও খুব ভালো ছিলো। সে তো চোখ দিয়েই অর্ধেক অভিনয় করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১৩)'।

তার মানে এই দশকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রযুক্তির জাদুময়তার কাছে নিজেকে সমর্পণের একটা আগ্রহ ছিলো। সেটা হয়তো একই সঙ্গে প্রযুক্তির প্রতি দুর্বলতা, আবার নিজেদের জীবনের গল্পটা বলতে পারার একটা সুযোগও।

২.৭) চলচ্চিত্রের দর্শক, ব্যবসা এবং প্রেক্ষাগৃহ

মধ্য ৫০ থেকে পুরো ৬০ দশকে নানা সীমাবদ্ধতার ভিতরও চলচ্চিত্র ব্যবসা ভালো ছিলো। যদিও বেশিরভাগ প্রেক্ষাগৃহ ছিলো শহরে। যেকোনো চলচ্চিত্র মুক্তি পেলেই প্রেক্ষাগৃহগুলোতে দর্শকের ঢল নেমে যেতো। আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত থেকে এই দশকের চলচ্চিত্র নিয়ে এমনই ধারণা পাওয়া যায়। খুলনার 'সোসাইটি সিনেমা'র মালিক জাফর আলী বলেন—

> ৫২ সালের দিকে যখন আমরা সিনেমাহলের ব্যবসা শুরু করি, তখন আসলে কী ধরনের ব্যবসা ছিলো, এটা আপনাকে বোঝাতে পারবো না! এই সিনেমাহলের ব্যবসা দিয়ে বাবা খুলনা শহর একটা জায়গা কিনলো। যেখানে আমরা পরে আরেকটা সিনেমাহল ও আবাসিক হোটেল করেছিলাম। মালিক হিসেবেও আমার বাবার তখন খুব সম্মান ছিলো। মানুষ তাকে সমীহ করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১১)।

একই ধরনের কথা বলেন চট্টগ্রামের এ টি এম ফারুক—'কী আর বলবো, তখন সব সিনেমা হিট। সিনেমা লাগালেই হিট। উর্দু সিনেমা তো চলতোই, সঙ্গে বাংলা সিনেমাও ব্যবসা করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৯)।'

তবে চলচ্চিত্র গবেষক, লেখকদের অনেকেই (কবির ২০১৮, পৃ৯৮–৯৯) (হক ১৯৮৯, পৃ১১৯) (শুভ ১৪১৬, পৃ৪৭) (মাযহার ২০০৮, পৃ৫৫) এই দশকের চলচ্চিত্রের ব্যবসা ও দর্শক রুচি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের মতে, শিল্পসম্মত অনেক চলচ্চিত্রই দর্শক দেখেনি আবার অনেকের অভিযোগ তখনকার দর্শকও শিল্পরুচি সম্পন্ন ছিলো না। এসব অভিযোগের পর্যালোচনায় ৫০ ও ৬০ দশকের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি—

প্রথমত, নতুন মাধ্যম হিসেবে তখনও চলচ্চিত্র পূর্ববঙ্গে বেশির ভাগ দর্শকের কাছে পৌঁছেনি। যাত্রা, পালাগান দেখা আর রেডিও শোনা **এই দর্শকের কাছে চলচ্চিত্র ছিলো তখন পুরোপুরি জাদু-বাস্তবতা**। সেই জাদু-বাস্তবতায় বেশিরভাগ দর্শকের চলচ্চিত্রের মান নিয়ে ভাবারই সুযোগ হয়নি। তখন অনেকের কাছে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখাই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো; সেই চলচ্চিত্রের শিল্পবিচার, আধেয় কিংবা কাহিনি নয়। ফলে চলচ্চিত্রের শিল্প বিচার করে দর্শককে যে দোষ দিচ্ছেন গবেষকরা তা নিয়ে নতুন করে ভাববার অবকাশ আছে।

দ্বিতীয়ত, দেশে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। তখন চলচ্চিত্র ব্যবসার কেন্দ্র ছিলো বলতে গেলে কেবল ঢাকা শহর। এর বাইরে বড়ো বড়ো শহরগুলোতে কিছু প্রেক্ষাগৃহ ছিলো। অথচ গ্রামেই ছিলো অধিকাংশ মানুষের বাস। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের দুটি অংশে মোট ৩৬০টি প্রেক্ষাগৃহ ছিলো। এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ৯৭টি শহরে ২৩৮টি প্রেক্ষাগৃহ এবং পূর্ব পাকিস্তানের ৫১টি শহরে ছিলো বাকি ১২২টি (Kabir 1969, p176)। ১৯৫৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা আরো ১৩১টি বৃদ্ধি পেলেও, পূর্ব পাকিস্তানে ১২২টি থেকে কমে হয় ১১০টি। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে প্রেক্ষাগৃহের এই সংখ্যা অপরিবর্তিত ছিলো (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৯৫–৩৯৬)। তার মানে দেশের ৫১টি শহরে গড়ে ওঠা মাত্র ১১০টি প্রেক্ষাগৃহ দিয়ে চলচ্চিত্র ব্যবসা করা তখন খুব একটা সহজ ছিলো না। তারপরও এসব প্রেক্ষাগৃহ সেসময় ভালো ব্যবসা করেছে।

রাজশাহীর ‘উপহার’-এর নৈশ্যপ্রহরী মো. জাহাঙ্গীরের কথায় এর সমর্থন মেলে। ‘উপহার’-এ গেলে নিয়মিত কথা হতো জাহাঙ্গীরের সঙ্গে। প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে তার খুব আবেগ ছিলো। ‘উপহার’-এর আগেও তিনটা প্রেক্ষাগৃহে কাজ করেছিলেন তিনি। এখন বেতনের টাকায় সংসার চলে না বলে চাকরির পাশাপাশি টিকেট কালোবাজারি করেন। ৬০-এর দশকের চলচ্চিত্র ব্যবসা নিয়ে তার ভাষ্য ছিলো এমন —

> পাকিস্তান পিরিয়ডে বাংলাদেশের ছবিও চলেছে, পাকিস্তানের ছবিও চলেছে। তখন বাংলাদেশের ছবি চলেনি? মানুষ সিনেমাহলে গিয়ে বাংলাদেশের ছবির টিকিট পায়নি! মারামারি লেগে গেছে, তখন তো বেশি সিনেমাহল ছিলো না। শহরজুড়ে ওই একটা, কোনো কোনো শহরে খুব বেশি হলে দুইটা। পাকিস্তান পিরিয়ডেও উর্দুর সঙ্গে বাংলা ছবি চলেছে। তখন কী করে বাংলাদেশের ডিরেক্টররা ছবি করেছে? *ময়নামতি*, *অবুঝ মন*, *বেহুলা*—এইগুলো কী রকম চলেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৩)!

তৃতীয়ত, যে দর্শকরুচি নিয়ে এতো প্রশ্ন উঠেছে, তাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৬০ দশকের শুরুতে কেবল অল্প কিছু সংখ্যক বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত যুবক সরকারি চাকরি করতে শুরু করেন। তার আগে পর্যন্ত এদের বেশিরভাগই ছোটোখাটো ব্যবসা নয়তো দোকান চালাতো (আহমেদ ২০০৭, পৃ১৩৩)। শহুরে নতুন এই শিক্ষিত শ্রেণির মূল সংগ্রাম ছিলো জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা নিয়ে। এর ফাঁকে বিনোদনের জন্য তারা সপ্তাহ শেষে প্রেক্ষাগৃহে যেতো। বিনোদন প্রত্যাশী এই দর্শকের কাছে উর্দু, হিন্দি কিংবা বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র আলাদা কোনো গুরুত্ব নিয়ে হাজির হয়নি বলেই মনে হয়েছে। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে এই তিন ভাষাকে অনেকেই কোনো না কোনোভাবে ধারণ করেছেন। এর বাইরে তখনো তাদের কাছে চলচ্চিত্র ছিলো ম্যাজিকের মতোই। এর প্রমাণ মেলে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার ‘রূপাঞ্জলি’র ব্যবস্থাপক উমর আলীর কথায়। উমর আলীর সঙ্গে তার বাড়ির পাশে টঙ দোকানে বসে কথা হয় দীর্ঘ সময় ধরে। শুভ্র দাড়ির সত্তোরোর্ধ্ব উমর আলীকে দেখে প্রথমে মনেই হয়নি তিনি প্রেক্ষাগৃহের ব্যবস্থাপক ছিলেন। কিন্তু কথা শুরুর পর তিনি যেভাবে চলচ্চিত্রের গান গেয়ে, উদাহরণ দিয়ে কথা বলছিলেন, তাতে খানিকটা আশ্চর্যই হয়েছিলাম। উমর আলীর বক্তব্যে উর্দু কিংবা বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র নিয়ে আলাদা কোনো সুর ছিলো না। তার ভাষ্যমতে,

> তখন টিকেটের মূল্য দুই–চার আনা হলেও ব্যবসা অত্যন্ত ভালো ছিলো। পাকিস্তান ও ঢাকার কিছু সিনেমা দেখানো হতো। সেসময় পরিবারের লোকজন সবাই মিলে সিনেমা দেখতে পারতো। ঢাকার অনেক সিনেমাই তখন উর্দু ভাষায় হতো; আবার বাংলাতেও হতো। নাদিম-শাবানার *চকোরি* সেসময় উর্দু ভাষায় নির্মাণ হয়। এছাড়া ঢাকার আরেকটা সিনেমা ছিলো *চান্দা*। এই সিনেমাগুলো সেসময় খুব ভালো ব্যবসা করেছিলো। আজিম-শাবানার *ডাকবাবু*ও খুব মার্কেট পায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৮)।

চতুর্থত, সারা দুনিয়াতেই প্রেক্ষাগৃহ ও চলচ্চিত্র চলেছে দর্শকের টাকায়। আর নির্মাতারা এই মাধ্যমটিকে ব্যবহার করেছেন একটা মায়া, জাদু-বাস্তবতা তৈরির ক্ষেত্র হিসেবে। যদিও চলচ্চিত্র সবসময়ই বাস্তবকে

ছুঁয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেছে। নতুন ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে এফ ডি সি'কে টিকিয়ে রাখতে পূর্ববঙ্গের নির্মাতাদের তখন নানা দিকে চলতে হয়েছে। জহির রায়হানও উর্দু ভাষায় চলচ্চিত্র করেছেন, *রূপবান*-এর সফলতার *বেহুলা* বানিয়েছেন[৭]; আবার প্রয়োজনে নির্মাণ করেছেন *জীবন থেকে নেয়া*ও। একজন নির্মাতা নতুন ইন্ডাস্ট্রিতে দর্শকের চাহিদাকে মাথায় রেখেছেন, দর্শকও তা দেখেছে। শুধু জহির নয়, সালাহউদ্দিন, মহিউদ্দিন, ফতেহ লোহানীও তাই করেছেন। আর যারা দর্শক ধরতে পারেননি তাদের চলচ্চিত্র ব্যবসা করেনি। এ ব্যাপারে আবদুল আউয়ালের ভাষ্য এমন—

> পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের বানানো উর্দু সিনেমা ছয় মাস পর্যন্ত পাকিস্তানেও চলছে। বাংলাদেশের *চান্দা*, *তালাশ* দুই দেশেই কয়েক মাস করে চলছে। সেই সিনেমা বাংলাদেশে যেমন ব্যবসা করছে পাকিস্তানের সিনেমার সঙ্গে ফাইট করে সেখানেও চলছে। অথচ আজকের দিনে কোনো সিনেমা লাগালে ছয় দিনও ঠিক মতো চালানো যায় না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১)।

কুষ্টিয়ার উমর আলী আরো বলেন,

> এর কিছু দিন পর আমরা একটা সিনেমা আনলাম সুভাষ দত্ত ও কবরীর *সুতরাং*। তখন দিনে তিনটা শো চলতো। দলে দলে দর্শক আসা শুরু হলো। রাতে ৯–১২টার শো শেষের পরও লোক কমে না। তখন সিনেমাহলের স্টাফরা আমরা খিচুড়ি রান্না করে খেয়ে রাত ১২টা থেকে আরেকটা শো চালালাম। দর্শক এই সিনেমাগুলো যে কীভাবে মনে-প্রাণে নিয়েছিলো, কল্পনা করা যায় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৮)!

তবে ঢাকার নির্মাতাদের উর্দু ভাষার চলচ্চিত্র খুব বেশি সময় দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ফলে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা নতুন পথের সন্ধান শুরু করেন। ঠিক এই সময় বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রে নতুন বিষয় নিয়ে হাজির হন সালাহউদ্দিন। তিনি জনপ্রিয় যাত্রার কাহিনি নিয়ে নির্মাণ করেন *রূপবান* (১৯৬৫)। চলচ্চিত্রটি অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা পায় এবং রেকর্ড ব্যবসা করে। নেত্রকোণার 'হিরামন' এর ব্যবস্থাপক পরিতোষ সাহা রায় বলেন,

> সেসময় *রূপবান* সিনেমা মুক্তি পেলে খুব ব্যবসা হয়। টানা কয়েক সপ্তাহ *রূপবান* আমার মালিকের প্রথম সিনেমাহল 'হাসনা টকিজ'-এ চলে। ব্যবসার সেই রমরমা অবস্থা দেখে আমাদের মালিক নওয়াব আলী সিদ্ধান্ত নেন আরেকটি সিনেমাহল করার। সেটাই আজকের 'হিরামন' (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২৪)।

একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় কুড়িগ্রামের 'মিতালি'র সাবেক সহকারি অপারেটর দেবলাল রজক দেওয়ানের কাছে—

---

[৭]. এহতেশাম ১৯৬২ সালে উর্দু ভাষায় নির্মাণ করেন *চান্দা*। চলচ্চিত্রটি অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক সফলতা পায়। *চান্দা*র আর্থিক সাফল্য দেখে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য নির্মাতারা উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যাপক আগ্রহী হয়। পরের বছরগুলোতে মুস্তাফিজের *তালাশ* (১৯৬৩), বেবি ইসলামের *তানহা* (১৯৬৪), জহির রায়হানের *সঙ্গম* (১৯৬৪), রহমানের *মিলন* (১৯৬৪) বেশ ব্যবসা করে।

> আমি সিনেমাহলে যোগ দেওয়ার আগে একটা সিনেমা খুব ব্যবসা করেছিলো *রূপবান*। এই কথা আমি ওস্তাদের কাছে শুনছি। তখন নাকি পুরাতন শহরের ওই সিনেমাহলে গরুগাড়ি নিয়ে মানুষ *রূপবান* দেখতে আসতো। লোকজন বেশি হওয়ার অনেকে শো ধরতে পারতো না। তখন নাকি লোকজন ওখানেই রান্না করে খেয়ে, থেকে সিনেমা দেখে বাড়ি চলে যেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৮)।

রূপবান-এর সাফল্যে আরেকটি ঘটনা হলো "গ্রামাঞ্চলের যেসব মানুষ ছবি দেখাকে 'পাপ' মনে করত, তাদের সেই ধর্মীয় কুসংস্কার মুছে যায়, তৈরি হয় ছবির ব্যাপক দর্শক" (কবির ২০১৮, পৃ১০০)। ফলে *রূপবান* মুক্তির পর গ্রামের লোকজন কাছের শহরে গিয়ে তা দেখা শুরু করলো। ফরহাদ মজহার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এভাবে, "ততোদিনে পূর্ব পাকিস্তানে ছবি বানানো সম্ভব এবং এই অঞ্চলের বাংলাভাষীরা সিনেমা তৈয়ার করতে পারে এটা প্রমাণিত হয়েছে। **কিন্তু ছবি তৈয়ার করতে পারা আর সেই ছবি পয়সা দিয়ে মানুষ দেখার মধ্যে একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। *রূপবান* সেই ফাঁকটিও পূরণ করেছে।** ... এই ছবি মানুষ পয়সা দিয়ে দেখেছে" (মজহার ২০১১)। এটা দেখে অনেক চিত্রব্যবসায়ী উৎসাহী হয়ে গ্রামে মৌসুমী প্রেক্ষাগৃহ খুলে বসেন। এভাবে পূর্ব বাংলায় চলচ্চিত্রের দর্শক বৃদ্ধি পায়।

তবে লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোও এই দশকের শেষের দিকে সমস্যায় পড়ে। "এবারে নগরভিত্তিক মধ্যবিত্তদের নিয়ে নির্মিত 'সামাজিক' ও 'রোমান্টিক' জঁরা (genre)-র চলচ্চিত্র নির্মিত হতে থাকে। রাজ্জাক-কবরী জুটি হিসেবে অনেকগুলো হিট ছবি উপহার দেন" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৪৭)। এই ধারার চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে নারায়ণ ঘোষ মিতার *এতটুকু আশা* (১৯৬৮), সুভাষ দত্তের *আবির্ভাব* (১৯৬৮), নূরুল হকের *মনের মতো বউ* (১৯৬৯) ও কাজী জহিরের *ময়নামতি* (১৯৬৯)। তবে **নগরভিত্তিক মধ্যবিত্তদের টার্গেট করে এই চলচ্চিত্র নির্মাণ হলেও মজার বিষয় হলো, সব শ্রেণির দর্শক কিন্তু তা দেখেছে এবং এগুলো ব্যবসা সফলও হয়েছে**। কারণ ততোদিনে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যাও দেশে বেড়ে গেছে। ফলে ৬০ দশকে 'রুচিশীল মধ্যবিত্ত'ই কেবল চলচ্চিত্র দেখেছে কিংবা দেখে নাই, এরকমের যে বিতর্ক চালু আছে তা এখানে খাটেনি। **প্রাযুক্তিক জাদুময়তার মাধ্যম চলচ্চিত্র সব শ্রেণির দর্শকই দেখেছে**। যার প্রভাব অবশ্য পরবর্তী দশকে কিছুটা হলেও অব্যাহত ছিলো। চট্টগ্রামের 'আলমাস'-এর প্রচারের দায়িত্বে থাকা প্রবীণ পিন্টু মারমার কথায় এর সমর্থন মেলে। তার ভাষ্যমতে, "সেসময় উর্দু সিনেমা *ইনসান আদমি*, *আঞ্জুমান*, বাংলা সিনেমা *নীল আকাশের নীচে*, *এতটুকু আশা*, *ময়নামতি* বাম্পার ব্যবসা করে। *নীল আকাশের নীচে* সিনেমাটা 'দিনার'-এ সেসময় টানা তিন মাস চলছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৮)।"

এবার আসা যাক প্রযোজক প্রসঙ্গে; ৬০-এর দশকে যারা চলচ্চিত্র প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত তাদের বেশিরভাগই ছিলেন প্রধানত ঠিকাদার (মুৎসুদ্দী ১৯৮৭, পৃ৪-৫)। শুরু থেকেই যারা বিনিয়োগ করেছিলেন তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ব্যবসার প্রসার। চলচ্চিত্র যেহেতু ব্যবসাও তাই এর মধ্যে দোষের কিছু ছিলো না। যদিও ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে মুনাফা লাভের মধ্যে অনেকে দোষ খুঁজেছেন। অথচ

ব্যবসার চরিত্রই তাই। এছাড়া আইয়ুবের সামরিক সরকারের কল্যাণেও এক শ্রেণির মানুষের হাতে কিছু অর্থ-বিত্তের আগমন ঘটেছিলো; এদের মধ্যে কেউ কেউ চলচ্চিত্রে অর্থ বিনিয়োগ করে (মাযহার ২০০৮, পৃ৫৭)। আবার পুঁজি বিনিয়োগের ইচ্ছে থাকলেও অনেকে তা গোপন করেছেন। এর পিছনে সম্ভবত সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ ছিলো। কারণ *রূপবান*-এর আগে পর্যন্ত চলচ্চিত্র নিয়ে ধর্মীয় টানাপড়েন ছিলো। ফলে চলচ্চিত্রশিল্পে আশানুরূপ পুঁজি লগ্নি হয়নি। আবার অনেকে সামান্য ব্যবসায়িক ক্ষতিতেই নিজেদের এ সরিয়ে নিয়েছেন। ফলে প্রযোজনা ব্যবসাটাও সেসময় ভালোভাবে দাঁড়ায়নি।

২.৭.১) সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহ

৬০-এর দশকেই মূলত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ববঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের বিকাশ ঘটে। সংখ্যায় অল্প হলেও উচ্চবিত্ত, শহুরে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সব শ্রেণির মানুষের মিলন কেন্দ্র ছিলো প্রেক্ষাগৃহ। “মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ সিনেমা দেখতেন ফাষ্ট [ফার্স্ট] ক্লাসের সিটে বসে। ফাষ্ট ক্লাসের প্রতিটি সিট পরিপূর্ণ থাকতো সন্ধ্যার প্রদর্শনীতে। সেকেণ্ড ক্লাসে ভিড় জমতো ম্যাটনি শোতে। এই শ্রেণীর দর্শকরা ছিল প্রধানত ছাত্র-যুবক। শ্রমজীবী মানুষেরা সিনেমা দেখতো থার্ড ক্লাসে বসে। সাধারণত রাতের দ্বিতীয় শোতে এই আসনগুলোতে ব্যাপক দর্শক সমাগম ঘটতো। এছাড়া প্রায় প্রতিটি সিনেমা হলেই মহিলাদের জন্য আলাদা একটি শ্রেণী থাকতো। **ম্যাটনি এবং রাতের প্রথম শোতে আধিক্য থাকতো মহিলা দর্শকদের।** এ সময় সিনেমা দেখা ছিল পরিবারের সাপ্তাহিক রুটিনের অংশ। উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরা সন্তানদের সপ্তাহের যে কোন একদিন সিনেমা দেখার অনুমতি দিতেন। ... আর সপ্তাহে একদিন রাতে সিনেমা দেখতে যেতেন অভিভাবকরা। নব বিবাহিত দম্পতিদের বিয়ের পর পরই সিনেমা হলে গিয়ে একটা সিনেমা দেখা প্রথায় পরিণত হয়েছিল। সিনেমা না দেখা পর্যন্ত বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। ভাল সিনেমা দেখার জন্য দু’সপ্তাহ থেকে প্রায় এক মাস আগে সিট বুকিং হত। ... এক সিনেমাই একটি হলে মাসের পর মাস প্রদর্শনের নজীরও আছে” (তুহিন ১৯৯১)।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহের অবস্থান নিয়ে এধরনের অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। তবে একেবারে ভিন্ন ধরনের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন চট্টগ্রামের আবদুল আউয়াল। তার ভাষ্যমতে,

> পাকিস্তান আমলে এই সিনেমাহলে একবার *শান-এ-খোদা* নামে একটি সিনেমা আসে। এই সিনেমার বিষয়বস্তু ছিলো পবিত্র হজ্জ পালন নিয়ে। এই সিনেমা আনার পর মালিক পুরো সিনেমাহল ধুয়ে-মুছে ফিটফাট করে ফেলেন। একই সঙ্গে তিনি পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে পুরো সিনেমাহলে গোলাপজল ছিটিয়ে দেন। ওই সিনেমা দেখার জন্য প্রচুর দর্শক হয়েছিলো। সিনেমা শেষে অনেকে সিনেমাহলের বারান্দায় জামাত করে নামাজও পড়েছেন। এগুলো কিন্তু সেসময় কোনো সমস্যা ছিলো না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১)।

আউয়ালের এই বর্ণনা কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহের সেই সময়ের অবস্থানকে পরিষ্কার করে। তবে এখানে মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের যে প্রাযুক্তিক জাদু-বাস্তবতা সক্রিয় ছিলো তার প্রমাণও

পাওয়া যায়; কারণ সুদূর সৌদি আরবে সংঘটিত পবিত্র হজ্জ পালন যখন কেবল প্রযুক্তির বদৌলতে নিজ শহরে বসে দর্শক দেখে, তখন তা চলচ্চিত্রকে মাধ্যম হিসেবে দর্শকের কাছে অনন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

চট্টগ্রামের 'আলমাস' প্রেক্ষাগৃহ ছবি : গবেষক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

চট্টগ্রামের 'আলমাস' প্রেক্ষাগৃহের ভেতরের অংশ ছবি : গবেষক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

কুষ্টিয়ার 'বনানী সিনেমা'র ৩৫ মি মি প্রজেক্টরের অপারেটর বর্তমানে গেইটম্যান সুবোধ চন্দ্র বলেন, "তখনকার সিনেমা ও সিনেমাহলের পরিবেশ বেশ ভালো ছিলো। তখন মানুষ কেবল সিনেমা নয়, সিনেমাহলও দেখতে আসতো। 'পাক পিকচার' সিনেমাহলে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ নানা ধরনের সিনেমা চলতো। মুক্তিযুদ্ধের পরেও এসব সিনেমাহলে ভালো ব্যবসা হয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৯)।" একই ধরনের কথা শোনা যায় চট্টগ্রামের এ টি এম ফারুকের কাছে,

> 'আলমাস'-এ তখন যেকোনো শো-এর অগ্রিম টিকেট কেনা যেতো। এমনকি এক বছর পরের টিকেটও যদি কেউ কিনতে চাইতো, সে টিকেটও বিক্রি করা হতো। টিকেটে শো টাইম, দেখার ডেট, ইস্যু করার দিন

> ইত্যাদি লেখা থাকতো। ফলে কোনো সমস্যা হতো না। দর্শক নিয়মিতই অগ্রিম টিকেট কিনতো (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৯)।

দর্শকের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় সেসময় দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোর আসন সাধারণত **তিন ভাগে বিভক্ত** ছিলো—**মিডল স্টল (সর্বনিম্ন)**, **রিয়াল স্টল (মধ্যম)** এবং **ড্রেস সার্কেল** বা ডি সি (সর্বোচ্চ)। পুরান ঢাকার কিছু প্রেক্ষাগৃহসহ দেশের অন্য জায়গার কিছু প্রেক্ষাগৃহে এর বাইরেও বিভিন্ন মানের আসনের বিন্যাস ছিলো। তবে প্রেক্ষাগৃহগুলোতে 'থার্ড ক্লাস' বলে একটা শ্রেণি ছিলো। মূলত প্রেক্ষাগৃহের পর্দার একেবারে সামনে ছিলো এই শ্রেণির অবস্থান। 'থার্ড ক্লাস' এর দর্শক নিয়ে নির্মাতা খান আতাউর রহমানের পর্যবেক্ষণ ছিলো খুবই বিশ্লেষণমূলক। তার ভাষায়,

> তখনকার দিনে ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের মাপকাঠি ছিল থার্ড ক্লাস আগে পূর্ণ হয়েছে কিনা। একথা নির্মম সত্য যে, মিডল ষ্টল (মধ্যবিত্তের আসন) এবং ডিসি ও ব্যালকনি (উচ্চ বিত্তদের আসন) ধীরে ধীরে ভরে। সেকালে নীলোর ফুলপ্যান্ট পরা দুদিকে পিস্তল ঝোলানো ছবির ব্যানার দেখে হুড় হুড় করে নিম্ন বিত্ত লোকেরা হলের ফ্রন্ট ষ্টল, এমন কি মিডল ষ্টলও ভরে ফেলতো। আর কলকাতার বাংলা ছবিগুলোতে ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা আসতেন পরিবার-পরিজন নিয়ে। বাংলাদেশে নির্মিত ছবি হলে তা ভরতো আরো ধীরে (*সাপ্তাহিক চিত্রালী* ১৩ এপ্রিল ১৯৯০, পৃ৬)।

খান আতার কথায় একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ৫০ ও ৬০ দশকে সব শ্রেণির দর্শক প্রেক্ষাগৃহে ছিলো। সেই দর্শকের কাছে ফ্যান্টাসি, জাদুময়তা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রামের পিন্টু মারমার কথাতেও তা পরিষ্কার হয়,

> আগে যখন আমরা সিনেমার পাবলিসিটিতে মাইক নিয়ে বের হতাম, তখন মানুষ গাড়ির কাছে চলে আসতো। অনেকে পোস্টার চাইতো। সিনেমা নিয়ে তখন মানুষের সে কী আগ্রহ, কী উচ্ছ্বাস! সিনেমাহলে লোকও হতো অনেক। এই যে সামনের জায়গাটা দেখতেছেন, এটা ভরে দর্শকের লাইন রাস্তা পর্যন্ত চলে যেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৮)।

কুড়িগ্রামের 'মিতালী'র মালিক জোবায়ের হাসানও একই ধরনের কথা বলেন, 'সে সময় সিনেমাহলের ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা হয়। সেই মুনাফা থেকেই বাবা মূলত আমাদের ভাড়া করা পুরনো সিনেমাহল ছেড়ে এই জায়গাটা কেনেন এবং সেখানে 'নিউ মিতালী' সিনেমাহল গড়ে তোলেন (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৯)।'

এছাড়া আরেকটি বিষয় না বললেই নয়, ৬০-এর দশকে সামগ্রিকভাবেই চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট লোকজনকে সবাই সম্মান করতো। প্রেক্ষাগৃহে চাকরির বিষয়টিও তখন সম্মানের ছিলো। প্রেক্ষাগৃহে মালিকদের তখন মানুষজন খুবই সম্মানের চোখে দেখতো। এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় চট্টগ্রামের এ টি এম ফারুকের কথায়,

> সব মিলিয়ে তখন 'আলমাস'-এ চাকরি করাই একটা বড়ো অর্জন ছিলো। আমরা গর্ব করে বলতাম 'আলমাস'-এ চাকরি করি। অন্য সিনেমাহলগুলোর কর্মচারিদের তখন বেতন ছিলো ৩০ টাকা। আর 'আলমাস'-এর কর্মচারিদের বেতন শুরুই হতো ৯০ টাকা দিয়ে। ভালো কাজের জন্য ছয় মাসের মধ্যে আমার বেতন হয়ে গেলো ১৭৫ টাকা (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৯)।

এ পিছনে অবশ্য অর্থনৈতিক বিষয়আসয়ের সঙ্গে অন্য কারণও ছিলো; এই মানুষগুলোকে সাধারণ জনগণ প্রাযুক্তিক জাদুময়তার কেন্দ্র হিসেবে প্রেক্ষাগৃহ ও চলচ্চিত্রের অংশ মনে করতো। ফলে তাদের সঙ্গ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আতিথিয়তা পাওয়ার লোভ অনেকের মধ্যে ছিলো।

২.৮) চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী

৫০ দশকের মধ্য ভাগ থেকে ৬০ দশক পর্যন্ত ঢাকায় নির্মিত চলচ্চিত্রের কাহিনি, সঙ্গীত নানা দিক থেকে ভালো ও জনপ্রিয় ছিলো। দর্শক এই সময়ের চলচ্চিত্রের গল্পের সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজে পেতেন। অনেক সীমাবদ্ধতার পরও এই দশকের নির্মাতারা সেগুলো বেশ যত্ন নিয়ে এসব চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা কম থাকার পরও তাই এসব চলচ্চিত্র দর্শক দেখেছেন। আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত থেকে এই দশকের চলচ্চিত্র নিয়ে এমন তথ্যই পাওয়া যায়।

এছাড়া এই অংশে আখ্যানের তথ্য-উপাত্তে ৬০ দশকে দর্শক স্মৃতিতে থাকা সর্বাধিক প্রাবল্যের দুটি চলচ্চিত্র (দেখতে পারেন, প্রথম অধ্যায়ের ১.৯.৩ এর সারণী ১.১.২) *রূপবান* ও *এতটুকু আশা*র আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬০ দশকের সব ধরনের চলচ্চিত্রের কাহিনি নিয়ে দর্শকের মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ দেখা যায়। প্রযুক্তির জাদু-বাস্তবতা হোক আর মধ্যবিত্তের জীবনের গল্পের প্রতিফলন হোক, দর্শক প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে এসব চলচ্চিত্র দেখেছেন। খুলনার 'সঙ্গীতা' প্রেক্ষাগৃহের গেইটম্যান নজরুল ইসলাম বলেন, 'আগে জহির রায়হান সিনেমা বানায় নাই? সেই সিনেমার কাহিনি অন্যরকম ছিলো। ওই সিনেমা দেখার জন্য শুক্রবারে সিনেমাহলে জায়গা দেওয়া যায় নাই। তখন লোক ছিলো আট কোটি। আর এখন ১৬ কোটি, কিন্তু দর্শক নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৯)।'

যশোরের 'তসবির মহল' এর প্রবীণ গেইটম্যান দামোদার সাহা বলেন, 'স্বাধীনের আগে *বেহুলা*, *দর্পচূর্ণ*, *রূপবান* এই সিনেমাগুলো যখন চলে, তখন আমরা সিনেমাহলে জায়গা দিতে পারি নাই। স্বাধীনের পরেও দর্শকের ভিড় একই রকম ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৩৫)।' যশোর ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক শেখ রবিউল আলমের ভাষায়, 'বেদেদের জীবন নিয়ে একটা সিনেমা হয়েছিলো *জোয়ার এলো*। তারপর সালাউদ্দিন সাহেব করেন *সূর্যস্নান*। এই সিনেমাগুলো দেখার মতো ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৮।'

এই দশকের চলচ্চিত্রের কাহিনির সঙ্গে সমাজ-বাস্তবতার মিল ছিলো বলেও আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়। দর্শক সেই কাহিনির মধ্যে বাস্তবের কাছাকাছি থাকার একটা স্বাদ পেতো বলেও তাদের কথায় মনে হয়েছে। যশোরের 'তসবির মহল' এর প্রজেক্টর অপারেটর অনুপ সিংহের সঙ্গে প্রজেক্টর রুমে বসে কথা হয় অনেক সময় ধরে। সংসার চালাতে তাকে অপারেটরের চাকরির বাইরেও ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত আরেকটি চাকরি করতে হয়। তার ভাষায়,

> পাকিস্তান আমলে কিংবা স্বাধীনের পরও আমাদের সিনেমার একটা গল্প ছিলো। সেই গল্পের সঙ্গে অনেক জায়গায় বাস্তব জীবন মিলে যেতো। দর্শক সিনেমা দেখে সেটা নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। আর এখনকার সিনেমায় নায়কের সঙ্গে নায়িকার চোখের দেখা হলেই ভালোবাসা হয়ে যায়। তার পরেই গান শুরু (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৬)।

যশোরের শেখ রবিউল আলম বলেন, 'যশোরের বিভিন্ন সিনেমাহলে আমি *নীল আকাশের নীচে*, *আলোর মিছিল*, *পিচ ঢালা পথ* দেখেছি। এগুলোর সঙ্গে বাস্তবের অনেক মিল আছে। সাদাকালোর সেই যুগে এসব সিনেমা পরিচ্ছন্ন ছিলো। ফলে দর্শকও খুব আগ্রহ নিয়ে দেখতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৮)।'

অনুপ সিংহ আরো বলেন,

> তখনকার সিনেমায় একটা জান-প্রাণ ছিলো। এখনকার সিনেমায় সেটা নাই। আগের সিনেমায় একটা মাধুর্য ছিলো। সবাই মিলে তিন ঘণ্টা সিনেমাহলে বসে আগ্রহ নিয়ে দেখা যেতো। কিন্তু এখন কেবল ধর তক্তা, মার পেরেক। আগের সিনেমায় দেখানো ভালোবাসা ছিলো অন্যরকম। সব দূর থেকে হতো, কিন্তু সেখানে ভালোবাসা ছিলো। এখন সব কাছে এসেছে, কিন্তু ভালোবাসা নাই। আমি হয়তো ঠিক বোঝাতে পারছি না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৬)।

তবে ১৯৫৬ সালে ঢাকায় চলচ্চিত্র যাত্রা শুরু হলেও ৬০ দশকের শুরুর দুই–তিন বছর পর্যন্ত ভারতীয় চলচ্চিত্রের ওপর একধরনের নির্ভরতা কথা জানা যায়। বরিশালের এস এম ইকবাল বলেন,

> ৬২ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে কিন্তু সিনেমার তেমন কোনো সেট আপ তৈরি হয়নি। তখন মূলত পুরোপুরি নির্ভরতা ছিলো ভারতের সিনেমার ওপর। আমি নিজে এখানে দিলীপ কুমারের সিনেমা দেখেছি, আর উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা বলতে তো তখন সবাই পাগল ছিলো। সেসময় সারা দেশের অবস্থা কী ছিলো জানি না, তবে বরিশালের লোকজন উত্তমের মতো করে ঢোলা পায়জামা পড়তো (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১৪)।

তবে কিছু সময় ভারতীয় চলচ্চিত্রের ওপর নির্ভরতা থাকলেও ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়টি সেই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। কারণ একেবারে শূন্য হাতে সেই সময়ের নির্মাতা, কলাকুশলী ও অভিনয়শিল্পীরা এই পথচলা শুরু করেছিলেন। **সেখানে চলচ্চিত্র নির্মাণই প্রধান ছিলো, তার শৈল্পিক ও নান্দনিক বিষয়গুলো বিবেচনায় ছিলো অনেক পরে। দর্শকও এগুলোকে খুব বেশি আমলে নিয়েছে বলে মনে হয়নি**। কারণ তাদের কাছে নিজের ভাষায়, নিজেদের পোশাকে চলচ্চিত্র হচ্ছে সেটাই অনেক বড়ো ব্যাপার ছিলো। পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের এই খারাপ অবস্থাকে মোটেও দুর্বলতা হিসেবে দেখতে রাজি নন লেখক, গবেষক, তাত্ত্বিক ফরহাদ মজহার। তার যুক্তি হলো, "ছবির নির্মাণ বা বিষয়ের দুর্বলতা কিম্বা তাদের বাণিজ্যিক ব্যর্থতা দিয়ে সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তানে ছবি বানানোর সাংস্কৃতিক-রাজনীতি বোঝা যাবে না। বরং পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ছবি আমরা বানাতে সক্ষম এই আত্মবিশ্বাস অর্জনের সাধনা তখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে" (মজহার ২০১১)।

তারপরও সব ধরনের প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) নির্মাণের এক দশকের ভিতর নিজেদের চলচ্চিত্র নিয়ে হাজির হন ঢাকাই ইন্ডাস্ট্রির নির্মাতা সালাহউদ্দিন। *রূপবান* (১৯৬৫) দেশীয় চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সব সমস্যাকে ছাপিয়ে ফেলে তার জনপ্রিয়তা ও ব্যবসায়িক সফলতা দিয়ে। এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে *রূপবান* তৈরি হয়েছিলো একেবারে পূর্ববঙ্গের নিজস্ব সংস্কৃতি, মূল্যবোধের অংশ হিসেবে। তখন যাদের জন্য এই চলচ্চিত্র বানানো হয়েছিলো তারা আগের দর্শকের চেয়ে খানিকটা আলাদা ছিলেন; এরা সাধারণ মানুষ। বিষয়ের দিক থেকেও এই চলচ্চিত্র ছিলো ভিন্ন। চলচ্চিত্রের বিষয় ঢাকায় নতুন গড়ে ওঠা পরিশীলিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চোখে ছিলো 'নিচু জিনিস',

তথাকথিত লোককাহিনি। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ফরহাদ মজহারের ভাষায়, 'চলচ্চিত্রে সাধারণ মানুষ হাজির হয়েছিলো' (মজহার ২০১১)। *রূপবান* রেকর্ড ব্যবসা করার পর যেটা হলো—"অস্তিত্ব রক্ষার ফর্মুলা আবিষ্কৃত হয়ে যাওয়ার পর এ দেশের পরিচালকরা হাতের কাছে যে লোককাহিনী পেলেন তাই দিয়ে তাড়াহুড়ো করে নির্মাণ করতে থাকলেন একের পর এক ছবি। বিষয়বস্তু বা শৈল্পিক কলাকুশলতার প্রশ্নটি ভেবে দেখারও সময় নেই কারো" (কবির ২০১৮, পৃ১০০)। এই রকম ঘটনা অবশ্য স্বল্প সময়ের ঢাকাই চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে এই দশকেই আরেকবার ঘটেছিলো উর্দু ভাষার চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। *চান্দা*র (১৯৬২) নির্মাণ ও ব্যবসায়িক সফলতার পর নির্মাতারা উর্দু ভাষার চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। অবশ্য সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির[৮] এটি একটি সাধারণ চিত্র।

যতোদূর জানা যায়, সালাহ্উদ্দিন কোনোমতে জোড়াতালি বাজেট দিয়ে *রূপবান* নির্মাণ করেছিলেন। তবে সেটাও যে সে সময় খুব সহজ ছিলো না, তা *রূপবান*-এর নায়িকা সুজাতার কথায় বোঝা যায়, "এই ছবিতে অভিনয় করার সময় আমাকে অনেক ঝামেলা ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। এফডিসিতে ঢুকলেই আমাকে দেখে অনেকে বলত, এই দেখ যাত্রার নায়িকা যাচ্ছে। এর কপালে কী আছে কে জানে? অনেকেই মুখটিপে হাসত" (*কালের কণ্ঠ*, ১১ আগস্ট ২০১৭)। যদিও সব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সালাহউদ্দিন সেটা নির্মাণ করেন।

রূপবান ঢাকাই নির্মাতাদের বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের নতুন পথ খুলে দেয়। তারা এবার চলচ্চিত্র নির্মাণে দেশীয় সংস্কৃতি ও লোককাহিনির কাছে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করেন। মূলত এই চলচ্চিত্রটিকে দেখা যেতে পারে দেশের প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্রের (National Cinema) উদাহরণ হিসেবে। কেননা বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদী পরিচয় উপস্থাপনের একটি সার্থক উদ্যোগ ছিলো এই চলচ্চিত্র। আলমগীর কবিরও বিষয়টিকে "সমকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অবদান" (কবির ২০১৮, পৃ১০৯) হিসেবে দেখেন।

১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে দেশব্যাপী ঘটে যাওয়া একের পর এক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বিশেষ করে ৫২'র ভাষা আন্দোলন পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যে চেতনা তাড়িত হয়, তার একটি পাটাতন তৈরি করেছিলো *রূপবান*। বিশেষ করে উর্দু ভাষার চলচ্চিত্রের বিপরীতে নিজেদের গল্পে, ভাষায় নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি মানুষের মধ্যে স্বাধিকারের চিন্তা নতুন করে বপন করেছিলো। "এই ছবির বিষয়ের অবাস্তবতা ও চিত্রায়ণের

---

৮. সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির অর্থ হলো 'বানানো সংস্কৃতি', যা বাইরে থেকে আরোপিত এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও মতাদর্শে দীক্ষিত করার হাতিয়ার মাত্র। সংস্কৃতি আজকের দিনে আর প্রকৃত চাহিদা থেকে উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হয় সেইসব প্রয়োজন মেটাতে যা evoked and manipulated. যেকোনো সাংস্কৃতিক উৎপাদ এখন আর সংস্কৃতির প্রয়োজনে নয়, ব্যবসার প্রয়োজনে উৎপন্ন হয়। ফলে কোনো উৎপাদ ব্যবসা করলে কিংবা সফল হলে একই ধরনের জিনিস তৈরি হতে থাকে। এই ধারণাটি দেন জার্মানের 'ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল' নামে পরিচিত ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চের প্রধান দুই তাত্ত্বিক থিওডর ডব্লিউ এ্যাডোরনো ও ম্যাক্স হর্কহেইমার।

কৌশলগত দুর্বলতা নিয়ে কথা তোলার অবকাশ এখানে নেই, কেননা এই ছবিটি এদেশের চিত্রশিল্পকে নিশ্চিত ভরাডুবি থেকে রক্ষা করে” (কবির ২০১৮, পৃ৯৯)।

বিপুল আর্থিক সাফল্য অর্জনকারী *রূপবান* এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ ছিলো এর গল্প ও গান। যাত্রাপালা ‘রূপবান’-এর কাহিনি অবশ্য আগে থেকেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলো। গল্প ছাড়াও *রূপবানে* ব্যবহৃত প্রায় সব গানই এর আগেই যাত্রায় জনপ্রিয় ছিলো।

ছবি : সংগৃহীত

সামন্তযুগীয় আখ্যান *রূপবান*-এর দুইটি দিক—**প্রথমত**, সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার উপস্থাপন। **দ্বিতীয়ত,** নারীর আত্মবিসর্জনের সংস্কৃতির চর্চা। সামন্ত নিয়মে যুক্তি, আবেগের কোনো মূল্য নেই। অবশ্য সামন্তপ্রভুদের নির্মমতার ওপর ভিত্তি করেই টিকে থাকে সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা। এই নির্মমতা প্রকাশ্য। তাই উজিরকে বাধ্য করা হয় তার ১২ বছরের মেয়ের সঙ্গে ১২ দিনের ছেলের বিয়ে দিতে। অসম্ভব

সত্ত্বেও এই বিয়েতে রাজি না হওয়ায় উজিরের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে দ্বিধা করেন না বাদশা একাব্বর।

রাজ্যের উজিরেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে অন্য সাধারণ প্রজার কী হয় সেটাও বোঝা যায়। একইভাবে তাজেলের বাবা আরেক সামন্তপ্রভু, তিনি আভিজাত্যের অহংকারে মালিনীর ছেলে বলে রহিমকে প্রত্যাখান এবং কারাগারে আটকে রাখেন। একই সঙ্গে নিজের কাম চরিতার্থ করতে আক্রমণ করেন রূপবানকে। যদিও আরেক নারী তাজেল এর প্রতিবাদ করেন।

দ্বিতীয়ত, নারীর বিসর্জন *রূপবান*-এর প্রধান গুরুত্বের জায়গা। একমাত্র রাজকন্যা তাজেল ছাড়া প্রত্যেকটি নারী চরিত্র সব কিছু মেনে নেন। রানী, রূপবানের দাইমা, রূপবান—সবকিছু মেনে নেওয়া ছাড়া চলচ্চিত্রজুড়ে এদের কিছুই করার থাকে না। ব্যতিক্রম একমাত্র তাজেল, সে বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সামন্ত সমাজের মান ও পুরুষের জীবন রক্ষার্থে রূপবানের যে বিসর্জন, সেটা নিঃসন্দেহে পুরুষ প্রাধান্যশীলতায় জনপ্রিয়। এই অসম বিয়ে এবং নিরুপায় রূপবানের সেই সম্পর্ককে আকড়ে ধরে এগিয়ে চলা সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে চলচ্চিত্রজুড়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র জংলি নেতা। তথাকথিত সভ্যতার বাইরের এক সভ্য মানুষ। সেই মানুষের কাছে স্নেহ, ভালোবাসা, নৈতিকতা, ন্যায়-অন্যায় সর্বোপরি মানবিকতা প্রধান। একই সঙ্গে তার ত্যাগ, মমতাও দর্শকের দৃষ্টি কাড়ে। বিশেষ করে যখন নিজের মৃত ছেলের পোশাক ও ঘোড়া তিনি নিঃসঙ্কোচে দিয়ে দেন রহিমের জন্য। **দীর্ঘ দিন ধরে যাত্রায় দেখে আসা এই কাহিনি চলচ্চিত্রের জাদুময়তায় যখন পর্দায় দেখেছে, তখন দর্শক যতোটা কাহিনি বা গান শুনেছে তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্মিত হয়েছে**। **এই বিস্ময়ই *রূপবান*কে চলচ্চিত্র ব্যবসার ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে**।

ব্যবসায়িক দিক থেকে *রূপবান*-এর এই সফলতা "বাংলা ছবির সংখ্যাগত দিকটিও উর্দু ছবিকে ছাড়িয়ে গেল। ১৯৬৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সংখ্যা ছিল ৫টি এবং উর্দু ছবির সংখ্যা ছিল ৬টি। পরবর্তী বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪টি এবং ১১টি। ১৯৬৭ সালে অবস্থার আরো উন্নতি ঘটে। এই সময় উর্দু ছবির সংখ্যা ৭-এ হ্রাস পায়। অপরদিকে বাংলা ছবির সংখ্যা ছিলো ১৬টি। ... উর্দু ছবি নির্মাণে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের এই নিরুৎসাহের কারণ কেবল ছবির মন্দা ব্যবসার মধ্যেই নিহিত ছিল না। সমকালীন রাজনীতিতে বাংগালি জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী" (কাদের ১৯৯৩, পৃ.১৩৫–১৩৬)।

সালাউদ্দিন যে খুব ভেবেচিন্তে *রূপবান* করেছিলেন তা পরিষ্কার নয়। হয়তো লোককাহিনির প্রতি বাঙালি মধ্য ও নিম্নবিত্ত সমাজের সহজাত দুর্বলতাকে বুদ্ধিদীপ্তভাবে কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জনই ছিলো তার

মূল লক্ষ্য এবং এতে তিনি সফল হয়েছিলেন। *রূপবান* লোককাহিনি হলেও ফ্যান্টাসি সেখানে আছে; ১২ বছরের এক মেয়েশিশুর সঙ্গে বিয়ে হয় নবজাতকের। গল্প-ফ্যান্টাসি ছাড়াও *রূপবান*-এ যে গান ব্যবহার করা হয়েছিলো তার সবকটি আগে থেকেই যাত্রাপালায় জনপ্রিয় ছিলো। আলমগীর কবিরের ভাষায়, সনাতনী যাত্রামঞ্চের মতো প্রবেশ-সংলাপ প্রক্ষেপণ-প্রস্থান স্টাইলে সালাউদ্দিন একটি যাত্রাগীতিকে চলচ্চিত্রে স্থানান্তর করেছিলেন (Kabir 1979, p28)। তবে দর্শক এই স্টাইলটা তখন গ্রহণ করেছিলো।

৬০ দশকে সর্বাধিক দর্শক স্মৃতিতে থাকা আরেকটি চলচ্চিত্র *এতটুকু আশা*। ১৯৬৮ সালে নির্মিত এ চলচ্চিত্রটিও সেসময় খুব ব্যবসা করে। মিতা পরিচালিত *একটুকু আশা* কাহিনি, অভিনয় ও সঙ্গীত তিন কারণেই বেশ আলোচিত। *এতটুকু আশা* যখন মুক্তি পায়, তখন এমন এক সময় যখন ঢাকাই চলচ্চিত্রে লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রের রমরমা বাজার। *রূপবান*-এর রেশও কাটেনি। সে বছরও রূপবানের নাম জড়িয়ে মুক্তি পায় *রূপবানের রূপকথা* নামে একটি চলচ্চিত্র। সব মিলিয়ে লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র মুক্তির সংখ্যা ডজন খানেকের কম নয়। এই পরিস্থিতিতে *এতটুকু আশা* দর্শকের মনে বেশ খানিকটা জায়গা করে নেয়।

তবে এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রের ভিড়ে *এতটুকু আশা* একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাই রাজু যথার্থই বলেন, "এই জঁরার শুরু হয় ১৯৬০-এর দশকের পূর্ব পাকিস্তানের আধা-শহুরে সামাজিক প্রেক্ষাপটে মফস্বলী মধ্যবিত্তের জীবন-যাপনকে পর্দায় তুলে ধরার মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে সামাজিক জঁরা ১৯৭০–৯০ এর দশকের বাংলাদেশের আধুনিক 'জাতীয়তাবাদী' সমাজে লিঙ্গ ও শ্রেণি সম্পর্কের জটিলতাকে চিহ্নিত করার হাতিয়ার রূপ নেয়" (রাজু ২০১৩, পৃ৮৪)। তার মানে *রূপবান*-এর বিপরীতে শহুরে মধ্যবিত্তের জীবনের গল্প প্রযুক্তির জাদু-বাস্তবতায় উপস্থাপনের যে আকাঙ্ক্ষা তারই একটা উদাহরণ হিসেবে হাজির হয়েছিলো *এতটুকু আশা*।

এতটুকু আশা গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্যা নিয়ে ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি করে। যার কারণ হিসেবে হাজির হয়েছে শহুরে আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আরেকটি পরিবার। চলচ্চিত্রটির একটু ভিতরে ঢুকলেই দেখা যায়, একটি স্বপ্নবান পারিবারের ভাঙন। যারা অনেক কষ্টের পর একটু ভালো সময়ের স্বপ্ন দেখতে কেবলই শুরু করেছে। ঠিক তখনই তাদের জীবনে চিরচেনা সেই দুঃখ আবার ভর করে। *এতটুকু আশায়* কিন্তু সেই অর্থে আলাদা করে কোনো শত্রু বা খলনায়ক নেই। পরিবারের সদস্যরাই এই দ্বন্দ্ব তৈরির জন্য দায়ী। সেই দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকায় আছেন দুই নারী। তাদের একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক; নিজের সংসার, ছেলেমেয়ে আছে, স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আয়ে মধ্যবিত্ত হলেও কী কারণে যেনো তাদের প্রাচুর্যের অভাব নেই—দু–তিনটা গাড়ি, ডুপ্লেক্স বাড়ি সবই আছে। তবে ১৯৪৭-এর গ্রামীণ ভূস্বামীরা পরে মধ্যবিত্তে রূপান্তরিত হয়েছিলো, সেই উত্তরাধিকার অধ্যাপক ধারণ করছেন কিনা

সেটা পরিষ্কার নয়। কিন্তু শহুরে মধ্যবিত্তের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সেখানে বিদ্যমান—জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী পালন, কারো সামান্য সাফল্যে পার্টি, সাপ্তাহিক ছুটিতে চলচ্চিত্র দেখতে যাওয়া কিংবা শহরের একটু বাইরে ঘুরে আসা। মাহতাব উদ্দীনের ভাষায়, "মধ্যবিত্ত সমাজের সবচেয়ে গর্বের বস্তু হল তার সংস্কৃতি। বেশভূশা চলন বলন ও আচার-আচরণে তাদের এই সংস্কৃতি নিত্য দৃশ্যমান ছিলো" (মাহতাব উদ্দীন ১৯৭৩)।

যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মেয়ে লুচি ও স্ত্রী নাহারকে দেখা যায় সব সময় ক্লাব, জন্মদিনের পার্টি, বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। তাই আলমের সঙ্গে লুচির বিয়ে ঠিক হলে মা নাহারকে (২৩ মিনিট ১৭ সেকেন্ড) বলতে শোনা যায়,

> নাহার : অসম্ভব, একটা অজপাড়া-গা সেখানে আমার লুচি কিছুতেই টিকতে পারবে না।
>
> অধ্যাপক : কেনো, পাড়া-গায়ে মানুষ থাকে না?
>
> নাহার : থাকে। তবে তারা তোমার মতো যতোসব আনকালচারড।
>
> অধ্যাপক : কালচারের বড়াই করো না নাহার। স্বামী-পুত্র ফেলে পার্টি আর ফাংশন নিয়ে থাকা যদি কালচারের লক্ষণ হয়, তাহলে তার দরকার নেই।
>
> নাহার : কী বললে?
>
> অধ্যাপক : ঠিকই বলেছি, কালচারের ছাড়পত্র নিয়ে যতোসব অনাচার করতে তোমাদের লজ্জা করে না! কালচারের মানে উশৃঙ্কলতা নয়, অনিয়ম নয় ...।

শেষ পর্যন্ত আলমের সঙ্গে লুচির বিয়ে হলেও ঘটনার পরম্পরায় অধ্যাপক আর তার পরিবারে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারেন না। আর এর মধ্য দিয়েই চলচ্চিত্রজুড়ে গ্রাম্য পরিবারকেন্দ্রিক সনাতন থিম এবং শহুরে আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চিন্তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বিস্তৃত হতে দেখা যায়। চলচ্চিত্রের ৪২ মিনিট ১১ সেকেন্ডে লুচিদের বাড়িতে তার বান্ধবী দীনা বেড়াতে এসে তার মায়ের সঙ্গে লুচির বিয়ে নিয়ে আলাপ করেন—

> দীনা : আপনি বাধা দিলে এরকম কিছুতেই হতে পারতো না।
>
> লুচিরা মা : বলো কী? বাধা দিইনি, হাজারবার বলেছি। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন কই? বিয়ে দেওয়ার জন্য একেবারে ক্ষেপে গেলেন।
>
> দীনা : লুচির সেখানে নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে! ক্লাব, রেস্তোরা, সিনেমা, সোসাইটি ছাড়া আজকের দিনে মডার্ন লাইফ অচল। লুচির পল্লীবধু হওয়ার কথা শুনে আমি তো রীতিমতো অবাক হয়ে গেছি!

এই কথোপকথনের মধ্যে আলম ও লুচি সেখানে প্রবেশ করেন। লুচিকে দেখে দীনা খুব খুশি হন। আলমের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা না বলেই লুচি, দীনা মিলে চলচ্চিত্র দেখতে যান। এই পরিস্থিতিতে

অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়আলমকে। লুচির অনীহা সত্ত্বেও দীনার আগ্রহে আলমকে তার সঙ্গে পরিচয় করে দেন। কিন্তু সেই পরিচয় করানোর মধ্যে লুচির আভিজাত্যের অহংকার স্পষ্ট ধরা পড়ে। লুচি, দীনা চলে গেলে বসার ঘরে আলম একা দাঁড়িয়ে থাকেন। লুচির মা আলমকে বসতে বলে উপরের ঘরে চলে যান। আলমকে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ৪৪ মিনিট দুই সেকেন্ডে বাড়ির কাজের লোককে কথা বলতে শোনা যায়,

> এই যে দুলাভাই কী খাবেন কন, ঠাণ্ডা না গরম? ও অবাক হইছেন, তা হওয়ারই কথা। আমাগো সমাজে জামাই আলি শ্বশুর আসে, শ্বাশুড়ি আসে, বউ আসে। আর তাও যদি না আসে নিদেন পক্ষে শালা-শালিরা আসে আদর-আপ্যায়ন করে। কিন্তু এখানকার সমাজে সব উল্টো, এখানে চাকর-বাকররাই সব।

কাজের লোকের মুখ দিয়ে 'আমাগো সমাজে' বাক্যাংশ বের করে নির্মাতা শেষ পর্যন্ত গ্রাম্য পরিবারকেন্দ্রিক সনাতন মিথ এবং শহুরে আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চিন্তার মধ্যে দ্বন্দ্বটা পরিষ্কার করান। এই দ্বন্দ্বই *এতটুকু আশা*কে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের দর্শকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে বলে মনে হয়েছে।

এছাড়া পুরুষ প্রাধান্যশীল সমাজে শেষ পর্যন্ত স্বামীই যে নারীর অবলম্বন, সেটাও নির্মাতা পরিষ্কার করেন। সেটা নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্ত যেকোনো শ্রেণির ক্ষেত্রেই একইভাবে কাজ করে। আলম শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর দেখা যায় লুচি তার সেই চিরচেনা, তাদের ভাষায় 'কালচারড' পরিবেশে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। চলচ্চিত্রের এক ঘণ্টা ৪১ মিনিট ৩২ সেকেন্ডে লুচিকে একা তার এক বান্ধবীর বিবাহবার্ষিকীতে দেখা যায়। সেখানে তাদের 'কালচারড সোসাইটি'র খন্দকার সাহেব নামে একজন লুচিকে নিয়ে কক্সবাজার বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। তাদের কথোপকথন এমন—

> খন্দকার : হ্যালো লুচি, মুড খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে? তা তো হবেই ... গো টু হেল। চলো কক্সবাজার ঘুরে আসা যাক, মন মেজাজ ভালো হয়ে যাবে। না না এতে মনে করার কিছু নেই।
>
> লুচি : মিস্টার খন্দকার, আপনি এতো জঘন্য লোক তা তো জানতাম না!
>
> খন্দকার : আমার চেয়ে আরো জঘন্য লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে, এতো সবে শুরু।
>
> লুচি : কী বলতে চান আপনি?
>
> খন্দকার : সোজা কথা, পাল ছাড়া হাল ভাঙা তরী কখন কোন ঘাটে ভিড়বে তার কোনো হদিস নেই।

এভাবে 'আধুনিকতা'র নামে অধ্যাপকের ভাষায় 'উৎশৃঙ্খলা' এবং তার ফল দেখানো হয়। এই ঘটনার পরম্পরায় লুচির সামনে তার বিবেক হাজির হয় (০১.৪৮.২১)। সেই কথোপকথন এমন—

> বিবেক : ভেবেছিলে আভিজাত্যের দম্ভে সৃষ্টির নিয়ম-কানুন সব পাল্টে দেবে? স্বামী-সংসার সব মিথ্যে? জবাব দাও?
>
> লুচি : আমি কেনো এর জবাব দেবো, যারা আমাকে এভাবে মানুষ করেছে, এর জবাব দেবে তারা।

বিবেক : নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাচ্ছো। তোমার বুদ্ধি আছে বিবেক আছে কেনো বুঝতে চাওনি, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যে। কেনো বুঝতে চাওনি মেয়েদের স্বামীই সব। তুমি পাপী, তুমি জ্বলবে, তুমি সব সময় জ্বলবে!

এই পুরো ন্যারেটিভ কাঠামোবদ্ধ সনাতন পরিবারের যে মিথ সেটাকে সমর্থন করে। দর্শক হয়তো, গবেষক জাকির হোসেন রাজুর ভাষায়, স্থানীয়/জাতীয় সম্প্রদায়ের কাঠামোর মধ্যে আধুনিকতা এবং বিশ্বায়নকে তাদের সনাতন জীবন পদ্ধতির প্রতি হুমকি হিসেবে দেখে থাকে (রাজু ২০১৩, পৃ৮৭)।

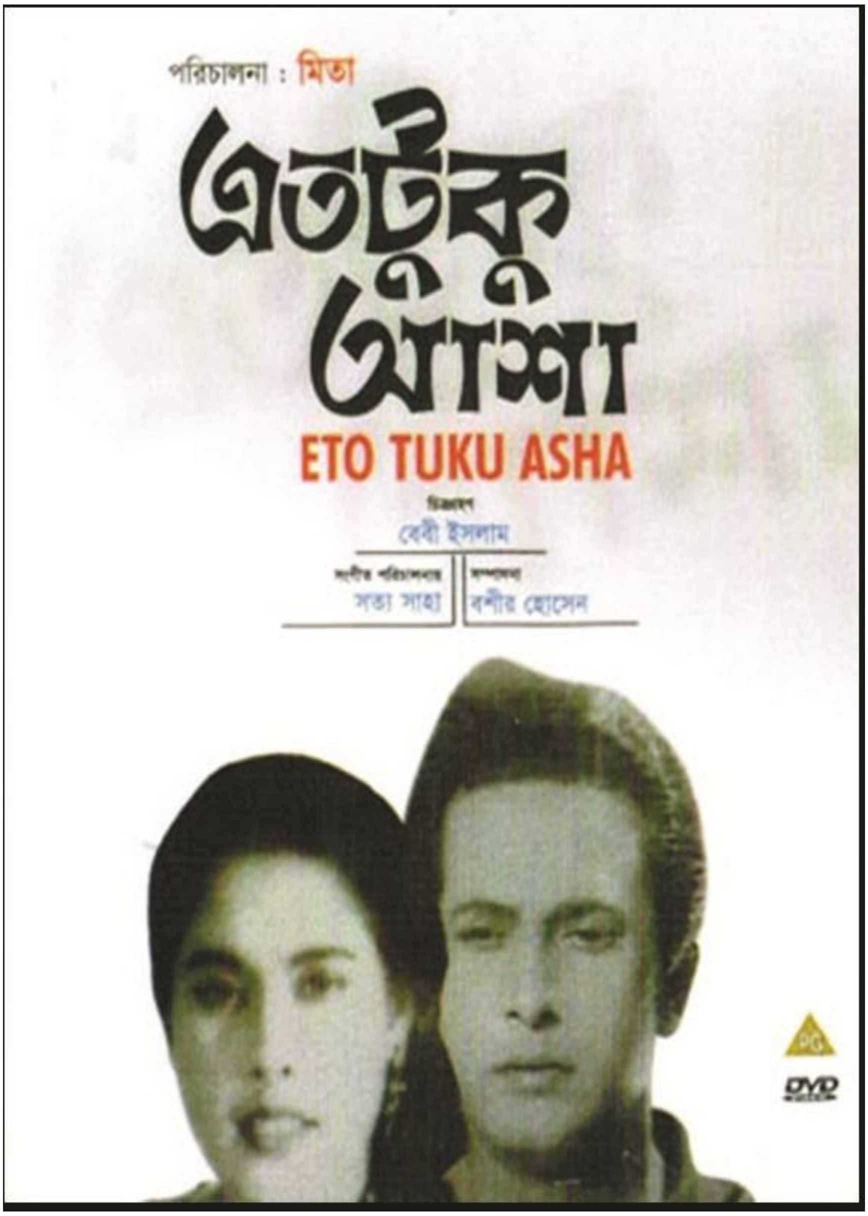

ছবি : সংগৃহীত

অন্যদিকে সামাজিক জনরার চলচ্চিত্রে আদর্শবাদী, সর্বত্যাগী নারী ও পুরুষ চরিত্র দেখা যায়। *এতটুকু আশায়* আলমের পরিবারে আলম ছাড়া তার বাবা ইরফান মিয়া, ভাই সালাম ও বোন হেনা এবং লুচির

পরিবারে তার একমাত্র ভাই চিত্রশিল্পী কবিরের মধ্যে এধরনের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দেখা যায়। এদের সবার মধ্যে মূলত বয়স্ক ইরফান মিয়া কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রতিভূ হয়ে ওঠেন। সর্বশান্ত হয়ে যে মানুষটি ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড়ো করেছেন, সেই ছেলে যখন তার থেকে দূরে চলে যান, তখন তাকে নির্বিকার থাকতে দেখা যায়। চলচ্চিত্রের ৫৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে দেখা যায়, আলম গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে শ্বশুরবাড়িতে উঠেছেন; জোয়ার্দারের ছেলের সঙ্গে হেনাকে বিয়ে না দেওয়ায় তিনি পাওনা টাকা চাচ্ছেন; এইরকম পরিস্থিতিতে আলমের বাবা ধীর-স্থির থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ভাববাদে আশ্রয় খোঁজেন, মোনাজাত করেন, 'যতো কষ্ট তুমি আমায় দাও, তা সইবার শক্তি দাও আমায়। আলমকে তুমি সুখে রেখো, ওকে শান্তিতে রেখো।'

এতো কষ্টের পরও ইরফান মিয়াকে হাল ছাড়তে দেখা যায় না। এমনকি তিনি কারো কাছে সাহায্য পর্যন্ত চান না। বরং স্ত্রী একমাত্র স্মৃতি সোনার চুড়ি বিক্রি করে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করেন। বৃদ্ধ বয়সেও ঢাকার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তাকে খেলনা ফেরি করতে দেখা যায়। আবার এ বিষয়টি তিনি তার অন্য দুই সন্তানকেও জানাতে নারাজ। কারণ তারা কষ্ট পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেনা ও সালাম সেটা জেনে যান। তারাআলমের মতো ইরফান মিয়াকে ছেড়ে যান না। দর্শক পরিষ্কার হয় আধুনিকতার ছোঁয়া গ্রামে বেড়ে ওঠা আলমকে 'খারাপ' করলেও হেনা, সালামকে করেনি। বাবার কষ্ট লাঘবে হেনা কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেন, আর সালাম অসুস্থ শরীরেই সংবাদপত্রের হকারি করেন। শেষ পর্যন্ত হেনা নিজের ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে জোয়ার্দারের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছেলেকে বিয়ে করতে পর্যন্ত রাজি হন। বোনের সেই বিয়ে দেখতে পারবেন না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যান সালাম। এতো সব পরিস্থিতির মধ্যেও ইরফান মিয়াকে অটল থাকতে দেখা যায়। একপর্যায়ে আলম এসে বিয়েতে বাধা দিলে ইরফান মিয়া দা উঁচিয়ে সেটা উপক্ষো করেন।

লুচির ভাই কবির চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভে খুব গুরুত্ব নিয়ে না থাকলেও তার আদর্শবাদীতা হাজির থাকে। আলমের অসহায়ত্বে একমাত্র তার পাশে থেকেছেন কবির। আধুনিকতার মারপ্যাঁচে পড়ে আলম যে তার আলোময় ভবিষ্যতের ইতি টেনেছেন, তা নানাভাবেই কবির তাকে মনে করিয়ে দেন। সব শেষে কবির তার বাবা অধ্যাপক সাহেব ও আলমকে এক কাতারে এনে সনাতন ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বকে আবারো স্পষ্ট করেন। ছেলের কথায় অধ্যাপক সাহেব তার অবস্থা বুঝতে পারেন। এবং ঠুনকো এই 'আধুনিকতা'র প্রতিবাদে বাড়িতে ভাঙচুর চালান।

৬০ দশকের লোককাহিনিভিত্তিক চিন্তার বাইরে এসে এই প্রথম মধ্যবিত্ত দর্শক *এতটুকু আশায়* তার বাস্তব জীবনের কাছাকাছি বিষয়কে দেখতে পায়। যে জীবনে হয়তো তাদের অজান্তেই সনাতন ও

আধুনিকতকার দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। যা আসলে জাতীয়/প্রথাগত ও পশ্চিমা/আধুনিক এই দুই মেরুর দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মধ্যে সমসাময়িক সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্বায়নে প্রথাগত পরিচিতির বিজাতীয়করণের শঙ্কা তুলে ধরে (রাজু ২০১৩, পৃ৮৭)। তবে সেই শঙ্কার পরবর্তী ফলাফল কী তারা তা নিয়ে যে খুব বেশি চিন্তিত ছিলো এমনটা মনে হয়নি।

এছাড়া এই চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভে প্রতিটি বিষয় ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিশেষ করে প্রথাগত চিন্তার সমর্থনে চলচ্চিত্র জুড়েই সঙ্গীতের টেক্সট হাজির থেকেছে। সংলাপের বিপরীতে একই ধরনের বক্তব্য যখন যথাযথ পরিস্থিতিতে সুর ও লয়ে উপস্থাপন করা হয়, তা নিঃসন্দেহে দর্শককে আবেগী করেছে। এক ঘণ্টা তিন মিনিট ৫৫ সেকেন্ডে দেখা যায়, আলমকে নিয়ে প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে আছেন বাবা ইরফান মিয়া। পাওনাদারের টাকা পরিশোধ করতে পারছেন না, অন্যদিকে আলমের কাছে সে কথা বলতেও পারছেন না। এমন পরিস্থিতিতে আবহে শোনা যায়, ‘মনো রে … দুঃখ, সুখের দোলায় দোলে ভব নদীর পানি/ বুকের ধারায় বেয়ে যা তুই আশার তরী খানি’।

বড়োভাই আলম সংসারের খবর নেন না। নিরুপায় বাবা ফেরিওয়ালা, একমাত্র বোন লেখাপড়া ছেড়ে চাকরির সন্ধান করছে—এইরকম পরিস্থিতিতে বাড়ির অসুস্থ ছোটোছেলে সালাম বসে থাকতে পারেন না। তিনি তার পঙ্গু পা নিয়েই রাস্তায় নামেন। উপার্জনের পথ হিসেবে বেছে নেন সংবাদপত্রের হকারি। হকারির অবসরে এক ঘণ্টা ১৮ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে গান ধরেন সালাম—

তুমি কি দেখেছো কভু
জীবনের পরাজয়
দুঃখের দহনে, করুণ রোদনে
তিলে তিলে তার ক্ষয়।।

আমি তো দেখেছি
কতো যে স্বপ্ন মুকুলেই ঝরে যায়
শুকনো পাতার মড় মড়ে বাজে
কতো সুর বেদনায়
আকাশে বাতাসে নিস্ফল আশা
হাহাকার হয়ে রয়।
… … …

ইরফান মিয়া তার নাতনিকে দেখার জন্য শহরে ছেলের শ্বশুড়বাড়িতে যান। কিন্তু দারোয়ান তাকে ঢুকতে দেন না। সেই সময় লুচি বাসা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে গিয়ে শ্বশুরকে দেখেও নির্বাক থাকেন। একপর্যায়ে ইরফান মিয়াকে দারোয়ান ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেন। ঠিক সেই সময় (০১.২৭.৫৪) আবহে ভেসে আসে, 'হায়রে অবুঝ মন/ একি তোর পরাজয়/ধুলিতে লুটায় প্রাণের বাসনা/হৃদয়ের সঞ্চয়'। এই স্থায়ীটুকু বৈতালিক হওয়ার পর কাট টুতে হেনার লিপে শোনা যায়, 'মিছে হলো সবি যে মোর/ আধার ঘনায় নয়নে/ হারিয়ে গেলো .../ যা ছিলো এই জীবনে' ।তার মানে সঙ্গীতের ব্যবহার ও প্রভাব নিয়ে আখ্যানের তথ্য-উপাত্তের সমর্থন পাওয়া যায় *এতটুকু আশায়*।

তবে *এতটুকু আশা* জুড়ে কোথাও সেই সময়ের রাজনৈতিক টানাপোড়েন কিংবা জাতি-রাষ্ট্রের উপস্থিতি চোখে পড়ে না। লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রের ধারাবাহিকতার সেই যুগে হয়তো নির্মাতা রাজনৈতিক টানাপড়েন হাজিরের ঝুঁকি নিতে চাননি কিংবা প্রয়োজন মনে করেননি। পরিবার ও বিয়ের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে এখানে কোনো জাতীয়/সামাজিক প্রতিষ্ঠান অনুপস্থিত। এমনকি জাতীয় পরিচয় নির্মাণের কোনো আকাঙ্ক্ষা কিংবা ব্যর্থতার ছাপও কোথাও নেই। বরং পুরো পরিস্থিতির জন্য দায় চাপানো হয়েছে ব্যক্তিমানুষের ওপর।

১৯৬৮ তে নির্মিত *এতটুকু আশা* বলা যায় লোকছবির চেক অ্যান্ড ব্যালান্স। এই চলচ্চিত্রটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্যাকে নিয়ে একটি ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি করে। *এতটুকু আশার* মধ্য দিয়ে সামাজিক সমস্যা নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণে নির্মাতারা আগ্রহী হন।

এদিকে ৬০ দশকের চলচ্চিত্র নিয়েও নকলের অভিযোগ যে উঠেনি এমন নয়। তবে সেটার মাত্রা খুব বেশি নয়। **এই দশকে নকলের প্রবণতা ছিলো ভাবগত অথবা স্বীকৃতি ছাড়া গল্পের ব্যবহার নিয়ে**। *রাজধানীর বুকে* ও *হারানো দিন*-এ ৫০ দশকের কলকাতার বাংলা চলচ্চিত্রের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সরাসরি কাহিনি নকল ধরা পড়ে ১৯৬৪ তে *সুতরাং*-এ। সুভাষ দত্ত নির্মিত প্রথম এই চলচ্চিত্রটির গল্প শচীন ভৌমিকের একটি গল্পের সঙ্গে ৯৫ শতাংশ মিলে যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রে কাহিনিকার হিসেবে অন্য একজনের নাম ছিলো।

একই রকম ঘটনা ঘটে লাহোরবাসী ও লন্ডন প্রবাসী এ কে কারদারের *জাগো হুয়া সাবেরার* (১৯৫৯) ক্ষেত্রে। চলচ্চিত্রটির আখ্যানভাগ মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ। কিন্তু মানিকের নাম বাদ দিয়ে কারদার এর কাহিনিকার হিসেবে কৃতিত্ব দেন উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে (কবির ২০১৮, পৃ৬৮)। তবে চলচ্চিত্রের এই নকল প্রবণতা সাধারণ দর্শক খুব বেশি আমলে নিয়েছেন বলে মনে হয়নি। কারণ এই দশকে তাদের কাছে অন্য অনেক কিছুর চেয়ে মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র ও তার জাদুময়তা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

২.৮.১) চলচ্চিত্রের গান

আখ্যানের তথ্য-উপাত্তে গানের ব্যাপারে দর্শকের দুর্বলতার কথা পাওয়া যায়। এই দশকের চলচ্চিত্রের একটা বড়ো জায়গা জুড়ে গানের প্রভাব ছিলো বলেও তারা মনে করেন। অনেক দর্শক প্রেক্ষাগৃহে আসতেন কেবল গানের জন্য। যশোরের শেখ রবিউল আলমের ভাষ্য হলো—'একটা চলচ্চিত্রের জন্য যে বিষয়গুলো দরকার—ভালো কাহিনি, সঙ্গীত ও আবহসঙ্গীত—তখনকার চলচ্চিত্রে সব ছিলো। তাই অনেক মানুষ কেবল গান শুনতে সিনেমাহলে যেতো। আমি নিজেও এই বয়সে গিয়েছি।' খুলনার 'সঙ্গীতা'র ক্যান্টিন মালিক আতিয়ার রহমান বলেন, 'আগের সিনেমার গান ভালো ছিলো। এখনো সেসব গান মানুষ শোনে। আগে গান শুনেই সিনেমার নাম বলে দেওয়া যেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৯)।' গান নিয়ে যশোরের শেখ রবিউল আলম আরো বলেন এভাবে,

> সিনেমাহলে সিনেমা দেখার পর দর্শক গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বের হবে; এটা কিন্তু ওই সময় ছিলো। আমার নিজেরও একটা গান যদি মনের মধ্যে একবার ঢুকে যেতো, তখন গাইতে গাইতে ঘুরতাম। এখন তার কোনো কিছুই নাই। আজকে যে সিনেমা হচ্ছে, সেখানে কাহিনিকারের-ই নাম নাই। চিত্রনাট্য, পরিচালনার কোনো মান নেই। এভাবে হয় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৮)!

এই সময়ের গান হৃদয়গ্রাহী হওয়ার ব্যাপারে অনেক মানুষের অবদান রয়েছে। প্রথিতযশা অনেক সঙ্গীতকার কাজ করেছেন দেশীয় চলচ্চিত্রে; যেমন, সমর দাস, রবীন ঘোষ, ওস্তাদ কাদের জামেরী, দেবু ভট্টাচার্য, ওস্তাদ ফজলুল হক, ওস্তাদ ওমর ফারুক, ওস্তাদ আবিদ হোসেন খান, সত্য সাহা, খান আতাউর রহমান, সুবল দাস, শহীদ আলতাফ মাহমুদ, আবদুল লতিফ, পণ্ডিত মোহনলাল দাস, সুজেয় শ্যাম, ওস্তাদ রাজা হোসেন খান প্রমুখ। এছাড়া আরো কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত সুরকার রয়েছেন—আজাদ রহমান, আলম খান, শেখ সাদী খান, খন্দকার নুরুল আলম, মনসুর আলী, ধীর আলী মিয়া, আমীর আলী, আলাউদ্দিন আলী, আনোয়ার উদ্দিন খান, মুসলেহ উদ্দিন, করিম শাহাবুদ্দিন প্রমুখ। এরা সঙ্গীত পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন। নানা পরিস্থিতিতে এরা চলচ্চিত্রে থাকতে পারেনি। কিংবা একটা গান সৃষ্টিতে যে ধরনের শ্রম, মেধা অর্থ দেওয়া দরকার পরবর্তী সময়ের অনেকে তা করেননি।

গান নিয়ে এই সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন চট্টগ্রামের এ টি এম ফারুক। তার অফিসে বসে এ নিয়ে যখন কথা হচ্ছিলো তিনি বেশ আবেগী হয়ে পড়েন। তিনি বলতে থাকেন,

> 'আকাশের গায়ে আছে একরাশ নীল' গানটা ৬০-এর দশকে সুভাষ দত্তের সুপারহিট সিনেমা *আয়না ও অবশিষ্ট*-এর। এই গানটা ছিলো ইন্টারভেল সিন। 'আলমাস'-এ আমরা তখন সিনেমাটা লাগাইনি। 'রঙ্গম' সিনেমাহলে লাগছিলো। আমি প্রত্যেকদিন খালি এই গানটা শোনার জন্য, রাতে আগে আগে এখানে ডিউটি শেষ করে 'রঙ্গম'-এ যেতাম। গানটা শুনে তারপর বাসায় যেতাম। শুধু এই গানটা শোনার জন্য তখনকার দিনে ছয় আনা গাড়ি আমাকে ভাড়া বেশি দিতে হতো। সিনেমাটা দুই সপ্তাহ চলছিলো, আমি প্রত্যেকদিন গেছি এই গান শোনার জন্য (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৯)।

২.৯) বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ

পূর্ববঙ্গের প্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্রযাত্রার শুরু হয়েছিলো ১৯৫৬ সালে *মুখ ও মুখোশ* নির্মাণের মধ্য দিয়ে। এই চলচ্চিত্রটিতেই একদিকে যেমন এই বঙ্গের মানুষ, তার সংস্কৃতি ও ভাষা ফুটিয়ে তোলা হয়। অন্যদিকে একই সময়ে এই ভূখণ্ডে বাঙালি শিক্ষিত হিন্দুদের প্রভাব মুক্ত হয়ে একটি বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। যারা পরবর্তী সময়ে শহুরে মধ্যবিত্ত হয়ে অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে দুটো ঘটনাই তৎকালীন পূর্ববঙ্গীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এই বাস্তবতায় চলচ্চিত্রের যেকোনো পর্যায়ের আলোচনার জায়গা থেকেই এই দশকটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে।

মধ্য ৫০ থেকে ৬০ দশকজুড়ে নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দেশীয় চলচ্চিত্র এগিয়েছে। ৫৬ তে *মুখ ও মুখোশ* মুক্তির পর পরবর্তী চলচ্চিত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিলো ১৯৫৯ পর্যন্ত। মূলত দেশীয় চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি সক্রিয় হয়েছিলো ৬০-এর দশক থেকে। এই দশকের চলচ্চিত্রের মান, ব্যবসা, শ্রেণিকরণ, নির্মাণশৈলী, তারকা-কুশীলব নিয়ে নানা সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে এই দশকে মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনার প্রধান জায়গা হয়ে উঠেছে এর প্রায়ুক্তিক জাদুময়তা বা জাদু-বাস্তবতা। কারণ যাত্রাপালা দেখে আসা এই দর্শকের কাছে চলচ্চিত্র ছিলো একধরনের ম্যাজিক, ফলে সেই ম্যাজিক দেখায় তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

গবেষক, লেখক ও তাত্ত্বিকদের মধ্যে এই দশকের চলচ্চিত্র নিয়ে নানা নেতিবাচক সমালোচনা থাকলেও দর্শক কিন্তু ঠিকই প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র দেখেছে। সেই চলচ্চিত্র কোন ভাষায় নির্মিত সেটাও তাদের কাছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। তারা সমান তালে সব ভাষার চলচ্চিত্র দেখেছে। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে নির্মিত উর্দু ভাষার চলচ্চিত্রও দুর্দান্ত ব্যবসা করেছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে। কারণ এই দর্শকের কাছে তখন চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, ভাষা নয়।

অন্যদিকে চলচ্চিত্র আমদানি নিয়ে যতো আলোচনা হয়েছে তা ছিলো মূলত চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী ও তৎকালীন সরকারের দিক থেকে। সেই সময় বিদেশি চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা নিয়েও বিভ্রান্তি ছিলো। রাষ্ট্র ও প্রযোজকরা তখন বিদেশি চলচ্চিত্র বলতে কেবল ভারতীয় চলচ্চিত্রই বোঝাতেন। এখানে তাদের রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিলো। কিন্তু দর্শকের দিক থেকে বাংলা, উর্দু কিংবা হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্র নিয়ে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া ছিলো না। তারা কেবল চলচ্চিত্র দেখেছে কিংবা দেখতে চেয়েছে।

মুখ ও মুখোশ-এর আগে পূর্ববঙ্গে যেসব চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছিলো, সেখানে নারী অভিনয়শিল্পী পাওয়া নিয়ে কিছুটা সঙ্কট থাকলেও পরে এই সমস্যা আর থাকেনি। *মুখ ও মুখোশ*-এর সময় থেকেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পারিবারের নারীদের অভিনয়ে আগ্রহী হতে দেখা গেছে। শুরুর এই অভিনয়শিল্পীরা আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জাদু-বাস্তব মাধ্যম চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহের কারণেই অর্থনৈতিক দিকটি নিয়ে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না। তারা এই মাধ্যমে অভিনয়ের সুযোগটাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। দর্শকও

সবকিছু বাদে অভিনয়ের দিকেই মনোযোগ দিতেন। ফলে অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে যারা ভালো অভিনয় করেছেন তারা টিকে গেছেন বাকিরা হারিয়ে গেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সেই সময়ের অভিনয়শিল্পীদের কেউ-ই শারীরিক সৌন্দর্য দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি, অভিনয় দক্ষতা দিয়েই হতে হয়েছে। এছাড়া প্রেক্ষাগৃহ কম হওয়ায় দর্শক চলচ্চিত্র দেখা সুযোগও কম পেতো, সে কারণে এই দশকে সেই অর্থে কোনো তারকা সৃষ্টি হয়নি। তবে বর্তমানের দর্শকও সেই ৬০-এর দশকের অনেক অভিনয়শিল্পীর অভিনয় মনে রেখেছেন।

এই দশকের চলচ্চিত্রের ব্যবসা নিয়ে যতো আলোচনা হয়েছে, সেই তুলনায় প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কম। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে প্রেক্ষাগৃহ ছিলো মাত্র ১১০টি। তাও ছিলো বড়ো শহরগুলোতে; ফলে বিশাল অংশের দর্শক চলচ্চিত্র দেখার সুযোগই পায়নি। তারপরও শহুরে নিম্নবিত্ত, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখেছে। মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের যে জাদুময়তা দর্শককে চলচ্চিত্রের সব শ্রেণিকরণের উর্ধ্বে প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে গেছে। ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের মান নয়, জরুরি ছিলো প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ সৃষ্টি করা।

১৯৬৫ সালে যাত্রাপালার কাহিনি নিয়ে একই নামে *রূপবান* নির্মিত হয়। শেকড়ের গল্প হিসেবে *রূপবান* জনপ্রিয় হতে পারে সেটা হয়তো কিছু ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত ছিলো। কিন্তু এর বাইরেও কিছু কারণ ছিলো। **প্রথমত**, 'রূপবান' ছিলো সেই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় যাত্রাপালা। এই যাত্রাপালাটি এতোটাই জনপ্রিয় ছিলো যে সেসময় এর গ্রামোফোন রেকর্ড পর্যন্ত প্রকাশ হয়। তার মানে যাত্রা দেখতে যেতে পারে না কিংবা 'রূপবান'কে বারবার দেখতে চান এমন লোকজন গ্রামোফোন রেকর্ডিং শুনে তাদের সেই তৃষ্ণা মেটাতো। এরফলে যেটা হয় তা হলো পারফর্মিং আর্টস যাত্রাপালার যান্ত্রিক রূপান্তর ঘটে। **দ্বিতীয়ত,** চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক জাদুময়তার সঙ্গে 'রূপবান'-এর চির চেনা আখ্যানের সম্মিলন হয়; ফলে দর্শক একদিকে যেমন অভিভূত হয়েছে, অন্যদিকে অচেনা এই মাধ্যমটিকে তারা প্রথম আপন করে নিতে পেরেছিলো। ফলে সবকিছু মিলিয়ে *রূপবান* হয়ে উঠেছিলো অনন্য।

৬০ দশকে চলচ্চিত্র নির্মাণই প্রধান ছিলো; তার শৈল্পিক ও নান্দনিক বিষয়গুলো বিবেচনায় ছিলো অনেক পরে। দর্শকও এগুলোকে খুব বেশি আমলে নিয়েছে বলে মনে হয়নি। দীর্ঘ দিন ধরে যাত্রায় দেখে আসা দর্শক 'রূপবান'-এর কাহিনি চলচ্চিত্রের জাদুময়তায় যখন পর্দায় দেখেছে, তখন তারা যতোটা কাহিনি বা গান শুনেছে তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্মিত হয়েছে। এই বিস্ময়ই *রূপবান*কে চলচ্চিত্র ব্যবসার ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে। একই কারণে সে সময়ের বেশিরভাগ চলচ্চিত্রই ব্যবসা করেছে।

আগেই বলা হয়েছে চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক জাদু-বাস্তবতার এই সময়ে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের অভাব ছিলো না; বরং সেসময় যথেষ্ট প্রেক্ষাগৃহ ও চলচ্চিত্রই নির্মাণ হয়নি। তবে এই সময়ের চলচ্চিত্রের আধেয়ের

ক্ষেত্রে দুইটা বিষয় মাথায় রাখতে হয়েছে। এর একটি গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের যে উপাখ্যান যেমন, যাত্রা-পালাগান, রূপকথা, চেনা সাহিত্য ইত্যাদিকে জাদু-বাস্তবতায় উপস্থাপন করা। অন্যটি শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি—যারা তখনো পুরোপুরি বিকশিত নয়—তারাও তাদের জীবনকে চলচ্চিত্রে নির্মাণের চেষ্টা শুরু করেন। জাদু-বাস্তবতা, গ্রামীণ উপাখ্যান ও শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিজের গল্প বলার চেষ্টা এই তিন সংযোগে ৬০-র দশকে তখনকার রাজনৈতিক ইতিহাস ছাপিয়ে সামাজিক ইতিহাসের টানাপড়েন চলচ্চিত্রে হাজির হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সত্তরের দশক : সমাজ বাস্তবতার পুনরাবিষ্কার

৩.১) সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

৭০ দশকে একদিকে যেমন রাষ্ট্রবিপ্লবের একটা উচ্ছ্বাস ছিলো, অন্যদিকে পর পর ঘটে যাওয়া অনেকগুলো নির্মম হত্যাকাণ্ড, রক্তপাত আর হানাহানির রাজনীতি সক্রিয় ছিলো। ফলে এই দশকের সমাজ-বাস্তবতাকে বুঝতে হবে সেই রাষ্ট্রবিপ্লব এবং তার পরে ঘটে যাওয়া রক্তপাত ও হানাহানির রাজনীতির ভিতর দিয়ে; যার শেষটা ঘটেছিলো সামরিকায়ন দিয়ে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সামান্য কিছু মানুষের হাতে যেমন প্রচুর অর্থবিত্ত দেখা যায়, তেমনি একটা বিশাল অংশের জনগণ ভয়াবহ সমস্যার মধ্যে ছিলো। শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ ছিলো পূর্ব পাকিস্তানি বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক সংগঠন। ফলে স্বাধীনতার পর এর সমর্থকদের একটা বড়ো অংশ একদিকে যেমন অর্থ উপার্জনে মনোনিবেশ করলো, অন্যদিকে কেউ কেউ শিল্প-সাহিত্যে ভূমিকা রাখার চেষ্টা শুরু করলো। মূলত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজেদের স্বার্থের তাগিদেই আওয়ামী লীগের পিছনে দাঁড়িয়েছিলো। তারা মনে করেছিলো, বাংলাদেশ যদি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছয় দফা দাবি আদায়ে সক্ষম হয়, তাহলে তারা ব্যবসা বাণিজ্য, কারবার, চাকরি-বাকরিতে পশ্চিম পাকিস্তানি মধ্যবিত্তের সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে। এছাড়া বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এবং জনগণ আওয়ামী লীগকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিলো। আহমেদ ছফার (ছফা ২০০৭, পৃ৯৮) বিশ্লেষণেও একই ধরনের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

স্বাধীনের পর এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা অংশ চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়ে নিজেরা নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এদের বেশিরভাগই সদ্য মুক্তিযুদ্ধ ফেরত ছিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের উচ্ছ্বাসে এদের মধ্যে জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা আকাঙ্ক্ষা ছিলো বলে মনে হয়েছে। যদিও পরে তা আর বেশি দূর এগোয়নি। আর একটা পক্ষ ছিলো যারা মূলত বিদেশি চলচ্চিত্র দেখা, তা নিয়ে পাঠচক্র, লেখালেখির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, মানে চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীরা ফিল্ম ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। এদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা, নির্মাতা আলমগীর কবির, বাদল রহমান, সৈয়দ সালাহ উদ্দীন জাকী, মুহম্মদ খসরু প্রমুখ ছিলেন। ১৯৭৩ সালেই সরকার দেশে একটি ফিল্ম ইন্সটিটিউট চালুর উদ্যোগ নেয়। কিন্তু সে উদ্যোগ আর পরে কার্যকর হয়নি। এরপরে ১৯৭৮ সালের ২২ জুন সরকার 'বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট ও আর্কাইভ' স্থাপনের ঘোষণা দেয়। স্বাধীনের পর পরই '৭৫ পর্যন্ত অনেকে অবশ্য ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে সেখানে চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়তে যান। ফিরে এসে তাদের বেশিরভাগকেই দেশীয় চলচ্চিত্রে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি।

মুক্তিযুদ্ধের পর সেন্সরবোর্ড থেকে শুরু করে চলচ্চিত্রের সব শাখায় সরকারি দলের লোকজন প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এরা সামগ্রিক স্বার্থের চাইতে ব্যক্তি স্বার্থকেই বড়ো করে দেখা শুরু করেছিলেন। ফলে এসব সেক্টরে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা দেখা দেয়। নির্মাতা আলমগীর কবিরের (কবির ২০০৮, পৃ৮১) বক্তব্য এর সমর্থন পাওয়া যায়।

স্বাধীনতার অল্প সময়ের মধ্যে আরেকটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, একটা পক্ষ ভারত বিরোধী অবস্থান নেন এবং অন্যটি ভারতের সমর্থনে কাজ করতে থাকেন। ঐতিহাসিক সত্য হলো, ভারতের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সারাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক গুণ খারাপ হয়। অনেকে এর জন্য ভারতকে দায়ী করেন। এই পরিস্থিতির বর্ণনা পাওয়া যায় ছফার ভাষ্যে—"সবচেয়ে সত্য কথা, তিন চার বছরের মধ্যে একেবারে সাধারণ অবস্থার মধ্য থেকে যে শাসক নেতৃশ্রেণীটি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দৌলতে দুধের সরের মত ভেসে উঠেছিল, জনগণের দুঃখ এবং কষ্টভোগের প্রতি তাঁদের কোন সহানুভূতি নেই। ... যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের অভাব, দুর্ভিক্ষ, প্রবলের উৎপীড়ন—সবকিছুর জন্যই জনগণের মুখ্য অংশ ভারতকে দোষারোপ করতে থাকল। ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ, অনেক সাম্প্রদায়িক দল এই সুযোগে হিন্দুত্ব এবং ভারতীয়তাকে একেবারে প্রকাশ্যে জনগণের সামনে তুলে ধরল" (ছফা ২০০৭, পৃ১৩১)। এই দ্বন্দ্বটা সে সময় সামগ্রিকভাবে বেশ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। যা রাষ্ট্রবিপ্লবের যে উচ্ছ্বাস সেটাকে খুব বেশি উপভোগ করতে দেয়নি সব শ্রেণিপেশার মানুষকে।

অন্যদিকে রাষ্ট্রবিপ্লবের উচ্ছ্বাসে অল্প দিনের মধ্যে দেশে 'একনায়কতান্ত্রিক' বাকশালীয় ব্যবস্থা চালু হয়। এর সঙ্গে ৭৪-এর মন্বন্তরের পূর্বাপর একটা সম্পর্ক ছিলো। এর আগে পরে অবশ্য দেশে অনেকগুলো নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এতো সব ঘটনার ফল হিসেবে ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন ধাপে ধাপে দেশে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া নীতি অনুসরণ করে। ওই সময় শিল্পনীতি বেসরকারি খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার অনুকূলে ছিলো।

৭৫ পরবর্তী সময়ে দেশীয় চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত আসে, দেশে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াস দেখা যায়। সরকারি অনুদানের এই ঘোষণায় বিভিন্ন মহল থেকে তখন সাধুবাদও জানায়। কারণ দীর্ঘ দিন ধরেই চলচ্চিত্রনির্মাতা, তরুণ নির্মাতা কলাকুশলী এবং চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীরা অনুদান চালুর জন্য দাবি জানিয়ে আসছিলো। এছাড়া জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রণয়ন ও চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সিদ্ধান্তগুলো সেসময় জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের অংশ হিসেবে কাজ করেছিলো।

৩.২) একনজরে ৭০ দশকের চলচ্চিত্র

এই দশকে চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে মোট ৩৩৮টি (আলম ২০১১ ও কাদের ১৯৯৩)। ১০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে ১৯৭৯ সালে ৫০টি; ১৯৭১ সালে মুক্তি পেয়েছে সবচেয়ে কম

মাত্র আটটি। এই দশক মূলত দুই ভাগে বিভক্ত—**স্বাধীনতাপূর্ব-স্বাধীনতাযুদ্ধ** এবং **স্বাধীনতা উত্তর**। স্বাধীনতা পূর্বকালে মানে ১৯৭০ সালে ব্যবসা সফল হয়েছে মাত্র দুটি চলচ্চিত্র—জহির রায়হানের *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) ও কাজী জহিরের *মধু মিলন* (১৯৭০) (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৬৮)। ৭০-এর উত্তাল গণআন্দোলন ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে মুক্তি পায় *জীবন থেকে নেয়া*। চলচ্চিত্রটি দেখার জন্য সেসময় বিপুল সংখ্যক দর্শক সমাগম ঘটে প্রেক্ষাগৃহগুলোতে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। বিশেষ করে নির্মাণ ব্যয় ও সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি চলচ্চিত্রশিল্পে অনেক পুঁজির সমাগম ঘটে। ১৯৭২ সালে মুক্তি পায় মোট ৩০টি চলচ্চিত্র। এ বছর দুটি চলচ্চিত্র ব্যবসা সফল হয়। ৭২-এর আগস্টে মুক্তি পায় মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র চাষী নজরুল ইসলামের *ওরা ১১ জন* (১৯৭২)। এটি দর্শকের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং ব্যবসা করে। এছাড়া ব্যাপকভাবে ব্যবসা সফল হয় কাজী জহিরের *অবুঝ মন* (১৯৭২)। সামাজিক ঘরানার এই চলচ্চিত্রটি মুক্তির পর কয়েক বছর টানা ব্যবসা করে। **১৯৭৩ সালে সবচেয়ে ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র রাজ্জাক অভিনীত জহিরুল হক পরিচালিত *রংবাজ* (১৯৭৩)। এই চলচ্চিত্রে প্রথমবারের মতো পদ্ধতিগত মারপিট দৃশ্য সংযোজিত হয়।** এই সময়ের চলচ্চিত্র নিয়ে রাজশাহীর ‘উপহার সিনেমা’র নৈশপ্রহরী মো. জাহাঙ্গীরের ভাষ্য এমন—

> স্বাধীনতার পরে যে বই চলেছে, সে বই-ই সিনেমাহলে দেখার জায়গা পায়নি দর্শকেরা। গরিব-দুঃখী, মা-বোন সবাই মিলে তখন বই দেখেছে। *ময়নামতি*, *অবুঝ মন*, *রংবাজ*, *রাখালবন্ধু*—এই সব বই দেখার জন্য সিনেমাহলে লোকে জায়গা পায় নাই। তখন মা-বোনরা দেখেছে। আমাদের এই সিনেমাহলেই তো জায়গা পায় নাই দর্শক (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৩)।

১৯৭৫ সালে মুক্তি পায় প্রমোদ কর এর *সুজন সখি*। গ্রামীণ পটভূমিতে কিশোর প্রেমের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্রটি দর্শকের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। “সত্তরের দশকের অন্যতম প্রধান ব্যবসা সফল ছবি ‘সুজন সখি’র মুনাফার পরিমাণ জানা না গেলেও তা প্রায় কোটি টাকার কাছাকাছি হবে বলে অনুমিত হয়” (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৬৯)। এছাড়া এম এ কাশেমের *বাহরাম বাদশা* (১৯৭৪), মাসুদ পারভেজের *মাসুদ রানা* (১৯৭৪), মিতার *লাঠিয়াল* (১৯৭৫), এস এম শফির *দি রেইন* (১৯৭৬), আমজাদ হোসেনের *নয়ন মণি* (১৯৭৬), ইবনে মিজানের *বাহাদুর* (১৯৭৬), কামাল আহমেদের *দাতা হাতেম তাই* (১৯৭৭), দেওয়ান নজরুলের *দোস্ত দুশমন* (১৯৭৭), এ জে মিন্টুর *মিন্টু আমার নাম* (১৯৭৮), আবদুল্লাহ আল মামুনের *সারেং বউ* (১৯৭৮), আমজাদ হোসেনের *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮), এফ কবীর চৌধুরীর *বুলবুল এ বাগদাদ* (১৯৭৯), দেওয়ান নজরুলের *বারুদ* (১৯৭৯) চলচ্চিত্রগুলো ভালো ব্যবসা করে। এই সময়ে চলচ্চিত্রের ব্যবসা নিয়ে কথা হয় মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের ‘ভিক্টোরিয়া

সিনেমা'র মালিক গোপেন্দ্র কুমার দাশের সঙ্গে। একসময়ের তিনটি প্রেক্ষাগৃহের মালিক যোগেন্দ্র এখন প্রায় নিঃস্ব। তার 'ভিক্টোরিয়া সিনেমা' এখন ধুক ধুক করে চলছে। প্রেক্ষাগৃহের অফিসের বসেই পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি বলেন,

> তখন ব্যবসার অবস্থা খুবই ভালো ছিলো, সিনেমা লাগালেই হাউজফুল। সরকারকে তখন মাসে ৪০–৫০ হাজার টাকা ট্যাক্স দিয়ে সবকিছু বাদে দুই-তিন লক্ষ টাকা লাভ থাকতো। তখন সিনেমার রেন্টালও ছিলো কম; নরমাল সিনেমার রেন্টাল চার–পাঁচ হাজার টাকা, আর সুপার হিট সিনেমা হলে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.২৫)।

গোপেন্দ্র কুমার দাশ আরো বলেন, '**তখনকার টাকার হিসাব করা আসলে কঠিন ছিলো**। আমার তখন তিনটা সিনেমাহল; সবগুলো থেকে মাসে অনেক টাকা আসতো; পরিস্থিতি এমন ছিলো যে, সেই টাকার হিসাব রাখাও কঠিন হতো।'

স্বাধীনতা উত্তরকালে চলচ্চিত্রের এই রমরমা ব্যবসার মধ্যে কিছু নকল চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে। সবমিলিয়ে এই দশকে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তনগুলো আসে সেগুলো হলো—

> **প্রথমত,** ৬০ দশকের উর্দু ভাষার চলচ্চিত্রের নির্মাণ ৭০-এ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে সামাজিক ঘরানার কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে;
>
> **দ্বিতীয়ত,** মুক্তিযুদ্ধের পর তা নিয়ে নতুন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়;
>
> **তৃতীয়ত,** *রূপবান*-এর পর লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রের যে জোয়ার আসে তাও এই দশকে খানিকটা নিষ্প্রভ হয়;
>
> **চতুর্থত,** মারপিট সম্বলিত নতুন ধারার এক ধরনের চলচ্চিত্র যাত্রা শুরু করে;
>
> **পঞ্চমত,** নকল চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা দেখা যায়;
>
> **ষষ্ঠত,** সাহিত্যাশ্রয়ী বেশকিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়।

কতো ধরনের চলচ্চিত্র এই দশকে নির্মাণ হয়েছে এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। এই দশকের শুরুতেই গণআন্দোলন নিয়ে *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) নির্মাণ করে জহির রায়হান আলোচনায় আসেন। এ ধারার চলচ্চিত্র আর হয়নি বললেই চলে। তবে মুক্তিযুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকে সরাসরি বিষয় করে প্রথম নির্মিত হয় চাষী নজরুল ইসলামের *ওরা ১১জন* (১৯৭২)। এরপর একে একে নির্মাণ হয় সুভাষ দত্তের *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২), মমতাজ আলীর *রক্তাক্ত বাংলা* (১৯৭২), খান আতাউর রহমানের *আবার তোরা মানুষ হ* (১৯৭৩), মিতার *আলোর মিছিল* (১৯৭৪)। কুড়িগ্রামের

শহরতলী কাঠালির ‘স্বর্ণমহল’-এর ৩৫ মি মি প্রজেক্টর অপারেটর কিনু বাবু বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের কিছু সিনেমা সেসময় ভালো ছিলো। কিন্তু কিছু সিনেমায় অহেতুক নাচ-গান, ধর্ষণ দেখানো হতো। অবশ্য দর্শক সেগুলো ভালো পছন্দই করতো। আমরা এসব সিনেমা দিয়ে ভালোই ব্যবসা করছিলাম সেসময় (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৭)।’

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যেও দশকজুড়ে কিছু সামাজিক ঘরানার চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়—আমজাদ হোসেনের *নয়নমনি* (১৯৭৬), *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮), এম আবদুস সামাদের *সূর্য গ্রহণ* (১৯৭৬) এবং *সূর্য সংগ্রাম* (১৯৭৯), আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সারেং বউ* (১৯৭৮) এবং *এখনই সময়* (১৯৮০), নারায়ণ ঘোষের *লাঠিয়াল* (১৯৭৫), কাজী জহিরের *মধুমিলন* (১৯৭০), *অবুঝ মন* (১৯৭২) ও *বধূবিদায়* (১৯৭৮) ইত্যাদি। এই ধরনের চলচ্চিত্র নিয়ে কথা হয় যশোরের ‘তসবির মহল’-এর প্রবীণ গেইটম্যান কাম প্রচারের দায়িত্বে থাকা প্রহ্লাদ দাশের সঙ্গে। ছয়টার শো করে গেইটের সামনে একাই বসেছিলেন প্রহ্লাদ। সুখ, দুঃখের নানা স্মৃতিচারণ করেন তিনি। ৭০ দশকের চলচ্চিত্র নিয়ে তার ভাষ্য ছিলো এমন—

> তখন রাজ্জাক, কবরী, আলমগীর, জাফর ইকবাল, ফারুক, বুলবুল আহমেদ, ববিতা এরা সব এক মাপের ছিলো। তারা সবাই সামাজিক সিনেমা করতো, দেখার মতো। দর্শক একবার কেউ সেই সিনেমা দেখলে পরে আরো সাতবার দেখতো। তখন মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা তো মানুষ দেখতোই, কিন্তু সামাজিক সিনেমারও খুব ডিমান্ড ছিলো। এই সময় *অবুঝ মন* নামে একটা সিনেমা হয়েছিলো, সব শ্রেণির মানুষ সিনেমাটা দেখছে। এই সিনেমার কাহিনিতে প্রেম, বন্ধুত্ব, বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, সবাই ছিলো। এই ধরনের সিনেমা হলে এখনো চলবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫)।

১৯৭০-এ কাজী জহিরের *মধুমিলন* ও ৭২-এ *অবুঝ মন* সুপার হিট ব্যবসা করে। সামাজিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মিষ্টি প্রেমের এসব ছবি তখন একটি নতুন ধারা তৈরি করেছিলো। এসময় অনেকেই এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের আগ্রহী হন। এসব চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা নিয়ে খুলনার ‘সঙ্গীতা’র ব্যবস্থাপক মহিউদ্দিন আহমেদ পান্না বলেন, ‘তখন সিনেমাহল ছাড়া চিত্তবিনোদনের আর কোনো মাধ্যম ছিলো না। আর তখন সিনেমাও অনেক বেশি সামাজিক ছিলো। সামাজিক সিনেমার চাহিদাও ছিলো। মা-বাবা ভাইবোন, ছেলেমেয়ে নিয়ে সেসব সিনেমা দেখা যেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৫)।’

এই দশকে একেবারে নতুন ধারার চলচ্চিত্র বলতে শুরুতেই আসে *রংবাজ* (১৯৭৩) এর নাম। জহিরুল হক পরিচালিত এই চলচ্চিত্রে প্রথম পদ্ধতিগত মারপিট দৃশ্য দেখা যায়। *রংবাজ* এর ব্যবসায়িক সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয় অন্যান্য পরিচালকরা। তবে এই বছরের আলোচিত চলচ্চিত্র ঋত্বিক কুমার ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম*। ভারতের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনার এই চলচ্চিত্রটি অদ্বৈত মল্লবর্মণের একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত। জাকির হোসেন রাজুর ভাষায়, “আমাদের চলচ্চিত্র ইতিহাসে ‘তিতাস একটি মহান মানব চিত্র’” (রাজু ১৯৯০, পৃ৯২)।

তিতাস একটি নদীর নাম ছাড়াও ৭০ দশকজুড়ে সাহিত্য থেকে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। এর মধ্যে আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' অবলম্বনে সুভাষ দত্তের *বসুন্ধরা* (১৯৭৭), আমজাদ হোসেনের নিজের উপন্যাস থেকে নির্মিত *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮), শহীদুল্লাহ কায়সারের উপন্যাস অবলম্বনে আবদুল্লাহ আল মামুনের পরিচালনায় *সারেং বউ* (১৯৭৮), আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী' নিয়ে মসিউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলীর চলচ্চিত্র *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৭৯)। সাহিত্য থেকে নির্মিত এই দশকের প্রত্যেকটি চলচ্চিত্র আলোচিত হয়। এর মধ্যে *সূর্য দীঘল বাড়ী* সরকারি অনুদানে নির্মিত।

১৯৭৪ সালে নির্মাণ হয় গোয়েন্দা কাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্র মাসুদ পারভেজের *মাসুদ রানা*। এধরনের চলচ্চিত্র সেই অর্থে এর আগে নির্মাণ হয়নি বাংলাদেশে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি; বাংলাদেশে যখন *মাসুদ রানা* মুক্তি পাচ্ছে, ঠিক সেই সময় ভারতে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত গোয়েন্দা কাহিনি *সোনার কেল্লা* (১৯৭৪) মুক্তি পায়। গোয়েন্দা কাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে সত্যজিৎ নির্মাণ করে *জয় বাবা ফেলুনাথ*। এই চলচ্চিত্রগুলো সেসময় খুব প্রশংসিত হয়। পরবর্তী সময়ে ভারতে এমনকী বর্তমানেও গোয়েন্দা কাহিনি একটি প্রভাবশালী ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। অথচ বাংলাদেশে এই ধারার চলচ্চিত্র পরে আর তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

১৯৭৫-এ সামাজিক ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্যেই ফ্যান্টাসি, মারপিট ও যৌনতা নির্ভর নৃত্য প্রাধান্য পেতে থাকে। এই ধরনের চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলেন চট্টগ্রামের 'সিনেমা প্যালেস'-এর ৩৫ মি মি প্রজেক্টর অপারেটর, বর্তমানে গেইটম্যান হাজী মো. সেলিম। তার সঙ্গে কথা হয় প্রেক্ষাগৃহের সামনের ফাঁকা জায়গায় একটা ভ্রাম্যমাণ চায়ের দোকানে বসে। সেলিম বলেন,

> ইবনে মিজান সাহেবরা একধরনের সিনেমা করছে, সেগুলো ফ্যান্টাসি সিনেমা। দর্শক কিন্তু এসব সিনেমা দেখছে। এই সিনেমার খুব জনপ্রিয়তা ছিলো। দর্শক সিনেমা দেখতো আর হাততালি দিতো। তাদের সে কী চিৎকার, উল্লাস! এসব সিনেমায় নাচ-গানও ছিলো একটু অন্যরকম। ইবনে মিজানের বেশিরভাগ সিনেমা এরকম ছিলো। ওনাকে দর্শক নামেই চিনতো। এদের মতো পরিচালক আর আসবে না বাংলাদেশে (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৬)।

সবমিলিয়ে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ছয় ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা বলেন গবেষক চিন্ময় মুৎসুদ্দী। সেগুলো হলো—১. মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর সমাজ ও সমস্যা নিয়ে চলচ্চিত্র; ২. রূপকথাভিত্তিক চলচ্চিত্র; ৩. লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র; ৪. ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলচ্চিত্র; ৫. নাচ-গান, পদ্ধতিগত মারপিট ও উচ্চতর নাটকীয়তা নির্ভর চলচ্চিত্র; ৬. বিবিধ (মুৎসুদ্দী ১৯৮৭, পৃ৫০)। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে চিন্ময় মুৎসুদ্দীর এই ধারা বিন্যাস যথাযথ হয়নি। যদিও তিনি বিবিধ বলে একটি ধারার কথা বলেছেন, কিন্তু তা দিয়ে দায়সারাভাবে অন্যান্য ধারাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলেই মনে হয়েছে।

এখানে আরেকটি বিষয়টি নিয়ে কথা বলা দরকার, অঞ্চলভিত্তিক আখ্যানে দর্শক স্মৃতিতে চলচ্চিত্রের যে প্রাবল্য দেখা গেছে সেটাও এই দশককে বোঝার জন্য জরুরি (সারণী ৩.১.১)।

সারণী ৩.১.১ : ৭০ দশকের চলচ্চিত্র ও দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
১.	দর্পচূর্ণ	৫	১৯৭০	নজরুল ইসলাম
২.	দ্বীপ নেভে না	১	১৯৭০	মিতা
৩.	জীবন থেকে নেয়া	৩	১৯৭০	জহির রায়হান
৪.	পিচ ঢালা পথ	২	১৯৭০	এহতেশাম
৫.	ক খ গ ঘ ঙ	৩	১৯৭০	মিতা
৬.	মধুমিলন	৪	১৯৭০	কাজী জহির
৭.	নাচের পুতুল	১	১৯৭১	অশোক ঘোষ
৮.	স্বরলিপি	২	১৯৭১	নজরুল ইসলাম
৯.	ওরা ১১ জন	৪	১৯৭২	চাষী নজরুল ইসলাম
১০.	অশ্রু দিয়ে লেখা	২	১৯৭২	কামাল আহমেদ
১১.	**অবুঝ মন**	**২৯**	**১৯৭২**	**কাজী জহির**
১২.	বাঘা বাঙ্গালী	১	১৯৭২	আনন্দ
১৩.	রংবাজ	১০	১৯৭৩	জহিরুল হক
১৪.	আবার তোরা মানুষ হ	১	১৯৭৩	খান আতাউর রহমান
১৫.	ঝড়ের পাখি	২	১৯৭৩	জামান
১৬.	দস্যুরানী	১	১৯৭৩	সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া
১৭.	অবাক পৃথিবী	৬	১৯৭৪	মুস্তফা মেহমুদ
১৮.	জিঘাংসা	৩	১৯৭৪	ইবনে মিজান
১৯.	আলোর মিছিল	২	১৯৭৪	মিতা
২০.	বেঈমান	৫	১৯৭৪	রুহুল আমিন
২১.	ডাকু মনসুর	৫	১৯৭৪	ইবনে খসরু নোমান
২২.	এপার ওপার	১	১৯৭৫	মাসুদ পারভেজ
২৩.	সুজনসখি	২	১৯৭৫	প্রমোদকর
২৪.	দুই রাজকুমার	১	১৯৭৫	ইবনে মিজান
২৫.	বাহাদুর	৭	১৯৭৬	ইবনে মিজান
২৬.	আগুন	১	১৯৭৬	মোহসীন
২৭.	দ্য রেইন	৪	১৯৭৬	এস এম সফী
২৮.	একমুঠো ভাত	১	১৯৭৬	ইবনে মিজান
২৯.	নয়নমণি	২	১৯৭৬	আমজাদ হোসেন
৩০.	সূর্যকন্যা	১	১৯৭৬	আলমগীর কবির
৩১.	সমাধি	৩	১৯৭৬	দিলীপ বিশ্বাস
৩২.	জীবন সাথী	১	১৯৭৬	নূরুল হক বাচ্চু
৩৩.	গুন্ডা	১	১৯৭৬	আলমগীর কুমকুম
৩৪.	**দোস্ত দুশমন**	**১১**	**১৯৭৭**	**দেওয়ান নজরুল**
৩৫.	কুয়াশা	১	১৯৭৭	আজিজুর রহমান
৩৬.	সীমানা পেরিয়ে	২	১৯৭৭	আলমগীর কবির
৩৭.	বসুন্ধরা	১	১৯৭৭	সুভাষ দত্ত
৩৮.	মতিমহল	৫	১৯৭৭	অশোক ঘোষ
৩৯.	নিশান	৫	১৯৭৭	ইবনে মিজান

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
৪০.	বধূবিদায়	৯	১৯৭৮	কাজী জহির
৪১.	গোলাপী এখন ট্রেনে	৩	১৯৭৮	আমজাদ হোসেন
৪২.	রাজদুলারী	৪	১৯৭৮	শফি বিক্রমপুরী
৪৩.	তুফান	২	১৯৭৮	অশোক ঘোষ
৪৪.	ডুমুরের ফুল	১	১৯৭৮	সুভাষ দত্ত
৪৫.	বন্ধু	৩	১৯৭৮	দিলীপ বিশ্বাস
৪৬.	সারেং বউ	২	১৯৭৮	আবদুল্লাহ আল মামুন
৪৭.	আসামী	৪	১৯৭৮	দিলীপ বিশ্বাস
৪৮.	ঈমান	৩	১৯৭৯	মমতাজ আলী
৪৯.	বারুদ	১	১৯৭৯	দেওয়ান নজরুল
৫০.	মাটির ঘর	৩	১৯৭৯	আজিজুর রহমান
৫১.	রুপালী সৈকত	১	১৯৭৯	আলমগীর কবির
৫২.	বুলবুল ই বাগদাদ	১	১৯৭৯	এফ কবীর চৌধুরী
৫৩.	শীষনাগ	১	১৯৭৯	এফ কবীর চৌধুরী
৫৪.	নাগ-নাগিনী	১	১৯৭৯	ইবনে মিজান

সারণী ৩.১.২ : চলচ্চিত্রের ধরনের প্রাবল্য

চলচ্চিত্রের ধরন	সংখ্যা
সামাজিক চলচ্চিত্র	৩০
লোককাহিনি ও ফ্যান্টাসি	১৩
অ্যাকশনধর্মী	৬
মুক্তিযুদ্ধ	৪
সাহিত্যনির্ভর	১

আখ্যানে দর্শক স্মৃতিতে চলচ্চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধের দশক হলেও সেখানে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র রয়েছে মাত্র চারটি। ৬০ দশকের রেকর্ড ব্যবসা করা লোককাহিনি ও ফ্যান্টাসি ভিত্তিক চলচ্চিত্রও খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি এই দশকে। বরং এই দশকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে সামাজিক ঘরানার চলচ্চিত্র, যেখানে গ্রামের জায়গায় প্রতিস্থাপিত হচ্ছে শহুরে জীবন। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিজেদের জীবনের গল্পটা এখানে পুনরায় নির্মাণ করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়েছে। ৬০ দশকে প্রাযুক্তিক মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের যে জাদু-বাস্তবতা সেটাও এই দশকে কিছুটা হলেও কমতে শুরু করে। এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, এই পরিসংখ্যান কিন্তু দর্শক স্মৃতি থেকে ওঠে আসা, এখানে অন্যপক্ষটি মানে নির্মাতা-প্রযোজকের দিকটি নেই বললেই চলে।

তবে এখানে একটি বিষয় না বললেই নয়, শিল্প ও নান্দনিক বিচারে অপেক্ষাকৃত ভালো মানের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩), *সূর্য দীঘল বাড়ী*র (১৯৭৯) মতো চলচ্চিত্র এই দশকে নির্মাণ হলেও তা গবেষণা আখ্যানের দর্শক স্মৃতিতে পাওয়া যায় না। একেবারে গ্রামীণ জীবনের বাস্তবচিত্র নিয়ে নির্মিত এই চলচ্চিত্রগুলো সেই অর্থে দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। অথচ শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি তার ফেলে আসা গ্রামীণ সমাজ বাস্তবতার পুনরাবিষ্কারের একটা চেষ্টা করেছিলেন এসব চলচ্চিত্রে। অন্যদিকে আরেকটি পক্ষ শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প নিয়ে সামাজিক চলচ্চিত্রের যে ধারা তৈরি করেন তার প্রভাব এই দশকের চলচ্চিত্র ব্যবসায় যেমন আছে, তেমনই দর্শক স্মৃতিতেও আছে।

৩.৩) চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর

৭০ দশকে রাষ্ট্র নানাভাবে চলচ্চিত্রকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রভাবকে তিনটি সময়পর্বে ভাগ করা যায়—**প্রথমত**, যুদ্ধের আগে ১৯৭০ সালে মানে জহির রায়হানের *জীবন থেকে নেয়া*কে ঘিরে রাষ্ট্রের নানা পদক্ষেপ; **দ্বিতীয়ত**, যুদ্ধের পর থেকে ১৯৭৫ এর আগস্ট পর্যন্ত; **তৃতীয়ত**, ৭৫-এর পর থেকে পরবর্তী সময়।

১৯৭০ সালে সামরিক শাসনামলে জহির রায়হান নির্মাণ করেন *জীবন থেকে নেয়া*। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুবের ১০ বছরের স্বৈরশাসনের পতন হয়, সেই আন্দোলনের পটভূমিতে চলচ্চিত্রটি নির্মিত। ফলে চলচ্চিত্রটি ও এর নির্মাতা তৎকালীন সামরিক সরকারের রোষানলে পড়ে। শুটিং পর্বেই বন্ধ করে দেওয়া হয় চলচ্চিত্রের কাজ, সেন্সর সনদ না দেওয়ার ব্যাপারেও গোপনে ষড়যন্ত্র চলে। যদিও রাষ্ট্রের সব বাঁধা উপেক্ষা করে জনগণের দাবির মুখে *জীবন থেকে নেয়া* শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায়। স্বাধীনের পর চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারের সমর্থন ছিলো। কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে অন্যান্য অনেক সেক্টরের মতোই চলচ্চিত্র নিয়ে আলাদা করে সরকারের ভাবনার অবকাশ ছিলো বলে মনে হয়নি। তবে একটা ফিল্ম ইন্সটিটিউট ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠায় সরকার পদক্ষেপ নিয়েছিলো।

ছবি : সংগৃহীত

৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর চলচ্চিত্রে কিছু পরিবর্তন আসে। বিশেষ করে চলচ্চিত্রের বিষয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ আসা বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া এই সময়ে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনও সেন্সরবোর্ডের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও কড়াকড়ির মধ্যে পড়ে। তবে **৭০ দশকে একটি নতুন রাষ্ট্রে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ শুরু হয়। চলচ্চিত্রে রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে শুরু হয় সরকারি অনুদান**। "উন্নতমানের রুচিশীল এবং শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র তৈরিতে দেশীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উৎসাহিতকরণ ও সাহায্য প্রদানের জন্য সরকার ১৯৭৬ সালের প্রথম ভাগে চলচ্চিত্র উন্নয়ন তহবিল গঠন করেন। এই তহবিল থেকেই চালু করা হয় অনুদানের রেওয়াজ" (কাদের ১৯৯৩, পৃ৫৩১)। ১৯৭৬–১৯৭৭ অর্থবছরে জুরি বোর্ড চার জন নির্মাতাকে অনুদান দেওয়ার সুপারিশ করেন। অনুদান পাওয়া চলচ্চিত্রগুলো হলো— *সূর্য দীঘল বাড়ী*, *এমিলির গোয়েন্দা বাহিনী*, *তোলপাড়* ও *মেহেরজান* (কাদের ১৯৯৩, পৃ৫৩২)। *সূর্য দীঘল বাড়ী* স্বাধীন দেশের প্রথম চলচ্চিত্র হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্মান বয়ে আনে।

এই দশকে চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পৃক্ততার আরেকটি পদক্ষেপ ছিলো **জাতীয় পুরস্কার প্রদান**। ১৯৭৬ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এই পুরস্কার দেওয়া হয়। মূলত ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য উৎসাহ, চলচ্চিত্র নির্মাণের মান উন্নয়ন এবং বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়। প্রথমবার ১৯৭৬ সালে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার পায় *লাঠিয়াল* (১৯৭৫), একই চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ নির্মাতার পুরস্কার পান মিতা। এছাড়া চলচ্চিত্রে সার্বিক অবদানের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় জহির রায়হানকে।

ফিল্ম ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই ছিলো। দেশ স্বাধীনের পর নির্মাতা আলমগীর কবির ও মুহম্মদ খসরু প্রমুখের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এটা আন্দোলনে রূপ নেয়। "স্বাধীনতার পরপরই চলচ্চিত্র-নির্মাতা ও মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর কবির, বাদল রহমান, সৈয়দ সালাহ উদ্দীন জাকী প্রমুখ ব্যক্তি ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যান। তিনি তাদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ফিল্ম আর্কাইভের নীতিমালা তৈরির নির্দেশ দেন" (হোসেন ও হামিদ ২০১৫, পৃ১৪)। নির্মাতা ও চিত্রগ্রাহক এম আব্দুস সামাদ জানান, শেখ মুজিব প্রথমে ফিল্ম আর্কাইভ ও পরে ফিল্ম ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন (হোসেন ও হামিদ ২০১৫, পৃ১৫)।

১৯৭৩ সালেই সরকার দেশে একটি ফিল্ম ইন্সটিটিউট চালুর উদ্যোগ নেয় (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ১৬৪)। কিন্তু সেই উদ্যোগ আর পরে কার্যকর হয় না। পরে ১৯৭৮ সালের ২২ জুন সরকার 'বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট ও আর্কাইভ' স্থাপনের ঘোষণা দেয়। ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত ফিল্ম ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে 'ফিল্ম আর্কাইভ' গঠন করা হয় (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ১৬৫)। এই ঘোষণার পর সরকার প্রথম পর্যায়ে আর্কাইভ অংশ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। ধানমন্ডির ১৯ নম্বর সড়কের একটি ভাড়া বাড়িতে শুরু হয় এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা। কিউরেটর নিযুক্ত হন বিশিষ্ট শিল্পী এ কে এম আবদুর রউফ।

১৯৬৯ সালে সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা ফিল্ম ইন্সটিটিউট' এর কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধের সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ১৯৭৩ সালে ইন্সটিটিউটটি আবার চালু হয়। এরপর 'ঢাকা ফিল্ম ইন্সটিটিউট' ১৯৭৪-এ বন্ধ হয়ে যায়। চলচ্চিত্র শিক্ষা নিয়ে যশোরের মণিহার-এর পাবলিসিটি বিভাগের প্রধান মোল্যা ফারুক আহম্মেদ মনে করেন,

> আজকে সিনেমার যে অবস্থা তার প্রধান এক–দুইটি কারণের মধ্যে একটি হলো ঠিক সময়ে আমরা একটা ফিল্ম ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। স্বাধীনতার পর যদি আমরা একটা ফিল্ম ইন্সটিটিউট করতে পারতাম, তাহলে হয়তো সিনেমার অবস্থা এরকম হতো না। ভারত সিনেমায় যে দিনের পর দিন উন্নতি করছে, তার প্রধান কারণগুলোর একটি তাদের ফিল্ম ইন্সটিটিউট। তারা ঠিক সময়ে এটা করতে পেরেছিলো। আমরা পারিনি (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।

রংপুরের 'শাপলা'র বুকিং ক্ল্যার্ক শফিকুল ইসলামও একই ধরনের কথা বলেন। তার ভাষ্যমতে, 'যে যতো কথাই বলুক, সিনেমা নিয়ে একটু পড়ালেখা থাকলে ভালো সিনেমা বানানো যায়। আমাদের ডিরেক্টররা কোনো পড়ালেখা করে না। তারা কীভাবে কীভাবে সিনেমা বানানো শিখে যায়। ফলে সিনেমার মানও সেই রকম হয় (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৬)।'

এদিকে ইন্সটিটিউট থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলমগীর কবির একধরনের সঙ্কটের কথা বলেন, "ইন্সটিটিউটের শিক্ষাপ্রাপ্তদের একদিকে ইন্ডাস্ট্রির লোকজন সহজভাবে নেয় না, অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রাপ্তরা একটু উন্নাসিকতা দেখায়। এর কোনটাই হওয়া উচিত নয়। পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ থাকা দরকার" (কবির ২০১৮, পৃ২৩১)। আলমগীর কবিরের এই মূল্যায়ন অনেকক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। প্রায়ুক্তিক অনেক বিষয়, যেগুলো সাধারণত উত্তরাধিকার থেকে শেখা হয়, সে বিষয়ে কেউ যদি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেয়, তা অনেকেই মেনে নিতে পারেন না—এই সঙ্কটটি ৭০-এ ধরে ফেলেছিলেন আলমগীর। কিন্তু সে সময় তারা যেটা করেননি তা হলো, এই দুইয়ের যে সমন্বয় করা যায় সেটা নিয়ে খুব বেশি কাজ করেননি।

ভারতের পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউট থকে ৭০ ও ৮০'র দশকে চলচ্চিত্র নির্মাণে কয়েকজন প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরলেও তারা কেউই চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংযোগ রাখেননি। তাদের শিক্ষা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনকে খুব বেশি কিছু দিতে পারেনি কেবল কিছু বিজ্ঞাপনচিত্রের মানবৃদ্ধি করা ছাড়া (মাযহার ২০০৮, পৃ৬৩)। ফলে চলচ্চিত্র শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে একটা জটিলতা থেকেই গেছে সব সময়।

৩.৪) চলচ্চিত্রের সমান্তরাল শিল্পকলা ও গণমাধ্যম

৭০ দশকেও গ্রামবাংলায় বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে যাত্রার দাপট ছিলো চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে শীতের মৌসুমে দেশজুড়েই রাতভর যাত্রার প্রদর্শনী চলতো। তাছাড়া বিভিন্ন মেলা, উৎসবে যাত্রাপালার আয়োজন ছিলো অনিবার্য। তবে যাত্রাকে কখনোই চলচ্চিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হয়নি। বরং বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র ও যাত্রা দুটোতেই দর্শকের অংশগ্রহণ ছিলো। তবে ৬০ দশকে *রূপবান*-এর বদৌলতে যে ব্যবসা জোয়ার শুরু হয়েছিলো তা কমে যায়। এই দশকে চলচ্চিত্রে লোককাহিনির সঙ্গে ফ্যান্টাসি-পোশাকি ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে এই দশকে নতুন যে মাধ্যমটি চলা শুরু করেছিলো সেটা 'বাংলাদেশ টেলিভিশন'। ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ ঢাকার রামপুরায় 'বিটিভি' নতুন কেন্দ্রে সম্প্রচার শুরু করে। এই সময়ে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহের রিলে স্টেশনের মাধ্যমে সম্প্রচার শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন জায়গায় রিলে স্টেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে টেলিভিশন সেটের সংখ্যা বাড়তে থাকে। যদিও ১৯৬৫ সালেই টেলিভিশন সেটের সংখ্যা ছিলো এক হাজার ৪০০টি (Statistical Disest of Bangladesh 1973, p157)।

দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এই বঙ্গে টেলিভিশন প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সক্রিয় ছিলো। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তৎকালীন টেলিভিশন কেন্দ্র প্রতি মাসে চারটি করে বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে। এরপর ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত মাসে দুইটি এবং পরবর্তী সময়ে গড়ে প্রতি মাসে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে (*সাপ্তাহিক পূর্বাণী* ২১ অক্টোবর ১৯৮২)। 'মুভি অব দ্য উইক' ছাড়াও স্বাধীনের পর 'বিটিভি' ঈদের দিন, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ জাতীয় নানা দিবসে চলচ্চিত্র সম্প্রচার করতো। তবে 'বিটিভি' সম্প্রচারিত বেশিরভাগ চলচ্চিত্রই ছিলো অপেক্ষাকৃত পুরনো। 'বিটিভি'তে চলচ্চিত্র দেখালে সেই চলচ্চিত্রের বাজার খারাপ হয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় নতুন চলচ্চিত্রের পরিবেশকদের অনেকে 'বিটিভি'তে তা প্রদর্শনে আগ্রহী ছিলেন না। আবার এজন্য যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হতো তা দিয়ে কোনোভাবেই নতুন চলচ্চিত্র পাওয়া সম্ভব ছিলো না। "১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা কাহিনিচিত্রের জন্য সর্বোচ্চ ছয় হাজার টাকা দেওয়া হতো" (*সাপ্তাহিক পূর্বাণী* ২১ অক্টোবর ১৯৮২)। সেই সময়ের টেলিভিশনের অবস্থার বর্ণনা করেন খুলনার 'সোসাইটি সিনেমা'র সুপারভাইজার মো. নাঈম। প্রেক্ষাগৃহের পাশের একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় কথা হয় তার সঙ্গে। নাঈম বলেন,

> তখন চ্যানেল ছিলো একটাই বিটিভি। একশো ঘর খুঁজলে তখন ১০টাতে টেলিভিশন ছিলো। আমাদের এলাকায় সাদাকালো টেলিভিশন ছিলো একটা। তখন সপ্তাহে একটা নাটক হতো, সাপ্তাহিক নাটক। আর মুভি অব দ্য ইউক হতো বৃহস্পতিবারে, আর মাসে একবার ছায়াছবির গান। আর দুই–তিন মাসে রাতে একটা করে সিনেমা হতো। তারও নিশ্চয়তা ছিলো না, কবে হবে? মানুষের বিনোদনের ক্ষুধা তখন চরম। আমাদের একটা রেডিও ছিলো, সন্ধ্যা সাতটায় সেখানে দুর্বার অনুষ্ঠান হতো। আশেপাশের লোকজন জানালায় এসে আব্বাকে বলতো, খালু একটু গান দেনতো শুনি। ওই গান শুনে মানুষ বাড়িতে গিয়ে ভাত খেয়ে ঘুমাতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৭)।

ময়মনসিংহের 'পূরবী'র বুকিং ক্ল্যার্ক মো. রবি সেই সময়ের টেলিভিশন সম্পর্কে বলেন এভাবে—

> তখন তো আজকের দিনের মতো এতো টেলিভিশন চ্যানেল, সিডি, মোবাইল ফোন ছিলো না। মানুষ তখন খালি সিনেমা আর মাঝে মধ্যে যাত্রা দেখতো। আর যে দুই–একটা টেলিভিশন ছিলো সেটা বড়োলোকদের বাড়িতে, সাধারণ মানুষ সেটা দেখার সুযোগও কম পেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১০)।

টেলিভিশনে চলচ্চিত্র দেখা তখন খুবই জনপ্রিয় ছিলো। বিশেষ করে গ্রামজুড়ে এক বাড়িতে টেলিভিশন সেট থাকলে সবাই সেখানে টেলিভিশন দেখতে ভিড় করতো। নারী দর্শকের প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ কম থাকায় দর্শক হিসেবে তাদের সংখ্যা ছিলো বেশি। মফস্বল শহরগুলোতে এক বাড়িতে অনেক লোক একসঙ্গে টেলিভিশন দেখতো। মাসে যেদিন চলচ্চিত্র সম্প্রচার হতো সেদিন গ্রামে উৎসব লেগে যেতো!

১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে ওয়েজ আনার্স স্কিম চালু হওয়ার পর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ রেকর্ডার, টু ইন ওয়ান প্রভৃতি ইলেকট্রনিক্সের নাম দিয়ে নতুন যন্ত্র ভিসিআর আনতে শুরু করেন (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৬৪)। শুরুর দিকে অল্প পরিমাণ ভিসিআর বিমান ও নৌ পথে আনা হয়। ১৯৭৮ সালে প্রথমবারের মতো ব্যাপক ভিত্তিতে ভিসিআর আমদানি করা হয় বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের যাত্রীবাহী জাহাজ 'হিজবুল বাহার' এর মাধ্যমে (*সাপ্তাহিক চিত্রালী* প্রতিবেদন, ২৩ অক্টোবর ১৯৮১)। এভাবে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখার বিপরীতে ভিসিআর-এ চলচ্চিত্র দেখার একটি নতুন মাত্রা শুরু হয় এই দশকের শেষের দিকে। কিন্তু ভিসিআর এই দশকে চলচ্চিত্রের ওপর খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি।

৬০ দশকের ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্র বিষয়ক সাংবাদিকতা ও নানা প্রকাশনা ৭০ দশকেও অব্যাহত ছিলো। এই সবচেয়ে আলোচিত পত্রিকার নাম 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'। ফজল শাহাবুদ্দীনের সম্পাদনায় দৈনিক বাংলা প্রকাশনী থেকে ১৯৭২ সালের ১৮ মে এটি প্রকাশ হয়। 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' সরাসরি চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা না হলেও চলচ্চিত্র নিয়ে এখানে যেসব আলোচনা, সমালোচনা প্রকাশ হতো তা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। যশোরের মোল্যা ফারুক আহম্মেদ বলেন,

'সাপ্তাহিক বিচিত্রা', ২০ এপ্রিল ১৯৭৩, ৩৭ তম সংখ্যা

ছবি : গবেষকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে

> আগে প্রচার-প্রচারণার জন্য প্রধান দুটি মাধ্যম ছিলো, বেতার ও দৈনিক 'ইত্তেফাক'। তখন সবাই 'ইত্তেফাক'-এ বিজ্ঞাপন দিতো। এছাড়া শুধু সিনেমার জন্য তখন দুটো পত্রিকা ছিলো 'চিত্রালী' ও 'পূর্বাণী'। এই দুটো পত্রিকার জন্য মানুষ আগ্রহ নিয়ে থাকতো। আর বেতারে এক সপ্তাহ আগে থেকে চলতো মুক্তি পাওয়া সিনেমার প্রচার-প্রচারণা। বিজ্ঞাপন তরঙ্গে সেটা চলতো। তখন অবশ্য রেডিও এতো সহজলভ্য ছিলো না। একটা রেডিও তখন অনেকজন শুনতো। সেই শোনা থেকে মানুষের আকর্ষণ হতো শুক্রবার কবে আসবে। তখন এতে খুব কাজ হতো। কিন্তু এখন কেউ আর বাংলাদেশে রেডিও শোনে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।

রঙ্গীন চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'সিনেমা' প্রকাশ হয় ১৯৭২ সালের আগস্টে। এর প্রকাশক ছিলেন ফজলুল হক মনি। আনোয়ারুল ইসলাম ববির সম্পাদনায় 'সিনেমা' শুরু থেকেই আরেক বিনোদন পত্রিকা 'চিত্রালী'র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। পত্রিকাটি ৭৫-এর জুনে জারি করা সংবাদপত্র বাতিল অধ্যাদেশের কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

এছাড়া ৭০ দশকের মধ্যভাগে 'চলচ্চিত্র' (১৯৭৫), 'চিত্রকল্প' (১৯৭৫), 'নিপুণ' (১৯৭৫) ও 'রংবেরং' (১৯৭৬), 'চলচ্চিত্রিক' (১৯৭৭), 'চলচ্চিত্রকার' (১৯৭৭) নামে আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ হয়। এসব পত্রিকার বেশ পাঠক প্রিয়তা ছিলো। এগুলোতে খবরের সঙ্গে নিয়মিতভাবে মুক্তি পাওয়া বা মুক্তি প্রত্যাশী চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন সম্প্রচার করা হতো। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকের জন্য পত্রিকার মাধ্যমে পাওয়া বিনোদনের এসব খবর খুব আগ্রহোদ্দীপক ছিলো। যশোরের প্রহ্লাদ দাশ বলেন,

> এই সময় শিক্ষিত মানুষরা চলচ্চিত্রের পত্রিকা পড়েও বিনোদন নিতো। তখন অনেক বাড়িতে এসব পত্রিকা নেওয়া হতো। অনেকে এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত নায়ক-নায়িকাদের ছবি কেটে বাড়ির দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতো। আমিও অন্যদের কাছ থেকে সিনেমার পত্রিকা ধার করে এনে নায়ক-নায়িকাদের ছবি কেটে রাখতাম। তাদের নিয়ে নানা খবর প্রকাশ হলে সেগুলো নিয়েও আমরা সিনেমাহলে আলোচনা করতাম। সবমিলিয়ে সিনেমা নিয়ে তখন একটা অন্যরকম পরিবেশ ছিলো। সবাই আগ্রহ নিয়ে সবকিছু করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫)।

চলচ্চিত্র নিয়ে এসব পত্রিকায় মুখরোচক নানা খবরও প্রকাশ হতো। মূলত "চলচ্চিত্র শিল্পের পুঁজিপতিদের সংগে তাই পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে সদ্ভাব রাখতে হয়। আবার দর্শকদের কাছে আগেভাগে ছবির খবর পৌঁছে দিয়ে ছবি সম্পর্কে তাদের কৌতুহলী করে তোলার শক্তিশালী মাধ্যম হল সংবাদপত্র। ... এই জন্যেই বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি গাল গল্প চলচ্চিত্র সাপ্তাহিকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়" (মুৎসুদ্দী ১৯৮৭, পৃ১৩৫–১৩৬) ছিলো। তার মানে এই দশকে সবমিলিয়ে চলচ্চিত্র নিয়ে একটা সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যেখানে সব শ্রেণির দর্শকের চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নানা মাধ্যম ছিলো। ফলে অনেকে সরাসরি প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র না দেখতে পারলেও টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিনের মাধ্যমে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ পেয়েছিলো। এই সুযোগগুলো শহুরে মধ্যবিত্ত চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে বেশি ভূমিকা রাখতো বলে মনে হয়েছে।

৩.৫) চলচ্চিত্র আমদানি ও অন্য ভাষার চলচ্চিত্র

এই দশকে স্বাধীনতা-পূর্ব রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের আমদানি বন্ধ থাকলে দর্শকের মধ্যে এ নিয়ে বেশ আগ্রহ ছিলো। ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্র আমদানি হলেও দর্শক সেইসব চলচ্চিত্র নিয়ে খুব বেশি আগ্রহ দেখায়নি। বরং ভাষাগত জায়গা থেকে মিল থাকায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতি তাদের বেশি আগ্রহ ছিলো। ৭০-এর দশকের নানা ঘটনা প্রবাহ ও গবেষণা আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত থেকে এধরনের ধারণাই পাওয়া গেছে।

রাজনৈতিক কারণে ১৯৭৩ সালে উর্দু ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও প্রদর্শনী বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এই সময়ে ১৯৬৫ সালে নিষিদ্ধ হওয়া ভারতীয় চলচ্চিত্রের বাংলাদেশে প্রদর্শনী নিয়েও নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে নতুন চলচ্চিত্রের অভাব এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির সুযোগে কয়েকজন পরিবেশক ও প্রদর্শক পুরনো ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু করে। ফলে চোরাপথে ভারতীয় চলচ্চিত্রের নতুন প্রিন্টও আসতে থাকে। একপর্যায়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রদর্শনী শুরু হয়। কুড়িগ্রামের শহরতলী কাঠালির ‘স্বর্ণমহল’-এর ৩৫ মি মি প্রজেক্টরের সহকারি অপারেটর ষাটোর্ধ্ব বিজয় অধিকারী বলেন,

> আমরা তখন চুরি করে ভারতের সিনেমা চালাতাম। প্রশাসনও খুব একটা কিছু বলতো না। ওই সিনেমাগুলো ভালো ব্যবসা করছিলো সেসময়। দর্শকও এসব সিনেমা খুব দেখতো। আমরাও চাইছিলাম, এই সিনেমা অল্প করে হলেও চলুক। কিন্তু ঢাকার প্রযোজকরা প্রেশার দিলো। ফলে সিনেমা আসা বন্ধ হলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২)।

১৯৭২ সালে মন্ত্রী পরিষদে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানির ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক, ১৫ লাখ টাকার ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানির ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়। (আখতারুজ্জামান ১৯৭৮, পৃ২০৯) কিন্তু এর বিরুদ্ধে নির্মাতারা তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সংস্কৃতিসেবী ত্রাণ তহবিল গঠনের জন্য কয়েকটি ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শনের কথা বলেন (আখতারুজ্জামান ১৯৭৮, পৃ২১০)। পরে *অপুর সংসার*, *দীপ জ্বেলে যাই*, *কাবুলিওয়ালা*, *পৃথিবী আমারে চায়* ও *সাধারণ মেয়ে* নামে পাঁচটি চলচ্চিত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

একই বছর ৫ এপ্রিল ঢাকায় শুরু হয় সপ্তাহব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসব। উৎসবে প্রেক্ষাগৃহগুলোতে বিদেশি চলচ্চিত্র দেখার জন্য ব্যাপক দর্শকের সমাগম হয়। এসব ঘটনা মিলে স্থানীয় নির্মাতারা কিছুটা নিরুৎসাহী হয়ে পড়েন (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৪১)। অন্যদিকে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানির তোড়জোর অব্যাহত থাকে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, “স্বাধীনতাপরবর্তী কয়েক বছরে ভারতের সব শিল্পমাধ্যমের গুণী মানুষরাই এদেশে এলেন—পারফর্ম করে গেলেন। এলো না কেবল সিনেমা। ... একচেটিয়া রাষ্ট্রীয়করণ আর আর সরকারি ‘সমাজতন্ত্র’ কায়েমের সেই যুগে আমাদের সিনেমাও আটকা পড়ে গেল একচেটিয়া প্রটেকশনে” (আহমেদ ২০১৮, পৃ১১৩)। কুমিল্লার লাকসামের ‘পলাশ সিনেমা’র পুরনো কর্মচারী তোফায়েল হোসেন এই সময়ের ভারতীয় চলচ্চিত্রের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

> স্বাধীনতার পর দেশে সিনেমার অভাব ছিলো। তাই চুরি করে ভারতের সিনেমা দেখানো হতো। কিছু সিনেমা ভালোই ব্যবসা করেছে। তবে সরকার চাইলে আরো সিনেমা চালানো যেতো। তাতে কিন্তু উপকারই হতো। কারণ গ্রামের মানুষ ইংরেজি ভাষার সিনেমা দেখতো না। তারা পরিচিত নায়ক-নায়িকা হলে সিনেমা দেখতো। এই সময় ভারতের কিছু ভালো সিনেমা সরকারিভাবে আনলে প্রতিযোগিতা হতো। কারণ দেশের পরিচালকরাও কিন্তু তখন খুব ভালো সিনেমা বানাতে পারছিলো না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৮)।

৭৫-এর ১৫ আগস্ট পটপরিবর্তনের পর দেশে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানির বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। পাশাপাশি বন্ধ হয়ে যায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের অবৈধ প্রদর্শনীও। ১৯৭৬ সালে সরকার চলচ্চিত্র আমদানি ও প্রদর্শনের ব্যাপারে নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক জানুয়ারি–জুন শিপিং মওসুমের আমদানি নীতি সংশোধনের মাধ্যমে 'ওয়েজ আনার্স স্কিমে'[৯] শুধু ইংরেজি চলচ্চিত্র আমদানির অনুমতি দেওয়া হয় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৪১)।

১৯৭৭ সালে চলচ্চিত্র আমদানি নীতিমালায় বর্ণিত 'Foreign film means a film not being a film produced locally' এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও সাব-টাইটেলযুক্ত চলচ্চিত্র অথবা ইংরেজিতে ডাবিং করা ভারত বা পাকিস্তানি চলচ্চিত্রের আমদানি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, হংকং প্রভৃতি দেশ থেকে ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্রের আমদানি বৈধ করা হয় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৪১)। এর আগে ১৯৭৪ সালে সাংস্কৃতিক চুক্তির আওতায় তৎকালিন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পাঁচটি চলচ্চিত্র আমদানি করা হয় (*সাপ্তাহিক বিচিত্রা* ২১ জুলাই ১৯৭৬, পৃ৫৩)। এসব চলচ্চিত্র আমদানি করা হয়েছিলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। কিন্তু রাশিয়া থেকে আমদানি কোনো চলচ্চিত্রই সেসময় বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। চট্টগ্রামের এ টি এম ফারুক বলেন, "স্বাধীনতার পর নানাভাবেই বিভিন্ন দেশের সিনেমা এসেছে। কিন্তু এর সবগুলো ব্যবসা করেছে এমন নয়। কিংবা সব সিনেমা মান সম্পন্ন ছিলোও না। আমরা 'আলমাস'-এ নানা দেশের সিনেমা চালিয়েছি। কিন্তু সবগুলো ব্যবসা করেনি।" তার মানে ৭০ দশকজুড়ে বিদেশি চলচ্চিত্র বিশেষ করে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটা চাহিদা দর্শকের মধ্যে ছিলো। কিন্তু সরকার, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের কারণে সেই চলচ্চিত্রের আমদানি ব্যাহত হয়েছে।

৬০ দশকে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানি নিয়ে যে সঙ্কট ছিলো, স্বাধীনতা উত্তরকালে আইন করেও সেই সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে দেশীয় চলচ্চিত্র চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার যে সুযোগ তা সবসময়ই ব্যাহত হয়েছে। এছাড়া সরকার চলচ্চিত্র আমদানির ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে নানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার কোনোটাই ইতিবাচক কোনো ফল আনতে পারেনি।

---

[৯]. প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো অর্থে পণ্য সামগ্রী আমদানির পদ্ধতিকে বলা হয় 'ওয়েজ আনার্স স্কিম'। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার এই স্কিম চালু করে।

৩.৬) তারকা-কুশীলব

৫০ ও ৬০ দশকের ধারাবাহিকতায় এই দশকেও দর্শকের কাছে অভিনয়শিল্পীদের চেহারা নয়, অভিনয় অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এই সময় নায়ক-নায়িকা হয়ে ওঠার জন্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতো। ছোটো ছোটো চরিত্রে পার্শ্ব-অভিনয়শিল্পী হিসেবে কাজ করে, নানা কাঠ-খড় পুড়িয়ে তাকে ওই আসনে বসতে হয়েছিলো। তবে এই দশকে তারকা প্রথার শুরু হয়। প্রেক্ষাগৃহের বৃদ্ধি এবং চলচ্চিত্রের সম্পূরক অন্যান্য গণমাধ্যম সক্রিয় থাকায় অনেক নায়ক-নায়িকাই দর্শকের কাছে তারকা হতে শুরু করেছিলেন। একই সঙ্গে জুটি প্রথাও জনপ্রিয় হতে শুরু করে এই দশকে। আখ্যানের তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ থেকে এধরনের ধারণা পাওয়া যায়।

৭০ দশক নিয়ন্ত্রণ করা অভিনয়শিল্পীদের বেশিরভাগেরই আগমন ঘটে ৬০ দশকের মাঝামাঝি ও শেষের দিকে। এদের মধ্যে অন্যতম রাজ্জাক, শাবানা, আজিম, সুজাতা, আনোয়ারা, শবনম, রোজী, আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ হাসান ইমাম, সুচন্দা, ববিতা, কবরী প্রমুখ। আনোয়ার হোসেন ১৯৬১ সালে মহিউদ্দিনের *তোমার আমার* দিয়ে যাত্রা শুরু করে পুরো ৬০ দশক পর্দায় ছিলেন। ৭০ দশকে তিনি মোট ৭২টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন (আলম ২০১১, পৃ৫৫–৬৫)। নায়ক ছাড়াও পার্শ্বচরিত্রে তিনি অভিনয় করেন এসব চলচ্চিত্রে।

আজিম ১৯৬০ সালে এহতেশামের *রাজধানীর বুকে* চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। এরপর তিনি ১৯৭৯'র নভেম্বর পর্যন্ত অভিনয় করেন মোট ৭২টি চলচ্চিত্রে (আলম ২০১১, পৃ৪৮–৫২)। ৬০ দশকে আজিম-সুজাতা জুটি বেশ জনপ্রিয় হয়। পরে এই জুটি অবশ্য বাস্তব জীবনেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই সময়ের অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে নেত্রকোণার 'হিরামন'-এর ব্যবস্থাপক পরিতোষ সাহার মূল্যায়ন এমন—'তখন আজিম, রাজ্জাক, আনোয়ার হোসেন, সুজাতা, সুচন্দা, শবনম এসব পুরনো শিল্পীদের অভিনয় ছিলো অন্যরকম। এদের অভিনয়, অভিনয় মনে হতো না। অবশ্য ভালো অভিনয় না করলে তখন টিকে থাকা যেতো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২৪)।'

সৈয়দ হাসান ইমাম ১৯৬৩ সালে *ধারাপাত* চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। ৭০ দশকে তিনি অভিনয় করেন মোট ২৪টি চলচ্চিত্রে। অভিনয়ে দক্ষ হাসান ইমাম নায়ক চরিত্রের পাশাপাশি পার্শ্ব অভিনয়শিল্পী হিসেবেও বেশ নাম করেন। এই সময় নতুন কোনো অভিনয়শিল্পীকে পরিচিত করার কৌশল কুষ্টিয়ার 'বনানী'র প্রচারের দায়িত্বে থাকা মো. নাঈম বর্ণনা করেন এভাবে—

> আগে আরেকটা বিষয় হতো, একটা পপুলার নায়কের সাথে আগে নতুন একজনকে নায়ককে পরিচিত করা হতো। আমরা তাকে বলতাম সাইড নায়ক। তখনকার অনেক প্রতিষ্ঠিত নায়ককে ফুল নায়ক হওয়ার জন্য আগে নানা চরিত্রে অভিনয় করা লাগতো। আবার এমনও হয়েছে মেইন নায়করে দেখতে গিয়ে অনেকের সাইড নায়করে ভালো লাগছে। এভাবে একজন ধীরে ধীরে নায়ক হয়ে উঠেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫৬)।

শাবানা ১৯৬৭ তে *চকোরী*তে প্রথমবারের মতো একক নায়িকা হয়ে আসেন। এরপর ১৯৬৯-এর অক্টোবর পর্যন্ত তিনি মাত্র আটটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এর মধ্যে চারটি উর্দু ভাষার। তিনি ৭০ দশকে মোট ৯৩টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এর মধ্যে কমপক্ষে ৩৮টি চলচ্চিত্রে শাবানার সঙ্গে জুটি হিসেবে ছিলেন রাজ্জাক (আলম ২০১১, পৃ৭১–৮০)। **এই সময়েই মূলত রাজ্জাক-শাবানা জুটি বেশ জনপ্রিয় হয়।** রাজ্জাক ছাড়াও শাবানা এই সময়ে আরো যে দুজন নায়কের সঙ্গে জুটি বাধেন তারা হলেন উজ্জ্বল ও ওয়াসিম। এছাড়া তিনি আলমগীর, বুলবুল আহমেদ, জাফর ইকবাল, খসরু, আজিমের সঙ্গেও জুটি বেধে অভিনয় করেন। এই সময়ের নায়িকাদের জনপ্রিয়তা নিয়ে সিলেটের 'নন্দিতা'র ব্যবস্থাপক মোস্তফা চৌধুরীর সঙ্গে কথা হয়। প্রেক্ষাগৃহের তিনতলায় তার চেম্বার, ঢুকেই বোঝা যায় আগের জৌলুস আর নেই। এম এ পাস করে অনেক বছর আগে ব্যবস্থাপকের পদে তিনি চাকরি নিয়েছিলেন অনেক স্বপ্ন নিয়ে। এখন তার পুরনো দিনের স্মৃতি ছাড়া আর তেমন কিছু নেই। তার ভাষায়,

> তখন রাজ্জাক-শাবানার সিনেমা মানেই অন্যরকম ব্যাপার। এই জুটিকে যে দর্শক কী রকম পছন্দ করতো আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না! এদের নাম শুনলেই তখন দর্শকের ভিড় লেগে যেতো। বিশেষ করে মহিলারা তো শাবানা থাকলে পাগল হয়ে যেতো। রাজ্জাক-শাবানার বিয়ে হলে ভালো হতো—এমন ধরনের মন্তব্য করতে শুনেছি অনেক দর্শককে। আসলে দর্শক নিজেদেরকে তাদের জায়গায় ভাবতে পছন্দ করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৩)।

ময়মনসিংহের 'পূরবী'র বুকিং ক্ল্যার্ক ষাটোর্ধ্ব মো. রবি বলেন, 'সেই সময়ে রাজ্জাক-শাবানা-ববিতা এদের সিনেমার একটা বিশাল বাজার ছিলো। এসব জুটির (রাজ্জাক-শাবানা ও রাজ্জাক-ববিতা) খুব দাম ছিলো। এছাড়া রূপকথার কাহিনি নিয়েও যেসব সিনেমা ছিলো সেগুলোও ভালো চলছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১০)।'

১৯৬৫ তে *রূপবান* দিয়ে চলচ্চিত্রের মোড় ঘোরানো সুজাতা ১৯৬৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৪৪টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে তার অবস্থান ধরে রাখেন। এই সময়ে সুজাতা কমপক্ষে ১৭টি চলচ্চিত্রে আজিমের সঙ্গে অভিনয় করেন। এ সময়ের বেশিরভাগ লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রে সুজাতাকে পাওয়া যায়। ১৯৭৯-এর জুন পর্যন্ত তিনি মাত্র ২৯টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন (আলম ২০১১, পৃ৯৭–১০০)। এই সময়ে আজিম ছাড়াও রাজ্জাককে তার সঙ্গে জুটি হিসেবে দেখা যায়।

সুভাষ দত্তের *সুতরাং* দিয়ে যাত্রা শুরু করা কবরী সবচেয়ে দাপটের সঙ্গে কাজ করেন ৭০ দশকে। এসময় তার অভিনীত মোট ৭৬টি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। এই দশকে রাজ্জাক মূলত একই সঙ্গে শাবানা ও কবরীর সঙ্গে জুটি বেধে সফল হন। **দর্শকের মধ্যে তখন রাজ্জাক-শাবানা ও রাজ্জাক-কবরী জুটি নিয়ে দুটি ভাগ হয়ে যায়।** জুটি নিয়ে যশোরের 'মণিহার' এর মোল্যা ফারুক আহম্মেদের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফারুক প্রথমে 'মণিহার'-এ পাবলিসিটির কাজ করতেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে তিনি সেটা বাদ দেন। এখন প্রেক্ষাগৃহের কিছু কাজকর্মের পাশাপাশি মণিহার আবাসিক হোটেল দেখাশোনা করেন। তার

সঙ্গে কথা হয় 'মণিহার'-এর নীচে যে ছোটো ক্যান্টিনটি আছে তার পাশে বসে। কথাবার্তায় অত্যন্ত স্মার্ট ফারুকের ভাষ্যমতে,

> সিনেমার ক্ষেত্রে জুটি একটা ফ্যাক্ট। ক্রিকেটে যেমন হয়। শাকিব আল হাসানের সঙ্গে মুশফিকুর রহিম থাকলে কিছু না কিছু রান করবেই। তেমনই সিনেমার ক্ষেত্রেও একেক সময়ে একেক জুটি গড়ে উঠে। ফলে এরা তখন যে সিনেমাই করেছে, সেটা কিছু না কিছু ব্যবসা করেছে। ওয়াসিম-অঞ্জু ছিলো; ফোক সিনেমায় তারা কিন্তু রাজত্ব করে গেছে। রাজ্জাক-করবী, রাজ্জাক-শাবানা, রাজ্জাক-শবনম—রাজ্জাকের সঙ্গেই কিন্তু জুটি সবচেয়ে বেশি। এছাড়া আলমগীরের সঙ্গেও এসেছে শাবানা; জাফর ইকবালের সঙ্গে ববিতা; এরাও কিন্তু খুব জনপ্রিয় একটা জুটি ছিলো। ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গেও অনেকে জুটি হয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।

ফারুক আহম্মেদের কথার সমর্থন পাওয়া যায় খুলনার 'সঙ্গীতা'র দর্শক জালাল শিকদারের কথায়। তিনি বলেন, 'আগের দিনের সিনেমা দেখছেন না আপনি—রাজ্জাক-কবরী, আলমগীর-শাবানা জুটি। ওই ধরনের সিনেমা আপনারা এখনো বানান, দর্শক ঠিকই আসবে; দর্শক আসতে বাধ্য। জুটি একটা ফ্যাক্ট। দর্শক সিনেমার জুটির মতো করে নিজেকে চিন্তা করে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৮)।'

এই দশকে সামাজিক ও প্রেম প্রাধান্যশীল চলচ্চিত্রগুলোতে রাজ্জাক-কবরী ও রাজ্জাক-শাবানা জুটি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। কবরীর অভিনয়ও বেশ প্রশংসিত হয়। এই সময়ে শাবানা ও কবরী মূলত বাঙালি নারীর সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হন। চলচ্চিত্রে তাদের ব্যবহৃত সালোয়ার, কামিজ, ব্লাউজ, চুলের কাট, চলাফেরা, তাকানো অনেক নারী অনুসরণ করতে থাকে। খুলনার জালাল শিকদারের ভাষায়, 'তখন শাবানা যেভাবে চুল বাধতো সেটাই মেয়েরা পছন্দ করতো, সেইভাবেই চুল বাধতো। কবরীর ব্লাউজের হাতা, গলার মতো করে সবাই ব্লাউজ বানাতো। খালি শহরে নয়, গ্রামের দিকেও এগুলা হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৮)।'

১৯৬৬ সালে কাজ শুরু করে ৭০ দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৩১টি চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন রাজ্জাক। এর মধ্যে ৬০-এর দশকে তিনি মাত্র ২৫টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। রাজ্জাকের অভিনয় নিয়ে কথা বলেছেন খুলনার 'শঙ্খ' এর চলচ্চিত্র প্রতিনিধি শেখ মোতাহার হোসেন—

> অভিনয় মনের ভিতর থেকে আসতে হয়। রাজ্জাক সাহেব সেটা করতে পারতেন। শুনেছি তিনি অভিনয়ের জন্য অনেক কষ্ট করতেন। তার অভিনয় দেখার মতো ছিলো। তিনি একাই সেসময় কয়েকজন নায়িকার সঙ্গে জুটি বেঁধে সিনেমা করেছেন। মজার ব্যাপার হলো, সুজাতা ছাড়া যার সঙ্গে যখন আমি রাজ্জাককে দেখতাম, তার সঙ্গেই আমার ভালো লাগতো। নিশ্চয় আরো অনেকের এমন হতো। তাছাড়া সেসব সিনেমা তো ব্যবসা করার কথা নয়। কিন্তু ব্যবসা করেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২)।

মোতাহারের কথাকে সমর্থন করেন রংপুরের শাহাবুদ্দীন মোল্লা। তার মতে,

> আগের আর্টিস্টরা অভিনয় জানতো। তারা চেষ্টা করতো দর্শকের ভালোবাসা পাওয়ার। ফলে সেই সময়ের অভিনেতারা কষ্ট করতো। সেই জন্য এখন পর্যন্ত কিন্তু মানুষ রাজ্জাক-শাবানাকে মনে রাখছে। অভিনয় ভালো

না করলে খালি চেহারা দিয়ে কোনো খাওয়া নাই। এখন যেমন অনেকের খাওয়া নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২০)।

এছাড়া এসময় সুচন্দা, সুচরিতা, অলিভিয়া, অঞ্জনাকেও রাজ্জাকের নায়িকা হিসেবে পাওয়া যায়। সেই অর্থে **৭০ দশকে নায়ক হিসেবে একা নেতৃত্ব দিয়েছেন রাজ্জাক**। তার অভিনয়ের প্রশংসা ছিলো দর্শকের মুখে মুখে। রাজ্জাক এই দশকেই *কি যে করি* (১৯৭৬) ও *অশিক্ষিত* (১৯৭৮) চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পী হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পান। এই সময়ে রাজ্জাকের চুলের কাট, প্যান্ট, শার্ট, কথা বলার শৈলী অনেক তরুণের কাছে অনুসরণীয় হতে থাকে। রাজশাহীর 'উপহার' এর চলচ্চিত্র প্রতিনিধি মাসুদার রহমান শান্তি। একসময় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। ব্যবসা কমে যাওয়ায় সেটা বন্ধ হয়ে গেলে এখন প্রতিনিধি হিসেবে নাম লিখিয়েছেন। তিনি বলেন,

> রাজ্জাকের কোনো সিনেমাও তখন মিস দিতাম না আমি। *এতটুকু আশা*, *ময়নামতি*, *বধু বিদায়*, *অবুঝ মন*, *কথা দিলাম*, *কাগজের নৌকা*, *নয়নতারা*, *বেহুলা* সব সিনেমা আমি সেসময় দেখছি। সবচেয়ে ভালো লাগছে কাজী জহিরের *অবুঝ মন*। তার অভিনয়ের একটা অন্যরকম ক্ষমতা ছিলো। সেটা আর কারো নাই। রাজ্জাক তখন আমাদের স্বপ্নের নায়ক ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৮)।

৭০ দশকের আরেক আলোচিত নায়িকা ববিতা। ১৯৬৯-এ নূরুল হক বাচ্চুর *শেষ পর্যন্ত*র মধ্য দিয়ে ববিতার নায়িকা হিসেবে আগমন। এরপর ৭০ দশকজুড়ে তিনি ৭০টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। মাসুদার রহমান শান্তি আরো বলেন, 'ববিতা ছিলো আরেক নায়িকা! তার চোখ দেখলেই দর্শকের মাথা ঘুরে যেতো। তার কী ফিগার! ওই নায়িকা আর এখন পাওয়া সম্ভব নয়। প্রেমের সিনেমাগুলোতে তার অভিনয় ছিলো অসাধারণ। একটু ঢঙি ছিলো, কিন্তু তার মধ্যে একটা অন্যরকম ব্যাপার ছিলো। সেটা দর্শককে আকর্ষণ করতো।'

১৯৭৫ সালে *বাদী থেকে বেগম* চলচ্চিত্রের জন্য ববিতা শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পীর পুরস্কার পান। এছাড়া এই দশকেই তিনি বিখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের *অশনি সংকেত* (১৯৭৩) এ অভিনয় করে ব্যাপক আলোচিত ও প্রশংসিত হন।

এতো গেল ৬০ দশকে অভিনয় শুরু করে ৭০ দশকে কাজ করতে থাকা নায়ক-নায়িকাদের অবস্থা। তবে ৭০ দশকে বেশ কিছু নায়ক-নায়িকা চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাস করা পাবনার ছেলে উজ্জ্বল চলচ্চিত্রে নাম লেখান সুভাষ দত্তের *বিনিময়* (১৯৭০) এর মাধ্যমে। সুদর্শন এই নায়ক ৭০ দশকে মোট ৩৮টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৭০ সালেই শিশুশিল্পী হিসেবে *বাবুল* নামের একটি চলচ্চিত্রে নাম লেখান সুচরিতা। ১৯৭২ সালে আজিজুর রহমান পরিচালিত *স্বীকৃতি*তে তিনি প্রথম নায়িকা হন। সুচরিতা এই দশকে মোট ৩২টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

১৯৭০ সালে *আপন ঘর* চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে নায়ক হিসেবে আবির্ভাব হয় জাফর ইকবালের। ঢাকার ছেলে জাফর ইকবাল অভিনয়ের পাশাপাশি ভালো গানও করতেন। অল্প সময়ের মধ্যে জাফর নায়ক

হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হন এবং তাকে ঢাকাই চলচ্চিত্রের 'এভারগ্রিন হিরো' হিসেবে ডাকা হতো। রংপুরের রফিকুল বারী বলেন, 'জাফর ইকবাল আর ববিতা জুটি হয়ে অনেক সিনেমা করছে, দুইজনকে তখন আমাদেরও খুব ভালো লাগতো। জাফর ইকবালের অভিনয় খুব ভালো ছিলো। প্রেমের সিনেমাগুলোতে তাকে খুব ভালো লাগতো। কিন্তু লোকটা বেশি দিন বাঁচলো না। তবে এখনো মানুষ জাফর ইকবালকে কিন্তু মনে রাখছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৪)।'

১৯৭১-এ *জলছবি* চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে অভিনয়ে আসেন নায়ক ফারুক। গ্রামীণ যুবকের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন সুদর্শন নায়ক ফারুক। ফারুক ১৯৭৫ সালে নারায়ণ ঘোষ মিতার *লাঠিয়াল*এ পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। এই সময়ের নায়কদের নিয়ে চট্টগ্রামের হাজী মো. সেলিম বলেন, 'গ্রামীণ চরিত্রে ফারুকের অভিনয় দেখে মনে হতো বাস্তব। তার অভিনয় দেখে দর্শকের আলাদা একটা অনুভূতি হতো। তারা ওকে নিজের লোক মনে করতো। এই পরিস্থিতি খুব কম নায়কের ক্ষেত্রেই হয়েছে।'

১৯৭২ সালে এস এম শফির *ছন্দ হারিয়ে গেল* এর মাধ্যমে চলচ্চিত্রে নাম লেখান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করা ওয়াসিম। পোশাকি-ফ্যান্টাসি ও লোককাহিনি ধারার চলচ্চিত্রের দুর্দান্ত জনপ্রিয় এক নায়কের নাম ওয়াসিম। তিনি এসব চলচ্চিত্রে দীর্ঘ দিন একা নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৭০ দশকে তার মোট ২৬টি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়, যার মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেক চলচ্চিত্র পোশাকি-ফ্যান্টাসি ধারার। ১৯৭৩-এ *দেবর* চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেন নায়ক জসিম। জসিম শুরুতে খলনায়ক হিসেবে অর্ধশতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৮২ তে সুভাষ দত্ত পরিচালিত *সবুজ সাথী*তে জসিম প্রথম নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন। **প্রথাগত নায়কের শারীরিক সৌন্দর্য ধারণার সঙ্গে জসিমের চেহারা খুব একটা মিল ছিলো না**। কিন্তু নিপীড়িত মানুষের পক্ষে নানা চরিত্রে অভিনয় করে জসিম নায়ক হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। দর্শক আসলে প্রোটাগনিস্ট চরিত্রগুলোর ভিতর দিয়ে তাদের জীবনকে দেখতে চায়; তাদের পাওয়া, না-পাওয়া, ক্ষোভ, হতাশা, না করতে পারা প্রতিবাদ সেগুলোর প্রতিফলন দেখতে চায়। তখন আর সেখানে তারকা, সৌন্দর্য্য কোনোটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না। দর্শকের এই চাওয়ায় হয়তো ধোঁকা আছে, কিন্তু দোষের কিছু নেই। কারণ হাজারো দর্শক মন আসলে একটা আশ্রয় খোঁজে, সেই আশ্রয় কতোখানি দীর্ঘস্থায়ী সেটার তাদের মাথাতেই থাকে না। নায়কের চেহারা নিয়ে যশোরের আলী হোসেন নদুর ভাষ্যটা অনেকটা সেরকমই—

> আগেরকার নায়কদের চেহারার চেয়ে অভিনয়ের দিকে দর্শকের লক্ষ্য ছিলো বেশি। এই যে জসিম দেখতে তো নায়কের মতো ছিলো না, কিন্তু যখন অভিনয় করতো মনে হতো ও একজন গরীব মানুষ। সে যে অভিনয় করতো বোঝা যেতো না, বাস্তব মনে হতো। তাই দর্শক কিন্তু তাকে বুকে টেনে নিয়েছিলো। অনেক সুন্দর নায়ক সেটা পারে নাই। শাবানার সাথে জসিম অনেক সিনেমায় অভিনয় করছে, ওই সিনেমাগুলো খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো। পরে নায়ক মান্নার সাথে জসিমের একটা মিল ছিলো।দুইজনেই গরীবের জন্য সিনেমা করছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৭)।

ব্যাংকার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করা বুলবুল আহমেদ ১৯৭৩ সালে ইউসুফ জহির পরিচালিত *ইয়ে করে বিয়ে* এর মাধ্যমে নায়ক হিসেবে চলচ্চিত্রে পথচলা শুরু করেন। বুলবুল ১৯৭৭ সালে আলমগীর কবির পরিচালিত *সীমানা পেরিয়ে* ও ১৯৭৮ এ *বধু বিদায়* চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পীর পুরস্কার পান। নায়ক আলমগীর ১৯৭৩ সালে আলমগীর কুমকুম পরিচালিত *আমার জন্মভূমি* চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে অভিনয়ে আসেন। ৭০ দশকেই তিনি ৩২টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এই দশকে চলচ্চিত্রে নতুন মুখ হিসেবে আসা অন্যান্য অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন নূতন, আহমেদ শরিফ, সোহেল রানা, অঞ্জনা, রোজিনা ও ইলিয়াস কাঞ্চন প্রমুখ।

৩.৭) চলচ্চিত্রের দর্শক, ব্যবসা এবং প্রেক্ষাগৃহ

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রেক্ষাগৃহের ব্যবসা ভালো ছিলো। তখন প্রেক্ষাগৃহে একটা চলচ্চিত্র মুক্তি দেওয়া হলে তা একটানা দুই–তিন মাস পর্যন্ত চলেছে। একই দর্শক একই চলচ্চিত্র তিন-চার বার দেখেছে এমন উদাহরণও সেসময় ছিলো। দর্শক হিসেবে পুরুষ তো ছিলোই; সন্ধ্যার শো, এমনকি লেট নাইট শোয়ে নারীরা থাকতো। কোনো চলচ্চিত্রের গল্প ভালো হলে দর্শকের মুখে মুখে সেটা প্রচার হতো। আলাদা করে প্রচার-প্রচারণা খুব বেশি দরকার পড়তো না। তারপরও প্রেক্ষাগৃহ কর্তৃপক্ষ নিয়মিতই সেটা করতো। প্রেক্ষাগৃহের নিরাপত্তা নিয়ে খুব বেশি সমস্যা না হলেও পরিবেশ নিয়ে কিছু সমস্যা এই দশকে ছিলো। প্রেক্ষাগৃহ কর্তৃপক্ষ অনেকক্ষেত্রেই দর্শকের মূল্যায়ন করতেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। সাংস্কৃতিক অঞ্চলভিত্তিক আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে চলচ্চিত্রের ব্যবসা সংক্রান্ত এমন ধারণা পাওয়া যায়।

স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক কারণে অবাঙালি চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। ফলে তাদের প্রযোজনা ও পরিবেশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই চলে আসে বাঙালিদের হাতে। এতে ১৯৭২ সালে চলচ্চিত্রশিল্প খানিকটা পুঁজি সঙ্কটে পড়লেও অচিরেই এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। ৭২-এর শেষ ভাগে এবং ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে প্রচুর পুঁজি লগ্নি শুরু হয় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩০৫)। এই সময়ের ব্যবসা নিয়ে কথা হয় যশোরের 'তসবির মহল'-এর প্রবীণ ব্যবস্থাপক আলী হোসেন নদুর সঙ্গে। স্বাধীনতার পরের স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তার ভাষ্য হলো—

> স্বাধীনতার পরেও সিনেমাহলের ব্যবসা খুব ভালো ছিলো। একটা সিনেমা লাগালে কেশবপুর উপজেলা থেকে গরু গাড়ি করে মানুষ যশোরে চলে আসতো। তারা একদিন থেকে সিনেমা দেখে পরের দিন যেতো। তখন একটা সিনেমা দুই–তিন সপ্তাহ হাউসফুল ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৭)।

একই ধরনের কথা বলেন রংপুরের 'শাপলা'র গেইটম্যান সুকুমার চন্দ্র দাস। তার ভাষ্যমতে, 'তখন ব্যবসার অবস্থা খুব ভালো ছিলো। বেশিরভাগ সিনেমায় দর্শক টিকেট পেতো না। ফলে আমরা একটু

বেশি টাকা নিয়ে তাদের বসার ব্যবস্থা করতাম আর কী (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৭)।' চট্টগ্রামের হাজী মো. সেলিমের ভাষ্য হলো,

> এই সময়ে পরিবারের লোকজন বিশেষ করে মহিলারা রাতে স্বামীর সঙ্গে নাইট শো দেখতে আসতো। আর দিনে আসতো অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা। কতো ছেলেমেয়ে স্কুল পালিয়ে আসতো, আমরা বুঝতে পারতাম। পরিবারের অন্যান্য লোকজনও তখন সিনেমাহলে সিনেমা দেখতো। সন্ধ্যার শো, এমনকি লেট নাইট শোয়ে মহিলারা থাকতো; কোনো সমস্যা হতো না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৬)।

সদ্য স্বাধীন দেশে কিছু মানুষের কাছে যে কালো টাকা ছিলো, চলচ্চিত্র ব্যবসা ভালো হওয়ায় তাদের অনেকে এই অর্থ চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ (মুৎসুদ্দী ১৯৮৭, পৃ৫০) করতে থাকেন। আসলে কালো টাকা সাদা করার একটা সহজ পথ ছিলো তখন চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ। প্রযোজকদের কালো টাকা বিনিয়োগের আরো বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় বদরুদ্দীন উমরের আলোচনায়। তার ভাষ্যমতে,

> ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক জাতীয় নীতি ঘোষিত হওয়ার পর বে-সরকারি খাতে অবস্থিত চলচ্চিত্র শিল্পে যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োজিত হয়েছে তার সমান অথবা কাছাকাছি পরিমাণ পুঁজি একমাত্র পরিবহণ ব্যতীত অপর কোন শিল্পে বিনিয়োজিত হয়নি ...। লুটতরাজের মাধ্যমে অর্জিত ধন সম্পদ ও কালো টাকার আইনগত বিনিয়োগের পথ বন্ধ থাকায় সেটার এক অংশ ব্যয় হলো ভোগ বিলাসে। একটি অংশ মুনাফার জন্য বিনিয়োজিত হলো চোরাচালান ও কালোবাজারীতে। অপর একটি অংশ বিদেশে পাচার হলো। এছাড়া কালো টাকার যে বাকী অংশ থাকলো সেটা কিছু পরিমাণ বিনিয়োজিত হলো পরিবহণ, চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র একটা বিশেষ স্থান অধিকার করলো। ... চলচ্চিত্র কালো টাকা বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার ফলেই ১৯৭২ থেকে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটতে লাগল (উমর ১৯৮১)।

এর ফলে যেটা হলো, রাতারাতি নতুন নতুন প্রযোজনা ও পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকলো; নির্মাণ হতে থাকে নতুন নতুন প্রেক্ষাগৃহও। এই সময়ের জমজমাট ব্যবসার বর্ণনা দেন চট্টগ্রামের 'সিনেমা প্যালেস'-এর গেইটম্যান মো. রফিক। তার ভাষ্যমতে,

> আমরা কখনো চিন্তাই করি নাই, এই ব্যবসা কোনো দিন আজকের মতো এতো খারাপ পর্যায়ে যাবে। কারণ স্বাধীনতার পর যে পরিমাণ জমজমাট ব্যবসা ছিলো, এটা ভাবার সুযোগই তৈরি হয় নাই। একটা সিনেমা লাগালে কমপক্ষে এক সপ্তাহ হাউজফুল থাকতো। অনেক মানুষ টিকেট না পেয়ে ফিরে যেতো। আমাদের কাছে তখন বুকিং এজেন্টরা একের পর এক সিনেমা তৈরির খবর দিচ্ছে। বুকিংয়ের জন্য টাকা নিচ্ছে। অন্য কিছু ভাবার সুযোগই ছিলো না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৫)।

বরিশালের 'অভিরুচি'র গেইটম্যান অরুণ চন্দ্র গোস্বামী বলেন, "রাজ্জাকের *রংবাজ*, *বেঈমান* এই সিনেমাগুলো চলার সময় সিনেমাহলে চার সপ্তাহ ধরে দর্শকের কী ভিড়! তখন বরিশালে চারটা সিনেমাহল ছিলো—'বিউটি', 'কাকলি', 'সোনালী' ও 'অভিরুচি'। তারপরও ব্যবসা হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১)।" রাজশাহীর মো. জাহাঙ্গীর বলেন,

> আমি তখন সিনেমাহলে গিয়েই সব বই দেখতাম। তখন ছবি দেখার একটা আমেজ ছিলো। ছবিও ভালো ছিলো; ছবি দেখতেও ভালো লাগতো। ছবির গানগুলা শোনার মতো ছিলো, হিট গান। ডিরেক্টরও ভালো। তাই তখনকার বইগুলা দর্শক দেখেছে। তারা সিনেমা দেখতে এসে টিকিট পায় নাই। দেখতেই মজা লাগতো তখনকার বই। ধরেন, *ময়নামতি*—এই যে গানগুলো বাজতো, শুনতে কী ভালো লাগতো। *অবুঝ মন*-এর গানও ভালো লাগতো। ছবিও ভালো ছিলো। তারপর *দস্যুরাণী*, *ডাকু মুনসুর*—এগুলা দেখার মতো ছবি। এগুলা দর্শক দেখেছে, আনন্দ পেয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৩)।

যশোরের প্রহ্লাদ দাশের ভাষ্য হলো, "এক সময় এই সিনেমাহলে একটা সিনেমা একটানা দুই-তিন মাসও চলেছে; যেমন : *নীল আকাশের নীচে*, *বধূ বিদায়*, *অবুঝ মন*, *সুতরাং*, *সাত ভাই চম্পা*, *রংবাজ*, *জনি*। এর মধ্যে *নীল আকাশের নীচে* 'তসবির'-এ রোজার ঈদে লাগিয়ে আড়াই মাস পর কোরবানি ঈদের আগে নামানো হয় (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫)।" কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার উমর আলী দর্শকের আগ্রহ তুলে ধরেন এভাবে—'একটা কথা বলি, আগে এমনও সিনেমা হয়েছে, দর্শক একই সিনেমা একটানা তিনবার দেখছে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, যে সিনেমায় রিপিট দর্শক হয় না, সে সিনেমা স্থায়ী হতে পারে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৮)।' ময়মনসিংহের 'পূরবী'র বুকিং ক্ল্যার্ক স্বপন মিয়া সেই সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করেন আরো ভিন্নভাবে। তিনি বলেন,

> কোনো সিনেমার গল্প ভালো হলে এমনি এমনি সেটা প্রচার হয়ে যেতো। মানুষের মুখে শুনে শুনেই আরেকজন মানুষ সিনেমা দেখতে আসতো। তখন আলাদা পাবলিসিটির প্রয়োজন পড়তো না। দর্শকই সিনেমার সবচেয়ে বড়ো পাবলিসিটি করতো। একটা সিনেমা দেখার পর কোনো দর্শক যদি সেটা নিয়ে ভালো কথা বলে, সেটা অন্যরা বিশ্বাস করে। সিনেমাহলের লোকজন যতো কথাই বলুক দর্শক সেটা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২০)।

কুড়িগ্রামের দেবলাল রজক দেওয়ান বলেন,

> আমি সিনেমাহলে ঢোকার পর প্রথম ব্যবসা করলো দিলীপ বিশ্বাসের *সমাধি*। নায়ক-নায়িকা ছিলো রাজ্জাক, সুচরিতা আর উজ্জ্বল। এটা ১৯৭৩ বা ৭৪ সালের শেষের দিকের ঘটনা। পরে মালিকের কাছ থেকে শুনেছি, ওই সিনেমার ব্যবসার টাকা দিয়ে তিনি এখন 'মিতালী' সিনেমাহল যেখানে আছে, সেই জায়গাটা কিনেছিলেন। আর ঢাকার প্রযোজকরাও অনেক টাকা নিয়ে যেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৮)।

কিন্তু ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর চলচ্চিত্রশিল্পে আবার পুঁজির সঙ্কট দেখা যায়। কালো টাকার মালিক অনেক বিনিয়োগকারী গা ঢাকা দেন। চলচ্চিত্রশিল্পে কিছুটা স্থবিরতা আসে। কিন্তু এই স্থবিরতা প্রেক্ষাগৃহ পর্যন্ত পৌঁছেনি, তা কেবল ঢাকা ও এফ ডি সি'কেন্দ্রিক ছিলো। এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন সরকার চলচ্চিত্রের উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ নেয়। **'১৯৭৬ সালে সরকার চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করে'** (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩০৬)। এতে প্রথমবারের মতো প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। অনুদান ও জাতীয় পুরষ্কার ঘোষণার পর ৭০ দশকে এটি ছিলো চলচ্চিত্র নিয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার তৃতীয় পদক্ষেপ। যা জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষাকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়েছিলো।

৭০ দশকের শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নির্দেশে ১৯৭৮–১৯৮০ দ্বিবার্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ কর্মসূচিতে বেসরকারি খাতে ২০০ স্বল্প ব্যয়ের প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এছাড়া জিয়াউর রহমান স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রাম পর্যন্ত ৪০০ প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থাকে ঋণের ব্যবস্থা করতে বলেন (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪০১–৪০২)। এই সময়েই মূলত উপজেলা পর্যায়ে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ শুরু হয়। এসব পদক্ষেপের কারণে আবারও পুরনো ও নব্য ধনীদের অনেকেই চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ করায় পুঁজির প্রবাহ বাড়তে থাকে। এই সময়ের পরিস্থিতি নিয়ে খুলনার 'শঙ্খ'-এর সুপারভাইজার শেখ জাহিদের ভাষ্য হলো,

> তখন ব্যবসা এতো ভালো ছিলো যে, টুরিষ্ট সিনেমার (ঘুরে ঘুরে সিনেমা দেখানো) টাকা দিয়ে আমরা 'সোহেলী' নামে একটা সিনেমাহল করেছিলাম যশোরের নোয়াপাড়ায়। এরপর 'সোহেলী'র মুনাফা দিয়ে খুলনায় জায়গা কিনে ১৯৭৯ সাল থেকে 'শঙ্খ' এর কাজ শুরু করি। ১৯৮১ সালের দিকে 'শঙ্খ' সিনেমাহল উদ্বোধন হয় (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১২)।

রংপুরের 'শাপলা'র বুকিং ক্ল্যার্ক শফিকুল ইসলাম সেই সময়ের প্রেক্ষাগৃহের সার্বিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেন এভাবে—

> সিনেমাহলে আমরা যখন চাকরি শুরু করি, আমরা কখনোই ভাবি নাই, সিনেমাহলের অবস্থা একসময় এই ধরনের হবে। স্বাধীনতার পর আমার সরকারি চাকরি হয়েছিলো, আমি সেটা না করে সিনেমাহলেই থেকেছি। জীবন বেশ ভালোই চলছিলো। সিনেমাহলের বেতন কিন্তু খুব কম। মালিকরা মনে করতো, কর্মচারীরা সিনেমাহল থেকে খুব ভালো একটা রোজগার করে; এটা ঠিকও ছিলো। তাই তারা কর্মচারীদের বেতন খুব একটা দিতো না। আজ পর্যন্ত কিন্তু একইরকম অবস্থাই আছে। তারপরও আমরা এখানে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৬)।

সরকারের এইসব পদক্ষেপে নির্মাতারা নতুন উৎসাহে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। কিন্তু চলচ্চিত্র উৎপাদনশীল শিল্প নয়—এমন অজুহাতে এবং গ্রহীতারা সময়মতো ঋণ পরিশোধ না করার কারণে পরে ব্যাংক ঋণ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তারপরও চলচ্চিত্র নির্মাণে পুঁজির প্রবাহমানতা ছিলো। ততোদিনে অনেক প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ হয়ে গেছে।

৭০ দশকে চলচ্চিত্র ব্যবসায় নতুন দিক হলো যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ-ভারত প্রথম যৌথ প্রযোজনায় নির্মাণ হয় আলমগীর কবির পরিচালিত *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩)। এরপর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় আরো দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়—ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩) এবং রাজেন তরফদারের *পালঙ্ক* (১৯৭৬)। তবে ১৯৭৫-এর পরেই ভারতের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণে ভাটা পড়ে। ১৯৭৬ থেকে কয়েক বছর চলচ্চিত্র নির্মাণে বিরতি দেওয়া হয়।

৩.৭.১) প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ

তাড়াহুড়া করে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত বেশিরভাগ প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ অল্প দিনের মধ্যে নিম্নমান ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। ৭০ দশকের শেষ ভাগে দেশের ২০টি প্রেক্ষাগৃহে এয়ার কন্ডিশনিং এর ব্যবস্থা ছিলো বলে জানা যায়। দর্শকের জন্য আরামদায়ক চেয়ার, প্রক্ষালন কক্ষ, বিশ্রামাগার, ক্যান্টিন, অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে ছাড়া অন্যগুলোতে ছিলো না বললেই চলে। (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪০২) দর্শকের স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত দিকটি চিন্তা করে তখন এসব প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করা হয়নি। মানা হয়নি দৃষ্টির সঙ্গে পর্দার ডিগ্রিভিত্তিক অবস্থানের বিষয়টি। মফস্বল শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলো ছিলো আরো বেশি অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত—অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন।

সরকারি নিদের্শনা অনুযায়ী কমপক্ষে ১০০ দর্শকের জন্য একটি পায়খানা এবং সমান সংখ্যক দর্শকের জন্য দুটি প্রসাবখানা থাকার বিধান রয়েছে (Censorship and Cinematography Manual 1977, p51-53)। এছাড়া দর্শকের উঠানামার জন্য প্রেক্ষাগৃহের সিড়ি কমপক্ষে পাঁচ ফুট প্রশস্ত হওয়ার নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু সেসময় দেশের শতকরা ৮০ ভাগ প্রেক্ষাগৃহে এসব নীতিমালা মানা হয়নি (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪০২)। মফস্বলের অনেক প্রেক্ষাগৃহে ঠিকঠাক দেয়াল ছিলো না, বৃষ্টি হলে পানি পড়তো। জেনারেটর না থাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটে দর্শককে নিয়মিত ভোগান্তিতে পড়তে হয়। অনেকেই তখন এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি অবহেলা করেছে। অনেক প্রেক্ষাগৃহের প্রজেক্টর ছিলো পুরনো, ছবি কাঁপতো, ঘোলা দেখাতো। কিন্তু অনেক মালিক সেটা আমলে নিতেন না। সেই সময়ের প্রেক্ষাগৃহের খারাপ অবস্থা নিয়ে যশোরের প্রহ্লাদ দাশ তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে—

> চেয়ারের ঠিক নাই, ভয়াবহ গরম, বাথরুম মাত্র একটা; সিনেমা দেখতে এসে মানুষের সে কী কষ্ট হতো! কিন্তু তারপরও তারা তখন সিনেমা দেখেছে। দর্শক তখন নিরুপায় ছিলো। মালিকরাও এসব বিষয় খুব একটা আমলে নিতো না। তারা ভাবতো দর্শক তো দেখছেই। আর দর্শকইবা কী করবে, সিনেমা দেখা ছাড়া তাদের তো কোনো উপায় ছিলো না। এখন তো অনেক উপায়। একটা টিকেটের জন্য দর্শক আমাদের কাছে এসে কতো অনুনয়-বিনয় করতো। আমরাও তখন সুযোগ পেয়ে কিছুটা ভাব নিতাম। কিন্তু সেই অবস্থা বেশি দিন থাকলো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫)।

কুমিল্লার লাকসামের তোফায়েল হোসেন বলেন,

> তখন সিনেমাহল খুললেই হাজার বিশেক টাকা সেল হতো। তখনকার দিনের ২০ হাজার মানে আজকের দুই লাখ টাকা। তখন এখানে 'উজ্জ্বল' নামে একটা টিনসেড সিনেমাহলে আমি কাজ করতাম। সেখানে জেনারেটর ছিলো না। বিদ্যুৎ সমস্যা করলে, কিংবা অনেকক্ষণ না আসলে আমরা দর্শকের টিকিটে লিখে দিতাম, সপ্তাহের যেকোনো দিন এসে তারা যেনো সিনেমা দেখে যেতে পারবে। অনেকে সেই সপ্তাহেই আসতো। আবার কেউ পরের সপ্তাহে অন্য সিনেমার সময় আসলেও আমরা তাদের দেখাতাম। এতে কাস্টমাররা খুশি থাকতো। কিন্তু এতো রোজগারের পরও মালিকরা খুব বেশি যত্নবান ছিলো না সিনেমাহল নিয়ে (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৮)।

সবমিলে বিনোদনের খুব বেশি ভালো ব্যবস্থা না থাকায় দর্শক এই সময়টাতে প্রদর্শকদের সব মেনে নিয়েই প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করতেন। প্রদর্শকরা হয়তো মনে করতেন, দর্শকের যাওয়ার আর কোনো

জায়গা নেই। অথচ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই সময়ে প্রেক্ষাগৃহের একটি গুরুত্ব ছিলো। দর্শক নিয়মিত সেখানে হাজির হতেন কিংবা হওয়ার চেষ্টা করতেন। প্রেক্ষাগৃহের এই সময়ের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কুড়িগ্রামের 'মিতালি'র মালিক জোবায়ের হোসেন বলেন,

> কুড়িগ্রামের সব কিছু নির্ভর করতো সিনেমাহলের ওপর। মানুষ কখন খাবে, কখন ঘুরতে বের হবে, এর সব কিছু নির্ভর করতো সিনেমাহলের ওপর। কারণ দীর্ঘ দিন এখানে সিনেমাহল ছাড়া মানুষের আর কোনো বিনোদন মাধ্যম ছিলো না। বাড়িতে আত্মীয় আসলে তাকে নিয়ে মানুষ সিনেমা দেখতে আসতো। পুরনো শহরে যখন 'মিতালি' ছিলো, তখন মানুষ সিনেমাহলের বাইরে যে মাইকটা বাজতো তার ওপর নির্ভর করে দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কাজ করতো। অথচ এখন মানুষ সিনেমাহলের খোঁজ রাখে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৯)।

৭০ দশকে ছোটো ছোটো প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিলো। 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র এক প্রবন্ধে বলা হয়, "ক্ষুদে সিনেমা হল অর্থাৎ ২০০/২৫০ (দুশো/আড়াইশো) আসনযুক্ত সিনেমা হলের সুবিধে অনেক এবং এই ক্ষুদে সিনেমা হল গড়ে তোলার দিকেই সরকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। জনসংখ্যার প্রতি ৫ হাজার লোকের জন্য একটি করে (ক্ষুদে) সিনেমা হল গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে ঢাকা শহরেই ৫ শত (ক্ষুদে) সিনেমা হলের এবং সারাদেশে ১৫ হাজার সিনেমা হলের প্রয়োজন। ২০০৩ সালে (জাতিসংঘের সমীক্ষা অনুযায়ী) বাংলাদেশে ৪৪ হাজার সিনেমা হলের প্রয়োজন হবে" (ইফতেখার ১৯৭৩, পৃ৪৫)। অথচ বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে মাত্র একশোর কিছু বেশি প্রেক্ষাগৃহ ছিলো। ফলে দর্শক চাহিদার এই সময়ে চলচ্চিত্র ব্যবসার একটা অপার সম্ভাবনা ছিলো দেশে।

৩.৮) চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী

এই দশকে নির্মিত চলচ্চিত্রের সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন ছিলো। যা দর্শককে আকৃষ্ট করেছে। এসব কাহিনি সৃষ্টিতে নির্মাতা ও কাহিনিকাররা প্রচুর মেধা, শ্রম ও সময় ব্যয় করতেন। বেশিরভাগ চলচ্চিত্রে কিছু না কিছু নৈতিক শিক্ষার জায়গা ছিলো। যা চলচ্চিত্রকে সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতে সহায়তা করতো। এছাড়া বেশিরভাগ চলচ্চিত্রের গানও ছিলো খুব আকর্ষণীয়। দর্শকের একটা বড়ো অংশ কেবল গান শোনার জন্যই প্রেক্ষাগৃহ যেতো। গবেষণা আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে নির্মাতা ও চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে দর্শকের যে ধ্যান-ধারণা পাওয়া যায় সেখানে তারা এমনটাই মনে করেন।

এছাড়া এখানে গবেষণা আখ্যানে দর্শক স্মৃতিতে থাকা সর্বাধিক প্রাবল্যের দুটি চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ৭০ দশকে সর্বাধিক দর্শক স্মৃতিতে থাকা চলচ্চিত্র দুটি (বিস্তারিত দেখতে পারেন প্রথম অধ্যায় ১.৯.৩; সারণী ১.১.২) হলো কাজী জহিরের *অবুঝ মন* (১৯৭২) ও দেওয়ান নজরুলের *দোস্ত দুশমন* (১৯৭৭)। দর্শক স্মৃতিতে থাকা মোট ৫৪টি চলচ্চিত্রের (সারণী ৩.১.১) মধ্যে সর্বাধিক যে দুটি চলচ্চিত্রের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ব্যবসায়িক দিক থেকেও এই দশকে এগিয়ে ছিলো। এছাড়া দর্শক চলচ্চিত্রের আধেয়তে যে সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলনের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন তাও এ দুটির আধেয়তে নানাভাবে এসেছে বলে মনে হয়েছে।

খুলনার 'সঙ্গীতা'র এক সময়ের নিয়মিত দর্শক ছিলেন কামরুল ইসলাম। প্রেক্ষাগৃহের পাশেই তার বাড়ি। ৭০ বছরের কামরুল 'সঙ্গীতা'র পাশের রাস্তায় একটি দোকানে প্রায় সারাদিন বসে থাকেন। দুই-এক দিন বিষয়টি লক্ষ্য করার পর কথা বলি তার সঙ্গে। প্রথমে চলচ্চিত্র নিয়ে কোনো কথা বলতেই তিনি একেবারেই রাজি হচ্ছিলেন না; শেষ পর্যন্ত কিছু কথা হয় তার সঙ্গে। তবে সেই কথায় প্রচণ্ড রাগ-ক্ষোভ-অভিমান ছিলো। তার ভাষায়,

> আমাদের সময়ের সিনেমায় সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে পরিচালকদের সোচ্চার কণ্ঠস্বর ছিলো। সমাজে খারাপ কাজ করা যাবে না, এটা করলে এই হবে—এগুলো কিন্তু তখন আমরা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেখতাম, শিখতাম। ফলে আগে পরিবার, ছোটো ভাইবোনকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়া যেতো। এখন তো সিনেমাহলের আশপাশে যাওয়া যায় না। এই যে আমি সারাদিন এখানে বসে থাকি, একবার নিজ থেকে সিনেমাহলের দিকে তাকাইও না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১০)।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার 'রূপাঞ্জলি'র সাবেক ব্যবস্থাপক উমর আলী বলেন,

> স্বাধীনতার পরের সিনেমাগুলোতে দেশ গড়ার বিষয়ে নানা ধরনের কথা থাকতো। সেগুলো দেখলে তখন শরীর গরম হয়ে যেতো। তখনকার পরিচালকরা সিনেমার মাধ্যমে জনগণকে কিছু একটা দেয়ার চেষ্টা করতেন। জনগণ সাময়িক হলেও সেটা নিতো। এছাড়া যে মারদাঙ্গা সিনেমাগুলো হতো, সেগুলোতেও শেখার অনেক কিছু ছিলো। ন্যায়-অন্যায়টা বোঝা যেতো। রাজ্জাক, ওয়াসিম, সোহেল রানা, খসরু এরা বেশ কিছু মারদাঙ্গা সিনেমা করলো। এসব সিনেমাও কিন্তু ভালোই চলতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৮)।

৭০ দশকের একেবারে শুরুতে জহির রায়হান নির্মাণ করেন *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০)। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ তথা স্বাধীনতা আন্দোলনে এই চলচ্চিত্রটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই প্রগতিশীল গণআন্দোলনের সাফল্যের পরে বৈপ্লবিক চলচ্চিত্র নির্মাণের নজির আছে; যেমন, সের্গেই আইজেনস্টাইনের *অক্টোবর* (১৯২৮), পুদোভকিনের *মাদার* (১৯২৬)। "কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে থেকে একদিকে সামরিক একনায়কের রক্তচক্ষু আর অন্যদিকে মুনাফালোভী প্রযোজকের শ্যেনদৃষ্টি উপেক্ষা [করা], দেশের স্বাধিকার আন্দোলনের সাথে সোচ্চার একাত্মতা ঘোষণা করা এবং দর্শককে প্রয়োজন হলে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করার মত যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা 'জীবন থেকে নেয়া'র মধ্যে দেখতে পাই তার নজির পৃথিবীর মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে বিরল" (কবির ২০১৮, পৃ৮৭)। আলমগীর কবিরের এই মন্তব্যকে আরো জোরালো করেছে ফরহাদ মজহারের ভাষ্য। তিনি কেবল *জীবন থেকে নেয়া* নয়, সেই সময়ে নির্মিত প্রায় সব চলচ্চিত্রকে মুক্তি সংগ্রামের উৎসাহদাতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠবার সময় নিজেদের হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠবার ক্ষেত্রে সেই সময়ের চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসের এই সকল অদৃশ্য ভূমিকার দিকে আমাদের নজর ও মনোযোগ নাই। এই ছবিগুলো কোনো রাজনৈতিক বয়ান তৈরি করে নি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ছবি বানানো যায় এবং তা বাণিজ্যিক ভাবে সফল হয়—ষাট দশকে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা জরুরি ছিল (মজহার ২০১১)।

জীবন থেকে নেয়া নিয়ে চট্টগ্রামের 'আলমাস'-এর প্রবীণ কর্মী এ টি এম ফারুকের মূল্যায়ন একটু অন্যরকম। তার ভাষ্যমতে,

> *জীবন থেকে নেয়া* এক অন্য ধরনের ফিল্ম, আমার কাছে এটা কালের সাক্ষী। সাধারণ দুইটা কই মাছ আর একটা চাবির গোছার ওপর সারাদেশ দেখিয়ে দেওয়া কেবল জহিরের পক্ষেই সম্ভব, আর কারো পক্ষে নয়। 'খুরশীদ মহল' সিনেমাহলে *জীবন থেকে নেয়া* প্রথম শো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। সেই সিনেমায় শেখ মুজিবের একটা ভাষণ ছিলো। পরের শো থেকে অবশ্য সেটা আর দেখানো হয়নি। প্রথম শো চালানোর পরই ওই ভাষণটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয় (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৯)।

রূপবান যদি জাতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম পদক্ষেপ হয়, তাহলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ বলা চলে *জীবন থেকে নেয়া*কে। যদিও সেই ধারাবাহিকতা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অব্যাহত রাখা যায়নি। কারণ যে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হাতে জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের দায়িত্ব পড়েছিলো *রূপবান*কে তারা চলচ্চিত্র মনেই করতে (দেখতে পারেন, ফরহাদ ২০১১) পারেননি। আর *জীবন থেকে নেয়া* ছিলো অনেকের কাছে একটি বিশেষ পরিস্থিতির সফলতা। ফলে যেটা হয়েছে ৭০ দশকে *সূর্য দীঘল বাড়ী* কিংবা *গোলাপী এখন ট্রেনে*'র মতো চলচ্চিত্র দিয়ে তারা যে জাতীয় ও রাষ্ট্রীক চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত খুব বেশি সফল হয়নি। কারণ ওইসব চলচ্চিত্রে *রূপবান*-এর গ্রামীণ জীবনের আখ্যান থাকলেও বিনোদন ছিলো না, ফলে তা দর্শককে ছুঁতে পারেনি।

১৯৭২ সালে দেশে চলচ্চিত্র মুক্তি পায় মোট ৩০টি। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মাণ হয় পাঁচটি চলচ্চিত্র। বাকি চলচ্চিত্রগুলোর বেশিরভাগেরই নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিলো পাকিস্তান আমলে। স্বাধীনতার পরপরই নির্মাণ হয় এ ঘটনাকে উপজীব্য করে প্রথম চলচ্চিত্র *ওরা ১১ জন* (১৯৭২)। তাৎক্ষণিক আবেগ ও দেশপ্রেমের কারণে চলচ্চিত্রটি সে সময় সাধারণ জনগণের মনে বেশ সাড়া ফেলেছিলো। এসব চলচ্চিত্র নিয়ে কথা হয় যশোরের 'তসবির মহল'-এর হিসাবরক্ষক শ্যামাপদ হালদারের সঙ্গে। তিনি বলেন,

> স্বাধীনের পর মুক্তিযুদ্ধের সিনেমাগুলো ভালো ব্যবসা করে। ওই সিনেমাগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সেই আবেগটা ছিলো। আজকের দিনের সিনেমায় তো কোনো কাহিনি নাই। কিন্তু ওইসব সিনেমার কাহিনিও অত্যন্ত ভালো ছিলো। সেসময় এসব সিনেমা দেখার জন্য মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়তো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৩৭)।

যশোরের 'মণিহার' এর বাদাম বিক্রেতা সিরাজুল ইসলামের কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

> মুক্তিযুদ্ধের সিনেমাগুলোতে সেসময় যে অভিনয় দেখছি, তাতে সেগুলোকে অভিনয় মনে হতো না। মনে হতো এরা মুক্তিযুদ্ধই করছে। আমি তো শুনছি অনেক আসল মুক্তিযোদ্ধাও নাকি এসব সিনেমায় অভিনয় করছে। সিনেমাহল থেকে বের হওয়ার পরও এগুলো মনে থাকতো। আর এখন দেখার পর কী দেখলাম সেটাই বলতে পারি না! আগের সিনেমার গানগুলোও খুব ভালো লাগতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪০)।

নেত্রকোণার 'হিরামন'-এর সুপারভাইজার জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রগুলোর জনপ্রিয়তাকে বর্ণনা করেন ভিন্ন দৃষ্টি থেকে। তার যুক্তি হলো—

> এ ধরনের যুদ্ধের সিনেমা দর্শক আগে দেখে নাই বললেই চলে। আর যদি কিছু দেখেও থাকে সেটা অন্য ভাষার ছিলো। মুক্তিযুদ্ধের সিনেমাগুলোতে যখন নিজের দেশের মানুষ নিজেদের ঘটনা নিয়ে সিনেমা করা শুরু করলো, তখন দর্শকরা মজা পেয়ে গেলো। সবাই তো আর প্রকৃত যুদ্ধ দেখে নাই। তারা এখানে যুদ্ধ দেখতেও পেলো, ফলে এসব সিনেমা দর্শক খুব আগ্রহ নিয়ে দেখতে থাকলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২৭)।

অনেকে অভিযোগ করেন (শুভ, মাহ্মুদ ২০০৬, পৃ৯৯) (কবির ২০১৮, পৃ৮৯) মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রগুলোতে তথ্যের বিকৃত উপস্থাপন, সস্তা আবেগ, নারী দেহের প্রদর্শনীসহ চটুল বাণিজ্যিক উপাদান ছিলো প্রচুর। এবং এসব চলচ্চিত্রের বেশিরভাগই ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু আখ্যানের তথ্য-উপাত্তে এ ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছিলো মোটে ১৩টি। বৃহৎ এই ঘটনা নিয়ে এক দশকে ১৩টি চলচ্চিত্র নির্মাণ সংখ্যার অনুপাতে খুব বেশি নয়। এছাড়া এতো বড়ো একটি ঘটনাকে নানা দিক থেকে দেখার অবকাশ আছে। তাই শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে তা সস্তা আবেগ, নারী দেহের প্রদর্শনীসহ চটুল বাণিজ্যিক উপাদান মনে হলেও সাধারণ দর্শক সেগুলোকে গ্রহণ করেছিলো।

'৭২-এ মুক্তি পায় কাজী জহিরের *অবুঝ মন*। *অবুঝ মন* সেসময় ব্যবসায় রেকর্ড সৃষ্টি করে। আগেই বলেছি প্রেমমুখ্য সামাজিক ঘরানার এই চলচ্চিত্রটি আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে ৭০-এর দশকে চলচ্চিত্রের প্রাবল্য বিবেচনায় সবচেয়ে এগিয়ে ছিলো।

অবুঝ মন-এর কেন্দ্রীয় আখ্যান হলো এমন—প্রাণের বন্ধু মাছুম ও বিজয়। এতিম মাছুম মুসলমান হলেও টানা সাত বছর বিজয়ের বাড়িতে থেকে তার সহায়তায় ডাক্তারি পাস করেন। মাছুমের ইচ্ছে গ্রামে ফিরে গরীব-দুঃখীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার। সেই অনুযায়ী বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাছুম ট্রেনে গ্রামে যাত্রা করেন। ট্রেনেই পরিচয় হয় মাধবীর সঙ্গে। ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়লে অজানা এক স্টেশনে একসঙ্গে নানা খুনসুটির মধ্য দিয়ে রাত কাটাতে হয় তাদের। কিন্তু মাধবী যে তারই এলাকার হিন্দু জমিদার রাজাবাবুর একমাত্র মেয়ে তা জানেন না মাছুম।

রাজাবাবু অসুস্থ, তাই জমিদারী দেখাশোনার ভার পড়ে মেয়ে মাধবীর ওপর। এলাকার মানুষের খাবার পানির জন্য জমিদারের পুকুর ব্যবহারের অনুমতির জন্য দেখা করতে গিয়ে মাধবীর পরিচয় পান মাছুম। অবশ্য মাধবী তখনও জানেন না মাছুম একজন চিকিৎসক এবং গ্রামে সবার সেবা দিচ্ছেন। নায়েবের স্ত্রী অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা করতে যান মাছুম। সেখানেই প্রথম মাছুমের পরিচয় মাধবী জানতে পারেন। ধীরে ধীরে দুজন দুজনের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

পরপোকারী হিসেবে চারদিকে নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ে মাছুমের। এরই মধ্যে মাধবীর বাবা জমিদার রাজাবাবু বেশি অসুস্থ হলে মাছুমের ডাক পড়ে। রাতভর রাজাবাবুর সেবা করার ফাঁকে দুজনের মধ্যে মন দেওয়া-নেওয়া হয়। মাছুমের চিকিৎসায় পরদিন সকালে রাজাবাবু পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেন। রাজাবাবু প্রতিজ্ঞা করেন, এর বিনিময়ে মাছুম তার কাছে যা চাইবেন তাই পাবেন। মাছুম সেদিন কিছু চান না। সময় হলে চাইবেন বলে রাজাবাবুকে জানান। এদিকে মাছুম-মাধবীর সম্পর্কের কথা জেনে

যান রাজাবাবু। হিন্দু জমিদারের মেয়ের সঙ্গে মুসলমানের প্রেম তিনি মেনে নিতে পারেন না। অন্যখানে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন। আর মাছুমের কাছে গিয়ে তাকে সন্তান ডেকে মেয়েকে ভিক্ষা চান। মাধবীকে ত্যাগ করে নিরুপায় মাছুম গ্রাম ছেড়ে চলে যান।

মাধবীর বিয়ে হয় মাছুমের সেই প্রাণের বন্ধু ব্যারিস্টার বিজয়ের সঙ্গে। বাসররাতেরই বিজয়কে ব্যর্থ প্রেমের কথা জানান মাধবী। বিজয় তা মেনে নিতে পারেন না। একপর্যায়ে মাধবীকে একা বাড়িতে রেখে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন তিনি। এই সময় বিজয়ের বাড়িতে আসেন মাছুম। বন্ধুর দেখা না পেয়ে ফিরে গিয়ে মাছুমও পথে পথে ঘুরতে থাকেন। সেখানেই দেখা হয় মেডিকেল কলেজের ছাত্রী রাবেয়ার সঙ্গে, যিনি মাছুমকে ছাত্রজীবন থেকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। মাছুমের এই খারাপ অবস্থা দেখে রাবেয়া তাকে বাসায় নিয়ে যান, সেবা করে সুস্থ করে তোলেন।

একদিন আবারো বিজয়ের খোঁজে তার বাসায় আসেন মাছুম। ততোদিনে অবশ্য বিজয় ফিরে এসেছেন। বিজয়ের অনুরোধে সে রাতে ওই বাসাতেই থেকে যান মাছুম। রাতে ঘটনাক্রমে মাছুমের সঙ্গে দেখা হয় মাধবীর। বিজয় সেটা আড়াল থেকে দেখে ফেলেন। মাছুম বোঝানোর চেষ্টা করেন মাধবীকে, তাদের বন্ধুত্ব অনেক বড়ো/মহৎ তাই তিনি যেনো সবকিছু বাদ দিয়ে বিজয়ের সঙ্গে সংসার করেন। মাধবী জানান, তারা সবাই মান-সম্মান আর বন্ধুত্ব নিয়ে আছে, তার কথা কেউ শুনছে না।

ছবি : সংগৃহীত

পরদিন মাধবী আত্মহত্যার চেষ্টা চালালে মাছুম তাতে বাধা দেন। এই সময় উপস্থিত হন বিজয়। সব শুনে তিনি মাছুমের সঙ্গে মাধবীকে থাকতে বলেন। মাছুম কিছুতেই তা মেনে নিতে পারেন না। বিজয় মন খারাপ করে গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। রাস্তায় দুর্ঘটনায় পরে তার দুটো চোখ নষ্ট হয়ে যায়। এটা মেনে নিতে পারেন না মাছুম। তিনি একটি চোখ বিজয়কে দান করেন। মাছুমের ত্যাগ শেষ পর্যন্ত মাধবীকে বিজয়ের সংসার মেনে নিতে বাধ্য করে। অন্য দিকে রাবেয়া চলে যান মাছুমের সঙ্গে।

সামন্ত সমাজের প্রেক্ষাপটে *অবুঝ মন*-এ ধর্মাভাব শক্তিশালীভাবে উপস্থাপিত হলেও বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালোবাসা, ত্যাগ ও ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার বিষয়গুলো অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। নির্মাতা অত্যন্ত কৌশলে ধর্ম দিয়ে এখানে চেক অ্যান্ড ব্যালান্স করেছেন। হিন্দু বন্ধুর বাড়িতে সাত বছর থেকে তার আর্থিক সহায়তায় লেখাপড়া শিখে চিকিৎসক হন মাছুম। সেই উপস্থাপনায় ধর্ম আসলেও তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমানের প্রেম-বিয়েতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ম। সেই বাধায় অবশ্য বাধা ডিঙানোর আগ্রহ নেই; বরং একজন আদর্শবাদী যুবকের ত্যাগ আছে। যে ত্যাগের মহিমা তাকে এম বি বি এস পাস করে গ্রামে নিয়ে গেছে, নিজের মায়ের শেষ স্মৃতি গলার হার বিক্রি করে গ্রামের গরীব কৃষকের মেয়ের যৌতুকের ব্যবস্থা করেছে। এমন কী জমিদার বাবু এসে যখন হাতজোড় করে মাধবীকে ভিক্ষা চান, তখনও তা নিয়ে কোনো কথা বলতে দেখা যায়নি মাছুমকে। শেষ পর্যন্ত নিজের একটি চোখ সম্প্রদান করে মাছুম বন্ধুত্বের ঋণ ও ভালোবাসার মানুষের সুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

অন্যদিকে বন্ধু বিজয় তার সবটুকু দিয়ে নিজের ভাইয়ের মতো করে শিক্ষিত করে তোলেন মাছুমকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাছুমকে গ্রামে পাঠিয়েছেন, নিজের টাকায় গরিবের চিকিৎসার জন্য ওষুধ কিনে দিয়েছেন, লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছেন। বন্ধুর ভালোবাসার জন্য নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বন্ধুর দান করা চোখ পেয়েও বন্ধুর ক্ষতি হবে ভেবে তাতে বাধা দিয়েছেন। চলচ্চিত্রজুড়ে দুই যুবকের এই আদর্শবাদীতা সব কিছুকে মেনে নিতে শিখিয়েছে!

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের প্রসার লক্ষ করা যায়। এ সময় ঢাকাসহ বাংলাদেশের শহরগুলোতে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি নব কলবরে বেড়ে ওঠে। এই শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যে বেশ পারঙ্গম হয় (উদ্দীন ১৯৭৩, পৃ২৪)। এই শ্রেণির প্রতিনিধি মাছুম। আধা সামন্তবাদী এক সমাজে মাছুমের মধ্যে মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। সুবিধাভোগী না হলেও তিনি আপোসকামী। তাকে অনেক অন্যায়, কদর্য ও অনভিপ্রেতের সঙ্গে আপোস করে চলতে হয়। যদিও এই মধ্যবিত্তই সমাজের সবচেয়ে সচেতন অংশ (উদ্দীন ১৯৭৩, পৃ২৩)।

অন্যদিকে মাধবী কোনোভাবেই বিজয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ককে মেনে নিতে পারেননি। মাছুমের প্রতি তার যে নিরবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা, সেটা তিনি প্রকাশ করে গেছেন নিঃসঙ্কোচে। যদিও মাধবীর সামন্তপ্রভু বাবার কাছে তার সন্তানের চেয়ে বংশ, মান মর্যাদা গুরুত্বপূর্ণ! তাই মাছুম ও মাধবীর ভালোবাসা জানাজানি হওয়ার পর জমিদার রাজাবাবু তার বন্ধুর ছেলের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে ঠিক করেন। এই পরিস্থিতিতে এক ঘণ্টা ৩৭ মিনিট এক সেকেন্ডে বাবা-মেয়ের কথোপকথন এমন—

রাজাবাবু : আজ তোমার সব বলাই বৃথা। তোমার কোনো কথা শুনতেই আমি প্রস্তুত নই। এ বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

মাধবী : অসম্ভব, এ কিছুতেই হতে পারে না।

রাজাবাবু : হতে পারে এবং হবেও।

মাধবী : আমার মতের বিরুদ্ধেও!

রাজাবাবু : শুধু বিয়ে কেনো, আমার বংশের মান মর্যাদা রক্ষার জন্য বাপ হয়ে আমি আমার সন্তানকে বলি পর্যন্ত দিতে পারি।

শেষ পর্যন্ত বিজয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় মাধবীর। ছন্নছাড়া মাছুম একপর্যায়ে গিয়ে উঠেন বিজয়ের বাসায়; জানতে পারেন প্রাণপ্রিয় বন্ধু বিজয়েরই স্ত্রী মাধবী। তাদের দুজনের দেখা হলে মাধবীকে সবসময়ই মাছুম তার বন্ধু বিজয়ের কাছে থেকে যেতে বলেন। কারণ বন্ধুর জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন। কিন্তু মাধবী তাতে রাজি নন। তার কাছে ভালোবাসা বড়ো। এই পরিস্থিতিতে মাধবী বিষপানে আত্মহত্যা করে সমস্যার সমাধান করতে চান। মাছুম তাতেও বাধা দেন। চলচ্চিত্রের দুই ঘণ্টা ১৯ মিনিটে মাধবীকে তাই মাছুমকে উদ্দেশ করে বলতে শোনা যায়, 'তোমরা সবাই স্বার্থপর। তোমাদের কারো কাছে মান মর্যাদা বড়ো, কারো কাছে বন্ধুর ভালোবাসা বড়ো, সেখানে আমার জীবনের কোনো মূল্যই নেই।' মাধবীর এই অবস্থান মধ্যবিত্ত দর্শকের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। পুরুষ প্রাধান্যশীল সমাজ অবশ্য এসবের খুব একটা ধার ধারতে চায় না। তাদের কাছে মাধবীর ভালোবাসার চেয়ে দুই পুরুষের ত্যাগ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ দুই বন্ধুর আদর্শবাদীতা আর ত্যাগের মহিমায় ততোক্ষণে মাধবী পিষ্ট হয়ে গেছেন।

এদিকে মহৎ ত্যাগী মাছুমের বিপরীতে রাবেয়াকে স্বার্থপর মনে হয়। কারণ মাছুম যখন বিজয়কে চোখ দান করতে যান, সেটা জেনে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন রাবেয়া। রাবেয়ার সেই প্রতিবাদের যে উপস্থাপন, সেখানে ভালোবাসার চেয়ে স্বার্থপরতা বেশি ছিলো। সেখানেও সেই আদর্শবাদী পুরুষকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা! নির্মাতা অবশ্য শেষ পর্যন্ত দর্শককে নিরাশ করেননি, কোনো প্রথা, নিয়ম না ভেঙেই যার যেখানে অবস্থান সেখানে বসিয়ে দিয়েছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত দর্শক 'প্রশান্তি' নিয়েই ঘরে ফিরেছেন। কাজী জহির পুরুষকে যেভাবে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত তা করেই ছেড়েছেন। তাই শেষ দৃশ্যে যখন মাছুম চলে যাচ্ছেন, তখন মাধবীকে উদ্দেশ করে বিজয়কে বলতে শোনা যায়, 'দেবতাকে এভাবে বিদায় দিতে নেই, প্রণাম করো।'

অবুঝ মন-এ সামন্ত সমাজের উত্তরাধিকার, প্রশাসন কাঠামো উপস্থিত থাকলেও তা চলচ্চিত্রে গৌণ হয়ে এসেছে। মাধবী-মাছুমের বিয়েতে চাল-চুলোহীন মাছুম কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়াননি, হয়েছে ধর্মবোধ। সামন্তবাদের ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ও এটার কারণ হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব সময়ে চলচ্চিত্রটি শুরু হয়ে মুক্তি পেয়েছে পরে। ৬০ দশকের শেষ প্রান্তেও রাজা-রাণী, রাজ্য, জমিদার এগুলো লোককাহিনি ধারার চলচ্চিত্রে গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। হয়তো ওই ধরনের চিন্তার কিছুটা হলেও সঙ্গে থাকার চেষ্টা

করেছেন নির্মাতা। তবে ওইসব চরিত্রে যেভাবে সামন্তপ্রভুদের দাপট নিয়ে হাজির থাকতে দেখা যায় *অবুঝ মন*-এ তা ছিলো না। বরং হিন্দু জমিদার রাজাবাবুকে রাতের আধারে মাছুমের কাছে গিয়ে নতি স্বীকার করতে দেখা যায়। যেনো মাছুমের সহযোগিতায় তার একমাত্র পাথেয়। মাছুমও তাকে নিরাশ করেননি। ফলে মধ্যবিত্ত আদর্শবাদী মাছুমের ত্যাগ আর ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু জমিদারের মিনতি, দুটো এক সুতোয় বাধা পড়েছে দর্শকের কাছে।

অবুঝ মন নিয়ে ১৯৭৩ সালে সেই সময়ের আলোচিত ম্যাগাজিন 'বিচিত্রা'য় বলা হয়, "শরৎচন্দ্রের দোষগুলোকে যদি কেউ দর্শকের অজ্ঞতার সুযোগে প্রয়োগ করতে চায় মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অনুভূতিকে যদি পুঁজি হিশেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে তার জন্য সেই নির্মাতাকে আমি দায়ী মনে করি না। বলতে পারি তার সীমিততা আছে। আর দর্শকেও অভিযুক্ত করা যায় না—সময় কাটানোর দ্বিতীয় কোন মাধ্যম নেই বলে। একমাত্র এদেশের চিত্রশিল্পকেই অভিযুক্ত করা যেতে পারে যে শিল্প ধর্ম নিয়ে ব্যবসাকে উৎসাহী করে" (*সাপ্তাহিক বিচিত্রা* ২৫ মে ১৯৭৩)। কাজী জহির ও তার ব্যাপক জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলো নিয়ে এ ধরনের সমালোচনা থাকলেও তাকে নিয়ে কিছু বিষয় বলা জরুরি। কাজী জহির তার চলচ্চিত্রে সমসাময়িক মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে টানাপড়েন সেটাকে ধরতে চেয়েছেন। ফলে ধর্মবোধ, মধ্যবিত্ত, প্রথাগত সামাজিক-পারিবারিক কোনো সম্পর্ককে তিনি সমালোচনার মুখে ফেলতে চাননি। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে জহির একেবারে নিজস্ব একটা ঢঙ নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হয়েছেন। সেই ধারায় পাশ্চাত্য শিক্ষার কোনো ছোয়া ছিলো না বললেই চলে। সেখানে সরলতা ছিলো, সহজ জীবনের একটা প্রত্যয় ছিলো। জীবন জটিল হলেও তা যে সরল করে নেওয়া যায়, তার একটা চেষ্টা জহিরের মধ্যে ছিলো। সেই চেষ্টাটাই তাকে অনন্য করে তুলেছিলো। ফলে সাধারণ জনগণ তার চলচ্চিত্র দেখতে হুমড়ি খেয়ে পড়তো। চলচ্চিত্র গবেষক ও নির্মাতা জাকির হোসেন রাজুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনিও জহিরকে নিয়ে একই ধরনের কথা বলেন। তিনি মনে করেন,

> তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বাংলাদেশসহ, সিনেমা মাধ্যমের এক ধরনের স্থানীয়করণ হয়েছে। কাজী জহিররা হচ্ছেন আমাদের হোমগ্রোন ফিল্মমেকার। এর সঙ্গে আরো আছেন সুভাষ দত্ত, খান আতাউর রহমান, চাষী নজরুল ইসলাম—আমরা এদের ছবি দেখতে পছন্দ করি বা না করি, এরা কিন্তু ওভারঅল আমাদের দেশের কমন পিপলের যে মাইন্ডসেট সেটাকে ধরতে পেরেছিলো। এদের সিনেমাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ তারা নিজেরাই ডেভেলপড করেছে, এরা ওয়েস্টার্ন সিনেমাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ শেখেও নাই বা সেটা নিয়ে তারা কনসার্ন না। একইভাবে আমাদের দর্শকও কিন্তু কনসার্ন না (আখ্যানের ক্রম ৫.৩; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

এছাড়া ৬০ দশকের ধারাবাহিকতায় ৭০ দশকেও কিন্তু দর্শকের ভিতর চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক জাদু-বাস্তবতার প্রভাব ছিলো। সঙ্গে *রূপবান*-এর ফ্যান্টাসি তো আছেই। ফলে *অবুঝ মন*-এ প্রেমমুখ্য গল্পের যে ফ্যান্টাসি সেটা দর্শক উপভোগ করেছে বলে মনে হয়েছে। আর শহুরে মধ্যবিত্তের যে নিজেদের গল্প বলার যে ঝোঁক ৬০ দশকে শুরু হয়েছিলো তারই কিছুটা বর্ধিত রূপ ছিলো *অবুঝ মন*। তারা এর মধ্যে দিয়ে সমাজ বাস্তবতাকে পুনরাবিষ্কারের একটা প্রয়াস নেন।

আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রাবল্যের ভিত্তিতে পাওয়া নমুনায়িত দ্বিতীয় চলচ্চিত্র *দোস্ত দুশমন* (১৯৭৭)। ভারতীয় জনপ্রিয় চলচ্চিত্র *শোলে*-এর নকল *দোস্ত দুশমন* যখন মুক্তি পায় তখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক অস্থির সময় বিরাজ করছে। সেই রাজনীতিতে হিংসা, ডাকাতি, গুজব আর উত্তেজনা এক মৌল উপাদান হিসেবে হাজির ছিলো। দেশের রাজনীতিতে কাণ্ডারি হিসেবে তখন ঠিক কাউকে পাওয়া যাচ্ছিলো না।

দোস্ত দুশমন-এর কাহিনি হলো এরকম—বিজয়নগর গ্রামে শোষণ ও অত্যাচার চালায় ভয়ঙ্কর ডাকাত সর্দার গাফফার ও তার দল। ইন্সপেক্টর জাফর নামে এক সৎ পুলিশ কর্মকর্তা গাফফারকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠান। কিন্তু গাফফার কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে ইন্সপেক্টর জাফরের পরিবারের ওপর নির্মম প্রতিশোধ নেন—এক পুত্রবধু ছাড়া পরিবারের সবাইকে হত্যা করে এবং জাফরের দুই হাত কেটে নেন। এ ঘটনা পর জাফরও চরমভাবে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন। এই প্রতিশোধ অবশ্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দিয়ে নয়; বরং ব্যক্তিগতভাবেই গাফফারকে মোকাবিলা করতে চান তিনি। কিন্তু ইন্সপেক্টরের তো সেই ক্ষমতা নেই, তাই এক অপরাধীকে থামাতে ইন্সপেক্টর জাফর দুই অপরাধী জনি ও রাজাকে ভাড়া করেন।

ছবি : সংগৃহীত

দোস্ত দুশমন-এর টেক্সট বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি উপাদান পাওয়া যায়—জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে পুলিশ; জাতি-রাষ্ট্রের বিপরীতে অবস্থানকারী ডাকাত এবং দুই যুবক যারা ভালো পথের সন্ধান করে কিন্তু পারে না; ধর্মাভাব; নিষ্ক্রিয় জনগণ এবং পুরুষের সহযোগী হিসেবে নারী।

প্রথমত, রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে পুলিশ এই চলচ্চিত্রে কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকলেও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে পারেনি। চলচ্চিত্রজুড়ে পুলিশকে দেখা যায় তিনবার। প্রথমবার জনি ও রাজাকে গ্রেপ্তারের সময়। ফেরার পথে গাফফারের লোকজন পুলিশের ওপর আক্রমণ করলে পুলিশ ব্যর্থ হয় এবং একপর্যায়ে পুলিশকে বাঁচাতে জনি ও রাজাকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হয়। পুলিশের এই ব্যর্থতার বিপরীতে দুইজন অপরাধীর (সেই অর্থে জনি, রাজাকে বড়ো কোনো অন্যায় করতে চলচ্চিত্রে কখনোই দেখা যায়নি) এই নায়কোচিত উপস্থাপন দর্শককে নতুন মাত্রা দেয়। কারণ উত্তর উপনিবেশ সময়ে পুলিশ সেই অর্থে জনগণের বন্ধু হয়ে উঠতে পারেনি। উপনিবেশকালে পুলিশ যেভাবে ঔপনিবেশকারীদের শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখায় ভূমিকা রেখেছে, উত্তর উপনিবেশ নিজেদের শাসনেও তারা সেভাবে জনগণের কাছাকাছি যেতে পারেনি। ফলে পুলিশকে বন্ধু না ভেবে সাধারণ জনগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শত্রুই ভাবে। তারা বিপদে পড়লে পুলিশের কাছে যায় ঠিকই, তবে সেটা নিরুপায় না হলে নয়।

দ্বিতীয়বার, ইন্সপেক্টর জাফর একবার গাফফারকে গ্রেপ্তার করেন। সেখানে গাফফারকে বলতে শোনা যায়, ফিরে এসে তিনি প্রতিশোধ নেবেন। গাফফার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে ঠিকই তার কথা মতো জাফরের ওপর নির্মম প্রতিশোধ নেন। ভয়াবহ এই ঘটনার পর অবশ্য ইন্সপেক্টর জাফরকে আর আইনের পথে হাঁটতে দেখা যায় না। বরং তিনি নিজের পথ নিজেই বেছে নেন। পুলিশের লোক হয়ে পুলিশের প্রতি অনাস্থা চলচ্চিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। তাই জাফর যখন কারাগারের সামনে জনি ও রাজুকে আনতে যান, তখন তাকে অনেকটা ক্রোধ নিয়ে বলতে (১৪ মিনিট ৫২ সেকেন্ড) শোনা যায়, 'আমি এখন ইন্সপেক্টর নই, শুধুই জাফর।' অবশ্য এই কথার উত্তর দেন জনি, 'কেনো, আগুন নিয়ে খেলার শখ মিটে গেলো জাফর সাহেব!'

ফলে পুলিশের এই ব্যর্থতার বিপরীতে দাঁড়ান 'অপরাধী' দুই যুবক। যারা অন্যভাবে দেখলে সাধারণ জনগণেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। তাদের কথাবার্তায় বোঝা যায়, তারা মোটেও ইচ্ছাকৃতভাবে এ পথে থাকতে চান না। ফলে জনি, রাজা এক অর্থে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। এবং তৃতীয়বার পুলিশ আসে চলচ্চিত্রের একেবারে শেষ দৃশ্যে, যখন রাজা চুক্তি মতো গাফফারকে তুলে দেন জাফরের হাতে। গাস্তঁ রোবের্জের ভাষায়, "শেষ দৃশ্যে পর্দায় হিংস্রতার কল্পমূর্তি হঠাৎ যেন দর্শকের উদ্দেশে চালিত হয়, যখন গব্বর সিংয়ের [গাফফার] দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয় তার বুকের সামনে তুলে ধরা ঠাকুর সাবের [জাফর] পা-কে, পুলিশ এসে যেন দর্শককে ওই উদ্যত হিংসা থেকে রক্ষা করে" (রোবের্জ

২০০৫, পৃ.৩৫)। তবে হিংসা থেকে দর্শককে পুলিশ বাঁচালেও জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে পুলিশের ভূমিকা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ইন্সপেক্টর ও জাফরের কথোপকথন থেকে সেটা পরিষ্কার হয়—

> ইন্সপেক্টর : ছেড়ে দিন জাফর সাহেব, অপরাধীকে সাজা দেওয়া আইনের কাজ।
>
> জাফর : আইন গাফফারকে চায় ইন্সপেক্টর, তবে জীবিত নয় মৃত।
>
> ইন্সপেক্টর : সরি জাফর সাহেব, আপনি কী বলতে চাইছেন আমি জানি, তবু এই দুষ্কৃতিকারীকে ধরিয়ে দিয়ে আপনি যে উপকার করেছেন সরকার আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারে না।
>
> জাফর : ইন্সপেক্টর এই ধন্যবাদের পাত্র আমি নই, রাজা ও তার মৃত বন্ধু জনি।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী হলেন ডাকাত গাফফার। একটা বিষয় মনে রাখা জরুরি, গাফফার ও তার সঙ্গীরা কিন্তু হঠাৎ করে মাটি ফুড়ে বেরিয়ে আসেননি। রাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা সন্ত্রাসী সৃষ্টিতে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। যার প্রমাণ চলচ্চিত্রেই আছে—রাজা ও জনি। তারা খারাপ পথ থেকে ফিরে আসতে চাইলেও পারেন না। তেমনই গাফফারও নিশ্চয় জন্মেই ডাকু গাফফার হয়ে উঠেননি। এই রাষ্ট্র, সমাজ এমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যাতে গাফফার ডাকাতের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় রাজা, জনি হয়তো গাফফারের মতো এতো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেননি, তবে সেটাও হতে পারতো।

ফলে উল্টো করে দেখলে গাফফাররা সাধারণ মানুষেরই অংশ, শাসক নয়। রাষ্ট্রের মারপ্যাঁচে সাধারণ মানুষের ওপরই সেই অর্থে শোষণ নিপীড়ন চালাচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাকে প্রতিরোধ করছে যে রাজা, জনি তারাও এই হিসাবের বাইরে নয়। আর পুলিশ এখানে পুরো প্রক্রিয়ার অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। *দোস্ত দুশমন* জুড়ে এই খেলা চলে। ফলে দর্শক নিজেকে এর অংশ মনে করতে দ্বিধা করে না।

চলচ্চিত্রের এক ঘণ্টা ২৩ মিনিটে দেখা যায়, গ্রামের মসজিদের অন্ধ ঈমামের ছেলে ফরিদ বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চাকরির জন্য বাইরে যান। কিন্তু রাস্তায় গাফফারের লোকজন তাকে ধরে নিয়ে হত্যা করে ঘোড়ার পিঠে করে বিজয়নগরে পাঠিয়ে দেন। অন্ধ বাবার একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে এক হৃদয় বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ফরিদের মৃত্যুর জন্য তখন সবাই জাফরকে দোষারোপ করতে থাকেন। এর উত্তরে জাফর বলেন,

> ... তবু এই দুনিয়ায় ইজ্জত নিয়ে বাঁচতে গেলে কিছু কোরবানিও দিতে হয়। ... আমরা চাষা, এই দেশ যুগ যুগ ধরে চাষীদের দেশ। যখনই এদেশে কোনো জালিম হামলা করেছে, তখনই আমরা কাস্তে বের করে তলোয়ার তৈরি করেছি। আমাদের শিরা উপশিরায় কোনো কাপুরুষের রক্ত নেই, আছে বীর তিতুমীর আর ঈশা খার রক্ত। ... একজন বুজদিল, জালিম পাপীর কাছে মাথানত করে থাকা সবচেয়ে বড়ো পরাজয়। যতো দিন বেঁচে থাকবো মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবো।

জাফরের একথায় যে গ্রামবাসী খুব বেশি সন্তুষ্ট হয় এমন নয়। তারা রাজা ও জনিকে গাফফারের কথা মতো তার হাতে তুলে দিতে চান। কিন্তু এই সময় দৃঢ় অবস্থান নেন সদ্য সন্তানহারা ঈমাম। বরং তাকে

দৃঢ়চিত্তে বলতে শোনা যায়, ‘আজ আমি খোদার কাছে ফরিয়াদ করবো আমায় আরো সন্তান দিলে না কেনো?’ ঠিক সেই সময় সময় আবহে আযানের সুর শোনা যায়। ঈমাম সাহেব সন্তানের লাশ রেখে নামাজে যাওয়ার কথা বলেন। ঈমাম ও জাফরের কথায় গ্রামবাসী শান্ত হন। সামনে এক গ্রামবাসীর মৃতদেহ, যিনি কিনা এক জালিমের হাতে নিহত; নিহতের বাবা বলছেন, তার আরো সন্তান দরকার এই যুদ্ধের জন্য; আর সেই সময় আবহে আযানের ধ্বনি—পুরো উপস্থাপনে ধর্মাভাব ও দেশপ্রেম একাকার হয়ে যায়। দর্শক একই সঙ্গে ভাবাবেগে থাকে, আবার দেশপ্রেমে প্রতিজ্ঞ হন।

আগেই বলেছি *দোস্ত দুশমন* এমন এক সময় নির্মিত, যখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভয়াবহ অস্থিরতা চলছে। রাজনৈতিক স্তরে তখন ঠিক যথাযথ কোনো বিরোধী পক্ষ, এমন কী সরকারী পক্ষও ছিলো না। এছাড়া স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কয়েক বছর ডাকাত, ডাকাতি বিষয়গুলোও জনগণের মধ্যে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছিলো। ফলে জনগণের মধ্যে এক ধরনের অসহায়ত্ব, হতাশা ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়। অক্ষম জাফরের সঙ্গে দর্শক নিজেদের মেলাতে চেয়েছেন। “সবচেয়ে বড় কথা, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দুই তরুণ নায়ক দর্শকের মধ্যে বেঁচে থাকার একপ্রকার প্রেরণা যোগায়” (রোবের্জ ২০০৫, পৃ.৩৬)। তাই চলচ্চিত্রের শেষে পর্দাজুড়ে উদ্যত জাফরের পা যেনো দর্শকের স্বপ্নকে উদ্যত করে, পুলিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও আসন্ন হিংসা ও হিংসার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দর্শককে সচেতন করে তোলে।

দোস্ত দুশমন পাশ্চাত্য ঘরানার চলচ্চিত্র। “চিত্র-জাতি হিসেবে ওয়েস্টার্ন সাধারণত নারীবিরোধী এবং তা পুরুষ যৌনশক্তির স্তুতিকারী। পিস্তল হল পুং জননাঙ্গের এক স্থূল প্রতীক। কাউবয় নায়ক তার পৌরুষকে তুলে ধরে বন্দুক তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। অস্ত্রের ব্যাপারে সে লঘুহস্ত ও নিখুঁত লক্ষ্যভেদী” (রোবের্জ ২০০৫, পৃ.৩৫)। কাউবয়ের সেই পৌরুষ রাজা ও জনির মধ্যে দেখা যায়। তাই জনি গুলি ছুঁড়ে গাছ থেকে আম পেড়ে দেখিয়ে দেন তার নিশানা। আর চুমকিকে রাজা বন্দুক চালানো শেখাতে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে চুমকি বুঝতে পারেন বন্দুক নয়, তার শরীর নিয়ে খেলছেন রাজা। আর জাফরের বিধবা পুত্রবধূর সঙ্গে জনির একধরনের বোঝাপড়া তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি সফলতার দিকে যায় না। জনির বীরত্বময় মৃত্যু সেই সম্ভাবনাকে থামিয়ে দেয়। তাই জাফরের বিধবা পূত্রবধুর স্বপ্ন পূরণের ঝুঁকি নেন না নির্মাতা। অন্যদিকে চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে চুমকিকে উদ্দেশ্য করে রাজাকে বলতে শোনা যায়, ‘আজ থেকে টানা (ঘোড়ার গাড়ি) চালাবো আমি। তোর কাজ বাইরে না, ঘরে। তুই আমার বউ।’ এই সংলাপও নতুন কিছু বলে না। ফলে দর্শক স্থিতি অবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। এছাড়া পশ্চিমের সেই কাউবয় ধরনের মারদাঙ্গা নায়কের দেশীয় উপস্থাপনও দর্শককে আনন্দ দেয়। কারণ দর্শকের একাংশ শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ততোদিনে কমবেশি পাশ্চাত্যের এই ধরনের চলচ্চিত্র দেখে অভ্যস্ত।

এছাড়া চলচ্চিত্রজুড়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সঙ্গীতের ব্যবহার দর্শককে আখ্যানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। ১৭ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে রাজা ও জনি বিজয়নগরের উদ্দেশে যাত্রা করে ইন্সপেক্টর জাফরের কথায় গাফফারকে প্রতিরোধ করার জন্য। রাস্তায় যেতে যেতে দুই বন্ধু গান ধরেন, 'দোস্ত আমরা দুজন হবো না দুশমন/ ছিড়বে না এ বাঁধন রবে চিরদিন'।

গাফফারের আস্তানায় আক্রমণের পর খানিকটা স্বস্তির সময় কাটছে জনি ও রাজার। সেই সময় চুমকির ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে যেতে চান রাজা। চুমকি রাজি হন না। এক ঘণ্টা ১১ মিনিটে চুমকির ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে সাইকেলে চলতে চলতে গান ধরেন রাজা—'চুমকি চলেছে একা পথে সঙ্গী হলে দোষ কী তাতে/ রাগ করো না সুন্দরী গো রাগলে তোমায় লাগে আরো ভালো।' চলচ্চিত্রের এক ঘণ্টা ৩৮ মিনিট ১০ সেকেন্ডে রাজা ও চুমকিকে ধরে নিয়ে গেছেন গাফফার তার আস্তানায়। সেখানে চুমকিকে নাচতে বলে গাফফার এবং শর্ত দেয় যতোক্ষণ নাচ চলবে ততোক্ষণ রাজা বেঁচে থাকবে। চুমকি গানের সঙ্গে নাচ ধরে, 'আমার প্রিয়র জন্য আমি সবকিছু পারি/ তোরা যতো দিস যন্ত্রণা/ নেই নেই নেই মানা/ ভালোবেসে পরেছি যে ফাঁসি'। *দোস্ত দুশমন* নিয়ে কথা বলেন রংপুরের 'শাপলা'র প্রবীণ বাদামওয়ালা আ. বারেক। তার ভাষ্যমতে, 'সেসময় যখন *দোস্ত দুশমন* চলছে, তখন লোকে লোকারণ্য। এসব সিনেমার কাহিনি ছিলো একেবারে অন্য রকম। দেখেই ভালো লাগতো। প্লেয়াররা অভিনয়ও করতো সেই রকম। ওই সিনেমার গানও মানুষকে আকর্ষণ করতো, অনেক লোক আসতো কেবল গান শোনার জন্য (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৫)।'

যশোরের 'তসবির মহল'-এর দামোদার সাহার কথায় আরো সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

> সেসময় *দ্য রেইন*, *দোস্ত দুশমন*, *গুণ্ডা*, *তুফান*, *বাহাদুর* এরকম অনেকগুলো সিনেমা হয়েছিলো। এগুলোতে যেমন ফাইটিং ছিলো, তেমনি নাচ-গানও ছিলো। দর্শক এই সিনেমাগুলো সেসময় খুব পছন্দ করে। যেকোনো সিনেমা লাগালেই দারুণ ব্যবসা হতো। আগের দিনের এসব সিনেমা সাদাকালো হলেও তার কাহিনি, গল্প, অভিনয় ভালো ছিলো। স্বাধীনতার আগে পরের সিনেমার মধ্যে কিন্তু খুব বেশি পার্থক্য ছিলো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৩৫)।

তবে *দোস্ত দুশমন*-এর গান নিয়ে নকলের অভিযোগ আছে। অবশ্য *দোস্ত দুশমন*-এর আরো আগে থেকেই চলচ্চিত্রের গানে নকল শুরু হয়। তখন হিন্দি ভাষার গানের সুরের ওপর কেবল কথা বসিয়ে দেওয়া হতো। পরে হিন্দির বাংলা অনুবাদ করে একই সুর জুড়ে দেওয়া শুরু হয়। সঙ্গীত পরিচালকদের কাজ কমে হয় হিন্দি ভাষার গানটি শোনা, আর গীতিকারের কাজ দাঁড়ায় সুরের সঙ্গে তাল রেখে হিন্দির বাংলা প্রতিশব্দ বসানো।

এই দশকের চলচ্চিত্রে ভালো গল্পের সঙ্কট ও নকল কাহিনি নিয়ে (মুৎসুদ্দী ১৯৮৭) (কবির ২০১৮) কথা বলেছেন অনেকে। কিন্তু আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে মনে হয়নি সেসময় গল্পের কোনো সংকট

ছিলো। বরং তারা এই সময়ের বেশিরভাগ চলচ্চিত্রের গল্প নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। এসব বিষয় নিয়ে দীর্ঘ কথা হয় যশোরের 'মণিহার'-এর পাবলিসিটি বিভাগের প্রধান প্রদীপ দাসের সঙ্গে। নীচতলার ক্যান্টিনের পাশে সিড়িঘরে বসে অনেক সময় ধরে তিনি কথা বলেন। যদিও বর্তমানের পরিস্থিতি নিয়ে ৪৫/৫০ বছরের প্রদীপের ক্ষোভ আর হতাশা ছিলো। তার ভাষ্যমতে,

> ৭৪, ৭৫-এ যদি যান; তখন আমি আজিমের *সন্তান* দেখেছি। ওই সিনেমাটা দেখার পর বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের কর্তব্য নিয়ে আমার বিবেক খুব কাঁদছে। এখনো মনে হলে মন কাঁদে। মোস্তফা আর আজিম দুই ভাই, বিশাল বড়ো লোক। নিজের বাসায় মাকে কাজের লোক হিসেবে রেখে, তারা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মোস্তফা সিনেমার মধ্যে ডাক্তার; শেষে আরেক ভাই আজিমের গাড়িতে চাপা পড়ে মায়ের চোখ অন্ধ হয়। তার সেই চোখ অপারেশন করতে গিয়ে ডাক্তার ছেলে মোস্তফা মায়ের সন্ধান পায়। কী ড্রামাটিক গল্প ভাই, এটা না দেখলে আপনাকে বোঝানো যাবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১২)!

কুড়িগ্রামের 'মিতালী'র সাবেক অপারেটর সাইদুল ইসলামও একই ধরনের কথা বলেন। সাইদুল এখন প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে পাশেই চা-পানের দোকান করেন। দীর্ঘ দিন প্রেক্ষাগৃহে চাকরির পর নিরুপায় হয়ে এ পেশা ধরেছেন বলে জানান। তার ভাষ্যমতে—'আগের দিনের সিনেমা ছিলো *অবুঝ মন*, *ডাকু মনসুর*, *বিনি সুতার মালা*, *এপার ওপার*, *জিঘাংসা*, *প্রতিহিংসা*, *ডুমুরের ফুল*, *ভাতদে* ইত্যাদি। এসব সিনেমা সাদাকালো হলেও একটা গল্প ছিলো, দেখে মজা ছিলো। এখন আর সেটা নাই। সেই সময়ে গানের সুর, নাচের একটা আর্ট ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৫)।' যশোরের 'মণিহার' এর ডি সি'র গেইটম্যান শহিদুল ইসলামের সঙ্গে সেখানে বসেই কথা হয় নানা বিষয় নিয়ে। তিনি বলেন,

> আরে সিনেমা হবে পরিষ্কার। আগে যেমন ছিলো। সেটা দেখে মানুষ কাঁদবে, হাসবে। স্বাধীনতার আগে-পরের সিনেমা দেখেন, কী কাহিনি ছিলো; মানুষ কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে বাড়ি চলে গেছে। আবার কেউ হাসতে হাসতে বের হতো। আগের কমেডিও ছিলো মনে রাখার মতো। এখন সব ভূয়া (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪২)।

কেবল চলচ্চিত্রের গল্পই নয়, সেই সময়ের নির্মাতাদের নিয়ে সন্তুষ্টি ছিলেন দর্শক। তার বার বার-ই বর্তমানের নির্মাতাদের সঙ্গে আগের নির্মাতাদের তুলনা করেছেন। সিলেটের 'নন্দিতা'র প্রতিবেশি ও দর্শক নুরুল ইসলাম বলেন, 'আগের ডিরেক্টর যেমন চাষী নজরুল ইসলাম, দেলোয়ার জাহান ঝন্টু এরা মাঠে গিয়ে সিনেমার গল্প তুলে নিয়ে আসতো। একটা সিনেমার কাহিনি লেখার জন্য তারা অনেক সময় নিতো। কখনো বছর পার হয়ে যেতো। আর আজকের ডিরেক্টররা সাত দিনে সিনেমা বানায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৫)।' নেত্রকোণার 'হিরামন' এর কর্মচারী শেখ ফকরুল হাসান দ্বিতীয় তলায় কাজ করেন। চেহারা ও পোশাকে মলিন ভাব নিয়ে বসেছিলেন; বললেন ভালো নেই। নতুন চলচ্চিত্র নেই তাই এ সপ্তাহেই 'হিরামন' সাময়িক বন্ধ হয়ে যাবে। কী করবেন জানেন না। কথায় কথায় ফকরুল বলেন, 'আগে সুভাষ দত্ত, খান আতাউর রহমান, সাইফুল আজম কাশেমের সিনেমায় কাহিনি ছিলো, একটা ভালো গল্প ছিলো। তারা সিনেমাটা বানাতে পারতো, এর জন্য কষ্ট করতো। আর এখন যারা আছে, তারা তো টাকা দিয়ে পরিচালক হয়। তাই সে সিনেমা চলেও না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২৫)।'

স্বাধীনতা উত্তরকালে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আরেকটি ঘটনা হয়—চলচ্চিত্রের কারিগরি মানের অবনতি হয়। এই সময় নতুন যন্ত্রপাতি আমদানিতে প্রচুর বৈদাশিক মুদ্রা ব্যয় করা হলেও তা খুব একটা কাজে আসেনি। আলমগীর কবিরের মতে, "এই অবক্ষয়ের প্রধান কারণ যন্ত্র নয়, বরং বাংলাদেশের চলচ্চিত্রাঙ্গনের একচেটিয়া কর্ণধার চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থায় ব্যাপক অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাপনা এবং ব্যক্তিগত কোন্দল" (কবির ২০১৮, পৃ৯০)। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এই ধরনের পরিস্থিতি শুধু এফ ডি সি'তে নয়, অনেক প্রতিষ্ঠানেই ছিলো। তারপরও নির্মাতা, কলাকুশলীরা এই মাধ্যমটিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন।

৩.৮.১) চলচ্চিত্রের গান

১৯৭০ এ *জীবন থেকে নেয়ার* সঙ্গীত আয়োজন পুরো চলচ্চিত্রটির মুখ্য ধারক হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ চলচ্চিত্রের সঙ্গীত যেমন বলিষ্ঠ, তেমনই চলচ্চিত্রানুগ ছিলো। 'আমার সোনার বাংলা' ও 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গান দুটির অপূর্ব চিত্রায়ণ ও অসাধারণ পরিবেশনা *জীবন থেকে নেয়ার* ব্যঞ্জনা সৃষ্টি সহায়ক ভূমিকা রেখেছে (চৌধূরী ২০১৬, পৃ৩৩)। এ সময়ের চলচ্চিত্রের গান নিয়ে ময়মনসিংহের 'ছায়াবাণী'র সামনের বাদাম-ছোলা বিক্রেতা অলক চন্দ্র দে বলেন,

> আগের সিনেমায় যেমন কাহিনি ছিলো, গানও ছিলো খুব ভালো। কাহিনির সঙ্গে মিল রেখে এসব গান ব্যবহার করা হতো। ফলে কষ্টের জায়গাগুলোতে গান শুনে দর্শক কান্নাকাটি করতো। বিশেষ করে মহিলারা। আর একটা কথা হলো, সিনেমার গান ভালো থাকলে কিন্তু মানুষ সিনেমা দেখে এক ধরনের আরাম পেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১৬)।

বরিশালের 'নন্দিতা'র দর্শক সবজি বিক্রেতা আ. খালেক এসময়ের গান নিয়ে বলেন, 'আগের সিনেমায় কাহিনির সঙ্গে গানের মিল ছিলো। ফলে সেই গান শুনে মানুষ তৃপ্তি পেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১১)।'

এছাড়া ৭০ দশকের চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ব্যবহারের চারটি নিদর্শন আলমগীর কবিরের *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩), *সূর্যকন্যা* (১৯৭৬), *সীমানা পেরিয়ে* (১৯৭৭) ও *রূপালী সৈকতে* (১৯৭৯)। বিশেষ করে *সূর্যকন্যা* ও *সীমানা পেরিয়ে* চলচ্চিত্র দুটির সঙ্গীতই ছিলো প্রধান চরিত্র। দুটো চলচ্চিত্রের চারটি গান পুরো চলচ্চিত্রে অসাধারণ মন্তাজ সৃষ্টি করেছে (চৌধূরী ২০১৬, পৃ৩৩-৩৪)। এই চলচ্চিত্রগুলো ছাড়া ৭০ দশকে আরো কয়েকটি চলচ্চিত্রের গান নিয়ে আলোচনা হয়েছে—*যোগ বিয়োগ* (১৯৭০), *টাকা আনা পাই* (১৯৭০), *রক্তাক্ত বাংলা* (১৯৭২), *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩), *পালঙ্ক* (১৯৭৫), *মেঘের অনেক রং* (১৯৭৬)। গান দিয়ে মন ভুলিয়ে দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে টেনে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রত্যাশা এই দশকের নির্মাতাদের মধ্যে ছিলো। এ প্রসঙ্গে যশোরের প্রদীপ দাস বলেন,

> অলিভিয়া, ওয়াসিম অভিনীত *দ্য রেইন* সিনেমার গান এখনো মনে আছে আমার, 'বন্ধু ঘুমিয়ে আছে দে ছায়া তারে'। এছাড়া *এতটুকু আশা* সিনেমার 'তুমি কী দেখেছো কভু জীবনের পরাজয়' গানটিও অন্যরকম। সেসময় এইসব সিনেমা মানুষ দেখছে কেবল গানের জন্য। আর এখন তো গান শুনলে দর্শক উঠে যায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১২)।

প্রদীপের কথার সমর্থন পাওয়া যায় ময়মনসিংহের 'ছায়াবাণী'র মালিক বদিউল আলম চৌধুরীর কথাতেও। তার মতে, 'আগের সিনেমার একটা মান ছিলো। এই যে *দ্য রেইন* নামে একটা সিনেমা চার–পাঁচটা গান ছিলো, যেগুলো এখনো শুনলে ভালো লাগে। এছাড়া *নিশান* নামে আরেকটি সিনেমা ছিলো। ওই সিনেমাটার গানও ভালো ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৫)।'

প্রদীপ দাস সেই সময়ের চলচ্চিত্রের গান নিয়ে আরো বলেন, "জাফর ইকবালের একটা সিনেমা ছিলো *একমুঠো ভাত*; এই সিনেমার একটা গান হলো, 'নাচ আমার ময়না তুই পয়সা পাবি রে'। এখনো এই গান আমি ভুলতে পারি না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১২)।" নেত্রকোণার 'হিরামন'-এর ব্যবস্থাপক পরিতোষ সাহা আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলেন, 'আগে গান শুরু হলে দর্শক টু শব্দ করতো না। এখনতো গান শুরু হলে তারা প্রস্রাব করতে যায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২৪)।'

৩.৯) বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ

৭০ দশকের যেকেনো আলোচনায় গণআন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের স্পৃহা, নানা পর্যায়ের রক্তপাত-হত্যাকাণ্ড ও সামরিকীকরণকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিতে হয়। কারণ এই সবগুলো পরিস্থিতি নানাভাবে এই দশককে প্রভাবিত করেছে। ফলে ৬০ দশকের জাদু-বাস্তবতা, ফ্যান্টাসি ও মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প নির্মাণের ধারাবাহিকতার সঙ্গে এই দশকে শহুরে মধ্যবিত্ত দর্শক সমাজ বাস্তবতার পুনরাবিষ্কারের দিকে ঝুঁকেছেন। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা ও তার প্রাপ্তি তাদেরকে এ পথেই এগিয়ে নিয়েছে।

চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক জাদুময়তা ৭০ দশকে তুলনামূলক কমতে শুরু করে। কিন্তু টেলিভিশন তখনো সাধারণের নাগালের বাইরে ছিলো বলে তা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। ৬০ দশকে শহুরে মধ্যবিত্ত তাদের জীবনের যে গল্প নির্মাণ করতে চেয়েছেন তা ৭০ দশকেও একটি স্বাধীন দেশে নতুনভাবে নির্মাণ হতে থাকে। সেই নির্মাণে ৬০ দশক থেকে ধার করা ফ্যান্টাসি ছিলো। মধ্যবিত্তের প্রেম, বন্ধুত্ব এখানে ফ্যান্টাসি হয়ে হাজির হয়, যদিও প্রেম সবসময়ই ফ্যান্টাসি হিসেবেই বিবেচিত। দর্শক অন্য ধরনের সেই ফ্যান্টাসির মধ্যে নিজেদের রাখতে চেয়েছেন।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ম্যাগাজিন সব মিলে একটা চলচ্চিত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো। টেলিভিশনে প্রতি মাসে চলচ্চিত্র প্রদর্শন, রেডিও ও সংবাদপত্রে চলচ্চিত্র নিয়ে নিয়মিত প্রচার-প্রচারণা চলছিলো। রেডিওর বদৌলতে সব শ্রেণির দর্শক এবং সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের দর্শকের মনে চলচ্চিত্রের একটা রেশ

সবসময়ই ছিলো। ফলে ৬০-এর দশকে যেখানে তারকা প্রথা প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়েছিলো, ৭০ দশকে তা কিছুটা হলেও সক্রিয় হয়। উদাহরণ হিসেবে নায়ক রাজ্জাকের কথা বলা যেতে পারে। একই সঙ্গে এই দশকে জুটি প্রথাও দর্শকের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এগুলোর প্রভাবে চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহ বাড়ার সঙ্গে দর্শক সংখ্যাও বেড়েছে। যাদের একটা বড়ো অংশ ছিলো নারী।

৭০ দশকে চলচ্চিত্র নিয়ে দর্শকের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেও প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা তাদের সেই আকাঙ্ক্ষার খুব বেশি কদর করেছেন বলে মনে হয়নি। প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ সংক্রান্ত সরকারি নিয়মনীতি ও প্রাসঙ্গিক সব স্বাস্থ্যবিধি (প্রসাবখানা ও পায়খানার সংখ্যা, আসনবিন্যাস, ফ্যান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সিঁড়ির মাপ) মেনে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের কথা থাকলেও এক্ষেত্রে মালিকরা উদাসীন ছিলেন। যদিও নিরুপায় দর্শক সবকিছু উপেক্ষা করে প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র দেখতে গেছেন, কিন্তু তাদের ওপর এর একটা দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। যা পরবর্তী দশকগুলোতে লক্ষ করা গেছে।

স্বাধীনতার পর চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের প্রথম পদক্ষেপ ছিলো অনুদান প্রথা চালু করা। এরপর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা হিসেবে একে একে আসে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, চলচ্চিত্রকে শিল্প (Industry) হিসেবে ঘোষণা। রাষ্ট্রীয়ভাবে শিল্প ঘোষণার পর ঋণ পাওয়ায় সারা দেশে আরো কিছু প্রেক্ষাগৃহ প্রতিষ্ঠা হয়। এতে দর্শক ও ব্যবসা বেড়েছিলো ঠিকই কিন্তু রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রকল্পে এগুলোর কোনোটাই বেশি সফল হয়েছে বলে মনে হয়নি।

এই দশকে দর্শক সমাজ বাস্তবতার কাছাকাছি গল্প সম্পন্ন চলচ্চিত্রকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। গবেষণা আখ্যান থেকে পাওয়া দর্শক স্মৃতিতে থাকা ৫৪টি চলচ্চিত্রের অর্ধেকের বেশি সামাজিক ও সামাজিক অ্যাকশন ঘরানার। এসব চলচ্চিত্রের বেশিরভাগে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সফলতার আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের গল্প নির্মাণ করতে চেয়েছেন। সেই গল্পে সমাজ বাস্তবতা ছিলো। তারা মূলত *রূপবান*কে পাশ কাটিয়ে বাস্তবতা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু বাস্তবেরও তো সমস্যা রয়েছে। বাস্তবের যে আপেক্ষিকতা সেটাকে হয়তো তারা মাথায় রাখতে পারেননি। ফলে তারা নতুন করে সমাজ বাস্তবতার আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা ফ্যান্টাসি হয়ে ধরা দিয়েছে।

একদিকে জাতীয়তাবাদ, নতুন রাষ্ট্র গড়ার আকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে এর মধ্যে থেকেই চলচ্চিত্র নিয়ে স্বপ্ন দেখা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ, যারা চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক পরিসর নিয়ে ভেবেছেন, তারা চলচ্চিত্রে সমাজ বাস্তবতাটাকে মুখ্য করে তুলতে চেয়েছেন। সেখানে তারা রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রূপক অর্থে (অনেকটা *রূপবান*-এর মতো) গ্রামীণ জীবনকে আঁকার (যেমন, *সূর্য দীঘল বাড়ী*, *গোলাপী এখন ট্রেনে*) চেষ্টা করেন। অন্যদিকে আরেকটি পক্ষ নিজেদের মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প বলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দর্শকের যে নিজের স্বর, যেটা *রূপবান*-এ ছিলো কিংবা পরে কাজী জহিরের *অবুঝ মন* জাতীয় চলচ্চিত্রে ছিলো, সেটাকে তারা শিল্পসম্মত, নান্দনিক নয় বলে গ্রহণ করলেন না। ফলে দুটোর সমন্বয়ে জাতীয় চলচ্চিত্র হয়ে ওঠার যে একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিলো তা এ দশকে শুরু হয়ে খুব বেশি সফলতার দিকে এগোয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়

আশির দশক : বিনোদন বাণিজ্য

৪.১) সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

অস্থির এক পরিস্থিতির মধ্যে ৮০'র দশকে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। অনেকগুলো হত্যা এবং পাল্টা হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন পথচলা শুরু করে। তবে শুরুর অল্প সময়ের মধ্যেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠতে থাকে। ১৯৮৩'র শুরু থেকেই সামরিক শাসন বিরোধী নানা কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৮৫ সালে সাংস্কৃতিক কর্মীরা নিজেদের আন্দোলন বিস্তৃত করার জন্য গঠন করেন 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট'। এই জোটে রেডিও, টেলিভিশন ও মঞ্চের নাট্যশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, কবি-সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, আবৃত্তিকার ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মীরা ছিলেন। সর্বমোট ১১৪টি সংগঠন এই জোটের অন্তর্ভূক্ত হয়, যার আহ্বায়ক হন কবি ও সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেসব সরকারি বিধিনিষেধ রয়েছে, সেসব উঠিয়ে নেওয়ার দাবির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জোট দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জোর দাবি জানায়। এই সংগঠনটি সেসময় দেশব্যাপী বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তবে এর উল্টো ঘটনাও ছিলো সাংস্কৃতিক কর্মীদের অনেকেই সেসময় সামরিক শাসনের তাবেদারিও করেছে।

এ সময় রেডিও, টেলিভিশন পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। যদিও স্বাধীনের পর সব সরকারি-ই রেডিও, টেলিভিশন নিয়ে তাই করেছে। তারপরও এই সময়ে টেলিভিশন পুরোপুরিভাবে সরকারি বাক্সে পরিণত হয়। এছাড়া এই দশকেই সরকার টেলিভিশন সম্প্রচারকে রঙিন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিটিভির দর্শকের জন্য বিভিন্ন ইঙ্গ-মার্কিন সিরিজ আমদানি করে তা সম্প্রচারের মাধ্যমে দর্শকের রুচি উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টা চলে। চলচ্চিত্রের বাইরে এসময় রঙিন টেলিভিশন ও ভিসিআর অন্যতম বিনোদন মাধ্যম হয়ে ওঠে। এর প্রভাব কিছুটা হলেও তৎকালীন চলচ্চিত্রের ব্যবসায় পড়েছিলো।

১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে 'বাংলাদেশ টেলিভিশন' রজত জয়ন্তী উৎসব করে। দীর্ঘ এই সময়ে 'বিটিভি'র লোকবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতিও বাড়লে; 'বিটিভি'র অনুষ্ঠানের মান সেই অর্থে খুব বেশি বাড়েনি তা বোঝা যায়। তবে এই বছরে 'বিটিভি' নতুন ধরনের একটি পদক্ষেপ নেয়—চলচ্চিত্র প্রযোজনা। হুমায়ূন আহমেদের 'শংখনীল কারাগার' উপন্যাস থেকে ডি এফ পি ও 'বিটিভি'র প্রযোজনায় একই নামে

চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন মুস্তাফিজুর রহমান। এই প্রযোজনার মধ্য দিয়ে 'বিটিভি'র নতুন ধরনের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। যদিও পরবর্তী সময়ে এর ধারাবাহিকতা থাকেনি।

৮০'র দশকজুড়েই রাষ্ট্রকে ইসলামিকরণের একটা প্রক্রিয়া ছিলো। প্রথমে শুক্রবারে ছুটি ঘোষণা এবং পরে ১৯৮৮'র ৭ জুন অষ্টম সংশোধনী বিল পাস করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতায় থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে শাসকগোষ্ঠী ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে অন্যান্য ধর্মের জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করেছিলো বলে মনে হয় (বিশ্বাস ২০০১, পৃ২৯)। দেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মীয় সংবেদনশীলতা ক্রীয়াশীল থাকায় এই রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রে সফলও হন (ইসলাম ২০০৮, পৃ৬৭)। অবশ্য সেসময় এ নিয়ে সেই অর্থে তেমন কোনো জোরালো প্রতিবাদও হয়নি।

এই দশকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা বড়ো ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। গ্রাম থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ শহরাঞ্চলে আসতে থাকে। গ্রামীণ অর্থনীতির দুর্বলতাই মূলত বিশাল অংকের এই মানুষকে শহরমুখী করেছিলো। তবে শহরে বিশেষ করে ঢাকায় এ সময় ব্যাপকভাবে গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে। সরাসরি গ্রাম থেকে আসা ওই মানুষের একটা অংশ এই শিল্পের শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করে। বিশাল অংকের এই শ্রমিকের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম ছিলো মূলত চলচ্চিত্র। এরফলে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে প্রেক্ষাগৃহের ব্যবসা কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের প্রত্যেকটি সরকারের সময়ই কিছু মানুষ অঢেল টাকার মালিক হয়েছেন। স্বাধীনতার আগে পূর্ব বাংলায় যেখানে এক-দুইজন কোটিপতি ছিলেন, স্বাধীনতা উত্তর সময়ে এ সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। আহমদ ছফার ভাষায়, "শেখ মুজিবুর রহমানের রাজত্বকালে এই কোটিপতিদের জন্ম। জিয়াউর রহমান তাঁদের লালন করেছেন এবং বাড়িয়ে তুলেছেন। এরশাদ সমাজজীবনে তাঁদের আইনগত বৈধতা দিয়েছেন। ... আমাদের দেশে যে সকল মানুষ হঠাৎ ধনী হয়ে উঠেছে জাতীয় বুর্জোয়াদের অঙ্গীকার তাঁদের কাছ থেকে আশা করা দূরাশার শামিল। মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলাই তাদের একমাত্র অভীষ্ট" (ছফা ২০০৮, পৃ২১)। ৮০'র দশকে এই ধরনের টাকার মালিকদের অনেকে চলচ্চিত্র ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। এই বিনিয়োগের প্রভাব ৮০'র দশকের চলচ্চিত্র ব্যবসার ওপর পড়েছিলো।

এছাড়া ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে সরকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রমোদ কর আদায়ের নতুন পদ্ধতি চালু করে যা 'ক্যাপাসিটি ট্যাক্স' নামে পরিচিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৯৮৩ সালের জুনে The duty on Capacity (Cinema House) Rules, 1983 নামে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রেক্ষাগৃহের আসন সংখ্যা, শ্রেণিবিন্যাস, বাৎসরিক প্রদর্শনী সংখ্যা ও এলাকার গুরুত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন শুল্ক হার নির্ধারণ করা হবে বলে জানানো হয়। প্রমোদ কর আদায়ের নতুন এ পদ্ধতিতে চলচ্চিত্রশিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। প্রদর্শকদের আয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ট্যাক্স নির্ধারিত হওয়ায় বর্ধিত আয় থেকে প্রেক্ষাগৃহ মালিককে কোনো কর দিতে হতো না। এই সময়ে দেশে প্রেক্ষাগৃহ ও চলচ্চিত্র নির্মাণ বেড়ে যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম সামরিক শাসনামলে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক অবস্থার যে পশ্চাদগামীতার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা গিয়েছিলো দ্বিতীয়বার তা আরো বিস্তৃততর অবয়ব লাভ করে। এরশাদের শাসনাধীন রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসনে সুপরিকল্পিতভাবে যে সামরিকায়ন করা হয়েছিলো তা সার্বিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৪.২) একনজরে ৮০'র দশকের চলচ্চিত্র

এই দশকে মুক্তি পাওয়া চলচ্চিত্রের সংখ্যা কমপক্ষে ৫৬৩টি (কাদের ১৯৯৩ ও আলম ২০১১)। সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র নির্মাণ হয় ১৯৮৯ সালে ৭৮টি; সবচেয়ে কম ৩৯টি হয়েছে ১৯৮১ সালে। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয়, এই দশকে চলচ্চিত্র নির্মাণের মাত্রা বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮০'র দশকের প্রথম ভাগেই এফ কবীর চৌধুরীর *সওদাগর* (১৯৮২) ব্যাপক ব্যবসা করে। এরপর যে চলচ্চিত্রটি রেকর্ড সংখ্যক ব্যবসা করে তা হলো মমতাজ আলীর *নসীব* (১৯৮৪)। অ্যাকশনধর্মী এ চলচ্চিত্রটির গানও খুব জনপ্রিয় হয়। একই বছরে এফ কবীর চৌধুরীর লোককাহিনিভিত্তিক *পদ্মাবতী* (১৯৮৪) ও সফদার আলী ভূইয়ার *রসের বাইদানী* (১৯৮৪) সুপার হিট ব্যবসা করে। *রসের বাইদানী* গ্রামের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে খুব জনপ্রিয়তা পায় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৬৯)। এই চলচ্চিত্রটির ব্যাপক সাফল্য ঢাকাই ইন্ডাস্ট্রিতে পুনরায় লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রের নির্মাণের প্রবণতা বাড়তে থাকে।

ছবি : সংগৃহীত

১৯৮৫ সালে মুক্তি পায় গাজী মাজহারুল আনোয়ারের *চোর* (১৯৮৫) ও দিলীপ বিশ্বাসের *অস্বীকার* (১৯৮৫)। সমকালিন পত্রিকা 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই চলচ্চিত্রটি দুটি সেসময় কমপক্ষে দেড় কোটি টাকা ব্যবসা করে (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৬৯)। তবে এই দশকে সবচেয়ে ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রের নাম তোজাম্মেল হক বকুলের *বেদের মেয়ে জোস্না* (১৯৮৯)। এটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণ ব্যবসা করে। ঢাকার চলচ্চিত্রের ৩২ বছরের ইতিহাসে এটি একমাত্র চলচ্চিত্র যা এক কোটি টাকার সীমিত বাজার থেকে আয় করে প্রায় ১৫ কোটি টাকা (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৬৯)।

এই দশকে মুক্তি পাওয়া অন্যান্য ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রের (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৭০–৩৭১) মধ্যে রয়েছে—এফ কবীর চৌধুরীর *আলিফ লায়লা* (১৯৮০), শামসুদ্দিন টগরের *হুর-এ আরব* (১৯৮০), মমতাজ আলীর *কুদরত* (১৯৮১), আজিজুর রহমান বুলির *লাভ ইন সিঙ্গাপুর* (১৯৮২), সুভাষ দত্তের *নাজমা* (১৯৮৩), এ জে মিন্টুর *মান সম্মান* (১৯৮৩), ইবনে মিজানের *লাইলী মজনু* (১৯৮৩), অমরিশ ও এহতেশামের *দূরদেশ* (১৯৮৩), আজিজুর রহমানের *রঙিন রূপবান* (১৯৮৫), শক্তি সামন্ত ও সৈয়দ হাসান ইমামের *অবিচার* (১৯৮৫), মমতাজ আলীর *উসিলা* (১৯৮৬), গাজী মাজহারুল আনোয়ারের *সন্ধি* (১৯৮৭), দিলীপ বিশ্বাসের *অপেক্ষা* (১৯৮৭), সুভাষ দত্তের *স্বামী স্ত্রী* (১৯৮৭), শিবলী সাদিকের *ভেজা চোখ* (১৯৮৮), গাজী মাজহারুল আনোয়ারের *স্বাক্ষর* (১৯৮৮), দেলোয়ার জাহান ঝন্টুর *অমর* (১৯৮৮), এ জে মিন্টুর *সত্য মিথ্যা* (১৯৮৯), মতিন রহমানের *রাঙা ভাবী* (১৯৮৯) ও আজিজুর রহমানের *ঘর ভাঙ্গা সংসার* (১৯৮৯)।

এই সময়ের চলচ্চিত্র ব্যবসা নিয়ে সিলেটের 'নন্দিতা'র মোস্তফা চৌধুরী বলেন, '৮০'র দশকের শুরুতে একটু কম হলেও মাঝামাঝি থেকে সিনেমাহলে রমরমা ব্যবসা হয়। *নসীব* সিনেমাটি টানা চার সপ্তাহ এখানে চলে। এ জে মিন্টুর সিনেমা *ন্যায় অন্যায়*, *সত্য মিথ্যা* এগুলোর খুব চাহিদা ছিলো সেসময় (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৩)।' একই ধরনের কথা বলেন কুড়িগ্রামের কিনু বাবু। তার ভাষায়,

> এই সময় নায়ক উজ্জ্বল, পরিচালক দিলীপ বিশ্বাসের সব সিনেমা জমজমাট ব্যবসা করেছে। *নসীব*, *নালিশ*, *নিয়ত*, *আসামী*, *বেদের মেয়ে জোস্না*, *বাদশা ভাই*, *পিতামাতা সন্তান* ইত্যাদি সিনেমা এক–দেড় মাস করে সিনেমাহলে চলেছে। তারপরও সিনেমাহলে লোকে লোকারণ্য। দল বেধে মহিলারা আসতো এসব সিনেমা দেখার জন্য (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৭)।

৮০'র দশকের ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রের তালিকা দেখলে বোঝা যায়, **একই সঙ্গে সামাজিক, লোককাহিনি ও পোশাকি-ফ্যান্টাসি ধারার চলচ্চিত্র ব্যবসা করেছে**। তবে এসব চলচ্চিত্রের বাইরে ৮০'র দশকের মাঝামাঝিতে ১৯৮৪–১৯৮৫ সালের দিকে বিকল্পধারায় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং প্রদর্শন

আন্দোলনের সূচনা হয়। মধ্য ৮০ তে *আগামী* (১৯৮৪), *হুলিয়া* (১৯৮৫) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে নতুন ধারার এই চলচ্চিত্র আন্দোলন শুরু হয় তা 'বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র' নামে পরিচিত। "বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র একসময় একইসঙ্গে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ১৬ মিমি ফরম্যাটের চলচ্চিত্র, ফিল্ম সোসাইটি চলচ্চিত্র, সিনেমা হলের বাইরে পাবলিক লাইব্রেরির মিলনায়তনে প্রদর্শিত চলচ্চিত্র ইত্যাদির সমার্থক ছিলো" (হক ২০০৬, পৃ৪০)। এই চলচ্চিত্র আন্দোলন পরের দশকগুলোতেও অব্যাহত ছিলো। এফ ডি সি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের বাইরে গিয়ে তারা মূলত চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

দুই-একটি ক্ষেত্র ছাড়া ৮০'র দশকের চলচ্চিত্রের ধরনে ৭০ দশকের প্রভাব চোখে পড়ার মতো। চলচ্চিত্র গবেষক আহমেদ আমিনুল ইসলামের ভাষায়, "স্বাধীন বাংলাদেশে সত্তর দশকের (১৯৭২-১৯৭৯) আট বছরে দেশীয় চলচ্চিত্রে যে প্রবণতাসমূহ বিরাজিত ছিলো ১৯৮০ দশকের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ব্যতিরেকে তাঁর অপরাপর সকল বিষয়ের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ বিগত দশকের মতো অ্যাকশন, ফ্যান্টাসি, পোশাকি, স্বকোপলকল্পিত কাহিনীনির্ভর চলচ্চিত্র ১৯৮০ দশকেও বিস্তর পরিমাণ নির্মিত হয়" (ইসলাম ২০০৮, পৃ ২১৫-২১৬)। তবে আমিনুলের এই বক্তব্য পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। কারণ সদ্য স্বাধীন একটি দেশে নানা সংঘাত-রক্তপাত-হানাহানির মধ্যেও জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রের সমর্থনেই ছিলো। কিন্তু প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েই নানা কারণে এর যবনিকাপাত হয় (বিস্তারিত দেখতে পারেন তৃতীয় অধ্যায় ৩.৯)। ফলে ৮০'র দশকের 'চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ব্যতিরেকে তাঁর অপরাপর সকল বিষয়ের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়' এতো সাদামাট চিন্তা এই দশকের সার্বিক পরিস্থিতি বুঝতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

তবে ৭০ দশকের ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু ধারার চলচ্চিত্রের বাইরে এ দশকে নতুন ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। শুরুতেই যে ধারাটির কথা বলতে হয়—শিশুতোষ চলচ্চিত্র। এই দশকে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের একটা প্রাধান্য চোখে পড়ে। যদিও এর শুরুটা স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে। ১৯৬৬-এর ছয় দফার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে শিশুদের নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন তৎকালের মাসিক 'সিনেমা' পত্রিকার সম্পাদক ফজলুল হক। স্ত্রী লেখক রাবেয়া খাতুনের কাহিনি অবলম্বনে তিনি *প্রেসিডেন্ট* (১৯৬৬) নামে একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ১৩৩)। চলচ্চিত্রটি সেন্সরবোর্ডে জমা পড়লে তারা এর নাম নিয়ে আপত্তি জানায়। পরে *প্রেসিডেন্ট* মুক্তি পায় *সান অব পাকিস্তান* (১৯৬৬) নামে।

স্বাধীন বাংলাদেশে সরকারি উদ্যোগে শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন সৈয়দ সালাহউদ্দীন জাকী। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের (ডি এফ পি) প্রয়োজনায় এর নাম ছিলো *অংকুর* (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ১৩৪)। এরপর ১৯৭৮ সালে সুভাষ দত্ত *ডুমুরের ফুল* নামে একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তবে ৮০'র

দশকের শুরুতে দুটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়—বাদল রহমানের *এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী* (১৯৮০) ও আজিজুর রহমানের *ছুটির ঘণ্টা* (১৯৮০)। সরকারি অনুদানে নির্মিত *এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী*র কাহিনি গড়ে উঠেছে জার্মান লেখক এরিখ কাস্টনার এর বিখ্যাত 'এমিল অ্যান্ড দ্য ডিটেকটিভ' গল্প অবলম্বনে। চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, "... এ ছবিতে ছোটোদের জন্য এ্যাডভেঞ্চার, সংগীত, গল্প অভিনয় সব কিছু ছিল, সে জন্য প্রতিটি শিশু কিশোর এ ছবিকে তাদের আপন ছবি হিসেবে ভাবতে পেরেছে" (কাদের ১৯৯৩, পৃ২৭৬)।

এছাড়া বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ৭০ দশকের শেষ ভাগে এবং ৮০'র দশকের শুরুতে বেশ কিছু শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তাদের প্রযোজনায় ১০টি চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। ১৯৮৩ সালে কামাল আমমেদ *লালু ভুলু* ও সি বি জামান *পুরস্কার* নামে দুটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এই দশকে যে পরিমাণ শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে, তা আগে পরে আর কখনো হয়নি।

১৯৮৫ সালে মতিন রহমান *রাধাকৃষ্ণ* ও মহম্মদ হান্নান *রাই বিনোদিনী* নামে দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। "হিন্দু লোকপুরাণের কাহিনীভিত্তিক এই চলচ্চিত্র দুটি স্বাধীন বাংলাদেশে লোকপুরাণাশ্রয়ী ধারার পুনরুজ্জীবন ঘটায়" (ইসলাম ২০০৮, পৃ২২১)। স্বাধীনতার পূর্বে জহির রায়হান নির্মাণ করেন এই ধারার *বেহুলা* (১৯৬৬)। কথা বলতে বলতে চলচ্চিত্রের এই ধারাটির কথা মনে করিয়ে দেন যশোরের 'তসবির মহল'-এর সামনের চা দোকানি বকুল কুমার বোস। তার ভাষ্যমতে, 'সেসময় হিন্দুদের কাহিনি নিয়েও কিছু সিনেমা হতো। হিন্দুদের সিনেমাগুলো মুসলমানরাও খুব পছন্দ করতো। অবশ্য তখন এইসব সিনেমা হিন্দু কি মুসলমানের তা নিয়ে খুব বেশি কথাও হতো না। পরে আর এই ধরনের সিনেমা হয় নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৩৬)।'

এই দশকে বেশ কয়েকটি সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে দেখা যায়। ১৯৮২ সালে চাষী নজরুল ইসলাম নির্মাণ করেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে একই নামে *দেবদাস* (১৯৮২)। বুলবুল আহমেদ অভিনীত চলচ্চিত্রটি ব্যবসা সফল হয়। এছাড়া শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' অবলম্বনে শহীদুল আমীন *রামের সুমতি* (১৯৮৫), 'বৈকুণ্ঠের উইল' রূপান্তরের মাধ্যমে নায়ক রাজ্জাক *সৎ ভাই* (১৯৮৫), 'শুভদা' থেকে চাষী নজরুল ইসলাম *শুভদা* (১৯৮৬), 'পরিণীতা' অবলম্বনে আলমগীর কবির *পরিণীতা* (১৯৮৬) এবং তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'চাঁপাডাঙ্গার বউ' অবলম্বনে নায়ক রাজ্জাক *চাঁপাডাঙ্গার বউ* (১৯৮৬) নির্মাণ করেন। "এই দশকে মৌলিক কাহিনীনির্ভর ছবির ক্ষেত্রে একমাত্র নতুনত্ব ছিল শরৎচন্দ্রের কাহিনীনির্ভর ছবি নির্মাণের প্রবণতা" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৫৭)।

কোলাজ : ৮০'র দশকের সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র ছবি : সংগৃহীত

পরের বছর নায়ক বুলবুল আহমেদ নির্মাতা হিসেবে আবির্ভূত হন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' অবলম্বনে *রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত* (১৯৮৭) নির্মাণের মাধ্যমে। দশকজুড়েই সাহিত্যভিত্তিক এসব চলচ্চিত্র নতুন সম্ভাবনা

নিয়ে হাজির হয়। যদিও এই দশকের প্রাধান্যশীল ধারা পোষাকি-ফ্যান্টাসি, সামাজিক অ্যাকশন, লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রের বিপরীতে এই ধারার অবস্থান ছিলো দুর্বল। এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় ময়মনসিংহের 'পূরবী'র ব্যবস্থাপক কাজী দেলওয়ার হোসেনের কথায়—'সেসময় একদিকে যেমন সামাজিক সিনেমা হয়েছে, অন্যদিকে পোশাকি-ফ্যান্টাসি ও রূপকথাভিত্তিক সিনেমাও হয়েছে। তবে সামাজিক সিনেমাগুলোই সেসময় বেশি ব্যবসা করেছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।' তিনি আরো বলেন,

> সামাজিক সিনেমায় জীবনের গল্প থাকতে হবে। সেই গল্প দেখে দর্শক চোখের জলে বুক ভাসাবে। যে সিনেমা দেখে দর্শক যতো বেশি কাঁদবে, সেই সিনেমা ততো সুপারহিট। এরশাদের আমলে এ ধরনের সিনেমা অনেক হয়েছে। তখন দর্শকের সমস্যা হতো না। এসব সিনেমায় অবশ্য নারীর সেন্টিমেন্ট নিয়ে কাজ করা হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।

যশোরের প্রহ্লাদ দাশ বলেন, '৮০'র দশকের অনেক সিনেমা সামাজিক ছিলো। তখন এতো টিভি, ডিসলাইন, মোবাইলফোন, মেমোরি ছিলো না। ফলে তখন একটা সিনেমা লাগালে দর্শক গ্রাম-গঞ্জ থেকে ভেঙে আসতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫)।'

এছাড়া ১৯৮৬ সালে শহিদুল ইসলাম খোকন নির্মাণ করেন *লড়াকু*। মার্শাল আর্ট নির্ভর *লড়াকু*, ঢাকাই চলচ্চিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। এই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে পথচলা শুরু করেন নায়ক রুবেল। রংপুরের 'শাপলা'র গেইটম্যান সুকুমার চন্দ্র দাশ বলেন,

> রুবেল তখন সিনেমায় যে ফাইটিং নিয়ে আসলো, সেটা দেখে তো ইয়ং ছেলেরা পাগল হয়ে গেলো। সেই মারপিট দেখে সবাই কুংফু-কারাতে শেখা শুরু করলো। রুবেল তখন সেই হিট নায়ক। এর আগে তো দর্শক বাংলাদেশে এই ধরনের সিনেমা দেখে নাই। ফলে এই সিনেমা খুব মার্কেট পেয়ে গেলো। একটা নতুন ধরনের সিনেমা শুরু হলো। পরে তো শহিদুল ইসলাম খোকন আর রুবেল মিলে এই ধরনের অনেকগুলো সিনেমা করছিলো। প্রায় সবগুলো মার্কেট পায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৭)।

এর আগে ৭০-এর দশকে *রংবাজ* (১৯৭৩) এর মাধ্যমে যদিও ঢাকাই চলচ্চিত্রে পদ্ধতিগত মারপিট শুরু হয়। কিন্তু সেই সময়ে হংকং থেকে আমদানি করা মার্শাল আর্ট নির্ভর চলচ্চিত্রের বিপরীতে দেশীয় অভিনয়শিল্পীদের এধরনের মারপিট বেশ জনপ্রিয় হয়। ফলে পরবর্তী সময়ে রুবেল, ওস্তাদ জাহাঙ্গীর আলম, ড্যানিসিডাক, ইলিয়াস কোবরা এদের অভিনীত মার্শাল আর্ট নির্ভর চলচ্চিত্রগুলো একটা নতুন ধারা হিসেবে জাহির হয়।

এই পর্যায়ে গবেষণার অঞ্চলভিত্তিক আখ্যান বিশ্লেষণে ৮০'র দশকের যে ৭৯টি চলচ্চিত্রের নাম এসেছে (সারণী ৪.১.১) তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সারণী ৪.১.১ : ৮০'র দশকের চলচ্চিত্র ও দর্শক স্মৃতিতে তার প্রাবল্য

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
১.	কথা দিলাম	৫	১৯৮০	আকবর কবীর পিন্টু
২.	নাগিন	১	১৯৮০	শেখ নজরুল ইসলাম
৩.	বৌরাণী	৩	১৯৮০	সাইফুল আজম কাশেম
৪.	এতিম	২	১৯৮০	শেখ নজরুল ইসলাম
৫.	কসাই	৩	১৯৮০	আমজাদ হোসেন
৬.	ছুটির ঘণ্টা	১২	১৯৮০	আজিজুর রহমান
৭.	যাদুনগর	১	১৯৮০	মাসুদ পারভেজ
৮.	রাজনন্দিনী	২	১৯৮০	এফ কবীর চৌধুরী
৯.	ভাই ভাই	১	১৯৮০	স্বপন সাহা
১০.	লুটেরা	১	১৯৮০	ফখরুল হাসান বৈরাগী
১১.	গায়ের ছেলে	১	১৯৮০	আকবর কবীর পিন্টু
১২.	আলিফ লায়লা	১	১৯৮০	এফ কবীর চৌধুরী
১৩.	এখনই সময়	১	১৯৮০	আবদুল্লাহ আল মামুন
১৪.	শাহাজাদা গুলবাহার	১	১৯৮০	শহীদুল আমিন
১৫.	ছক্কা পাঞ্জা	১	১৯৮০	নূর হোসেন বলাই
১৬.	আল্লাহ মেহেরবান	১	১৯৮১	মহসিন
১৭.	বিনি সুতার মালা	১	১৯৮১	ফখরুল হাসান বৈরাগী
১৮.	দুই পয়সার আলতা	২	১৯৮২	আমজাদ হোসেন
১৯.	সওদাগর	১	১৯৮২	এফ কবীর চৌধুরী
২০.	সবুজ সাথী	৪	১৯৮২	সুভাষ দত্ত
২১.	আল হেলাল	২	১৯৮২	দেলওয়ার জাহান ঝন্টু
২২.	রাজসিংহাসন	১	১৯৮২	এফ কবীর চৌধুরী
২৩.	তাসের ঘর	২	১৯৮২	মিতা
২৪.	নালিশ	২	১৯৮২	মমতাজ আলী
২৫.	রজনীগন্ধা	১	১৯৮২	কামাল আহমেদ
২৬.	মান সম্মান	১	১৯৮৩	এ জে মিন্টু
২৭.	লাইলী মজনু	২	১৯৮৩	ইবনে মিজান
২৮.	বদনাম	১	১৯৮৩	রাজ্জাক
২৯.	গলি থেকে রাজপথ	১	১৯৮৩	শামসুদ্দীন টগর
৩০.	প্রতিহিংসা	১	১৯৮৩	এ জে মিন্টু
৩১.	জনি	১	১৯৮৩	দেওয়ান নজরুল
৩২.	আবে হায়াত	২	১৯৮৩	এফ কবীর চৌধুরী
৩৩.	হাসু আমার হাসু	১	১৯৮৩	এইচ আকবর
৩৪.	প্রাণসজণী	১	১৯৮৩	জহিরুল হক
৩৫.	লালু ভুলু	১	১৯৮৩	কামাল আহমেদ
৩৬.	ভাত দে	৭	১৯৮৪	আমজাদ হোসেন
৩৭.	**নসীব**	**১৩**	**১৯৮৪**	**মমতাজ আলী**
৩৮.	সকাল সন্ধ্যা	১	১৯৮৪	সুভাষ দত্ত
৩৯.	চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা	৩	১৯৮৪	ইবনে মিজান

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
৪০.	মান অভিমান	১	১৯৮৪	নারায়ণ ঘোষ মিতা
৪১.	নয়নের আলো	১	১৯৮৪	বেলাল আহমেদ
৪২.	রসের বাঈদানী	১	১৯৮৪	সফদর আলী ভূঁইয়া
৪৩.	অবিচার	১	১৯৮৫	শক্তি সামন্ত ও সৈয়দ হাসান ইমাম
৪৪.	রাধাকৃষ্ণ	১	১৯৮৫	মতিন রহমান
৪৫.	ঝিনুক মালা	৩	১৯৮৫	আবদুস সাত্তার খোকন
৪৬.	সোনাবউ	১	১৯৮৫	দিলীপ সোম
৪৭.	দহন	১	১৯৮৫	শেখ নিয়ামত আলী
৪৮.	অন্যায়	১	১৯৮৫	এ জে মিন্টু
৪৯.	রাই বিনোদিনী	১	১৯৮৫	মহম্মদ হাননান
৫০.	চোর	১	১৯৮৫	গাজী মাজহারুল আনোয়ার
৫১.	আক্রোশ	১	১৯৮৬	মোতালেব হোসেন
৫২.	পুষ্পমালা	১	১৯৮৬	মোস্তফা আনোয়ার
৫৩.	লড়াকু	১	১৯৮৬	শহিদুল ইসলাম খোকন
৫৪.	নিষ্পাপ	২	১৯৮৬	আলমগীর
৫৫.	ওগো বিদেশীনি	১	১৯৮৬	আকবর কবীর পিন্টু
৫৬.	উসিলা	১	১৯৮৬	মমতাজ আলী
৫৭.	সারেন্ডার	৩	১৯৮৭	জহিরুল হক
৫৮.	দেশ বিদেশ	১	১৯৮৭	আজিজুর রহমান বুলি
৫৯.	স্বামী স্ত্রী	২	১৯৮৭	সুভাষ দত্ত
৬০.	দায়ী কে	২	১৯৮৭	আফতাব খান টুলু
৬১.	নিয়ত	২	১৯৮৭	মমতাজ আলী
৬২.	লালু মাস্তান	১	১৯৮৭	এ জে মিন্টু
৬৩.	হারানো সুর	২	১৯৮৭	নারায়ণ ঘোষ মিতা
৬৪.	অপেক্ষা	৬	১৯৮৭	দিলীপ বিশ্বাস
৬৫.	বিরাজ বউ	১	১৯৮৮	মহিউদ্দীন ফারুক
৬৬.	তোলপাড়	১	১৯৮৮	কবীর আনোয়ার
৬৭.	আলী বাবা চল্লিশ চোর	১	১৯৮৮	আজিজুর রহমান
৬৮.	দুই জীবন	২	১৯৮৮	আবদুল্লাহ আল মামুন
৬৯.	ভেজা চোখ	৭	১৯৮৮	শিবলি সাদিক
৭০.	নীতিবান	২	১৯৮৮	শিবলী সাদিক
৭১.	বিরোধ	১	১৯৮৮	প্রমোদ চক্রবর্তী
৭২.	বেদের মেয়ে জোস্না	৩২	১৯৮৯	তোজাম্মেল হক বকুল
৭৩.	ভাইজান	১	১৯৮৯	রায়হান মুজিব
৭৪.	কালা খুন	১	১৯৮৯	দারাশিকো
৭৫.	মাস্টার সামুরাই	১	১৯৮৯	আল মাসুদ
৭৬.	সত্য মিথ্যা	৩	১৯৮৯	এ জে মিন্টু
৭৭.	রাঙাভাবী	৩	১৯৮৯	মতিন রহমান
৭৮.	সত্য মিথ্যা	২	১৯৮৯	এ জে মিন্টু
৭৯.	সোনার নাও পবনের বৈঠা	১	১৯৮৯	আলমগীর কুমকুম

সারণী ৪.১.২ : ৮০'র দশকের চলচ্চিত্রের ধরন ও প্রাবল্য

চলচ্চিত্রের ধরন	প্রাবল্য
সামাজিক ধারার চলচ্চিত্র	৩০
লোককাহিনি	৫
পোশাকি-ফ্যান্টাসি	১৯
সাহিত্যনির্ভর	১
প্রেমমুখ্য	৫
অ্যাকশনধর্মী	১৬
শিশুতোষ	৩

আখ্যান থেকে পাওয়া চলচ্চিত্রগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যায়, সামাজিক ঘরানার চলচ্চিত্র দর্শক স্মৃতিতে সবচেয়ে বেশি ছিলো। এই ধরনের চলচ্চিত্রগুলোতে সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বড়োভাই-ভাবীর ত্যাগ কিংবা স্বার্থপরতা, সন্তানের কাছ থেকে বাবা-মায়ের কষ্ট পাওয়া, বন্ধুত্ব ও তাতে ভুল বোঝাবুঝি, পারিবারিক নানা ধরনের সংকট উঠে আসে। সমাজ বাস্তবতার কাছাকাছি যাওয়ার একটা সুযোগ এইসব আখ্যানে থাকে, ফলে দর্শক হয়তো জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে এসব কাহিনি মনে রেখেছে। প্রাবল্যে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা পোশাকি-ফ্যান্টাসি ঘরানাও নানা কারণেই দর্শক স্মৃতিজুড়ে আছে। এসব চলচ্চিত্র সেসময় এতো বেশি প্রভাব ফেলেছিলো যে নির্মাতাদের মধ্যে এফ কবীর চৌধুরী, ইবনে মিজান, সফদর আলী ভূঁইয়ারা নিজ নামে দর্শকের কাছে জনপ্রিয় ও পরিচিত ছিলেন। তাদের নামেও চলচ্চিত্র ব্যবসা করতো।

নওগাঁর পত্নীতলার 'বিনোদন'-এর ব্যবস্থাপক সমীর কুমার মণ্ডল এই চলচ্চিত্রগুলোর নাম দিয়েছিলেন 'ঝুমুর সিনেমা'। তার যুক্তি ছিলো এসব চলচ্চিত্র নাচ-গান-মারামারিতে ভরপুর থাকতো তাই এ নাম। আমি অবশ্য বিষয়টাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম। এক সময় যাত্রাপালার প্রচারে বলা হতো, 'আজ রাতে দেখতে পাবেন আকাশ থেকে নেমে আসা এক ঝাঁক ডানাকাটা পরীর ঝুমুর ঝুমুর নাচ ও গান'। সমীরের কথায় যাত্রার সেই প্রচারের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি হয়তো সেখান থেকেই এটা ধার করেছিলেন। ফ্যান্টাসির সঙ্গে এসব চলচ্চিত্রে আসলেও নাচ-গান ভরপুর থাকতো। এই দশকের অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্রগুলোও দর্শককে বেশ আকর্ষণ করেছিলো বলে মনে হয়েছে। দশকজুড়ে বেশ কয়েকটি সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র হলেও তা দর্শককে হয়তো খুব বেশি ছুঁয়ে যেতে পারেনি।

তবে শিশুতোষ চলচ্চিত্র হিসেবে *ছুটির ঘণ্টা* দীর্ঘ দিন শিশুসহ সব শ্রেণির দর্শকের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিলো। একই প্রেক্ষাগৃহে *ছুটির ঘণ্টা* একাধিকবার মুক্তি পাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। সাদাকালোয় নির্মিত চলচ্চিত্রটি রঙিনের যুগেও সমানতালে জনপ্রিয় ছিলো। সর্বোপরি এই দশকের চলচ্চিত্রগুলোতে একধরনের বিনোদন বাণিজ্যের ঝোঁক ছিলো বলে মনে হয়েছে।

৪.৩) চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর

দুটি সামরিক শাসনকে ধারণ করেছে ৮০'র দশক। সরকারগুলো নিজেদের ধ্যান ধারণা ও মত প্রচারের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরকে নানাভাবে ব্যবহার করেছে। রাষ্ট্রপতির বিদেশ সফর, বিদেশি রাষ্ট্রনায়কদের বাংলাদেশ সফর, নানা ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় দিবসগুলোর উদ্‌যাপন প্রভৃতি বিষয়ের প্রচার-প্রচারণামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হয়েছে সেসময়। এতে একদিকে যেমন সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে, অন্যদিকে মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রেরও নেতিবাচক ব্যবহার হয়েছে। গবেষক আহমেদ আমিনুল ইসলামের (ইসলাম ২০০৮, পৃ৬৮–৬৯) কথাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এছাড়া বণিজ্য প্রাধান্যশীল চলচ্চিত্রগুলোতেও সরকারের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব যে একেবারে ছিলো না তা নয়। ফলে এই দশকে সরকারকে মাথায় রেখেই চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের কাজ করতে হয়েছে।

অন্যদিকে ৮০'র দশকে এফ ডি সি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করে। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে চলচ্চিত্রকে আধুনিকায়নের জন্য উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে পুরো এফ ডি সি'কে ঢেলে সাজানো হয়। এসময় এতো আধুনিক মানের যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছিলো যে, এফ ডি সি'র অনেক প্রকৌশলীই সেসব যন্ত্রপাতি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারতো না (ইসলাম ২০০৮, পৃ৯০)। এছাড়া ১৯৮৩ সালে রঙ্গিন চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য এফ ডি সিতে 'জহির রায়হান কালার ল্যাব' প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই বছরের ১৪ মার্চ ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এফ ডি সি সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধান সামরিক প্রশাসক লে. জেনারেল এরশাদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২৫ বছরে চলচ্চিত্রশিল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ছয়জনকে মরণোত্তর এবং ৩৭ জনকে এফ ডি সির পক্ষ থেকে 'এফ ডি সি রজত জয়ন্তী ট্রফি' দেওয়া হয় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩২৮)।

শুধু এসব করেই এফ ডি সি সেসময় থেমে থাকেনি; ১৯৮৫'র নভেম্বরে চলচ্চিত্রকর্মীদের মান উন্নয়নে স্পেশাল এফেক্টস সিনেমাটোগ্রাফি (অপটিকাল) বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। কোর্সটি পরিচালনা করেন মার্কিন নির্মাতা রিচার্ড ক্যাপলান। জার্মান চলচ্চিত্রনির্মাতা ক্রিস্টব হিউবনারের তত্ত্বাবধায়নে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে।

১৯৮৫ সালে এফ ডি সি আরেকটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ নেয়। এবার নতুন প্রতিভাবান লেখকদের অনুসন্ধানে চিত্রনাট্য আহ্বান করা হয়। এই আয়োজনে ব্যাপক সাড়া পড়ে। পরের বছর '৮৬ তে এফ ডি সির পক্ষ থেকে 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের জন্য উল্লেখযোগ্য এই গ্রন্থটি রচনা করেন চলচ্চিত্র গবেষক ও লেখক অনুপম হায়াৎ।

স্বাধীনতা উত্তরকালে এফ ডি সির অন্যতম প্রশংসনীয় উদ্যোগ হচ্ছে ‘নতুন মুখের সন্ধান’। শিল্পী সঙ্কট নিরসনে ১৯৮৪ সালে এফ ডি সি এই প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পে চূড়ান্তভাবে ২৯ জনকে নির্বাচিত করা হয়। দ্বিতীয়বারে মতো ‘নতুন মুখের সন্ধান’ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ তে।

দেশের চলচ্চিত্র উন্নয়নে এই সময় এফ ডি সি নানা পদক্ষেপ নিলেও তা চরম অব্যবস্থাপনা মধ্য দিয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানটির এক শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্য বিরাজমান দুর্নীতি, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং কিছু নির্মাতার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও অসহযোগিতামূলক মনোভাব এফ ডি সির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৩৮)। এর আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। বিরাট ঋণের ভার লাঘবের জন্য ১৯৮৮ সালে সরকার এফ ডি সির সাত কোটি ২০ লাখ টাকা ঋণকে মূলধনে রূপান্তরিত করে। তার পরও ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৯২ সালের জুন পর্যন্ত সরকারের কাছে এফ ডি সির ঋণের পরিমাণ ছিলো ১৯ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৪১)। ফলে সবমিলিয়ে এফ ডি সি’কে এসময় সমস্যার মধ্য দিয়েও যেতে হয়।

একটি ফিল্ম ইন্সটিটিউট স্থাপনের ব্যাপারে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বিশেষভাবে উৎসাহী ও আগ্রহী ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ১৯৮০ সালে ইন্সটিটিউটের জন্য প্রস্তাবিত স্থান (আগারগাঁওয়ের রেডিও ভবন সংলগ্ন) পরিদর্শন করে মোট ১০ একর জমি বরাদ্দ করেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে এজন্য তিন কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৫১৬)। ১৯৮১ সালের ৯ আগস্ট ইন্সটিটিউট থেকে চালু হয় প্রথম চলচ্চিত্র সমীক্ষা কোর্স। কোর্সের সমন্বয়কারী ছিলেন আলমগীর কবির। প্রথম কোর্সে ৬৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বের হন মাত্র ১৬ জন। অনেকে আগ্রহ নিয়ে এই কোর্সে ভর্তি হলেও তারা শেষপর্যন্ত তা এগিয়ে নিতে পারেননি। এর কারণও ছিলো, চলচ্চিত্রের একাডেমিক শিক্ষা মোটেও খুব সহজ ছিলো না। চলচ্চিত্র শিক্ষা নিয়ে কথা বলেন খুলনার ‘শঙ্খ’-এর চলচ্চিত্র প্রতিনিধি শেখ মোতাহার হোসেন। তার ভাষ্যমতে,

> আমাদের দেশে তো ছোটো থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কেউ সিনেমায় আসে না। সবাই এর ওর কাছ থেকে কোনোমতে শিখেই কাজে লেগে যায়। সেই শেখায় তো সমস্যা আছে। এই শেখা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, অনেকে সিনেমাও বানায়, অভিনয়ও করে; কিন্তু নতুন কিছু দিতে পারে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২)।

১৯৮১-এর আগস্ট থেকে ১৯৮৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ইন্সটিটিউটে মোট চারটি ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স, একটি উচ্চতর ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স ও একটি অ্যানিমেশন ফিল্ম মেকিং কোর্সের আয়োজন করা হয় (হোসেন ও হামিদ ২০১৫, পৃ১৫–১৬)। দেশের প্রবীণ নির্মাতা, চলচ্চিত্র পেশার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, কলাকুলশী ও চলচ্চিত্রের লেখক-সমালোচকদের প্রায় সবাই এই চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণের সঙ্গে উপদেষ্টা, আয়োজক, সাহায্যকারী, শিক্ষক অথবা শিক্ষার্থী হিসেবে যুক্ত ছিলেন। এই প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য তথা বিকল্পধারার চলচ্চিত্র আন্দোলনের জন্ম দেন।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রথমে ‘ফিল্ম ইনস্টিটিউট অ্যান্ড আর্কাইভ’ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হলেও ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটির সুপারিশে (হোসেন ও হামিদ ২০১৫, পৃ১৭) সামরিক ফরমান বলে এ প্রতিষ্ঠান থেকে ‘ফিল্ম ইনস্টিটিউট’ অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়। ফলে দেশে চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণের প্রথম যে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিলো তা বন্ধ হয়ে যায়। মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের ‘রাধানাথ সিনেমা’র ৩৫ মি মি প্রজেক্টর অপারেটর মনির রাগ-ক্ষোভ নিয়ে বলেন,

> বাংলাদেশে কোনো অভিনয় স্কুল, পরিচালক বানানোর স্কুল নাই। তাহলে নায়ক-নায়িকা, পরিচালক তৈরি হবে কোথা থেকে! খালি সুন্দর চেহারা দিয়ে তো অভিনয় হয় না। অভিনয় শিখতে হয়। এটা শেখার তো জায়গা দেশে সেসময় ছিলো না। আর টাকা থাকলেই তো পরিচালক হওয়া যায় না। এজন্য অনেক শিক্ষা লাগে, কিন্তু সেই শিক্ষাটা লোকজন পাবে কই। স্বাধীনের পর থেকে যদি ভারতের মতো এখানে স্কুল হতো তাহলে আজকের এ অবস্থা হতো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭)।

১৯৮৪ সালে সরকার আর্কাইভের সঙ্গে ইন্সটিটিউটের প্রকল্প বাদ দিয়ে ইন্সটিটিউটকে ‘জাতীয় সম্প্রচার একাডেমি’র সঙ্গে একীভূত করে। ‘জাতীয় সম্প্রচার একাডেমি’র সঙ্গে ফিল্ম ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম যুক্ত করে ‘জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট’ (নিমকো) গঠন করা হয়। পরে ১৯৮৭ সালে নতুন করে ফিল্ম ইন্সটিটিউট চালুর জন্য সৈয়দ সালাহউদ্দীন জাকী, আলমগীর কবির, সৈয়দ বজলে হোসেন প্রমুখকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় (হায়াৎ ১৯৮৭, পৃ১৬৫)। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিলো ইন্সটিটিউটের কাঠামো, কার্যক্রম ও পাঠ্যক্রম তৈরি করা। তবে এই কমিটির কাজও খুব বেশি এগোয়নি। সামরিক সরকারের এই সময়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও দিনশেষে তা চলচ্চিত্রের মৌলিক উন্নয়নে খুব বেশি কাজে লেগেছে বলে মনে হয়নি।

৪.৪) চলচ্চিত্রের সমান্তরাল শিল্পকলা ও গণমাধ্যম

চলচ্চিত্রের সমান্তরালে এই দশকে জোরালোভাবে পথচলা শুরু করে টেলিভিশন ও ভিসিআর। তবে চলচ্চিত্রের ওপর এই দুটি মাধ্যমের প্রভাব নিয়ে ভিন্ন মত আছে, কেউ মনে করেন ভিসিআর-এর কারণে চলচ্চিত্রের ক্ষতি হয়েছে; আবার কারো মত এটা কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। টেলিভিশন এই দশকে চলচ্চিত্রের জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়িয়েছে বলেও অনেকের মত। এই সময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে দেখানো বন্ধ থাকলেও ভিসিআর-এর ক্যাসেটে ভারতের হিন্দি ও বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র দেশে এসেছে। এসব চলচ্চিত্র নিয়ে দর্শকের ব্যাপক আগ্রহও ছিলো। এবং ভিসিআর-এর বদৌলতে এসব চলচ্চিত্র দেখাও সহজ হয়ে গিয়েছিলো।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের পাশাপাশি একপর্যায়ে এফ ডি সি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রও ক্যাসেটে পাওয়া শুরু হয়। প্রথম দিকে পাইরেসির মাধ্যমে এসব চলচ্চিত্র ক্যাসেট হয়ে দর্শকের কাছে পৌঁছাতো। পরে বৈধভাবেই তা পাওয়া যেতো। এর প্রভাবও এফ ডি সি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের ওপর ছিলো। আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে এসব বিষয়ে ধারণা পাওয়া গেছে।

৭০-এর দশকের শেষের দিকে দেশে ব্যাপক ভিসিআর আমদানি শুরু হয়। অবশ্য তখনো মধ্যবিত্তের ঘরে ভিসিআর আসেনি। ঘরের বাইরে ব্যবসায়িকভাবে ভিসিআর-এর শো চালানো হতো; অনেক দর্শক একসঙ্গে বসে সেখানে চলচ্চিত্র দেখতেন। সেই সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করেন কুষ্টিয়ার 'বনানী'র ব্যবস্থাপক মোখলেছুর রহমান বকুল। প্রথমে কোনোভাবেই বকুল কথা বলতে রাজি হচ্ছিলেন না। তার ভাষ্য, এসব কথা বলে কী হবে, আগের দিন তো আর ফেরত আসবে না। তারপরও সময় নিয়ে অনেক অনুরোধ করে কথা বলি তার সঙ্গে। বকুল বলেন,

> বাংলাদেশের সিনেমা ধ্বংস হয়েছে সেই ১৯৮৫ সাল থেকে; যখন এই দেশে ভিসিআর আসে। এর জন্য দায়ী ভারত। কারণ সে সময় ভিসিআর এ দেখার জন্য বাংলাদেশের সিনেমা কম পাওয়া গেলেও ভারতীয় সিনেমার অভাব হতো না। ফলে মানুষ সিনেমাহল ছেড়ে ঘরের মধ্যে সিনেমা দেখা শুরু করে। সেই যে শুরু হলো, তার পরিণতি আজকের এ অবস্থা (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫২)।

রংপুরের 'শাপলা'র রফিকুল বারী বলেন, 'প্রথমে সাদাকালো, পরে রঙ্গিন টেলিভিশন আসে ঘরে ঘরে। তারপর ভিসিআর, আরো পরে সিডি, ডিস আসে। মানুষ তখন ঘরে বসে সিনেমা দেখা শুরু করলো। মানুষ কিন্তু এখনও ঘরে বসে সারাদিন সিনেমা দেখে। তাহলে তারা বাইরে সিনেমা দেখতে আসবে কোনো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৪)!' যশোরের মোল্যা ফারুক আহম্মেদ কিছুটা ভিন্ন কথা বলেন,

> আমরা যখন 'মণিহার'-এ ৮০ সালে চাকরি শুরু করি, তখন সিনেমা আর যাত্রা ছাড়া মানুষের বিনোদনের তেমন কোনো জায়গা ছিলো না। পরে ভিসিআর আসতে থাকে। ফলে কিছু দর্শক ভিসিআর এ সিনেমা দেখতো। তবে যেখানেই দেখুক তখনও সাধারণ মানুষের একমাত্র বিনোদনের মাধ্যম ছিলো সিনেমা। কিন্তু সেটা বেশি দিন থাকেনি। এখন তো মানুষের হাতে বিনোদনের অনেক মাধ্যম (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।

১৯৮০ সালে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ভিসিআর-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়। গবেষক মির্জা তারেকুল কাদেরের (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৬৫) ভাষ্যমতে, এসব চলচ্চিত্রের বেশিরভাগই ছিলো ভারতীয় হিন্দি এবং পর্নোগ্রাফি। ১৯৮০ সালের মধ্য ভাগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিপুল সংখ্যক অবৈধ ভিসিআর বৈধ করে নেওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। এই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে নির্ধারিত সময় ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮০-এর মধ্যে মাত্র ২৫ জন তাদের অবৈধ ভিসিআর সেট বৈধ করে নেন (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৬৫)। এর বাইরে সেসময় হাজার হাজার ভিসিআর সেট ছিলো। পরে সরকার এ নিয়ে কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি।

ফলে ঢাকাসহ মফস্বলেও বাণিজ্যিকভাবে ভিসিআর-এর প্রদর্শনী বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে এর পরিমাণ বাড়তে থাকে। যশোরের 'মণিহার'-এর গেইটম্যান নজরুল ইসলাম সোহেল বলেন, 'ভিসিআর আসার পর সিনেমাহলের ব্যবসায় প্রথম সমস্যা দেখা দেয়। আমরা খেয়াল করতে থাকি দর্শক কিছুটা কমছে। সেসময় যশোরেও অনেক জায়গায় রাতে ভিসিআর-এর শো চলতো (আখ্যানর ক্রম ৪.৪.২৬)।' তবে একেবারে উল্টো কথা বলেন কুমিল্লার লাকসামের তোফায়েল হোসেন,

ভিসিআর তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে নাই। গ্রামে যখন ভিসিআর-এ সিনেমা দেখানো হতো, তখনো সিনেমাহলের কোনো সমস্যা হয় নাই। কারণ ভিসিআর-এ সিনেমা দেখে মন ভরতো না। সাধারণ মানুষ হয়তো মাঝে মাঝে ভিসিআর-এ কিছু খারাপ সিনেমা দেখতে যেতো। কিন্তু তারা সিনেমাহলেও আসতো। আর যেকোনো নতুন জিনিস আসলে তার প্রতি তো মানুষের ঝোঁক থাকেই। ভিসিআরও তেমন ছিলো (আখ্যানর ক্রম ৪.২.১৮)।

একই ধরনের কথা বলেন কুমিল্লার লাকসামের 'পলাশ সিনেমা'র ব্যবস্থাপক শামসুল ইসলামও। তার ভাষ্যমতে,

৮০'র দশকে যখন আমি এই সিনেমাহলে চাকরি শুরু করি, তখন মূলত চিত্তবিনোদনের জন্য মানুষের তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। টেলিভিশন থাকলেও তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। ফলে তখনো শতকরা ৩০–৪০ ভাগ মানুষ বিনোদনের জন্য সিনেমাহলের ওপরই নির্ভরশীল ছিলো (আখ্যানর ক্রম ৪.২.১৭)।

১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ দেশে সামরিক শাসন জারি হলে ভিসিআর-এর বাণিজ্যিক প্রদর্শনী সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৬৫)। এ বছরের ২৬ জুলাই সামরিক আইনের ৭ নম্বর ধারায় বলা হয়, ২৪ আগস্টের মধ্যে প্রতিটি অবৈধ ভিসিআর সেট বৈধ করে নেওয়া যাবে (Marlial law Regulation 7, 1982)। ২৪ আগস্ট পর্যন্ত শুল্ক বিভাগ মোট ৫৭৭টি ভিসিআর সেট ও ২১০০ ভিডিও ক্যাসেটের ছাড়পত্র দেয় (*দৈনিক বাংলা* ২৫ আগস্ট ১৯৮২)। ৮২'র মার্চের পর ব্যাপক হারে বাণিজ্যিক প্রদর্শনী বন্ধ হলেও পুরনো ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য কিছু এলাকায় গোপনে ও প্রকাশ্য প্রদর্শনী অব্যাহত থাকে।

এই পরিস্থিতি নিয়ে ১৯৮১ সালে করা আলমগীর কবিরের একটি মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ—

সবচাইতে রক্ষণশীল হিশেব মতেও বেআইনি ভিসিআর **চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসার শতকরা ত্রিশ ভাগ** বা তার বেশি দর্শককে ইতিমধ্যে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ফলে বিনোদন কর বাবদ সরকার ইতিমধ্যে আনুমানিক দশ কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ভিসিআরের দৌরাত্ম এভাবে বাড়তে দেয়া হলে আগামী বছরে পনের থেকে বিশ কোটি টাকা হারাবেন। এই পরিমাণের ক্ষতি সহ্য করার মতো অবস্থা বাংলাদেশের আছে কিনা সরকার নিশ্চয়ই তা ভেবে দেখবেন (কবির ২০১৮, পৃ১৪৬–১৪৭)।

ফলে সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থে মানে ট্যাক্সের জন্য ভিসিআর নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা শুরু করে। ১৯৮২ সালের ২২ ডিসেম্বর ফিল্ম সেন্সরশিপ অ্যাক্ট ১৯৬৩ এবং সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট ১৯১৮ সংশোধন করে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশের অধীনে ভিসিআর-এর মাধ্যমে জনসমক্ষে চলচ্চিত্র প্রদর্শনকে বেআইনি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়।

এছাড়া ক্যাপাসিটি রুল (ভিডিও ক্যাসেট সপস্) ১৯৮৩ এর ৩ নং ধারানুসারে প্রতি বছরের জন্য প্রতিটি ভিডিও দোকানের সর্বনিম্ন কর নির্ধারণ করা হয়। নতুন অধ্যাদেশ জারির ফলে ভিসিআর-এর অবৈধ বাণিজ্যিক প্রদর্শনী অনেকখানি হ্রাস পায়। তারপরও ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে ঢাকায় কমপক্ষে ১০টি বাণিজ্যিক ভিডিও সপ ও ভিডিও লাইব্রেরি ছিলো। ঢাকার পর ভিডিও ব্যবসা আস্তে আস্তে চট্টগ্রামে

বিস্তৃত হয় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৬৬)। ১৯৮৫ সালে সরকার 'ভিডিও ক্যাসেট দোকান আইন ১৯৮৫' জারি করে। এই আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক লাইসেন্স নিয়ে সর্বনিম্ন ২৫০টি ক্যাসেট সংগ্রহ করে দোকান চালু করতে পারবে। এজন্য সর্বনিম্ন সংখ্যক ক্যাসেটের একটি দোকানকে বছরে ২৫ হাজার টাকা কর দিতে হবে। এই আইনের মধ্য দিয়ে দেশে ভিডিও ব্যবসা স্বীকৃতি লাভ করে (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৬৬)। চট্টগ্রামের 'আলমাস'-এর আবদুল আউয়াল বলেন,

> প্রথমে ভিসিআর-এর অনেক টাকা দাম হলেও পরে ক্যাসেট ও ভিসিআর সেট দুটোই সহজলভ্য হয়ে গেলো। যখন ভিসিআর-এর দাম কমে গেলো, ততোদিনে রিকশাওয়ালার বাড়িতে টেলিভিশন ঢুকে গেছে। ওই রিকশাওয়ালা কিন্তু সিনেমার দর্শক ছিলো। টেলিভিশনের দাম চার হাজার আর ভিসিআর সাত হাজার। এই মোট ১১ হাজার টাকা ইনভেস্টমেন্টে তারা ঘরে বসে তখন বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি সব সিনেমা দেখতে পেতো (আখ্যানর ক্রম ৪.২.১)।

খুলনার নাঈম বলেন, 'সিনেমা রিলিজ হওয়ার দুই–তিন মাসের মধ্যে তখন ওই সিনেমা ক্যাসেটে পাওয়া যেতো। তখন এক–দেড়শো টাকা দিয়ে ভিসিআর-টিভি ভাড়া করে লোকজন বাড়ি নিয়ে সিনেমা দেখতো (আখ্যানর ক্রম ৪.৫.২৭)।' বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পাইরেসি হওয়ার ব্যাপারে নাঈম আরো বলেন,

> এই পাইরেসি বন্ধ করতে প্রত্যেক সিনেমার সঙ্গে ঢাকা থেকে তখন একজন করে লোক আসতো। সে অপারেটর রুমে বসে থাকতো। তারপর আইন-টাইনও হলো। দোকানে রেইড দিয়ে সব ক্যাসেট পুলিশ নিয়ে যেতো। এভাবে চললো কিছু দিন। তবে এটা ঠিক ভিসিআর-এ মানুষ সিনেমা দেখে আরাম পেতো না—কাঁপাকাপি, ফিতা আটকে যেতো (আখ্যানর ক্রম ৪.৫.২৭)।

এই সময়ের মধ্যবিত্ত দর্শক কীভাবে ভিডিও ও টেলিভিশনে ঝুঁকে পড়লো তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আলমগীর কবির বলেন,

> পঞ্চাশের চলচ্চিত্র দর্শকের একটি বিরাট অংশ ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। ষাটের দশকে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত দর্শককে মেসমেরাইজ করে তাড়াতাড়ি লগ্নি টাকার পাঁচ-সাত গুণ মুনাফার লোভে স্থানীয় চিত্রশিল্পে আমদানি করা হল এমনই সস্তা মালের (এছাড়া সঠিক পরিভাষা এই মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছি না), যা মধ্যবিত্ত দর্শককে সিনেমা হল থেকে তাড়িয়ে টেলিভিশনে পাঠিয়ে দিল। এই শ্রেণির দর্শক যাতে ভুলেও না আসে, সেজন্য প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশও করা হল দুর্বিসহ। টিকেটের কালোবাজারি, নোংরা পরিবেশ, ছেড়া কার্পেট, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলে টিকেটে অতিরিক্ত মাশুল নিয়েও শো চলাকালে এয়ারকন্ডিশন প্ল্যান্টটির সুইচ অফ করে দেয়া, দুর্গন্ধময় টয়লেট ইত্যাদি ইত্যাদি মারফত এই এককালের নিয়মিত দর্শকশ্রেণিকে নিশ্চিতভাবে তাড়িয়ে দেয়া হল (কবির ২০১৮, পৃ১৪৭)।

কবিরের এই যুক্তি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ৫০ ও ৬০-এর দশকে দর্শকের কাছে মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের মূল্যায়নের সুযোগই কম ছিলো। কারণ চলচ্চিত্রের যে প্রাযুক্তিক জাদু-বাস্তবতা সেটা

সেসময় সবকিছুকে ছাপিয়ে প্রাধান্য পেয়েছিলো। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তে খুব বেশি তফাৎ ছিলো না। ফলে তারা যেকোনো চলচ্চিত্রই দেখেছে। তবে ৭০ দশকের শেষের দিকে প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। তারপরও পরিবেশের কারণে বিশাল দর্শক প্রেক্ষাগৃহ ছেড়েছে, তাও খুব বেশি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মনে রাখতে হবে এই দশকেই কিন্তু *বেদের মেয়ে জোস্‌না*র মতো সর্বকালের ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র হয়েছে। দর্শক প্রেক্ষাগৃহে গিয়েই এ চলচ্চিত্র দেখেছে। তবে টেলিভিশনের প্রভাব যে একেবারে ছিলো না তা নয়। খুলনার নাঈমের ভাষ্যে তার কিছু ইঙ্গিতও আছে—

> মাঝে শুক্রবার বিকাল তিনটা থেকে সিনেমা দেওয়া শুরু হলো বিটিভিতে। যে শুক্রবার সিনেমা হতো সেদিন আমরা তিনটার সময় সিনেমাহলে এসে দেখতাম—আমার বাবা এই সিনেমাহলে ৪৫ বছর চাকরি করছে—লোকজন নাই। এমনকি সেদিন ছয়টার শোয়েও লোক হতো না। কারণ তিনটার সিনেমাটা টেনে ছয়টার পর নিয়ে যেতো। তখন আমরা এটা নিয়ে খুব টেনশনে পড়ে গেলাম। আমাদের যারা ডিস্ট্রিবিউটর ছিলো, তারাও দেখলো শুক্রবারে বিক্রি কমে গেছে। আর সিনেমার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার আছে, যদি শুক্রবারে ভালো সেল না হয়, তাহলে সেটা আর কাভার করা যায় না। যে শুক্রবারে সিনেমা হতো আমরা একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকতাম (আখ্যানর ক্রম ৪.৫.২৭)।

১৯৮৭ সালে সরকার চলচ্চিত্রের পাশাপাশি ভিডিও ক্যাসেটের সেন্সরশিপের জন্য ১৩ সদস্যের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে (*দৈনিক বাংলাবাজার*, ২৪ আগস্ট ১৯৯২)। কিন্তু সেন্সর বোর্ড এনিয়ে কোনো তৎপরতা দেখায়নি। ফলে দেশের সবগুলো ভিডিও ক্লাবে 'অ্যাডাল্ট' চলচ্চিত্র সাজানো থাকতো। ১৯৮৯ সালের দিকে ঢাকায় বৈধ, অবৈধ ভিডিও ক্লাবের সংখ্যা ছিলো কমপক্ষে ৮০০টি (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৬৭)। এ বছরই প্রথমবারের মতো স্থানীয় চলচ্চিত্রগুলো আইনসম্মতভাবে ভিডিওতে বাজারজাতকরণ শুরু হয়। সবমিলে ভিসিআর-এর বিস্তৃতি ব্যাপকভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। লাকসামের 'পলাশ'-এর ব্যবস্থাপক শামসুল ইসলাম বলেন, '৮৬'র পর থেকে ভিসিআর-এ লোকজন ভারতীয় বাংলা সিনেমা দেখতে থাকে। তখন গ্রামে ২১ ইঞ্চি টেলিভিশনে ভিসিআর দিয়ে রাতভর এসব সিনেমা দেখানো হতো। টিকিট কেটে এসব সিনেমা দেখতে হতো। এতে সরকারের ক্ষতি হয়েছে, কারণ তারা কোনো ট্যাক্স পায়নি (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৭)।'

শহর, গ্রামেগঞ্জে ভিসিআর-এ প্রদর্শনী দেখার মূল্য প্রেক্ষাগৃহের টিকেটের তুলনায় কম ছিলো। ভ্যাপসা গরমে ঘিঞ্জি পরিবেশে ভিসিআর দেখার বাড়তি আকর্ষণের মূল কারণ ছিলো ভারতীয় হিন্দিসহ অন্যান্য দেশের ইংরেজি ও নীল ছবি। 'ব্লু-ফিল্ম' প্রদর্শনীতে দর্শক সমাগম বেশি ছিলো। আর দর্শকের প্রধান অংশ ছিলো যুবক।

এই দশকে আরেকটি ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ, ১৯৮০ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে শতকরা ১০০ ভাগ অনুষ্ঠান রঙ্গিন সম্প্রচার হতে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে টেলিভিশন কেন্দ্র ও রিলে স্টেশন স্থাপনের কারণে দেশে টেলিভিশন সেটের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৮১ সালে পাঁচ হাজার রঙ্গিন টেলিভিশন সেটসহ দেশে টেলিভিশনের মোট সংখ্যা ছিলো এক লাখ পাঁচ হাজার ৫৫২টি (Television Research Study, No 1 1982, p85)। টেলিভিশন সেটের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশ 'বিটিভি'র পরিধি বেড়েছে। ফলে একই সঙ্গে সারাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দর্শক ঘরে বসে টেলিভিশনে চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পেতে থাকে। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত 'বিটিভি' তার সর্বমোট সম্প্রচার ঘণ্টার ২১ শতাংশ চলচ্চিত্র দেখিয়েছে (BTV Profile 1989)।

টেলিভিশন ও ভিসিআর-এর বাইরে ৮০'র দশকে চলচ্চিত্রের সমান্তরালে কাজ করেছে বেশকিছু পত্রপত্রিকা। এই দশকের শুরুতেই ১৯৮১ সালের ২৭ মে প্রকাশ হয় সাপ্তাহিক 'চিত্রবাংলা'। এই সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা 'তারকালোক'। ১৯৮২ সালের ৩ নভেম্বর প্রথমে এটি সাপ্তাহিক 'মহানগরী'র পাক্ষিক ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশ হয়। পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। চলচ্চিত্র বিষয়ক জনপ্রিয় পত্রিকা পাক্ষিক 'আনন্দ বিচিত্রা' প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৮৬ সালের ১৬ মার্চ। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন কবি শামসুর রাহমান। পত্রিকাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো প্রতি সংখ্যায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্প, কলাকুশলী, শিল্পীদের নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন। ১৯৮৫ সালে প্রকাশ হয় পাক্ষিক 'ছায়াছন্দ'। সবমিলিয়ে এই পত্রিকাগুলো দেশে একটা চলচ্চিত্রিক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিলো। বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এসব পত্রিকা নিয়মিত কেনা হতো। অনেকেই এসব পত্রিকায় প্রকাশিত পছন্দের নায়ক-নায়িকাদের আলোকচিত্র কেটে ঘরে লাগিয়ে রাখতো। এই সব ম্যাগাজিন মূলত চলচ্চিত্রের বিনোদন বাণিজ্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলো। কখনো কখনো এসব ম্যাগাজিনের সঙ্গে চলচ্চিত্রে পুঁজি বিনিয়োগকারীদের সরাসরি সম্পর্ক ছিলো। তারা বিশেষ কোনো চলচ্চিত্রের প্রচার-প্রচারণায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় সহায়তা পর্যন্ত করতো। এছাড়া তারকা উৎপাদনেও এদের ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র ব্যবসার সমান্তরালে টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের মতো মাধ্যম থাকে বলেই বিনোদন ব্যবসা অনেকক্ষেত্রেই সফলতা পায়।

এর বাইরে অবশ্য চলচ্চিত্র নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চানির্ভর পত্রিকাও প্রকাশ হয় ৮০'র দশকে। মূলত চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীরাই এ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতো। ঢাকার ঋত্বিক চলচ্চিত্র সংসদ ১৯৮৮ সালে প্রকাশ করে 'মন্তাজ'। 'মন্তাজ' সম্পাদনা করতেন তানভীর মোকাম্মেল, মানজারে হাসীন ও মাহমুদুল হোসেন। চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি ১৯৮৭ সালে প্রকাশ করে 'চলচ্চিত্রম'। এটি সম্পাদনা করেন নির্মাতা

মোরশেদুল ইসলাম। চট্টগ্রামের রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি ১৯৮০ সালে ৬ জুলাই প্রথম প্রকাশ করে 'ইন্টারকাট'। পত্রিকাটি দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্রশিল্প নিয়ে লেখা প্রকাশ করে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকেও এসময় নিয়মিত চলচ্চিত্রবিষয়ক খবর প্রকাশ হতো।

৪.৫) তারকা-কুশীলব

৭০ দশকে নায়ক-নায়িকা হিসেবে অভিনয় করা অনেককেই ৮০'র দশকে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে দেখা গেছে। দর্শক তাদের এই সিদ্ধান্তকে সেসময় ভালোভাবে গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়েছে। কারণ এসব চরিত্রে তাদের অভিনয় বেশ প্রশংসিত হয়। এ ধরনের সিদ্ধান্তে অবশ্য নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয়শিল্পীর খুব বেশি টান পড়েনি। নতুন ছেলেছেয়েরা এসব জায়গা পূরণ করেছে। এই দশকে সেই অর্থে প্রতিষ্ঠিত নায়ক-নায়িকার অভাব ছিলো না বললেই চলে; দর্শকও তাদের পছন্দ মতো নায়ক-নায়িকা বেছে নিয়েছেন। কোনো নায়ক-নায়িকারই একাধিপত্য ছিলো না। এছাড়া চলচ্চিত্রের ধরন অনুযায়ীও দর্শকের নায়ক-নায়িকা পছন্দ ছিলো। যেমন, তারা সামাজিক ধারার চলচ্চিত্রে একজনকে পছন্দ করলে, ফ্যান্টাসি ধারায় আরেকজনকে পছন্দ করতেন।

এছাড়া তখন অনেক নায়কের নামে-ই চলচ্চিত্র ব্যবসা করতো। এমনকি নায়কের বাইরে কোনো কোনো খলনায়কের নামেও চলচ্চিত্র ব্যবসা করেছে। এই দশকেও দর্শক অভিনয়শিল্পীদের শারীরিক সৌন্দর্যের চেয়ে অভিনয় দক্ষতার ওপর জোর দিয়েছেন। আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত থেকে এসব বিষয়ে ধারণা পাওয়া গেছে।

১৯৬০ সালে অভিনয় শুরু করা আজিম ৮০'র দশকে কাজ করেছেন ৪৬টি চলচ্চিত্রে। তবে এক সময়ের জনপ্রিয় এই নায়ককে এসময় দেখা গেছে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে। নায়ক চরিত্রে অভিনয় শুরু করলেও পরে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে অভিনয় করেছেন আনোয়ার হোসেন। ৮০'র দশকজুড়ে তিনি ১৪২টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন (আলম ২০১১, পৃ৫৯–৬৩)। এসব চলচ্চিত্রে তাকে নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গেছে। খলিলও ৮০'র দশকে ৬৫টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন পার্শ্বঅভিনয়শিল্পী হিসেবে। শওকত আকবর শুধু ৮০'র দশকেই অভিনয় করেছেন ১১০টি চলচ্চিত্রে, যার বেশির ভাগই চরিত্রাভিনেতা। ৮০'র দশকে পার্শ্বচরিত্রের অভিনয়শিল্পী হিসেবে কমপক্ষে ১৪৮টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন প্রবীর মিত্র। নায়ক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করলেও পরে তিনি নিজেকে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে নায়ক ও পরে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে অভিনয়ের এই চর্চাটি নিঃসন্দেহে ইন্ডাস্ট্রির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মধ্যে নতুনরা যেমন সুযোগ পায়, পুরনোরা তাদের অভিনয় দক্ষতা প্রকাশের জায়গা পান। একই সঙ্গে নতুনকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার যে চর্চা তাও বহাল থাকে। যশোরের 'মণিহার'-এর বুকিং ক্ল্যার্ক শামীম আনোয়ার এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দরভাবে। তার ভাষ্যমতে,

> আগেরকার নায়কদের একটা সিস্টেম ছিলো। তারা একটু বয়স হলে আর নায়ক থাকতো না। বাবা-মা, ভাই-ভাবী এগুলো হয়ে যেতো। এই যে দেখেন আনোয়ার হোসেন এতো বড়ো অভিনেতা। তিনি তো নায়ক ছিলেন, অনেক সিনেমা করছেন নায়ক হিসেবে। তারপর একটু বয়স হলে আর নায়ক থাকলেন না। তখন বড়োভাই, বাবা, চাচা, বাড়ির চাকর এই ধরনের অভিনয় করা শুরু করলেন। এই প্রাকটিস কিন্তু ভালোই ছিলো। একজন গেলে আরেকজন আসতো। এতে নায়ক-নায়িকার অভাব হয় নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২০)।

আনোয়ারাও খুব বেশি চলচ্চিত্রে নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেননি। তিনিও মূলত পার্শ্বঅভিনয়শিল্পী হিসেবে পরে নিজেকে তুলে ধরেছেন। ৮০'র দশকে তিনি অভিনয় করেছেন মোট ৮৯টি চলচ্চিত্রে। এসব চলচ্চিত্রের বেশিরভাগে আনোয়ারাকে মা, বড়ো বোন ও ভাবীর চরিত্রে দেখা গেছে। আনোয়ারা অভিনয় দিয়ে এসব চরিত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এই অভিনয়শিল্পী চারবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। যশোরের নজরুল ইসলাম সোহেল বলেন, 'এই যে ধরেন সে সময় রোজি আফসারী, আনোয়ারা, সুমিতা দেবী এদের যে অভিনয় ছিলো, তার কোনো তুলনা নাই। এরা যেমন নায়িকা ছিলো, তেমনই আবার মা, ভাবী, চাচীও ছিলো। এদের অভিনয়ও মহিলারা খুব পছন্দ করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২৬)।'

শাবানা '৬২ তে অভিনয় শুরু করে '৭০ ও পুরো ৮০'র দশকে নিজের উপস্থিতির জানান দিয়েছেন। এই দশকে তিনি মোট ১০৫টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। ৮০'র দশকের বেশিরভাগ চলচ্চিত্রে তাকে প্রধান চরিত্রে (Protagonist) দেখা গেছে। অবশ্য এসব চলচ্চিত্রের বেশিরভাগেই তিনি একেবারে অল্প বয়স্ক প্রেমিকার চরিত্রে অভিনয় করেননি। এর পরিবর্তে তাকে দেখা গেছে স্ত্রী, ভাবী, বোন ও মায়ের চরিত্রেও।

এই দশকেও রাজ্জাক-শাবানা এবং আলমগীর-শাবানা জুটির প্রাধান্য ছিলো। এছাড়া জসিম, ওয়াসিম, বুলবুল আহমেদকেও শাবানার সঙ্গে জুটি বাধতে দেখা গেছে। ৭০ দশকের পর থেকেই শাবানা মূলত মমতাময়ী, ত্যাগী বাঙালি নারীর যে অবয়ব তার প্রতীক হিসেবে পর্দায় হাজির হন। নারীদের অধস্তনতা চর্চায় এই চরিত্রগুলো উদাহরণ হিসেবে মানুষের মুখে মুখে ছিলো। বিশেষ করে নারী দর্শক শাবানা অভিনীত এসব চলচ্চিত্র দেখে চোখের জলে কাপড় ভেজাতেন এবং অনেক নারী নিজেকে শাবানার জায়গায় কল্পনা করতেও ভালোবাসতেন। এসব বিষয় নিয়ে কথা হয় ময়মনসিংহের 'ছায়াবাণী'র নারীকর্মী গৌরি চৌহানের সঙ্গে। ৩০ বছর আগে স্বামী মারা যাওয়ার পর গৌরি এখানে যোগ দেন। প্রথমের দিকে তিনি নারীদের জন্য বিশেষ যে শ্রেণিটা ছিলো তার দায়িত্বে ছিলেন। পরে ওই শ্রেণিটি বন্ধ হয়ে গেলে, এখন সব ধরনের কাজই করেন। গৌরি বলেন,

> আগে বেশি সিনেমা চলতো শাবানা, ববিতা, সুচরিতা, সুচন্দা, চম্পার। এদের মধ্যে সিনেমায় সবচেয়ে বেশি কষ্টের অভিনয় করতো শাবানা। শাবানার বেশিরভাগ সিনেমা দেখলে মেয়েরা কান্নাকাটি করতো। সেই অভিনয়গুলো একেবারে বাস্তব ছিলো। শো চলার সময় আমি সাধারণত বাইরে বসে থাকতাম, সেখান থেকে ভিতরে মেয়েদের কান্নার শব্দ শোনা যেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৬)।

এই সময়ের অন্যান্য নায়িকা নিয়ে কথা বলেন ময়মনসিংহের 'পূরবী'র সামনের দোকানি মো. শহীদ—'আগে একেকজন নায়িকার একেকরকম আকর্ষণ ছিলো। এই যে শাবানা, রোজিনা পরে শাবনূর সিনেমা করতো; কেবল তাদের দেখার জন্যই আমরা সিনেমা দেখতে যেতাম (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১৫)।' ময়মনসিংহের 'ছায়াবাণী'র গেইটম্যান ইসমাঈল আলী বলেন, 'আগে নায়িকারা শাড়ি পরতো, তাদের নাভি পর্যন্ত দেখা যেতো না। আগে শাবানা, ববিতা, সুচন্দা নায়িকা ছিলো; তাদের একটা ভদ্রতা বোধ ছিলো। তাই তারা জনপ্রিয় ছিলো। এখন আর সেটা নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৮)।'

৭০ দশকে একা পর্দার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া রাজ্জাক ৮০'র দশকেও দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। এই দশকে তার অভিনীত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ৮১টি। ৮০'র দশকেও রাজ্জাককে সবচেয়ে বেশি জুটি বাধতে দেখা যায় শাবানার সঙ্গে। কুড়িগ্রামের কিনুবাবুর ভাষায়,

> সিনেমার এক অন্যরকম নায়কের নাম রাজ্জাক। আমরা তো এক সময় মনে করতাম রাজ্জাক-শাবানার বোধ হয় বিয়ে হয়েছে। তাদের দুইজনকে যে মানাতো (মিল) সেটা বলার মতো নয়। পুরুষ-মহিলা সবাই সেসময় ওদেরকে খুব পছন্দ করতো। রাজ্জাক-শাবানার সিনেমা আসলেই সেই ভিড় হতো। তবে কবরীর সাথেও রাজ্জাক অনেক সিনেমা করছে। সেগুলো মানুষ দেখছে। করবী তখন দেখতে খুব সুন্দর ছিলো। কেমন একটা মায়া মায়া লাগতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৭)।

৭০ দশকের পোশাকি-ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্রের হিট নায়ক ওয়াসিম ৮০'র দশকেও দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। এই দশকে তিনি ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন ৯১টি। পোশাকি-ফ্যান্টাসির ঘরানার চলচ্চিত্রে এই দশকে একক আধিপত্য নিয়ে ওয়াসিম কাজ করেন। ওয়াসিমের চলচ্চিত্র মানেই মারপিটের বিষয়টি দর্শকের মাথায় ছিলো। অবশ্য ৮০'র দশকের পরে আর খুব বেশি চলচ্চিত্রে ওয়াসিমকে দেখা যায়নি। নায়কের ইমেজ নিয়েই তিনি চলচ্চিত্র থেকে সরে দাঁড়ান। বাংলাদেশে খুব কম অভিনয়শিল্পীর ক্ষেত্রেই এমনটি দেখা যায়। রংপুরের 'শাপলা'র প্রজেক্টর অপারেটর আ. রহমান বলেন,

> তখন নায়ক ওয়াসিমের খুব চাহিদা ছিলো। তার মারপিট দেখার জন্য লোকজন সিনেমা দেখতে আসতো। সে তো ফাইটিং হিরো ছিলো। সেই সময় *ডাকু মনসুর*, *দুই রাজকুমার*, *বাহাদুর*, *শাহাজাদী গুলবাহার*, *রাজনন্দিনী*, *রাজদুলারী*, *ছক্কা পাঞ্জা*, *আল্লাহ মেহেরবান*, *গৃহবধু* সিনেমাগুলো দেখার মতো ছিলো! এগুলো খুব ভালো ব্যবসাও করছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৮)।

নওগাঁর পত্নীতলার 'বিনোদন'-এর ব্যবস্থাপক প্রবীণ সমীর কুমার মণ্ডল বলেন,

> ৮৩, ৮৪, ৮৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে চলতো অঞ্জু-ওয়াসিম, আর পরিচালক ছিলো এফ কবীর চৌধুরী। এফ কবীর চৌধুরী পরিচালিত অঞ্জু-ওয়াসিম থাকলেই কোনো কথা নাই। এসব সিনেমায় আমরা লাখ লাখ টাকা কামাই করছি। মানুষ পাগলের মতো এসব সিনেমা দেখেছে। এখন ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারবো না নায়ক-নায়িকার সঙ্গে কোনো ডিরেক্টরও কতো জনপ্রিয় হতে পারে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)!

নায়ক জাফর ইকবাল তার অভিনয় জীবনের সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন ৮০'র দশকে ৪৩টি চলচ্চিত্রে। ৮০'র দশকে ৯৮টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন আলমগীর। অত্যন্ত শক্তিমান এই অভিনেতা এই দশকে সবচেয়ে বেশি জুটি বাধেন শাবানার সঙ্গে। শাবানার সঙ্গে জুটি করেই মূলত আলমগীরের চলচ্চিত্রে উত্থান। সামাজিক ঘরানার চলচ্চিত্রে এক আলমগীর অনেকখানি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেন।

খলচরিত্র থেকে এসে নায়ক হওয়া জসিমের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সোনালি সময় বলা চলে ৮০'র দশককে। এই দশকে তিনি সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন ৮৯টি। এসব চলচ্চিত্রের বেশিরভাগে জসিমকে একক নায়ক হিসেবে দেখা যায়নি। জসিমের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শ্রীমঙ্গলের 'রাধানাথ সিনেমা'র ৩৫ মি মি প্রজেক্টর অপারেটর মনির বলেন, 'জসিম সাহেব বলতো, সিনেমা নিয়ে যান, না চললে আমি দেখবো। এই কথা এখনকার কোনো নায়ক, প্রযোজক বলতে পারবে! ইলিয়াস কাঞ্চন বলতো, সিনেমা নিয়ে যান, না চললে পয়সা ফেরত দেবো। অথচ এখনকার প্রযোজক, নায়করা কেউ সিনেমাহলের লোকদের কথা ভাবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭)।'

যশোরের 'মণিহার'-এর দর্শক মোশারফ খান বলেন, 'ওই সময় সিনেমার যে প্লেয়াররা ছিলো তারা নাটক, যাত্রা থেকে আসা অভিজ্ঞ। তাদের অভিনয়ের সঙ্গে এখনকার প্লেয়ারদের কোনো মিলই নাই। আগে তো অভিনয় করতে চেহারা লাগে নাই। যার অভিনয় ভালো ছিলো, তার চেহারা ভালো না থাকলেও দর্শক সিনেমা খেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৮)।' তখনকার নায়কদের সংখ্যা নিয়ে খুলনার 'শঙ্খ'-এর বুকিং এজেন্ট আনোয়ার হোসেন বলেন,

> ঢাকার সিনেমায় নায়কের তখন অভাব হয়নি—ইলিয়াস কাঞ্চন, রুবেল, জসীম। কতো ধরনের নায়ক। এক সপ্তাহে চার নায়কের চারটা সিনেমা রিলিজ পাইছে। এই হিরো ভালো লাগতেছে না, তো আরেক হিরো দেখো। কারো ওপর কোনো নির্ভরতা ছিলো না। সবাই ভালো, সবাই হিট (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৪)।

যশোরের শামীম আনোয়ারও একই ধরনের কথা বলেন, "তখন একেক সিনেমার দর্শক ছিলো একেকরকম, কেউ রাজ্জাকের, কেউ ইলিয়াস কাঞ্চনের। সেই সময়ের দর্শক ছিলো নায়ক ও নায়িকা ভিত্তিক। তখন 'মণিহারে' ববিতা, সুচন্দা, চম্পার সিনেমা আসলে হাউসফুল থাকতো, কারণ যশোরের মেয়ে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২০)।"

৮০'র দশকে বিপুল সংখ্যক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন রোজিনা। এই দশকে তার অভিনীত চলচ্চিত্রের সংখ্যা কমপক্ষে ১৪৫টি। এই সময়ের প্রায় সব নায়কের সঙ্গে জুটি বেধে অভিনয় করেছেন তিনি। পোশাকি-ফ্যান্টাসি, লোককাহিনি, সামাজিক ও প্রেমনির্ভর চলচ্চিত্রে সমান তালে রোজিনাকে অভিনয় করতে দেখা যায়। কিন্তু সমস্যা হলো **এই দশকে গড়ে রোজিনাকে প্রতি বছর ১৪টির উপরে চলচ্চিত্রে**

অভিনয় করতে হয়েছে। একজন অভিনয়শিল্পীর জন্য বছরে ১৪টি ভিন্ন চরিত্র ধারণা করা নিঃসন্দেহে কষ্টকর। এই পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে অবশ্যই তার অভিনয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শুধু রোজিনা নয়, এই দশকে অনেক অভিনয়শিল্পীর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে। তারা কাজের মানের দিকে নজর না দিয়ে সংখ্যা বাড়ানোতেই ব্যস্ত ছিলেন। এতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করা রোজিনাকে কিন্তু দর্শক স্মৃতিতে খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাবল্যের বিচারে প্রথম ৫০ জনের তালিকায় তার অবস্থান ৩২ নম্বরে (নির্ঘণ্ট ৩)। গবেষণায় অংশ নেয়া ২৫৮ জনের মধ্যে মাত্র তিনজন তার প্রসঙ্গ এনেছেন।

৭০ দশকের একেবারে শেষ পর্যায়ে অভিনয় শুরু করা ইলিয়াস কাঞ্চন ৮০'র দশকে ৭৪টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। সব ঘরানার চলচ্চিত্রেই এই অভিনয়শিল্পীকে অভিনয় করতে দেখা যায়। দীর্ঘ সময় ধরে ইলিয়াস কাঞ্চন চলচ্চিত্রে নায়কের ইমেজ ধরে রেখেছিলেন। মঞ্চ নাটকের মাধ্যমে অভিনয় জীবন শুরু করা অঞ্জু ঘোষ পরে বাণিজ্যিক নাটক ও যাত্রায় অভিনয় করে চট্টগ্রামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরে ১৯৮২ সালে এফ কবীর তার *সওদাগর*-এ অঞ্জুকে নায়িকা হিসেবে সুযোগ দেন। "আশির দশকের শুরুতে 'সওদাগর' সকলকে চমকে দিয়েছিল। অঞ্জু নির্মাতা ও প্রদর্শকদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন নগদ অর্থ" (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৭০)। এই দশকে তিনি কমপক্ষে ৭৪টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৮৯ সালে অঞ্জু তার জীবনে সবচেয়ে আলোচিত ও ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র তোজাম্মল হক বকুলের *বেদের মেয়ে জোস্‌নায়* অভিনয় করেন। এখানে জোস্‌না চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয় হন। "নায়িকা অঞ্জুর সেক্স আপিল এর সঙ্গে জনপ্রিয় লোককাহিনীর অভূতপূর্ব সম্মিলনই এ ছবিকে ব্যবসা সফল ছবির শীর্ষে পৌঁছে দেয়" (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৭০) বলে গবেষক মির্জা তারেকুল কাদের মনে করেন।

১৯৮১ সালে আবদুস সাত্তার পরিচালিত *রাখে আল্লাহ মারে কে* চলচ্চিত্রে নায়ক হিসেবে রাজীব অভিনয় করলেও পরে তাকে খলঅভিনেতা হিসেবে দেখা যায়। এই দশকে তিনি কমপক্ষে ৬০টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। খলঅভিনেতা হিসেবে রাজীবের জনপ্রিয়তা ছিলো অকল্পনীয়। যশোরের মোশারফ খান বলেন, 'রাজীব নামে যে ভিলেন ছিলো, এর নামের ওপর সিনেমা চলতো। রাজীবের মতো প্লেয়ার বাংলাদেশে আর হবে না। ওর অভিনয়ের কথা মনে উঠলে এখনো আমার শরীর কেঁপে উঠে। এই প্লেয়ার যদি আরো দুই–দশ বছর থাকতো! কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৮)।' কুড়িগ্রামের উপশহর কাঠালির 'স্বর্ণমহল'-এর সাবেক প্রজেক্টর অপারেটর রফিকুল ইসলাম বলেন,

> রাজীব ছিলো জাত অভিনেতা, জাত হারামি। ওই তাকালেই কেমন জানি একটা ব্যাপার হতো। চেহারাটা সুন্দর ছিলো, কিন্তু হারামির অভিনয় করতো। ওকে দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো। তার অভিনয়ের মধ্যে কোনো ফাঁক ছিলো না। ওর চেয়ে ভালো হারামি বাংলাদেশে খুব কম আসছে। কিন্তু লোকটা বেশি দিন বাঁচলো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৩)।

৮০'র দশকের পোশাকি-ফ্যান্টাসি ও সামাজিক অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্রে খলচরিত্রে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় আহমেদ শরিফকে। এই দশকে তার অভিনীত চলচ্চিত্রের সংখ্যা কমপক্ষে ১০১টি। খলঅভিনেতা হিসেবে তারকা হয়ে ওঠা অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম আহমেদ শরিফ। তাকে নিয়ে যশোরের মোশারফ খান বলেন,

> চেহারা থাকলেই অভিনেতা হওয়া যায় না। চেহারা দিয়ে কোনো কাজ হয় না। আহমেদ শরীফের মতো কেউ হারামির অভিনয় কেউ করে দেখাক তো পারে নাকি? রাজীবেরও সে কী অভিনয়! এদের অভিনয়ের ভাবভঙ্গি আলাদা ছিলো। এদের সঙ্গে কখনো কখনো নায়কও পারতো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৮)!

এই দশকে নতুন মুখ হিসেবে অভিনয়ে আসা অন্যান্য অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন—মান্না, চম্পা, হুমায়ুন ফরিদী, দিতি ও রুবেল। ১৯৮৪ সালে এফ ডি সি আয়োজিত 'নতুন মুখের সন্ধানে' প্রতিযোগিতায় মান্না নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮৫ সালে প্রথম কাজী হায়াৎ পরিচালিত *পাগলী* চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। মঞ্চ ও টিভি নাটকের প্রখ্যাত অভিনয়শিল্পী হুমায়ুন ফরিদী প্রথমবারের মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন শেখ নেয়ামত আলীর *দহন* (১৯৮৫)-এ। অবশ্য ৯০-এর দশকে চলচ্চিত্রে তাকে একেবারে ভিন্নভাবে দেখা যায়।

মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রুবেল চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করেন শহিদুল ইসলাম খোকনের *লড়াকু* দিয়ে। এই চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে মার্শাল আর্টনির্ভর নতুন ধারার সৃষ্টি করে।

৪.৬) চলচ্চিত্রের দর্শক, ব্যবসা এবং প্রেক্ষাগৃহ

টেলিভিশন, ভিসিআর ও প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে মালিকদের কিছু উদাসীনতা সত্ত্বেও এই দশকে চলচ্চিত্রের ব্যবসা খুব জমজমাট ছিলো। কোনো কোনো জেলা শহরে চার-পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহ থাকলেও সেখানে দর্শকের খুব বেশি অভাব হতো না। একটি চলচ্চিত্র টানা দুই-তিন সপ্তাহ একই প্রেক্ষাগৃহে ব্যবসা করতো। ব্যবসা ভালো হওয়ায় অনেক প্রেক্ষাগৃহের সামনে টিকেট কালোবাজারি কিছু মানুষের পেশা হয়ে গিয়েছিলো। যদিও এ কারণে দর্শককে টিকেটের জন্য বেশি টাকা গুণতে হতো। প্রচুর নারী দর্শক এই সময় প্রেক্ষাগৃহে এসেছে। তবে বেশিরভাগ নারী একা কখনো চলচ্চিত্র দেখতে আসতেন না। পুরুষ কিংবা দুই-তিন নারী একসঙ্গে মিলে প্রেক্ষাগৃহে যেতেন। এই সময় প্রযোজক-পরিবেশকদের খুব গুরুত্ব ছিলো প্রদর্শকদের কাছে। নতুন চলচ্চিত্রের জন্য প্রদর্শকদের নিয়মিতই তাদের কাছে ধরনা দিতে হতো। অনেক প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ দর্শকের অনুকূলে ছিলো না। প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা উদাসীন ছিলেন এ সমস্যা সমাধানে। আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত থেকে ৮০'র দশকের চলচ্চিত্র ব্যবসা সংক্রান্ত এধরনের তথ্যই পাওয়া যায়।

সিলেটের 'নন্দিতা'য় ঢোকার মুখে প্রেক্ষাগৃহের দোকান ভাড়া নিয়ে ৩৫ বছর ধরে চা-পান-সিগারেটের ব্যবসা করেন আ. রশীদ। চলচ্চিত্র, প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে কথা হয় তার সঙ্গে। রশীদের ভাষ্যমতে,

> এরশাদের আমলে যখন এই সিনেমাহল প্রতিষ্ঠা হয়, তখন একটা সিনেমা আসলে দর্শকের ভিড়ে সামনের এই রাস্তা জ্যাম হয়ে যেতো। সিনেমা শুরু ও শো ভাঙার পর এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যেতো না। এক শো চলার সময় বাইরে আরেক শোয়ের লোক অপেক্ষা করতো। বেশিরভাগ দর্শককে টিকেটই দেওয়া যেতো না। প্রায়ই মারামারি হতো। সেসময় টিকেটের দামও কম ছিলো। ১৩ টাকা ছিলো রিয়ার স্টল, ডিসি ছিলো ১৬ টাকা আর বেলকুনি ছিলো ১৮ টাকা (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৯)।

'নন্দিতা'য় পাবলিসিটির কাজ করেন হারুন। এই দশকের চলচ্চিত্রের রমরমা ব্যবসা নিয়ে হারুনের ভাষ্যও একইরকম—

> সেসময় *ভেজা চোখ*, *ব্যবধান*, *ওগো বিদেশিনী*, *দেশ বিদেশ*, *রাঙাভাবী*, *নীতিবান* জমজমাট ব্যবসা করেছে। সিলেট শহরের সাতটা সিনেমাহলে তখন সিনেমা চলতো, তারপরও ভরপুর দর্শক ছিলো। নাইট শোতেও প্রত্যেক দিন ৫০০ উপরে দর্শক থাকতো। আর ইভিনিং আর ম্যাটিনি শো তো সব সময় হাউসফুল (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৫) ।

যশোরের 'মণিহার'-এর টিকেট কালোবাজারি মো. ইউসুফ বলেন, "তখন 'মণিহার' এ রমরমা ব্যবসা ছিলো, তাই মেকানিকের কাজ ছেড়ে আমি টিকেট কালোবাজারি শুরু করি (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৩)।" আরেক কালোবাজারি লিকু বলেন, 'আমি এক সময় এই সিনেমাহলে ব্ল্যাকার ছিলাম। টিকেট বিক্রি করে শেষ করা যেতো না। আমরা ১৩–১৪ টাকার একটা টিকেট ৬০–৭০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করছি। এখন দুই ঈদে ছাড়া সিনেমাহল চলে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৩৯)।' বরিশালের এবায়দুল হক চাঁন বলেন,

> অভিরুচির সামনে সেসময় কমপক্ষে ২০–২৫ জন মানুষ কালোবাজারি, বাদাম, পান, সিগারেট বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো। কারণ একটা সিনেমা মুক্তির পর হাউসফুল থাকতো ১৫–২০ দিন। ফলে টিকেট কালোবাজারি কিছু মানুষের পেশা হয়ে গিয়েছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১৫)।

সিলেটের 'নন্দিতা'র পাশে বাসা নুরুল ইসলামের। ৮০'র দশকের প্রেক্ষাগৃহের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন,

> অনেক সিনেমায় দর্শক বসার মতো জায়গা পেতো না। থার্ড ক্লাসে দাঁড়িয়ে সিনেমা দেখতো। গরমে শার্ট, প্যান্ট ভিজে যেতো। ফ্যান চললেও তাতে কাজ হতো না। সিনেমাহল থেকে বের হওয়ার পর মনে হতো গোসল করে বের হয়েছে। দর্শকের ভিড়ে সিনেমাহলের ভিতরে ভিতরে বেঞ্চি, টুল বসানো হতো। তার পরও বাইরে লোক দাঁড়িয়ে থাকতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৫)।

কুড়িগ্রামের সাইদুল ইসলাম বলেন, 'আগে মহিলারা গরুর গাড়িতে করে সিনেমা দেখতে আসতো। আর গ্যারেজে সাইকেল রাখার জায়গা ছিলো না। এমন পরিস্থিতি হতো দুই টাকার জায়গায় মানুষ একটা সাইকেল রাখার জন্য ১০ টাকা পর্যন্ত দিতে চাইতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৫)।' আর রংপুরের 'শাপলা'র শফিকুল ইসলামের ভাষ্যমতে, '৮০'র দশকে সিনেমার ব্যবসা খুব জমজমাট ছিলো। সেসময়

সকালে সিনেমাহল খোলার আগেই দেখতাম লোক গিজগিজ করছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৬)।' যশোরের ফারুক আহম্মেদ সেই সময়ের চলচ্চিত্রের রমরমা ব্যবসার কথা বর্ণনা করেন কিছুটা অন্যভাবে। তার ভাষ্যমতে,

> যেদিন 'মণিহার' সিনেমাহলের উদ্বোধনী পাবলিসিটি নিয়ে আমি বের হই, ভিআইপি মানে প্রধানমন্ত্রী রাস্তা দিয়ে গেলে যেমন দুই পাশে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে, অনেক জায়গা ব্লক হয়, সেদিন তেমন হয়েছিলো। সবার নজর ছিলো ওই গাড়িটার দিকে। আবার পরের সপ্তাহে কখন মণিহারের গাড়ি আসবে এ নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা চরম আগ্রহ ছিলো। মানুষ আগ্রহ ভরে সেই প্রচার শুনতো। এখন মণিহারের সেই গাড়িটায় আছে, পাবলিসিটি করা লোক চেঞ্জ হয়েছে; আমার জায়গায় অন্যজন এসেছে। এখন আর আগ্রহ ভরে মানুষ সেই জিনিসগুলো শোনে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।

খুলনার 'সঙ্গীতা'য় কথা প্রবীণ বুকিং ক্ল্যার্ক সৈয়দ নাসির উদ্দিনের সঙ্গে। তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে কথা বলেন কাউন্টারে বসে; চা খাওয়ান। নাসির বলছেন, '৮০'র দশকে শুক্রবারের দিন খুলনার ছয়টা সিনেমাহলে সব শো ফুলহাউস থাকতো। সিনেমা দেখা নিয়ে মানুষের সেসময় সে কী আগ্রহ ছিলো! এক সিনেমাহলে টিকেট না পেলে আরেকটাতে যেতো। যেকোনোভাবে সিনেমা দেখতেই হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৫)।' কুমিল্লার লাকসামের 'পলাশ'-এর পুরনো কর্মচারী প্রদীপ শিকদারের সঙ্গে কথা শুরু হয় প্রেক্ষাগৃহের সামনের চায়ের দোকানে। এর কথা বলতে বলতে আমরা প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে যাই। অত্যন্ত ক্ষোভ নিয়ে প্রদীপ বলেন,

> ওই যে দেখেন আজ শুক্রবার কিছুক্ষণ পর নতুন সিনেমার শো শুরু হবে। সিনেমাহলের গেইটের সামনে ছাগল শুয়ে আছে। এমন দিনে আগে এই সময় সিনেমাহলের সামনে ছিলো মানুষ আর মানুষ। যেকোনো সিনেমা চালালেই সপ্তাহে এক-দেড় লক্ষ টাকা লাভ থাকতো। এসব কথা বললে এখন আর কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সেটাই সত্য ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৬)।

ময়মনসিংহের 'পূরবী'র কাজী দেলওয়ার হোসেন বলেন,

> আগে ব্যাংকের লোকজন প্রতিদিন সকালে নগদ টাকা নেওয়ার জন্য সিনেমাহলে এসে বসে থাকতো। সিনেমাহলের সেই নগদ টাকায় দুপুর পর্যন্ত স্থানীয় ব্যাংকের লেনদেন চলতো। আপনি কি ব্যাপারটা বুঝকে পারছেন? তাহলে প্রতিদিন কতো টাকার ব্যবসা আমরা করতাম। সেটা কিন্তু বেশি দিন আগের কথা নয়। এরশাদের আমলেই এ অবস্থা ছিলো। এখন সব স্মৃতি (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।

পটুয়াখালী সদরের বন্ধ হওয়া 'রূপালি'র সামনের দোকানি খোকন দে বলেন, "'রুপালি' সিনেমাহল সেসময় খুব নীচু ছিলো, টিন দিয়ে বানানোর কারণে জোয়ার হলে নীচ দিয়ে পানি ঢুকতো। দর্শক তখন ওই পানির মধ্যে বসেই সিনেমা দেখতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২২)।"

৮০'র দশকে প্রেক্ষাগৃহে নারী দর্শকের উপস্থিতি ও আগ্রহ নিয়ে কথা বলেন ময়মনসিংহের গৌরি চৌহান। তার ভাষায়,

> আগে কোনো মেয়ে টিকিট না পেলে বলতো, খালা দুইজন মিলে অন্তত একটা সিট দেন। তারপরও তারা কখনো ডিসিতে কিংবা ছেলেদের ওখানে যেতো না। আর এখনকার মেয়েরা তো ওসব জায়গা ছাড়া দেখে না। আগে এই জায়গায় সব সময় নিরাপত্তা থাকতো। কোনো পুরুষ এর আশপাশ আসতে পারতো না। আগে মেয়েরা খুব পর্দার মধ্যে সিনেমা দেখতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৬)।

ময়মনসিংহের 'পূরবী'র বুকিং ক্ল্যার্ক স্বপন মিয়া বলেন, 'মেয়েরা কিন্তু একা কখনো সিনেমা দেখতে আসতো না। কোনো না কোনো পুরুষ তার সঙ্গে থাকতোই। এখন কেমন জানি মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলো কেমন হয়ে গেছে! সব সম্পর্কে এখন কেবল মানুষ স্বার্থ খোঁজে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২০)।'

তবে এই দশকেই বিনোদন মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন ও ভিসিআর মধ্যবিত্ত দর্শকের ঘরে পৌঁছে। এছাড়া সেই সময়ে প্রেক্ষাগৃহগুলোর পরিবেশ নিয়েও মধ্যবিত্ত শ্রেণি খুব বেশি সন্তুষ্ট ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে যেটা হলো একদিকে প্রেক্ষাগৃহের এই অবস্থা, অন্যদিকে ভিসিআর-এর সহজলভ্যতা । "এ সব কারণে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা এখন আর হলমুখী হন না বললেই চলে। পাড়ায় পাড়ায় ভিডিও ক্লাব গড়ে উঠায় ঘরে বসেই এরা পছন্দ মাফিক ছবির দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। ঋণ করেও অনেকে ক্রয় করেছেন ভিসিআর, ভিসিপি ও কালার টেলিভিশন। ফলত বাংলাদেশের সিনেমা হলগুলোর অধিকাংশ দর্শকই এখন হলেন রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়ী চালক, ক্ষেত মজুর, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর মহিলা শ্রমিক" (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪০৫)। একই ধরনের কথা বলেন শুভ ও মাহমুদ (শুভ ও মাহ্মুদ ২০০৬, পৃ১০১)। কিন্তু ময়মনসিংহের গৌরি চৌহান একেবারে ভিন্ন কথা বলেন। তার ভাষ্যমতে,

> আমি যখন ৮০ সালের দিকে চাকরি শুরু করি, তখন আয় রোজগার ভালো হতো। একটা সিনেমা লাগানোর পর কমপক্ষে চার–পাঁচ সপ্তাহ চলতো। তারপরও বেশিরভাগ শো হাউজফুল থাকতো। বেতন যাই পাই, কোনো সমস্যা ছিলো না। কারণ উপরি কামাই ছিলো। কতো ধরনের মানুষ যে তখন আসতো, ধনী-গরিব কোনো ভেদাভেদ ছিলো না। অনেক ভদ্র পরিবারের মেয়েরা এখানে সিনেমা দেখতে আসতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৬)।

যশোরের 'তসবির মহল'-এর সুপারভাইজার পলাশ কুমার বোসও একই ধরনের কথা বলেন, 'যখন আমি চাকরি শুরু করি, তখন সিনেমাহলে এতো লোকজন হতো যে, দুপুরে খেতে পর্যন্ত যেতে পারতাম না। বাড়ি পাশে হলেও হোটেল থেকে খাবার এনে খেতে হতো। তখন ইনকামও ভালো ছিলো, খরচেও কোনো সমস্যা হতো না। সেই ব্যবসাটা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৬)।'

অবশ্য ১৯৮৯ সালে 'দৈনিক ইনকিলাব'-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে প্রেক্ষাগৃহের তৎকালিন পরিবেশ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়—

> আজ বিনোদনেও ভেজাল এসেছে। সিনেমা হলের ব্যবস্থাপনায়ও দুর্নীতি ঢুকেছে। হলগুলোর অব্যবস্থাপনায় দর্শককুল এদিকে যেমন বিরক্ত, হতাশ ও বিনোদন বিমুখ হয়ে পড়েছে, অপরদিকে কর্তৃপক্ষীয় উদাসীনতার ফলে দেশের গণ-বিনোদন মাধ্যমটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম করেছে। সিনেমা হলগুলোর মালিকদের অপেশাদার আচরণেও দেখা যায় ব্যবসায়ীসুলভ মনোভাবের অভাব। অসৎ পথে কালো টাকা বানানোর অতিরিক্ত আগ্রহ, সিনেমা হলকে সাইন বোর্ড হিসাবে ব্যবহার করে তার আড়ালে মদ, নারী, আফিম, হেরোইনের অবৈধ কারবার ইত্যাদি সিনেমা শিল্পকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছে। কোন কোন হল কর্তৃপক্ষ আবার অভিনব পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন হলে দর্শক টানার জন্য। তারা হাফ পর্ণোগ্রাফী ছবির প্রদর্শনী করছেন চুটিয়ে, কোথাও এক টিকেটে দুই ছবির নামে কোথাও রগরগে বিজ্ঞাপন চিত্রে অর্ধনগ্ন নারী দেহ দেখিয়ে। ... ফলে একশ্রেণীর দর্শক কোথাও কোথাও সাময়িক ভিড় জমালেও তা গোটা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে। ... তাছাড়া সিনেমা হলগুলোতে টিকেটের মূল্য নির্ধারণে কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ, প্রতিনিয়ত দর্শকদেরকে প্রতারিত করা, সিনেমা হল মালিকদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে (তুহিন ১৯৮৯)।

এই পরিস্থিতির কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় নওগাঁর পত্নীতলার সমীর কুমার মণ্ডলের কথায়। তার ভাষ্যমতে,

> প্রেক্ষাগৃহের লাইসেন্সের ফি মূলত চারশ টাকা, কিন্তু খরচ হতো ২০ হাজার টাকা। এই লাইসেন্স নিতে কোনো প্রেক্ষাগৃহের ২০টা শর্ত পূরণ করতে হয়। কেউই এই শর্ত পূরণ করতে পারতো না। এক হাজার আসনের প্রেক্ষাগৃহ হলে নিয়ম অনুযায়ী গড়ে একশো জনের জন্য কমপক্ষে একটা পায়খানা, দুইটা প্রসাবখানা লাগবে। এটা কি কোনো প্রেক্ষাগৃহের ছিলো না। ফলে তাদেরকে ঘুষ দিতে হতো। আর এদিকে হলের পরিবেশ ঠিক না থাকায় দর্শকরা কষ্ট পেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

আবার এই পরিস্থিতিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন যশোরের 'মণিহার'-এর প্রথম শ্রেণির গেইটম্যান কাজী শরিফুল ইসলাম। তার ভাষ্যমতে,

> ৮৩ সাল থেকে ৯২ সাল পর্যন্ত কিন্তু ব্যবসা খুব ভালো গেছে। তখন 'মণিহার'-এ আমরা ভাবতাম, ভালো ব্যবহার করলে দর্শক আসবে সিনেমাহলে। তাই আমরা তখন যার সঙ্গে যে ব্যবহার করার দরকার ছিলো, তাই করতাম। সিনেমাহলের ব্যবসার মূল জিনিস আছে কয়েকটা—সিনেমায় ভালো জুটি দরকার, ভালো মানের সিনেমা দরকার আর সিনেমাহলের কর্মচারীদের ভালো ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে দর্শক আসবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৪)।

এরশাদের শাসনামলেই একশ্রেণির লগ্নিকারি অবৈধভাবে অর্জিত কালো টাকার ঘোষণা দিয়ে তা চলচ্চিত্রশিল্পে প্রকাশ্যে বিনিয়োগের মাধ্যমে সাদা করার সুযোগ গ্রহণ করে (মুৎসুদ্দী ১৯৮৭, পৃ১২৬) বলে অভিযোগ রয়েছে। চলচ্চিত্রে কালো টাকার বিনিয়োগ নতুন নয়। স্বাধীনতা উত্তরও এ অভিযোগ খুব জোরালো ছিলো। কুষ্টিয়ার মোখলেছুর রহমান বকুল বলেন, 'সিনেমার ব্যবসা আগে থেকেই কালো টাকা সাদা করার ব্যবসা। এই ব্যবসা করে টাকাও সাদা হয়, ফুর্তিও করা যায়। তাহলে ভালো সিনেমা তৈরি হবে কীভাবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫২)!'

তবে সেসময় প্রযোজক পরিবেশকরা প্রদর্শকদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। সিলেটের রাশেদুল কবির মন্টু বলেন, 'আগে প্রযোজক-পরিবেশকদের সে কী দাম ছিলো! মহরতের পর কোনো সিনেমা হয়তো

দুই রিলও শুটিং হয় নাই, অথচ সিনেমাহলওয়ালারা অগ্রিম টাকা দিয়ে আসতো। তারপরও অনেক সময় পছন্দের সিনেমা পাওয়া যেতো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১১)।'

১৯৮৯ সালে রেকর্ড সংখ্যক ব্যবসা করে, তোজাম্মেল হক বকুলের *বেদের মেয়ে জোস্‌না*। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে এই চলচ্চিত্রটির ব্যবসায়িক সফলতা রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। *বেদের মেয়ে জোস্‌না* ব্যবসায়িক সফলতা নিয়ে নানা কথাই চালু আছে। বরিশালের 'অভিরুচি'র গেইটম্যান অরুণ কুমার গোস্বামী বলেন, "*বেদের মেয়ে জোস্‌না* নামে একটা সিনেমা ছিলো, 'অভিরুচি' সিনেমাহলে এটা টানা ৮৫ দিন চলছে। তারপরও লোক আর লোক। পর্দার সামনের ফাঁকা জায়গাটা থাকে না, ওখানে দেড়–দুইশো মানুষ মাটিতে বসে সিনেমা দেখছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১)।" একই ধরনের কথা বলেন যশোরের 'মণিহার'-এর দর্শক কামাল হোসেন—"বেনাপোল থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে 'নাভারন' নামে একটা সিনেমাহল ছিলো। সেখানে *বেদের মেয়ে জোস্‌না* সেসময় টানা তিন মাস চলেছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১১)।" কুড়িগ্রামের দেবলাল রজক দেওয়ান বলেন, 'আমি শুনেছি এমনও হয়েছে, ৯–১২টার শো শেষ হওয়ার পর রৌমারি না কোথা থেকে ৯–১০টা নৌকা আসছে *বেদের মেয়ে জোসনা* দেখার জন্য। ওরা আবার রাত ১২–৩টা শো চালিয়েছে। তারপর ভোরের দিকে দর্শক চলে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৮)।'

*বেদের মেয়ে জোস্‌না*র সার্বিক দিক নিয়ে কথা বলেন যশোরের মোল্যা ফারুক আহম্মেদ। তার ভাষ্যমতে,

> এখনো ভালো কাহিনি, ভালো আর্টিস্ট, ভালো সংলাপ, ভালো গান হলে সিনেমা চলবে। এই যে গান নির্ভর একটা সিনেমার কথা বলি *বেদের মেয়ে জোস্‌না*; সিনেমাটা কী ছিলো? আসলে তো এটা কাল্পনিক কাহিনি; কিন্তু কাল্পনিক হলেও সিনেমাটার অনেকগুলো দিক কিন্তু ছিলো বাস্তবভিত্তিক। একটা সিকোয়েন্সের পরে আরেকটা সিকোয়েন্সের ব্যবহার ছিলো খুব ভালো। একটা উত্তরে আরেকটা দক্ষিণে যাবে, সেটা কিন্তু হয়নি। আর মিউজিক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শককে ধরে রেখেছিলো। বিধায় দর্শক সেটা দেখেছে। যতোই ফোক সিনেমা হোক, বাংলাদেশের সর্বকালের ব্যবসা সফল সিনেমা হলো এটি। তার একটাই কারণ এর মেকিং ভালো ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।

তবে *বেদের মেয়ে জোস্‌না*র ব্যবসায়িক সফলতা নিয়ে লেখক, গবেষক আহমাদ মাযহারের যুক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ। তার দাবি—

> এই ছবির ব্যবসা সাফল্যের অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায় গ্রামের মানুষের চির পরিচিত বিনোদন মাধ্যমগুলোর ক্রমহ্রাসমানতা, গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে মানুষের বিপুল আগমনের স্রোতের শহরমুখি হওয়া বেড়ে গিয়েছিল আশির দশকেই। সে-সময়ই শহরগুলোতে ব্যাপক ভাবে গড়ে উঠতে শুরু করে গার্মেন্টস শিল্প। এই শিল্পের শ্রমিকদের অধিকাংশই নগরে এসেছিল সরাসরি গ্রাম থেকে। গ্রামগঞ্জে চির পরিচিত গল্পগুলোর রঙিন

> উপস্থাপনা তাই তাদের আকৃষ্ট করল। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত নগরবাসীদের মধ্যে গ্রামজীবনের স্মৃতি নিঃশেষিত হয়ে যায় নি বলে এই গল্পগুলোর বা এই লোককাহিনীর আদলে নির্মিত চলচ্চিত্রের আবেদন ততদিনেও ফুরিয়ে যায় নি (মাযহার ২০০৮, পৃ৬৭)।

৮০'র দশকে চলচ্চিত্রের ব্যবসার ধরন নিয়ে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের 'রাধানাথ সিনেমা'র সুপারভাইজার জহির খন্দকার বলেন, 'আগে যখন ৩৫ মিলিমিটার প্রজেক্টরে চলতো, তখন একটা সিনেমা এক বছর ধরে বিভিন্ন সিনেমাহলে ঘুরে ঘুরে দেখানো হতো। একটা সিনেমা একবার চালানোর পর, বছর শেষে সেটা আবার আমরা আনতাম। যেমন, *বেনাম বাদশা* এই সিনেমাহলে আমরা বিভিন্ন সময় সাতবার চালিয়েছি (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৬)।'

এছাড়া প্রযোজক-পরিবেশক-প্রদর্শকের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এদেশে অনেক চলচ্চিত্রই ভালো ব্যবসা করতে পারেনি। "প্রভাবশালী প্রযোজকদের নির্মমতা, স্বার্থপরতা ও একচেটিয়া বাণিজ্য নীতির ফলে অনেক নবীন প্রযোজক নিদারুণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে ছবি পাড়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকেই প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন" (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৯১)। ১৯৮৪ সালে *সুরুজ মিয়া* নামে একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। বিষয় হিসেবে কিছুটা স্বতন্ত্র এই চলচ্চিত্রটি প্রদর্শক সমিতির ষড়যন্ত্রের কারণে দর্শকের কাছে ভালোভাবে পৌঁছাতেই পারেনি।

৪.৬.১) ক্যাপাসিটে ট্যাক্স ও প্রেক্ষাগৃহের ব্যবসা

১৯৮৩–৮৪ অর্থ বছরে সরকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রমোদ কর আদায়ের নতুন পদ্ধতি চালু করে যা 'ক্যাপাসিটি ট্যাক্স' নামে পরিচিত। এজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের জুনে The duty on Capacity (Cinema House) Rules, 1983 নামে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রেক্ষাগৃহের আসন সংখ্যা, শ্রেণিবিন্যাস, বাৎসরিক প্রদর্শনী সংখ্যা ও এলাকার গুরুত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন শুল্ক হার নির্ধারণ করা হবে বলে জানানো হয়। নওগাঁর পত্নীতলার সমীর কুমার মণ্ডল বলেন, 'নতুন কোনো প্রেক্ষাগৃহ হলে, একজন অফিসার এসে দুই–চার দিন বেচাকেনা দেখে একটা ট্যাক্স নির্ধারণ করে যেতো। তারপর সেটা মাস শেষে দিয়ে আসলেই হতো। তাতেও অনেক টাকা সরকার পেতো—সারাদেশে বছরে প্রায় তিনশো কোটি (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।'

স্ট্যাম্পের মাধ্যমে প্রমোদ কর আদায়ের আগের যে পদ্ধতি ছিলো, সেই জায়গায় ক্যাপাসিটি ট্যাক্স চালু করায় চলচ্চিত্রশিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। প্রথমত, **ক্যাপাসিটি ট্যাক্স চালুর ফলে প্রদর্শকদের আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে**। ট্যাক্স নির্ধারিত হওয়ায় বর্ধিত আয় থেকে প্রেক্ষাগৃহ মালিককে কোনো কর দিতে হতো না। স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে প্রতিটি টিকিটে লাগানোর ঝামেলাও ছিলো না। কুড়িগ্রামের দেবলাল রজক দেওয়ান বলেন,

> 'মিতালী' হলের ডিসি'র দুই পাশে করিডর আছে। ডিসি'র আসন ভরে গেলে আমরা দুই পাশের করিডরে চেয়ার, টুল বা বেঞ্চ দিয়ে আরো ৬০–৭০টা সিট বসাতাম। এই আসনগুলোর জন্য কোনো ট্যাক্স দিতে হতো না। এছাড়া আমরা নানাভাবেই চেয়ার, বেঞ্চ ঢুকাতাম। সেসময় ঈদের দিনগুলোতে সিনেমাহলের মধ্যে যতো

> লোক থাকতো তার দ্বিগুণ লোক থাকতো বাইরে। ঈদের সিনেমার ব্যবসা ছিলো অন্যরকম (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৮)।

দ্বিতীয়ত, **লাভজনক হওয়ায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবসা খুব দ্রুত মফস্বলে বিস্তৃত হয়। নতুন নতুন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ হতে থাকে।** ১৯৮৩ সালে জুনে দেশে মোট ৩৮৫টি প্রেক্ষাগৃহ থাকলেও ক্যাপাসিটি ট্যাক্স চালুর পর ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে জুনে আরো ৩৫০টি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ হয় (কাদের ১৯93, পৃ৪১৪)। প্রেক্ষাগৃহের ব্যবসা নিয়ে কুমিল্লার লাকমাসের 'পড়শি'র মালিক অঞ্জন দাস বলেন, '৮০'র দশকে ক্যাপাসিটি ট্যাক্স চালু হলে সিনেমাহলের লাভ বেড়ে যা। ফলে যখন এখানে সিনেমাহলটা প্রতিষ্ঠা হয় তখন ব্যবসার অবস্থা খুবই ভালো ছিলো। ব্যবসা দেখেই তখন সিনেমাহল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। দীর্ঘ দিন অবশ্য সিনেমাহলে ভালো ব্যবসাও হয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.২.২০)।' একই ধরনের মন্তব্য করেন নওগাঁর পত্নীতলার 'বিনোদন'-এর মালিক আমিনুল ইসলাম বলেন,

> সেসময় মোটেও ব্যবসায়িক দিকটা মাথায় ছিলো না। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ চালুর পর ভালো ব্যবসা হয়েছে। তখন অবশ্য একটা চিন্তা ছিলো, প্রেক্ষাগৃহটা ভালো চললে এই উছিলায় এর চারপাশে বাজার গড়ে উঠবে। সেটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত হয়েছিলো। পরে অবশ্য এই এলাকাটা প্রেক্ষাগৃহের জন্যই জমজমাট হয় (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১৮)।

লাকসামের 'পলাশ'-এর ব্যবস্থাপক শামসুল ইসলাম বলেন, '৬০'র দশকে সিনেমাহলের ব্যবসা কোনো সাধারণ ব্যবসার মতো ছিলো না, এটা শখের ব্যাপার ছিলো। ৮০'র দশকে এসে এটা হয়ে গেলো পেশাদার ব্যবসার বিষয় হয় (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৭)।' তবে সারাদেশে প্রেক্ষাগৃহ বেড়ে যাওয়ার এই বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে দেখেন নওগাঁর পত্নীতলার আমিনুল ইসলাম। তার ভাষ্যমতে,

> সেসময় সিনেমাহল প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। আমি একটা সিনেমাহল প্রতিষ্ঠা করার পর এখানে আরো তিনটা হল হয়। আমার ধারণা ছিলো, সরকার এতো সিনেমাহল প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেবে না। কিন্তু তারা কোনো বাধা দিলো না। ফলে সিনেমাহল বেশি হয়ে গেলো। অন্য সিনেমাহলগুলো অবশ্য এখন আর চলে না। আমরাও আর আগের সেই ব্যবসায় ফেরত আসতে পারছি না (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৮)।

তৃতীয়ত, **প্রযোজক-পরিবেশকদের শেয়ার মানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সময়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের হারও বেড়ে যায়।** মুনাফা বেড়ে যাওয়ায় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী ছাড়াও শিল্পপতি ও বিভিন্ন শ্রেণির ব্যবসায়ীরা এখানে পুঁজি বিনিয়োগ করতে থাকে। ১৯৮৩ সালে চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ ছিলো যেখানে মাত্র ৩২ কোটি টাকা। পরের বছর কেবল ক্যাপাসিটি ট্যাক্সের কারণে তা বেড়ে হয় ৭০ কোটি টাকা (কাদের ১৯93, পৃ৩০৭)।

ক্যাপাসিটি ট্যাক্স চালুর সময় সরকার আশা করেছিলো, এই পদ্ধতি চালুর ফলে প্রমোদ কর খাতে তাদের আয় বাড়বে। কিন্তু এক শ্রেণির প্রদর্শক ও সরকারি কর্মচারীর যোগসাজসের ফলে আয় বাড়া তো দূরের কথা তা কমে যায়। এর মূল কারণ ছিলো প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন শ্রেণির প্রকৃত আসন সংখ্যা গোপন রাখা। নওগাঁর পত্নীতলার সমীর কুমার মণ্ডল বলেন,

> প্রেক্ষাগৃহে সম্পূরক শুল্ক ৩৫ শতাংশ আর মূসক ১৫ শতাংশ; তার মানে সব মিলে ৫০ শতাংশ ট্যাক্স। এটার নাম ছিলো ক্যাপাসিটি ট্যাক্স। এ অনুয়ায়ী সারাদিনে যদি ২০ হাজার টাকা বিক্রি হয়, ট্যাক্স দেওয়া দরকার ১০ হাজার। কেউ সেটা দিতো না। সেই সময় প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত কাস্টমসের লোকজন আসতো। তবে তাদের সঙ্গে মাসওয়ারি চুক্তি থাকলে তারা আসতো না, ঘুষের টাকা তাদের অফিসে পৌঁছে দেওয়া হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

নিজের অভিজ্ঞতা টেনে সমীর আরো বলেন, "এই 'বিনোদন' সিনেমাহল থেকে মাসে আমি ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স দিয়েছি। যদিও সেটা অরিজিনাল নয়। সেসময় ঈদে এক দিনে এক লক্ষ টাকা বিক্রি হতো। সেখান থেকে প্রকৃত ট্যাক্স ছিলো ৫০ হাজার। কিন্তু আমরা সেটা কোনো দিনও দিতাম না (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।"

এই পরিস্থিতিতে ১৯৮৮–১৯৮৯ অর্থ বছর থেকে সরকার ক্যাপাসিটি ট্যাক্স প্রত্যাহার করে পুনরায় আগে প্রচলিত টিকেটের গায়ে আবগারী স্ট্যাম্প লাগানোর প্রস্তাব প্রবর্তনের প্রস্তাব করে। ১ জুলাই ১৯৮৮ থেকে সরকার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করে। ক্যাপাসিটি ট্যাক্স তুলে দেওয়ার পরপরই প্রেক্ষাগৃহ মালিকরা টিকেটের দাম বাড়িয়ে দেয়। ১৯৮৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রেক্ষাগৃহ মালিকরা আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে সরকার ১৯৮৯ সালের ১০ মার্চ থেকে পুনরায় ক্যাপাসিটি ট্যাক্স চালু করা হবে বলে ঘোষণা আসে।

প্রেক্ষাগৃহের ট্যাক্স নিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, সামরিক সরকার বিনোদনকে বাণিজ্যিকীকরণের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সামরিক সরকারের এ ধরনের কৌশল অবশ্য নতুন কিছু নয়। কারণ জনগণের মস্তিস্ক প্রক্ষালনে সব সময়ই তারা নানা ধরনের কৌশল অবলম্বনে সিদ্ধহস্ত থেকেছে। ফলে চলচ্চিত্রে বাণিজ্যের লোভ দেখিয়ে তাদের বুদ করে রাখা সেই প্রক্রিয়ারই অংশ।

৪.৬.২) প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্টদের সামাজিক মর্যাদা

প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষদের এসময় সমাজে খুব সম্মান ছিলো। মালিকরা সেই অর্থে এলাকাভিত্তিক বিখ্যাত ও প্রভাবশালী লোক ছিলেন। কোনো প্রেক্ষাগৃহের মালিককে কেউ চেনে কিংবা তার বাড়ির কাছে বাড়ি, এগুলো পরিচয় দেওয়ার মতো ঘটনা ছিলো। আর সাধারণ মানুষ প্রেক্ষাগৃহের কর্মচারীদেরও সম্মান, শ্রদ্ধা করতো। ময়মনসিংহের 'পূরবী'র কাজী দেলওয়ার হোসেন তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন এভাবে—

> ১৯৮৬ সালে আমি 'মধুমিতা মুভিজের' ম্যানেজার ছিলাম। আমার শ্বশুরবাড়ি ময়মনসিংহে। আমি একবার ঢাকা থেকে বউ নিয়ে ময়মনসিংহে আসছি। সে সময় কী কারণে যেনো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ থাকার পর খুলেছে। আমি যে বগিতে বসেছি, সেটাতে বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনেক ছেলেমেয়ে। তো আমি একটু কী যেনো কাজে অন্য

> বগিতে গেছি, এসে দেখি আমার সিটটা ব্লক হয়ে গেছে। আমি পাশের সিটে বসলাম। তারপর কথায় কথায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হলো। ওরা জিজ্ঞাসা করতেছিলো, আমি কী করি? আমি জানালাম, আমি 'মধুমিতা মুভিজের' ম্যানেজার। তখন ওরা খুব আগ্রহ নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বললো, বেশ সম্মান করলো। অনেক বিস্ময় নিয়ে বললো, আপনি 'মধুমিতা'র ম্যানেজার! এতো বড়ো সিনেমাহল (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)!

যশোরের 'মণিহার'-এর বুকিং ক্ল্যার্ক শামীম আনোয়ার বলেন,

> তখন 'মণিহার' মানে তো বিশাল ব্যাপার। দেশের অন্যতম সিনেমাহল। ঘোরানো সিড়ি, ছয় ঋতুকে ধরে আলো। রেডিওতে নাজমুল হোসাইনের যে বর্ণনা, এইটা শুনে পাবলিকের তো মাথা খারাপ। আমাদেরও তখন কতো সম্মান! লোকজনেরা সেই দাম দিতো। রাস্তায় হাঁটলে ডেকে নিয়ে চা খাওয়াতো। সেসময় উত্তর-দক্ষিণের এমন কোনো এলাকা ছিলো না, লোকজন সেখান থেকে সিনেমা দেখতে আসে নাই। দূর-দূরান্ত থেকে 'মণিহারে' সিনেমা দেখার দর্শক তো আমাদের ছিলোই, তার ওপর নিয়মিত দর্শক তো আছেই। ৯০ পর্যন্ত কখনো কখনো আমাদের মিড নাইট শো পর্যন্ত চালাতে হয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২০)।

কুড়িগ্রামের 'মিতালী'র সাবেক ব্যবস্থাপক হাবিবুর রহমান টিটু সঙ্গে কথা হয় তার চা-পানের দোকানে। কথা বলার একপর্যায়ে টিটু কেঁদে ফেলেন। তার ভাষ্যমতে,

> 'আগে আমরা কোথাও গেলে মানুষজন আমাদের সম্মান করতো। কতো মানুষ বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতো। আমরা কুড়িগ্রাম সদরের নয়টা ইউনিয়ন ঘুরতাম কেউ একটা পানের পয়সা নিতো না। সবাই ভালোবাসতো। এটা বেশি দিন আগের ঘটনা নয়, এই ৮১, ৮২, ৮৩ সালের দিকের ঘটনা (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৬)।'

যশোরের 'মণিহার'-এর মালিক জিয়াউল হক মিঠুর সঙ্গে কথা হয় তার অফিসে বসে। ব্যবসা আগের মতো না থাকলেও এখনো সব ঝকঝকে রেখেছেন মিঠু। তিনি বলেন,

> ধরেন, আপনি যশোর বেনাপোলে বর্ডার পার হচ্ছেন, সেসময় যদি আপনি 'মণিহার'-এর স্টাফ বলে পরিচয় দেন, তাহলে নিশ্চিত অ্যাডভান্টেজ পাবেন। ইভেন কলকাতাতেও 'মণিহারের' কর্মচারী বললে, তারা সম্মান পায়। ওখানকার লোকজন বলে, আরে বাবা এতো বড়ো একটা সিনেমাহলের কর্মচারী! আর সারা বাংলাদেশে এখনো 'মণিহারের' মালিক একটা ব্যাপার! সিনেমাহলের ব্যবসার কথা আসলেই 'মণিহারের' নাম আসবেই (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২১)।

জিয়াউল হক মিঠু আরো বলেন, "আমাদের পরিবার সিনেমাহল থেকেই সবচেয়ে বেশি সম্মান পেয়েছে। আমাদের আরো অনেক ব্যবসা ছিলো, কিন্তু 'মণিহারের' মালিক হিসেবেই সবাই আমাদের চেনে-জানে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২১)।"

প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে বর্তমানের অভিজ্ঞতার কথা বলেন যশোরের 'মণিহার'-এর প্রধান হিসাবরক্ষক মো. তোফাজ্জল। তার ভাষায়, "এটা ঠিক, আগে কোনো সমস্যা ছিলো না, 'মণিহার'-এ চাকরির কারণে অনেকেই সেসময় তাদের চিনতো। তবে বর্তমানে ব্যবসা পড়ে যাওয়ায় লোকজন একটু খারাপ চোখে দেখে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৯)।" বরিশালের 'অভিরুচি'র পাবলিসিটির দায়িত্বে থাকা শেখ মাসুম বলেন, 'সিনেমাহলে চাকরি করতে গিয়ে কোনো দিন ভাবি নাই, আমিও একদিন বুড়া হবো, আমি অসুস্থ হলে টাকার প্রয়োজন হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২)।'

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহ যতোদিন তার অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছিলো, ততোদিন মানুষ প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্টদের সম্মান করেছে। কারণ বিদ্যালয়, মসজিদ, মন্দির, পরিবারের মতো এটাও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিলো। যেখানে মানুষ নির্দিষ্ট কিছু আচার, মূল্যবোধ মেনে চলতো কিংবা শিখতো। প্রেক্ষাগৃহ অনেক দিন পর্যন্ত সেটা ধরে রাখতেও পেরেছিলো। এছাড়া মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র ও প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের যে ম্যাজিক তাও সাধারণ মানুষকে বিমোহিত করতো। ফলে এই মানুষগুলোকে সম্মান না দেওয়ার কোনো উপায় ছিলো না। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবেও প্রেক্ষাগৃহের লোকজনের কাছে প্রচুর কাঁচা টাকা ছিলো, যা তাদেরকে সমাজে অন্য ধরনের একটা সম্মান দিয়েছিলো।

৪.৭) চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী

এই দশকে সামাজিক, পোশাকি-ফ্যান্টাসি, মারদাঙ্গা সব ধারার চলচ্চিত্র সমানতালে নির্মাণ হয়েছে। এসব চলচ্চিত্রের কাহিনি কখনো বাস্তবতাকে ছুঁয়ে গেছে, আবার কখনো তা ফ্যান্টাসি নিয়ে হাজির হয়েছে। তবে কাহিনি যাই হোক দর্শক বেশিরভাগ সময় বাস্তবের সঙ্গে এর সম্মিলন ঘটাতে চেয়েছেন। আবার এমনও হতে পারে চলচ্চিত্রের যে জাদুময়তা সে কারণেই হয়তো সেটা ঘটেছে। কিংবা কাহিনি তাদের মন ছুঁয়ে গেছে। এই দশকের বেশির ভাগ চলচ্চিত্রের কাহিনি স্বতন্ত্র ছিলো। ফলে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বের হওয়ার পরও অনেক দিন পর্যন্ত এসব কাহিনি, গল্প, অভিনয়, গান দর্শকের মনে গেঁথে থাকতো। এসব চলচ্চিত্রের গান শুনেই বলে দেওয়া যেতো, সেই চলচ্চিত্রের নাম।

ভারতীয় চলচ্চিত্র থেকে সেসময় বিভিন্ন উপাদান ঢাকাই চলচ্চিত্র নেওয়া হতো ঠিক। কিন্তু তারপরও তখন চিন্তা করা হতো, একটা গল্প কীভাবে চলবে, দর্শক তার কতোখানি নিবে, কোনো পরিবর্তন দরকার আছে কিনা? ফলে নকল চলচ্চিত্রগুলোও শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র হয়ে উঠতো। দর্শক মনে করেন, চলচ্চিত্রগুলোর কাহিনি বহুমাত্রিক ছিলো, গল্প একখানে শুরু হয়ে তা নানা ডালপালা ছড়িয়ে যেতো। দিনশেষে এসব চলচ্চিত্রে সত্যের জয় হতো। এই জয়কে দর্শক তাদের নিজেদের জয় হিসেবেই দেখেছেন। গবেষণার অঞ্চলভিত্তিক আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে ৮০'র দশকের চলচ্চিত্র নিয়ে এমনসব ধারণায় পাওয়া গেছে।

এছাড়া গবেষণার আখ্যান বিশ্লেষণে ৮০'র দশকের ৭৯টি চলচ্চিত্রের নাম এসেছে (সারণী ৪.১.১)। এই চলচ্চিত্রগুলো মধ্যে সবচেয়ে বেশি এসেছে দুটি চলচ্চিত্রের নাম মমতাজ আলীর *নসীব* (১৯৮৪) ও তোজাম্মেল হক বকুলের *বেদের মেয়ে জোস্না* (১৯৮৯)। এই পর্যায়ে চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি এ দুটি চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণও করা হয়েছে।

প্রথমেই এ দশকের চলচ্চিত্রের কাহিনি নিয়ে কথা বলেছেন খুলনার 'শঙ্খ'-এর চলচ্চিত্র প্রতিনিধি শেখ মোতাহার হোসেন। তিন তলায় ডিসির সামনে বসে দীর্ঘ সময় ধরে কথা হয়েছিলো মোতাহারের সঙ্গে। তার ভাষ্যমতে,

৮০'র দশকে যে সিনেমাগুলো হয়েছে তার কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল ছিলো। তাই এসব সিনেমা দর্শক দেখেছে। আর এখন যে সিনেমা হচ্ছে, সিনেমাহল থেকে বের হওয়ার পর সেই কাহিনি, ইতিহাস, গল্প মনে থাকে না। আগের সিনেমার গান এখনো মানুষ শোনে। কিন্তু আজকের দিনে যেসব গান সেগুলো সিনেমাহল থেকে বের হলে মাথায় থাকে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২)।

যশোরের প্রদীপ দাস বলেন, "... অথচ ৮০, ৯০ দশকের সিনেমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন যেসব সিনেমা আমি দেখছি, তার অনেকগুলোর গান, সংলাপ আমার এখনো মনে আছে। *অবিচার* 'নিরালা'য় সাত সপ্তাহ চলেছে। আমি ওই সিনেমা কমপক্ষে ২৫ বার দেখেছি। সিনেমাটার অনেক সংলাপ আমার এখনো মনে আছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১২)।"

আবার যশোরের 'মণিহার'-এর দর্শক বাদামবিক্রেতা সিরাজুল ইসলামের মতে,

তখন সিনেমা চলতো বাস্তব-অবাস্তব কাহিনি নিয়ে। কিন্তু সেখান থেকে মানুষ কিছু জিনিস বাস্তবের সঙ্গে মেলাতো। সিনেমা দেখে আমার কিছু ভালো, কিছু খারাপ বোঝাপড়াও হয়েছে। কিছু সিনেমা দেখে আমি মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছি। একজন অসহায় মানুষের পাশে কীভাবে দাঁড়াতে হবে, আমি সেটা শিখেছি সিনেমা দেখে। এই সময়ের সিনেমায় সেটা ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪০)।

অভিযোগ রয়েছে এই দশকের চলচ্চিত্রের গল্পে কাঠামোবদ্ধভাবেই নাচ, গান, হাসি, কান্না ছিলো। এর ভিত্তিতেই চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী গল্প সীমাবদ্ধ হয়েছে (মুৎসুদ্দী ১৯৮৭) (ইসলাম ২০০৮)। ফলে সেসময় ভিন্ন দুটি চলচ্চিত্রের মধ্যে তারতম্য খুঁজে বের করা দুষ্কর হয়। আপাত দুটি গল্প মনে হয়েছে একই। অথচ ময়মনসিংহের ইসমাঈল আলী সেই সময়ের চলচ্চিত্রের কাহিনি নিয়ে বলছেন একেবারেই ভিন্ন কথা। তার ভাষ্যমতে, "'ছায়াবাণী'তে একবার *তাসের ঘর* লাগালো; নায়ক-নায়িকা ফারুক আর রোজিনা। আমি এই সিনেমাটা সাত দিন দেখছি। তখনকার সব সিনেমার কাহিনি আলাদা ছিলো। ফলে সব গল্প মনে থাকতো। এখনো আমার *তাসের ঘর*-এর কাহিনি মনে আছে, রিনা খান অন্ধ ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৮)।" একই ধরনের কথা বলেন কুমিল্লার লাকসামের তোফায়েল হোসেন—'তখনকার সিনেমার কাহিনি ভালো ছিলো। একই সিনেমায় হয়তো গল্প ১০ দিকে ডালপালা মেলতো, কিন্তু শেষ হতো এক জায়গায় এসে (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৮)।' যশোরের মোশারফ খান বলেন, '৮০-৯০ দশকের সিনেমার সঙ্গে আজকের সিনেমার কোনো মিলই নাই। আগে তো একটা সিনেমার কাহিনির সঙ্গে আরেকটা মিলতো না। আগে গান শুনে বলা যেতো, এটা কোন সিনেমার গান। কারণ তখন একটা সিনেমার গান, অভিনয়, কাহিনি কোনো কিছুর সাথে অন্য একটা সিনেমার মিল ছিলো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৮)।'

৮০'র দশকে চলচ্চিত্র নির্মাণে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করার মতো—নকল চলচ্চিত্রের আধিক্য। সেসময় ভারতের একাধিক হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্রের ভিডিও ক্যাসেট দেখে একটি চলচ্চিত্রের গল্প লেখা হতো বলে অভিযোগ রয়েছে। নকল প্রবণতা নিয়ে এই দশকে দেশজুড়ে আলোচনা সমালোচনা হলেও এরশাদের শাসনামলে কালো টাকা সাদা করা লগ্নিকারকদের টাকায় নির্মিত চলচ্চিত্রে কোনো নির্মাতাই অনুকরণ নির্ভরতার ছক থেকে মুক্ত হতে পারে নাই। ফলে এই সময় হিন্দি কাহিনির অনুবর্তনের

অপচ্ছায়া দেশের চলচ্চিত্র থেকে বিদূরিত হয় নাই (ইসলাম ২০০৮, পৃ৯৩)। নকল চলচ্চিত্র নির্মাণের এ অভিযোগকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেন। তার যুক্তি হলো,

> তখনো নকল গল্প থাকতো—বোম্বে (মুম্বাই), তেলেগু, মাদ্রাজী, দক্ষিণীর সিনেমা থেকে বিভিন্ন উপাদান নেওয়া হতো। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তা হুবহু বানানো হতো না। তখন চিন্তা করা হতো, একটা গল্প কীভাবে চলবে, দর্শক কতোখানি নিবে, কোনো পরিবর্তন দরকার আছে কিনা? দেখেন মানুষ তো একটা গল্প থেকেই আরেকটা গল্প বানায়। তাহলে সমস্যা কী (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)!

উত্তরাধুনিকতা ধারণায় যে ইন্টারটেক্সুয়ালিটির কথা বলা হয়, সেখানেও কাজী দেলওয়ারের কথার সমর্থন আছে। পৃথিবীতে কোনো টেক্সটই একেবারে অনন্য নয়। পূর্ববর্তী অন্য কোনো টেক্সট কিংবা একাধিক টেক্সটের সমন্বয়ে নতুন একটি টেক্সট গড়ে ওঠে। এই দার্শনিক অবস্থান থেকে কোনো টেক্সটটি আসলে একেবারে নতুন নয় কিংবা উল্টো করে বললে নকলও নয়। এর একধরনের আপেক্ষিকতা আছে। পরিবেশ, পরিস্থিতি, অবস্থা অনুযায়ী টেক্সট নতুন নতুন রূপে হাজির হয়। ফলে কাজী দেলওয়ার যে যুক্তি দেন তা যথার্থই।

আবার নকল নিয়ে একেবারে অন্য ধরনের ব্যাখ্যা হাজির করেন যশোরের মোশারফ খান। তার ভাষ্যমতে,

> সেসময় আমাদের যেসব সিনেমা হতো, কলকাতা সেগুলো নকল করতো। তখন আমাদের অনেক ভালো ভালো সিনেমা হয়েছে। অনেক বড়ো বড়ো প্লেয়ারও ছিলো। *বেদের মেয়ে জোস্‌না*ও তো কলকাতায় বানানো হয়েছিলো। সেটা দোষের কী! যার যেটা ভালো লাগবে সে সেটা তার মতো করে বানাবে। আমি তো খারাপ কিছু দেখি না। আমি যখন একা শুয়ে থাকি তখন জসীম, ওয়াসিম, ইলিয়াস কাঞ্চন, ফারুক, অলিভিয়া, রোজিনা, অঞ্জু ঘোষ, রাজীব এই প্লেয়ারগুলোর কথা ও তাদের সিনেমার কথা মনে পড়ে খুব (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৮)।

৮০'র দশকের চলচ্চিত্রের নকল কাহিনি নিয়ে এফ ডি সি'র প্রযোজক সমিতির অফিসে বসে কথা হয় কাহিনিকার, পরিচালক, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার দেলওয়ার জাহান ঝন্টুর সঙ্গে। ঝন্টুও নকল চলচ্চিত্র বানানোকে দোষের কিছু মনে করেন না। এ পর্যন্ত ২০০টির উপরে চলচ্চিত্রের গল্প লেখা ঝন্টু তার এই সাক্ষাৎকারে বলেন,

> শফি বিক্রমপুরী সাহেব একটা সিনেমা বানাবে, মুম্বাইয়ের প্রেমনাথ-মধুবালার একটি সিনেমা ছিলো *সাকি* নামে সেটা। তারা তখন *সাকি*র প্রিন্ট পাচ্ছিলেন না ঢাকায়। তখন আমি কেবল *লিডার* সিনেমা বানিয়েছি, এডিটিং করতেছিলাম, ওখানে ওরা আমাকে পেয়ে যায়। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেছে, আমরা শুনছি আপনি ভারতের অনেক সিনেমা দেখেছেন, তো আপনি কি *সাকি* দেখেছেন? আমি বললাম, দেখেছি। তাহলে আপনি একটু বলেন। আমার সামনে তখন সুভাষ দত্ত, শামসুদ্দিন টগর, জসিম, ওয়াসিম এরা সবাই বসা। আমি সিন টু সিন *সাকি*র টোটাল গল্পটা বলে দিলাম। ওরা তো শুনে অবাক! গল্প শোনার পর ওরা আড়ালে গিয়ে কয়, তাইলে ঝন্টু সাহেবরে গল্প ও চিত্রনাট্য লেখার জন্য বসাইয়া দিই (আখ্যানের ক্রম ৫.৪; ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

তারপরও এ সময়ের উল্লেখযোগ্য নকল চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে মোস্তফা আনোয়ারের *আখি মিলন* (১৯৮৩) হিন্দি চলচ্চিত্র *নদীয়া কি পার* এর অনুকরণ, মমতাজ আলীর *নসীব* (১৯৮৪) ছিলো হিন্দি

খুনকা বদলা খুন এবং অশোক ঘোষের *নিশান* (১৯৮৬) হিন্দি *কালা আওর গোরার* হুবহু অনুকরণ। এছাড়া গান, সংলাপ, নাচের দৃশ্য অনেক কিছুই হিন্দি চলচ্চিত্র থেকে নকল করা হতো। সেই সময়ের প্রভাবশালী ম্যাগাজিন 'বিচিত্রা'র মতে, "হাতে গোণা কয়েকটি ছবি ছাড়া প্রায় সব ছবি অপরুচি, চৌর্যবৃত্তি ও অপসংস্কৃতির ধারক" (*সাপ্তাহিক বিচিত্রা* বর্ষপত্র, ১৯৮৫, ঢাকা, পৃ.১৮৩) ছিলো। ৮০'র মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্বকারী ম্যাগাজিন 'বিচিত্রা'র এই ভাষ্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সাধারণ দর্শকের বয়ানের কিন্তু কোনো মিল পাওয়া যায় না। 'অপরুচি, চৌর্যবৃত্তি ও অপসংস্কৃতি'কেই এই দর্শক তাদের রুচি, মৌলিক গল্প ও সংস্কৃতি হিসেবে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে গেছেন কেঁদেছেন, হেসেছেন, প্রতিবাদী হয়েছেন।

এই দশকে মৌলিক গল্পের চলচ্চিত্রের সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়ে অভিযোগ করেন গবেষক ফাহমিদুল হক ও গীতি আরা নাসরীন। তাদের ভাষ্য হলো, "আলমগীর কবির নির্মাণ করেন *মহানায়ক*-এর (১৯৮৬) মতো সাধারণ ছবি। আমজাদ হোসেনের সমাজমনস্কতা *কসাই*-এ (১৯৮০) এসে *ঠেকে*, *ভাত দে* (১৯৮৪) বা *জন্ম থেকে জ্বলছি*তে (১৯৮১) উচ্চকিত বক্তব্য থাকলেও তাতে সংযম ও সংহতি নেই। সুভাষ দত্ত নির্মাণ করেন *সবুজ সাথী* (১৯৮২), *নাজমা* (১৯৮৩), *আগমন* (১৯৮৮), *ফুলশয্যা* (১৯৮৬) নামক অতি সাধারণ ছবি" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৫৭)। তবে এর বাইরে সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকীর *ঘুড্ডি* (১৯৮০), বাদল রহমানের *এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী* (১৯৮০), আলমগীর কবিরের *মোহনা* (১৯৮২), শেখ নিয়ামত আলীর *দহন* (১৯৮৫)—এ ধরনের অল্প কয়েকটি চলচ্চিত্র মৌলিক গল্পের উদাহরণ হিসেবে হাজির হয়। এর মধ্যে *ঘুড্ডি*তে (১৯৮০) মূলত উত্তরাধুনিক ছোঁয়া ছিলো। এক তরুণ মুক্তিযোদ্ধার বেকার জীবন ও তার অভিলাষী প্রেম নিয়ে চলচ্চিত্রের গল্প এগিয়েছে। "সদ্য স্বাধীন দেশের চলচ্চিত্রে এমন সমসাময়িক গল্প ও তার গান চমকে দেয় সবাইকে। প্রচলিত কাঠামো কিছুটা অনুসরণ করেও ছবিটি পরিপূর্ণ ছিল শক্তিশালী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পসুষমায়" (আলী, ১৫ জানুয়ারি ২০২০)। বিশেষ করে *ঘুড্ডি*র গান, আবহ সঙ্গীতের মার্জিত ব্যবহার ও চিত্রধারণের নান্দনিকতা সে সময়ের প্রচলিত বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রকে ঝাঁকুনি দিয়েছিলো। তবে এসব চলচ্চিত্র সাধারণ দর্শকের কাছে কতোখানি পৌঁছেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে।

এবার আসা যাক আখ্যানে সর্বাধিক দর্শক স্মৃতিতে থাকা নমুনায়িত দুটি চলচ্চিত্রে। ১৯৮৪ সালে রেকর্ড পরিমাণ ব্যবসা করে *নসীব*। যদি এর বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ রয়েছে। অ্যাকশনধর্মী এ চলচ্চিত্রটি এক কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করে বলে জানা যায় (কাদের ১৯৯৩, পৃ.৩৬৯)। *নসীব* এমন এক সময়ে ব্যবসা সফল হয়, যখন দেশে সামরিক শাসনের অবস্থান পাকাপোক্ত, হিংসার রাজনীতি চরমে, রাজনৈতিক বিরোধীরা চরমভাবে প্রতিহিংসার শিকার।

*নসীব*ও শুরু হয় প্রতিহিংসা দিয়েই। একজন ভাড়াটে খুনীকে দেখা যায় ব্যবসায়ী আফজালকে খুন করতে। তার কথায় বোঝা যায়, তিনি মোটেও স্বেচ্ছায় এমনটি করছেন না, কারো আদেশ পালন করছেন। ওই খুনীকে ভাড়া করা হয়েছিলো, আফজালের পরিবারের সবাইকে খুনের জন্য কিন্তু তিনি আফজাল ছাড়া বাকি তিনজনকে বাঁচিয়ে দেন এবং তাদের দ্রুত পালিয়ে যেতে বলেন। ফলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান আফজালের স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে।

এরপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে নিপীড়নের শিকার হতে থাকে আফজালের স্ত্রী, ছেলে মন্টু ও মেয়ে শাহানা। এক পর্যায়ে নিপীড়নের হাত থেকে মাকে বাঁচাতে গিয়ে ইটভাটার মালিককে খুন করে মন্টু। খুনের দায় থেকে ছেলেকে বাঁচাতে মা-ই মন্টুকে পালাতে বলেন। ঘটনাক্রমে বাসে ওঠে মা-ছেলের আবার দেখা হলেও সেটা বেশি সময় স্থায়ী হয় না। এবার বাসে ডাকাতের আক্রমণে নির্মমভাবে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় মন্টু। তাকে ডাকাত দল সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বাবার মৃত্যুর পর থেকে যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মন্টু যেতে থাকে, তা তাকে সম্পন্ন নতুন একটা পথের দিকে পারিচালিত করে। অল্প সময়ের মধ্যেই দর্শক মন্টুর জীবনের নতুন পথ সে দেখতে পান। মন্টু থেকে তিনি হয়ে ওঠেন ডাকু বশিরা।

ছবি : সংগৃহীত

পর্দায় ডাকু বশিরার আবির্ভাব ঘটে তার দলের ডাকাত সর্দারকে হত্যার মধ্য দিয়ে। যে কিনা কুয়ায় ফেলে, পোষ না মানা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে, বশিরা নামের মন্টুকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। বশিরা বুমেরাং হয়ে হাজির হন ডাকাত সর্দারের সামনে। ডাকাত সর্দারকে হত্যার মধ্য দিয়ে বশিরা প্রথম যে পরিবর্তনটা আনেন তা হলো সাধারণ মানুষের ওপর যে জুলুম হতো, সেটা বন্ধ করেন। বশিরাকে বলতে (২৫ মিনিট) শোনা যায়, 'এই হাত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অত্যাচারিতের উপার্জিত ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে নিরীহ গরীব-দুঃখী মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেয়।'

এরপর বশিরা একে একে প্রতিশোধ নিতে থাকেন, একই সঙ্গে বশিরা হয়ে ওঠেন গরিব-দুঃখী মানুষের বন্ধু। তাকে এতিমখানায় টাকা দিতে, অভাবীদের সাহায্য করতে দেখা যায়। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত দর্শক তাদের নেতার ছায়া দেখতে পান বশিরার মধ্যে। তাদের না পাওয়ার বোধ, প্রতিবাদ করতে না পারার কষ্ট, সব যেনো একে একে বশিরার মাধ্যমে ঘটতে থাকে।

একপর্যায়ে এতিম মেয়ে লাইলীকে বিয়ে করেন বশিরা। কিন্তু স্ত্রী না দেখেই সেইরাতে তাকে ঘর ছাড়তে হয়। সেই বিয়ে বশিরার কাছে দুর্ঘটনা হলেও লাইলীর কাছে ছিলো অনেক বড়ো বিষয়। তাই স্বামীর খোঁজে লোভী মামার কাছ থেকে লাইলী পালাতে চান। ঘটনাক্রমে কুখ্যাত ব্যবসায়ী আকরামের আস্তানায় আটকা পড়েন বাঈজি হয়ে যান লাইলী। ঘটনাক্রমে লাইলীকে উদ্ধার করে বাড়িতে আনেন বশিরা। বশিরার পরিচয় পেয়ে লাইলী স্ত্রীর মর্যাদা চান। বশিরা বলেন, 'বিয়েটা ছিলো নিছক দুর্ঘটনা।' উত্তরে লাইলীকে বলতে শোনা যায়, 'আপনি পুরুষ তাই ধর্মকে সাক্ষী রেখে কবুল করে বিয়ে করাটা আপনার কাছে একটা দুর্ঘটনা; কিন্তু আমি একটা সাধারণ মেয়ে। আর কোনো মেয়ে যদি স্বামীর ঘরে এসে স্ত্রীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয় তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।'

একপর্যায়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন লাইলী। বশিরা তাকে বাঁচান। প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ যে কতোখানি শক্তিশালী, এরপর দর্শক তা বুঝতে পারেন। লাইলীর কথায় ধীরে ধীরে বশিরা মানুষ খুন বন্ধ করে দেন। তাদের ঘরে সন্তান আসে। সন্তানের জন্মের সময় লাইলীর কিছু সমস্যা হলে চিকিৎসককে ডাকতে হয়। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে বশিরা জানতে পারেন এই গাইনি চিকিৎসকই তার সেই হারিয়ে যাওয়া বোন। তার মাধ্যমে মাকেও খুঁজে পান বশিরা। কিন্তু তারা কেউই বশিরাকে চিনতে পারে না।

যদিও সম্পদের উত্তরাধিকার ও বংশগতি টিকে রাখার জন্য বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর বাইরেও এই প্রতিষ্ঠানের বদৌলতে যে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয় সেটা চলচ্চিত্রে স্পষ্ট হতে থাকে। ফলে এতো হিংসা, প্রতিশোধ, নির্মমতার মধ্যেও বশিরা-লাইলীর সংসার দেখে দর্শক আবেগী, উদ্বেলিত হয়।

চলচ্চিত্র জুড়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশের উপস্থিতি চোখে পড়ে না বললেই চলে। বশিরার বাবার খুন হওয়া, তার মায়ের ওপর নিপীড়ন, বাসে ডাকাতি, ডাকাত সর্দারের রাহাজানি, আকরামের বাঈজি নাচানো, এমন কী বশিরার একের পর এক নির্মম প্রতিশোধ—কোনো সময়ই পুলিশের উপস্থিতি চোখে

পড়ে না। বরং বশিরা যখন এসব বাদ দিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চান, তখনই পুলিশ এসে হাজির হয়। দর্শক তখন পুলিশকে শুধু বশিরার নয়, তাদেরও শত্রু ভাবতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কিন্তু নিজেদের বুদ্ধিমত্তায়ও বশিরাকে ধরতে পারে না। বশিরা তার বোনের সংসার রক্ষায় মহত্বের পরিচয় দিয়ে নিজে পুলিশের হাতে ধরা দেন। প্রয়োজনে বশিরা আবার কারাগার থেকে বেরিয়েও আসেন। যদিও শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে বশিরার মৃত্যু হয়, কিন্তু সেটা কোনো ডাকু বশিরার নয়, দর্শকের নায়ক বশিরার। ততোক্ষণে তার জন্য দর্শকের অগাধ ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেছে।

নসীব-এর নারী চরিত্রগুলোয় চেক অ্যান্ড ব্যালান্স আছে। টিপিকাল নারী চরিত্র লাইলী যেমন আছেন, তেমনই আছেন দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ডা. শাহানা, নৈতিকতা বোধ সম্পন্ন বশিরার মা। এছাড়া মমতাময়ী বাঈজির চরিত্রের পাশাপাশি, নেতিবাচক মানসিকতার শাহানার শ্বাশুড়ি। লাইলী যেমন স্বামী হারা হয়ে আত্মহত্যা করতে যান, ইজ্জত রক্ষায় উঁচু ভবন থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেন; অন্যদিকে নিজের ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগায় সংসার ছাড়তে দ্বিধা করেন না ডা. শাহানা। বশিরার মা, ডাকাত হওয়ায় নিজের ছেলেকে যেমন দূরে ঠেলে দেন আবার নৈতিকতার জোরে কাছেও টেনে নেন। যে বাঈজির কাছে লাইলীর আশ্রয় হয়, সেই বাঈজিকে শেষ পর্যন্ত জীবন দিতে হয় লাইলীকে বাঁচাতে। লাইলীকে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। অন্যদিকে এদের সবার বিপরীত চরিত্র নিয়ে হাজির থাকেন শাহানার শ্বাশুড়ি। তিনি মোটেও শাহানার ব্যক্তিত্ববান চলাফেরা, কাজকর্ম পছন্দ করেন না; তার জন্ম পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যদিও কোনো কিছুই শাহানাকে হার মানাতে পারে না। নারী চরিত্রের এই দুর্দান্ত সমন্বয় নিঃসন্দেহে দর্শককে চলচ্চিত্রটি দেখতে আগ্রহী করে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ভালো-মন্দের যুদ্ধে বেশিরভাগ সময়ই মন্দের পরাজয় হয়। *নসীব*ও এর বাইরে নয়। কারাগারে বশিরার সঙ্গে দেখা হয় তার বাবার খুনীর, সেখানেই তিনি জানতে পারেন তার বাবার আসল খুনীর পরিচয়। প্রতিশোধ স্পৃহা তাকে আর কারাগারে বন্দি রাখতে পারে না। তিনি আকরাম খানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন। একে একে তার হাতে মৃত্যু হয় আকরাম খান ও ডাকাত সর্দারের ছেলের। যদিও শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে বশিরার মৃত্যু হয়, কিন্তু সেই মৃত্যু ভালোর প্রতীক হয়ে বশিরাকে বাঁচিয়ে রাখে। দর্শক এই বশিরাকে দেখতেই দলে দলে প্রেক্ষাগৃহে গেছেন। এবং বশিরা যে এতো বছর পরও দর্শকের মনে আছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নসীব-এ ন্যারেটিভের সঙ্গে গান রয়েছে পাঁচটি। পর্দায় সবগুলো গানের উপস্থাপন ন্যারেটিভের সঙ্গে মিলিয়ে যথাযথ হয়েছে এমন নয়; তবে গানগুলো সেসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। চলচ্চিত্রে ৩২ মিনিটে প্রথম গান নিয়ে হাজির হন ডা. শাহানা ও তার প্রেমিক ইন্সপেক্টর শাহেদ। শাহানা এম বি বি এস পাস করেছেন, প্রেমিক শাহেদকে নিয়ে গান করছেন, 'হায় হায় এই কলিজায়/ কে ধরালো আগুন, কে দিলো আগুন/ তারে ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম তারে পায়/ স্বজনী গো দিন গুনে দিন চলে যায়/ স্বজনী গো রাত জেগে রাত চলে যায়।'

৫৬ মিনিটে ডাকাত সর্দারের ছেলে ভুলু স্বপ্নে দেখে লাইলীর সঙ্গে গান করছেন, 'এসো না ভাব করি জলে ডুবে মরি/ কেনো যে বোঝো না সয় না দেরি।' আকরাম খানের আস্তানায় তার ব্যবসায়িক অংশীদার ও সরকারি আমলারা আসবেন; সেখানে তাদের মনোরঞ্জন করতে হবে লাইলীকে। এক ঘণ্টা ছয় মিনিট ৩০ সেকেন্ডে লাইলী আগত অতিথিদের সামনে গান ধরেন—'যে নারীর কারণে সবাই এলো দুনিয়ায়/ তারাই আবার সেই নারীকে বাজারে বিকায়/ এমন একটি মানুষও কী নাই হায় রে/ যে আমারে আদর করে বুকে দেবে ঠাই। ... নারী শুধু বিক্রি হওয়ার ধন/ নারী শুধু ভোগের প্রয়োজন/ হায়রে।'

এছাড়া এক ঘণ্টা ২১ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে বশিরা ও লাইলীর মিলনের পর—'এক দিল দিওয়ানা আমার দিল কেড়েছে/ এক দিনদুপুরে বুকে ছুরি মেরেছে/ ছুরি মেরে যাবার কালে নিজের ভুলে ধরা পড়েছে।' বশিরার তার বোনের কথা মনে হয়েছে, ঠিক তখনই (০১.২৯.৩৬) অপ্রাসঙ্গিকভাবে বোন শাহানা ও শাহেদের মধ্যে গান, 'তোমাকে চাই আরো কাছে/ তোমাকে বলার আরো কথা আছে/আমি বলতে পারি না মুখে তওবা তওবা/ দিলে জখম হলো উহু-আহা।'

এই দশকে ব্যবসা সফল এ জাতীয় আরো চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ইবনে মিজানের *জংলী রানী* (১৯৮০), *চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* (১৯৮৩), এফ কবীর চৌধুরীর *সুলতানা ডাকু* (১৯৮১), *পদ্মাবতী* (১৯৮৩), আজিজুর রহমান বুলির *লাভ ইন সিঙ্গাপুর* (১৯৮২), ইলতুৎমিশের *মাই লাভ* (১৯৮২), দেলোয়ার জাহান ঝন্টুর *নাগরানী* (১৯৮৩), শামসুদ্দীন টগরের *বানজারান* (১৯৮৩) প্রভৃতি।

অভিযোগ রয়েছে এসময় চলচ্চিত্রে সব ধরনের বাণিজ্যিক উপকরণই সংযোজিত হয়েছে। চলচ্চিত্রে যৌন সুড়সুড়ি দেওয়া অঙ্গভঙ্গি সহযোগে পরিবেশিত হয়েছে নাচ ও গানের দৃশ্য। ধর্ষণ ও 'শয্যা দৃশ্য' প্রয়োগের পাশাপাশি চলচ্চিত্রে তখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চুমুও এসেছে (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৭১)। এসব মুনাফার উদ্দেশে হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে। এসব অভিযোগ নিয়ে খুলনার 'শঙ্খ'-এর বুকিং এজেন্ট আনোয়ার হোসেন বেশ খোলামেলা কথা বলেন। তার ভাষ্য হলো—

> বাণিজ্যিক সিনেমা যদি করতে হয়, বাণিজ্যিকভাবেই করতে হবে। এদের তো দোষের কিছু নাই। দর্শক এগুলো দেখে যদি মজা পায়, তাহলে তো কোনো সমস্যা নাই। ঘরে বসে তো আমরা এখন অনেক কিছুই দেখি। তখন যেসব পোশাকি বা রাজকীয় সিনেমা হতো, তখন একটা সাধারণ গল্পের উপরে অনেক কিছু দেওয়া হতো। দর্শক সেগুলো খুব আনন্দ নিয়ে দেখতোও (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৪)।

আনোয়ারের কথার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় যশোরের পলাশ কুমার বোসের কথায়। তিনি বলেন, ”সেসময়ের *সওদাগর*, *রাজসিংহাসন*, *বাহাদুর*, *আল হেলাল* নামে পোশাকি সিনেমাগুলো খুব ভালো ব্যবসা করে। সব মানুষ তখন এগুলো দেখেছে। কোনো সমস্যা হয় নাই। অনেক মহিলা দর্শক সেসময় 'তসবির'-এ আসছে এসব সিনেমা দেখতে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৬)।”

এই দশকের একেবারে শেষের দিকে মুক্তি পায় *বেদের মেয়ে জোস্না*। ১৯৮৯ সালের ৯ জুন *বেদের মেয়ে জোস্না* মুক্তির পর সমকালীন অন্যান্য চলচ্চিত্রগুলো মার খেতে শুরু করে। এই একটা চলচ্চিত্রের

কারণে সামগ্রিক বাজারে এক ধরনের বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। এই চলচ্চিত্রটির সঙ্গে সেই সময় অনেকেই চলচ্চিত্র মুক্তি দিতে সাহস করেনি। কুমিল্লার লাকসামের তোফায়েল হোসেন বলেন,

> তখন চারদিকে *বেদের মেয়ে জোস্না* নিয়ে হৈ চৈ অবস্থা। যে সিনেমাহলে ওই সিনেমা চলে সেখানে হাজার হাজার দর্শক, অন্যগুলো প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এই সময়ে এখানে 'পড়শি'তে লাগালো *বেদের মেয়ে জোস্না*। আমরা পেলাম না; ফলে আমরা লাগালাম *সত্য মিথ্যা*। আলমগীর-শাবানার সেই সিনেমার কাহিনিও অসাধারণ। লাকসামের মানুষ সমান তালে *সত্য মিথ্যা*ও দেখলো, *বেদের মেয়ে জোস্না*ও দেখলো। সিনেমা ভালো হলে দর্শক দেখবেই (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৮)।

বেদের মেয়ে জোস্না লোককাহিনি নিয়ে হলেও সামরিক শাসনের সেই সময়ে এর কাহিনিতে রাজনৈতিক বার্তা ছিলো। ফরহাদ মজহার চলচ্চিত্রটির কাহিনিকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—

> অন্য কোনো ছবির মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু *বেদের মেয়ে জোস্নার* মধ্যে আমি এক কণা ফ্যান্টাসি দেখিনি। একজন রাজকুমারের সঙ্গে একটি বেদের মেয়ের প্রেম হওয়াটা হয়তো অসম্ভব কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। হতে পারে। যদি বিকৃতি অর্থে অস্বাভাবিক বুঝি আমরা তাহলে *বেদের মেয়ে জোস্নার* ঘটনা অস্বাভাবিক নয় (মজহার ২০০৮)।

গল্পের এই স্বাভাবিকত্ব চলচ্চিত্রটিকে কেবল লোককাহিনি করে রাখেনি, সেটাকে দর্শকের কাছে নিয়ে এসেছে। ফলে জোস্নার দুঃখ, কষ্ট, প্রতিবাদের সঙ্গে দর্শক একাত্ম হয়েছেন।

বেদের মেয়ে জোস্না শুরু হয় এক তরুণ বাবার আহাজারি দিয়ে। তার একমাত্র শিশুকন্যা সাপের কামড়ে মারা গেছেন। কলাগাছের ভেলায় তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ নদীতে ভেসে দেওয়া শিশুকে যদি কোনো ওঝা কূলে নিয়ে বিষ ঝেড়ে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন এই আশায়। জোস্নার ভেলা এসে ভেড়ে এক নিঃসন্তান বেদে দম্পতির কাছে। ভেলায় থাকা একটি চিঠি থেকে তারা জানতে পারেন এই শিশুর নাম জোস্না। জোস্নাকে সুস্থ করে তারা নাতি হিসেবে বড়ো করে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। দক্ষ বেদে হিসেবে জোস্না বড়ো হতে থাকেন।

একদিন বঙ্গরাজের বাড়িতে সাপ খেলা দেখিয়ে ফেরার পথে জোস্না উজিরের ছেলের কামুক বাসনার শিকার হলে রাজকুমার আনোয়ার তাকে রক্ষা করে মন জয় করে নেন। এরপর থেকে দুজনের প্রেম পর্ব শুরু হয়। অন্যদিকে উজির চান তার মেয়ে তারার সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে হোক। বাবার প্রণোদনায় উজিরকন্যা তারা লেগে থাকেন রাজকুমার আনোয়ারের পিছনে।

রাজকুমারের বন্ধু সেনাপতির ছেলে রাজ্জাক। সেজন্য উজিরের ছেলে ক্ষুব্ধ। কারণ সেনাপতির ছেলের চেয়ে মর্যাদায় উজিরের ছেলে বড়ো, এই সামন্ত হিসাব কাহিনিকে এগিয়ে নেয়ার পিছনে আরেকটি ক্রীড়ানক হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে রাজ্জাক ভালোবাসে উজিরের মেয়ে তারা'কে। কিন্তু তারা এই ভালোবাসাকে ধৃষ্টতা মনে করেন। কারণ রাজ্জাক সামান্য সেনাপতির ছেলে আর তারা উজিরের মেয়ে।

সামন্তীয় এই হিসাব-নিকাশও সংঘাত সৃষ্টি করে। আর আনোয়ার এর বাইরে চুপিসারে বেদেনির প্রেমে মাতোয়ারা। প্রেমের এই মুহূর্তে একদিন আনোয়ারের সঙ্গে দেখা করার কথা দিয়ে জোস্না দেরি করে আসলে আনোয়ার শুরু করেন, 'বেদের মেয়ে জোস্না আমায় কথা দিয়েছে/ আসি আসি করে জোস্না ফাঁকি দিয়েছে।'

ঠিক এই সময় ঘটে এক মর্মান্তিক ঘটনা। বাগানে ঘুরতে গিয়ে সাপে কামড় দেয় রাজকুমারকে। কোনো ওঝাই রাজকুমারকে বাঁচাতে এগিয়ে আসছিলেন না। কারণ এতে মরণবীণা বাজাতে হবে, তাতে মুখে রক্ত ওঠে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। এই অবস্থায় ঝুঁকি নেন জোস্না। বেজে ওঠে জোসনার মরণবীণ। বীণ বাজাতে বাজাতে মুখে রক্ত উঠলেও শেষ পর্যন্ত জোস্না, রাজকুমার দুজনায় বেঁচে যান।

জোস্নাকে বঙ্গরাজা বলেন, আমার একমাত্র ছেলের প্রাণ রক্ষার বিনিময়ে তুমি যা পুরস্কার চাও তাই দেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে জোস্না চান রাজকুমার আনোয়ারকে। বঙ্গরাজ জোস্নার এই চাওয়াকে ধৃষ্টতা মনে করেন এবং জোস্না তার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছেন বলে তিরস্কার করেন। জোস্নাও কম যান না, তিনি বঙ্গরাজার কথার তীরের জবাব দেন যৌক্তিক কথার তীর ছুঁড়ে। মজহার এই পরিস্থিতিটাকে বর্ণনা করেন এভাবে—

> জোস্নার মধ্যে দর্শকরা এক ব্যক্তিসত্তার দৃঢ় ও সাফ অভিপ্রকাশ দেখে। তার জড়তাহীন ব্যক্তিত্ববান স্পষ্ট উচ্চারণ এক অনির্বচনীয় সত্তার উপস্থিতি আমাদের টের পাইয়ে দেয়। তার এই ব্যক্তিসত্তা দর্শকদের টানে, আপ্লুত করে এবং যেহেতু এই ব্যক্তিসত্তা দর্শকদের মধ্যে ক্রিয়াশীল, ফলে চৈতন্যের মূলে যে শেকড় তার গোড়াসুদ্ধ টান পড়ে (মজহার ২০০৮)।

একপর্যায়ে গলা ধাক্কা দিয়ে রক্ত ঝরিয়ে জোস্নাকে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। রক্তাক্ত জোস্না বিদায়ের সময় রাজপ্রাসাদের মেঝে কপালের রক্তে রাঙিয়ে দিয়ে যান। এতে দর্শক কষ্ট পান ঠিকই, কিন্তু তাদের মনে রাজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারার প্রশান্তি কাজ করে। তারা জোস্নাকে তাদের প্রতিনিধি ভাবতে থাকেন।

রাজকুমার সুস্থ হয়ে সব শোনার পর পাগলের মতো জোস্নার খোঁজে বের হন এবং বাবার আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তাকে বিয়ে করে প্রাসাদে ফেরেন। বাবা-ছেলের বচসা তখন তুঙ্গে। নিজের অহঙ্কার রক্ষায় রাজার রাগ এতোই অসহনীয় মাত্রায় গিয়ে ঠেকে যে, রাজা নিজের ছেলের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে অবিলম্বে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। বঙ্গরাজের কথা, রাজকুমার ছোটো জাতের মেয়েকে রাজপ্রাসাদে তুলে তাদের আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ন করেছেন। রাজার আদেশ মতো জল্লাদ রাজকুমারকে হত্যা করতে উদ্যত হলে বঙ্গরানীর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে বঙ্গরানীর পরামর্শে রাজকুমার ও জোস্না অন্যত্র নির্বাসনে চলে যান।

নির্বাসনে রাজকুমার কাঠ কাটেন আর জোস্না ঘর সামলান। এদিকে উজিরের ছেলে (যে চলচ্চিত্রের শুরুতেই জোস্নার সম্ভ্রম নষ্ট করতে চেয়েছিলো) জোস্নাকে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যান। ছদ্মবেশে

উজিরের ছেলে জমিদারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তার প্রহরীকে হত্যা করে রক্তাক্ত খঞ্জর রেখে আসেন রাজকুমার ও জোস্‌নার কুঁড়েঘরের পাশের খড়ির গাদায়। রাজকুমার প্রহরীকে খুনের দায়ে আটক হন এবং জমিদারের কারাগারে তাকে চাবুকের আঘাত সহ্য করতে হয়। এই কারাগার থেকেই দর্শক শুনতে পায় জনপ্রিয় সেই গান 'আমি বন্দি কারাগারে/ আছি গো মা বিপদে/ বাইরের আলো চোখে পড়ে না মা'।

এদিকে রাজকুমারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বঙ্গরাজা নিজেও শোকে কাতর হয়ে পড়েন। সেনাপতির ছেলের রাজ্জাককে রাজ্যভার দিয়ে বঙ্গরাজ অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যদিকে এই পরিস্থিতিতে রাণী মা বাধ্য হয়ে রাজ্জাককে জানান রাজকুমারের বেঁচে থাকার কথা। এ খবর জেনে রাজ্জাক রাজকুমারকে খুঁজে বের করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেন।

রাজ্জাককে রাজ্যভার দিয়ে বঙ্গরাজ অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে উজির বিচলিত হন এবং বঙ্গরাজ্য কব্জা করার চক্রান্তে এবার তিনি মেয়েকে রাজ্জাকের দিকে লেলিয়ে দেন। কিন্তু বাবার এ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করেন মেয়ে তারা। রাজ্য ও সম্পদের লোভে তার বাবা-মা তাকে যেভাবে ব্যবহার করছে, সেটা তিনি মেনে নিতে পারেন না। একপর্যায়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন। তারা আত্মহত্যায় উদ্যত হলে, রাজ্জাক এসে তাকে বাঁচান। তারা বুঝতে পারেন রাজ্জাক তাকে প্রকৃতই ভালোবাসেন। আভিজাত্যের বিপরীতে প্রেমের সাম্য জয়লাভ করে। তারা ও রাজ্জাক মিলে এবার রাজকুমারকে বাঁচানোয় সংকল্পবদ্ধ হয়।

রাজকুমারের খোঁজ পেয়ে তারা রাজ্জাকের পরামর্শে ছদ্মবেশে পুরুষ সেজে যে জমিদারের কারাগারে রাজকুমার বন্দি রয়েছে সেখানে যান। সেখানে রাজকুমারের সন্ধান নিশ্চিত করে তারা খরব পাঠান রাজ্জাকের কাছে। বঙ্গরাজ এ খবর পেয়ে সন্তানকে উদ্ধারে পরগণার জমিদারের কাছে ছোটেন। ইতোমধ্যে খুনের মামলায় রাজকুমারের বিচার শুরু হয়ে গেছে।

কাজী বিচারের আসনে বসেছেন। সেখানেই হাজির হন বঙ্গরাজা। তিনি বিচারককে চিনতে পারেন, তিনি আর কেউ নন তারই ভগ্নিপতি। একে একে জানা যায়, এই কাজী আসলে জোস্‌নার বাবা। যদিও আগেই কাজীর সঙ্গে জোস্‌নার পরিচয় হয়েছিলো নদীতে পানি আনতে গিয়ে। কিন্তু কাজী তখন জানতেন না জোস্‌নার তারই হারানো মেয়ে।

কাজীর দরবারে সবাই উপস্থিত। আইন সবার জন্য সমান। এরই মধ্যে রাজ্জাক ঘটনার প্রকৃত দোষী উজিরের ছেলেকে সেখানে হাজির করেন। উজিরের ছেলে রাজকুমারের বিরুদ্ধে তার সব ষড়যন্ত্রের কথা নিজমুখে স্বীকার করেন। রাজকুমার মুক্তি পান। কিন্তু বাবা বঙ্গরাজের ওপর তীব্র অভিমানে রাজকুমার

আনোয়ার নিজের পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তারপরও শেষ পর্যন্ত বাবা-ছেলের মিলন হয়। আর জোস্না বেদের মেয়ে থেকে কাজীর মেয়ে হওয়ায়, তাকে বৌ হিসেবে স্বীকার করে নিতে বঙ্গরাজের আভিজাত্যে আর বাধে না। ছেলের ও ছেলের বউকে রাজা বরণ করে নেন।

জোস্নার এই কাহিনি নিয়ে 'শিক্ষিত' দর্শকের অবস্থানের সমালোচনার জবাব দেন ফরহাদ মজহার। তার ভাষায়,

> 'শিক্ষিত' বা আধুনিকমনস্ক' মধ্যবিত্তের চোখে এ সকল কাহিনী ফ্যান্টাসি মনে হবে। এই শ্রেণী সাধারণত তার নিজের সমাজ ও সংস্কৃতির কোনো খোঁজখবর রাখে না বা রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। গ্রামীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চেতনার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিটা যে আসলে কী সে সম্পর্কে এই শ্রেণীর মধ্যে আজতক কোনো গভীর অনুসন্ধিৎসা চোখে পড়েনি। অপরদিকে উন্নত দেশের দিকে তাকিয়ে যে মন ও মানসিকতার চর্চা এই শ্রেণী করে তা পর্যবসিত হয় নেহাতই অনুকরণে। কারণ সেসব তার বোধ ও অভিজ্ঞতার বাইরের জিনিস। সে আসলে বুঝতে পারে না নিজের একটা মনগড়া 'আধুনিকতা' নিয়ে বুক চিতিয়ে সমাজে পণ্ডিতি করে বেড়াচ্ছে। বলা যায়, সে না ঘরকা না ঘাটকা (মজহার ২০০৮)।

'মনগড়া' সেই আধুনিকাকে পিছনে ফেলে গ্রামীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো *বেদের মেয়ে জোস্না*। ফলে তা আর ফ্যান্টাসি কিংবা হালকা লোককাহিনি থাকেনি, হয়ে উঠেছে তাদের জীবন, না করতে পারা প্রতিবাদ। ফলে রাজকুমার আনোয়ার যখন সব বাধা ডিঙিয়ে বেদের মেয়েকে বিয়ে করে আনেন, এর ভিতরে সাধারণ মানুষ তাদের জয় দেখতে পান। জোস্না যখন তাদের ভাষায় রাজার সামনে দাঁড়িয়ে কঠোর প্রতিবাদ করেন, তখনও সেই প্রতিবাদ তাদেরকে ছুঁয়ে যায়। ফলে বেদের মেয়ে জোস্না আর রাজকুমার আনোয়ার তাদের প্রতিনিধি হয়ে হৃদয়ে আশ্রয় করে নেয়। এই সময়ের চলচ্চিত্র নিয়ে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার উমর আলী বলেন,

> এরপরে আসলো কাল্পনিক নানা কাহিনি নিয়ে সিনেমা। আমাদের এখানে সবচেয়ে বেশি মার্কেট পাইছিলো *বেদের মেয়ে জোস্না*। সিনেমাটা কাল্পনিক হলে কী হবে এতে কী যেনো একটা ছিলো, লোকজন সেটা মনোযোগ দিয়ে দেখতো। জোস্না কষ্টে আমি অনেককে কাঁদতে দেখেছি, আবার ওর খুশিতে সবার সে কী হাততালি। অন্যান্য সাপের সিনেমাগুলোও সেসময় ভালোই চলতো। *রাখাল বন্ধু* খুব মার্কেট পেয়েছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৮)।

৪.৭.১) চলচ্চিত্রের গান

৮০'র দশকের চলচ্চিত্রের গান নিয়ে নকলের অভিযোগ (সেন ২০১৫, পৃ৪৫) থাকলে এসব গান দর্শকের মন ছুঁয়ে যেতো বলে তারা দাবি করেন। আখ্যানের তথ্য-উপাত্তে অভিযোগ করা হয়, এখনই বরং মানুষ হিন্দি গান শোনে, আগে অনেকে চলচ্চিত্রের গানই শুনতো। তবে একথা ঠিক যে পাশ্চাত্যের সুরের প্রভাব দেশীয় চলচ্চিত্রের গানে থাকলেও সেখানে সুর অনুসরণের চেয়ে মেলবন্ধনের দিকে নজর

বেশি দেওয়া হতো। কিন্তু চলচ্চিত্রের গানে হিন্দি গানের সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্ধ অনুকরণের প্রবণতা আছে (সেন ২০১৫, পৃ৪৫)। কোথাও পুরো গানের সুরে শুধু হিন্দি শব্দের পরিবর্তে বাংলা শব্দের প্রয়োগ বা কোথাও বেশ কয়েকটি হিন্দি গানের সুরের পাঁচমিশালি প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায় । সংস্কৃতি কারখানার অংশ হিসেবে জনপ্রিয় সুর ও গান নকল হবে এটা পুঁজি প্রাধান্যশীল সমাজে নতুন কিছু নয়। এটা রোধ করাও এই সময়ে বেশ কঠিন।

তবে এর বাইরেও ৮০'র দশকের ভিন্ন চিত্রও আছে। দেশীয় চলচ্চিত্রে গান যখন নিজস্ব আদল পাচ্ছে বা পেয়ে গেছে, তার প্রায় সমান্তরালে দেশে চালু হয় রক মিউজিক। স্বশিক্ষিত কিছু মিউজিশিয়ান নিজস্ব মৌলিক গান সৃষ্টির নেশায় একত্র হয়েছিলেন চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম কলেজের কিছু উদ্যোমী শিক্ষার্থী ১৯৬৩ সালে গড়ে তোলেন 'জিঙ্গা শিল্পগোষ্ঠী'; দেশের প্রথম অর্কেস্ট্রা ব্যান্ড। পরে ৮০'র দশকে এসে তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠা ব্যান্ড মিউজিক একেবারে অর্বাচীন কিছু নয়, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রায় সমান্তরালে চলেছে তাদের অভিযাত্রা (আহসান ২০১৬, পৃ৪৭)। সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী পরিচালিত *ঘুড্ডিতে* (১৯৮০) নায়কের বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুর চরিত্রে দেখা যায় শিল্পী হ্যাপী আখান্দকে। তিনি 'কে বাঁশি বাজায় রে' গানটি পরিবেশন করেন চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য। ফোক গান ও রক মিউজিকের সমন্বয়ে করা এই গানটি সেসময় খুব জনপ্রিয় হয়। এছাড়া *ঘুড্ডির* 'আবার এলো যে সন্ধ্যা', 'ঘুম ঘুম ঘুম চোখে দেয় চুম', 'সখী চলো না জলসা ঘরে এবার যাই' গানগুলো দেশীয় চলচ্চিত্রের গান নতুন মাত্রা যোগ করে।

মূলত রক, ধ্রুপদ, ফোক ও আধুনিক বাংলা গানের একটা সমন্বয়ের চেষ্টা ছিলো গানগুলোতে। লাকী আখান্দে্র সঙ্গীত পরিচালনায় সেটা একটা মানও পেয়েছিলো। শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে এই গানগুলো নতুন আগ্রহ নিয়ে হাজির হয়। এই সময়ের চলচ্চিত্রের গান নিয়ে সিলেটের নুরুল ইসলাম বলেন, 'আগে সিনেমার গান ছিলো অসাধারণ। সেই গান এখন আর নাই। তখন অনেক দর্শক কেবল গান দেখার জন্য সিনেমা দেখতে আসতো। এখন তো মানুষ হিন্দি গান শোনে, আগে ৯৫ ভাগ মানুষ বাংলাদেশের সিনেমার গান শুনতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৫)।' একই ধরনের কথা বলেন লাকসামের মো. তোফাজ্জল হোসেন,

> আগে সিনেমায় একটা গান হলে তার সঙ্গে সিকোয়েন্স, কাহিনি, আকাশের আবহাওয়ার মিল থাকতো। সব কিছু মিল রেখে একটা গান করা হতো। এখন কিন্তু সেই গান হচ্ছে না। আগে প্রত্যেকটা সিনেমায় অন্তত একটা গান দর্শকের ভালো লাগতো, সেই গানের জন্য কখনো কখনো সিনেমা হিট হয়েছে। এখন সেটা হচ্ছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৮)।

গান নিয়ে যশোরের পলাশ কুমার বোসের বক্তব্য আরো জোরালো—"সিনেমা মানুষ দেখে কেনো—অভিনয়, কাহিনি, গান আর নায়ক-নায়িকার জন্য। আগের দিনের গান এখনো বাজালে মানুষ

দাঁড়িয়ে শোনে। আমি নিজেই তো সেদিন জসিমের সারেন্ডার সিনেমার ‘সবাই তো ভালোবাসা চায়/ কেউ পায় কেউবা হারায়’ গানটা শুনে দাঁড়িয়ে গেলাম (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৬)।”

তবে পপ বা ব্যান্ডসঙ্গীতে দেশে যারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাদের সবাই কোনো না কোনো সময় চলচ্চিত্রের গানে কণ্ঠ দিয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম পিলু মমতাজ, আযম খান, ফেরদৌস ওয়াহিদ, এম এ শোয়েব। ফলে এদের অংশগ্রহণ দেশীয় চলচ্চিত্রের গানে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তবে হিন্দি গানের সুরের অনুপ্রবেশ, পপ ও রকের কারণে বিভিন্ন ধরনের লোকজ সুরের প্রভাব এই দশকে হ্রাস পেতে থাকে (সেন ২০১৭, পৃ৬৭)। তারপরও কিছু গানে লোকসুর ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু তাতে লোকসুরের যে বৈচিত্রময়তা বা যথাযথ প্রয়োগ তা খুব বেশি দৃষ্টিগোচর হয়নি চলচ্চিত্রের গানে। তবে এ দশকেও লোক সুরাশ্রিত গান জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলো, উদাহরণ হিসেবে *বেদের মেয়ে জোস্‌নার* (১৯৮৯) গানগুলোর কথা বলা যায়। এই সময়ের চলচ্চিত্রের গান নিয়ে যশোরের মোশারফ খান বলেন,

> সেসময় এধরনের মারাত্মক মারাত্মক গানের সিনেমা ছিলো। আগে একটা গান সৃষ্টি করতে পরিচালক, গীতিকার, শিল্পীর অনেক পরিশ্রম করতে হতো। এখন তো আর এগুলো হয় না। *ভাত দের* একটা গান আছে—কতো সাধলাম, কতো গো কাঁদলাম—এইটা গান আপনি শোনেন; শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাবে। আপনার ধরেন, *সোনা বউ* সিনেমার একটা গান আছে—আমি ধন্য হয়েছি ওগো ধন্য/ তোমারই প্রেমেরই জন্য; এই গানটা আমার মোবাইলফোনেও আছে। আপনি গানটা শুনলে বুঝতে পারবেন, গান কী জিনিস (আখ্যানের ক্রম ৪,৪.১৮)!

৪.৭.২) বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র

এই দশকে এফ ডি সি থেকে বের হয়ে একটি দল বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র নামে একটি আন্দোলন শুরু করেন। মূলত চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীদের নেতৃত্বেই এই ধারাটি পথচলা শুরু করে। মূলত ১৬ মি মি ক্যামেরা দিয়ে স্বাধীনভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণই এদের উদ্দেশ্য ছিলো। এই ধারার প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেন তানভীর মোকাম্মেল। নির্মলেন্দু গুণের ‘হুলিয়া’ কবিতা অবলম্বনে তিনি *হুলিয়া* (১৯৮৫) চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

তার চলচ্চিত্রটির নির্মাণ প্রক্রিয়া নানা কারণে কিছুটা বিলম্বিত হওয়ায়, পরে শুরু করেও আরেক চলচ্চিত্র সংসদকর্মী মোরশেদুল ইসলামের *আগামী*র (১৯৮৪) নির্মাণ সম্পন্ন হয় *হুলিয়া*র আগেই। *আগামী* নির্মিত হয়েছিলো পুরোপুরিভাবে ‘চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি’র কর্মীদের ব্যবস্থাপনায় ও সংগৃহীত অর্থে (মাযহার ২০০৮, পৃ৬৪)।

সেসময় এই চলচ্চিত্র দুটি চলচ্চিত্রমোদীদের আশাবাদী করেছিলো। কিন্তু এরপর দীর্ঘ সময় এই ধারার নিমার্তারা আর কোনো কাজ দেখাতে পারেনি। তারপরও কয়েকটি চলচ্চিত্রের কথা না বললেই

নয়—হাসিবুল ইসলাম আবীরের *বখাটে* (১৯৮৫), এনায়েত করিম বাবুলের *চাক্কী* (১৯৮৬), আবু সাইয়ীদের *আবর্তন* (১৯৮৮), তারেক মাসুদের *আদম সুরত* (১৯৮৯), খান আখতার হোসেনের *দুরন্ত* (১৯৮৯)। এই ধারার নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো সাধারণত বাণিজ্যিকভাবে প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হতো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি এস সি'র ছোটো কক্ষে, পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তন, বা বিভিন্ন শহরের ছোটো সাধারণ মিলনায়তনে প্রজেক্টর সংগ্রহ করে এগুলো প্রদর্শন করা হতো। এইভাবে বিকল্প উপায়ে এসব চলচ্চিত্র দর্শকের কাছে পৌঁছেছে। "বড়ো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে যেমন সাহিত্যের আন্দোলন যেমন করে এগিয়ে চলে তেমনটিই ছিল এই বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলন" (মাযহার ২০০৮, পৃ৬৫)।

"বাংলাদেশের 'বিকল্প' ধারার নির্মাতাদেরও অভিন্ন লক্ষ্য ছিলো—ভালো ছবি নির্মাণ। কারণ একমাত্র স্টুডিও এফডিসি থেকে যে ছবিগুলো নির্মিত হচ্ছিলো তা ছিলো শিল্প থেকে যোজন দূরে অবস্থানরত সস্তা বিনোদনধর্মী বাণিজ্যিক পণ্য মাত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু তরুণ ভালো, শিল্পসম্মত ছবি নির্মাণ করতে চাইলেন কিন্তু তাদের হাতে পয়সা ছিলো না। কিন্তু আশির মধ্যভাগে এই উদ্যমী তরুণরা ... এমন এক ধারায় ছবি করা শুরু করলেন যা একেবারে এফডিসির বাইরের ধারা। ... সবচেয়ে বড়ো কথা এরা ছবি পরিবেশনের দায়িত্বটাও নিজেদের কাছে তুলে নিলেন" (হক ২০০৬, পৃ৪৬)। এই আন্দোলনের নাম তারা বিকল্পধারা দিলেও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে তা মূল ইন্ডাস্ট্রির বাইরের হওয়ায় মূলত স্বাধীন ধারা ছিলো। স্বাধীন বা বিকল্প যে ধারাই বলি না কেনো মধ্য ৮০ তে এফ ডি সি থেকে বের হয়ে আসার এই সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী ছিলো বলেই ঘটনার পরবর্তী পরম্পরায় অন্তত মনে হয়েছে। চলচ্চিত্রনির্মাতা কামার আহমাদ সাইমনের বক্তব্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ঢাকায় বাসা কাম অফিসে বসে তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সাইমন বলেন,

> আপনাকে আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে, কারো বাড়ি নেত্রকোণা কিংবা পটুয়াখালীতে হোক, কিংবা বাংলাদেশের যেকোনো তল্লাটেই হোক; সিনেমা নিয়ে আপনার সামান্যতম যদি স্বপ্ন কাজ করে, তাহলে আপনার 'কাবা' হচ্ছে এফ ডি সি। আপনি বাড়ি থেকে রওনা দিতেন, পোটলা বেধে ঢাকায় এসে এফ ডি সি'র গেটে দাঁড়াইয়ে থাকতেন এবং কোনো একভাবে সেখানে ঢুকে যেতেন। সেটা শিল্পী, সাহিত্যিক হোক, সৈয়দ হক, গাফফার চৌধুরী, জহির রায়হান, আলমগীর কবির হোক, কী কাজী হায়াৎ হোক, যে কেউ খালি চলচ্চিত্রের চ-টা নিয়ে ভাবছে, তার 'মক্কা' কিন্তু একটা—এফ ডি সি। তার ফলে এই মক্কা যেকোনো লেভেলের, যেকোনো মেরিটের লোককে, সবগুলো রুচির লোককে একটা পয়েন্টে এনে সেখান থেকে ডেলিভারি দিচ্ছিলো। এটা নিয়ে আমি তারেক ভাইয়ের (তারেক মাসুদ) সঙ্গেও বিতর্ক করেছি, এটা নিয়ে অনেকে মাইন্ড করতে পারে; কিন্তু এটা নিয়ে যদি আমাকে কোট করেন তাহলে পুরোটা পরিষ্কারভাবে কোট করতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৫.২; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রধান জায়গাটাই ছিলো এফ ডি সি এবং সবার স্বপ্নই ছিলো সেখানে স্থান করে নেওয়ার। কিন্তু কিছু নির্মাতা, কলাকুশলী যখন সেখান থেকে বের হয়ে আসলো, তখনই সমস্যার শুরু হয়। সাইমনের ভাষায়,

> ’৮৬ তে শর্টফিল্ম ফোরামের আন্দোলনের ফলে এফ ডি সিতে থাকা মেধার পাইপলাইনটা কেটে দেওয়া হলো। ’৮৬ উত্তর যারা নিজেদেরকে মেধাবী মনে করে—সেটা লেখক, গায়ক, নির্মাতা হতে পারে—সে কিন্তু ভাবলো আর এফ ডি সিতে যাবো না। অথচ সারাদেশের যে কেউ চলচ্চিত্র নিয়ে ভাবলেই এখানে আসতো। এবং মেরিট অনুযায়ী একটা জায়গায় পৌঁছাতো। কেউ জহির রায়হানের সঙ্গে, কেউ কাজী জহিরের সঙ্গে, কেউ এফ কবীরের সঙ্গে অ্যাসিস্ট করতো। আমি বলছি যে, সে তার লেভেল এবং কোয়ালিটি অনুযায়ী সেগমেন্টেড হয়ে যেতো। ফলে এটার একটা সিনার্জি ছিলো, মানে একটা আরেকটাকে কমপ্লিমেন্ট করতো। কিন্তু ৮৬’র পর এটা শেষ হয়ে গেলো। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে, আপনি আপনার মাকে ডিসওয়ন করে বসে আছেন। এর ফলে কী হলো, পুরো ইন্ডাস্ট্রির বাইরে মেধার একটা পাইপলাইন তৈরি হলো। যে পাইপলাইনটা ৮৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত খুব শক্তিশালী ছিলো—যদিও সেটার অন্য একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও ছিলো। সেসময় কবিতা উৎসব হতো, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের জন্ম হয় ওই সময়েই। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনও তখন বিশাল একটা ফ্যাক্ট ছিলো। দেখেন, আপনার সামনে যদি রাবণ থাকে তাহলে আপনি রামায়ণ করতে পারবেন। সো এরশাদ ছিলো বলে আপনি রামায়ণ করেছেন (আখ্যানের ক্রম ৫.২; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

ফলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যে কমন বা সাধারণ জায়গাটা ছিলো সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো বিকল্পধারার কারণে। এটা পুরো ইন্ডাস্ট্রির জন্য যে কতো বড়ো ক্ষতির কারণ হয়েছিলো তা বোঝার জন্য আমাদের খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। সাইমন খুব আফসোস নিয়ে বলেন,

> ৭৫-এর পর থেকে ৮৫ পর্যন্ত আলমগীর কবির এবং তাকে ঘিরে যে উচ্ছ্বাসটা ছিলো এবং এটা যদি পরে এফ ডি সির ভিতরেই থাকতো, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না এর ইফেক্টটা কী হতো! যার ইফেক্টটা আমরা ভারতীয় চলচ্চিত্রে দেখছি। যেটা পশ্চিমবঙ্গেও আছে। পশ্চিমবঙ্গে আজ যে ঢেউটা আপনি দেখছেন, তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতে হবে। ওখানে ওরা কিন্তু কেউ মূল ইন্ডাস্ট্রি থেকে বের হয়ে গিয়ে সিনেমা বানাই নাই। এখানে এখন অনেক কিছু নিয়ে আপনার হাসি পেতে পারে, কিন্তু গত ২০–৩০ বছরে এফ ডি সিতে তো কোনো মেধাকে ঢুকতে দেওয়া হয় নাই। ফলে ৮৬ তে আমাদের একটা অনেক বড়ো ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতিটা আমরা আর কোনো দিন সামলিয়ে উঠতে পারি নাই। একটা ইন্ডাস্ট্রি যে জিনিসটা ঘটাতে পারে, সেটা এককভাবে ঘটানো সম্ভব নয় (আখ্যানের ক্রম ৫.২; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সমস্যা বুঝতে হলে এই সমস্যাটা বোঝা জরুরি। যা ঘটেছিলো এই ৮০’র দশকেই। ফলে একদিকে যেমন বাণিজ্যিকভাবে এই দশক খুব সফল হয়েছে, অন্যদিকে চলচ্চিত্রের কেন্দ্রে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছে বলে মনে হয়।

৪.৮) বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ

এই দশক দুটি সামরিক শাসনকে ধারণ করায় প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে তার প্রভাব চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলো। ৭০ দশকে জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের রাষ্ট্রীয় প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ায় (দেখতে পারেন তৃতীয় অধ্যায় ৩.৯) ৮০’র দশকে চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিকীকরণের পথ খুলে যায়। ফলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে

চলচ্চিত্রের পুঁজির প্রবাহে। প্রত্যেকটি সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থে কিছু মানুষকে অঢেল টাকার মালিক বানায় কিংবা কিছু মানুষ রাষ্ট্রের সমর্থনেই অঢেল টাকার মালিক বনে যান। এই কালো টাকা বিনিয়োগের একটি উর্বর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে চলচ্চিত্র। এই ব্যবস্থাও করে দেয় সরকারই। ১৯৮৩–৮৪ অর্থ বছরে সরকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রমোদ কর আদায়ের নতুন পদ্ধতি চালু করে যা 'ক্যাপাসিটি ট্যাক্স' নামে পরিচিত। ট্যাক্সের এই পদ্ধতি চালুর পর চলচ্চিত্রের ব্যবসা ও বিনিয়োগ দুটোই বেড়ে যায়। একদিকে যেমন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ হতে থাকে, অন্যদিকে চলচ্চিত্রও নির্মাণ বেড়ে যায়। ফলে জমজমাট বিনোদন বাণিজ্য চলতে থাকে।

১৯৮৫ সালে দেশে নির্মাণাধীন চলচ্চিত্রের সংখ্যা ছিলো ৩১১টি; প্রতিটি চলচ্চিত্র গড়ে ৩০ লাখ টাকা করে ধরলেও ওই সময় ৯৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিলো (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩০৭)। বিনিয়োগ ও ব্যবসা বেড়ে যাওয়ার কারণে ১৯৮৪–৮৫ সালের দিকে চলচ্চিত্রের শিল্পী কলাকুশলীদের পারিশ্রমিকও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। এই বিনিয়োগে বড়ো ধরনের সুযোগ নিয়েছিলো কালো টাকার ওই মালিকরা। দশকজুড়েই চলচ্চিত্রে মোটাদাগের পুঁজির প্রবাহ বজায় রাখার এটা ছিলো অন্যতম কারণ।

চলচ্চিত্রের ধরনগত জায়গা থেকে এই দশকে সামাজিক, লোককাহিনি ও ফ্যান্টাসি তিন ধারার চলচ্চিত্রই একসঙ্গে ব্যবসা করেছে। ফলে দর্শককে কোনো একটি বিশেষ ধরনের ওপর নির্ভর করতে হয়নি। একই সঙ্গে অভিনয়শিল্পীরও খুব বেশি অভাব ছিলো না। ৭০ দশকের অনেকে যেমন এই দশকে নায়ক-নায়িকার আসন ছেড়ে দিয়ে চরিত্রাভিনেতা হয়েছেন, আবার অনেক নতুন মুখও এখানে জায়গা করে নিয়েছেন। ফলে বিচিত্র চলচ্চিত্রের সঙ্গে বহুমাত্রিক অভিনয়শিল্পীকেও দর্শক নিজেদের পছন্দ মতো বাছাই করে নিতে পেরেছে। ফলে প্রেক্ষাগৃহগুলো ব্যবসা করেছে সারা বছরই।

৭০-এর দশকের চেয়ে চলচ্চিত্রের সমান্তরাল মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন ও ভিসিআর-এর প্রভাব খানিকটা বেড়েছে এই দশকে। যেকোনো নতুন প্রযুক্তি আসলে তার প্রভাব পুরনোগুলোর পড়েই, এটাই নিয়ম। এই ক্ষেত্রে ওই প্রযুক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে না করে তা কীভাবে অভিযোজন করা যায়, সেরকম পদক্ষেপই নেয়া সমীচীন। কিন্তু সরকার ভিসিআর-এর বিস্তার দেখে নানা ধরনের আইন-কানুন করার মধ্য দিয়ে এর গতি রোধের চেষ্টা করে। দৃশ্যত চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য এগুলো করছে বলে প্রতীয়মান হলেও সরকার মূলত রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যই এসব পদক্ষেপ নিয়েছিলো। এতে একদিকে যেমন চলচ্চিত্রের উন্নয়ন হয়নি, অন্যদিকে ভিসিআর অনেক দেরিতে দেশীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে অভিযোজিত হয়েছে। এর মধ্যেই অবশ্য শহুরে মধ্যবিত্তদের একটা অংশ টেলিভিশন ও ভিসিআর'কেই তাদের বিনোদন মাধ্যম করে নিয়েছেন। যার প্রভাব কিছুটা হলেও এই দশকের চলচ্চিত্র ব্যবসার ওপর পড়েছে।

আগেই বলেছি, এই দশকের চলচ্চিত্রে সামাজিক ও সামাজিক অ্যাকশন ঘরানার চলচ্চিত্রের পাশাপাশি লোককাহিনি ও ফ্যান্টাসি ধারার চলচ্চিত্রের প্রাধান্য ছিলো। সামাজিক ঘরানার চলচ্চিত্রে একধরনের সমাজ-বাস্তবতার প্রতিফলন থাকে। বিপরীতে লোককাহিনি ও ফ্যান্টাসি ধারার চলচ্চিত্রে সরাসরি সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। নমুনায়িত চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে লোককাহিনি ও ফ্যান্টাসি ধারার চলচ্চিত্রের প্রোটাগনিস্টরাও দর্শককে নানাভাবেই প্রভাবিত করেছেন। তা না হলে এই ঘরানার চলচ্চিত্রের এতো পরিমাণ ব্যবসা করার কথা ছিলো না। প্রতীকী অর্থেও সাধারণ দর্শক এসব চলচ্চিত্রের প্রোটাগনিস্টের ভূমিকায় তাদের ক্ষোভ, প্রতিবাদগুলো প্রশমনের সুযোগ পেয়েছেন।

এই দশকেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে বিকল্প ধারা নামে একটি নতুন চলচ্চিত্র আন্দোলনের পথচলা শুরু হয়। ৭০-এ জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যর্থ পক্ষটির উত্তরাধিকাররা, যারা মূলত চলচ্চিত্র সংসদকর্মী, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এফ ডি সি থেকে বের হয়ে একটি স্বাধীন ধারা তৈরির চেষ্টা করেন। এর ফলে যেটা হয়, দেশের চলচ্চিত্র মেধা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। নতুন ধারাটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে যেমন খুব বেশি কিছু করতে পারেনি, অন্যদিকে এফ ডি সি কিছুটা হলেও মেধা সঙ্কটে পড়েছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি এই বিভাজন থেকে হয়েছে বলে মনে হয়। যা পরবর্তী দশকগুলোতে কোনোভাবেই আর পুষিয়ে নেয়া যায়নি; বরং ক্ষতির মাত্রা দিন দিন বেড়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

নব্বই দশক : বিপর্যস্ত বাণিজ্য ও পুরুষালি বিনোদন

৫.১) সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

রাজনৈতিকভাবে চরম উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ৯০ দশকে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। সামরিক শাসন থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয় এই দশকের শুরুতে। এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশ গণতান্ত্রিক সরকারের নেতৃত্বে পথচলা শুরু করে।

এই দশকের শুরুতে নিম্নবিত্ত মানুষের শহরমুখী ঢল নামে। জীবন যাপনের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা না থাকলেও গ্রামের মানুষেরা শহরে আসতে থাকে। বিশেষ করে তিনটি বড়ো শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার দিকেই শহরমুখী জনস্রোতের বড়ো অংশ ধাবমান ছিলো। গ্রামীণ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় টুকটাক কাজ করে অন্তত বেঁচে থাকা যাবে, এই আশায় তারা শহরে আসতে থাকে। অন্যদিকে ১৯৯০ সালে বিশ্ব ব্যাংক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে আফ্রিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত সাহারা অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়। একই সঙ্গে তারা বাংলাদেশকে বিশ্বের পঞ্চম দরিদ্রতম দেশ হিসেবেও চিহ্নিত করে। পৃথিবীর অর্থনৈতিক মানচিত্রে সোয়া ১১ কোটি মানুষের ছোটো আয়তনের এই দেশটি মাত্র ১৭০ মার্কিন ডলার মাথাপিছু আয় নিয়ে তখন দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দরিদ্র দেশ হিসেবে পরিচিতি পায় (চৌধুরী ১৯৯০, পৃ৩১)। এমনকি ভুটানের চেয়েও বাংলাদেশের দারিদ্র্য প্রকট ছিলো। দারিদ্র্যের তলানিতে এসে ঠেকে এ দেশের ৫৭ ভাগ মানুষ।

তবে ১৯৯১ সালের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের অস্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধি। এই খাতে দেশে ১৯৭৬–৭৭ সালে নগণ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছিলো, যা পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২১-এ দাঁড়ায় এবং ১৯৯৯ সালে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় তিন হাজার। সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১৫ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যার শতকরা ৯৫ ভাগ নারী (আলী ২০০৭, পৃ৪৬৬)। এরফলে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয় তা ছিলো পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান। গ্রাম থেকে শহরমুখী ওই মানুষের অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় এবং অর্থনীতিতে নতুন একটি শ্রেণি যোগ হয়। যারা শহর থেকে টাকা রোজগার করে গ্রামে গিয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে থাকে। এরাই কিন্তু সেসময় রঙিন টেলিভিশন ও সিডি কিনেছেন। এই মানুষগুলো এসময়ের চলচ্চিত্রের একটা বড়ো দর্শকও ছিলেন।

৯০ পরবর্তী সময়ে প্রথম সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বাজেট পরিকল্পনায় উদারীকরণের পথে হাঁটেন। দেশ সয়লাব হয়ে যায় চীন, ভারত, কোরিয়াসহ নানা দেশের পণ্যে। বিশ্বায়ন আর মুক্তবাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে সরকার তখন এই সিদ্ধান্তগুলো নেয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে বেশ কয়েকটি শিল্প খাত এই অবাধ প্রতিযোগিতায় টিকেও যায়। কোনো কোনোটি আবার হারিয়ে যায়। তবে কোনো এক রহস্যজনক কারণে চলচ্চিত্র এই ব্যাপক উদারীকরণ প্রক্রিয়ার বাইরে ছিলো। ফলে যেটা হলো, অন্যান্য অনেক কিছু প্রতিযোগিতার মুখে পড়লো, কেবল চলচ্চিত্র ছাড়া। অথচ সে সক্ষমতা এই মাধ্যমটির ছিলো। প্রতিযোগিতায় না পড়াটা পরে ক্ষতির কারণ হয়েছে।

১৯৯০-এর আগস্টে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল এবং ঢাকাসহ সারা দেশে নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯০-এর ৩১ আগস্ট সরকার বৃটিশ প্রবর্তিত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল ও একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার দাবি মেনে নেয়। সংবাদ সম্মেলন করে ১৯৩৩ সালে প্রণীত যাত্রার লাইসেন্স এনডোর্সমেন্ট নীতিও বাতিল করা হয়। একই বছরের ২৪ আগস্ট উদ্বোধন করা হয় দেশের প্রথম নাট্য প্রশিক্ষণ স্কুল ‘থিয়েটার স্কুল’ এর। দুই হাজার প্রার্থী থেকে পরীক্ষা দিয়ে প্রাথমিকভাবে ৭০ জনকে এই স্কুলে ভর্তি করা হয়। এই কোর্স পরিচালিত হয় এক বছর মেয়াদী। এর ফলে অনেক তরুণ-তরুণী অভিনয়ের প্রাতিষ্ঠানিতক শিক্ষার সুযোগ পান। যদিও এর প্রভাব খুব একটা চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে পড়েনি। কারণ তখনও অভিনয় শিখে চলচ্চিত্রে কাজ করার যে সংস্কৃতি তা দেশে সেভাবে চালু হয়নি। এসব শিক্ষার্থী মূলত এখান থেকে বের হয়ে মঞ্চ ও টেলিভিশন নাটকে আগ্রহী ছিলো।

৫.২) একনজরে ৯০ দশকের চলচ্চিত্র

গত তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র মুক্তি পায় ৯০ দশকে ৭৪১টি (কাদের ১৯৯৩ ও আলম ২০১১)। ১৯৯৯ সালে সবচেয়ে বেশি ৯২টি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। গড়ে বছরে ৭৪টির বেশি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। ৮০'র দশকের পোশাকি-ফ্যান্টাসি ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ ৯০-এর দশকে কমে আসে। সেই জায়গা দখল করে নেয় টিনএজ প্রেমনির্ভর চলচ্চিত্র। তবে এই দশকের শেষের দিকে ঢাকাই চলচ্চিত্রে সহিংসতা ও যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। এবং পরের দশকে গিয়ে তা চরম আকার ধারণ করে।

৯০ দশকের শুরুতে এহতেশামের *চাঁদনী* (১৯৯১) বিস্ময়কর ব্যবসা করে। *চাঁদনী*র সফলতায় ৯০ দশকের চলচ্চিত্র নতুন মোড় নেয়। অনেকে (কাদের ১৯৯৩) মনে করেন, চলচ্চিত্রটির বিপুল ব্যবসার পিছনে অন্যতম কারণ ছিলো টিনএজ নতুন তারকা জুটি শাবনাজ ও নাঈম । শাবনাজ, নাঈম ছাড়াও এই দশকে বেশ কয়েকজন নতুন নায়ক-নায়িকার আগমন ঘটে। তারা দশকজুড়েই সুপারহিট চলচ্চিত্র উপহার দেন। ১৯৯১ সালে ব্যবসা সফল আরো চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে এ জে মিন্টুর *পিতা মাতা সন্তান* (১৯৯১), দেলোয়ার জাহান ঝন্টুর *নাচে নাগিন* (১৯৯১), রায়হান মুজিবের *কাজের বেটি রহিমা* (১৯৯১), মোস্তফা আনোয়ারের *কাসেম মালার প্রেম* (১৯৯১)।

১৯৯২ সালের শুরুতেই মুক্তি পায় কাজী হায়াতের *দাঙ্গা*। গতানুগতিক কাহিনির বাইরে রাজনীতিকে সম্পৃক্ত করে কাজী হায়াৎ *দাঙ্গা* নির্মাণ করেন। দর্শক *দাঙ্গা* গ্রহণ করে এবং ব্যবসা সফল হয়। একই বছর কাজী হায়াৎ নির্মাণ করেন কাছাকাছি ধাঁচের *ত্রাস*। এই চলচ্চিত্রটিও ব্যবসা করে। এর মধ্য দিয়ে নায়ক মান্না অভিনীত চলচ্চিত্রের কদর বাড়ে এবং নির্মাতা হিসেবে কাজী হায়াৎও গুরুত্ব পেতে থাকেন। এ বছর ব্যবসা সফল অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে শেখ নজরুল ইসলামের *চাঁদের আলো* (১৯৯২) ও মোহাম্মদ হোসেনের *আজকের হাঙ্গামা* (১৯৯২)। কাজী হায়াতের চলচ্চিত্র সম্পর্কে যশোরের নজরুল ইসলাম সোহেল বলেন, '৮০, ৯০-এর দশকে অনেক সিনেমা এখনো স্মৃতিতে ভাসে—*দায়ী কে*, *দাঙ্গা*, *সিপাহী*। কাজী হায়াৎ আগে মুক্তিযুদ্ধ, রাজনীতি, পুলিশ প্রশাসন নিয়ে সুন্দর সব সিনেমা করতো। তিনি এখন সিনেমা বানানোয় ঢিল দিয়েছেন (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২৬)।' সাতক্ষীরার দেবাহাটার 'লাইটহাউজ'-এর কর্মচারী শ্রী বিশ্বজিৎ কুমার ঘোষ বলেন, "সেসময় মান্না, রুবেলের যেকোনো সিনেমা লাগালেই ব্যবসা হতো। দুই সপ্তাহ সিনেমা চালাইয়া বৃহস্পতিবারও আমরা হাউসফুল পাইছি। 'ইছামতি' সিনেমাহলে সালমান শাহের *জীবন সংসার* আমরা টানা এক মাস চালাইছিলাম (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩৫)।"

ছবি : সংগৃহীত

*চাঁদনী*র প্রভাব কাটতে না কাটতেই ১৯৯৩ সালে নির্মাণ হয় সুপারহিট টিনএজ প্রেমনির্ভর চলচ্চিত্র *কেয়ামত থেকে কেয়ামত*। এই চলচ্চিত্রের "পরিচালক সোহানুর রহমান সোহান মৌলিক গল্পও বাছেননি, আবার নকল কাহিনীর দুর্নামও কুড়াতে চাননি। তিনি মুম্বাই থেকে সুপারহিট ছবি কেয়ামত সে কেয়ামত তক ছবির কপিরাইট নিয়ে শট বাই শট দৃশ্যায়ন করেন, এবং তাতেই ছবি সুপারহিট হয়" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬২)।

পরবর্তী সময়ে সালমান-মৌসুমী জুটি এবং আলাদাভাবে অন্য নায়ক-নায়িকার সঙ্গে জুটি বেঁধেও তাদের অভিনীত চলচ্চিত্রগুলো ব্যবসা করে। এছাড়া এ বছর *বাংলার বধু* (১৯৯৩), *নয়া বাইদানী* (১৯৯৩), *টাকার অহংকার* (১৯৯৩), *আখেরী হামলা* (১৯৯৩), *রূপের রানী গানের রাজা* (১৯৯৩), *প্রেম দিওয়ানা* (১৯৯৩), *চাঁদাবাজ* (১৯৯৩) ব্যবসা সফল হয়।

কেয়ামত থেকে কেয়ামত (১৯৯৩) মুক্তির পর সালমান শাহ অভিনীত বেশির ভাগ চলচ্চিত্র ব্যবসা সফল হয়। এসব চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে *স্নেহ* (১৯৯৪), *অন্তরে অন্তরে* (১৯৯৪), *বিক্ষোভ* (১৯৯৪), *দেনমোহর* (১৯৯৫), *স্বপ্নের ঠিকানা* (১৯৯৫), *মহামিলন*, *তোমাকে চাই* (১৯৯৬), *স্বপ্নের পৃথিবী* (১৯৯৬), *মায়ের অধিকার* (১৯৯৬), *জীবন সংসার* (১৯৯৬), *বিচার হবে* (১৯৯৬) ইত্যাদি। ১৯৯৬ সালে ৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সালমান অভিনীত বেশিরভাগ চলচ্চিত্র ব্যবসা সফল হয়। সালমানের মৃত্যুর আগে পুরোপুরি কাজ শেষ করে যাওয়া শেষ চলচ্চিত্র *সত্যের মৃত্যু নাই* (১৯৯৬)। এই চলচ্চিত্রটিও সুপারহিট ব্যবসা করে।

এই দশকের শেষের দিকে মান্নার সঙ্গে খলঅভিনয়শিল্পী হিসেবে হাজির হন ডিপজল। মান্না-ডিপজল জুটির কাজী হায়াৎ পরিচালিত *আম্মাজান* (১৯৯৯) সুপার-ডুপার হিট হয়। এর আগের বছর যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র বাসু চ্যাটার্জির *হঠাৎ বৃষ্টি* (১৯৯৮) বাংলাদেশ ও কলকাতায় সুপারহিট ব্যবসা করে।

৯০-এর আরো ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে *কালিয়া* (১৯৯৪), *বাংলার নায়ক* (১৯৯৫), *সিপাহী* (১৯৯৪), *লুটতরাজ* (১৯৯৭), *ধর* (১৯৯৯), *বিদ্রোহী বধু* (১৯৯৪), *আজকের শয়তান* (১৯৯৪), *স্বামী কেন আসামী* (১৯৯৭), *বাবা কেন চাকর* (১৯৯৭), *প্রাণের চেয়ে প্রিয়* (১৯৯৭), *কুলি* (১৯৯৭), *শান্ত কেন মাস্তান* (১৯৯৮), ভণ্ড (১৯৯৮), *রাঙাবউ* (১৯৯৮), *বিয়ের ফুল* (১৯৯৯) ইত্যাদি। নেত্রকোণার জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ব্যবসা সফল এসব চলচ্চিত্র নিয়ে বলেন এভাবে—

> *বাবা কেন চাকর* নামে যে সিনেমাটার কথা বললাম তার কাহিনিতে বাবা আসলেই চাকর হয়েছিলো। এই সিনেমার কাহিনির যে ফিনিশিং সেটা একেবারে অন্যরকম। সিনেমা দেখে কোনো মানুষ না কেঁদে বের হতে পারে নাই। সব বয়সের মানুষ এই সিনেমা দেখতে আসছে। সেসময় মান্না, সালমান শাহের সিনেমাগুলোও অন্যরকম ছিলো। এখন সেই সিনেমাও নাই, মানুষও আসে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২৭)।

গত তিন দশকের তুলনায় ৯০-এর দশকে ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হলেও শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখা যায়নি। এই দশকে বেশ কয়েকজন নতুন মুখ আসে, যারা চলচ্চিত্র ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তবে গবেষকরা মনে করেন, "এই দশকের যা কিছু ব্যবসায়িক অর্জন প্রায় সবটাই বলিউড প্রভাবিত" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬৪)। কারণ টিনএজ প্রেম, ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রগুলোর কাহিনির ধরন, নির্মাণ শৈলী এর অনেক কিছুই বলিউড থেকে নেওয়া। এই কথা পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। কারণ কাজী হায়াৎ-মান্না জুটি সামাজিক-অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র বানালেও তার নির্মাণশৈলীতে ভিন্নতা ছিলো। তারা সাধারণ দর্শকের খুব কাছে যেতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে সালমানের ফ্যাশন, অভিনয় দক্ষতায় টিনএজ নারী-পুরুষকে আর্কষিত হয়েছিলো। একের পর এক চলচ্চিত্রের ব্যবসা করায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলিউডের প্রভাব হয়তো ছিলো, কিন্তু তার সবটাই বলিউড দ্বারা প্রভাবিত এটা মেনে নেওয়া যায় না।

৯০ দশকে চলচ্চিত্র ধারার সঙ্গে গত তিন দশকের চলচ্চিত্র ধারার খুব কম মিল পাওয়া যায়। এই দশকে **প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের টিনএজ প্রেমনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়**। এবং এই ধারার চলচ্চিত্র দশকজুড়েই প্রভাব ফেলে। **৮০'র দশকে প্রতিনিধিত্ব করা পোশাকি-ফ্যান্টাসি ও লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র এই দশকে খুবই সামান্য পরিমাণ দেখা যায়**। *বেদের মেয়ে জোস্‌নার* (১৯৮৯) মতো এতো ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রের পরও এই ধারা পরে দশকে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি।

এই দশকে বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্র দেখা যায়; গীতি আর নাসরীন ও ফাহমিদুল হক (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬৩) এ ধরনের চলচ্চিত্রের একটা ফর্মুলা দিয়েছেন—'রাজনৈতিক গডফাদার-অসৎ পুলিশ-প্রতিবাদী নায়ক'। এই ধরনের চলচ্চিত্রে মূলত রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়। এই সব চলচ্চিত্র সেই অর্থে ঠিক সামাজিক ধারারও নয়, আবার রাজনৈতিক চলচ্চিত্রও নয়। তবে চলচ্চিত্রগুলোতে অ্যাকশন ও ভায়োলেন্সে ভরপুর ছিলো। **সামাজিক, রাজনৈতিক ও অ্যাকশন এই তিনটি ধারার চলচ্চিত্রের সমন্বয়ে মূলত এই মিশ্র ধারাটি গড়ে ওঠে**। এই ধারার বেশিরভাগ চলচ্চিত্রের নির্মাতা ছিলেন কাজী হায়াৎ এবং নায়ক মান্নাকে কেন্দ্র করে এগুলো নির্মিত হয়।

এই দশকে **খলচরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েও বেশকিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়**। মূলত হুমায়ুন ফরিদী, রাজীব ও পরে ডিপজলকে মুখ্য ভূমিকায় রেখে এসব চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। এই ঘরানার বেশিরভাগ চলচ্চিত্র অ্যাকশন নির্ভর হলেও তাতে প্রেম ছিলো। যেমন : *চাঁদাবাজ* (১৯৯৩), *দেনমোহর* (১৯৯৫), *বিশ্বপ্রেমিক* (১৯৯৫), লম্পট (১৯৯৬) *পালাবি কোথায়* (১৯৯৭), ভন্ড (১৯৯৮), *রাঙ্গাবউ* (১৯৯৯), *আম্মাজান* (১৯৯৯) প্রভৃতি। তবে **কেবল খলঅভিনয়শিল্পীকে মুখ্য করে চলচ্চিত্র এই দশকের আগে আর নির্মাণ হয়নি বললেই চলে**।

৮০'র দশকে *লড়াকু* দিয়ে মার্শাল আর্ট নির্ভর যে ধারা বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে তার ধারাবাহিকতা ৯০ দশকেও ছিলো। মূলত রুবেলকে মাথায় রেখে এসব চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে। তবে টিনএজ প্রেমনির্ভর চলচ্চিত্রের পাশাপাশি এই দশকে সামাজিক এবং সামাজিক অ্যাকশন ধারার প্রচুর চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। যদিও হক ও নাসরীন তাদের এক গবেষণায় দাবি করেছেন, ৯০-এর দশকে '... মৌলিক কাহিনীনির্ভর সামাজিক ছবির সংখ্যা শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকে' (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬৩)।

তাদের এ মূল্যায়ন যথাযথ মনে হয়নি। কারণ এই দশকের প্রত্যেক বছরে কমবেশি সামাজিক এবং সামাজিক অ্যাকশন ধারার মৌলিক কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে। বিশেষ করে শাবানা-আলমগীর জুটিকে ঘিরে অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ হয় এবং বেশ কিছু চলচ্চিত্র ব্যবসা সফলও হয়। এসব চলচ্চিত্রে শাবানা-আলমগীরকে স্বামী-স্ত্রী, ভাবী, বড়োভাই, টিনএজ সন্তানের বাবা-মা হিসেবে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে *গরীবের বউ* (১৯৯০), *মায়ের দোয়া* (১৯৯০), *স্ত্রীর স্বপ্ন* (১৯৯০), *পিতা মাতা সন্তান* (১৯৯১), *স্বামীর আদেশ* (১৯৯১), *স্ত্রীর পাওনা* (১৯৯১), *সান্ত্বনা* (১৯৯১), *অন্ধ বিশ্বাস* (১৯৯২), *ক্ষমা* (১৯৯২), *ঘরের সুখ* (১৯৯২), *বন্ধন* (১৯৯২), *অবুঝ সন্তান* (১৯৯৩), *বাংলার বধূ* (১৯৯৩), *জজ ব্যারিস্টার* (১৯৯৪), *শাসন* (১৯৯৪), *স্নেহ* (১৯৯৪), *বিদ্রোহী বধূ* (১৯৯৪), *সংসারের সুখ দুঃখ* (১৯৯৫), *গৃহবধূ* (১৯৯৫), *বাংলার মা* (১৯৯৬), *অজান্তে* (১৯৯৬), *সুখের স্বর্গ* (১৯৯৬), *সত্যের মৃত্যু নেই* (১৯৯৬), *স্নেহের বাঁধন* (১৯৯৭), *অগ্নিস্বাক্ষী* (১৯৯৮), *মিথ্যার মৃত্যু* (১৯৯৮), *মা যখন বিচারক* (১৯৯৮), *একটি সংসারের গল্প* (১৯৯৯), *ঘরে ঘরে যুদ্ধ* (১৯৯৯), *জবাবদিহি* (১৯৯৯) প্রভৃতি চলচ্চিত্রের কথা বলা যায়। এসব চলচ্চিত্র নিয়ে সাতক্ষীরার দেবাহাটার 'লাইটহাউজ'-এর দর্শক মহিবুল্লাহ সরদার বলেন, 'সালমান শাহের *জীবন সংসার*, *স্নেহ*, আলমগীর-শাবানার *পিতা মাতা সন্তান* এগুলো সেসময় খুব ভালো লাগছিলো। এখন তো পারিবারিক জীবন নিয়ে কোনো সিনেমা হয় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩৬)।' বরিশালের অরুণ চন্দ্র গোস্বামীও একই ধরনের কথা বলেন, 'সালমান শাহ যখন সিনেমা করছে, তখন তার মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা যেমন ছিলো, জীবনের অন্য অনেক বিষয়ও ছিলো। এখন তো খালি প্রেম। তাছাড়া আমাদের দেশে এখন ভালো কোনো নায়কও নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১)।'

সামাজিক ও সামাজিক অ্যাকশন ধারার চলচ্চিত্রের এই তালিকার বেশিরভাগই শাবানা-আলমগীর জুটির। কিন্তু এর বাইরেও আলমগীর-ববিতা, শাবানা-রাজ্জাক, রাজ্জাক-ববিতা, সোহেল রানা-শাবানা, জসিম-শাবানা, রাজ্জাক-রোজিনা জুটির প্রচুর সামাজিক এবং সামাজিক অ্যাকশন ধারার চলচ্চিত্র এ দশকে মুক্তি পায়।

৯০ দশকের একেবারে শেষের দিকে ঢাকাই চলচ্চিত্রে ভয়াবহ সহিংসতা ও যৌনতানির্ভর বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে। এসব চলচ্চিত্রে 'কাটপিস' নামে বিশেষ ধরনের যৌনদৃশ্য জুড়ে দেওয়া হতো। এই ধারার শুরুর দিকের চলচ্চিত্র মোহাম্মদ হোসেনের *রাঙ্গাবউ* (১৯৯৮), নাদিম মাহমুদের *এতিম রাজা* (১৯৯৮)। এর পরের দশকে এই ধরনের চলচ্চিত্র ভয়ঙ্কর রূপ ধারণা করে।

এছাড়া এই দশকের সাতিহ্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে একই নামে গৌতম ঘোষের *পদ্মা নদীর মাঝি* (১৯৯৩), সেলিনা হোসেনের উপন্যাস অবলম্বনে একই নামে *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৯৬) ও *হাঙ্গর নদী গ্রেনেড* (১৯৯৭) এবং সেলিম আল-দীনের নাটক অবলম্বনে *চাকা* (১৯৯৩)। এছাড়া বিকল্পধারার নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম *দুখাই* (১৯৯৮) ও তানভীর মোকাম্মেল *চিত্রা নদীর পাড়ে* (১৯৯৯) নির্মাণ করেন। এই দশকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মাণ হয়েছে নাসিরউদ্দিন ইউসুফের *একাত্তরের যীশু* (১৯৯৩), হুমায়ুন আহমেদের *আগুনের পরশমণি* (১৯৯৪) ও চাষী নজরুল ইসলামের *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৯৭)। মুক্তিযুদ্ধের এসব চলচ্চিত্র গতানুগতিক ন্যারেটিভ থেকে কিছুটা আলাদা ছিলো।

এবারে আসা যাক ৯০ দশকে গবেষণা আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দর্শক স্মৃতিতে যে চলচ্চিত্রগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোর ব্যাপারে। এই দশকে মোট ৬৩টি (সারণী ৫.১.১) চলচ্চিত্রের নাম পাওয়া গেছে দর্শক স্মৃতিতে। সবচেয়ে বেশিবার নাম এসেছে সামাজিক অ্যাকশন ঘরানার *আম্মাজান* (১৯৯৯)-এর এবং দ্বিতীয় অবস্থানে আছে টিনএজ প্রেমনির্ভর চলচ্চিত্র *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* (১৯৯৩)।

সারণী ৫.১.১ : ৯০ দশকের চলচ্চিত্র ও দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
১.	শিমুল পারুল	১	১৯৯০	দেলোয়ার জাহান ঝন্টু
২.	দোলনা	১	১৯৯০	শিবলী সাদিক
৩.	বাদশা ভাই	১	১৯৯১	দারাশিকো
৪.	ন্যায় অন্যায়	১	১৯৯১	এ জে মিন্টু
৫.	চাঁদনী	২	১৯৯১	এহতেশাম
৬.	মধু মালা মদনকুমার	১	১৯৯১	সাইদুর রহমান সাইদ
৭.	পিতা মাতা সন্তান	৪	১৯৯১	এ জে মিন্টু
৮.	অকৃতজ্ঞ	১	১৯৯১	শাহাদত খান
৯.	মালেকা বানু	১	১৯৯১	কামরুজ্জামান
১০.	কাসেম মালার প্রেম	২	১৯৯১	মোস্তফা আনোয়ার
১১.	কাজের বেটি রহিমা	১	১৯৯১	রায়হান মুজিব
১২.	নিঃস্বার্থ	১	১৯৯১	দেলোয়ার জাহান ঝন্টু
১৩.	রুবেল আমার নাম	১	১৯৯১	আমেদ সাত্তার
১৪.	দাঙ্গা	৭	১৯৯২	কাজী হায়াৎ
১৫.	গাড়িয়াল ভাই	২	১৯৯২	তোজাম্মেল হক বকুল
১৬.	মাটির কসম	১	১৯৯২	শিবলী সাদিক
১৭.	বেনাম বাদশা	২	১৯৯২	সোহানুর রহমান সোহান
১৮.	ত্রাস	১	১৯৯২	কাজী হায়াৎ
১৯.	আজকের হাঙ্গামা	১	১৯৯২	মোহাম্মদ হোসেন
২০.	টাকার অহংকার	১	১৯৯৩	হাফিজ উদ্দিন
২১.	পাগল মন	১	১৯৯৩	তোজাম্মেল হক বকুল
২২.	বাংলার বধূ	৯	১৯৯৩	এ জে মিন্টু
২৩.	নয়া লায়লা নয়া মজনু	১	১৯৯৩	হোসেইন আনোয়ার

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
২৪.	প্রেম দিওয়ানা	১	১৯৯৩	মনতাজুর রহমান আকবর
২৫.	**কেয়ামত থেকে কেয়ামত**	**১১**	**১৯৯৩**	**সোহানুর রহমান সোহান**
২৬.	হিংসা	১	১৯৯৩	মোতালেব হোসেন
২৭.	আগুনের পরশমণি	১	১৯৯৪	হুমায়ূন আহমেদ
২৮.	কালিয়া	১	১৯৯৪	দেওয়ান নজরুল
২৯.	রঙ্গীন সুজনসখী	১	১৯৯৪	শাহ আলম কিরণ
৩০.	সিপাহী	২	১৯৯৪	কাজী হায়াৎ
৩১.	আখেরী রাস্তা	১	১৯৯৪	সোহানুর রহমান সোহান
৩২.	বিদ্রোহী বধূ	১	১৯৯৪	ইস্পাহানী আরিফ জাহান
৩৩.	অন্তরে অন্তরে	১	১৯৯৪	শিবলী সাদিক
৩৪.	দেনমোহর	৩	১৯৯৫	শফি বিক্রমপুরী
৩৫.	সত্যের মৃত্যু নাই	৭	১৯৯৫	ছটকু আহমেদ
৩৬.	বাংলার নায়ক	১	১৯৯৫	দেওয়ান নজরুল
৩৭.	স্বপ্নের ঠিকানা	৪	১৯৯৫	আবদুল খালেক
৩৮.	তোমাকে চাই	৮	১৯৯৬	মতিন রহমান
৩৯.	স্বপ্নের পৃথিবী	১	১৯৯৬	বাদল খন্দকার
৪০.	বিদ্রোহী কন্যা	১	১৯৯৬	সোহানুর রহমান সোহান
৪১.	খলনায়ক	১	১৯৯৬	মনতাজুর রহমান আকবর
৪২.	সৈনিক	১	১৯৯৬	এহতেশাম
৪৩.	জীবন সংসার	৩	১৯৯৬	জাকির হোসেন রাজু
৪৪.	বিচার হবে	১	১৯৯৬	শাহ আলম কিরণ
৪৫.	মায়ের অধিকার	১	১৯৯৬	শিবলী সাদিক
৪৬.	স্বজন	১	১৯৯৬	সোহানুর রহমান সোহান
৪৭.	স্বামী কেন আসামী	১	১৯৯৭	মনোয়ার খোকন
৪৮.	প্রাণের চেয়ে প্রিয়	১	১৯৯৭	মোহাম্মদ হান্নান
৪৯.	বাবা কেন চাকর	২	১৯৯৭	রাজ্জাক
৫০.	দেশদ্রোহী	১	১৯৯৭	কাজী হায়াৎ
৫১.	কুলি	২	১৯৯৭	মনতাজুর রহমান আকবর
৫২.	কমলার বনবাস	২	১৯৯৭	ফিরোজ আল মামুন
৫৩.	লুটতরাজ	৩	১৯৯৭	কাজী হায়াৎ
৫৪.	মেয়েরাও মানুষ	১	১৯৯৮	মনোয়ার খোকন
৫৫.	তেজী	২	১৯৯৮	কাজী হায়াৎ
৫৬.	মধুরমিলন	২	১৯৯৮	বাদল খন্দকার
৫৭.	ভালোবাসার ঘর	১	১৯৯৮	মোতালেব হোসেন
৫৮.	গরীবের বিচার নাই	১	১৯৯৮	তোজাম্মেল হক বকুল
৫৯.	**আম্মাজান**	**১২**	**১৯৯৯**	**কাজী হায়াৎ**
৬০.	ধর	২	১৯৯৯	কাজী হায়াৎ
৬১.	বিয়ের ফুল	১	১৯৯৯	মতিন রহমান
৬২.	ভালোবাসি তোমাকে	১	১৯৯৯	মহম্মদ হান্নান
৬৩.	রাজা	১	১৯৯৯	মালেক আফসারী

সারণী ৫.১.২ : ৯০ দশকে দর্শক স্মৃতিতে থাকা চলচ্চিত্রের ধরন ও প্রাবল্য

চলচ্চিত্রের ধরন	প্রাবল্য
সামাজিক ধারার চলচ্চিত্র	২২
লোককাহিনি	৪
পোশাকি-ফ্যান্টাসি	৫
প্রেমমুখ্য চলচ্চিত্র	১০
সামাজিক অ্যাকশন ও অ্যাকশন	২১
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র	১

দর্শক স্মৃতিতে থাকা ৬৩টি চলচ্চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৯০ দশকেও দর্শক স্মৃতিতে সবচেয়ে বেশি ছিলো সামাজিক ঘরানার চলচ্চিত্রগুলো (সারণী ৫.১.২)। তবে এই দশকের সামাজিক ঘরানা খানিকটা ভিন্ন ধাঁচের ছিলো। এসব চলচ্চিত্রে দুই স্তরে প্রোটাগনিস্ট চরিত্র পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে বাবা-মা কিংবা বড়ো ভাই-ভাবী, দ্বিতীয় স্তরে তাদের সন্তান কিংবা সন্তানতুল্য ছোটোভাই-বোন। মূলত পারিবারিক সম্পর্কের টানাপড়েনগুলোকেই এসব চরিত্রে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। এছাড়া দুই স্তরের প্রোটাগনিস্টরা-ই আখ্যানে প্রাধান্য পেতো। এসব চলচ্চিত্র এই দশকে নারী দর্শককে খুব আকর্ষণ করেছিলো। বিশেষ করে একই চলচ্চিত্রে একদিকে আলমগীর, শাবানা, ববিতার অভিনয় নারী দর্শককে যেমন টেনেছে, অন্যদিকে সালমান-মৌসুমী-শাবনূরের উপস্থিতি টিনএজ দর্শককে আকৃষ্ট করেছে।

সামাজিক অ্যাকশন ও অ্যাকশন নির্ভর চলচ্চিত্রগুলো অন্য শ্রেণির দর্শক টেনেছে। বিশেষ করে কাজী হায়াৎ নির্মিত মান্না অভিনীত চলচ্চিত্রগুলো এক শ্রেণির দর্শক খুব আগ্রহ নিয়ে দেখেছেন। পরের দিকে অবশ্য এই জুটির সঙ্গে খলচরিত্রে যুক্ত হন ডিপজল। এই তিনজনের কেমিস্ট্রি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মনে অত্যন্ত প্রভাব ফেলে। এই দশকের প্রেমমুখ্য চলচ্চিত্রগুলোও টিনএজ দর্শকসহ নারীদের খুব টেনেছিলো। সব মিলিয়ে ৯০ দশকের মাঝামাঝির কিছু সময় পর পর্যন্ত এসব চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দর্শক কমবেশি দেখেছে। এর পরবর্তী সময়ে ঢাকাই চলচ্চিত্রে একধরনের বিপর্যয় নেমে আসে। এর মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রে নতুন দুটি ধারার সৃষ্টি হয় ‘সুস্থ’ ও ‘অসুস্থ’ চলচ্চিত্র।

৫.৩) চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর

একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের সেন্সর পুরোপুরি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এবং সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নেই এই বোর্ড পরিচালিত হয়। বিভিন্ন সময়ে সেন্সরবোর্ডে থাকা সদস্যদের পেশা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বোর্ড সবসময়ই রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের ভিড়ে ভারাক্রান্ত (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৯৯) ছিলো। ফলে এই কর্মকর্তারা চলচ্চিত্র নয়, অন্ধভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখেছেন। আপাত যৌনতাসর্বস্ব নাচের দৃশ্য কিংবা হুবহু বিদেশি চলচ্চিত্রের নকলের অভিযোগে দুই–একটি চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করে তারা দেখাতে চেয়েছেন, সেন্সরবোর্ড চলচ্চিত্রের জন্য কাজ করে। কিন্তু ভিতরের বিষয়টি মোটেও এরকম নয়।

বিশেষ করে রাষ্ট্রের যে আদর্শিক অবস্থান, সেখানে সামান্যতম স্বার্থগত টানাপড়েন হলে তারা ছাড় দেননি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯১ সালে আবু সাইয়ীদ নির্মিত *ধূসর যাত্রা* নিষিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে। ১৯৯১ সালের ১৭ নভেম্বর সেন্সর বোর্ডের তৎকালীন সচিব স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনী বাতিল করা হয়। চিঠিতে বলা হয়, "এই চলচ্চিত্রে বাংলাদেশ বা তার জনগণের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আচার ও পোশাকের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অখণ্ডতা বা ঐক্যের ওপর আঘাত করা হয়েছে" (রায়হান ১৯৯১, পৃ৫৮)।

৪৫ মিনিটের সাদাকালোয় নির্মিত চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধের প্রতিবাদে শর্টফিল্ম ফোরামের পক্ষ থেকে সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এতে বলা হয়, "ছবিটি দেখার পর আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে এর বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক হওয়াতেই সেন্সর বোর্ডের এই আপত্তি বা অভিযোগ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে ছবি করাকে যদি সেন্সর বোর্ড দেশের স্বাধীনতা বা অখণ্ডতার পরিপন্থী বলে মনে করেন তবে তা ক্ষমাহীন অপরাধ" (রায়হান ১৯৯১, পৃ৫৮)। স্মারকলিপিতে তারা অবিলম্বে *ধূসর যাত্রার* ছাড়পত্র দেওয়ারও দাবি জানান।

এছাড়া ১৯৯৪ সালে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রনির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *আগুনের পরশমণি* (১৯৯৪) ছাড়পত্র পাওয়া নিয়েও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। হুমায়ূন আহমেদ তার প্রথম চলচ্চিত্রটির অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে 'ছবি বানানোর গল্প' শিরোনামে একটি বই লেখেন। হুমায়ূনের ভাষ্যমতে, "সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা ছবি দেখলেন। তাঁদের অনেকের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তাঁরা আমাকে বোর্ড রুমে ডেকে পাঠালেন। বোর্ডের সভাপতি বললেন, ছবি ঠিক আছে তবে কয়েকটি ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরেই ছাত্রপত্র পাওয়া যাবে। আমি বললাম বিষয়গুলি বলুন। 'শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠ বাদ দিতে হবে, নগ্ন করে দুটি মানুষকে শস্তি দেয়া হচ্ছে সেটা বাদ দিতে হবে, পাকিস্তানী মিলিটারী কথাটা বাদ দিতে হবে। আমরা সার্কভুক্ত দেশ, আমরা এমন কিছু করতে পারি না যা সার্কের চেতনা ক্ষুণ্ন করে'" (আহমেদ ১৯৯৬, পৃ৮৪)।

ছবি : সংগৃহীত

যদিও হুমায়ূন আহমেদের অকাট্য যুক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণসহই চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়। কিন্তু সেটা হয়তো হুমায়ূন বলেই সম্ভব হয়েছিলো। কারণ নির্মাতার বাইরেও সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তার একটা অবস্থান ছিলো। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনকর্মী তারেক আহমেদ মনে করেন, "এ দেশে নির্মিত এমন একটা জীবনঘনিষ্ঠ ও শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র নেই, যা এই সেন্সরবোর্ডের রোষানলে পড়েনি। ... একদিকে এই সেন্সর বোর্ড যেমন সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ ও তার প্রদর্শনে বাধার সৃষ্টি করছে—অন্যদিকে তেমনি সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিবেশ যাতে সৃষ্টি না হয়—তাতে বাধা প্রদান করে চলেছে" (আহমেদ, ২৭ আগস্ট ১৯৯২)।

স্বাধীন দেশে সেন্সর বোর্ডের অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেন নির্মাতা, প্রযোজক, অভিনয়শিল্পী কাজী হায়াৎ। দেশের সংবিধানে বাক স্বাধীনতা থাকার পরও কেনো সেন্সর বোর্ড, তিনি এই প্রশ্ন তোলেন। মূলত চলচ্চিত্রকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্য সেন্সর বোর্ড চালু রাখা হয়েছে। সেন্সর বোর্ড অনেক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে শেষ করে দিয়েছে। কোনো নির্মাতা একটি সংলাপ ব্যবহার করে সেন্সর বোর্ডে সমস্যায় পড়লে কিংবা সেটা কেটে বাদ দেয়া হলে, তখন অন্য আরেকজন নির্মাতা তার চলচ্চিত্রে এধরনের সংলাপ ব্যবহারের ঝুঁকি নেননি। আর তখনই সেই নির্মাতা ভিন্ন পথ খুঁজেছেন। ৯০ দশকের শেষ দিকে কাটপিস সমৃদ্ধ যে চলচ্চিত্রগুলো মুক্তি পায় তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাজী হায়াৎ বলেন,

> ... তখন ওই নির্মাতা একটা কাজ করেছে—সংলাপের ওই অংশটা বাদ দিয়ে ছবিটি সেন্সরে জমা করেছে, সেন্সর হয়ে গেলে সেটা আবার জোড়া দিয়েছে। ফলে তা সেন্সরবোর্ডের হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ, সেন্সরবোর্ড কয়টা সিনেমাহলে গিয়েইবা পরে এটা দেখবে। আর যদি দেখেও, ইন্সপেক্টরকে কয়েকটা টাকা দিলেই হয়ে গেলো। এভাবেই চলতে থাকে। চোর যখন ছোটো চুরি করে সাহস পায়, তখন সে বড়ো চুরি করবেই। এছাড়া শোনা যায়, সেন্সরবোর্ডের সদস্যরাও পরিচালক-প্রযোজকদের কাছে এসব কাজের জন্য হাত পাতে, মানে টাকা দিলে কাজ হয়; আর তখনই একটু খোলামেলা দৃশ্য জুড়ে দিতে থাকে কোনো কোনো প্রযোজক-পরিচালক (আখ্যানের ক্রম ৫.১; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

প্রথম প্রথম অনেক দর্শক এগুলোকে খুব ভালোভাবে নিতে থাকে। ফলে ব্যবসা বেড়ে যায়। তখন অনেক প্রযোজক-নির্মাতাই এ সুযোগগুলো নিতে থাকেন। কাজী হায়াৎ আরো বলেন,

> এই পরিস্থিতি সেসময় শুরু হয়েছিলো একেবারে মন্ত্রণালয় থেকে। ফলে তখন সেন্সরবোর্ডের সদস্য হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা লেগে যায়। প্রতি সপ্তাহে তিন–চারটা করে সিনেমা সেন্সরে যেতো এবং প্রথা চালু হয়ে গেলো যে সেন্সরে গেলে—সে ভালো হোক আর মন্দ হোক—টাকা দিতেই হবে (আখ্যানের ক্রম ৫.১; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

কাটপিসযুক্ত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি একটা কারণ বটেই। কিন্তু এই ধরনের বিষয়গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণের চোখের বাইরে থেকে যায়। ফলে মনে হয় কোনো ব্যক্তি, কিংবা বিশেষ কোনো গোষ্ঠী এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

এদিকে ১৯৮৫–৮৬ থেকে ১৯৯২–৯৩ অর্থবছর পর্যন্ত টানা সাত বছর সরকারি অনুদান দেওয়া বন্ধ ছিলো। ১৯৯৩–৯৪ অর্থবছরে তিনটি চলচ্চিত্রকে অনুদান দেওয়া হয়। এরপর ১৯৯৪–৯৫ অর্থবছরে চারটি চলচ্চিত্রকে দেওয়া হয় ১১ লাখ টাকা করে অনুদান। ১৯৯৬–৯৭ অর্থবছরে অনুদানের টাকা বাড়িয়ে ১৫ লাখ করা হয়। অনুদান পাওয়া তিনটি চলচ্চিত্র, জাঁ নেসার ওসমানের *জননী*, নাসির উদ্দিন ইউসুফের *নিষিদ্ধ লোবান* ও মাসুম আজিজের *সনাতন গল্প*। এর মধ্যে নেসার ওসমান ও নাসির উদ্দিন ইউসুফ অনুদানের অর্থ গ্রহণ করেননি, চলচ্চিত্রও হয়নি। মাসুম আজিজকে প্রথম কিস্তি বাবদ পৌনে চার লাখ টাকা দেওয়া হলেও তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করতে পারেননি। এরপর তাকে মন্ত্রণালয় থেকে টাকা ফেরতের জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি চলচ্চিত্রটি নির্মাণের আগ্রহ প্রকাশ করে সহযোগিতা কামনা করেন। দ্বিতীয় কিস্তিতে তাকে আরো সাড়ে চার লাখ টাকা দেওয়া হয়। এরপর তাকে ২০১৫ সালের ২২ জুনের মধ্যে চলচ্চিত্রটি মুক্তির সময়সীমা বেধে দেওয়া হয়। এরপরও তিনি চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করতে পারেননি। তবে ২০১৯ সালে *সনাতন গল্প* নির্মাণ হয়েছে বলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে একটা খবর পাওয়া গেছে।

১৯৯৭–৯৮ অর্থবছর থেকে ১৯৯৯–২০০০ অর্থবছর পর্যন্ত আবার তিন বছর অনুদান বন্ধ রাখা হয় (জামান, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)। অনুদানের সমালোচনায় যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো, প্রত্যেক সরকারের সময় রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুদান দেওয়া হয় (জেয়াদ ২০১০, পৃ৩৪৭)। ৯০ দশকের অনুদান বিশ্লেষণ করলেও একই ধরনের বিষয় পাওয়া যায়। চাষী নজরুল ইসলাম, নাসির উদ্দিন ইউসুফ, জাঁ নেসার হোসেন, খান আতাউর রহমান, মাসুম আজিজ এদের প্রত্যেকের নির্মাতার বাইরে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিচয় আছে। এরা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুটি দলেরই সাংস্কৃতিক সহায়তাকারী হিসেবে পরিচিত।

এছাড়া এই দশকে অনুদান পাওয়া চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে হুমায়ূন আহমেদের *আগুনের পরশমণি* ছাড়া বাকি চলচ্চিত্রগুলোর সঙ্গে দর্শক সেভাবে পরিচিত-ই হতে পারেনি। বেশিরভাগ চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে চলেনি। এগুলো সাধারণত সরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে দেখানো হয়। বেশিরভাগ নির্মাতার যেনো উদ্দেশ থাকে কোনো রকমে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে সরকারি অর্থ জায়েজ করা। দুই–একটি চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলেও এক সপ্তাহ ধরেও কেউ তা প্রদর্শন করতে পারে না। এছাড়া অনুদানের চলচ্চিত্রগুলোর আধেয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশেষ ধরনের কিছু চলচ্চিত্রই কেবল অনুদান পেয়েছে। এর বাইরে কোনো চলচ্চিত্রেও অনুদান দেওয়া হয়নি। এমনকি অনুদান পাওয়া কোনো চলচ্চিত্র ব্যবসা করেছে, এমন নজির নেই বললেই চলে।

৯০ দশকে এফ ডি সি খানিকটা সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। অবশ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এধরনের একটা সঙ্কটের ইঙ্গিত ছিলো। কারণ দিনের পর দিন এফ ডি সি মূলত অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে

পড়ছিলো। ১৯৫৭ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সরকারের কাছে এফ ডি সির ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯ কোটি ৮২ লাখ টাকা। প্রতি বছর প্রকৃত লাভ কয়েক লাখ টাকা দেখানো হলেও সরকারি ঋণ মিলিয়ে এই সংস্থাটি সেসময় সম্পূর্ণ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৪১)।

চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য এফ ডি সি স্টুডিও ভাড়া, কাঁচা ফিল্ম, রাসয়নিক দ্রব্যাদি এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম বাকি ও ভাড়া দিয়ে প্রযোজকদের সাহায্য যেমন করে, একই সঙ্গে এসব খাত থেকে বিপুল পরিমাণ বকেয়া অর্থ তারা আদায় করতে পারেনি। দিনে দিন বকেয়ার এই পরিমাণ বেড়েছে। ১৯৯২ সালে এই বকেয়ার পরিমাণ ছিলো চার কোটি সাত লাখ ৮১ হাজার টাকা (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৪১)। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির পদে পদে দুর্নীতি যেনো জেকে বসেছিলো।

এর বাইরে আরেকটি সমস্যাও প্রকট আকার ধারণ করে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এফ ডি সিতে সেসময় প্রাযুক্তিকভাবে খুব বেশি উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ছিলো না। আর যে কয়টা ছিলো সেগুলো চালানোর মতো দক্ষ কুশলীর অভাব ছিলো। এমনকি দক্ষ লোকের অভাবে অনেক দামী ও নতুন যন্ত্র নষ্ট পর্যন্ত হয়ে গেছে। ফলে চলচ্চিত্র নির্মাণে এফ ডি সি সেই অর্থে কোনো উন্নত প্রাযুক্তিক সহায়তা দিতে পারেনি। এফ ডি সি প্রবর্তিত ক্রেডিট প্রথাকে নির্মাতা তারেক মাসুদ ব্যাখা করেছেন এভাবে—

> এই সিস্টেম আদৌ কি ঢালিউড চলচ্চিত্রের বিকাশে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে? নাকি একটি স্বাভাবিক প্রতিযোগিতামুখী মনোভাবে স্থবিরতা সৃষ্টি করছে? এফডিসির ল্যাব, শব্দ গ্রহণ, মিশ্রণ, সম্পাদনা, এমনকি ক্যামেরাসহ বিভিন্ন সার্ভিসের মান যথেষ্ট ভালো না বলে স্বাধীন ধারার প্রায় সব ছবির পরিস্ফুটন, মুদ্রণ, শব্দ মিশ্রণ, এমনকি সম্পাদনার কাজ ভারতে গিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। অতি সম্প্রতি ক্যামেরাও ভারত থেকে এনে ভাড়া করে ব্যববহার করা হচ্ছে (মাসুদ ২০১২, পৃ৯৭)।

তারেকের একথায় অবশ্য একেবারে ভিন্ন এক ইঙ্গিত আছে। যে ইঙ্গিতে তিনি এফ ডি সির পুরো সিস্টেম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এবং এই সিস্টেম যে চলচ্চিত্র নির্মাণে বাধা তাও বোঝাতে চেয়েছেন।

ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও এফ ডি সি স্বচ্ছ অবস্থানে থাকতে পারেনি। সৃজনশীল, অপেক্ষাকৃত কম পুঁজির তরুণ নির্মাতারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সংস্থা থেকে ঋণ বা বাকির সুবিধা পায়নি। মূলত প্রভাবশালী ও অধিক পুঁজির মালিক নির্মাতা ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানই এসব সুযোগ পেতো (কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৪২)। ফলে চলচ্চিত্র উন্নয়নের যে চিন্তা থেকে এফ ডি সি সেসসয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো, সেই অবস্থান থেকে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি বেরিয়ে এসেছে।

এছাড়া চলচ্চিত্রের দ্রুত বাজারজাতকরণ এবং নতুন কোনো নির্মাতার চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার পর তাকে নানা রকম সহায়তা করার ক্ষেত্রেও এফ ডি সি যে ভূমিকা রাখতে পারতো তাতেও সংস্থাটি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। স্বাধীনতার পর এফ ডি সি যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিবেশনার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলো। কিন্তু এই উদ্যোগে তারা সফল হয়নি। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ন্যাশনাল

ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ১৯৯২ সালে শেষ হওয়া ৭ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় (Eight Five year plan, 1992-1997) নিজেরা এবং যৌথভাবে ৩৬টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। এছাড়া পুঁজি সরবরাহ করেছে ২০০ চলচ্চিত্রে।

সবমিলিয়ে এফ ডি সি তিন দশক পার করে এসে মূলত দেশীয় চলচ্চিত্রের উন্নয়নে খুব বেশি কিছু করতে পারেনি। একথার প্রমাণ পাওয়া মেলে সংস্থাটির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা মনোয়ারের কথায়। ১৯৯১ সালে পাক্ষিক 'আনন্দ বিচিত্রা'য় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন,

> আপাতঃ দৃষ্টিতে চলচ্চিত্র উন্নয়নে এফডিসি কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না, তা অবলীলায় বলা যায়। শুধু 'র' ম্যাটেরিয়ালম বিক্রি এবং ফ্লোর ভাড়া দেয়া ছাড়া এই সংস্থার আর কিছুই করনীয় নেই। ... আমার মতে এদেশের চলচ্চিত্রের উন্নয়নে এই সংস্থাটিকে আরও সক্রিয় গঠনমূলক করা উচিত (উদ্ধৃত, কাদের ১৯৯৩, পৃ৩৪৪)।

৯০ দশকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিক্ষায় তেমন কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। বর্তমান চলচ্চিত্রশিক্ষার পরিস্থিতি নিয়ে যশোরের মো. তোফাজ্জলের মন্তব্য হলো,

> আমাদের অনেক নায়ক-নায়িকা আছে, তারা আদতে অভিনয়-ই জানে না। অভিনয় শেখার জন্য এখানে কোনো প্রতিষ্ঠানও নেই। ফলে যে কেউ হঠাৎ করে এসেই অভিনয় করতে চায়, সিনেমা করতে চায়। অথচ ভারতে এরকম নয়। ওখানে ফিল্মের ওপরে স্কুল আছে। সেখানে এগুলো শেখানো হয়। এটা আমাদের একটা বড়ো দুর্বলতা (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৯)।

তবে ১৯৯৪ সালে চলচ্চিত্রশিক্ষা নিয়ে একটি উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। পদ্ধতিগত চলচ্চিত্রশিক্ষা ও গবেষণার জন্য দেশের ১০ জন চলচ্চিত্রনির্মাতা, গবেষক, শিল্পী ও কুশলী মিলে '৯৪ এর অক্টোবরে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র অধ্যয়ন কেন্দ্র' (বা চ অ ক) নামে একটি চলচ্চিত্রশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করে। এই কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৯৯৫ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ১৭টি চলচ্চিত্র অধ্যয়ন কোর্সও সম্পন্ন হয়। এরা চলচ্চিত্রের ওপর 'চলচ্চিত্রবিদ্যা' (২০০৪) নামে একটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে। কেন্দ্রের প্রধান কোর্স সমন্বয়কারী লেখক ও গবেষক অনুপম হায়াৎ গ্রন্থটি রচনা করেন।

এছাড়া ১৯৯৮ সালে এম আবদুস সামাদের উদ্যোগে 'ফিল্ম ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ' নামে প্রতিষ্ঠান চালু হয়। তবে এ নিয়ে এর বেশি কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৯৯৯ সালে নবতর ব্যবস্থাপনায় আলমগীর কবিরের 'ঢাকা ফিল্ম ইন্সটিটিউট'ও চালু হয় বলে তথ্য পাওয়া যায় (জেয়াদ ২০১০, পৃ৪৫১)। কিন্তু সেটা নিয়েও পরে কোনো অগ্রগতি চোখে পদে না। সিলেটের 'নন্দিতা'র সুপারভাইজার হারুন অর রশীদ মনে করেন, 'আজ যদি বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শেখার ভালো কোনো প্রতিষ্ঠান থাকতো তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরা আরো ভালো করতো। আমাদের ছেলেমেয়েদের চিন্তা ভালো কিন্তু সিনেমা বানাতে পারে না।'

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ১৯৯২ সালের ১০ অক্টোবর দেশটির দ্বিতীয় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও কলকাতায় ৩৯ দশমিক ৩৬ একর জমির ওপর ইন্সটিটিউটটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অন্যদিকে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা হয় Institute for the study for Film Art নামে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান (কাদের ১৯৯৩, পৃ৫২৪)। খুলনার 'সোসাইটি সিনেমা'র হিসাবরক্ষক মো. নাসিম বলেন, 'ভারতে অভিনয়, ফটোগ্রাফি, পরিচালনার জন্য ইন্সটিটিউট আছে। বাংলাদেশে তেমন কোনো ইন্সটিটিউট নাই। এরফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো কিছু করতে পারছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩)।' ভারত সরকার সে সময় খুব ভালোভাবেই বুঝেছিলো অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়নে চলচ্চিত্র শিক্ষার বিকল্প নেই। অথচ এদেশে বহুবার উদ্যোগ নিয়েও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় একটি ফিল্ম ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা যায়নি।

৫.৪) চলচ্চিত্রের সমান্তরাল শিল্পকলা ও গণমাধ্যম

৮০'র দশকে ভিসিআর-এর যে প্রভাব ছিলো, ৯০ দশকে তা খুব বেশি কমেনি। প্রাযুক্তিক বিবর্তনে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি) প্লেয়ার; রঙিন টেলিভিশন সেটের পরিমাণ বেড়েছে, এসেছে ডিস অ্যান্টেনা। এর সবগুলোর কমবেশি প্রভাব চলচ্চিত্রের ওপর ছিলো। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তের বাইরে ভিসিআর-এর দর্শকও ছিলো মূলত টিনএজ ছেলেরা। তারা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে শাবনাজ, নাঈম, সালমান শাহ্, মৌসুমী, মান্নার চলচ্চিত্র দেখেছে ঠিকই, কিন্তু ঘরে ফিরে বা পাড়ায় ভিসিআর দেখার জায়গায় তারা দেখেছে মূলত হিন্দি চলচ্চিত্র আর পর্নোগ্রাফি।

ফলে একদিকে প্রেক্ষাগৃহ একধরনের, অন্যদিকে ভিসিআর আরেক ধরনের বিনোদন চাহিদা মিটিয়েছিলো। ঢাকা শহরসহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে গড়ে ওঠা ব্যাচেলর মেস ও ছাত্র মেসগুলো ভিসিআর দেখার অন্যতম জায়গা ছিলো। তারা সুযোগ পেলেই পুরো রাতের জন্য রঙিন টিভিসহ ভিসিআর ভাড়া করে হিন্দি চলচ্চিত্র ও পর্নোগ্রাফি দেখতো। বিশেষ করে মেসগুলোতে পর্নোগ্রাফি দেখাই ছিলো ভিসিআর ভাড়া করার প্রধান কারণ। মেস সদস্যদের সম্মিলিত চাঁদার টাকায় এই ভিসিআর ভাড়া করা হতো।

৯০ দশকে গ্রামের দিকেও ভিসিআর ভাড়া শুরু হয়। গ্রামে অবশ্য ভাষার কারণে ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্রগুলো বেশি জনপ্রিয় ছিলো। সন্ধ্যার দিকে বাড়ির বড়ো-ছোটো সবাই মিলে ভাড়া করা সেই ভিসিআর দেখা হলেও, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর দখল চলে যেতো যুবকদের হাতে। গভীর রাতে তারা মূলত পর্নোগ্রাফিই বেশি দেখতো।

রঙিন টেলিভিশনের কারণেও ভিসিআর এর চাহিদা এই দশকে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিলো। কারণ বাস্তবের মতো একইরকম দেখানোর ক্ষমতা রঙিন টেলিভিশনের ছিলো। ফলে সাদাকালো টেলিভিশন দেখা দর্শকের কাছে এটা ছিলো জাদু-বাস্তবতা। ১৯৯২ সালের জানুয়ারির এক পরিসংখ্যান মোতাবেক

বাংলাদেশে তখন মোট ছয় লাখ ৩৭ হাজার ২৭২টি টেলিভিশন সেট ছিলো। এর মধ্যে সাদাকালো সেট চার লাখ ৫৯ হাজার ৩৬৭টি এবং রঙিন এক লাখ ৭৭ হাজার ৯০৫টি (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৫৬)। সময়ের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হারে রঙিন টেলিভিশন সেটের সংখ্যা বেড়েছে।

৮০'র দশকে নানা কারণে প্রেক্ষাগৃহ থেকে যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বেরিয়ে গিয়েছিলো, তারা ৯০ দশকের শুরুতে মাঝে মাঝে প্রেক্ষাগৃহে ফিরলেও, বিনোদনের মূল জায়গা ছিলো টেলিভিশন এবং ভিসিআর। খুলনার নাঈম বলেন,

> আগে মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা চাল বাঁচিয়ে রাখতো; কারণ সবাই মিলে সিনেমা দেখতে যাবে। এই মহিলারা এবার সমিতি থেকে লোন নিয়ে টিভি কেনা শুরু করলো। সবাই ডিসের লাইন নিয়ে বাসায় বসে দেখে। এদিকে সিনেমাহলের দর্শক কিন্তু কমতেছে। আমরা বুঝতে পারছিলাম ধীরে ধীরে দর্শক কমছে। কিন্তু তখন কিছুই করার ছিলো না। রঙিন টেলিভিশন, ডিসকে আপনি অস্বীকার করবেন কীভাবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৭)?

১৯৯১ সালের শুরুতে দেশে ডিস লাইনের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে সিএনএন ও বিবিসি'র সম্প্রচার চালু হয়। আরো পরের দিকে শহরে ক্যাবল টিভির মাধ্যমে সুযোগ তৈরি হয় ভারতীয় ও ইংরেজি চলচ্চিত্র দেখার। "সিএনএন এবং বিবিসি শুরুতে এলেও ভারতের স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো আমাদের পাড়াতুতো ডিশ ব্যবসায়ীদের কল্যাণে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয় বিশেষত মধ্যবিত্ত দর্শকের মাঝে। যারাই প্রকৃত অর্থে ছিলেন সিনেমার দর্শক। সত্তর দশকের শেষদিকে পুরান ঢাকার বেগমবাজার, সিদ্দিকবাজারসহ কোনো কোনো পাড়ায় ১০ থেকে ৫০ টাকা দিয়ে কেনা ভিসিআরে দেখা *শোলে* আর *মুদাদ্দার কি সিকান্দার* অনেক ঝকঝকে রূপ নিয়ে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর কল্যাণে যেন ঘরে ঘরেই পৌঁছে গেল তখন" (আহমেদ ২০১৮, পৃ১১৩–১১৪)। তবে গ্রামে স্যাটেলাইট টেলিভিশন আসতে আরো সময় লেগেছে। সাতক্ষীরার দেবাহাটার 'লাইটহাউজ'-এর দর্শক আফজাল হোসেন বলেন,

> রঙিন টেলিভিশন আর ডিসলাইন একটা অন্যরকম জিনিস। প্রথমে এটা আমরা বুঝতে পারি নাই। তখন সাতক্ষীরা শহরে যারা থাকতো তাদের কাছে আমরা খালি গল্প শুনতাম। ওরা এসে বলতো বড়ো একটা অ্যান্টেনা নাকি লাগাতে হয়; সারাদিন হিন্দি গান আর সিনেমা চলে। আমাদের দেবাহাটায় অবশ্য অনেক পরে এটা আসছে, এর আগে আমরা ভিসিআর-এ সিনেমা দেখতাম আর 'ইছামতি'তে যেতাম। কিছু দিন পরে অবশ্য 'লাইটহাউজ' হলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩২)।

এদিকে মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের যে ক্ষমতা সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দর্শককে ধরে রাখা কিংবা দর্শকের সঙ্গে থাকার এক অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে টেলিভিশনের। তাই টেলিভিশন নিয়ে চলচ্চিত্রশিক্ষক, তাত্ত্বিক গাস্তঁ রোবের্জ এর ভাষ্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—

> টেলিভিশন আমার কাছেও আসে না, আমাকে টেনেও নিয়ে যায় না। সে শুধু আছে। তা শুধুই উপর-ভাসা ছবি, আমি যোগ দিলাম কি না দিলাম, তাতে তার কিছু এসে যায় না; এমন কি আমি আছি না আছি তাতেও তার কিছু এসে যায় না। টিভির ছবি একাই নিজের মত দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে চলে। উপস্থাপনের সময়েই কোনও দর্শক নেই, এমন মঞ্চনাটকের কল্পনা করা যায় না। চলচ্চিত্রেরও দর্শকের প্রয়োজন, যদিও দর্শকের উপস্থিতি হতে পারে নানা স্থানে, নানা সময়ে। কিন্তু টেলিভিশন সর্বদাই আছে। বিদ্যুৎ-সরবরাহের মতই, আপনি প্লা করুন বা নাই করুন, টিভি হাজির (রোবের্জ, গাস্তঁ ২০০৪, পু১৩৯)।

দর্শকের সঙ্গে জোকের মতো লেগে থাকা এই যন্ত্রটিতে যখন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়, তখন তা প্রেক্ষাগৃহে দেখানো চলচ্চিত্রের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশও তাই হয়েছে।

এদিকে প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে কিছু দিনের মধ্যে সিডি প্লেয়ার চলে আসে। ভিসিআর-এর একটা বড়ো সমস্যা ছিলো, এর ক্যাসেট অনেকবার ব্যবহারের কারণে পর্দায় ছবির মান খুব ভালো হতো না। অনেক সময় টেলিভিশনের পর্দা ঝিরঝির করতো, কাঁপতো, শব্দেও সমস্যা হতো। কিন্তু সিডি আসার পর ছবির মানে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। আগের সেই কাঁপা, ঝিরঝিরি ছবির জায়গায় ঝকঝকে ছবি দেখা যায়। সঙ্গে রঙিন টেলিভিশন থাকার কারণে তা একধরনের স্বপ্নের মতো পরিস্থিতি তৈরি করে। এই পরিস্থিতির বর্ণনা পাওয়া যায় খুলনার নাঈমের কথায়। তার ভাষ্য হলো,

> এরপর আসলো সিডি। আমরা টেনশনে পড়ে গেলাম। সিডি তো আরেক ভয়ানক জিনিস, কাচের মতো স্বচ্ছ ছবি দেখা যায়। সিডি প্লেয়ারের দামও হয়ে গেলো তিন–চার হাজার টাকা। সবাই কেনা শুরু করলো। এদিকে কিন্তু আমাদের ব্যবসা ডিমোশন হচ্ছে; লোকজন কমতে শুরু করেছে। রঙ্গীন টিভির দামও কমে গেলো। সবাই টিভি, সিডি এক সঙ্গে কেনা শুরু করলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৭)।

নাঈম আরো বলেন, 'কেবল অপারেটররা করলো কী, কম্পিউটারের সাহায্যে স্থানীয়ভাবে একটা চ্যানেলে সব সময় বাংলা সিনেমা চালানো শুরু করলো। আমরা তো কমপ্লেইন করলাম, আপনারা যে সিনেমাই দেন, বাংলা সিনেমা দেওয়া যাবে না। ওরা তখন বাংলা সিনেমা দেওয়া বন্ধ করলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৭)।'

একদিকে সিডি, অন্যদিকে রঙিন টেলিভিশন সব মিলিয়ে চলচ্চিত্রের ওপর চাপটা বাড়তে থাকে। আর প্রতিযোগিতা না থাকায় ঢাকাই চলচ্চিত্রের মানও যে খুব বেশি বেড়েছিলো এমন নয়। ফলে "টিকে থাকার তাগিদে [চলচ্চিত্র] ইন্ডাস্ট্রির লোকজন এবার ভারতীয় ছবিরই পুনরুৎপাদনের কথা ভাবতে থাকেন" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬৫)। ফলে চলচ্চিত্রে নতুন সমস্যা দেখা দেয়।

৯০ দশকে মধ্যবিত্তের ঘরোয়া বিনোদনের অংশ হিসেবে চলচ্চিত্রবিষয়ক বেশ কিছু পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রকাশ হয়। চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র ব্যবসায় এসব পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। কারণ এসব পত্রিকা থেকেই দর্শক তখন চলচ্চিত্র সংক্রান্ত নানা তথ্য পেতো। নায়ক-নায়িকা সম্পর্কে নানা ধরনের গসিপ, নতুন চলচ্চিত্রের খবর, বিদেশী চলচ্চিত্রের খবরও থাকতো এসব পত্রিকায়। স্যাটেলাইট আসার কারণে দেশীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী চলচ্চিত্র সম্পর্কিত নানা তথ্য তখন পাঠক-দর্শকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো।

১৯৯২ সালে প্রকাশ হয় চলচ্চিত্রবিষয়ক পাক্ষিক 'তারকা কাগজ'। এর সম্পাদক ছিলেন নাইমুল ইসলাম খান। তারকা প্রধান এই পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। পরের বছর টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা 'টেলিভিশন' প্রকাশ হয়। জনপ্রিয় এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন

আসাদুজ্জামান রিপন। ১৯৯৬ সালে প্রকাশ হয় মিজানুর রহমান মাসুমের সম্পাদনায় 'অন্যদিন'; ইকবাল খোরশেদের সম্পাদনায় ১৯৯৬ সালে 'আনন্দ ভুবন'; ১৯৯৮ সালে দেওয়ান হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় 'বিনোদন বিচিত্রা'। এই তিনটি পত্রিকা টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ছাড়াও ফ্যাশন ও লাইফ স্টাইল বিষয়ক আধেয় প্রকাশ করতো। মধ্যবিত্তের বসার ঘরে নিয়মিতই এসব পত্রিকা দেখা যেতো। মধ্যবিত্তের বসার ঘরে থাকা টেলিভিশন সেটটি এবং সোফার সেন্টার টেবিলে থাকা এই পত্রিকা/ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে একটা সুতোবিহীন সম্পর্ক ছিলো। যে সম্পর্ক টেলিভিশনের দর্শক হিসেবে তাদের প্রভাবিত করতো।

৫.৫) চলচ্চিত্র আমদানি ও অন্য ভাষার চলচ্চিত্র

৮০'র শেষ ও ৯০-এর শুরুতে বিদেশি চলচ্চিত্র আমদানি ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। এই সময় বিদেশি চলচ্চিত্রের আমদানি এতোই বেড়ে গিয়েছিলো যে, সেন্সর বোর্ড এসব চলচ্চিত্রে ছাড়পত্র দেওয়া নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিলো। ১৯৯১–১৯৯২ সালে হংকং থেকে সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র আমদানি করা হয় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৪৫)। যৌনতা-সহিংসা ও কারাতে নির্ভর মারামারিতে পরিপূর্ণ হংকংয়ের এসব চলচ্চিত্রের তখন খুব জনপ্রিয়তা ছিলো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যৌনতা-সহিংসা নির্ভর এসব বিদেশি চলচ্চিত্রের আধেয় কিন্তু ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে দেশীয় চলচ্চিত্রেও উপস্থাপন হতে থাকে। তা চরম আকার ধারণ করে ৯০-এর দশকেরই শেষ দিকে। কাজী হায়াতের পরিচালনায় মান্না-ডিপজল জুটির চলচ্চিত্রগুলোতে এ ধরনের সহিংসতা বেশি দেখা যায়।

৯০ দশকের শুরু থেকেই বিদেশি নিম্ন অসংখ্য চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে চলতে থাকে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহগুলো এসময় খুব বেশি আইন মেনে চলেনি। "সরকারি নিয়ম মোতাবেক কোন প্রেক্ষাগৃহেই বছরে শতকরা ২০ ভাগের বেশি বিদেশী ছবি প্রদর্শন করা যায় না" (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৫২)। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহগুলো এসময় কোনো নিয়ম মানেনি বললেই চলে। ১৯৯২ সালের প্রথম সাত মাসে সেন্সর বোর্ড ৫৮টি বিদেশি চলচ্চিত্রের ছাড়পত্র দেয়। পরিস্থিতি এমন হয় আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকায় কোনো দেশী চলচ্চিত্র মুক্তি পায়নি। ওই সপ্তাহে ঢাকার ৪২টি প্রেক্ষাগৃহে ২৯টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয়, এর মধ্যে ১৬টি ছিলো বিদেশি (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৫২)।

সেসময় ঢাকার একাধিক প্রেক্ষাগৃহসহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহরগুলোতে কমপক্ষে একটি প্রেক্ষাগৃহে প্রতি সপ্তাহে 'এক টিকিটে দুই ছবি'[১০] প্রদর্শন করা হতো। জেলা শহরগুলোতে সাধারণত বি ডি আর (বর্তমানে বি জি বি) ও সেনাবাহিনী পরিচালিত প্রেক্ষাগৃহগুলোতে বিদেশী চলচ্চিত্র এবং 'এক টিকিটে

---

১০. যেসব প্রেক্ষাগৃহে বিদেশি চলচ্চিত্র চালানো হতো, তারা প্রচার-প্রচারণার স্লোগান হিসেবে 'এক টিকিটে দুই ছবি' ব্যবহার করতো। এসব প্রেক্ষাগৃহে মূলত বিরতির আগে একটি বিদেশি চলচ্চিত্র ও বিরতির পর পর্নোগ্রাফি দেখানো হতো। একবার টিকেট কেটে দুইটি চলচ্চিত্র দেখার এই সুযোগকেই 'এক টিকিটে দুই ছবি' বলা হতো। তবে 'এক টিকিটে দুই ছবি' বলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক এটাকে পর্নোগ্রাফি ধরে নিতো, অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহে পর্নোগ্রাফি দেখার সমার্থক ছিলো এই বাক্যাংশটি।

দুই ছবি’ বেশি দেখানো হতো। এসব প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত দ্বিতীয় চলচ্চিত্রটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌনতা-সহিংসতায় পরিপূর্ণ থাকতো। তবে কখনো কখনো ভালো কোনো চলচ্চিত্রের মধ্যেও কিছু সময়ের জন্য ‘কাটপিস’ আকারে যৌনদৃশ্য বা কখনো সরাসরি পনোগ্রাফি চালিয়ে দেওয়া হতো। বেশি দর্শক আকর্ষণের জন্যই মূলত তখন এগুলো করা হতো। একপর্যায়ে ‘কাটপিস’ সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রগুলো উপজেলা পর্যায়ের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে প্রদর্শন হতে থাকে।

আর একটি নিয়ে কথা বলা জরুরি, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারত থেকে অনেক কিছু আসলেও আসেনি কেবল চলচ্চিত্র। তবে নব্বই পরবর্তী প্রথম বিএনপি সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বাজেট পরিকল্পনায় ব্যাপক উদারীকরণের পথে হাঁটলেন। দেশ সয়লাব হয়ে গেল চীন, ভারত, কোরিয়াসহ নানা দেশের পণ্যে। দোহাই দেয়া হলো বিশ্বায়ন আর মুক্তবাজার অর্থনীতির। “উল্টোপথের মানুষেরা ব্যাপক সমালোচনা করলেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে কিন্তু আমাদের বেশ কয়েকটি শিল্প খাত এই অবাধ প্রতিযোগিতায় টিকেও গেল। কোনো কোনোটি আবার হারিয়ে গেল একেবারেই। তবে কোন এক রহস্যজনক কারণে সিনেমা কিন্তু তখনো থেকে গিয়েছিলে—এই ব্যাপক উদারীকরণ প্রক্রিয়ার বাইরে” (আহমেদ ২০১৮, পৃ১১৩)। ফলে যেটা হলো, অন্যান্য অনেক কিছু প্রতিযোগিতার মুখে পড়লো, কেবল চলচ্চিত্র ছাড়া। অথচ সে সক্ষমতা এই মাধ্যমটির ছিলো। যার খেসারত অবশ্য পরে দিতে হয়েছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে।

(৫.৬) তারকা-কুশীলব

৯০ দশকে নতুন ধারা টিনএজ প্রেমনির্ভর চলচ্চিত্রের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দশকজুড়েই অনেক কয়জন অভিনয়শিল্পীর আগমন ঘটে। এই দশকে নির্মাতা এহতেশামের হাত ধরে ১৯৯১ সালে চলচ্চিত্রে আসেন নাঈম-শাবনাজ। তাদের অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র *চাঁদনী* (১৯৯১) সুপার-ডুপার হিট হলে নতুন প্রজন্মের অনেক ছেলেমেয়ে চলচ্চিত্রে আসতে আগ্রহী হন। নাঈম তার ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে ১৪টি ও শাবনাজ ৩৪টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে। পরে অবশ্য শাবনাজ-নাঈম জুটি বাস্তবেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৫ সালের মধ্যেই জনপ্রিয় এই জুটির মৃত্যু হয়। শাবনাজ এর পরে কয়েকটি চলচ্চিত্র করলেও নাঈম অভিনয় থেকে দূরে সরে যান। এতো জনপ্রিয় এই জুটির নাম কিন্তু দর্শক স্মৃতিতে ছিলো না বললেই চলে (সারণী ৫.১.৩)। অনেকে *চাঁদনী*র কথা বললেও শাবনাজ-নাঈমের নাম বলেননি।

১৯৯২ সালে শেখ নজরুল ইসলামের *চাঁদের আলো* চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে ওমর সানির পথচলা শুরু। সুদর্শন এই অভিনয়শিল্পী অভিনয়ে খুব বেশি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। তারপরও নায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে জুটি বেধে তাদের বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র ব্যবসা সফল হয়। ৯০ দশকজুড়েই ওমর সানি চলচ্চিত্রে তার প্রতাপ বজায় রেখেছিলেন। পরে তিনি নায়িকা মৌসুমির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০০০ সালের পর থেকে ওমর সানির হাতে চলচ্চিত্রের সংখ্যা কমতে থাকে। ধীরে ধীরে তিনি চলচ্চিত্র থেকে নিজেকে বেশ খানিকটা দূরে সরিয়ে নেন।

নাঈম-শাবনাজ জুটির ধারাবহিকতায় ১৯৯৩ সালে সোহানুর রহমান সোহানের *কেয়ামত থেকে কেয়ামত*-এ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সালমান শাহ্‌ের পথচলা শুরু হয়। অভিনয় দক্ষতা দিয়ে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সালমান দর্শকের কাছে তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সালমানের সঙ্গে একই চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করেন নায়িকা মৌসুমী।

সালমান এই সময় ঢাকাই চলচ্চিত্রের প্রধান নায়ক হয়ে ওঠেন। মৌসুমী ছাড়াও একের পর এক সফল জুটি বাঁধেন শাহনাজ, লিমা, শাবনূরের সঙ্গে। ১৯৯৬ সালে ৬ সেপ্টেম্বর জনপ্রিয়তার চরম শিখরে থাকা অবস্থায় সালমানের মৃত্যু হয়। সালমান শাহ্‌কে নিয়ে যশোরের 'মণিহার'-এর দর্শক কামাল হোসেন বলেন, 'ভাই, আমি সালমান শাহের ভক্ত ছিলাম। এখন তাই সিনেমা একটু কম দেখা হয়। সালমান শাহ, মান্না মারা যাওয়ার পরে এখনকার নায়করা আর সেই অভিনয় করতে পারছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১১)।' খুলনার 'সঙ্গীতা'র মো. হালিম বলেন, 'চোখের সামনে আমাদের দেশের এই শিল্পটা ধ্বংস হয়ে গেলো। নায়ক-নায়িকা সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। এক জসিম, সালমান শাহ মরলো; এরপরে আসলো মান্না; সেও মারা গেলো। এদের মৃত্যুর পর সিনেমাহলের ব্যবসা শেষ হয়ে গেলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৬)।'

কেয়ামত থেকে কেয়ামত এর সাফল্যের পর মৌসুমী একের পর এক চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন। ৯০-এর দশকেই তার অভিনীত চলচ্চিত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫টি। ১৯৯৩-এ শুরু করে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সাত বছরে মৌসুমী গড়ে প্রতি বছর নয়টির বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। একজন অভিনয়শিল্পী জন্য বছরে নয়টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করা মোটেও কোনো সহজ কথা নয়। এক্ষেত্রে অভিনয়ের মান নিয়েও প্রশ্ন ওঠার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে প্রায় সব ধরেনর চরিত্রে একই ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশের আশঙ্কাও রয়েছে। মৌসুমী প্রথমে দুই–তিনটি চলচ্চিত্রে সালমানের সঙ্গে জুটি বেধে অভিনয় করলেও পরে ওমর সানি, রুবেল ও মান্নার সঙ্গে জুটি বেধে তিনি বেশ কিছু জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

১৯৯৩ সালে এহতেশামের হাত ধরে চলচ্চিত্রে আসেন শাবনূর। প্রথম চলচ্চিত্র *চাঁদনী রাতে* ভালো ব্যবসা করতে না পারলেও অল্প সময়ের মধ্যে শাবনূর রোমান্টিক নায়িকা হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। শাবনূর তার তৃতীয় চলচ্চিত্র *তুমি আমার* (১৯৯৪) এ জুটিবদ্ধ হন সালমান শাহ্‌ের সঙ্গে। এই জুটি পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। সালমান শাহের ২৬টি চলচ্চিত্রের মধ্যে ১৩টি চলচ্চিত্রের নায়িকা ছিলেন শাবনূর। সালমানের মৃত্যুর পর শাবনূর অনেকের সঙ্গে (অমিত হাসান, শাকিল খান, রিয়াজ) জুটি বাধার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত রিয়াজের সঙ্গে জুটি বেধে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র জনপ্রিয় হয়।

পরিচালক দেওয়ান নজরুলের *বাংলা নায়ক*-এর মাধ্যমে ১৯৯৫ সালে রিয়াজ অভিনয় শুরু করেন। এই চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন জসিম-শাবানা। অভিনয় দক্ষতা ও সুদর্শন নায়ক হিসেবে রিয়াজ জনপ্রিয়তা পান। রিয়াজ-শাবনূর জুটিও বেশ জনপ্রিয়তা পায়। এছাড়া ১৯৯৭ সালে ছটকু আহমেদের

বুকের ভিতর আগুন চলচ্চিত্রে ফেরদৌস অভিনয় শুরু করেন। পরের বছর যৌথ প্রযোজনার *হঠাৎ বৃষ্টি* (১৯৯৮) তে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ফেরদৌস। প্রথম চলচ্চিত্র *কুলি* (১৯৯৭) সুপার-ডুপার হিট করলে চলচ্চিত্রে অবস্থান পোক্ত হয় পপির। একই বছর সোহানুর রহমান সোহানের কপিরাইট চলচ্চিত্র *আমার ঘর আমার বেহেশত* (১৯৯৭) এ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আরেক নায়ক শাকিল খান অভিনয়ে আসেন। শাকিল খানেরও প্রথম চলচ্চিত্র জনপ্রিয় হলে তিনিও তারকা খ্যাতি পান। তিন বছরের মধ্যে শাকিল ১৮টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। শাকিল খানের অভিনয়ে দক্ষতা ছিলো না বললেই চলে। অথচ এতো অল্প সময়ে তিনি এতোগুলো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। ফলে তার অভিনয়ের মান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। যশোরের 'মণিহার'-এর সামনে কথা হয় অর্থনীতিতে অনার্স শেষবর্ষ পড়ুয়া রাকিবের সঙ্গে। ছোটোবেলা থেকেই রাকিব এখানে চলচ্চিত্র দেখেন। তার সময়ের নায়কদের কথা বলেন তিনি এভাবে,

> আর একজন নায়ক ছিলো শাকিল খান; চেহারাটা ভালো ছিলো কিন্তু অভিনয় একদমই পারতো না। অভিনয় না জানলে যতো ভালো চেহারাই হোক দর্শক পছন্দ করে না। ওমর সানিকেও লোকজন খুব একটা পছন্দ করতো না। মৌসুমীর সাথে কয়েকটা সিনেমা করে লোকজন তাকে চিনেছিলো। তারপর নাই হয়ে গেছে। সালমান, রিয়াজ কিন্তু অনেকদিন ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৯)।

১৯৯৮ সালে চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন নায়িকা পূর্ণিমা। তার প্রথম চলচ্চিত্র জাকির হোসনে রাজুর *এ জীবন তোমার আমার* (১৯৯৮)। এই দশকে অভিনয় শুরু করা অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন আমিন খান, মিশা সওদাগর। এই দশকের সর্বশেষ নতুন মুখ হিসেবে আসেন শাকিব খান; ১৯৯৯-এ সোহানুর রহমান সোহান পরিচালিত *অনন্ত ভালবাসা* দিয়ে তিনি পথচলা শুরু করেন। এই দশকে তার অভিনীত চলচ্চিত্রের সংখ্যা মাত্র তিনটি। এই দশকের নতুন অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—তারা অভিনয়ের মানের দিকে চিন্তা না করে চলচ্চিত্রের সংখ্যা বাড়াতেই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। এরফলে অনেকে যেমন দ্রুত জনপ্রিয় হয়েছেন, ততো দ্রুতই সেখান থেকে পড়ে গেছেন। এই প্রবণতা অবশ্য ৭০ ও ৮০'র দশকের কোনো কোনো অভিনয়শিল্পীদেরও ছিলো।

নতুন অভিনয়শিল্পীদের পাশাপাশি এই দশকে দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে অভিনয় করে গেছে আলমগীর, শাবানা, ববিতা, জসিম, রুবেল, চম্পা, ইলিয়াস কাঞ্চন, মান্না, মিজু আহমেদ, রাজিব ও হুমায়ুন ফরিদী। এদের মধ্যে আলমগীর, শাবানা, জসিম, ববিতা সামাজিক ও সামাজিক অ্যাকশন চলচ্চিত্রে স্বামী-স্ত্রী, বড়োভাই, ভাবী, বাবা, মা এসব চরিত্রে অভিনয় করেন। শাবানা অভিনীত চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা নিয়ে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের 'ভিক্টোরিয়া'র সামনের পান দোকানি রঞ্জু বলেন, 'আগে অনেক মহিলা দর্শক আসতো। বিশেষ করে মহিলারা শাবানার সিনেমা খুব দেখতো। *মাস্তান রাজা*, *বাংলার বধূ*, *বাংলার নায়ক* এই সিনেমাগুলো খুব চলছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.২১)।' খুলনার মহিউদ্দিন আহমেদ পান্না বলেন, '৮০ ও ৯০ এর দশকে রাজ্জাক-শাবানা, আলমগীর-শাবানা, সালমান শাহ, আরো পরে মান্নার সিনেমাগুলো ভালো ব্যবসা করেছে। সালমান ও মান্নার মৃত্যুর কারণেও

সিনেমার বড়ো ধরনের ক্ষতি হয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৫)।' একই ধরনের কথা বলেন সিলেটের 'নন্দিতা'র গেইটম্যান ময়না মিয়া। তার মতে,

> আগে যেমন শাবানা, ববিতা কিছু সামাজিক সিনেমা করতো। এই যেমন ধরেন শাবানার *বাংলার বধূ*, এগুলো কিন্তু একসময় দর্শক খুব দেখছে। আর এখনকার নায়িকারা এধরনের সিনেমা করলে কেউ সেটা দেখবে না। কারণ তারা শাবানা, ববিতার মতো এখন সামাজিকভাবে অভিনয়ই করতে পারে না। ওই ধরনের অভিনয় তাদের মাথাতেই নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৭)।

৮০'র দশকে রেকর্ড ব্যবসা করা *বেদের মেয়ের জোস্‌নার* (১৯৮৯) **নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন ৯০-এর দশকে অভিনয় করেন কমপক্ষে ১৪০টি চলচ্চিত্রে** (আলম ২০১১, পৃ২২৪–২৩১)। তার সমসাময়িক প্রায় সব নায়িকার সঙ্গে কাঞ্চন জুটি বেধে অভিনয় করেছেন। বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে একক নায়ক হিসেবে ক্যারিয়ার ধরে রাখার কৃতিত্ব যতোদূর সম্ভব কাঞ্চনেরই রয়েছে। **ইলিয়াস কাঞ্চনই একমাত্র নায়ক যিনি শাবানার সঙ্গে নায়ক হিসেবে আবার শাবানার ছেলের চরিত্রেও অভিনয় করেছেন**। দর্শক স্মৃতিতেও ইলিয়াস কাঞ্চনের অবস্থান প্রথম ১০ জনের মধ্যে নয় নম্বরে ছিলেন (সারণী ৫.১.৩)।

সারণী ৫.১.৩ : মাঠ থেকে পাওয়া তথ্য-উপাত্তে তারকা-কুশীলবদের উপস্থিতির প্রাবল্য

নম্বর	অভিনয়শিল্পীর নাম	প্রাবল্য
১.	শাবানা	৩৭
২.	রাজ্জাক	৩৪
৩.	আলমগীর	৩১
৪.	জসিম	৩১
৫.	মান্না	৩১
৬.	সালমান শাহ	২৫
৭.	আরেফীন শুভ	২১
৮.	মাহিয়া মাহী	১৫
৯.	ইলিয়াস কাঞ্চন	১৪
১০.	শাকিব খান	১২
১১.	ফারুক	১০
১২.	ববিতা	১০
১৩.	বাপ্পী চৌধুরী	১০
১৪.	রিয়াজ	৯
১৫.	রুবেল	৯

খলঅভিনেতা হিসেবে ৯০-এর দশকে হুমায়ুন ফরিদী ও রাজীব তারকা ইমেজ ধরে রাখেন। মঞ্চ টেলিভিশনের জাঁদরেল অভিনয়শিল্পী হুমায়ুন ফরিদী খলঅভিনেতা হিসেবে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ শহীদুল ইসলাম খোকনের *সন্ত্রাস* (১৯৯১) এর মধ্য দিয়ে। এর মধ্য দিয়ে "ইন্ডাস্ট্রিতে ভিলেন চরিত্রের অভিনেতাদের গুরুত্ব বাড়ে, তারাও তারকা-ইমেজ উপভোগ করতে থাকেন" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬৩)। দক্ষ অভিনয়শিল্পী ফরিদী ১৯৯১ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ১০৯টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

গড়ে প্রতি বছর ফরিদীকে নয়টির বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে হয়েছে। দক্ষ এই অভিনয়শিল্পীকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি যথাযথ ব্যবহার করতে পেরেছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

৯০ দশকে কমপক্ষে ১৯৯টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন রাজীব। এই দশকে হুমায়ুন ফরিদীর বাইরে বাকি প্রায় সব চলচ্চিত্রে রাজীবকে খলঅভিনয়শিল্পী হিসেবে দেখা যায়। দক্ষ অভিনয়শিল্পী রাজীবও বেশকিছু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন প্রোটাগনিস্ট হিসেবে।

রাজীব ও হুমায়ূন ফরিদী অভিনীত অনেক চলচ্চিত্রেই সহিংসতার প্রকোপ ছিলো। "নব্বই দশকেই সহিংসতার ব্যবহারে নায়ক ও প্রতিনায়কের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে যেতে থাকে" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬৩)। এক্ষেত্রে অবশ্য আরেকজনের নাম না নিলেই নয়, ডিপজল। যদিও ৯০ দশকে তিনি খুব বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেননি। কিন্তু অল্প সংখ্যক চলচ্চিত্রেই তিনি খলচরিত্রে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন। এসব চলচ্চিত্রে প্রোটাগনিস্ট হয়ে উঠে খলচরিত্র। "প্রবল এ্যাকশন, প্রচণ্ড সহিংসতানির্ভর এসব ছবিতে নায়িকার ভূমিকাও ছোট হয়ে আসতে থাকে" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬৩)। ৮০'র দশকে সামাজিক অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র দিয়ে জনপ্রিয় হওয়া মান্না এই দশকেও এই ধারার চলচ্চিত্রে রাজত্ব করেছেন।

৯০-এর দশকের আরেকটি বিষয় হলো, এই দশকে মুম্বাই ও কলকাতার শিল্পীদের নিয়ে ঢাকাই চলচ্চিত্রে ছবি নির্মাণে রীতি মতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কেউ কেউ এই প্রতিযোগিতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেও নিয়েছিলেন (জেয়াদ ২০১১, পৃ২৬৫)। এই অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন—ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, চাঙ্কিপান্ডে, মুনমুন সেন, রিয়া সেন, প্রিয়াঙ্কা, শতাব্দী রায়, মহুয়া সমাদ্দার, জয়াপ্রদা, অভিষেক চ্যাটার্জি, প্রসেনজিৎ, তাপস পাল, রঞ্জিত মল্লিক, আসরানী, ইন্দ্রানী হালদার, রবিনা, শ্রীলেখা মিত্র, আয়েশা জুলকা, শক্তি কাপুর প্রমুখ। এদের মধ্যে ঋতুপর্ণা ঢাকাই চলচ্চিত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ভারতের অভিনয়শিল্পীদের বাংলাদেশের আসা নিয়ে মৌলভীবাজারের জহির খন্দকার বলেন,

> ৮০-৯০ দশকে কলকাতায় যেসব সিনেমা হতো, সেগুলো চলতো না। অথচ তখন বাংলাদেশে সিনেমার বাজার জমজমাট ছিলো। ওখানকার নায়ক-নায়িকারা এখানে এসে অভিনয় করতো। এখন আমরা তাদের দেশের সিনেমা চালাই, তাদের দেশের স্টারদের এনে সিনেমা বানাই! অথচ সরকারের এদিকে কোনো নজর নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৬)।

ঋতুপর্ণা অভিনীত *রাঙা বউ* (১৯৯৮) কে ৯০-এর দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশে যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রের শুরুর চলচ্চিত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এই চলচ্চিত্রে ঋতুপর্ণাকে দিয়ে মূলত সফ্‌ট পর্নোগ্রাফিতে অভিনয় করানো হয়। তার মতো অভিনয়শিল্পীর এই আচরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অনেক নায়িকাকে এধরনের চরিত্রে অভিনয়ে উৎসাহিত করে বলে ধারণা করা হয়।

৫.৬.১) তিনি নায়ক সালমান শাহ্

সালমান শাহ্রে আগমনে অনেক দিন পর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের দর্শককে কোনো নায়কের পোশাক, ফ্যাশন, কথা বলার শৈলী ইত্যাদি নকল করতে দেখা যায়। দর্শক যখন বাংলা চলচ্চিত্রে নায়কদের

একই ধাঁচের পোশাকে দেখে বিরক্ত, ঠিক তখন সালমান প্রচলিত ধারার বিপরীতে পোশাক-আষাকে নিয়ে আসেন ব্যতিক্রমি ছোঁয়া। সালমানের প্রশংসা করতে গিয়ে খুলনার আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমি সালমান শাহকে কাছ থেকে দেখেছি, স্ক্রিপ্ট ভালোভাবে না পড়ে তিনি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতেন না। তাকে আগে স্ক্রিপ্ট পড়তে দিতে হতো, পরে ভালো লাগলে তিনি সম্মতি দিতেন; না হলে সেই সিনেমা করতেন না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৪)।'

> কখনো হ্যাট ও লম্বা কোটে পশ্চিমা লুক কিংবা টি-শার্ট বা লঙ শার্টের সঙ্গে নানা রকমের পশ্চিমা কোট থেকে শুরু করে স্যুট-টাই পরে কেতাদুরস্ত, কখনো শার্টের কলার উঠিয়ে কিংবা হাফহাতা গেঞ্জি, জিনস ওপরের দিকে ভাঁজ, হুডি-শার্ট এখনো ইন করে আবার ওপেনে রেখে বিচিত্র লুক, কাউবয় বা জমিদারি পোশাকে, কবি-সাহিত্যিকের প্রতীকী পাঞ্জাবি, [পরে] পর্দায় হাজির হতে দেখা গেছে সালমানকে (আলী ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭)।

শুধু পোশাক নয় স্টাইলেও সালমান ছিলেন অনন্য—ব্যাক ব্রাস করা চুল, কানের দুল, রঙ-বেরঙের টুপি, সানগ্লাস, ফেড জিনস, মাথায় স্কার্ফ আরো কতো কী! সেই ৯০-এ লাল কিংবা কালো নকশায় মধ্যেপ্রাচ্যের প্রচলিত স্কার্ফ ব্যবহার করেছিলেন সালমান। সিলেটের হারুন অর রশীদ বলেন,

> আগে একজন মাত্র অভিনেতা ছিলো সালমান শাহ। তার অভিনয়ের মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব ছিলো। সেই সময়ে সালমান শাহের স্টাইল এখন মুম্বাইয়ের অনেক নায়ক ফলো করে। বাংলাদেশে প্রতিভাবান যদি কোনো অভিনেতা থেকে থাকে সেটা ছিলো সালমান শাহ। তার মৃত্যুর কারণে চলচ্চিত্রের অনেক বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৫)।

রাজশাহীর 'উপহার'-এর প্রবীণ গেইটম্যান আখলাক বলেন, '৮০ দশকের পর থেকে সিনেমার অবস্থা খারাপ হওয়া শুরু হয়। তারপরও ৯০-এর দশকে ভালোই ছিলো। কিন্তু সালমান শাহ্ মারা যাওয়ার পর থেকে অবস্থা একেবারে খারাপের দিকে চলে যায়। রিয়াজও কিছুটা চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সালমানের মতো কিছু করতে পারেনি (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১৭)।'

সালমান শাহ্ ছবি : সংগৃহীত

ক্যারিয়ারে মোট ২৬টি চলচ্চিত্রে সালমান অভিনয় করেন। "১৯৯৩ সাল থেকে সালমান যতোদিন ছিলেন, তাকে নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ এতটুকু কমার আলামত পাওয়া যায়নি। বাংলা চলচ্চিত্রে বোধ করি সালমানই একমাত্র নায়ক যার জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের চেয়ে অজনপ্রিয় ছবির তালিকা করা সহজ" (লাবলু ২০১৫, পৃ৫২)। প্রদর্শকদের দেওয়া তথ্য (আলী, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭) থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের সর্বকালের ১০টি ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রের তিনটি সালমানের দখলে। এ যাবৎ সবচেয়ে ব্যবসা সফল *বেদের মেয়ে জোসনা*, এটি প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যবসা করে। এরপর দ্বিতীয় অবস্থানে আছে সালমানের *স্বপ্নের ঠিকানা*; এটি আয় করে ১৯ কোটি। তৃতীয় অবস্থানেও সালমানের *সত্যের মৃত্যু নাই*, সাড়ে ১১ কোটি টাকা আয় করে। সালমান অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* আছে চতুর্থ স্থানে, এর আয়ের পরিমাণ আট কোটি ২০ লাখ টাকা । সালমানের চলচ্চিত্রের ব্যবসা নিয়ে খুলনার 'শঙ্খ'-এর বুকিং এজেন্ট আনোয়ার হোসেন বলেন,

> তখন রেন্টালে সিনেমা আনতে হতো। দাম অনেক বেড়ে গেলো *সত্যের মৃত্যু নাই*-এর। ... শেষ পর্যন্ত তিন লক্ষ টাকা দিয়ে ওই সিনেমা আমাদের আনতে হয়েছিলো। তারপরও অবশ্য আমরা অনেক টাকা লাভ করেছি ওই সিনেমা দিয়ে। দর্শকের জন্য সিনেমাহলে থাকা দায়। যতো লোক সিনেমা দেখছে, তার চেয়ে বেশি লোক বাইরে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৪)।

একই ধরনের কথা বলেন বরিশালের অরুণ চন্দ্র গোস্বামী। তার ভাষ্যমতে, 'এই যে সালমান শাহের *কেয়ামত থেকে কেয়ামত*; এই সিনেমাহলে একটা শো চলছে আর বাইরে তার চেয়ে বেশি লোক দাঁড়িয়ে ছিলো। এছাড়া ওর *তোমাকে চাই*, *দেনমোহর*ও বাম্পার ব্যবসা করছে। ভালো পরিচালক দিয়ে সিনেমা বানালে দর্শক আসবে না কেনো (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১)!' খুলনার নাঈম বলেন,

> এই যে এখন শাকিব খানের যে এতো নামডাক, তার সিনেমাও যে খুব ব্যবসা করছে এমন নয়। শুক্রবারে লোক ছিলো, শনিবার থেকে নাই। কিন্তু সালমান শাহের সিনেমা *তোমাকে চাই*, এই সিনেমাহলে ১৩ সপ্তাহ চলছে; *মায়ের অধিকার* চলছে আট সপ্তাহ; *জীবন সংসার* ছয় সপ্তাহ চলছে। যতো দিন যায়, ততো সেল বাড়ে। সালমান মারা গিয়ে চলচ্চিত্রের বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৭)।'

একজন অভিনয়শিল্পী মূল যে গুণ অভিনয় দক্ষতা, সেখানেও সালমান সমসাময়িক সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* দেখে হয়তো অনেকে ভেবেছিলেন সুন্দরী নায়িকার সঙ্গে প্রেম আর নাচানাচির মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখবে এই তরুণ। কিন্তু পরে দেখা যায়, অল্প সময়ের ব্যবধানে নিজেকে বারবার ভেঙেছেন এই অভিনয়শিল্পী। মাথায় ব্যানডানা বেঁধে তিনি যেমন খল অভিনয়শিল্পীদের শায়েস্তা করেছেন, তেমনই বিচারক মায়ের অবাধ্য সন্তান হিসেবে, কলেজের মেধাবী ছাত্র থেকে ছাত্রনেতা হয়ে, জমিদারের ছেলে থেকে রাখাল, সব চরিত্রে সালমান সাবলীল অভিনয় করে গেছেন। যশোরের কামাল হোসেন বলেন,

> রোমান্টিক সিনেমাতে সালমান শাহের অভিনয় দেখে এখনকার ইয়াং জেনারেশনও আপসোস করে। তার অভিনয় ছিলো অন্যরকমের। সালমান মারা যাওয়ার পর পরিচালক সোহানুর রহমান সোহান বলছিলেন, তার অভিনয় দক্ষতা ছিলো অসাধারণ, কোনো কিছু একবার ধরিয়ে দিলে আর বলা লাগতো না। কিন্তু লোকটা হঠাৎ করে মারা গেলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১১)।

খুলনার জাফর আলী আরো নির্দিষ্ট করে বলেন,

> আমাদের সিনেমাহলে আমরা দুই সপ্তাহ সালমান শাহের একটা সিনেমা চালিয়েছিলাম ১৫ লক্ষ টাকার ব্যবসা হয়েছিলো। তার *কেয়ামত থেকে কেয়ামত*, *অন্তরে অন্তরে* বিউটিফুল সিনেমা ছিলো। সালমান দেখতে ভালো ও আকর্ষণীয় ছিলো। কথাবার্তায় ভালো, খুব সুন্দর করে ডায়লগ থ্রো করতো। ওই ছেলে অভিনয়টা জানতো। ও বেঁচে থাকলে সিনেমার আজকের অবস্থা এরকম নাও হতে পারতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১১)।

চলচ্চিত্রে আর দশজন নায়কের মতো তিনি কেবল স্টাইল আর চেহারা দিয়ে জনপ্রিয় হননি; তিনি অভিনয় দিয়েই সবার মন জন করেছিলেন। বিশেষ করে তরুণীদের মধ্যে সালমানের জনপ্রিয়তা ছিলো অকল্পনীয়। এর বাইরে সব শ্রেণির দর্শক সালমানকে গ্রহণ করেছিলেন, যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে রাজ্জাকের বাইরে কমই দেখা গেছে। খুলনার আনোয়ার হোসেন মনে করেন, 'সালমান ও মান্নার মৃত্যুতে বড়ো ধরনের ক্ষতি হয়েছে দেশের চলচ্চিত্রের। কারণ এরপর আমরা আর হিরো তৈরি করতে পারিনি (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৪)।' সালমানের জুটি নিয়ে রংপুরের তছলিম উদ্দিন বলেন, 'সালমান শাহ্ মারা যাওয়ার পরে বাংলাদেশের সিনেমায় বড়ো ধরনের ধস নেমেছে। কারণ সালমান-শাবনূর জুটিটা খুব ভালো চলছে। গল্প একটু খারাপ হলেও জুটির কারণে সেই সিনেমা চলছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২৪)।' যশোরের আলী হোসেন নদু মনে করেন, 'একেক নায়কের একেক দর্শক থাকে। যখন সালমান শাহ জীবিত ছিলো তখন যেমন ব্যবসা হয়েছে, উনি মারা যাওয়ার পরও ওনার সিনেমা নিয়ে সেই ব্যবসা হয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৭)।'

একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, একক নায়ক হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সালমানের ভূমিকা ছিলো। তার অকালমৃত্যু ঢাকাই চলচ্চিত্রে বড়ো ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বলে মনে হয়েছে। কারণ এমন একটা সময়ে সালমান চলে গিয়েছিলেন, যখন তার সেই শূন্যতা পূরণের অবস্থা ইন্ডাস্ট্রির ছিলো না বললেই চলে। ফলে সেই শূন্যতা পূরণ তো হয়ইনি উল্টো বাড়িয়েছে।

৫.৬.২) **নায়ক মান্না**

৮০'র দশকে অভিনয় শুরু করা মান্না ৯০ দশকে অভিনয় করেন ১০০টি চলচ্চিত্রে। "এরমধ্যে কাজী হায়াৎ 'রাজনৈতিক গডফাদার-অসৎ পুলিশ-প্রতিবাদী নায়ক' ফর্মুলায় পরপর *দাঙ্গা* (১৯৯২) ও *ত্রাস* (১৯৯২) নামক দু'টি এ্যাকশন ছবি নির্মাণ করলে তা দর্শক গ্রহণ করে এবং মান্না-অভিনীত এই ধারার

ছবির কদর বাড়ে” (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬৩)। অন্য অনেক নির্মাতার চলচ্চিত্রে অভিনয় করলেও কাজী হায়াৎ-মান্না জুটির প্রায় সব চলচ্চিত্র ব্যবসা সফল হয়। **বিশেষ করে সালমান শাহের মৃত্যুর পর পুরো চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি নিয়ন্ত্রণে নেন মান্না**। এ নিয়ে স্বয়ং কাজী হায়াতের ভাষ্য হলো,

> সালমান শাহের মৃত্যুর পর সিনেমায় একটা বড়ো ধরনের ধস নামে। দর্শক সেসময় সিনেমা দেখতে চাইতো না। সালমানের মৃত্যুর পরে তার অর্ধসমাপ্ত যে সিনেমাগুলো ছিলো, সেগুলো কোনোমতে সমাপ্ত করা হলে সেগুলোওআকাশচুম্বী ব্যবসা করে। এরপরে আর অন্য ছবি ব্যবসা করছিলো না। আমি কাজী হায়াৎ তখন মান্নাকে নিয়ে টুক টুক করে এগোচ্ছিলাম (আখ্যানের ক্রম ৫.১; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

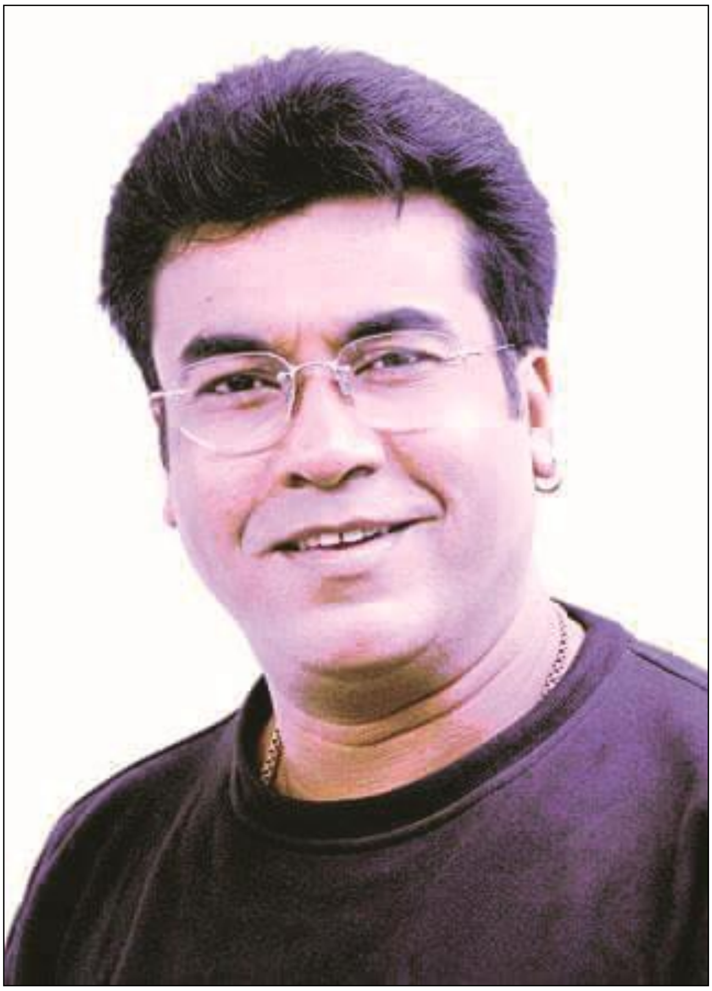

মান্না ছবি : সংগৃহীত

যশোরের প্রহ্লাদ দাশ বলেন,

> সালমান শাহ মারা যাওয়ার পরই তো মান্না আসে। সেসময়ই মান্নার খুব নাম ফুটলো। ধরেন, মান্না থাকতে থাকতেই শাকিব খান আসলো। কিন্তু শাকিব খানকে কেউ তখন চিনতো না, ওর নামও ফোটে নাই। তখন একচেটিয়া মান্না ছিলো। মান্না কিন্তু আলমগীরের সাথেও অভিনয় করে আসছে, তখন সাইড নায়ক ছিলো। একটা সিনেমা ছিলো *অমর*; সেখানে মান্না ছিলো সাইড নায়ক। তারপর আস্তে আস্তে মান্নার নাম ফুটলো কাজী হায়াতের *দাঙ্গা* দিয়ে। এরপর মান্না বেশ কয়েকটা হিট সিনেমা করলো, *বর্তমান*, *ধর*, *আম্মাজান*। তখনও শাকিব খানের নাম ফোটে নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫)।

মান্নার অভিনয় নিয়ে রংপুরের তসলিম উদ্দিন বলেন,

> মান্নার রোমান্টিক অভিনয় ওতো ভালো হতো না, তবে অ্যাকশন খুব ভালো হতো। বিশেষ করে যে সিনেমায় ডিরেক্টর কাজী হায়াৎ থাকতো, সেখানে মান্নার অভিনয় ছিলো অন্যরকম। দর্শকও এই দুইজনের নাম এক সঙ্গে শুনলে সিনেমাহলে চলে আসতো। কারণ ওই সব সিনেমায় সংলাপ ভালো থাকতো। মান্না চলে যাওয়ার পর আর তো কোনো নায়কই থাকলো না। পলিটিকাল সিনেমায় মান্না যেটা পারতো, শাকিব সেটা পারে না। মান্না সাধারণ মানুষের মনের কথা বলতো সিনেমার সংলাপে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২৪)।

মান্নাকে নিয়ে তার সর্বাধিক চলচ্চিত্রের নির্মাতা কাজী হায়াৎ বলেন, "মান্না পোড় খেতে খেতে এই শিল্পে বড়ো হয়েছে। একটি ছবি মুক্তি পেয়েছে তারপর সিনেমা হলে গিয়ে পড়ে থেকেছে, ছবি না চললে কেঁদেছে। যেন পরীক্ষায় ফেল করেছে। নায়ক মান্না এমনি করে মানুষের কাছে নিজেকে মেলে ধরে ভালোবাসা আদায় করে নিয়েছে" (*প্রথম আলো* ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)। এ ব্যাপারে সিলেটের হারুন অর রশীদ বলেন, 'মান্না খুব জনপ্রিয় হলেও প্রথম দিকে কিছুই করতে পারতো না। বিশেষ করে ডাবিং করতে পারতো না। তারপর অবশ্য এক সময় তিনি খুব ভালো অভিনয় করেছেন। দর্শক তাকে পছন্দ করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৫)।' বরিশালের আ. খালেক মিয়া বলেন, 'মান্নার সিনেমা খুব ভালো ছিলো, তার অভিনয় ভালো ছিলো। মান্নার সিনেমা *শান্ত কেন মাস্তান* খুব ব্যবসা করছে, পুরস্কারও পেয়েছিলো। এরকম সিনেমা হলে এখনো দর্শক দেখবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.৩)।'

মান্নার অনেক চলচ্চিত্রের নায়িকা ছিলেন চম্পা। মান্নার ক্যারিয়ার নিয়ে চম্পা বলেন, মান্না চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন ১৯৮৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত। খুব কম নায়কই এতো দীর্ঘ সময় ক্যারিয়ার বজায় রাখতে পেরেছে (*প্রথম আলো* ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)। সাতক্ষীরার দেবাহাটার 'লাইটহাউজ'-এর গেইটম্যান শাহরুখ হোসেন রাজা বলেন, 'নায়ক মান্না শ্যাষ, আর চিত্রজগত কানা হয়ে গেছে। রাজনীতি, লাভ স্টোরি মান্নার যে সিনেমার কথাই বলেন, লাগালেই দর্শক গেইট-টেইট ভেঙে ফেলতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩৩)।' একই ধরনের কথা বলেন নওগাঁর পত্নীতলার আবু মুসা। তার ভাষ্যমতে, 'মান্নার সিনেমাতে প্রচুর ব্যবসা হয়েছে। সিনেমা লাগালেই লোকে লোকারণ্য। এই এলাকায় মান্না ভক্ত বেশি। মান্না মারা যাওয়ার পর থেকে চিত্রজগতটাই ধ্বংসের দিকে গেছে। আর শাকিব ছাড়া কোনো নায়ক না থাকায়, সবার কাছে একঘেয়ামি হয়ে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১৩)।'

মান্না তার সময়কালে রাজনৈতিক বক্তব্যধর্মী চলচ্চিত্রগুলোতে একচেটিয়া অভিনয় করেন। তাই তার ভিত্তিটাই গড়ে উঠেছিলো জনগণের ভালোবাসা দিয়ে। *দাঙ্গা* চলচ্চিত্রটি মুক্তির পর মান্নাকে নিয়ে চারদিকে বেশ আলোচনা শুরু হয়। মান্নার সার্বিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে খুলনার জালাল শিকদার বলেন,

> মান্না মারা যাওয়ার পর দুই ধরনের লোকের ক্ষতি হয়েছে। এক হলো, জনগণের আর দুই কাজী হায়াতের। মূলত মান্না সিনেমা করতো রাজনীতি নিয়ে। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতি যেখানে গণতন্ত্র সেখানে। রাজনীতি না থাকলে গণতন্ত্রও নাই। ফলে ভালো একটা হিরো যদি এই রাজনীতির গল্পটা ভালো করে বলতে পারে; তাহলে কিন্তু সিনেমাটা ফোটে। মান্না সেটা করে গেছে। সে নাই, জনগণের জন্য রাজনীতির গল্প বলার লোক নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৮)।

তবে রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের বাইরেও মান্নার চলচ্চিত্র ব্যবসা করেছে। *কাশেম মালার প্রেম* মুক্তি পাওয়ার পর গ্রামবাংলার মানুষ প্রেক্ষাগৃহে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। আর *প্রেম দিওয়ানা* মুক্তি পেলে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা প্রেক্ষাগৃহে লাইন ধরে দাঁড়িয়েছিলো। তার মানে ধাপে ধাপে মান্না বাংলাদেশের একেকটা শ্রেণির দর্শকের ভালোবাসা অর্জন করেছিলো (*প্রথম আলো* ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মান্না সেই ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে ছিলেন বলে প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট অনেকে মনে করেন। ময়মনসিংহের 'ছায়াবাণী'র চলচ্চিত্র প্রতিনিধি বিপ্লব হোসেনের ভাষায়,

> মান্না যেমন দর্শককে হাসাতে পারতো, তেমনই কাঁদাতেও পারতো। এছাড়া মান্নার এমন কিছু ডায়লগ ছিলো যেগুলো মানুষের হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করেছে। মান্না সাধারণ মানুষের মনের কথা বলতে পারতো। তার মৃত্যুর পর ওই ধরনের কেউ আর সিনেমায় আসতে পারে নাই। এখন এই যে বাপ্পী, সায়মন আছে, এদের মধ্যে অভিনয়ের কোনো ইমোশন-ই নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৪)।

নওগাঁর পত্নীতলার 'রংধনু'র কর্মচারী মকবুল বলেন,

> একবার ছয় মাস পত্নীতলার কোনো সিনেমাহলে মান্নার সিনেমা মুক্তি দেওয়া হয় নাই। হঠাৎ *সিটি টেটর* নামে মান্নার একটা সিনেমা মুক্তি পায়। তখন ছিলো পৌষ মাস। সে কী কুশায়া আর ঠাণ্ডা। এর মধ্যে সিনেমাহলে লোক দেখে মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা। হলের বাইরে যতো মানুষ ভেতরেও ততো মানুষ। সিনেমা শেষ হলে মানুষের চাপে সামনের রাস্তার বাস-ট্রাক পর্যন্ত আটকে যায়। সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২২)!

রংপুরের তাপস সরকার বলেন, 'মান্না তো সেই সময়ের অশ্লীলতার চরমভাবে বিপক্ষে ছিলো। তাকে হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২২)।'

তবে দর্শকের কাছে মান্না ও সালমান শাহ্, দুই নায়কের অবস্থান ছিলো আলাদা। মান্না নিম্নবিত্তের মানুষের কাছে ছিলেন ত্রাতার মতো। গবেষক গীতি আরা নাসরীন নায়ক মান্নার মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—

> মান্না সাধারণত ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। কখনো তিনি অপরাধী পুষছেন এমন রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৎ পুলিশ অফিসার, কখনো বা গুণ্ডা বাহিনীর বিরুদ্ধে বস্তি রক্ষায় নিয়োজিত রাগী যুবক, কখনো ধনীর ধন কেড়ে এনে গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া দাতা। আমাদের দেশে যেখানে অপরাধের সংখ্যা অনেক, সমাজের প্রভাবশালীরা অনেক সময়ই এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকেন, এবং প্রায়শই অপরাধের বিচার হয় না, সেখানে মান্না নিম্নবর্গের দর্শকের কাছে তাদের একমাত্র কণ্ঠস্বর। পর্দায় তিনি ধর্ষককে খুন করেন, মস্তানের পিলে চমকে দেন। সিনেমায় তাই সমাজের অসহায় শ্রেণীর এই দর্শকদের সাময়িক রাগ মোচন হয় (নাসরীন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)।

ফলে বাস্তব জীবনেও মান্না হয়ে উঠেন ওই মানুষগুলোর প্রতিনিধি। তারা মান্নাকে নিজের লোক ভেবে ভালোবাসতে শুরু করেন। মান্নার সঙ্গে দর্শকের একাত্মবোধ ছিলো। তারা তাকে তাদের বাবা-ভাই-বন্ধু মনে করেছেন। সেই বোধ-ই হয়তো মান্নাকে একপর্যায়ে গিয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের কাণ্ডারি করে তুলেছিলো।

৫.৭) চলচ্চিত্রের দর্শক, ব্যবসা এবং প্রেক্ষাগৃহ

একেবারে নতুন নায়ক-নায়িকা দিয়ে *চাঁদনী*র সাফল্যে অনেকেই নড়েচড়ে বসেন। শাবনাজ-নাঈমকে জুটি করে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রও নির্মাণ হয়। কিন্তু *চাঁদনী*র পর এই জুটির আর কোনো চলচ্চিত্রই ওই পরিমাণ ব্যবসা করতে পারেনি। তবে *চাঁদনী*র প্রভাবে টিনএজ প্রেম নিয়ে ১৯৯৩-এ নির্মিত *কেয়ামত থেকে কেয়ামত*-এর মাধ্যমে সালমান শাহ্, মৌসুমী নামে নতুন অভিনয়শিল্পীর আবির্ভাব হয়। পরবর্তী সময়ে সালমান-মৌসুমী জুটি দুই–তিনটি চলচ্চিত্র করলেও মূলত সালমান-শাবনূর জুটি জনপ্রিয় হয়। এই জুটির সবগুলো চলচ্চিত্রই ব্যবসা সফল ছিলো। এই সময়ে আলমগীর-শাবানা জুটির সামাজিক চলচ্চিত্রগুলোও ব্যবসা করে। বিশেষ করে নারী দর্শক এসব চলচ্চিত্র খুবই পছন্দ করেন। এই সময়ের নারী দর্শক নিয়ে নওগাঁর পত্মীতলার সমীর কুমার মণ্ডল বলেন,

> সেসময় মূলত নারীদের নিরাপত্তার দিকে বেশি জোর দেওয়া হতো। এছাড়া তাদের জন্য ভালো ওয়েটিং রুম, বাথরুমেরও ব্যবস্থা ছিলো। মেয়েরা বেশ নিরাপদে সেখানে থাকতে পারতো। পুরুষদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততাই ছিলো না। ওখানে নারীদের জন্য আয়না ও চিরুনির ব্যবস্থাও ছিলো। এছাড়া প্রেক্ষাগৃহ থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রায় আধা কিলোমিটার রাস্তায় যাতে রাতে নারীদের যাতায়াতের সমস্যা না হয়, সেজন্য নিজের খরচে সিনেমাহল কর্তৃপক্ষ আলোর ব্যবস্থা করেছিলো। এমনকি বিদ্যুৎ চলে গেলেও জেনারেটর দিয়ে এসব আলো জ্বলতো। স্টাফরাও রাতে রাস্তায় পাহারায় পর্যন্ত থাকতো (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

নারী দর্শকের চাপ নিয়ে সমীর কুমার মণ্ডল আরো বলেন,

> 'রংধনু'তে *তোমাকে চাই* আনার পর প্রথম শোয়ে কিছুটা সমস্যা হয়েছিলো। কারণ মহিলাদের জন্য নির্ধারিত জায়গাটা ভরে যাওয়ায় অনেকে প্রথম শো দেখতে পারেনি। ডিসিতে কিছু মহিলা দর্শক প্রথম শো দেখার পরও অনেকে থেকে যায়। তখন একটা কৌশল অবলম্বন করা হলো; এই সিনেমাহলে মূলত মহিলাদের জন্য ১২৫টি আসন আর বাকি এক হাজার ছিলো পুরুষদের জন্য। তখন এই হিসাবটা আমরা উল্টে দিই, পুরুষদের জন্য মাত্র ১২৫টি আসন রেখে বাকিগুলো মহিলাদের জন্য দেওয়া হয়। তখন আর ডিসি বলে কিছু রাখা হয় না। মহিলাদের একই টাকায় যেকোনো জায়গায় চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ দেওয়া হয় (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

শুধু নারীরা নয়, সপরিবারে লোকজন তখন এসব চলচ্চিত্র দেখতে আসতো। সিলেটের রাশেদুল কবির মন্টু বলেন, 'আগে মা-বাবা, ভাইবোন মিলে মানুষ সিনেমা দেখতো। শাবানা-রাজ্জাক-আলমগীর থাকলে আগে প্রচারম্যান মাইকে বলতো, একটা সামাজিক ছবি; সেই সিনেমা অনেকে দেখতে আসতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১১)।' প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের সেবা দেওয়ার ব্যাপারে সমীর কুমার আরো বলেন,

> আমরা কোনো দর্শককে ফেরাতাম না। এমনকি কারো টাকা কম পড়লে, আমাদের জানালে, ওই টাকাতেই সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করা হতো। বাকিতেও (হাসি) লোকজনকে আমি সিনেমা দেখিয়েছি। রাতের বেলা দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন বাস, গাড়ি, টেম্পু, ভটভটি নিয়ে আসতো; সিনেমাহলের সামনের ফাঁকা জায়গাটায় সেগুলো পার্কিং করে আমাদের লোকজন পাহারা দিতো। আর যারা বাস, ট্রাক, টেম্পো নিয়ে আসতো, প্রতি গাড়ির দুইজন করে মানে হেলপার, ড্রাইভার ফ্রি সিনেমা দেখতে পারতো। এরফলে ওরাও আগ্রহী হতো; লোকজনকে আমাদের সিনেমাহলে নিয়ে আসতো (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

খুলনার নজরুল ইসলাম বলেন, 'আগের সিনেমার একটা মান ছিলো। *তেজী*, *পিতা মাতা সন্তান*, *অকৃতজ্ঞ*, *অপেক্ষা*র মতো ভালো ভালো সিনেমা এখানে চলেছে। এসব সিনেমা সাত–আট সপ্তাহ ধরে চলতো। এখন কোনো সিনেমা এক সপ্তাহের বেশি চলে না। অবস্থা খুব খারাপ (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৯)।' নজরুলের কথার সমর্থন পাওয়া যায় খুলনার মো. হালিমের কথায়। তিনি দাবি করেন, 'ভালো সিনেমা হলে দর্শক দাঁড়িয়ে সিনেমা দেখবে। মানুষ সিনেমাহলে সিনেমার জন্য আসে, হলের জন্য আসে না। এক সময় আমরা ১৪০০ সিটের হলে ২০০০ টিকেট বিক্রি করছি। মানুষ দাঁড়াইয়ে দাঁড়াইয়ে সিনেমা দেখছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৬)।'

সমীর কুমার মণ্ডল আরো বলেন,

> তখন পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সিনেমা নিয়ে আসলেও, সাত দিনে এক লক্ষ টাকা বিক্রি হতো। এমন একটা সময় তখন ছিলো, সিনেমা মুক্তি দিলেই হাজার হাজার টাকা ব্যবসা হতো। আবার এমনও হয়েছে, ৮০ হাজার টাকা দিয়ে সিনেমা এনে ২০ দিন চালানোর পর তিন–সাড়ে তিন লক্ষ টাকা শুধুলাভ হয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

এই দশকে কিছু চলচ্চিত্রে একই সঙ্গে আলমগীর-শাবানা, আলমগীর-ববিতা ও সালমান-মৌসুমী কিংবা সালমান-শাবনূর, সালমান-শাবনাজ এই জুটির সমন্বয় দেখা যায়; উদাহরণ হিসেবে *স্নেহ* (১৯৯৪), *সত্যের মৃত্যু নাই* (১৯৯৬), *মায়ের অধিকার* (১৯৯৬) এর কথা বলা যায়। এই চলচ্চিত্রগুলো সব শ্রেণির দর্শকের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিলো। এগুলোতে যেমন টিনএজ প্রেম ছিলো সঙ্গে সামাজিক গল্পের প্লটও পাওয়া যেতো।

১৯৯৬-এর সেপ্টেম্বরে সালমানের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত **ঢাকাই চলচ্চিত্রে ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রের তিনটি ধারা দেখা যায়**।

> প্রথমটি, **সালমান শাহ অভিনীত টিনএজ প্রেম এবং প্রেম ও অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র**;
>
> দ্বিতীয়টি, **আলমগীর-শাবানা-ববিতা, জসীম-শাবানা, জসীম-ববিতা এবং সালমান শাহ্ অভিনীত সামাজিক ও সামাজিক অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র** এবং
>
> তৃতীয়টি, **মান্না অভিনীত অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র**।

এর বাইরে রুবেল ও হুমায়ুন ফরিদী এবং নির্মাতা শহীদুল আলম খোকনের বেশ কিছু চলচ্চিত্র জনপ্রিয়তা পায়। ৯০ দশকের চলচ্চিত্র নিয়ে নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহানের সঙ্গে কথা হয় এফ ডি সি'র পরিচালক সমিতির অফিসের বারান্দায়। সেদিনের সন্ধ্যার সেই সাক্ষাৎকারে সোহান বলেন,

> ৯০-এর দশকে দর্শক সিনেমা চয়েস করার একটা জায়গা পেলো। আমি রোমান্টিক ছবি দেখবো, না অ্যাকশন ছবি দেখবো, না প্রতিবাদী কোনো সিনেমা দেখবো। সেটা দেখার সুযোগ এসময় ছিলো। এছাড়া সব ধরনের

সিনেমা দেখার মতো দর্শকও কিন্তু আমাদের ছিলো। সালমানের এক ধরনের জনপ্রিয়তা ছিলো, মান্নার অন্য ধরনের (আখ্যানের ক্রম ৫.৫; ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

সিলেটের 'নন্দিতা'র প্রধান ফটকের গেইম্যান আইয়ুব আলী বলেন, 'কাটপিস সিনেমা আসার আগে সালমান শাহ ও পরে মান্নার সিনেমা খুব ব্যবসা করছে। বিশেষ করে মান্নার সিনেমা আসলে কাট কাট মার মার ব্যবসা হতো। এই দুই নায়ক মারা যাওয়ার পর সিনেমার ব্যবসায় প্রথম ধস নামে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৩)।' সিলেটের মোস্তফা চৌধুরী বলেন, '১৯৯০ সাল পর্যন্ত সিনেমার ব্যবসা ভালো ছিলো। ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্তও সিনেমাহল চলেছে মোটামুটি। তারপর সব শেষ (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৩)।'

সেই সময়ের প্রযোজনা ও পরিবেশনা নিয়ে নওগাঁর সমীর কুমার মণ্ডল বলেন,

> ধরেন একটা সিনেমার কাজ চলছে, ছয় মাস পরে মুক্তি পাবে, ছয় মাস আগেই প্রযোজককে টাকা দেওয়া হতো। ধরেন, ১৯৯৬ সালে যেসব সিনেমা চলবে, তার ছয় মাসের সিনেমা ১৯৯৫ সালেই বুকিং দেওয়া হতো। আবার এই ছয় মাসে পরের ছয় মাসের সিনেমাগুলো কেনা হতো। তখন আমরা ঢাকায় গিয়ে পরিচালক-প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলতাম। সবমিলিয়ে খুব ভালো পরিবেশ ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

সমীর আরো বলেন,

> আগে ঢাকার 'মধুমিতা'তে সিনেমাটা যেদিন মুক্তি পেতো, সেদিন সেই সিনেমার নায়ক-নায়িকা, পরিচালক আসতো; আমাদেরও দাওয়াত করতো। আমরা যেতাম। সাধারণত ছয়টা থেকে নয়টার শো এর পর ৯–১২টার শো বন্ধ করে দিয়ে হলমালিকসহ সবাই মিলে নতুন সেই সিনেমা দেখা হতো। প্রযোজক আমাদের অ্যাপ্যায়ন করাতো। সিনেমা দেখার পর ভালো লাগলে আমরা হয়তো সঙ্গে সঙ্গে বুকিং দিয়ে দিতাম। এভাবে মার্কেটিং হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

সেই সময়ের প্রযোজকদের ব্যবসার অবস্থা নিয়ে সিলেটের মোস্তফা চৌধুরী বলেন,

> ২০০১ সালের পরেই বাংলাদেশের নামি-দামী প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে লাগলো। এই যেমন ধরেন এস এস প্রোডাকশন ছিলো সাদিক সাহেবের। তিনি নায়িকা শাবানার স্বামী। তারা বছরে কম করে হলেও পাঁচটা সিনেমা করতো। ওনার কাছে সব সময় আমার দেড়-দুই লাখ টাকা পড়ে থাকতো। উনি তিনটি সিনেমার বিপরীতে অগ্রিম আমার কাছে টাকা নিয়ে রাখতেন (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৩)।

তবে সালমানের মৃত্যুর পর ঢাকাই চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির মাত্রাগত পরিবর্তন আসে। এই সময় সালমানের রোমান্টিক নায়কের ইমেজকে দখলের জন্য দুই–তিন জন নায়কের আগমন ঘটলেও তারা সফল হতে পারেনি। ফলে সালমানের অনুপস্থিতিতে বড়ো ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়। নতুন নায়কদের চলচ্চিত্রগুলো কোনোভাবেই ভালো ব্যবসা করতে পারছিলো না। সিলেটের মোস্তফা চৌধুরী বলেন,

> সালমান ছিলো একই সঙ্গে অ্যাকশন ও রোমান্টিক নায়ক। আর মান্না ছিলো পুরোপুরি অ্যাকশন হিরো। এই ধরনের নায়কের অভাব এখন বাংলাদেশে। সালমানের মৃত্যুর পর তবু কিছুদিন মান্না চালিয়ে নিয়েছে। তারপরও সালমানের অভাব পূরণ হচ্ছিল না। কিন্তু মান্নার মৃত্যুর পর শাকিব খান ছাড়া তো এখন আর কেউ নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৩)।

কুষ্টিয়ার মো. নাঈম বলেন, '৯০ এর দশকে একজন নায়ক আসলো সালমান শাহ, সিনেমার ব্যবসা কিছু দিন জমজমাট চললো। আমরা মনে করলাম, যাক এভাবে মনে হয় চলবে। বেচারা গেলো মারা। তার মারা যাওয়ার পর সিনেমায় কেমন জানি একটা ধস নামলো। সালমান শাহের পরে আর নায়ক নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫৬)।'

সালমানের মৃত্যুর পর টিনএজ প্রেমনির্ভর চলচ্চিত্র ধারাটি মার খেয়ে যায়। অন্যদিকে আলমগীর-শাবানা, জসিম-শাবানা অভিনীত সামাজিক ও সামাজিক অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্রগুলোর ব্যবসাও কমে যায়। এই পরিস্থিতিতে প্রেক্ষাগৃহ থেকে নারী দর্শক কমে যেতে থাকে। নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহান বলেন, 'সালমানের মৃত্যুর পর কিছু দর্শক খুব কষ্ট পায় এবং তারা আর সিনেমা দেখেনি। এটা প্রত্যেক স্টারের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সালমানের কিন্তু সব শ্রেণির দর্শকের মধ্যে জনপ্রিয়তা ছিলো। কারণ একই সঙ্গে সে রোমান্টিক ও অ্যাকশন হিরো ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৫.৫; ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।'

সালমানের মৃত্যুতে ইন্ডাস্ট্রিতে মান্নার দায় বেড়ে যায়। কিন্তু মান্নার একার পক্ষে এটা সামাল দেয়া কঠিন ছিলো। পর্দায় মান্না মূলত বেশির ভাগ চলচ্চিত্রে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে হাজির হতেন। তার অভিনীত চলচ্চিত্রগুলোতে সামাজিক নানা অসঙ্গতি উঠে আসতো। দর্শকও তাকে গ্রহণ করতে থাকলো। খুলনার নাঈম বলেন, 'মান্নার সিনেমা ভালোই ব্যবসা করতেছিলো; তার ডায়লগ, অভিনয় দেখে সাধারণ মানুষজন খুব মজা পেতো; হাত তালি দিতো। এই সময় বিভিন্ন জায়গায় ডিসলাইন আসা শুরু হলো। তখন চ্যানেল ছিলো ১২টা। এই চ্যানেল আসার পর তো আমাদের পুরাই মাথা খারাপ (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৭)।'

মান্না অভিনীত চলচ্চিত্রগুলোর কাহিনি নিয়ে যশোরের 'মণিহার'-এর চলচ্চিত্র প্রতিনিধি মাসুদ শেখ বলেন,

> আগে বাস্তবের সঙ্গে মিল রেখে পরিচালকরা সিনেমা করতো। কোনো সিনেমা দেখতে গিয়ে আমরা জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পেতাম। কেউ কেউ সেটা দেখে ভেউ ভেউ করে কেঁদে বের হয়েছে। মান্নার *আম্মাজান* দেখে অনেকে কেঁদেছে। এখনকার দর্শক তো আর সেই কান্নার সিনেমা দেখতে চায় না। তারা এনজয়, আনন্দ খোঁজে। ফলে দুঃখ-কষ্টের সিনেমা আর চলে না। আগের আর বর্তমানের দর্শকের মধ্যে এখন অনেক ফাঁরাক (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৩৩)।

৯০ দশকের একেবারে শেষের দিকে মান্নার সঙ্গে যুক্ত হন খলঅভিনেতা ডিপজল। "মান্না-ডিপজল জুটিনির্ভর 'সহিংসতা-গোলাগুলি-ঢাকাইয়া স্ল্যাং' মার্কা এ্যাকশন ছবিগুলো টিন-এজ প্রেম, পারিবারিক সেন্টিমেন্ট, মার্শাল আর্টনির্ভর খোকনীয় চলচ্চিত্র—সবকিছুকে ম্লান করে দেয়। প্রবল এ্যাকশন, প্রচণ্ড সহিংসতানির্ভর এসব ছবিতে নায়িকার ভূমিকা ছোট হয়ে আসতে থাকে" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬৩)। এই চলচ্চিত্রগুলো এ সময় ব্যবসা সফল হয়। এই সময়টাতে কোনো কোনো চলচ্চিত্রে কাটপিস আকারে যৌনতানির্ভর দৃশ্যের আগমন ঘটে। রংপুরের তছলিম উদ্দিন বলেন,

৯০ দশকের শেষের দিকে সিনেমা ব্যবসাটা মার খেয়ে গেলো। তখন কিছু উৎশৃঙ্খল দৃশ্য সিনেমায় আসা শুরু হলো। এগুলো থাকলে তো আর মহিলা আসবে না। একটা ব্যাপার শোনেন, সিনেমাহলে মহিলা দর্শক না থাকলে সেটা কখনোই ভালো ব্যবসা করতে পারবে না। কারণ মহিলা আসলেই পুরুষ সিনেমাহলে আসবে। ওইসব সিনেমার কারণে একপর্যায়েমহিলারাসিনেমাহলে আসা প্রায় বন্ধ করে দিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২৪)।

যশোরের আব্দুর রশীদ ওই সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

শুরুতে 'মণিহার'-এ বছর দশেক ভালোই ছিলো। একটু একটু করে খারাপ হতে শুরু করলো। তারপর যখন বুঝলাম, ব্যবসাটা বেশি খারাপের দিকে যাচ্ছে, ওই বেতনে সংসার চালানো নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, তখন মালিকের সঙ্গে কথা বলে হলের সামনে এই দোকানটা নিই। ভিসিআর, ডিসলাইনের কারণে কিছু দর্শক কমে গেছে ঠিক; তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে ন্যাংটা সিনেমাগুলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২৮)।

রংপুরের রফিকুল বারীও একই ধরনের কথা বলেন, '৯০ দশকের শেষের দিকে কিছু খারাপ সিনেমা আসে বাংলাদেশে। এসব সিনেমার কারণে নারী দর্শক একেবারে কমে যায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৪)।'

তবে কাটপিসযুক্ত চলচ্চিত্রগুলোও শুরুতে ভালো ব্যবসা করতে থাকে। কিন্তু ততোদিনে নারী দর্শকের ৯০ ভাগ প্রেক্ষাগৃহে আসা বাদ দিয়েছে। যে দুই-চার জন মধ্যবিত্ত কালেভদ্রে প্রেক্ষাগৃহে ঢু মারতো তারাও আসা বন্ধ করে দেয়। প্রেক্ষাগৃহের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় পুরোপুরি নিম্নবিত্তের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে। 'নব্বই দশকের শেষভাগেও দেখা গেছে বছরে ৮/১০টি ছবি দারুণভাবে ব্যবসা সফল হয়েছে। ... এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, '৯৮–৯৯ সালের দিকে সিনেমা হলের গড় টিকিট বিক্রির পরিমাণ ছিল ৬৫ থেকে ৭০ ভাগ' (জেয়াদ ২০১০, পৃ৩৫৩)। তবে এই পরিসংখ্যান সাময়িক ব্যবসার জন্য আরামদায়ক হলেও কয়েক বছরের মধ্যে তা উল্টো পরিসংখ্যান নিয়ে হাজির হয়েছে। এছাড়া ৯০ দশকে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তের ঘরে জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। বরিশালের বন্ধ হয়ে যাওয়া 'বিউটি'র ব্যবস্থাপক ফারুক হোসেনের সঙ্গে কথা হয়। ফারুক বর্তমানে বরিশাল শহরে একটি বিরিয়ানির দোকান চালান। সেই দোকানে বসেই কথা হয় তার সঙ্গে। ফারুক বলেন,

ন্যাংটা সিনেমার শুরুর সময়ে সিনেমাহল ব্যবসার কথা এখন কাউকে বললে বিশ্বাস করানো যাবে না। আগের দিনে টিকেট বিক্রির টাকা পরদিন সকালে আমি দুইটা ব্রিফকেসে ভর্তি করে ব্যাংকে নিয়ে যেতাম। এটা ছিলো আমার নিয়মিত কাজ। প্রথমে 'বিউটি'তে তিনটা শো চলতো, পরে চারটা করা হয়। প্রত্যেকটা শো হাউসফুল ছিলো। যেকোনো সিনেমা আনলেই ব্যবসা ভালো হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১০)।

সাতক্ষীরার দেবাহাটার শ্রী বিশ্বজিৎ কুমার ঘোষ বলেন,

সিনেমাহলে তখন প্রতিদিন ৫০ টাকা করে বেতন ছিলো। তবে তাতে সমস্যা হতো না। কারণ অন্য রোজগার ছিলো। 'ইছামতি'তে তখন খুব ব্ল্যাকে টিকেট বিক্রি হতো। এতো লোক হতো যে, ১০ টাকার টিকেট মানুষ

২০ টাকায় কিনতে কোনো সমস্যা করতো না। এসব টাকা কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ হতো। বেতনের বাইরে আমরা প্রতি মাসে তিন-চার হাজার টাকা ভাগ পেতাম। এটা সবাই জানতোও। মালিকও এখান থেকে একটা ভাগ পেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩৫)।

কুষ্টিয়ার মো. নাঈম বলেন,

> সালমান শাহ মারা যাওয়ার পর মান্না, রুবেল এরা তো সাধারণত অ্যাকশন সিনেমা করতো; এদের সিনেমার মধ্যে এক-দুইটা কমার্শিয়াল গান থাকতো। এসব গান কিন্তু একেবারে ন্যাংটা না। আমার মনে আছে মান্নার একটা সিনেমা ছিলো *প্রেম দিওয়ানা*; এতে শহরের ওই বড়ো বড়ো পাইপ আছে না ময়লা যাওয়ার সেখানে মান্না-চম্পার একটা কমার্শিয়াল গান ছিলো। ওই গানটা দেখার জন্য অনেকে চারবার করে ওই সিনেমা দেখছে। কিন্তু পরে সব ওপেন হয়ে গেল (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫৬)।

একটু খেয়াল করলে বোঝা যায়, ৯০ দশকে দেশের চলচ্চিত্র কিন্তু চার ধরনের সঙ্কটের মধ্যে পড়ে।

প্রথমত, **ভিসিআর ও পরবর্তী সময়ে সিডি'র প্রভাব;**

দ্বিতীয়ত, **বসার ঘরে স্যাটেলাইট টেলিভিশন;**

তৃতীয়ত, **বিদেশ থেকে আমদানি করা বিপুল পরিমাণ চলচ্চিত্র** ও

চতুর্থত, **যৌনদৃশ্য সম্বলিত চলচ্চিত্র নির্মাণ**।

এর বাইরে পাইরেসি তো ছিলোই। পাইরেসি নিয়ে ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেন বলেন, 'অনেক প্রযোজক-পরিচালক সিনেমা পাইরেসির সঙ্গে জড়িত। আগে তাই কোনো সিনেমা মুক্তির আগেই পাইরেসি যারা করে তাদের সঙ্গে আমরা দুই-তিন মাসের জন্য চুক্তি করা হতো তিন-চার লক্ষ টাকায়, যাতে পাইরেসি না হয়। তারপরেও অবশ্য ওই সিন্ডিকেট পাইরেসি করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।' সাতক্ষীরার দেবাহাটার শ্রী বিশ্বজিৎ কুমার ঘোষ বলেন,

> এখানে কাজ করার আগে আমি নিজে কিছু দিন ঢাকায় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি। আমি নিজেও একবার পারুলিয়াতে আসছিলাম এজন্য; কেউ যেনো প্রিন্ট থেকে সিডি না করে এটা দেখার জন্য। প্রডিওসাররাই তখন আমাদের সিনেমাহলে পাঠাতো; তারাই বেতন দিতো। তখন অনেক লোক এই কাজ করছে। কিন্তু এখন আগের সেই ব্যবসাও নাই, লোকজনও নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩৫)।

এই দুইজনের কথার সমর্থন পাওয়া যায় নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহানের কথাতেও। তার ভাষ্যমতে,

> পাইরেসি বন্ধ না হওয়ার কারণে একের পর এক সিনেমা ব্যবসা না করায়, প্রযোজকরা সমস্যায় পড়ে। এই পরিস্থিতিতে কোনো কোনো প্রযোজক কাটপিসযুক্ত সিনেমা বানাতে থাকে। পাইরেসি বন্ধ করা যাচ্ছিল না, কারণ সেসময় এ নিয়ে ভালো আইন ছিলো না। অন্যদিকে সেন্সর বোর্ডের কিছু সদস্যও এসব সিনেমা ছাড়পত্র পাওয়ার ব্যাপারে যে সহযোগিতা করেনি এমন নয়। এই সবকিছু মিলেই আসলে অবক্ষয়টা শুরু হয় (আখ্যানের ক্রম ৫.৫; ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

তবে চলচ্চিত্রে কাটপিস যুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে নির্মাতা কামার আহমেদ সাইমন ব্যাখ্যা করেন খানিকটা অন্যভাবে। তার যুক্তি হলো—

> ৯০-এর শেষে যৌনতা বা কাটপিস নির্ভর চলচ্চিত্র আসার মূল কারণটা ছিলো ভিএইচএস। মধ্য ৮০তে ভিসিআর আসা শুরু করে বাংলাদেশে। তখন ঢাকা শহরের অনেক অলিগলিতে শো চলতো। মানুষ সেটা দেখেছে, পাঁচ-দশ টাকার বিনিময়ে। এই সময়ে কিছু হিন্দি সিনেমা আসছে যেমন, *সিলসিলা*, *কুলি*। অন্যদিকে বি ডি আর ও গ্যারিসনে এক টিকিটে দুই সিনেমা চলতো। এখন প্রশ্ন বি ডি আর ও গ্যারিসনে এই সিনেমা দেখানোর অনুমতি কে দিলো? এই কথা তো বলা যাবে না। তখন গ্যারিসন মানেই নিষিদ্ধ, প্রচণ্ড উত্তেজনা। লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেরা সেখানে যেতো। এখন ৯০-এর শেষের দিকে সিনেমার বাজার যখন পড়তি, তখন পরিচালকরা গ্যারিসন-বি ডি আর-এর এসব সিনেমা কপি করবে না, তো কী করবে! আপনার দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর পাশের দোকানে দুই টাকার নুল্‌ডস বিক্রি হচ্ছে, আপনি তখন কী করবেন দোকান বন্ধ করবেন নাকি দুই টাকার নুল্‌ডস বিক্রি করবেন (আখ্যানের ক্রম ৫.২; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

সবমিলিয়ে দেশীয় চলচ্চিত্রে অল্প সময়ের মধ্যে উপরে আলোচিত বিষয়গুলোর (ভিসিআর, ডিস, চলচ্চিত্র আমদানি, যৌনচলচ্চিত্র) প্রভাব পড়ে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে। “ফলে দুয়েকটি *বেদের মেয়ে জোছনা* বা *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* হঠাৎ সাফল্য পেয়ে গেলেও আমাদের এফডিসিকেন্দ্রিক মূলধারার সিনেমা তখন ডুবন্ত টাইটানিকে পরিণত হয়েছে, যাকে আর টেনে তোলা সম্ভব ছিল না। ফলে অশ্লীলতা-কাটপিস-পাইরেসি ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যতই শোরগোল উঠুক, ফুকের মতোই তা হারিয়ে গেছে’ (আহমেদ ২০১৮, পৃ১১৪)। চলচ্চিত্রের মানসহ আরো অন্যসব অনুষঙ্গ চলচ্চিত্রের ব্যবসাকে ভয়াবহ রকমের চাপের মধ্যে ফেলেছে।

আর এর ফল হিসেবে একে একে বন্ধ হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ। মূলত ১৯৯০ সাল থেকেই দেশে প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হওয়া শুরু হয়। প্রদর্শক সমিতির হিসাব অনুযায়ী ১৯৯০–১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বন্ধ হওয়া প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ২১০টি (সারণী ৫.১.৪)।

সারণী ৫.১.৪ : ৯০ দশকে প্রেক্ষাগৃহ বন্ধের তালিকা

বন্ধের বছর	বন্ধ হওয়া প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা
১৯৯০ সাল	৩০
১৯৯১ সাল	২৪
১৯৯২ সাল	১৮
১৯৯৩ সাল	১২
১৯৯৪ সাল	২১
১৯৯৫ সাল	২৪
১৯৯৬ সাল	২৭
১৯৯৭ সাল	৯
১৯৯৮ সাল	১৫
১৯৯৯ সাল	৩০

সূত্র : হকি ও আবদুল্লাহ, ৩ জুলাই ২০১১

প্রেক্ষাগৃহ বন্ধের এই সারণীটি খেয়াল করলে দেখা যায়, একেবারে এই দশকের শুরুতে এবং শেষে প্রেক্ষাগৃহ বন্ধের হার অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু মাঝের বছরগুলোতে সেই পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে বলে মনে হয়, ৮০ দশকে কেবল বিনোদন বিক্রি করতে গিয়ে প্রেক্ষাগৃহগুলো

তাদের সামাজিক ভিত্তি নষ্ট করে ফেলে। ফলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার যে অবস্থান ছিলো সেটা ভয়াবহ রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার প্রভাব পড়ে ৯০ দশকের শুরুতে একের পর এক প্রেক্ষাগৃহ বন্ধের মাধ্যমে। তবে এই পরিস্থিতিতে একেবারে নতুন গল্প ও অভিনয়শিল্পী দিয়ে চলচ্চিত্রের অবস্থা কিছুটা হলে ফেরানোর চেষ্টা করেন এহতেশাম *চাঁদনী* (১৯৯১) মাধ্যমে। তারই ধারাবাহিকতায় পরে আসে *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* (১৯৯৩)। এতে প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে এবং তারা কিছুটা সফলও হন। কিন্তু নানাবিধ কারণেই সেই চেষ্টা খুব বেশি দূর এগোয়নি। ৯৭, ৯৮ এর পর থেকে তো একেবারে নতুন ধরনের এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ফলে এই দশকের শেষে দর্শক আবারও মুখ ফিরিয়ে নেন। আর শুন্য দশকে গিয়ে তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

৫.৭.১) নতুন ট্যাক্স, নতুন সঙ্কট

১৯৯০ সালের জুলাই থেকে সরকার থানা পর্যায়ের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে শতকরা ১০০ ভাগ কর ধার্য করে। ৯০-এর জুন পর্যন্ত এই হার ছিলো শতকরা পাঁচ ভাগ থেকে ১২ ভাগ পর্যন্ত। সরকারের নতুন ট্যাক্স নীতির কারণে থানা পর্যায়ের ৬১৫টি প্রেক্ষাগৃহের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং কিছু সংখ্যক প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হয়ে যায় (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪২৬)। কিন্তু ১৯৯১–১৯৯২ অর্থবছরে সরকার প্রমোদকর আদায়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯১ এর ১ জুলাই থেকে আগের ক্যাপাসিটি ট্যাক্সর জায়গায় চালু করা হয় মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট (Value Added Tax)। এই নিয়মে প্রত্যেক মাসের জন্য প্রেক্ষাগৃহগুলোকে কর দায়িতার বিবরণ সম্বলিত দাখিল পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সুপারিনটেনডেন্টের কাছে পেশ করা বাধ্যতামূলক ছিলো। এই প্রথম প্রবেশ মূল্যের শতকরা ৮৫ ভাগ মূল্য সংযোজন কর দেওয়ার বিধান চালু হয়।

প্রতি সপ্তাহে যে পরিমাণ দর্শক প্রেক্ষাগৃহে আসবে প্রদর্শকরা সেই অনুপাতেই সপ্তাহে এই কর জমা দেবেন। "এই পদ্ধতি চালুর পর সরকার থেকে আশা প্রকাশ করে বলা হয়, এতে টিকেটের দাম কমবে। কারণ পূর্ববর্তী নিয়মে দর্শককে প্রবেশ মূল্যের শতকরা ১ শ ২৫ ভাগ আবগারী কর দিতে হতো। নতুন নিয়মে তাদের দিতে হবে ১১২১/২ [১১২.৫] ভাগ। অন্যান্য চার্জ বাদ দিয়ে ক্যাপাসিটি ট্যাক্স প্রথায় ৪ টাকা প্রবেশ মূল্যের একটি টিকেট দর্শককে কিনতে হতো ৯ টাকায়। নতুন নিয়মে সেই টিকেট দর্শককে কিনতে হবে ৮.২৫ টাকায়" (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪২৬–৪২৭)। অবশ্য এই হিসাব বিবেচনায় না নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ মালিকরা সেসময় টিকিটের দাম গড়ে দুই টাকা হারে বাড়িয়ে দেন। এ নিয়ে যশোরের মো. তোফাজ্জল বলেন,

> দেখেন, যদি ভালো ব্যবসা থাকে তাহলে ট্যাক্স-ফ্যাক্স কোনো ব্যাপার না। আবার ভালো সিনেমা হলে দর্শকের কাছে এক–দুই টাকা বেশি টিকেটের দামও কোনো সমস্যা না। কারণ দর্শক ১২ টাকার টিকেট ব্ল্যাকে ৫০ টাকায় কিনে সিনেমা দেখেছে। এখন তো ক্যাপাসিটির টেন পারসেন্ট লোকও সিনেমা দেখতে আসে না। যখন ব্যবসা হয়েছে, তখন আমরা একশো সাড়ে বারো পারসেন্ট ট্যাক্স দিয়েছি। এখন তো মাত্র ফিফটিন পারসেন্ট ট্যাক্স। তাও সিনেমাহল চালানো যাচ্ছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৯)।

তবে একথা ঠিক যে, টিকেটের উচ্চমূল্য দর্শকের প্রেক্ষাগৃহে যাওয়ার ব্যাপারে বড়ো কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিলো না কখনোই। দর্শকের মনে লাগলে সেই চলচ্চিত্র তারা সব সময়, সব পরিস্থিতিতেই দেখেছে।

৫.৮) চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী

৯০ দশকে চলচ্চিত্র নির্মাণে কিছুটা পরিবর্তন আসে। ১৯৯১ সালে শাবনাজ-নাঈমের চটুল প্রেম ও নৃত্যগীত সমৃদ্ধ *চাঁদনী* ব্যাপক মুনাফা করে। এর মধ্য দিয়ে একেবারে নতুন ধরনের কিছু ছেলেমেয়ে চলচ্চিত্রের অভিনয়ে যুক্ত হন। সব দিক থেকেই এরা আগের প্রজন্মের চেয়ে খানিকটা এগিয়ে ছিলো। কুড়িগ্রামের 'মিতালী'র কর্মচারী মিরাজের সঙ্গে কথা হয় এসময়ের নানা বিষয় নিয়ে। মালিকের আত্মীয় মিরাজ মূলত এখন প্রেক্ষাগৃহটি দেখাশোনা করেন। প্রধান ফটকে বসেই তিনি তিনটার শোয়ের টিকেট বিক্রি করছিলেন। মিরাজ বলেন,

> *চাঁদনী*, *কেয়ামত থেকে কেয়ামত*, *দেনমোহর*, *স্বপ্নের পৃথিবী* এই সিনেমাগুলোর কাহিনি, নির্মাণ তখন অন্যরকম ছিলো। আগের সিনেমা থেকে এই সিনেমাগুলো একেবারে অন্যরকম। সেটা নায়কের পোশাক বলেন, আর অভিনয় বলেন, সব আলাদা ছিলো। প্রথমে সালমান শাহ্, পরের দিকে রিয়াজ, ফেরদৌস; এদের সব কিছু একেবারে নতুন ছিলো। এদের হাটাচলা, কথা বলাও ছিলো অন্যরকম। দর্শক এদের সিনেমা সেসময় খুব দেখেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৪)।

কুড়িগ্রামের স্বর্ণমহল-এর নৈশপ্রহরী মো. দুলাল হোসেন বলেন, 'এসব সিনেমার কাহিনি আগে থেকে বোঝা যেতো না। আগে যেমন সিনেমা দেখলে শেষে কী হবে বলা যেতো। এদের সিনেমায় সেটা ছিলো না। নায়কও মাঝে মাঝে মারা যেতো। নায়ক মারা গেলেও তার একটা অন্যরকম ফিনিশিং ছিলো। আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১)।'

তবে এই দশকের চলচ্চিত্রে ভারতীয় চলচ্চিত্রের কিছুটা প্রভাব ছিলো বলে অভিযোগ (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬২) রয়েছে। ফাহমিদুল হক ও গীতি আরা নাসরীন ৯০ দশকের শুরুতে স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্যাবল-টেলিভিশনের আগমনে ভারতীয় ও ইংরেজি চলচ্চিত্রের সহজলভ্যতাকে এর কারণ মনে করেন। এটা হয়তো ঠিকও। তবে দর্শক এগুলো খুব বেশি আমলে নেননি। বরং আগের দশকগুলোর চেয়ে কিছুটা নতুনত্ব এই দশকে ছিলো বলে তারা এসব চলচ্চিত্র আগ্রহ নিয়ে দেখেছেন। এই সময়ের চলচ্চিত্র নিয়ে খুলনার মো. হালিম বলেন,

> বাংলাদেশে নতুন ধরনের একটা লাভ স্টোরি সিনেমা শুরু হয় *চাঁদনী* থেকে। এসব সিনেমার সব কিছুই আলাদা ছিলো। ওই সময় আমি বিয়ে করি। সেই সময় সিনেমার যে সেল ছিলো, আমি নতুন বউয়ের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতাম না। দর্শক কী আগ্রহ নিয়ে এসব সিনেমা দেখছে। এখন সেইসব কথা মনে হলে কষ্ট লাগে। তাই এখন সিনেমাহল নিয়ে কিছু বলতে ভালো লাগে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৬)।

৯০ দশকের শুরুতে পারিবারিক সেন্টিমেন্ট নির্ভর কিছু সামাজিক ও সামাজিক অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। মূলত শাবানা-আলমগীর ও জসিম-শাবানা জুটিকে কেন্দ্র করে এই চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণ হতে থাকে। এইসব চলচ্চিত্রের কাহিনিতে একেবারে কাঠামোবদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার হাজির থাকতো। এইসব গল্পের নারীরা সব সময়ই মমতাময়ী, ত্যাগী, অসহায়, কুটবুদ্ধি সম্পন্ন, অন্যের ভালো দেখতে না পারা চরিত্রে রূপদান করতেন। দুই–একটি চলচ্চিত্রে একটু ভিন্নভাবে নারীর উপস্থাপন হলেও দিনশেষে তারা আখ্যানে পুরুষের সহায়তা ছাড়া কিছুই করতে পারেনি। তবে চলচ্চিত্রের আধেয়ের এসব সীমাবদ্ধ দর্শককে খুব বেশি ভাবায়নি। বরং ৯০ দশকের এসব চলচ্চিত্র নিয়ে তারা প্রশংসাই করেছেন। যশোরের প্রদীপ দাস বলেন,

> ‘মণিহার’-এ চলছিলো *পিতা মাতা সন্তান*, ‘নিরালা’য় চলেছে *বাংলার বধূ*। সিনেমার নামের সঙ্গে, গল্পের আর গানের কী মিল! অনেক দর্শক তো কান্নাকাটি করতো এসব সিনেমায় শাবানার অভিনয় দেখে। দর্শক এই সব সিনেমা যে কী আগ্রহ নিয়ে দেখছে। সেটা বলার মতো নয়। সেসব এখন আর নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১২)।

এসব চলচ্চিত্রের পাত্র-পাত্রী নিয়ে ময়মনসিংহের বদিউল আলম চৌধুরী মামুন বলেন,

> ৯০-এর দশকের সিনেমায় হিরোই থাকতো দুই–তিনজন। হিরোর বাবা থাকতো সাবেক হিরো, মা ছিলো সাবেক হিরোইন। সালমান শাহ্, শাবানা, আলমগীর, ববিতা এধরনের বেশকিছু সিনেমায় অভিনয় করছে। সেগুলো খুব ভালো হয়েছিলো। এসব সিনেমায় দেখা যেতো গড়ে ১২–১৪ জন একই মানের আর্টিস্ট অভিনয় করছে। তাদের অভিনয়ও ভালো ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৫)।

রাজশাহীর ‘উপহার’-এর চলচ্চিত্র প্রতিনিধি এম এ মোমিন রাঙ্গা বলেন,

> আজ থেকে ১৫–২০ বছর পিছনে যান, যখন জসিম, শাবানা, আলমগীর অভিনয় করতো; তখন সিনেমার মান, অভিনেতাদের মান, গল্পের মান ভালো ছিলো; সঙ্গে ডিরেক্টররাও। বিশেষ করে সিনেমার গল্পটা আপনি যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টাইট রাখতে পারেন, সেই সিনেমা ব্যবসা করবেই। মনে করেন সিনেমা শুরু করে মাঝখানে গিয়ে যদি স্লো হয়ে যায়, তাহলে সে সিনেমা আর চলবে না। আমাদের দেশে স্লো সিনেমা চলতে চায় না (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৬)।

তবে ১৯৯১–৯২ সালে নির্মিত চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষক ও লেখকরা (কাদের ১৯৯৩) (জেয়াদ ২০১১) অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য করেন। তাদের মত, সেসময় চলচ্চিত্রে ভালো কোনো স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিলো না, তথাকথিত যারা ছিলেন, তারা কপিরাইটার। এদের কথার সমর্থন পাওয়া যায় খুলনার ‘সোসাইটি সিনেমা’র মালিক প্রবীণ জাফর আলীর কথায়। তার ভাষ্যমতে, ‘আমাদের সিনেমার ধস নামার কারণ এদেশে না আছে কোনো স্ক্রিপ্ট রাইটার, না আছে স্ক্রিন প্লে রাইটার, না আছে কোনো ভালো ডিরেক্টর, না আছে কোনো গীতিকার। আসলে সিনেমার এই ধস নামাটা শুরু হয়েছে ৯২ থেকে। তখন থেকেই আমাদের সিনেমায় কোনো ধরনের আর্টিস্ট নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১১)।’

চট্টগ্রামের ‘আলমাস’-এর বুকিং ক্ল্যার্ক সাবের আহমেদও একই ধরনের কথা বলেন,

> সমস্যা ৮০-এর দশকেই শুরু হয়েছিলো। আমরা ধরতে পারিনি। আমি তখন টুকটাক হিন্দি সিনেমা দেখতাম, ওইসব সিনেমার কাহিনির সঙ্গে আমাদের অনেক সিনেমার মিল তখন ছিলো। কিংবা ধরেন কয়েকটা সিনেমার কাহিনি মিলে আমাদের এখানে একটা সিনেমা বানানো হতো। তারপরও একেবারে নতুন গল্প নিয়ে আমাদের এখানেও কাজ হয়েছে, কাজী হায়াৎ তার মতো করে সিনেমা ও গল্প বানাতো। তবে অনেকে কাজী হায়াতকেও নকল করেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১২)।

এই দশকের প্রথমার্ধেই কাজী হায়াতের *দাঙ্গা* (১৯৯২) সুপারহিট হয়। ফলে টিনএজ ধারার প্রেমনির্ভর কাহিনির সমান্তরালে অ্যাকশননির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। এই ধরনের চলচ্চিত্রগুলোতে মূলত নায়ক হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন মান্না। তিনি জনপ্রিয় হলেও তার অভিনয়শৈলী ছিলো অবাস্তব। যেমন, তিনি কোনো সাধারণ সংলাপ চিৎকার না করে বলতে পারতেন না। তারপরও মান্নার বেশির ভাগ চলচ্চিত্র দর্শকপ্রিয় হয়। মান্নার বেশিরভাগ চলচ্চিত্রের নির্মাতা ছিলেন কাজী হায়াৎ; চলচ্চিত্রের অভিনয়, তার ভাষা নিয়ে কাজী হায়াতের নিজের ভাষ্য হলো—

> সিনেমার ভাষা বলতে আমি যেটা বুঝি, তা হলো—সিনেমা, যাত্রা ও নাটকের ভাষার মধ্যে ব্যবধান। সিনেমার ভাষা বলতে আমাদের বিদগ্ধ পরিচালকরা সাধারণত প্রতীকের ব্যবহার বোঝে; ধরেন কষ্ট বোঝাতে তারা ভাত উতলানোর দৃশ্য ব্যবহার করতো। কিন্তু আমি মনে করি, এটা সিনেমার ভাষা নয়। সিনেমার ভাষা বলতে আমি যা বুঝি—পর্দায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটি দর্শক একেবারেই সত্য করে দেখতে চায়। এটা তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। যেমন, পর্দায় কোনো কাজের লোককে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে গেলে তার উপযোগী পোশাক লাগবে, এর সঙ্গে তার মুখ দিয়ে তার উপযোগী সংলাপ ও বলার ভঙ্গি লাগবে। এগুলো না থাকলে দর্শক প্রচণ্ডভাবে হোঁচট খাবে (আখ্যানের ক্রম ৫.১; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

কিছু দিন আগে *মনপুরা* ও *আয়নাবাজি*’র ব্যবসা সফলতা নিয়ে কাজী হায়াতের মন্তব্য হলো—

> দুইটা সিনেমা খুব হিট করার পিছনে কারণ হলো, এর চরিত্রগুলো বিশ্বাসযোগ্য ছিলো, কোনো ব্যতয় হয়নি। অনেক দিন পরে দর্শক বিশ্বাসযোগ্য সিনেমা দেখেছে। এই ধরনের সিনেমা খুব বেশি হচ্ছে না; হলেও সেগুলো কোনো কোনো দৃশ্যে হয়তো বিশ্বস্ততা নেই। *মনপুরা* চলার আরেকটি কারণ হলো আমাদের দেশের মানুষেরা সঙ্গীতপ্রিয়। তাদের মনের মতো গান হলে বহু লোক সেই সিনেমা দেখে। এই সিনেমার গানগুলোতে মাটির সুর ছিলো, তাই দর্শকের ভালো লেগেছে (আখ্যানের ক্রম ৫.১; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

মান্নার অভিনয়ে প্রচুর পুনরাবৃত্তি ছিলো, অথচ নির্মাতারা বার বার সেটাই পর্দায় তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। অ্যাকশনধর্মী ও সহিংসতায় পরিপূর্ণ এসব চলচ্চিত্রের কাহিনির দুই–একটি ছাড়া বেশিরভাগই একই ধাঁচের ছিলো। “... কেবল কাজী হায়াৎ-এর ছবিগুলোতে কিছুটা মৌলিকত্ব থাকলেও তা পুনরুৎপাদনের দোষে দুষ্ট, এবং একই হায়াৎ-ফর্মুলায় অন্যরাও অনেক ছবি বানাতে থাকেন, যাতে

একই কাহিনীর পিঠে তারা কেবল সহিংসতার মাত্রা বাড়াতে থাকেন" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬৪)। সহিংসতা বাড়তে থাকার এই পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এক ভয়াবহ পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো। বিশেষ করে এই দশকের শেষের দিকে মান্না-ডিপজল-কাজী হায়াৎ জুটির চলচ্চিত্রগুলো সহিংসতার সব মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এসব চলচ্চিত্রের সংলাপ ছিলো খুবই সঙ্কটপূর্ণ। অবশ্য মান্না ও কাজী হায়াতের চলচ্চিত্র একেবারে ভিন্ন কথা বলেছেন কুড়িগ্রামের 'মিতালী'র দর্শক রবিউল। তার মতে, 'এখনকার সিনেমায় তো কোনো কাহিনি নাই। কাজী হায়াতের সিনেমাগুলোতে কাহিনি ছিলো, সংলাপ ছিলো। সেই কাহিনি অনুযায়ী মান্নার অভিনয়ও ছিলো খুব ভালো। প্রত্যেকটা সিনেমায় শেখার মতো সব অনেক কিছু ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১০)।'

মান্নার চলচ্চিত্র নিয়ে চট্টগ্রামের 'সিনেমা প্যালেস-এর টেকনিশিয়ান সিরাজউদ্দৌলা বলেন,

> মান্নার সিনেমা দেখলে গা গরম হয়ে যেতো। সে কী অভিনয়! মনে হতো আমি নিজেই অভিনয় করতেছি। ওর অনেক সংলাপ আমার মুখস্ত ছিলো। মান্না কোনো রাখঢাক করে কথা বলতো না, আমরা যেমন করে কথা বলি ও সেরকম করেই কথা বলতো, গালি দিতো। দর্শক খুব মজা পেতো। কিন্তু লোকটা হঠাৎ করে মরে গেল। ওর মতো নায়ক আর আসবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৩)!

নিজের চলচ্চিত্রের সংলাপ ও অভিনয় নিয়ে কাজী হায়াতের ভাষ্য হলো—

> আমার সিনেমায় ভালগার ছিলো না, সংলাপে হয়তো কিছুটা সমস্যা ছিলো। কিন্তু সংলাপের ক্ষেত্রে আমার যেটা বক্তব্য— যে চরিত্র যেমন, তাকে সেভাবেই ডিজাইন করতে হয়। তাই আমি তার পোশাক, মুখের ভাষা সেভাবেই দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ডিপজলের ভাষা ডিপজলকে আমি দিয়েছিলাম; ডিপজলের মাতৃভাষা দিয়েছিলাম ডিপজলকে। ডিপজলের বেলায় আমি কোনো সংলাপ লিখতাম না, কেবল যেটা প্রয়োজনীয় সেটা বলে দিতাম। আমি আসলে যেটা চেষ্টা করেছি, ব্যবসায়িক সিনেমার মাধ্যমে—আঁতেল সিনেমার কথা বলছি না, যদিও এই ধরনের সিনেমার দর্শক আমি—দর্শককে বিনোদন দিতে চেয়েছি এবং তারা যেনো স্বেচ্ছায় সিনেমাহলে গিয়ে সেটা দেখে তার চেষ্টা করেছি। এর বাইরে তারা যদি বাড়তি কিছু নিয়ে আসে সিনেমাহল থেকে মানে বিনোদনের পাশাপাশি সমাজের কিছু অঘটন, অপ্রিয় ঘটনা আমি তাদের জানাতে চেয়েছি (আখ্যানের ক্রম ৫.১; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

কাজী হায়াৎ ও দর্শকের কথায় মনে হয়েছে, এসব চলচ্চিত্রে উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। এক শ্রেণির দর্শক যেমন এসব চলচ্চিত্র থেকে বিনোদন পেয়েছেন, তেমনি তাদের মতো করে কিছু হয়তো শিক্ষাও নিয়েছেন। অন্যদিকে নির্মাতা হিসেবে কাজী হায়াৎও তাদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। তবে এসব চলচ্চিত্র সব শ্রেণির দর্শক দেখেননি।

এই দশকে আরেকজন নির্মাতার কথা না বললেই নয়, তিনি হুমায়ূন আহমেদ। **৭০ দশকে জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের যে রাষ্ট্রীয় প্রকল্প ৮০'র দশকে বিকল্পধারার উত্তরাধিকার বহন করেছিলো তারই ধারাবাহিকতাই আসেন হুমায়ূন আহমেদ।** জনপ্রিয় এই কথাসাহিত্যিক এ দশকে *আগুনের পরশমণি*

(১৯৯৪) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নির্মাতা হিসেবে পথচলা শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি* (১৯৯৪) সেসময় মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত দর্শকের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা পায়। সাহিত্যিক হিসেবে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে তার যে জনপ্রিয়তা ছিলো সেটাও এক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক হয়। চলচ্চিত্রটি সে বছর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে জাতীয় পুরস্কারও লাভ করে। এই দশকের শেষের দিকে হুমায়ূন নির্মাণ করেন তার দ্বিতীয় চলচ্চিত্র *শ্রাবণ মেঘের দিন* (১৯৯৯)। কাহিনি, সঙ্গীত, অভিনয় সবমিলে চলচ্চিত্রটি নিয়ে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত দর্শক আবারো নড়েচড়ে বসেন। **অন্যদিকে সমসাময়িক চলচ্চিত্রে সহিংসতা-যৌনতা নিয়ে যে অভিযোগ ওঠে তার বিপরীতে 'সুস্থ' ও 'অসুস্থ' চলচ্চিত্র বলে যে ধারার তৈরি হয় হুমায়ূনের চলচ্চিত্রগুলো সেসময় 'সুস্থ' ধারার চলচ্চিত্রের উদাহরণ হিসেবে হাজির হয়।** এছাড়া বাংলাদেশে সিনেপ্লেক্স বাণিজ্যে যে ধরনের চলচ্চিত্র প্রদর্শন হচ্ছে, তার শুরুটা বলা চলে হুমায়ূন আহমেদের হাত ধরেই হয়েছিলো। পরে এটা এগিয়ে নিয়েছেন আরেক জনপ্রিয় নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।

কোলাজ : হুমায়ূন আহমেদ নির্মিত চলচ্চিত্র ছবি : সংগৃহীত

এবারে আসা যাক, গবেষণা আখ্যানের তথ্য-উপাত্তে দর্শক স্মৃতির প্রাবল্যে এই দশকে যে দুটি চলচ্চিত্র সবচেয়ে এগিয়ে ছিলো সে প্রসঙ্গে। ৯০ দশকের যে দুটি চলচ্চিত্র (সারণী ৫.১.১) নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা হয়েছে তার একটি *আম্মাজান* (১৯৯৯), অন্যটি *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* (১৯৯৩)। কাজী হায়াৎ পারিচালিত *আম্মাজান* (১৯৯৯) এই দশকের অন্যতম ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রও। এছাড়া *কেয়ামত থেকে কেয়ামত*ও ব্যবসায়িক সফলতাসহ নানা কারণেই এই দশকে আলোচিত। এপর্যায়ে এই দুটি চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আম্মাজান-এ নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন ১৯৬০–৭০ দশকের সামাজিক ধারার চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত অভিনয়শিল্পী শবনম। অন্যদিকে *আম্মাজান*-এ মান্নাকে নিয়ে নির্মাতা কাজী হায়াতের মূল্যায়ন হলো, "*আম্মাজন* ছবি মান্নাকে অন্য রকম এক সম্মানের জায়গায় নিয়ে গেছে' (*প্রথম আলো*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)।

আম্মাজান-এর গল্পের ন্যারেটিভ এগিয়েছে রাজুর ভাষায়, সাধারণ কারণ-ফলাফল (cause-effect) ধারা অনুসরণ করে (রাজু ২০১৩, পৃ.৮৮)। প্রথমে বাবার অফিসের বড়োকর্তার হাতে মায়ের ধর্ষিত হওয়া দেখে ছেলে তাকে খুন করে। এরপর মায়ের সঙ্গে ১৪ বছর কারাভোগ করে বেরিয়ে এসে একে একে ধর্ষককে খুন করতে থাকে সেই ছেলে বাদশা। এই পুরো প্রক্রিয়ায় নীরবে আম্মাজান ছেলেকে সমর্থন দেন। চলচ্চিত্রের শেষে আম্মাজানের কথা রাখতে গিয়েই খুন হন বাদশা। কিন্তু সেই খুনেও দর্শকের চোখে বাদশা-ই এগিয়ে থাকেন। আরেক সন্ত্রাসী কালামকে উদ্দেশ্য করে বাদশাকে বলতে (দুই ঘণ্টা ছয় মিনিট ২০ সেকেন্ড) শোনা যায়, 'হায় হায় কালাম কী করলি, ছি ছি ছি, তুই পিছন থাইকা আমারে গুলি করলি'। তার মানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেও যে নীতি- নৈতিকতা আছে, এবং সেটা কালাম মানেননি।

বাদশা যে দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ধর্ষককে খুন করেন, এতে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, মায়ের সেই ধর্ষণের প্রতিশোধ তিনি এখনো নিয়ে চলেছেন। রংপুরে ধর্ষককে খুনের পর ধর্ষিতাকে বাদশা বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং নিজের ছোটোবেলার বন্ধুকে দিয়ে বিয়ে দেন। আবার ঢাকায় এক ধর্ষককে খুনের পর ধর্ষিতার বাড়িতে এসে দেখেন, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে বাদশাকে বলতে (২৩ মিনিট ৩০ সেকেন্ড) শোনা যায়,

> এই যে নারী নির্যাতন, এই যে কলঙ্কটা খুব কষ্টের। ওই যে লিটন, যে ওরে বেইজ্জত করছিলো, ওরে আমি মাইরা ফালাইছি। এই কলঙ্ক নিয়ে কেউ বেঁচে থাকতে চায় না। মেয়েরা হলো আম্মাজানের জাত তো ওদের গার্ড দিয়ে রাখতে হয়। ... ভালো হয়েছে বিয়ে হতো না, খুব কলঙ্ক। বিয়ে দিতে কষ্ট হতো, কেউ বিয়ে করতো না।

তার মানে কখনো বাদশা সেই নারীর পাশে সরাসরি দাঁড়াচ্ছেন, আবার কখনো সমাজের নারীদের ক্ষেত্রে সাধারণত যা ঘটে তাই মেনে নিচ্ছেন। এছাড়া বাদশাকে দেখা যায়, গরীব, অসহায়, দুঃখী মানুষের জন্য অকাতরে অর্থ বিলিয়ে দিতে। সেই উপস্থাপনায় বোঝা যায়, বাদশা নিঃস্বার্থভাবে এই কাজগুলো করেন। এইসব কাজ অনায়াসে বাদশাকে দর্শকের চোখের মণি করে তোলো।

আম্মাজান-এর এক ঘণ্টা ৩০ মিনিটে দেখা যায়, মিজানকে মেরে রিনাকে বাদশা তুলে নিয়ে গেছেন। এই বাড়াবাড়ি সহ্য করতে না পেরে রিনার বাবা সাবেক মন্ত্রী আজিজ খান নিরুপায় হয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে আজিজ বলেন,

> দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। সারা দেশের মানুষ আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। ... আমি এক সময় মন্ত্রী ছিলাম। আজ আমি আমার ইজ্জত নিয়ে বসবাস করতে পারছি না। আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এই ছেলেটির সঙ্গে, অথচ সন্ত্রাসীরা হুমকি দিচ্ছে আমার মেয়েকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। ... আমি পুলিশকেও ভয়ে জানাতে পারছি না। কারণ তাদের প্রতি আমার কোনো ভরসায় নেই।

এরপর রিনা বাড়ি ফিরে আসলে এক ঘণ্টা ৩১ মিনিট ১৬ সেকেন্ডে মেয়ের সামনে আজিজ খানকে বলতে শোনা যায়, 'আমি একজন ভদ্রলোক, এই ছেলেটি একটি ভদ্রলোকের ছেলে, আমরা সন্ত্রাস করবো! বর্তমানে আমরা এই সমাজে দেশে একেবারেই অযোগ্য।' মজার ব্যাপার হলো, আজিজ খান এই কথাগুলো যখন বলছেন, তার সঙ্গে একই সোফায় বসে রয়েছেন শহরের আরেক বড়ো সন্ত্রাসী কালাম। এই কালামকে মন্ত্রী থাকায় অবস্থায় রাস্তা থেকে তুলে এনে কালু থেকে কালাম বানিয়েছেন আজিজ। চলচ্চিত্রের এক পর্যায়ে কালামকে উদ্দেশ্য করে আজিজকে এই কথা সরাসরি বলতেও শোনা যায়। ফলে দর্শকের বুঝতে কষ্ট হয় না, আজিজ একজন গডফাদার, ক্ষমতার পালাবদলে হয়তো আজ খানিকটা অসহায়। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের এই চরিত্র দেখতে দেখতে জনগণ অভ্যস্ত। এমনকি সংবাদপত্রের পাতায় নিয়মিতভাবে এই ধরনের পরিস্থিতির আলোকচিত্রও চোখে পড়ে। এর বিপরীতে যখন বাদশা কোনো গডফাদার ছাড়া একাই অবস্থান নেন, সেটা নিঃসন্দেহে দর্শককে নতুন মাত্রা দেয়। দর্শক মান্নাকে নিজের লোক ভাবতে থাকে। মান্নার সফলতায় খুশি হন, কষ্টে কষ্ট পান। আর এটাই তাদেরকে প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে আসে।

ছবি : সংগৃহীত

বাদশাকে দেখা যায়, রিনা নামের একজন নারীকে জোর করে বিয়ের প্রস্তাব দিতে। নারীর প্রতি এতো সম্মান প্রদর্শন করা বাদশার কেনো এই আচরণ? কারণ আর কিছুই নয়, আরেক নারী আম্মাজান ছেলের বউ হিসেবে পছন্দ করেছেন রিনাকে। বাদশার ভাষ্য, এই ঘটনায় অনেক দিন পর হেসেছেন আম্মাজান। আম্মাজানের এই হাসি বাদশার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। তাই এই হাসির জন্য বাদশা যেকোনো মূল্যে রিনাকে বিয়ে করতে চান। যদিও রিনার সঙ্গে অন্য একজনের প্রেম এবং বাগদানও সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু সেটা মানতে রাজি নন বাদশা, সঙ্গে হয়তো দর্শকও। কারণ এখানে দর্শকের সেই শ্রেণিচেতনা প্রবল। সাবেক মন্ত্রী আজিজ খানের মেয়ে রিনা আর প্রবাসী বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান মিজানকে তারা বিরোধী পক্ষ ভাবতে থাকে। সমাজের নিম্ন শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে বাদশা একজন সাবেক মন্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে করবেন সেটা দর্শককে আনন্দ দেয়। ফলে এর বিপরীতে নারী হিসেবে রিনার যে হাহাকার সেটা দর্শকের চোখ এড়িয়ে যায়। একই সঙ্গে 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত' জাতীয় ধর্মীয় বিবৃতিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে রিনার সঙ্গে মান্না যে অন্যায় আচরণটি করেন সেটি আর অন্যায় থাকে না।

অন্যদিকে ঢাকাই চলচ্চিত্রে গত কয়েক দশকে গল্পের যে কাঠামো, সেখানে নায়কের সঙ্গে নায়িকার দিনশেষে মিলন হবে সেটাই 'নিয়ম' হয়ে উঠেছে। ফলে রিনার প্রেমিক মিজান সেখানে 'খলনায়ক' হিসেবেই হাজির হন। চলচ্চিত্রের প্রথমে দেশ ছেড়ে না যাওয়ার মতো বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মিজান একটা ইতিবাচক ইমেজ তৈরি করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে দেশ ছেড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সমস্যায় পড়লে সমাজের বিত্তবান ও রাজনীতিকরা দেশ ছেড়ে চলে যান বা যাওয়ার প্রস্তুতি রাখেন—স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নব্য ধনিক শ্রেণির বেশিরভাগের ক্ষেত্রে এমন কথা চালু আছে। ফলে এখানেও দর্শকের আজিজ খান, মিজান ও রিনার প্রতি কোনো মায়া সৃষ্টি হয় না। উল্টো নিম্নবিত্তের নায়ক বাদশা খুব জোরালোভাবে তাদের কাছে চলে যান। নাসরীনের ভাষায়, "আপনাদের যদি সত্তর-আশির দশকের সিনেমাগুলো মনে থাকে, তবে দেখবেন নায়কেরা তখন অনেক বেশি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতেন। তারা 'শুদ্ধ' ভাষায় ও নম্র সুরে কথা বলতেন, ভালো ছাত্র ও ভদ্রলোক হতেন, তাদের সাফল্যের মাপকাঠি ছিলো চাকরি করা। কিন্তু মান্নার ছিল উচ্চকিত কণ্ঠ, আচরণে ছিলো অস্থিরতা, সংলাপে থাকত যথেষ্ট খিস্তিখেউড়, তাঁর সাফল্যের মাপকাঠি হলো সমাজে অন্যায় যারা করেছে তাদের পরাজিত করা। দারিদ্র্যের চাপে ক্রমশ শহরমুখী বস্তি ও গঞ্জবাসী দর্শকের কাছে মনে হতো, মান্না তাদের কথাই বলেন" (নাসরীন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)। ফলে মান্না তখন আর তাদের কাছে কেবলই চলচ্চিত্রের নায়ক বা তারকা হয়ে থাকেননি, তারও বেশি কিছু হয়ে ধরা দিয়েছেন।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় *আম্মাজান*-এ জাতি-রাষ্ট্র আপাত অনুপস্থিতি। এখানে কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে দেখা যায় না। পুলিশ, আদালতের মতো জাতি-রাষ্ট্রের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এখানে অনুপস্থিত। চলচ্চিত্রে এ ধরনের প্রবণতা দুটি সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে;

প্রথমত, বিশ্বায়নের কারণে বাংলাদেশের মতো অ-পশ্চিমা জাতি-রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, গ্যাংস্টার সবল হচ্ছে (রাজু ২০১৩, পৃ.৮৯)।

গ্যাঙস্টার বাদশা এখানে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যেনো তার মুখের কথাই আইন। রাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে বাদশা তার আইন চালু করেন, যা রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করে। আর আম্মাজানের ভূমিকা অনেকটা সৃষ্টিকর্তার মতো। তাকে খুশি করার জন্য তার সৃষ্টিরা যেমন অনেক কিছু করেন, বাদশাও আম্মাজানের জন্য তাই করেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চলচ্চিত্রজুড়ে বাদশার কাজের রিপ্রেজেন্টেশন এমন যে, আপাত সেটাকে অন্যায়-ই মনে হয় না! বরং হত্যা, রক্তপাত, বন্দুকযুদ্ধ, ধর্ষণকে আবশ্যক উপকরণ মনে হয়। ছুরিকাঘাত, রক্তমাখা ছুরি এবং সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ার দৃশ্যকে ক্লোজ শটে দেখানো হয়। এক ধর্ষককে খুনের পর নবাব জিজ্ঞাসা করেন বাদশাকে,

> নবাব : কবে শেষ করবা?
>
> বাদশা : কী?
>
> নবাব : সেই যে ছোটোকালে আমার হাতটা কাইটা দিলা। সেইখান থাইকা যে শুরু করছো, তারপর খালুর অফিসের বড়োসাহেব রে খুন কইরা ১৪ বছর জেল খাটলা। এরপর আর হাতের কর গুইনা কইতে পারবা না কয়টা খুন করলা। শ্যাষ করবা কবে?
>
> বাদশা : ওরে জিগা?
>
> নবাব : কারে?
>
> বাদশা : (রাগ হয়ে) আরে ওরে (সৃষ্টিকর্তাকে উদ্দেশ্য করে) জিগা? আরে আল্লারে জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহ তো দেখি সব পারে। টর্নেডো দিতে পারে, সাইক্লোন দিতে পারে, দিনে-দুপুরে মানুষের ওপর বাজ ফেলে মাইরা ফেলতে পারে। এই, সেদিন মারছিলানা ক্যান, আমারে বাঁচাইয়া রাখছিলা ক্যান? আমার মাথার ওপর ঠাডা ফ্যালাইয়া মারছিলানা ক্যান? এই নিজের মায়েরে কেউ কোনো দিন উলঙ্গ দেখছে? এই দুই চোখ দিয়া আমি দেখছি, আমি দেখছি। আমি কাউরে কইতে পারমু না, কাউরে না। সেদিন আল্লাহ আমার এই দুই চোখ কানা করে দিছলোনা ক্যান? এই তুই জানোস (নবাবকে উদ্দেশ্য করে), তারপর থেকে আমার আম্মাজান কোনো দিন হাঁসে নাই, খালি আমার আম্মাজান কান্দে। আমার আম্মাজান ১৪ বছর জেল খাটছিলো ক্যান জানোস? আমার আম্মাজান কি খুন করছিলো? আমি কোর্টে মিথ্যা কথা কইছিলাম, আমার আম্মাজান আমার হাতে ছোরা তুইলা দিছিলো। ক্যান কইছিলাম জানোস? আমার আম্মাজান যেনো আমার সঙ্গে থাকে। আমার আম্মাজান গলায় দড়ি দিয়া যেনো মরতে না পারে। এহনো রাইতে আমি আম্মাজানের হাত ধইরা বইসা থাকি, আমি ঘুমাই না। আমার আম্মাজান যদি রাতে গলায় দড়ি দিয়া মইরা যায়! আমার আম্মাজান রে আমি গার্ড দিয়া রাইখা দিছি।

বাদশার এই দীর্ঘ সংলাপ, আবহের করুণ সুর, অভিনয় সব মিলে এক অন্যরকম ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। যা কিছুক্ষণ আগে পর্দায় ঘটে যাওয়া সহিংসতা ভুলে দর্শককে বাদশার ব্যাপারে সহানুভূতিশীল করে তোলে। তাই মান্নাকে নিয়ে নায়করাজ রাজ্জাকের মন্তব্য হলো, "২৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে মান্না বঞ্চিত মানুষের কথা সিনেমার পর্দায় তুলে ধরেছে। কখন যে মানুষ ওকে এতটা কাছে টেনে নিয়েছিল, সেটা মনে হয় মান্নাও বুঝতে পারেনি" (*প্রথম আলো* ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)।

এছাড়া গান *আম্মাজান*-এর ন্যারেটিভকে জোরালোভাবে এগিয়ে নিয়েছে। বাদশা ও আম্মাজান মাজারে এসেছেন। দান-খয়রাতের পর আউলিয়ার মাজারে আম্মাজান প্রার্থণা করেন, 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাও।' এই কথা শুনে বাদশা গান ধরেন (৩২ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড)—'আম্মাজান, আম্মাজান চোখের মণি আম্মাজান/ বুকের ধ্বনি আম্মাজান/ প্রাণের খনি আম্মাজান। আম্মাজান আম্মাজান আপনি বড়ো মেহেরবান/ জন্ম দিছেন আমায়/ আপনার দুগ্ধ করছি পান'।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মিজান ও রিনার শেষ দিন। র‍্যাগ ডে পালন হচ্ছে। গান (৫৬ মিনিট ৪০ সেকেন্ড)—'একতারা বাজারে রে তোরা দোতরা বাজারে তোরা, বাজারে বাঙলা ঢোল/ আজ শিক্ষাজীবনের সমাপনী দিন র‍্যাগ ডে ঝড় তোল'। বাদশাকে নিয়ে মিজান ও রিনা কথা বলছেন। রিনা ভয় পাচ্ছেন বাদশাকে। মিজান তাকে আশ্বাস দিচ্ছেন (এক ঘণ্টা ১৭ মিনিট)—'তোমার আমার প্রেম এক জনমের নয়/ হাজার বছর আগেও বুঝি ছিলো পরিচয়/ আমার এমন মনে হয়'।

রিনাকে জোর করে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন বাদশা। কারণ বাড়িতে রংপুরের ধর্ষিতা সেই মেয়েটির সঙ্গে নবাবের বিয়ে। বিয়েতে বাদশা নিজেই গান (এক ঘণ্টা ২৬ মিনিট ১০ সেকেন্ড) ধরেন—'স্বামী আর স্ত্রী বানায় যেজন মিস্ত্রী/ সে বড়ো আজব/কঠিন কারিগর/জাদুকর মন রে সে বড়ো আজব কারিগর/ কলেমার মন্ত্র দিয়া দুইজনের এ দেই বাধিয়া/ এই না বাধন থাকে ওরে মরণেরও পর'। এসব গান দর্শককে চলচ্চিত্রের গল্পের সঙ্গে একাত্ম করেছিলো। দর্শক সব মিলে একটা প্যাকেজ হিসেবে পেয়েছিলো *আম্মাজান*কে।

যশোরের 'মণিহার'-এর সামনের ভ্রাম্যমাণ দোকানি জুয়েল হোসেন বলেন, 'মান্নার অভিনয়ে অ্যাকশন ছিলো, কিন্তু তার ভিতর একটা মায়া, ভালোবাসা ছিলো। সেইটা কম নায়কের মধ্যেই আছে। এই যে *আম্মাজান* বলে তার একটা সিনেমা আছে; কেউ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে নিশ্চিত কান্নাকাটি করবে। এখনকার সিনেমা দেখলে সেটা হয় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৩)।'

নেত্রকোণার 'হিরামন'-এর গেইটম্যান বাচ্চু মিয়া বলেন,

> *আম্মাজান* একটা অন্যরকম সিনেমা। আমাদের এখানে যখন লাগছিলো, আমি তো প্রত্যেক শো-ই দেখতাম। এতো ভালো লাগতো আমার, গানগুলোও খুব ভালো ছিলো। অনেক জায়গায় কান্না চলে আসতো। মান্নার সে কী অভিনয়! সিনেমাটা ব্যবসাও করছিলো সেসময়। প্রত্যেক শো প্রায় হাউসফুল হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৩১)।

কুষ্টিয়ার 'বনানী'র ঝালমড়ি বিক্রেতা সনাতন অধিকারীর সঙ্গে কথা হয় প্রেক্ষাগৃহের প্রধান ফটকেই। সনাতন বলেন, 'তখনকার সিনেমায় অনেক বাস্তব বিষয় উঠে আসতো। মান্না এগুলো নিয়ে সবচেয়ে ভালো অভিনয় করতে পারতো। তার *লুটতরাজ*, *আম্মাজান*, *শান্ত কেন মাস্তান* সিনেমাগুলো খুব ভালো ছিলো। এসব সিনেমায় মান্না সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতো। দর্শকও সেটা খুব পছন্দ করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫৩)।'

ছবি : সংগৃহীত

সোহানুর রহমান সোহানের *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* দুইটি পরিবারের দ্বন্দ্বের গল্প। সেই দ্বন্দ্বে প্রেম-ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই। মির্জা পরিবারের মেয়ে ভালোবেসে ছিলো খান বাহাদুর পরিবারের ছেলেকে; মেয়েটি প্রতারিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। বোনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে খান বাহাদুর পরিবারের ছেলেকে খুন করেন মির্জা সালাউদ্দিন। এতে সালাউদ্দিনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৪ বছর পর তিনি যখন ফিরে আসেন, ততোদিনে তার একমাত্র ছেলে রাজ বড়ো হয়ে গেছেন। কারাগার থেকে মুক্তির দিনটি ছেলের কলেজের শেষ দিন। সব কিছু ভালোই চলছিলো। কিন্তু অনেক বছর পর আবারো মির্জা ও খান পরিবারের উত্তরাধিকারদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এবার মির্জার পরিবারের ছেলে রাজ আর খান বাহাদুর পরিবারের মেয়ে রেশমি।

কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে দুইজনের মধ্যে প্রেম হয়। একপর্যায়ে দুইজন দুজনার পরিচয় জানার পরও সম্পর্কে ছেদ পড়ে না। কিন্তু দুই পরিবার কোনোভাবেই মেনে নেয় না এ সম্পর্ক। তাদের কাছে প্রেম-ভালোবাসার চেয়ে নিজেদের জেদ, আভিজাত্য, প্রতিশোধ অনেক বড়ো। শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেন রাজ ও রেশমি। রেশমির বাবা রাজকে মারার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করলে সেই গুণ্ডার গুলিতে খুন হন রেশমি। রেশমির মৃত্যু মেনে নিতে না পেরে তার উপহার দেওয়া ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করেন রাজ। এভাবে দুই পরিবারের দম্ভ, প্রতিশোধপরায়ণতায় মৃত্যু হয় দুটি প্রাণের; কিন্তু এতো কিছুর পরও বিরোধ মেটে না।

ভারতের হিন্দি ভাষার একটি চলচ্চিত্রের কপিরাইট নিয়ে *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* নির্মাণ করা হলেও এটি ব্যবসায়িকভাবে অত্যন্ত সফল হয়। একই সঙ্গে সালমান-মৌসুমীকে দর্শক গ্রহণ করেন। *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* বর্তমানের প্রেমের অ্যাখান হলেও চলচ্চিত্রজুড়ে সামন্তযুগের ছোঁয়া ছিলো। পোশাক, সংলাপ, সেট নানা ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছোয়া থাকলেও চলচ্চিত্রটির মূল অ্যাখান এগিয়েছে সামন্ততান্ত্রিক দ্বন্দ্বকে পুঁজি করে। চলচ্চিত্রের সময়কাল পরিষ্কার না হলেও সমসাময়িক বাংলাদেশকেই তুলে ধরেছে বলে মনে হয়েছে। সেই বাংলাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রভাব যে একটুও কমেনি সেটা বোঝা যায় খান বাহাদুর উপাধি নিয়ে অহংকার করতে দেখে। তবে কৌশলে নির্মাতা খান বাহাদুর পরিবারটির প্রতি একধরনের নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করেন চলচ্চিত্রের শুরুতেই। মির্জা পরিবারের মেয়েকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ধোকা দেয় খান পরিবারের ছোটো ছেলে; এর ফলস্বরূপ ওই মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হয়। এই ঘটনা মেনে নিতে পারেন না ছোটো মির্জা, তিনি বোনের হত্যার প্রতিশোধ নেন এবং ১৪ বছর কারাভোগ করেন।

দুই পরিবার কেন্দ্রীক এই দ্বন্দ্ব কিন্তু দর্শকের নতুন দেখা নয়। উত্তর উপনিবেশ এই উপমহাদেশের রাজনীতিতেওএই দ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। সেই দ্বন্দ্বে নিজেদের রক্তে রঞ্জিত হওয়ার ইতিহাসই চোখে পড়ে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ, বিশেষ করে ১৯৭৫ সালের পর থেকে পরিবার কেন্দ্রীক যে রাজনীতি শুরু হয় তা দর্শক দেখেছে দীর্ঘকাল। এই রাজনীতিতেও হত্যা, প্রতি-হত্যা ছিলো, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ছিলো, আছে। দর্শক দীর্ঘদিন ধরেই এই পরিস্থিতিগুলোর সঙ্গে কমবেশি পরিচিত। *কেয়ামত থেকে কেয়ামত*-এ পরিচিত সেই দ্বন্দ্বই ফুটে উঠে নতুন রূপে।

খান পরিবারের ছেলের সঙ্গে প্রেম এবং তার পরিণতিতেই অন্তসত্ত্বা হয় মির্জা পরিবারের ছোটো মেয়ে। অথচ খান পরিবারের বড়োকর্তার মুখে শোনা যায় অযৌক্তিক কথা। চলচ্চিত্রের ছয় মিনিটে খান বাহাদুরকে বিয়ের বিপক্ষে যুক্তি দিতে দেখা যায় এভাবে, 'বিয়ের আগে যে মেয়ে গর্ভবতী হয়, তার মতো চরিত্রহীনা এ বাড়ির বউ হতে পারে না।' নির্দ্বিধায় তিনি নিজের ছেলের সম্পৃক্ততাকে উপেক্ষা করেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও নিজের দোষ না দেখে অন্যের দোষের বিষয়ে ক্ষমতাবানরা অনেকে মনোযোগী হন।

তবে চলচ্চিত্রে নতুন হিসেবে যোগ হয়েছে, দুই পরিবারের মিলনের সম্ভাবনা। যদিও শেষ পর্যন্ত তা ভয়াবহ এক ট্রাজেডিতে রূপ নেয়। সেখানেও খান পরিবারের ভাড়া করা গুন্ডার হাতেই খুন হয় নিজেদের মেয়ে। অন্যদিকে প্রেমিকার মৃত্যু মেনে নিতে না পেরে আত্মহত্যা করেন প্রেমিক। ফলে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় দ্বন্দ্ব, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসার পরিণতি ভালো হয় না।

মিলনেই প্রেমের সফলতা এবং দর্শক তাই দেখতে চায়, এধরনের পূর্বধারণাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* কিন্তু ব্যবসা সফল হয়। তার মানে মিলনে দর্শক সুখ পায় বলে মনে করা হলেও, বিচ্ছেদেও তার থেকে কম পায় না। তা না হলে নির্মম এই বিচ্ছেদকে বুকে নিয়ে দর্শক বারবার নিশ্চয় প্রেক্ষাগৃহে ফিরে যেতো না। এই বিচ্ছেদের মধ্যে নিশ্চয় কোথাও আনন্দ আছে। সেই আনন্দ দর্শকও উপভোগ করেছে। মিষ্টি প্রেমের কাহিনি ভেবে *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* দেখতে গিয়ে দর্শক বোনাস হিসেবে অনেক কিছু পেয়েছে, আর সেটাই চলচ্চিত্রটিকে জনপ্রিয় করেছে।প্রথমে টিন এজ ছেলেমেয়েরা এর দর্শক হলেও পরে এর আধেয়গত কারণেই সব বয়সী ও শ্রেণির মানুষ *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* দেখেছে বলে মনে হয়েছে।

চলচ্চিত্রটির প্রতিটি গান সেসময় খুব জনপ্রিয় হয়। যদিও হিন্দি গানের কথা ও সুরের উপর কেবল বাংলা শব্দ বসানো হয়। তবে চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভের সঙ্গে প্রত্যেকটি গানের সম্পৃক্ততা ছিলো দুর্দান্ত। কলেজের শেষ দিনের অনুষ্ঠানে রাজ গান করছেন,'বাবা বলে ছেলে নাম করবে, সারা পৃথিবী তাকে মনে রাখবে/ শুধু এ কথা কেউ জানে না/ আগামী দিনের ঠিকানা'। পুরুষ সব সময় দায়িত্ববান আর নারীরা অকারণে কথা বলে, বিপদ নিয়ে চিন্তা করে না। ফলে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে গেছে এ নিয়ে রেশমীর (মৌসুমী) কোনো চিন্তা নেই। ৫৭.৩১ মিনিটে তাকে দেখা যায় গান গাইতে,'এখন তো সময় ভালোবাসার/ এ দুটি হৃদয় কাছে আসার / তুমি যে একা আমিও যে একা/ লাগে যে ভালো ও প্রিয়'।

রাজের পরীক্ষার ফল বের হবে, তারপর সে রেশমিকে নিয়ে নতুন করে জীবন গড়ার কথা ভাবছে। এখন শুধু ২২ মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা। এরই মধ্যে রেশমির জন্মদিনে রাজ আসে; গান ধরে,'ও আমার বন্ধু গো চির সাথী পথ চলার/ তোমার জন্য গড়েছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসার'। রাজ ও রেশমি পালিয়ে এসেছে পাহাড়ে। রেশমি কোনো রান্নাবান্না করতে পারে না, সব মেনে নেয় রাজ। ১ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে রাজের লিপে শোনা যায়, 'একা আছি তো কী হয়েছে/সবই তো আছে আমারই কাছে/এই তুমি আছো, হৃদয়ে আছো/ আমার এ জীবন, তোমারই এখন'। প্রতিটি পরিস্থিতির সঙ্গে মিল রেখে গানগুলোর কথা নির্বাচন করা হয়। ফলে টিন-এজ দর্শকের মুখে মুখে এই গানগুলো তখন ছড়িয়ে পড়ে।

যশোরের 'তসবির মহল'-এর শ্যামাপদ হালদার বলেন,

> *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের প্রেম-ভালোবাসার গল্প হলেও এখানে অনেক কিছু শেখার ছিলো। মানুষের অহংকার যে ভালো না, তাতে যে নিজেদের ক্ষতি হয়, সেটা ওই সিনেমা দেখে যে কেউ বুঝবে। নতুন হলেও ছেলেমেয়েগুলোর অভিনয় ভালো ছিলো; গানগুলোও ভালো। দর্শক সিনেমাটা খুব পছন্দ করছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৩৭)।

রংপুরের ‘শাপলা’র গেইটম্যান তাপস সরকারের সঙ্গে কথা হয় প্রথম শ্রেণির সামনেই টুলে বসে। মলিন কাপড়ের তাপস চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলতে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না। তারপর সময় নিয়ে কথা হয় তার সঙ্গে। তাপস বলেন, ‘প্রথম সিনেমাতেই সালমান-মৌসুমী খুব ভালো অভিনয় করছিলো। সিনেমার গল্পটাও আগের প্রেমের কাহিনির মতো ছিলো না। নায়ক-নায়িকা মারা যায় ঠিকই কিন্তু কাহিনি খারাপ লাগে না। দুই বাড়ির দ্বন্দ্বটাও দেখার মতো ছিলো। দর্শক এগুলো খুব পছন্দ করছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২২)।’

চট্টগ্রামের ‘দিনার’-এর বুকিং ক্ল্যার্ক আ. মতিন বলেন,

> *চাঁদনী*, *কেয়ামত থেকে কেয়ামত*, *স্বপ্নের ঠিকানা* ওই ধরনের সিনেমাগুলো সেসময় খুব ব্যবসা করছে। এসব সিনেমার কাহিনিগুলো অন্যরকম ছিলো। প্রেমের সিনেমা হলেও অন্যান্য অনেক জিনিস সেসময় এই সিনেমাগুলোতে ছিলো। *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* তো খুব ভালো লাগছিলো, দুই বাড়ির রেষারেষি নিয়ে ঘটনা, তারপর প্রেম। দেখতে খুব ভালো লাগছিলো। এই সিনেমা দেখতে মহিলারাও খুব আসছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১০)।

এই দশকে কোনো একটি চলচ্চিত্র ব্যবসা সফল হলে তার অনুকরণে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা দেখা যায়। যদিও এই ইন্ডাস্ট্রিতে এটা নতুন কিছু নয়। ’৬৫ তে *রূপবান* ব্যবসা সফল হলে ৭০ দশক পর্যন্ত রূপবান নাম সংযুক্ত করে নানা ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে। প্রত্যেক দশকেই এ ধরনের টুকটাক উদাহরণ আছে। যখনই কোনো চলচ্চিত্র ব্যবসা করেছে, সেটাকে নকল করা হয়েছে কিংবা সামান্য এদিক-ওদিক করে চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে। সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি ধারণার এটি একটি সাধারণ প্রপঞ্চ। পুঁজিবাদী সমাজের সংস্কৃতির ধরন ও গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যায় সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি ধারণাটি ব্যবহার করা হয় (Adorno & Horkheimer 1972)। সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির দুটি কৌশলের একটি হলো নির্দিষ্ট মানপ্রমিতকরণ (Standardization), অন্যটি ছদ্মপ্রাতিস্বিকীকরণ (Pseudo-individualization)। নির্দিষ্ট মানপ্রমিতকরণ হলো—“সেই প্রক্রিয়া যা কোনো সাংস্কৃতিক পণ্যের নির্দিষ্ট ও বিস্তারিত দিকগুলোকে স্পর্শ করে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ফর্মের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়—এটি সংস্কৃতি-ইন্ডাস্ট্রির বণ্টন ও যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের কারণে ঘটে থাকে। জনপ্রিয় পন্যগুলোকে বৃহৎ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ‘নকল’ করা হয়” (গায়েন ১৯৯৭, পৃ৮১)।

৯০ দশকে যেটা হলো, শাবানা অভিনীত *স্বামী কেন আসামী* (১৯৯৭) নামে একটি চলচ্চিত্র সুপারহিট হলে একই ধরনের নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে একে একে নির্মাণ হতে থাকে *বাবা কেন চাকর* (১৯৯৭), *শান্ত কেন মাস্তান* (১৯৯৮), *মানুষ কেন অমানুষ* (১৯৯৮), *আলী কেন গোলাম* (১৯৯৯), *গরীব কেন কান্দে* (১৯৯৯), *রাণী কেন ডাকাত* (১৯৯৯), *ভাই কেন আসামী*

(১৯৯৯), *আম্বিরন কেন ঢাকায়* ইত্যাদি। একটা নির্দিষ্ট মানের মধ্যে চলচ্চিত্রগুলোকে বৃত্তাবদ্ধ করা হয়। এসব চলচ্চিত্রে প্রত্যেকটিকে নতুন বা আলাদা বলে দাবি করা হলেও তা আসলে খুব বেশি নতুন ছিলো না। বরং প্রত্যেকটি চলচ্চিত্রের কাহিনির কাঠামো একই ধরনের, একই ধরনের নৃত্যগীতে সাজানো। একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলে চলচ্চিত্রগুলোকে একটি থেকে আরেকটি পৃথক করা যায় না।

৫.৮.১) চলচ্চিত্রের গান

৯০ দশকে প্রেমমুখ্য কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্রের অনেক গান জনপ্রিয় হয়। এসব গান তখন দর্শকের মুখে মুখে ফিরেছে। উদাহরণ হিসেবে *তোমাকে চাই* (১৯৯৬) এ 'সোনা কিনিলাম নাকি রূপা কিনিলাম'; *বিয়ের ফুল* (১৯৯৯) এ 'ঐ চাঁদ মুখে যেনো লাগে না গ্রহণ' ও 'তোমায় দেখলে মনে হয়'; *আগুন জ্বলে* (১৯৯৪) তে 'এলোমেলো বাতাসে উড়িয়েছি শাড়ির আঁচল'; *বাসনায়* 'একটা টাকা দিয়া যান'; *ত্যাগ* (১৯৯৩) এ 'তেল গেলে ফুরাইয়া'; *অন্তরে অন্তরে* (১৯৯৪) এর 'কালতো ছিলাম ভালো'; *চরম আঘাত* (১৯৯৪) এ 'ভালোবাসা যতো বড়ো/জীবন ততো বড়ো নয়'; *বিশ্বপ্রেমিক* (১৯৯৫) এ 'তোমরা কাউকে বলো না'; *প্রাণের চেয়ে প্রিয়* (১৯৯৭) তে 'পড়ে না চোখের পলক', 'যে প্রেম স্বর্গ থেকে এসে জীবনে অমর হয়ে রয়'; 'কিছু কিছু মানুষের জীবনে'; *জীবন সংসার* 'পৃথিবীতে সুখ বলে যদি কিছু থেকে থাকে' ইত্যাদির কথা বলা যায়। এই সময়ের চলচ্চিত্রের গান নিয়ে সিলেটের নুরুল ইসলাম বলেন,

> অনেক দর্শক তখন গান দেখার জন্য সিনেমা দেখতো। সালমানের একটা সিনেমায় সোনিয়া নামে একটা নায়িকা 'নীল সাগর পার হয়ে তোমার কাছে এসেছি' গানটা করছিলো। এই গান মানুষের মুখে মুখে ছিলো। পরে শুনছিলাম গানটা নাকি নকল, তাতে অবশ্য দর্শকের কিছু মনেই হতো না। দর্শক এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতো না। তাদের গান ভালো লাগলে আনন্দ করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৫)।

চট্টগ্রামের 'সিনেমা প্যালেস'-এর সামনের চা-পানের দোকানি আ. শুক্কুর বলেন, "মান্নার গানগুলো আমার খুব ভালো লাগতো। একেবারে কাহিনির সাথে মিশে যেতো। ওর একটা গান ছিলো 'স্বামী আর স্ত্রী বানাইছে কোন মিস্ত্রি' খুব ভালো গান। আমি এখনো ভুলতে পারি না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৪)।" খুলনার আনোয়ার হোসেন চলচ্চিত্রে গানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলেন, 'তখন বাস্তবের সঙ্গে সিনেমার অনেক মিল ছিলো। এছাড়া আপনি সিনেমা করতে পারবেন না। কিছু অবাস্তবও ছিলো; যেমন গানগুলো অবাস্তব। কিন্তু তারপরও গান দিতে হয়, কারণ কিছু মানুষ গান ভালোবাসে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৪)।'

তবে দশকের শেষার্ধে চলচ্চিত্রের গানের কথা ও সুর চলচ্চিত্রের মতোই মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। ফলে গানের দর্শকপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

৫.৯) বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ

দশকটি নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। ৮০'র দশকের ব্যাপক বিনোদন বাণিজ্য প্রেক্ষাগৃহের সামাজিক ভিত্তি অনেকখানি নষ্ট করে দিয়েছিলো। এই পরিস্থিতিতে কয়েকজন নির্মাতা-প্রযোজক ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। এই দশকের শুরুতেই চলচ্চিত্রে কিছু পরিবর্তন আসতে থাকে। নতুন অভিনয়শিল্পী ও কিছুটা নতুনভাবে গল্প বলার চেষ্টা করা হয়। তাতে কিছু দর্শক আবারও প্রেক্ষাগৃহমুখী হন। কিন্তু ৮০'র দশকের ব্যাপক বিনোদন বাণিজ্যের যে প্রভাব তা থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ ছিলো না। তাই ৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে ব্যবসায় বিপর্যয় নেমে আসে। একটা পক্ষ এই বিপর্যয়কে সহিংস ও যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র দিয়ে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন।

এক ঝাঁক শিক্ষিত নতুন ছেলেমেয়ে এই দশকে ঢাকাই চলচ্চিত্রের অভিনয়ে পথচলা শুরু করে। এদের অভিনয় দক্ষতাও ছিলো চোখে পড়ার মতো। শুরুতে দর্শক তাদের গ্রহণও করেছিলো। এই সুযোগে চলচ্চিত্রের অভিনয়ের উত্তরাধিকারে খুবই মান সম্মত একটা পরিবর্তন আসে। কিছু সংখ্যক অভিনয়শিল্পীর ক্ষেত্রে দুইটা ধাপ তৈরি হয়। অভিনয়শিল্পীর একটি দল যারা এতোদিন নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করতেন, তারা চরিত্রাভিনেতা হিসেবে অভিনয় শুরু করেন। আর নতুনরা তাদের সন্তান, ভাই, বোন চরিত্রে প্রোটাগনিস্ট হয়ে ওঠেন। ৮০'র দশকে এই ঘটনাটি কিছুটা ঘটলেও ৯০ দশকে এটা ছিলো চোখে পড়ার মতো। ফলে একই চলচ্চিত্রে অনেকজন অভিনয়শিল্পীর কাজের সুযোগ তৈরি হয়। দর্শকও এই উত্তরাধিকারকে ভালোভাবে গ্রহণ করেন। সামাজিক ঘরানার বেশিরভাগ চলচ্চিত্রে এই ঘটনাটি ঘটে এবং চলচ্চিত্রগুলো দর্শকপ্রিয়তাও পায়। বিশেষ করে নারীরা এসব চলচ্চিত্র দেখতে আগ্রহী হন। কিন্তু এই দশকের শেষার্ধে সেই নারী দর্শককে আর ধরে রাখা যায়নি।

এই দশকের শুরু থেকেই চলচ্চিত্রে কমবেশি ব্যবসা হয়েছে। তার একটি প্রধান কারণ ছিলো অভিনয়শিল্পী ও চলচ্চিত্রের ধরন দুই জায়গাতেই দর্শকের বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিলো। নতুন অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে টিনএজ প্রেমমুখ্য চলচ্চিত্র যেমন হয়েছে, তেমনি সামাজিক, সামাজিক অ্যাকশন ও অ্যাকশন ধারার চলচ্চিত্রও হয়েছে। অন্যদিকে রুবেল-ফরিদী মিলে আরেকটি ধারাও ছিলো। এছাড়া হুমায়ুন আহমেদও এই দশকে ঘরে থাকা মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ফলে চলচ্চিত্র বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে দর্শকের কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। নানা শ্রেণির দর্শকের এই বেছে নেওয়ার সুযোগ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলচ্চিত্রের ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়েছিলো। আর এই দশকে গত কয়েক দশকের তুলনায় বেশি চলচ্চিত্রও নির্মাণ হয়। কিন্তু সালমান শাহের মৃত্যু, শাবানার হঠাৎই অভিনয় ছেড়ে চলে যাওয়া সামাজিক ও সামাজিক অ্যাকশন ঘরানার চলচ্চিত্রে প্রভাব ফেলে। ফলে এর যে প্রধান দর্শক নারী তারা কমতে শুরু করেন।

এই দশকে তারকা হিসেবে দুইজন অভিনয়শিল্পীর অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন—মান্না ও সালমান শাহ্। মান্না আগের দশকে অভিনয় শুরু করলেও সালমান একেবারে নতুন ছিলেন। কিন্তু দুইজনেরই আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা ছিলো। টিনএজ প্রেম ও সামাজিক অ্যাকশন ধারার চলচ্চিত্রে সালমান খুব অল্প সময়ে নিজের আসন পাকাপোক্ত করে নেন। একই সময়ে মান্নাও অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তখন দুটি ধারা সৃষ্টি হয়—একদিকে শাবানা-আলমগীর-ববিতা-সালমান-মৌসুমী প্রমুখ; অন্যটিতে মান্না-কাজী হায়াৎ-ডিপজল, রুবেল, হুমায়ুন ফরিদী। নারী দর্শক ও শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিছু দর্শক প্রথম ধারার চলচ্চিত্রগুলো পছন্দ করেন। অন্যদিকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ পছন্দ করতেন মান্নাসহ অন্যান্যদের চলচ্চিত্রগুলো। সালমানের হঠাৎ মৃত্যুতে প্রথম ধারাটি ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। পরে রিয়াজ, ফেরদৌস, পূর্ণিমারা এই ধারার উত্তরাধিকার নেওয়ার চেষ্টা করেও তেমন একটা সফল হতে পারেননি। তখন ইন্ডাস্ট্রি মান্নার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। দর্শকের চলচ্চিত্র বেছে নেওয়ার সুযোগও কমে যায়। একপর্যায়ে সাধারণ নারী দর্শক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি প্রেক্ষাগৃহে আসা প্রায় বন্ধ করে দেন। তখন থাকে কেবল পুরুষ দর্শকের একটা শ্রেণি। এই দর্শককে তখন কেবল সংলাপ আর সহিংসতা দেখিয়ে ঠাণ্ডা রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ ততোদিনে সিডি ও ডিসলাইনের কারণে দেশি-বিদেশি নানা ধাঁচের চলচ্চিত্র সাধারণ দর্শকের হাতের নাগালে চলে আসে। এই ধরনের একটা পরিস্থিতিতে প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি পুরুষ দর্শকের জন্য বিশেষ ধরনের বিনোদন বাণিজ্য শুরু হয়। এই সময় চলচ্চিত্রে নারীকে যে কেবল বস্তু (object) হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে এমন নয়, দর্শককেও বস্তু মানে নিষ্ক্রিয় সত্তা ভাবা হতে থাকে। একটা পক্ষ ভাবতে থাকেন এগুলো দিলেই দর্শক খাবে।

অন্যান্য অনেক কারণের সঙ্গে দেশের চলচ্চিত্রে সহিংস ও যৌনদৃশ্য সংযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রের সরাসরি ভূমিকা রয়েছে বলে মনে হয়েছে। শুরুতে সেন্সর বোর্ড সহিংস ও যৌনদৃশ্যগুলো চলচ্চিত্র থেকে কেটে বাদ দিতে থাকে। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চরিত্র হারানো প্রেক্ষাগৃহের একমাত্র দর্শক পুরুষদের চাহিদা মেটাতে, প্রযোজকদের সমর্থনে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায়, প্রথম দিকে মূল প্রিন্টের সঙ্গে সেন্সরবিহীন এসব দৃশ্য জুড়ে দিয়ে চালানো শুরু হয়। দর্শক এগুলো দেখতেও আগ্রহী হন। সময়ের সঙ্গে দর্শক চাহিদা এবং প্রেক্ষাগৃহ মালিক ও প্রযোজকদের সাহস বাড়তে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে তা আরো খোলামেলা হয়ে যায়। পরে অবশ্য নানা অনৈতিক সহায়তায় সেন্সর বোর্ডের সম্মতিতেই এসব চলচ্চিত্র ছাড়পত্র পেতে শুরু করে। রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি দিনে দিনে প্রযোজক-নির্মাতাদের সাহস কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে দিনশেষে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে ঢাকাই চলচ্চিত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়

একুশ শতকের পরিস্থিতি ও প্রবণতা

৬.১) সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্কট বাংলাদেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই দেশটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধারাবাহিক স্থায়ী রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। টানা এক দশকের বেশি সেনা শাসনের পর ১৯৯০ সালে সঙ্কটময় গণতান্ত্রিক অবস্থা পরিবর্তনের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়। তারপরও দুই দশকের সাফল্যের মাত্রা আশাব্যঞ্জক ছিলো না। ২০০৬ সালে রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে অপ্রত্যক্ষ একটি সেনা শাসনের সূচনার ফলে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আবারও সঙ্কটের মুখে পড়ে।

২০০৮ সালে নির্বাচনে আপাত সেই সঙ্কট কেটে গেছে মনে হলেও বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের আচরণ ভিন্ন কিছুর ইঙ্গিত করে। এর দ্রুত ফল পাওয়া যায় ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের দুটি সাধারণ নির্বাচনে। বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জন সত্ত্বেও এককভাবে ক্ষমতাসীন দল যেভাবে একটি ধোয়াশা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার গঠন করে, তা দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসনেরই প্রতিফলন।

এই দশকের শুরুতেই ২০০১ সালে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম ঘোষণা করা হয়। একটি দীর্ঘ সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফসল ছিলো এই অর্জন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চা এবং সেখানে রাষ্ট্রীয় সমর্থন না থাকলে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির বিষবাষ্প এভাবে ছড়ানোর কথা নয়। ৪৭'র দেশভাগ পরবর্তী সময়ে যে মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটেছিলো তারাই অনেকাংশে এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি একদিকে যেমন নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যস্ত থেকেছেন, অন্যদিকে এদের আচরণগত সততা বলে কিছুই ছিলো না। এরা ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি চাকরি, রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন করলেও আচরণগত সংস্কৃতিতে নিজেদের সৎ রাখতে পারেননি। এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় বদরুদ্দীন উমরের (উমর ২০১৫, পৃ৪৭) বক্তব্যেও। ফলে এর প্রভাব অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো চলচ্চিত্রেও লক্ষ করা যায়। এই সময়ের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে ভয়াবহ রকমের বিশৃঙ্খলা

দেখা দেয়। খোদ এফ ডি সির ভিতরে সহিংস ও যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রের নির্মাণ হতে থাকে। শোনা যায়, সেই সময়ের এফ ডি সিতে এহেন কোনো কর্ম নেই যা হয়নি। পরে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে র‌্যাব-এর সহায়তায় টাস্কফোর্স গঠন করে ভয়াবহ এই পরিস্থিতির কিছুটা অবসান হয়।

২০০২-এ দ্বিতীয়বারের মতো দুর্নীতিতে বাংলাদেশ প্রথম স্থান অর্জন করে। একই বছরের অক্টোবরে সরকার সন্ত্রাস দমনের নামে সেনাবাহিনীর সহায়তায় 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' শুরু করে। এই অভিযানের প্রভাব পড়ে দেশের প্রায় সব ক্ষেত্রেই। অনেকগুলো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও স্থবির হয়ে পড়ে। রাতে জনগণ বের হতে ভয় পেতে থাকে। এর প্রভাব পড়ে প্রেক্ষাগৃহের ব্যবসায়। বিশেষ করে সন্ধ্যা ও রাতের শোগুলোতে দর্শক কমে যায়।

এছাড়া এই সময়ে দেশব্যাপী যে জঙ্গি নাশকতা শুরু হয় তার আঘাত থেকেও বাদ পড়েনি প্রেক্ষাগৃহ। আসলে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যখনই কোনো সংকট এসেছে তার আঘাত চলচ্চিত্র ও প্রেক্ষাগৃহে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। ২০০২ সালের ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের চারটি প্রেক্ষাগৃহে বোমা হামলা হয়। মর্মান্তিক এই বোমা হামলায় ১৮ জন নিহত ও শতাধিক আহত হন। এই ঘটনার পর সারাদেশের প্রেক্ষাগৃহ ব্যবসায় ভয়াবহ প্রভাব পড়ে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষ প্রেক্ষাগৃহে যেতে ভয় পান। এই ধরনের বোমা হামলার ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট মুন্সিগঞ্জ ছাড়া দেশের সব জেলায় পাঁচ শতাধিক বোমা বিস্ফোরণ হয়। জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ তাদের প্রচারপত্রে সরকারি ও বিরোধী দলকে সংবিধান বাদ দিয়ে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায় এবং না হলে সব প্রশাসন ও বিচারকার্য বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়।

২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার শাহবাগে একটি বড়ো ধরনের গণআন্দোলন সূচিত হয়। যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসি না দেওয়াকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন শুরু হলেও পরে তা ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। বদরুদ্দীন উমর মনে করেন, "শাহবাগ আন্দোলন যেভাবে হয়েছিল তার মূল কারণ কাদের মোল্লার ফাঁসির মধ্যেই সন্ধান করলে সেটা হবে মারাত্মক ঐতিহাসিক ভুল। ৪২ বছর ধরে বাঙলাদেশে নব্য শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে শোষণ নির্যাতন চালিয়ে এসেছিল তার ফলাফলের বিরুদ্ধে সেটা ছিল এক প্রতিক্রিয়া" (উমর ২০১৫, পৃ৪৬–৪৭)। যদিও শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনটি তার চরিত্র ধরে রাখতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে ধর্ম এখানে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে ওঠে। গণজাগরণ মঞ্চের বিপরীতে হেফাজতে ইসলাম নামে একটি ধর্মভিত্তিক সংগঠন অবস্থান নেয়। রাষ্ট্রীয় প্রণোদনায় তাদের মধ্যে ভয়াবহ দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে আপাত এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শাহবাগ আন্দোলন পরবর্তী বাংলাদেশে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে আগ্রহ বাড়ে ব্যাপকভাবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলী রীয়াজের (রীয়াজ ২০১৭, পৃ২৭) কথাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। অন্যদিকে ১৯৯২ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে দেশে উল্লেখযোগ্য হারে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে (খালেক, ১২ নভেম্বর ২০১৫)। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি যেমন গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনে অংশ নেয়, আবার একই সঙ্গে তারা নানা ক্ষেত্রে ধর্মের ব্যবহারকে

সমর্থনও করে। আলী রীয়াজ এই মধ্যবিত্তদের নিয়ে বলেন, "... গত এক দশকের বেশি সময়ের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমি এই অনুমান করি যে এসব প্রশ্নে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভেতরে একটা বড় ধরনের বিভক্তি তৈরি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে গত এক বা দেড় দশকের মধ্যবিত্তদের যে অংশের বিকাশ ঘটেছে, যাদের আমি 'নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি' বলে বর্ণনা করতে চাই, তাদের ভেতরেই গণতন্ত্রের উদারনৈতিক দিকগুলোর আবেদন কম এবং একই সঙ্গে তাদের মধ্য থেকেই সমাজে ও রাষ্ট্রে ধর্মের প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য ভূমিকার তাগিদ পরিলক্ষিত হচ্ছে" (রীয়াজ ২০১৭, পৃ২৯)।

এই পরিস্থিতি যেকোনো দেশের মুক্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসর সৃষ্টির জন্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সহজলভ্যতা মানুষের মধ্যে একধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি করে। দেশের এই সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সাতক্ষীরার দেবাহাটার 'লাইটহাউজ'-এর মালিক আবু রাহান তিতুর কথার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিতুর ভাষ্য হলো, 'আমি ২৭ বছর দেশের বাইরে ছিলাম, ফিরে এসে দেখি একটা শ্রেণি আমাদের কালচারকে পিষে শেষ করে ফেলেছে। তারা বলছে, সিনেমা দেখা মানে পাপ, এটা শয়তানের বাসা, সিনেমাহলে যারা যায় তারা ভদ্রলোক না, খারাপ লোক। এই একটা পরিস্থিতি এখানে তৈরি হয়েছে। অথচ আমাদের দেশ এমন ছিলো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩৮)।' নতুন এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়াও এতো সহজ ছিলো না।

এই দশকে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে নানা ক্ষেত্রে অভাবনীয় সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিশ্বায়নের সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে এক ধরনের অসহায়ত্ব জাগিয়ে তোলে। বাজার অর্থনীতির তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে এর কোনো বিকল্প নেই বলে প্রচার চালানো হয়। জনপ্রিয় সংস্কৃতির নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী বাজারি ব্যবস্থার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্য বিস্তার চলে। "... ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে সবাই সমান ঘোষণা করা হলেও এই নয়া গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তি সৃষ্ট মহাসড়কে হাঁটার সুযোগ নেই বিশ্বের শত কোটি মানুষের। আর্থিক অস্বচ্ছলতা, নির্দিষ্ট মানের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগহীনতা এ ক্ষেত্রে বাঁধা। ... তাই এ অবস্থা ডিজিটাল ডিভাইড তথা নতুন ধরনের বৈষম্য তৈরি করছে। মানুষ কেবল ধনের গরিব নয়, জ্ঞানের গরিবও হচ্ছে" (ভট্টাচার্য ও রহমান ২০১১,পৃ৯৩)। এক্ষেত্রে আরো যে ঘটনাটি ঘটছে তা হলো, প্রযুক্তির ওপর মানুষ অতিনির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এই নির্ভরশীলতা অনেকটা স্বেচ্ছায় বন্দিত্বের মতো। অন্য অনেক কিছু বাদ দিয়ে ঘরে বাইরে মানুষ এখন বুদ হয়ে আছে মোবাইল ফোনসেট, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ, টিভি নিয়ে। যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে চলচ্চিত্রেও। নতুন এই প্রেক্ষাপটে প্রাযুক্তিক মাধ্যম চলচ্চিত্রকে তার নির্মাণ থেকে প্রদর্শন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্র এগুলোকে ঠিক কীভাবে সামাল দেবে তা সময়ই বলে দেবে।

৬.২) একনজরে শূন্য দশকের চলচ্চিত্র

শূন্য দশকে (২০০০–২০০৯) মুক্তি পেয়েছে কমপক্ষে ৭৮৬টি চলচ্চিত্র (আলম ২০১১ ও জেয়াদ ২০১০)। এছাড়া ২০১০–২০১৫ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে আরো ৩৪৫টি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। ৯০ দশকের

শেষ দিকে ঢাকাই চলচ্চিত্রে শুরু হওয়া সঙ্কট, শূন্য দশকে এসে চরম আকার ধারণ করে। চলচ্চিত্রের মানের চরম অবনতি, আধেয়তে সহিংসতা ও পর্নোগ্রাফিক উপাদানের ব্যাপক বৃদ্ধি, ব্যবসায়িক মন্দা, এফ ডি সি ও সেন্সর বোর্ডের চরম দুর্নীতি দেশের চলচ্চিত্রকে একটা ভয়াবহ পর্যায়ে নিয়ে যায়। দর্শকের অভাবে একের পর এক প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হতে থাকে। চলচ্চিত্র নির্মাণও ধীরে ধীরে কমে আসে। তবে এর মধ্যে ২০০৭ সালের শেষ দিকে সরকার চলচ্চিত্রের সংস্কারে অভিযান শুরু করে, এতে পরিস্থিতি কিছুটা পরিবর্তন হয়।

এই সঙ্কটের মধ্যেও স্বাধীন ধারার নির্মাতারা বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এই ধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র তারেক মাসুদের *মাটির ময়না* (২০০২)। এটি কান উৎসবে প্রশংসিত হয় এবং ডিরেক্টরস ফোর্টনাইট বিভাগে সমালোচক পুরস্কার জিতে নেয়। এছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকায় বাণিজ্যিকভাবে মুক্তিও পায় চলচ্চিত্রটি। স্বাধীন ধারার অন্যান্য চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে তানভীর মোকাম্মেলের *লালসালু* (২০০১), আবু সাইয়ীদের *শঙ্খনাদ* (২০০৪) ও *নিরন্তর* (২০০৬), মোরশেদুল ইসলামের *খেলাঘর* (২০০৬), গোলাম রব্বানী বিপ্লবের *স্বপ্নডানায়* (২০০৭), তৌকীর আহমেদের *জয়যাত্রা* (২০০৫), এনামুল করিম নির্ঝরের *আহা* (২০০৭) প্রভৃতি।

স্বাধীন ধারার এসব চলচ্চিত্রের অনেকগুলোই তখন টেলিভিশন চ্যানেলের প্রযোজনায় নির্মাণ হয়। এই দশকে টেলিভিশন চ্যানেলের প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের নতুন ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। 'চ্যানেল আই'য়ের ইমপ্রেস টেলিফিল্ম এককভাবে সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র প্রযোজনা করে।

ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যেও এই দশকে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র ব্যবসা সফল হয়—*মনের মাঝে তুমি* (২০০৩), *কোটি টাকার কাবিন* (২০০৬), *চাচ্চু* (২০০৬), *মোল্লা বাড়ির বউ* (২০০৬), *হৃদয়ের কথা* (২০০৬), *আমার প্রাণের স্বামী* (২০০৭)। কুড়িগ্রামের 'মিতালী'র দর্শক রবিউল বলেন, 'ডিপজলের একটা সিনেমা ছিলো *চাচ্চু*। এমনই কাহিনি মানুষ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রসাব করতে বের হয় নাই। সিনেমা শেষের পরও দর্শক ঝিম মেরে বসেছিলো। শেষ দৃশ্য দিঘীর একটা সিনে এমন কোনো দর্শক নাই কাঁদে নাই! ওগুলো হচ্ছে কাহিনি (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১০)।'

এই দশকের পরবর্তী সময়ে আরো কিছু চলচ্চিত্র ব্যবসা সফল হয়। *খায়রুন সুন্দরী* (২০০৪), *মনপুরা* (২০০৯), *চাচ্চু আমার চাচ্চু* (২০১০), *নাম্বার ওয়ান শাকিব খান* (২০১০), *মোস্ট ওয়েলকাম* (২০১২), *নিঃস্বার্থ ভালোবাসা* (২০১৩), *পোড়ামন* (২০১৩), *পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেমকাহিনী* (২০১৩), *অগ্নি* (২০১৪), *আমি শুধু চেয়েছি তোমায়* (২০১৪), *দেশা দ্য লিডার* (২০১৪), *রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট* (২০১৫), *ছুঁয়ে দিলে মন* (২০১৫), *অগ্নি ২* (২০১৫), *আশিকী* (২০১৫) প্রভৃতি। সিলেটের 'নন্দিতা'র প্রধান ফটকের গেইটম্যান আইয়ুব আলী বলেন, "অনেক আগে আরেকটা সিনেমা খুব ব্যবসা করছিলো, নাম *মনপুরা*। তখন এক সঙ্গে 'মণিকা' ও 'কাকলি' দুইটা সিনেমাহলে *মনপুরা* চলেছিলো। তারপরও

সিনেমাটি রমরমা ব্যবসা করে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৩)।" কুড়িগ্রামের হাবিবুর রহমান টিটু *মনপুরা* নিয়ে তার স্বপ্নের কথা বলেন এভাবে—'আমার দেখা সর্বশেষ ব্যবসা করা সিনেমা হলো *মনপুরা*। এই সিনেমার দর্শক দেখে আমাদের মনে হয়েছিলো, আবার বোধ হয় ব্যবসা ফিরে এলো। পুরনো অনেক দর্শক সে সময় সিনেমা দেখতে আসছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৬)।'

শূন্য দশকের ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রগুলো নিয়ে যশোরের মোল্যা ফারুক আহম্মেদ বলেন,

> ভালো গল্পের সিনেমা হলে মানুষ এখনো আসে। এই যে কিছু দিন আগে চঞ্চল চৌধুরীর একটা সিনেমা *আয়নাবাজি* আসছিলো, সেটা খুব ভালো চলেছে। এ বছর তিনটা সিনেমা আমাদের হলে খুব ভালো ব্যবসা করেছে, এর দুইটা ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনার *বাদশা: দ্য ডন* ও *শিকারী* এবং সর্বশেষ *আয়নাবজি*। এছাড়া তেমন কোনো সিনেমা আর ব্যবসা করতে পারেনি (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।

এই দশকে চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক ক্ষেত্রে একটি বড়ো ধরনের পরিবর্তন আসে। ২০০৯ সালে সরাসরি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন মোরশেদুল ইসলাম। *প্রিয়তমেষু* (২০০৯) নামে এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ থেকে প্রদর্শন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এর আগে দুই–একটি চলচ্চিত্রের নির্মাণে ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করা হলেও পরে তা ৩৫ মি মি এ রূপান্তর করা হয়েছিলো। কিন্তু *প্রিয়তমেষু*'র পুরো প্রক্রিয়া ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সম্পন্ন হয়। এই দশকে প্রেক্ষাগৃহের প্রদর্শন ব্যবস্থাতেও ডিজিটাল প্রজেক্টর ব্যবহার শুরু হয়।

২০১০-এর পর যৌথ প্রযোজনার কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে। যৌথ প্রযোজনার বেশিরভাগ চলচ্চিত্রই ভারতের সঙ্গে নির্মাণ হয়। তবে এ সময়ে নির্মিত বেশিরভাগ চলচ্চিত্র ব্যবসা করতে পারেনি। অন্যদিকে সারাদেশে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা আরো কমে যেতে থাকে।

এবারে শূন্য ও ১০-এর দশকে গবেষণা আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দর্শক স্মৃতিতে যে চলচ্চিত্রগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই দশকে মোট ৯১টি (সারণী ৬.১.১) চলচ্চিত্রের নাম পাওয়া যায় দর্শক স্মৃতিতে। সবচেয়ে বেশিবার নাম এসেছে প্রেমমুখ্য ঘরানার *মনপুরা* (২০০৯) এবং দ্বিতীয় অবস্থানে আছে সামাজিক অ্যাকশন ঘরানার *কোটি টাকার কাবিন* (২০০৬)। দর্শক স্মৃতির এই প্রাবল্য কেবল ২০১৫ সাল পর্যন্ত মুক্তি পাওয়া চলচ্চিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। যদিও দর্শক স্মৃতিতে ২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া চলচ্চিত্রগুলোও ছিলো।

সারণী ৬.১.১ : শূন্য ও ১০-এর দশকের চলচ্চিত্র ও দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম	দর্শক স্মৃতি প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
১.	বর্তমান	৬	২০০০	কাজী হায়াৎ
২.	নারীর মন	১	২০০০	মতিন রহমান
৩.	কষ্ট	১	২০০০	কাজী হায়াৎ
৪.	সুলতান	১	২০০১	এফ আই মানিক
৫.	শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ	১	২০০১	দেবাশীষ বিশ্বাস

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম	দর্শক স্মৃতি প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
৬.	মাটির ফুল	২	২০০২	মতিন রহমান
৭.	ধ্বংস	১	২০০২	বদিউল আলম খোকন
৮.	মাস্তানের ওপর মাস্তান	১	২০০২	মনতাজুর রহমান আকবর
৯.	মনের মাঝে তুমি	১	২০০২	মতিউর রহমান পানু
১০.	ফায়ার	২	২০০২	মহম্মদ হোসেন
১১.	স্বামী-স্ত্রীর যুদ্ধ	১	২০০২	এফ আই মানিক
১২.	ভাইয়া	১	২০০২	এফ আই মানিক
১৩.	বউ শাশুড়ির যুদ্ধ	১	২০০৩	আজাদী হাসনাত ফিরোজ
১৪.	নসিমন	১	২০০৩	আলী আজাদ
১৫.	খায়রুন সুন্দরী	৪	২০০৪	এ কে সোহেল
১৬.	নিষিদ্ধ নারী (অশ্লীলতার কোনো সংজ্ঞা নেই! নগ্নতাই অশ্লীলতা নয়!)	১	২০০৪	মোহাম্মদ হোসেন
১৭.	রং নাম্বার	১	২০০৫	মতিন রহমান
১৮.	আমি জেল থেকে বলছি	১	২০০৫	মালেক আফসারী
১৯.	কাবুলিওয়ালা	১	২০০৬	কাজী হায়াৎ
২০.	মাথা নষ্ট	১	২০০৬	সাফি ইকবাল
২১.	চাচ্চু	৬	২০০৬	এফ আই মানিক
২২.	পিতার আসন	১	২০০৬	এফ আই মানিক
২৩.	**কোটি টাকার কাবিন**	**৯**	**২০০৬**	**এফ আই মানিক**
২৪.	দাদীমা	৪	২০০৬	এফ আই মানিক
২৫.	মা আমার স্বর্গ	২	২০০৭	জাকির হোসেন রাজু
২৬.	আমার প্রাণের স্বামী	১	২০০৭	পি এ কাজল
২৭.	শান্ত কেন মাস্তান	২	২০০৭	সালাউদ্দিন
২৮.	প্রিয়া আমার প্রিয়া	৫	২০০৮	বদিউল আলম খোকন
২৯.	তুমি স্বপ্ন তুমি সাধনা	১	২০০৮	শাহাদৎ হোসেন লিটন
৩০.	এক টাকার বউ	১	২০০৮	পি এ কাজল
৩১.	**মনপুরা**	**২৭**	**২০০৯**	**গিয়াসউদ্দিন সেলিম**
৩২.	গরীবের ছেলে বড়লোকের মেয়ে	১	২০০৯	আহমেদ নাসির
৩৩.	মা বড় না বউ বড়ো	১	২০০৯	শেখ নজরুল ইসলাম
৩৪.	থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার	২	২০০৯	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
৩৫.	ভালোবাসা দিবি কিনা বল	১	২০০৯	উত্তম আকাশ
৩৬.	সাহেব নামের গোলাম	১	২০০৯	রাজু চৌধুরী
৩৭.	মনের মানুষ	১	২০১০	গৌতম ঘোষ
৩৮.	ভালোবাসলে ঘর বাধা যায় না	৪	২০১০	জাকির হোসেন রাজু
৩৯.	চাচ্চু আমার চাচ্চু	১	২০১০	পি এ কাজল
৪০.	নষ্ট জীবন	১	২০১০	রাকিবুল আলম রাকিব
৪১.	মনের জ্বালা	২	২০১০	মালেক আফসারী
৪২.	গহীনে শব্দ	১	২০১০	খালিদ মাহমুদ মিঠু
৪৩.	হায় প্রেম হায় ভালোবাসা	১	২০১০	নজরুল ইসলাম খান
৪৪.	নাম্বার ওয়ান শাকিব খান	১	২০১০	নাম্বার ওয়ান শাকিব খান

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম	দর্শক স্মৃতি প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
৪৫.	মাটির ঠিকানা	১	২০১১	শাহ আলম কিরণ
৪৬.	এক মন এক প্রাণ	১	২০১১	সোহানুর রহমান সোহান
৪৭.	মনের ঘরে বসত করে	১	২০১১	জাকির হোসেন রাজু
৪৮.	একবার বলো ভালোবাসি	২	২০১১	বদিউল আলম খোকন
৪৯.	ভালোবাসার রঙ	৪	২০১২	শাহিন-সুমন
৫০.	লালটিপ	১	২০১২	স্বপন আহমেদ
৫১.	খোদার পরে মা	১	২০১২	শাহিন-সুমন
৫২.	পিঁপড়াবিদ্যা	১	২০১২	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
৫৩.	পোড়ামন	৬	২০১৩	জাকির হোসেন রাজু
৫৪.	মাই নেম ইজ খান	১	২০১৩	বদিউল আলম খোকন
৫৫.	টেলিভিশন	১	২০১৩	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
৫৬.	আমি শুধু চেয়েছি তোমায়	৭	২০১৪	অশোক পাতি ও অনন্য মামুন
৫৭.	হিরো দ্য সুপার স্টার	১	২০১৪	বদিউল আলম খোকন
৫৮.	শুনতে কী পাও	১	২০১৪	কামার আহমাদ সাইমন
৫৯.	অনেক সাধের ময়না	১	২০১৪	জাকির হোসেন রাজু
৬০.	দেশা দ্য লিডার	৩	২০১৪	সৈকত নাসির
৬১.	অগ্নি	৫	২০১৪	ইফতেখার চৌধুরী
৬২.	অগ্নি ২	৫	২০১৫	ইফতেখার চৌধুরী
৬৩.	ছুঁয়ে দিলে মন	৫	২০১৫	শিহাব শাহীন
৬৪.	আশিকী	১	২০১৫	অশোক পাতি ও আবদুল আজিজ
৬৫.	লাভ ম্যারেজ	২	২০১৫	শাহীন সুমন
৬৬.	ওয়ার্নিং	১	২০১৫	সাফি উদ্দিন সাফি
৬৭.	জিরো ডিগ্রী	১	২০১৫	অনিমেষ আইচ
৬৮.	রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট	৬	২০১৫	অশোক পাতি ও আবদুল আজিজ
৬৯.	ভালোবাসার গল্প	১	২০১৫	অনন্য মামুন
৭০.	আরো ভালোবাসবো তোমায়	১	২০১৫	এস এ হক অলিক
৭১.	নিয়তি	১	২০১৬	জাকির হোসেন রাজু
৭২.	শ্যুটার	১	২০১৬	রাজু চৌধুরী
৭৩.	অনেক দামে কেনা	১	২০১৬	জাকির হোসেন রাজু
৭৪.	শিকারী	২৪	২০১৬	রাজেশ কুমার যাদব ও আবদুল আজিজ
৭৫.	সম্রাট	১	২০১৬	মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ
৭৬.	আয়নাবাজি	৫৮	২০১৬	অমিতাভ রেজা চৌধুরী
৭৭.	বাদশা দ্য ডন	২৯	২০১৬	রাজেশ কুমার যাদব ও আবদুল আজিজ
৭৮.	বসগিরি	৩	২০১৬	শামীম আহমেদ রনি
৭৯.	অজ্ঞাতনামা	১	২০১৬	তৌকীর আহমেদ
৮০.	রানা পাগলা দ্য মেন্টাল	১	২০১৬	শামীম আহমেদ রনি
৮১.	সুইটহার্ট	১	২০১৬	ওয়াজেদ আলী সুমন
৮২.	নবাব	১৪	২০১৭	জয়দীপ মুখার্জী ও মো. আবদুল আজিজ
৮৩.	রাজনীতি	১	২০১৭	বুলবুল বিশ্বাস
৮৪.	ভুবন মাঝি	২	২০১৭	ফাখরুল আরেফিন খান

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম	দর্শক স্মৃতি প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
৮৫.	প্রেমী ও প্রেমী	১	২০১৭	জাকির হোসেন রাজু
৮৬.	বস ২	৬	২০১৭	বাবা যাদব ও আবদুল আজিজ
৮৭.	ঢাকা অ্যাটাক	২১	২০১৭	দীপংকর দীপন
৮৮.	ডুব	১	২০১৭	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
৮৯.	স্বপ্নজাল	৩	২০১৮	গিয়াসউদ্দিন সেলিম
৯০.	একটি সিনেমার গল্প	১	২০১৮	আলমগীর
৯১.	আমি নেতা হব	১	২০১৮	উত্তম আকাশ

সারণী ৬.১.২ : শূন্য ও ১০-এর দশকে চলচ্চিত্রের ধরন ও দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য

চলচ্চিত্রের ধরন	প্রাবল্য
সামাজিক ধারার চলচ্চিত্র	২৬
লোককাহিনি	২
প্রেমমুখ্য ধারার চলচ্চিত্র	২৯
সামাজিক অ্যাকশন ও অ্যাকশন	২২
সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র	১
মুক্তিযুদ্ধ	১
যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র	২
ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র	১
রাজনৈতিক ধারার চলচ্চিত্র	১
স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র	৬

৯০ দশকের শেষের দিক থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ঢাকাই চলচ্চিত্রে সহিংসতা ও যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র নিয়ে আখ্যানে নানা ধরনের কথাবার্তা থাকলেও দর্শক স্মৃতিতে সেসব চলচ্চিত্রের মধ্যে থেকে মাত্র দুটির নাম এসেছে—*ফায়ার* ও *নিষিদ্ধ নারী*। ২০০৮ পর্যন্ত চলচ্চিত্র নির্মাণে চরম অব্যবস্থাপনার বিপরীতেও সামাজিক ঘরানার কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছিলো, সেসব চলচ্চিত্র থেকে ১১টির নাম দর্শক স্মৃতিতে পাওয়া গেছে। সামাজিক ঘরানার মোট চলচ্চিত্রের সংখ্যা অবশ্য এই তালিকায় মোট ২৬টি।

সামাজিক ঘরানার পাশাপাশি এই তালিকায় সবচেয়ে বেশি এসেছে প্রেমমুখ্য ধারার ২৯টি চলচ্চিত্রের নাম। তার মানে দর্শক সহিংসতা ও যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রের চরম সময়ের মধ্যেও সামাজিক ও প্রেমমুখ্য ঘরানার কিছু চলচ্চিত্র দেখেছে। প্রেমমুখ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে *মনের মাঝে তুমি* (২০০২) এসময় ব্যাপক ব্যবসা করে। যদিও দর্শক স্মৃতির প্রাবল্যে চলচ্চিত্রটির নাম এসেছে মাত্র একবার। ২০০৮ এর আগ পর্যন্ত সামাজিক অ্যাকশন ও অ্যাকশন ধারার চলচ্চিত্রে মান্না অভিনীত চলচ্চিত্রগুলো প্রাধান্য পায়। ২০০৬ এর পর থেকে শাকিব খান অভিনীত কয়েকটি চলচ্চিত্র দর্শক স্মৃতিতে জায়গা করে নেয়।

এই দশকে কমপক্ষে ছয়টি স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়। সিনেপ্লেক্স নির্ভর এসব চলচ্চিত্রের কয়েকটি বেশ ব্যবসাও করে। ২০১৫ সালের মধ্যে নির্মাণ না হলেও *আয়নাবাজি* (২০১৬) চলচ্চিত্রটি

নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং অনেক দিন পর কোনো চলচ্চিত্র রেকর্ড ব্যবসা করে। দর্শক স্মৃতিতেও চলচ্চিত্রটি সব দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যকবার জায়গা করে নেয়। এছাড়া এই দশকে লোককাহিনি-পোষাকি-ফ্যান্টাসি ধারার চলচ্চিত্র অপেক্ষাকৃত কম নির্মাণ হয়েছে। ফলে দর্শক স্মৃতিতে তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে।

৬.৩) চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর

শিল্পমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ততোক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকে, যতোক্ষণ তা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতির কারণ না হয়। কিংবা রাষ্ট্র যতোক্ষণ মনে করে, 'নাচ-গানওয়ালা' এই মাধ্যমটি দিয়ে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি এর উল্টোটা হয়, মানে সামান্যও ক্ষতি হয় কিংবা ক্ষতির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তাহলে এই মাধ্যমটিকে নিমিষে পিষে মারতে রাষ্ট্রের সময় লাগে না। রাষ্ট্র-চলচ্চিত্রের এই সম্পর্ক দীর্ঘ দিন ধরেই চলমান; তবে পুঁজি প্রাধান্যশীল এই মাধ্যমটি রাষ্ট্রের সঙ্গে খুব বেশি যে দ্বন্দ্বে জড়িয়েছে এমন নয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, দ্বন্দ্বে জড়ানোর আগেই রাষ্ট্র ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে চলচ্চিত্রকে আঘাত করেছে। তারা চলচ্চিত্র নিয়ে সামান্য ঝুঁকিও নিতে চায়নি। শুন্য দশকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এই ধরনের কয়েকটি ঘটনা ঘটে। রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে মৌলভীবাজরের শ্রীমঙ্গলের 'রাধানাথ'-এর অপারেটর মনির বলেন,

> ভারতে কতো ঘটনা নিয়ে সিনেমা হয়। পুলিশ খারাপ কাজ করলে সেটা নিয়ে সিনেমা হচ্ছে। আর আমাদের এখানে পুলিশ নিয়ে সিনেমা বানাতে গেলে অনুমতি লাগে, কাহিনিতে একটু সরকারের খারাপ কিছু বললে সেন্সর বোর্ডে আটকে দেয়। তাহলে ভালো সিনেমা বানাবে কীভাবে? সিনেমা মানেই তো বাস্তব। সেই বাস্তব যদি আটকে যায় সেন্সরে, তাহলে সে সিনেমা চলবে কী করে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭)?

একই ধরনের কথা বলেন চট্টগ্রামের 'আলমাস'-এর প্রহরী দিলীপ দে। তার ভাষ্যমতে,

> দেখেন, বাস্তবধর্মী সিনেমা এদেশে চলবে কীভাবে! সিনেমার মধ্যে একটা পুলিশ মারলে সেই সিনেমা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ ভারতে দেখেন মন্ত্রীদের সমস্যা, দুর্নীতি নিয়ে কতো সিনেমা হচ্ছে। কাহিনির প্রয়োজনে মন্ত্রীকে গ্রেফতার করছে, মেরে ফেলছে। এখন আমরা এগুলো ঘরে বসে টেলিভিশনেই দেখতেছি। অথচ আমাদের এখানে একটু কিছু হলেই সিনেমা বাতিল(আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৫)।

উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই তারেক মাসুদের *মাটির ময়না* নিয়ে কথা বলা যায়। *মাটির ময়না* বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে ২০০২ সালে বিখ্যাত কান চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য নির্বাচিত হয় এবং সম্মানজনক ডিরেক্টরস ফোর্টনাইট বিভাগের সূচনা চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। একই সময়ে তারেক মাসুদ চলচ্চিত্রটি দেশে সেন্সরের জন্য জমা দেন। কিন্তু **সেন্সর বোর্ড *মাটির ময়না*কে বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য 'অতিরিক্ত স্পর্শকাতর' বলে নিষিদ্ধ করে**। দেশে নিষিদ্ধ হলেও কান উৎসবে চলচ্চিত্রটি সম্মানজনক 'ফিপরেস্কি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিকস্ অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে।

এই সময়ের অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে তারেক মাসুদ বলেন, “কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই বিজয়, এই আনন্দ আমরা উপভোগ করতে পারিনি। কারণ আমরা যখন কানে পৌঁছাই, এর মধ্যেই ছবিটি দেশে নিষিদ্ধ হয় সেন্সর বোর্ডের কল্যাণে। অত্যন্ত বেদনাগত মন নিয়ে এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা উৎসবের দিনগুলো কাটিয়েছি নিজে দেশে ছবিটির দুর্ভাগ্যের কারণে। একটা মিশ্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি আমরা” (মাসুদ ২০১২, পৃ২৬–২৭)। পরে অবশ্য তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদ সেন্সর বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে মামলা করেন এবং চলচ্চিত্রটির সেন্সর ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য আদালত রায় দেন। ফলে ২০০২ সালের শেষের দিকে চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশে প্রদর্শনের অনুমতি পায়। মূলত মুক্তিযুদ্ধ, মাদ্রাসা, ইসলাম এই বিষয়গুলোর খানিকটা ভিন্নধর্মী উপস্থাপনের কারণে *মাটির ময়না* নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র কিছুটা ভীত ছিলো। তারই ফল হিসেবে তৎকালীন বিএনপি জোট সরকার চলচ্চিত্রটি প্রাথমিকভাবে নিষিদ্ধ করে।

ছবি : সংগৃহীত

অন্যদিকে ২০১১ সালের ২১ জানুয়ারি মুক্তি পায় রুবাইয়াত হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *মেহেরজান*। চলচ্চিত্রটি মুক্তির দুই–এক দিনের মধ্যেই এনিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। অভিযোগ ওঠে, চলচ্চিত্রটিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হয়েছে। একজন পাকিস্তানি সেনার সঙ্গে বাঙালি নারীর প্রেম নিয়েই মূলত বিতর্কের শুরু। পরে ধীরে ধীরে তা আরো ডালপালা মেলে।

বাংলাদেশে *মেহেরজান*-এর পরিবেশক ছিলো ‘আর্শীবাদ চলচ্চিত্র’। ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তির দুই–তিন দিন পর চলচ্চিত্রটি প্রেক্ষাগৃহ থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়। যদিও রাষ্ট্র এই

চলচ্চিত্রটি নিয়ে তখন প্রকাশ্য কোনো ধরনের মতামত দেয়নি। অবশ্য চলচ্চিত্রটি সেন্সরের যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মুক্তি পেয়েছিলো।

মেহেরজান-এর এই পরিণতি নিয়ে নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, "'মেহেরজান' এর ব্যাপারে আমার প্রচুর সমালোচনা ও প্রশ্ন আছে। তাই বলে কী ছবিটি বন্ধ করে দিতে বলব? আমি মনে করি শিল্পীর ভাল ছবি খারাপ ছবি, সঠিক ছবি বেঠিক ছবি—সবরকম ছবি বানানোর স্বাধীনতা থাকা উচিত। তেমনি দর্শকেরও স্বাধীনতা থাকা উচিত কোনো ছবি গ্রহণ ও বর্জনের। কিন্তু গলা টেপার নয়" (*কালের কণ্ঠ*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১)। *মেহেরজান* নিয়ে আরেক নির্মাতা তারেক মাসুদ বলেন, "আমি ছবিটি দেখেনি তার পরও বলছি, যদি ছবিটা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে হয়, তাহলে তো দর্শকই বিপক্ষে দাঁড়াবে, সমালোচনা করবে। সরকার, সেন্সর বোর্ড বা অদৃশ্য ওপর মহলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপে কোনো সিনেমার প্রচার বন্ধ করে দেওয়া কখনোই শুভ নয়। এটা খুবই বিপজ্জনক লক্ষণ" (*কালের কণ্ঠ*৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১)।

তবে চলচ্চিত্রটি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কারণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন চলচ্চিত্র গবেষক ও সমালোচক ফাহমিদুল হক,

> আমার ধারণা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, হয়তো ওই মাত্রায় বিশ্লেষণপ্রবণ নই। ফলে মুক্তিযুদ্ধের 'গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ' এর বাইরে কোনো কিছুই আমরা অনুমোদন দিতে চাই না। সেই গ্র্যান্ড ন্যারেটিভটা কী, আমরা সবাই জানি। এর একটা অংশ হলো, স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে, হত্যা-ধর্ষণ-ধ্বংসের মতো যুদ্ধাপরাধ করে এবং বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ গড়ে তুলে দেশকে স্বাধীন করে। এই ন্যারেটিভের আরেকটি অংশ হলো, ইসলামপন্থী কয়েকটি দলের বাঙালি সদস্যরা ওই সব যুদ্ধাপরাধে সহায়তা করেন অথবা ওই সব অপরাধে নিজেদের নিযুক্ত করেন। *মেহেরজান* ছবিটি এই গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের বাইরে গিয়ে ভিন্ন ন্যারেটিভ নির্মাণ করেছে। ফলে ছবিটি ঘিরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে (হক, ৩০ জানুয়ারি ২০১১)।

পুরো এই পরিস্থিতিটাকে সরকার আসলে মেনে নিতেও পারেনি আবার গ্রহণের সাহসও দেখায়নি। ফলে যেটা হয়েছে চলচ্চিত্রটি বন্ধে তারা প্রকাশ্য কোনো অবস্থান নেয়নি। যেটা করেছে খুবই কৌশলে পরিবেশককে দিয়ে *মেহেরজান* প্রেক্ষাগৃহ থেকে সরিয়ে নিয়েছে। আরো শঙ্কার কথা হলো, চলচ্চিত্রটি বিকল্প কোনো মাধ্যমে দেখারও সুযোগ প্রযোজক-পরিবেশক-নির্মাতা আর রাখেননি। এই ঘটনার অনেক বছর পরও *মেহেরজান* এর কোনো ডিভিডি কিংবা ইন্টারনেটে সেটা পাওয়া যায় না। কোনো চলচ্চিত্র ও তার নির্মাতার জন্য এর চেয়ে নির্মম আর কিছু হতে পারে না।

২০১৩ সালে ২৪ এপ্রিল সাভারের গার্মেন্টস কারখানার ভবন 'রানা প্লাজা'র ধস এবং তার ১৭ দিন পর ধ্বংসস্তুপের ভিতর থেকে রেশমা আক্তার নামে এক শ্রমিক জীবিত উদ্ধার হন। এ ঘটনাকে উপজীব্য

করে *রানা প্লাজা* নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ হয় ২০১৫ সালে। কিন্তু সেন্সর বোর্ডের নানা আপত্তি ও হাইকোর্টের রিটের কারণে নজরুল ইসলাম খান পারিচালিত চলচ্চিত্রটির মুক্তি স্থগিত করা হয়। বিশেষ কতোগুলো দৃশ্য ও সংলাপ কর্তনের শর্তে ২০১৫ সালের ১৬ জুলাই সেন্সর বোর্ড *রানা প্লাজা*কে সনদপত্র দেয়।

সে অনুযায়ী প্রযোজক সংস্থা ৪ সেপ্টেম্বর ৫০টি প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্রটি মুক্তি দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বাংলাদেশ ন্যাশনাল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজ লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলামের করা একটি রিট আবেদনের ভিত্তিতে *রানা প্লাজা*র মুক্তি আটকে যায়। তার অভিযোগ ছিলো, এই চলচ্চিত্রে ভীতিকর দৃশ্য দেখানোর পাশাপাশি নিরাপত্তা বাহিনীর নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যা আইনের লঙ্ঘন।

এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত ওই বছরের ২৪ আগস্ট চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনী ও সম্প্রচারে ছয় মাসের নিষেধাজ্ঞা দেয়। প্রযোজক শামীমা আক্তার ওই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ ৬ সেপ্টেম্বর উচ্চ আদালতের আদেশ স্থগিত করে দেন। ফলে আবারও *রানা প্লাজা*র মুক্তি সম্ভাবনা দেখা যায়। এবার ১১ সেপ্টেম্বর মুক্তির দিন ঠিক করে নতুন করে প্রচার শুরু হয়। কিন্তু মুক্তির ঠিক আগের দিন রিট আবেদনকারী পক্ষ আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন নিয়ে চেম্বার আদালতে যান (মোস্তফা ২০১৫, পৃ২০)।

চেম্বার বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী চলচ্চিত্রটির ওপর ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেন এবং বিষয়টি শুনানির জন্য আপিল বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন। এই ধারাবাহিকতায় ওই রিভিউ আবেদন আপিল বিভাগে ওঠে এবং ১৭ সেপ্টেম্বর তা খারিজ করে দেন আদালত। কিন্তু সকালে রিভিউ আবেদন খারিজ হওয়ার পর বিকেলেই, এবার তথ্য মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে স্থগিত করে দেয় *রানা প্লাজা*র মুক্তি। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, “ফিল্ম সেন্সর আপিল কমিটির কর্তৃক আপিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত ‘রানা প্লাজা’ চলচ্চিত্রের সেন্সর সার্টিফিকেট স্থগিত করা হয়েছে” (মোস্তফা ২০১৫, পৃ২০)।

রানা প্লাজা মুক্তি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে, রাষ্ট্র না চাইলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেই রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো চলচ্চিত্র মুক্তি দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এবং *রানা প্লাজা*র ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। রাষ্ট্র প্রথমে এখানে একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্রটিকে থামাতে চেয়েছে। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব হয়নি, তখন তারা সরাসরি হস্তক্ষেপ করে। সেন্সর বোর্ডে তৎকালিন সচিব নিজামুল কবীরের একটি বক্তব্যে তার প্রমাণ মেলে। নিজামুল কবীরের ভাষ্যমতে, চলচ্চিত্রটি নিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আপত্তি এসেছিলো (মোস্তফা ২০১৫, পৃ২০)। এই ঘটনা নিয়ে কুষ্টিয়ার ‘বনানী’র চলচ্চিত্র প্রতিনিধি মো. রাজন আহমেদ বলেন, ‘এই যে *রানা প্লাজা* সিনেমাটা তারা শেষ পর্যন্ত ছাত্রপত্র

দিলোই না। সিনেমাটা কিন্তু ব্যবসা করতো। ভারতে কিন্তু এধরনের সিনেমা ঠিকই সেন্সর পায়। বাস্তব নিয়েই চলচ্চিত্র। তাহলে সেই বাস্তব ঘটনা নিয়ে সিনেমা বানালে সমস্যা কোথায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫১)!'

শূন্য দশক ও পরের কয়েক বছরে সেন্সর নিয়ে চলচ্চিত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের এই সম্পর্ক বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনটি ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে তিনটি চলচ্চিত্র নিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যেকটিতেই রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে।

বাংলাদেশে সেন্সরের এই বিষয়টিকে প্রযোজক ও নির্মাতা ক্যাথরিন মাসুদ দেখেছেন আরেকটু ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে—"বাংলাদেশে সব শিল্পের মধ্যে চলচ্চিত্র 'নমঃশূদ্র'! এটি সব সময়ই সবচেয়ে কম গুরুত্ব পাওয়া একটি মাধ্যম। অন্য সব শিল্প মাধ্যমেরই—থিয়েটার, সংগীত, চিত্রকলা বা সাহিত্যের—নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু 'জাতীয় চলচ্চিত্রকেন্দ্র' বলে এখানে কিছু নেই। অযাচিত নিয়ন্ত্রণ সেন্সরশিপের প্রয়োজনেই হয়তো বাংলাদেশে চলচ্চিত্র এখনো সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বদলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে" (মাসুদ, ২৮ অক্টোবর ২০১১)। এই পরিস্থিতিতে মানগত দিক দিয়ে খারাপ এমন কতো চলচ্চিত্র টুশব্দটি না করে সেন্সর ছাড়পত্র দেওয়া হয়। সেদিকে সেন্সর বোর্ডের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ময়মনসিংহের 'পূরবী'র স্বপন মিয়া বলেন,

> বর্তমানের অনেক সিনেমাই সিনেমাহলে দেখানোর উপযোগী নয়। অনেক সিনেমার মান খুবই খারাপ। তাই সেন্সর বোর্ডকে স্বাধীনতা দিতে হবে। একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড যদি কোনো সিনেমা না মানে, তাহলে সেই সিনেমা মুক্তি দেওয়া যাবে না। আর নানা ধরনের সিনেমা বানাতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২০)।

যশোরের নজরুল ইসলাম সোহেল বলেন, 'সেন্সর বোর্ড তো কিছু সিনেমা আটকে দিতে পারে। এতো ফালতু গল্প দিয়ে সিনেমা বানালে কেনো সেন্সর দিতে হবে! কিন্তু তারা তো সেটা পারতেছে না। ক্ষমতার কারণে সেটা সম্ভব নয় (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২৬)।'

রাষ্ট্রের সঙ্গে চলচ্চিত্রের আরেকটি সরাসরি সম্পর্ক হলো অনুদান। চলচ্চিত্রের সঙ্গে একেবারেই সম্পৃক্ত নয়, বর্তমানে এমন লোককে অনুদানের জন্য আবেদন করতে দেখা যাচ্ছে। তারা হয়তো শিল্প-সাহিত্যের অন্য শাখায় অবদান রেখেছেন—এমন অনেকে খানিকটা ফ্যান্টাসি থেকে অনুদানের জন্য আবেদন করছেন এবং পেয়েও যাচ্ছেন। অথচ এদের চলচ্চিত্র নিয়ে তেমন কোনো বোঝাপড়া নেই। অনুদান পাওয়ার পর যেনোতেনোভাবে একটা চলচ্চিত্র নির্মাণ করে এদের অনেকে জমা দিচ্ছেন আবার কেউ হয়তো প্রথম কিস্তির টাকা তুলে কাজই শুরু করেননি। অনুদানের একটি চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে চালানোর অভিজ্ঞতা কুড়িগ্রামের মিরাজ বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> কিছু দিন আগে *অনিল বাগচীর একদিন* আনা হয়েছিলো পার্সেন্টেজে। তিন দিন চালানোর পর বন্ধ করে দিই। সিনেমাটা খুবই ধীর গতির। আর বেশিরভাগটাই সাদাকালো। কোনো দর্শকই পাওয়া যায়নি। আমার প্রশ্ন

> হলো, অনুদানের সিনেমা হলেই এধরনের হতে হবে কেনো! আগে তো অনুদানের অনেক ভালো সিনেমাও হয়েছে। এখন খালি মুক্তিযুদ্ধের নাম থাকলেই সেই সিনেমা অনুদান পায়। এর ভিতর কী আছে, সেটা দেখা হয় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৪)।

২০১১–২০১২ অর্থবছরে *নেকড়ে অরণ্য* নামে চিত্রনাট্যের ওপরে অনুদান পান মারুফ হাসান আরমান। তিনি অনুদানের প্রথম কিস্তির টাকা তোলার পরও চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ শুরু করেননি। আরমানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। অভিযোগ রয়েছে, অনুদানের টাকা দিয়ে তিনি জমি কিনেছেন (জামান, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মারুফ হাসান আরমান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে তার কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। লোক ভাড়া করে তিনি চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য লিখে নিয়ে জমা দেন এবং ক্ষমতার কারণে অনুদান পান।

অনুদানের চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে তারা তাদের মতাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ চলচ্চিত্রকে অনুদান দিয়েছে। সেই বিষয়বস্তু সঙ্গে মূল চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়নের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিন্তা করা হয়নি। কুষ্টিয়ার মোখলেছুর রহমান বকুল বলেন,

> অনুদানের সিনেমা এখন আর কেউ দেখে না। মুক্তিযুদ্ধের গল্প এখন আর কেউ শুনতে চায় না। এই প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের গল্প জানতে চায় না। তারা সারাদিন মোবাইল, ফেইসবুক নিয়ে থাকে। তাই অনুদান নিয়ে কেবল মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা নির্মাণ করলে হবে না। নানা ধরনের সিনেমা করতে হবে। এফডিসি থেকে যে সিনেমাগুলো হয়, সেই সিনেমা বানানোর জন্য অনুদান দিতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫২)।

"অর্থাৎ জনগণের ট্যাক্সের অর্থে বিগত ৩৫ বছর দেশে শিল্পসমৃদ্ধ ছবি নির্মাণের যে উদ্যোগ চালু আছে, তা আমাদের চলচ্চিত্রকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরবার বড় কোনো উদ্যোগে পরিণত হতে পারেনি" (আহমেদ ২০১৮, পৃ৩৪)। এছাড়া অনুদান পাওয়া বেশিরভাগ চলচ্চিত্র দর্শক দেখার সুযোগই পায় না। নামমাত্র দুই–একটি প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্রগুলো মুক্তি দিয়েই কাজ শেষ করে ফেলা হয়।

অনুদানের চলচ্চিত্র মানেই যেনো সেটা চলবে না, দর্শক দেখবে না। অথচ জনগণের টাকায় জনগণের জন্য এই চলচ্চিত্র নির্মাণ হওয়ার কথা ছিলো। মৌলভীবাজরের শ্রীমঙ্গলের মনির বলেন,

> এখন মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা বানানো হয়, সেগুলো চলে না। কেনো মান্না আগে *সৈনিক* বানায় নাই, ব্যবসাও করছে, পুরস্কারও পাইছে। অথচ আপনি বানাবেন *অনিল বাগচীর একদিন*। আপনি সরকারের কাছ থেকে নেবেন ৫০ লাখ টাকা অথচ খরচ করবেন ৩০ লাখ টাকা। এই করে সিনেমা হবে না। এখন আমাদের দেশে অনুদানের টাকা দিয়ে বাণিজ্যিক সিনেমা বানাতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭)।

শ্রীমঙ্গলের জহির খন্দকার বলেন,

> সরকারের উচিত সপ্তাহে কমপক্ষে তিনটা সিনেমা মুক্তির ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে সিনেমা তৈরির সময় তারা প্রযোজককে টাকা দিবে। অনুদান দিয়ে খালি পুরস্কার পাওয়া সিনেমা বানালে তো হবে না। অন্য সিনেমা মানে

> বাণিজ্যিক সিনেমা বানানোর জন্য টাকা দিতে হবে। আমাদের এখন পুরস্কার পাওয়া সিনেমা বানানোর কোনো দরকার নাই। বণিজ্যিক সিনেমার দরকার (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৬)।

অনেকে অনুদান পাওয়ার পর সময় মতো চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যর্থ ও জমা না দিতে পারার কারণ হিসেবে স্বল্প বাজেটকে দায়ী করেছেন (নির্ঝর, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩)। কিন্তু এই যুক্তি বোধ হয় ধোপে টেকে না। কারণ চলচ্চিত্রের একটা বড়ো অংশ জুড়ে থাকে প্রি-প্রোডাকশনের কাজ। সেখানে বাজেট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা নিয়ে যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ চলে। এটা চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে অনুদানের জানা বাজেটে কোনো নির্মাতা চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করতে পারলে সেটি জমা দিবেন, না হলে নয়। কিন্তু অনুদান পেয়ে টাকা নেই বলে নাকি-কান্না খুব বেশি গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে চলচ্চিত্রের আজকের অবস্থানের জন্য অনেকে সরাসরি সরকারের সমালোচনা করেছেন। যশোরের 'মণিহার'-এর দর্শক কে এম হাসান দাবি করেন, 'সিনেমার আজকের এ অবস্থার জন্য সরকারের অবহেলা আছে। তারা এতো বড়ো একটা মাধ্যমে কী হচ্ছে সেটা খেয়াল করছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৩২)।' রংপুরের 'শাপলা'র শফিকুল ইসলাম বলেন,

> বর্তমানে সিনেমাহলের পিছনে কেউ নেই। এখন সিনেমাহলে একটা গণ্ডগোল লাগলে যদি পুলিশ ডাকা হয়, তারা আসতে দেরি করে। কোনো কারণে কাস্টমসকে ডাকা হলে তারা আসেই না। অথচ একসময় পুলিশ সিনেমাহল পাহারা দিয়েছে, কাস্টমস এসে সিনেমাহলে সারাদিন বসে থাকতো। এখন সিনেমাহল নিয়ে সরকারের একেবারে অবহেলা (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৬)।

সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে কুড়িগ্রামের বিজয় অধিকারী বলেন, 'দেখেন সরকার সবচেয়ে বেশি ট্যাক্স খেয়েছে সিনেমাহল থেকে, তাহলে এর জন্য সে কাজ করবে না কেনো? জাতির জন্য সিনেমাহলের বিনোদন তো প্রয়োজন (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২)।' কুড়িগ্রামের হাবিবুর রহমান টিটু বলেন একই ধরনের কথা—'এক সময় আমরা হাজার হাজার টাকা ট্যাক্স দিছি সরকারকে। এখন তো মনে হয় ট্যাক্সের লোকজন সিনেমাহলে আসেই না। এখন তো ব্যবসা নাই। সরকারের তো এখন সিনেমাহলের দিকে নজর দেওয়া উচিত (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৬)।' লাকসামের মো. তোফাজ্জল বলেন,

> এখন আস্তে আস্তে ভালো সিনেমা দিয়ে দর্শককে ডেকে আনতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা আছে। অনেকে অল্প খরচে বিভিন্ন সিনেমাহল আগের এসব সিনেমা এখনো চালাচ্ছে, সেগুলো বন্ধ করতে হবে। এরফলে সিনেমা সম্পর্কে খারাপ ধারণা মানুষের যাচ্ছে না। আর সরকার যেহেতু সিনেমাকে শিল্প ঘোষণা করেছে, তাই ভালো সিনেমা নির্মাণে তাদের ভূমিকা রাখতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৮)।

তবে সরকারের ভূমিকা নিয়ে ভিন্ন কথাও আছে। সিলেটের 'নন্দিতা'র রাশেদুল কবির মন্টু বলেন, 'আমি জানি না আপনি (গবেষক) ঠিক কী করতেছেন। তবে অনেকে বলে সরকার জেলায় জেলায় একটা করে সিনেমাহল বানিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে? কিন্তু আমি মনে করি, সব টাকাই জলে

যাবে। কোনো লাভ হবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১১)।' ময়মনসিংহের বদিউল আলম চৌধুরী বলেন, 'সরকারের পক্ষ থেকে সিনেমাহলগুলো সংস্কারের জন্য সাহায্যের কথা বলা হচ্ছে; কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। কারণ যদি প্রোডাকশন না থাকে, তাহলে খালি দোকান দিয়ে কী হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৫)!'

চলচ্চিত্রের আধেয়ের সঙ্গে সঙ্গে শূন্য দশকে এসে এফ ডি সির অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এফ ডি সির প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা চরম আকার ধারণ করে। এর ফল হিসেবে এফ ডি সির ভিতরেই চলচ্চিত্রের বেশিরভাগ নোংরা দৃশ্য ও কাটপিস ধারণ শুরু হয়। কিছু পরিচালকদের নিয়ে সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে (*কালের কণ্ঠ* ২৬ মার্চ ২০১১)। ২০০৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র বিরোধী অভিযান শুরুর আগে এগুলো ছিলো এফ ডি সিতে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এছাড়া নতুন আরেক সমস্যার কথা বলেন রাজশাহীর 'উপহার'-এ ঢাকা থেকে আসা চলচ্চিত্র প্রতিনিধি এম এ মোমিন রাঙ্গা, 'এখন আবার নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে এফ ডি সি'তে, সেটা হলো চাঁদাবাজি। আপনি নতুন প্রযোজক, সিনেমা বানিয়েছেন, আপনাকে মোটাদাগের চাঁদা দিতে হবে। তাছাড়া আপনি সিনেমা মুক্তি দিতে পারবেন না। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৬)।'

এছাড়া প্রাযুক্তিক বিষয়ে নানা সমস্যা তো এফ ডি সির পুরনো ঘটনা। ৯০ দশকের শেষ দিকে চারদলীয় জোট সরকার ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলো। ২০০৮-এ নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার তিন বছর পার হয়ে গেলেও তারা সাউন্ড কমপ্লেক্সটি চালু করেনি। নতুন যে মেশিনপত্র কেনা হয় সেগুলোও নিম্নমানের। অনেক টাকায় কেনা টেলিসিনে মেশিনটি (গতিশীল চিত্রকে ফিল্ম থেকে ভিডিও মাধ্যমে নেওয়ার জন্য যে মেশিন ব্যবহার করা হয়) চালু হওয়ার আগেই নষ্ট হয়ে যায়।

সবমিলে অকার্যকর হয়ে পড়ে ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড কমপ্লেক্স। এছাড়া সেসময় নজীর আহমেদ সাউন্ড কমপ্লেক্স ও বিপুল অংকের টাকা ব্যয়ে নির্মিত মান্না ডিজিটাল সাউন্ড কমপ্লেক্সে আশানুরূপ কাজ করতে পারছিলো না নির্মাতারা (যুবায়ের ২০১১, পৃ১০)। সিলেটের মোস্তফা চৌধুরী বলেন, 'টেকনিকালি আমাদের দেশের সিনেমা এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। এই যে দেখেন এফ ডি সিতে অনেক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বছরের পর বছর ধরে পড়ে আছে। ওগুলো ব্যবহারের মতো কোনো লোক নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৩)।'

এফ ডি সির এই সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে নির্মাতা তারেক মাসুদের মন্তব্য হলো—

> বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (এফডিসি) বর্তমান চলচ্চিত্র সংস্কৃতির মান অবনয়নের জন্য অনেকাংশে দায়ী। বিশেষ করে, ঢালিউড ধারার ছবির এই দুর্দিনে সংস্থাটির ভূমিকা অনেকটা শ্মশানের শিয়ালের মতো। মুক্ত অর্থনীতির জিগির তুলে আমরা অর্থনৈতিক ও শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লাভবান অনেক প্রতিষ্ঠানকে বিকিয়ে দিয়েছি বেসরকারি খাতে। অথচ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা যথেষ্ট লাভজনক না হলেও একে শুধু টিকিয়ে রাখা

হয়নি, দেওয়া হয়েছে একচেটিয়া আধিপত্য। সংস্থাটির বেসরকারীকরণ তো দূরের কথা, সংস্থাটির পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিযোগিতামূলক স্টুডিও ল্যাব ও কারিগরি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না (মাসুদ ২০১২, পৃ৯৬–৯৭)।

এফ ডি সি'র এই আধিপত্যই এতোটাই প্রবল যে দেশে বর্তমানে কোনো বেসরকারি স্টুডিও গড়ে ওঠেনি। ফলে যেটা হচ্ছে বাণিজ্যনির্ভর হোক আর শিল্পমনস্ক হোক, ন্যূনতম মান সম্পন্ন চলচ্চিত্রের পরিস্ফুটন, মুদ্রণ, সম্পাদনার জন্য দেশের নির্মাতা ও প্রযোজকদের ভারতের চেন্নাই কিংবা মুম্বাইয়ে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এখন এফ ডি সি'র মৌলিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন ছাড়া চলচ্চিত্রের বর্তমান স্থবিরতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। শূন্য দশকের মধ্য ভাগের একটু পরে এফ ডি সিতে ডিজিটাল সাউন্ড রেকর্ডিং, এডিটিং যন্ত্রপাতি আনা হয়। কিন্তু সেগুলো পরিচালনা করার মতো যোগ্য লোক দেশে এখনো নেই। বস্তুত ভারতের মাদ্রাজ, মুম্বাই কিংবা চেন্নাই এবং এফ ডি সি'র যন্ত্রপাতি একই (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ১৭০), কিন্তু আনুসঙ্গিক সমর্থন দেওয়ার মতো পরিবেশ এফ ডি সিতে নেই এবং লোকগুলো অদক্ষ।

এহেন পরিস্থিতিতে তারেক মাসুদের ভাষ্য, "... কারিগরিভাবে ন্যূনতম মানসম্পন্ন ও বাণিজ্যিক মোটামুটি সফল ছবির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এফডিসির খোলনলচে বদলে ফেলতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির বিরাষ্ট্রীয়করণ ছাড়া তা সম্ভব কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে" (মাসুদ ২০১২, পৃ১১৪–১১৫)। তারেক মাসুদের কথার সমর্থন পাওয়া যায় আরেক নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেলের কথায়, তার ভাষ্যমতে,

> ... গত ৪০ বছরে এফডিসির সুযোগ-সুবিধা ভাঙিয়ে অনেক প্রযোজক ও কর্মচারীর উন্নয়ন(!) ঘটলেও এফডিসি এ দেশের চলচ্চিত্রের উন্নয়নে উল্লেখ করার মতো কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। এফডিসি রয়ে গেছে কেবলই বাণিজ্যিক একটা ফিল্ম স্টুডিও হিসেবে। ... বাংলাদেশ সরকারকে কেন এমন একটা ফিল্ম স্টুডিওর মালিক হতে হবে? ফ্রান্স, ইতালি বা বাড়ির পাশের দেশ ভারতের সরকার তো কোনো ফিল্ম স্টুডিওর মালিক নয়, কিন্তু এসব দেশের চলচ্চিত্রের বিকাশ ও উন্নয়নে তো কোনো অসুবিধা ঘটছে না? কেন বাংলাদেশ সরকারকেই একটা ফিল্ম স্টুডিওর মালিক হতে হবে, বিশেষ করে এই বাজার অর্থনীতির যুগে? ... বাংলাদেশ সরকারের উচিত রাজস্বের ব্যাপারটা নিশ্চিত করে এফডিসিকে ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে দেওয়া (মোকাম্মেল, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)।

কিন্তু এতো বছর পরেও সরকারের এ ধরনের চিন্তা আছে বলে মনে হয়নি। তবে ২০০৭ সালে যখন এফ ডি সি কেন্দ্রিক নোংরা চলচ্চিত্রগুলোর অবস্থা চরমে, তখন এর বিরুদ্ধে এফ ডি সি, সেন্সরবোর্ড ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করে। কিন্তু ততোদিনে এফ ডি সির যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। খুলনার আনোয়ার হোসেন মনে করেন, 'এফডিসির উচিত, একজন ডিরেক্টর আসলে কী সিনেমা বানাচ্ছে সেটা খতিয়ে দেখা। প্রডিউসারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমরা যেনোতেনো একটা গল্প নিয়ে সিনেমা বানালাম—এটা বন্ধ করা উচিত (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৪)।'

২০১১-এর দিকে এফ ডি সিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ একেবারে কমে যায়। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে জানা যায়, "গত কয়েক মাস ধরে এখানে নির্মাতারা কাজ করার বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এফডিসির কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন শাখা এখন প্রায় অচল। বিশেষ করে সম্পাদনা শাখা, শব্দগ্রহণ শাখা, ক্যামেরা শাখা সবই একপ্রকার অচল হয়ে আছে" (*সমকাল* ১৩ মার্চ ২০১১)। এই পরিস্থিতিতে নির্মাতা এফ ডি সি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নির্মাতা আমজাদ হোসেনের (হোসেন, ২২ জুন ২০১১) কথাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে ফিল্ম ইনস্টিটিউট অ্যান্ড আর্কাইভ এবং পরে ফিল্ম আর্কাইভে বেশ কয়েকটি কোর্স সম্পন্ন হয়। কিন্তু সমস্যা হলো এতোদিন পর্যন্ত চলচ্চিত্র শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কাঠামো বাংলাদেশে দাঁড়ায়নি। চট্টগ্রামের 'সিনেমা প্যালেস'-এর মালিক হাজী আবুল হোসেন বলেন, 'পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে অভিনয়, পরিচালনা, নাচ-গান শেখার কতো বড়ো বড়ো ইনস্টিটিউট আছে। কিন্তু আমাদের এখানে সেটা গড়ে উঠেনি। ফলে আমাদের তো কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরি হচ্ছে না। এখানে আমাদের এখন সবার আগে ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা দরকার (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৬)।' রংপুরের তসলিম উদ্দিন বলেন,

> আমাদের দেশে রাস্তায় একটা সুন্দর মেয়ে পেলে সেটাকে নিয়ে এসে নায়িকা বানানো হচ্ছে! তার তো কোনো অভিনয় দক্ষতা নেই, তাহলে কীভাবে চলবে! তাই তার পক্ষে তো ভালো অভিনয় করা সম্ভব নয়। আমাদের এখানে অভিনয় শেখার সেই সুযোগও নাই। সারা দেশে অনেক সিনেমাহল বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর নতুন করে কোনো সিনেমা তৈরি হচ্ছে না, বরং কমে যাচ্ছে। তাই দেশে এখন অভিনয়শিল্পী, পরিচালক বানানোর স্কুল খুব জরুরি (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২৪)।

তবে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র শিক্ষার জন্য বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০০৩ সালে ঢাকার গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় 'চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও ডিজিটাল মাধ্যম' বিষয়ে স্নাতক কোর্স চালু করে (জেয়াদ ২০১০, পৃ৪৫১)। কিন্তু পরে তা আর বেশি দূর এগোয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চলচ্চিত্র শিক্ষাক্রম চালুর ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বেসরকারি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি। এখানে চলচ্চিত্র বিষয়ক কোর্সে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এফ ডি সি। এখানকার শিক্ষার্থীরা শব্দ গ্রহণ, আবহসঙ্গীত গ্রহণ ও সাউন্ড টেকনোলজির ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য এফ ডি সি'র সাউন্ড কমপ্লেক্স ব্যবহার করছে (জেয়াদ ২০১০, পৃ৪৫২)। এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে ২০১০ সাল থেকে মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের অধীনে যে কেউ চাইলে সাংবাদিকতা কিংবা চলচ্চিত্র নিয়ে অনার্স ডিগ্রি নিতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২ সালের ২৩ জানুয়ারি টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগ চালু হয়। পরে ২০১৬ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় টেলিভিশন, ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট। এখানে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য চার বছরের অনার্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে।

এছাড়া ২০১৩ সালের ১ নভেম্বর দেশে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট' (বি সি টি আই) নামে স্বায়ত্তশাসিত একটি প্রতিষ্ঠান পথ চলা শুরু করে। ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেন বলেন,

> পাশের দেশ ভারতের কথাই বলেন, সেখানে যতো বড়ো প্রোডিওসারের মেয়েই আসুক না কেনো, সে চাইলেই নায়িকা হতে পারবে না; তাকেও প্রশিক্ষণ নিয়ে আসতে হবে। ফলে তাদের অভিনয়, নাচ দেখলে মনে হয় না তারা নতুন আসছে। আমাদের দেশে এসবের কোনো বালাই নাই। প্রযোজকের পছন্দ হলেই নায়িকা, সে অভিনয় পারুক আর না পারুক। যার কারণে আজকে আমাদের এই অবস্থা (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)!

সিলেটের হারুন অর রশীদ বলেন, 'বিদেশে একজন অভিনেতাকে ড্যান্স, অভিনয় সবকিছুর ওপর লেখাপড়া করে শিখতে হয়। আমাদের দেশে এধরনের অভিনেতা কে আছে বলেন (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৬)?'

চলচ্চিত্র শিক্ষা নিয়ে আরো যে সমস্যাটি দেশে আছে সেটা হলো, দক্ষ শিক্ষকের অভাব। কিছু মানুষ বিদেশ থেকে চলচ্চিত্র নিয়ে পড়ালেখা করেছে ঠিকই কিন্তু তারা দেশে ফিরে না চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে, না চলচ্চিত্র শিক্ষায় ভূমিকা রাখতে পেরেছি। ফলে এই সমস্যাটি রয়েই গেছে।

৬.৪) চলচ্চিত্রের সমান্তরাল শিল্পকলা ও গণমাধ্যম

৯০ দশকের শেষের দিকে ভিসিআর এর চেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি সিডি ও ডিভিডি সহজলভ্য হয়ে ওঠে; সঙ্গে রঙিন টেলিভিশনের দামও হাতের নাগালে চলে আসে। ১৯৯২-১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে যেখানে ১০টি আন্তর্জাতিক চ্যানেল দেখার সুযোগ ছিলো, ২০০১-এ এই সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়ে যায়। এবং ২০১৬ তে স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা দাঁড়ায় শতাধিক (কাদের ও সিদ্দিক, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬)। এসব চ্যানেলে প্রচারিত চলচ্চিত্র, নাটক, সোপ অপেরা[১১], বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান অনেক দর্শক নিয়মিতই দেখে। শ্রীমঙ্গলের জহির খন্দকার বলেন, 'এই শ্রীমঙ্গলে ডিসের চারটা লোকাল চ্যানেল আছে, তারা প্রত্যেক দিন সিনেমা দেখায়। অনেক সময় নতুন নতুন সিনেমাও দেখায়। তাহলে দর্শক এই নোংরা, গন্ধওয়ালা সিনেমাহলে টাকা খরচ করে আসবে কেনো (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৬)!' কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার উমর আলী বলেন, 'ভারতের সিরিয়াল যেনো সবাই রুটিন করে দেখে; মনে হয় ক্লাস করতেছে। তার ওপর আছে মোবাইল ফোন, সবাই তিন-চারটা করে সিনেমা নিয়ে ঘোরে।

[১১]. পাশ্চাত্যে সাবানের বিজ্ঞাপন প্রচারের সঙ্গে এসব নাটক দেখানো হতো বলে এগুলোকে ডেইলি সোপ অপেরা বলা হয়।

তাহলে সিনেমাহলে কখন যাবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৮)!’ নওগাঁর পত্নীতলার ‘রংধনু’র দর্শক আবদুর রহমান বলেন,

> আগে মাসে একটা করে সিনেমা দেখানো হতো বাংলাদেশ টেলিভিশনে, তার পর সপ্তাহে একটা করে দেখানো শুরু হলো। এরপর প্রতিদিন একটা করে সিনেমা দেখানো হতো। আর এখন তো টেলিভিশনে সারা দিন সিনেমা হয়, অনেকগুলো করে। তাই সিনেমাহলে সময় দেওয়ার সময় মানুষের নাই। এখন লোকজনের আগ্রহ গাঁজা, হিরোইন, ফেন্সিডিল, মদ এগুলার দিকে। আগে এগুলা ছিলো না। মানুষের রঙ-তামাশার জায়গাই ছিলো সিনেমাহল। বৃষ্টি, আকাশ একটু মেঘলা থাকলে, কুশায়া হলে তখন সিনেমাহলে জায়গা দেওয়া যেতো না (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৪)।

বিশেষ করে ভারতীয় কয়েকটি চ্যানেলে সারাদিনই হিন্দি ও বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র সম্প্রচার হতে থাকে। একটি চলচ্চিত্র পছন্দ না হলে মুহূর্তে অন্য একটি দেখার সুযোগ আছে। এছাড়া যে নারী দর্শক নানা কারণে প্রেক্ষাগৃহে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো, তাদের বিনোদনে নতুন উপাদান হিসেবে যোগ হয় ভারতীয় ডেইলি সোপ অপেরা। নেত্রকোণার পরিতোষ সাহা মনে করেন, “ডিস আসার পর সিনেমার ওপর তেমন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু ভারতীয় চ্যানেল ‘স্টার প্লাস’, ‘স্টার জলসা’, ‘জি বাংলা’ এসে সব শেষ হয়ে গেলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২৪)।” যশোরের ‘মণিহার’-এর শহিদুল ইসলাম বলেন,

> টেলিভিশনে যে সিরিয়ালগুলো এখন হয়, এগুলো দেখার পর সিনেমাহলে আসার কোনো প্রশ্নই আসে না। সন্ধ্যা থেকে এমনভাবে এসব সিরিয়াল শুরু হয়, দর্শক আটকে যায়। সিনেমাহলে আসার কোনো সুযোগই দেয় না। আগে ইভিনিং শোয়ে প্রচুর দর্শক হতো। এখন সিরিয়াল সেই দর্শককে আটকে রাখে। সেজন্য পরিবার নিয়ে আসা দর্শক আর এখন পাওয়া যাচ্ছে না (আখ্যানের ক্রম ৪৪.৪২)।

বরিশালের এবায়দুল হক চাঁন বিষয়টা ব্যাখ্যা করেন একটু অন্যভাবে। তার ভাষায়,

> আমি পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ ভ্রমণ করেছি। কিন্তু কোনো দেশে আমি দেখেনি যে, পার্শ্ববর্তী বা বাইরের দেশের কোনো চ্যানেল তারা এভাবে বিনা পয়সায় দেখে। ওখানকার বেশিরভাগ চ্যানেল দেখার জন্য গ্রাহককে টাকা দিতে হয়। আমাদের দেশে আপনি একটা ডিস সংযোগ নিলেই দেশ-বিদেশের যেকোনো চ্যানেলের অনুষ্ঠান, সিনেমা দেখতে পারছেন। তাহলে মানুষ কেনো সিনেমাহলে যাবে! এগুলো আসলে দেশের স্বার্থে বন্ধ করা দরকার (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১৫)।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে ৮০ ও ৯০ এর দশকে ধারাবাহিক নাটক খুবই জনপ্রিয় ছিলো। সপ্তাহের বিশেষ একটি দিনে সাধারণত এই নাটক চলতো। দর্শক ওই নাটক দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে থাকতো সারা সপ্তাহ। এবং প্রতি সপ্তাহের নাটকটি এমন পরিস্থিতিতে শেষ হতো যেনো পরের সপ্তাহে তা দেখার ব্যাপারে দর্শকের আগ্রহ থাকে। বিটিভি’র সেই ধারাবাহিক নাটকগুলো, দেশে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর পর তাদের কব্জায় চলে যায়। বিশেষ করে ‘একুশে টেলিভিশন’ প্যাকেজ নাটকের

আওতায় দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক নাটক সম্প্রচার করতে থাকে। সেগুলো খুব জনপ্রিয়ও হয়। কিন্তু দেশে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব ধারাবাহিক নাটকের মানও কমতে শুরু করে। বরিশালের শেখ মাসুম বলেন,

> এখন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে টেলিভিশন ও ডিসের লাইন। সেই টেলিভিশনে সারা দিন ভারতীয় চ্যানেল চলে; অথচ আমাদের দেশের চ্যানেলগুলোতে যে নাটক হয়; সেটা কেউ দেখে না। আমাদের দেশের নাটকের কাহিনি এতো সুন্দর, অথচ সিনেমার কোনো কাহিনি নাই। নাটকের কাহিনি নিয়েও যদি সিনেমা হতো, তাহলেও অনেক লোক সিনেমা দেখতে আসতো। কিন্তু সেটাও কেউ করতেছে না। অবশ্য এখন নাটকও আগের মতো আর নেই (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২)।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে শুন্য দশকের মাঝামাঝি থেকে দেশে চালু থাকা ভারতীয় চ্যানেলগুলোতে সোপ অপেরা জনপ্রিয় হতে থাকে। প্রথম দিকে 'সনি টিভি'তে হিন্দি ভাষায় সম্প্রচারিত সোপ অপেরাগুলো জনপ্রিয় হয়। মূলত হিন্দি ভাষা খুব বেশি মানুষ না বোঝায়, শহরে এসব সোপ অপেরার বেশি জনপ্রিয়তা ছিলো। পরে ধীরে ধীরে কলকাতাভিত্তিক চ্যানেলগুলো বাংলা ভাষায় সোপ অপেরা নির্মাণ শুরু করে। সাধারণত পারিবারিক জটিলতা, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, বউ-শ্বাশুড়ির দ্বন্দ্ব, পরকীয়া প্রেম, নারীদের কুটিলতা, পৌরাণিক কাহিনি, রূপকথার গল্প নিয়ে সোপ অপেরাগুলো নির্মাণ হতে থাকে। বরিশালের 'অভিরুচি'র পয়েন্টম্যান আ. মালেক বলেন,

> আর যতো ভালো সিনেমাই আসুক লোক আসবে কেনো, এখন সবাই ইন্টারনেটে, মোবাইলে সিনেমা দেখে, মহিলারা তো সারাদিন দেখে 'স্টার জলসা'। সেখানে একই কাহিনি ঘুরে ঘুরে দেখায়। আর সব কাহিনিতেই কোনো না কোনোভাবে পরকীয়া প্রেম আছেই। বাংলাদেশের মহিলা-পুরুষরা এখন কেউ দেশের কোনো চ্যানেল দেখে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.৩)।

৯০ দশকের শেষের দিক থেকে বিনোদন-হারা নারীরা এসব সোপ অপেরায় ভয়াবহভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। ঘরকন্নার বাইরে এই নারীদের অনেকের কাছে বিনোদনের এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনার প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে এসব সোপ অপেরা। প্রতিদিনের নতুন পর্বটি সন্ধ্যার পর থেকে সম্প্রচার হওয়া শুরু হলেও ২৪ ঘণ্টায় একই পর্ব কমপক্ষে তিনবার পুনঃপ্রচার হয়। ফলে দিন-রাতের কোনো না কোনো সময় তারা এগুলো দেখতেই পারে। এর সমর্থন পাওয়া যায় কবি, সাংবাদিক আবুল মোমেনের কথাতেও। তার ভাষায় "এসব বানোয়াট কূটচালে ভরা চক্রান্ত-কুটিলতার কাহিনীজালে আর কুশীলবদের পোশাকি চাকচিক্যে ও বাহ্য স্মার্টনেসের জালে তারা বাঁধা পড়েছেন। এটা তাঁদের দৈনন্দিন খোরাক এবং ভয়ানক নেশার মতো আচ্ছন্ন করে রাখছে" (মোমেন, ২২ মে ২০১০)।

অন্যদিকে বাড়ির পুরুষদের জন্য টক শো, ক্রিকেট খেলা বিনোদনের উপাদানে পরিণত হয়েছে। আর শিশুদের জন্য রয়েছে কার্টুন, চলচ্চিত্র আরগান। ফলে বাড়ির প্রায় সব সদস্যই কোনো না কোনোভাবে

বিনোদনের জন্য টেলিভিশনের ওপর নির্ভরশীল। খুলনার 'শঙ্খ'-এর বুকিং ক্ল্যার্ক মো. ওবায়দুর রহমান বলেন,

> এতো টাকা খরচ করে মানুষের সিনেমাহলে আসার সামর্থ্য নাই। তাই তারা বাড়িতে, চা দোকানে টেলিভিশনে সিনেমা দেখে। এখন নতুন নতুন সিনেমাও চ্যানেলে দেয়। আর আগে মহিলারা সিনেমা দেখতে আসতো। তারাও ডিসের কারণে আসে না। তারা সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন চ্যানলে নাটক দেখে। তাহলে সে সিনেমাহলে আসবে কেনো! এরকম হাজার হাজার মহিলা আছে। এরা সারা দিন কাজ করে সন্ধ্যার পর টেলিভিশনের সামনে থেকে নড়ে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৩)।

যশোরের আলী হোসেন নদু বলেন,

> আমার তো মনে হয় ডিসলাইনের কারণেই এরকম হয়েছে। কারণ ডিসলাইন আগে ছিলো কেবল শহরে, আর এখন সব গ্রামে সেটা চলে গেছে। সিনেমাহলের দর্শকের অনেকে এখন ভারতের কিছু চ্যানেলে নাটক, সিনেমা দেখে। এগুলোতে সারাদিন সিনেমা চলে। তবে মোবাইলের মেমোরি কার্ডও খুব ক্ষতি করেছে। একটা মেমোরি কার্ডে অনেক কিছু নেওয়া যায়। যারা শ্রমজীবী তারা কাজ করতেছে আর মোবাইলে গান শুনতেছে। কাজ না থাকলে ওখানেই আবার সিনেমা দেখতেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৭)।

বরিশালের এবায়দুল হক চাঁন বলেন,

> যখন একজন লোক ১০ মিনিট চায়ের দোকানে বসে চা খায়, একই সঙ্গে সে টেলিভিশনে কোনো সিনেমাও দেখে। ওই লোক সারাদিনে দুই কাপ চা খাওয়ার সময়ের মধ্যেই সে বিনোদন নিয়ে নেয়। চা খাওয়া হয় সিনেমা দেখাও হয়। ফলে আলাদাভাবে টাকা খরচ করে ওই লোক কেনো সিনেমাহলে আসবে! এছাড়া ডিসের মাধ্যমে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের নানা চ্যানেলে সারা দিন সিনেমা হতে থাকে। অনেকে বাড়িতে বসে সেটা দেখে (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১৫)।

যশোরের রবিউল আলম বলেন, 'দীর্ঘ দিন বাংলাদেশের সিনেমার আমি কোনো উন্নয়ন দেখি না। মাঝে মাঝে মনে হয় সরকার যদি ভারতীয় কয়েকটা চ্যানেল বন্ধ করে দিতো, তাহলে বোধ হয় কিছু হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৮)।' একই ধরনের কথা বলেন রংপুরের 'শাপলা'র পাবলিসিটির দায়িত্বে থাকা আ. কুদ্দুস।

কুড়িগ্রামের বিজয় অধিকারী এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করেন অন্যভাবে। তার মত হলো,

> মানুষের জন্য বিনোদন থাকাটা খুব জরুরি। সেটা হারিয়ে গেছে। সিনেমাহলে সিনেমা দেখার একটা আলাদা মজা আছে। সেটা একা একা দেখলে পাওয়া যায় না। মানুষ যদি সিনেমাহলে এসে এই মজা না নিতে পারে, তাহলে দেশের অনেক ক্ষতি হবে। কারণ এসব সিনেমার মধ্যে অনেক জ্ঞান আছে। একই সঙ্গে আনন্দও আছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২)।

তবে শূন্য দশকের শেষের দিকে টেলিভিশনের পাশাপাশি কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব ও স্মার্ট মোবাইল ফোনসেট অন্যান্য কাজের সঙ্গে বিনোদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। কুষ্টিয়া সদরের মোখলেছুর রহমান বকুল বলেন, 'দিনে দিনে মনে হচ্ছে, মানুষের মন থেকে বিনোদন উঠে যাচ্ছে। তার কারণ প্রথমত ডিসলাইন, তারপর মোবাইলফোন। এখন আর ভিসিআর, সিডি, ডিভিডি নাই, সবার

হাতে বড়ো বড়ো মোবাইল ফোনসেট, সেখানেই সবাই সবকিছু দেখছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫২)।' যশোরের রাকিব বলেন,

> ইন্টারনেটের কারণে বেশিরভাগ সিনেমা দর্শক সিনেমাহলে না এসেই দেখতে পারছে, তাই তারা সিনেমাহলে আসতে চায় না। অনেক গানও আগেই দেখে ফেলছে, তাই সিনেমার প্রতি আগ্রহ কমে গেছে। তবে আমার মোবাইলফোনে সিনেমা দেখতে ভালো লাগে না। তাই যে দু-চারটা সিনেমা দেখি, সিনেমাহলেই দেখি (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৯)।

কুড়িগ্রামের নয়ন বলেন, 'মোবাইলফোনে সিনেমা দেখা আর সিনেমাহলে সিনেমা দেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য। এখন হয়তো অনেক মানুষ টাইম পাস করার জন্য মোবাইলে সিনেমা দেখে, কিন্তু এখনো অনেক লোক আছে যারা ভালো পরিবেশ পেলে সিনেমাহলে সিনেমা দেখবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১১)।' যশোরের জুয়েল হোসেন বলেন. 'এখন মানুষের হাতে হাতে সিনেমাহল। তাই দর্শকের আর সিনেমাহলে আসার দরকার পড়ে না। তারপরও ভালো সিনেমা হলে দর্শক দেখে। কারণ সিনেমাহলে সিনেমা দেখার আনন্দই আলাদা (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৩)।' নওগাঁর পত্নীতলার মিলন কুমার মণ্ডল বলেন, 'সিডি সহজলভ্য হওয়ায় দর্শকের ওপর খানিকটা প্রভাব পড়ে। কিন্তু সেটা খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে নাই। এই স্মার্ট মোবাইলফোন আসার পর থেকে ব্যবসাটায় বড়ো ধরনের ধস দেখা দেয় (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৭)।'

নওগাঁর পত্নীতলার 'বিনোদন'-এর আইসক্রিম বিক্রেতা ফিরোজ মিয়ার সঙ্গে কথা হয় প্রেক্ষাগৃহের সামনের বাজারে। বিষণ্ন মুখে তিনি বসে ছিলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি আগ্রহ দেখান। ফিরোজ বলেন, 'লোকজনের আর কী দোষ বলেন; তারা ১০ টাকা দিয়ে মোবাইলে পাঁচটা সিনেমা তুলে বাড়ি নিয়ে সারারাত দেখতেছে। এতো টাকা দিয়ে সিনেমাহলে এসে সিনেমা দেখার চেয়ে ঘরের ভিতর কাঁথার নীচে বসে সিনেমা দেখা অনেক ভালো (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১০)।' আর যশোরের প্রহ্লাদ দাশ বলেন, 'তবে এখন কিন্তু সিনেমাহলে খারাপ সিনেমা, ন্যাংটা সিনেমা দেখিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না। কারণ এই যে আপনার হাতে যে মোবাইলফোনটা সেখানে খারাপ-ভালো সব সিনেমাই আছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫)।'

ভিসিডির জায়গা দখল করে নেওয়া কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ট্যাবের সুবিধা হলো, যে কেউ শুয়ে, বসে, কিংবা বাসে-ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় চাইলেই এসব ডিভাইসে চলচ্চিত্র দেখতে পারে। এছাড়া একই বাড়িতে এখন টেলিভিশন সেট, কম্পিউটারের সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে একের অধিক। বাড়ির প্রত্যেক সদস্য নিজের মতো করে এসব যন্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। চট্টগ্রামের আউয়াল বলেন, 'এটা ঠিক তখন [৬০ এর দশকে] সিনেমা ছাড়া মানুষের বিনোদনের আর কোনো মাধ্যম ছিলো না। এখন এক

বাড়িতে তিনটা ঘর থাকলে সবগুলোতেই টেলিভিশন আছে। অবশ্য এখন অনেকে টেলিভিশনও দেখে না তারা কম্পিউটার, মোবাইল ফোনসেটে ইন্টারনেট ব্যবহার করে (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১)।'

কুড়িগ্রামের কিনু বাবু বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন খানিকটা অন্যভাবে। তার ভাষ্যমতে,

> এখন ঢাকায় সিনেমা মুক্তি পেলে দুই-চার দিনের মধ্যে কীভাবে যেনো পাইরেসি হয়ে যায়। তারপর তা পাওয়া যায় সবার ফোনে ফোনে। মোবাইল ফোনে মানুষ টানা সিনেমা দেখে না। আধা ঘণ্টা দেখার পর হয়তো কেউ কোনো কাজ করলো, আবার ফাঁকা হলে দেখলো। ফলে দর্শকের ওপর কোনো চাপ থাকে না। তাই এখন সিনেমাহলে এসে তিন ঘণ্টা সময় অপচয় করার কোনো সময় তার নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৭)।

সম্প্রতি স্মার্ট মোবাইল ফোনসেটের দাম অনেক কমে গেছে। বিশেষ করে চীন থেকে আমদানি করা এসব ফোনসেট অল্প টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। ফলে আগের তুলনায় ফোনসেটের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। বিনোদনের অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে এসব মোবাইল ফোনসেট। সঙ্গে ইন্টারনেট সংযোগও অনেক সস্তা ও সহজ হয়ে এসেছে। ময়মনসিংহের 'ছায়াবাণী'র দর্শক সাখাওয়াত আলী শিবলি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী। বান্ধবীকে নিয়ে তিনি প্রেক্ষাগৃহে এসেছেন। শিবলি দর্শকের প্রেক্ষাগৃহ বিমুখতার ব্যাখ্যা করেন অন্যভাবে। তার মতে,

> কোনো মানুষ যদি রিচ ফুডের সন্ধান পেয়ে যায়, তখন তার কাছে মাছ-ভাত খুব বেশি আর ভালো লাগে না। এখন প্রযুক্তির বদৌলতে আমরা নিমেষেই হলিউড, বলিউডের সিনেমা দেখতে পারি। সেই সিনেমার তুলনায় বর্তমানে আমাদের সিনেমা হয়তো কিছুই না। ফলে আমাদের এই সিনেমা আর ভালো লাগে না। ওইসব সিনেমার কাহিনি, অ্যাকশন ও কারিগরি নানা দিকের তুলনায় আমাদের সিনেমাকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়। সেই জন্য তরুণ প্রজন্মকে এই সিনেমা মোটেও টানতে পারছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২১)।

খুলনার জাফর আলী বলেন, 'আপনি কী চান মোবাইলে এখন, তাই পাবেন। ছেলেরা মোবাইলে ন্যাংটা ন্যাংটা সিনেমা নিয়ে ঘোরে। সব সিনেমা আছে সেখানে। তাহলে কেনো আসবে সিনেমাহলে মানুষ! সিনেমাহলে ওই মানুষকে আনতে গেলে ওর চেয়ে ভালো কিছু দেখাতে হবে। কিন্তু সেটাতো তারা পারছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১১)।'

চট্টগ্রামের 'দিনার'-এর গেইটম্যান আমির হামজা বলেন,

> মোবাইল ফোন আসার পর আমাদের অনেকগুলো জিনিস ধ্বংস হয়ে গেছে। মোবাইল আমাদের ডাক বিভাগ, আমাদের টেলিফোন ব্যবস্থা, আমাদের দেশে ছবি তোলার অনেক স্টুডিও ছিলো সেগুলো ধ্বংস করছে। অন্যদিকে স্মার্ট মোবাইলফোন আর ডিসলাইন মিলে ধ্বংস করে দিয়েছে সিনেমাহলগুলোকে। মোবাইলের কারণে যে কোনো উপকার হচ্ছে না, এমন নয়। তবে উপকারের চেয়ে ক্ষতি অনেক বেশি (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৭)।

একই ধরনের কথা আর একটু বাড়িয়ে বলেন সিলেটের হারুন অর রশীদ। তার ভাষ্যমতে,

> ডিজিটাল প্রযুক্তি আসার পর অনেকগুলো সেক্টর নষ্ট হয়ে গেছে। বলেন তো এখন কেউ রেডিও বাজায়, ক্যামেরা ব্যবহার করে, ঘড়ি ইউস করে, কেউ টি অ্যান্ড টির ফোন ব্যবহার করে, কেউ পোস্ট অফিসে যায়; এগুলো সব চলে এসেছে মোবাইলফোনে। আমি মনে করি সিনেমারও এই অবস্থা আজকে মোবাইলফোনের জন্যই। ইন্টারনেটের সাহায্যে ইউটিউবে তো এখন যেকোনো জিনিস দেখা যায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৫)।

নওগাঁর সমীর কুমার মণ্ডল বলেন, 'ডিশ আসার পরও আমরা অনেক যুদ্ধ করেছি, কিন্তু ফোনের মেমোরি কার্ডের সঙ্গে আর পারলাম না। এটার সঙ্গে আর পারাই গেলো না। আর ছবিগুলোও এমন হতে লাগলো, মেয়ে-ছেলেরা দেখলো না। তাদেরকে সিনেমাহল ছাড়তে বাধ্য করা হলো আরকি (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।' একই ধরনের কথা বলেন কুড়িগ্রামের 'স্বর্ণমহল'-এর নৈশপ্রহরী দুলাল হোসেন (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১)।

তবে খুলনার 'সোসাইটি সিনেমা'র হিসাবরক্ষক মো. নাসিম এ নিয়ে একেবারে অন্য যুক্তি দেন। তার ভাষ্যমতে, 'অনেকে বলে ডিস, মেমোরির কারণে সিনেমা চলছে না। এটা ভুল কথা। তাহলে *শিকারী*, *বাদশা* এই সিনেমাগুলো ব্যবসা করলো কেনো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩)?' ময়মনসিংহের 'ছায়াবাণী'র অপারেটর মো. সুমন বলেন, 'মোবাইল ফোনের মেমোরি কার্ড মোটেও সমস্যা নয়। কারণ মেমোরি কার্ড আসছে পাঁচ–ছয় বছর হলো। কিন্তু তার আগে থেকেই সিনেমার অবস্থা খারাপ (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৩)।' যশোরের 'মণিহার'-এর কর্মচারী শওকত আলী মনে করেন, 'ভারতেও ইন্টারনেট আছে, কিন্তু ওদের আলাদা সিস্টেম। ওখানকার পরিচালকরা মিউজিকের ওপর বেশি জোর দেয়। কিন্তু বাংলাদেশে সেটা হয় না। কারণ এটা মুসলিমভিত্তিক দেশ। এখানে দর্শক একটু কম (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৭)।' নাসিম, সুমন ও শওকত আলীর কথায় যুক্তি আছে। মেমোরিকার্ড আসার আগে থেকেই চলচ্চিত্রের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। বিশেষ করে ৯০ দশকের শেষের দিকে চলচ্চিত্রে সহিংসতা ও যৌনতা আসতে থাকে। ভালো কাহিনি নির্মাণের বিপরীতে দর্শককে এগুলো দিয়ে নির্মাতা-প্রযোজকরা আকর্ষণের চেষ্টা করেন।

নানা কারণেই যারা সরাসরি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন না, তারা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা চলচ্চিত্র, গান, নাটক দোকান থেকে তাদের স্মার্ট ফোনসেটে ভরিয়ে নিয়ে দেখছে। খুলনার 'শঙ্খ'-এর দর্শক বর্ষা বলেন, 'বাংলাদেশের সিনেমা তার ভালো লাগে। তবে খুব বেশি সিনেমা সিনেমাহলে এসে দেখা হয়নি। বেশিরভাগ সময় দোকান থেকে নিয়ে মোবাইলফোনে সিনেমা দেখেন (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২১)।' বর্ষা আরো বলেন, 'মোবাইলফোনে আমি বাংলাদেশের সিনেমার বাইরে টালিগঞ্জের সব সিনেমা দেখি। সেসব সিনেমার কাহিনির মধ্যে অনেক নতুনত্ব আছে (আখ্যানের ক্রম

৪.৫.২১)।' এসব নিয়ে কথা হয় কুড়িগ্রামের 'মিতালী'র পাশের ভিডিও দোকানদার নয়নের সঙ্গে। তিনি বলেন,

> আগে মানে যখন প্রথম প্রথম স্মার্ট মোবাইলফোন আসলো তখন পর্নোগ্রাফির চাহিদা খুব ছিলো। কিন্তু এখন চাহিদা একটু কম। এর কারণ আমি ঠিক জানি না। তবে এখন হিন্দি, এমনকি বাংলা আইটেম গানগুলো ভালো চলে। বাংলাদেশে বিপাশা নামে একটা মেয়ে আইটেম গান করে, ওর বেশ চাহিদা (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১১)।

তার মানে বর্তমানে স্যাটেলাইট চ্যানেল, টেলিভিশনের চেয়ে মাধ্যম হিসেবে অনেক বেশি ক্ষমতাবান হয়ে গেছে স্মার্ট মোবাইল ফোনসেট। মাঠের কৃষক, রিকশাওয়ালা, দোকানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণির চাকরিজীবী পর্যন্ত সবাই বিনোদনের জন্য স্মার্ট মোবাইল ফোনসেটের ওপর নির্ভর করছেন। নওগাঁর আমিনুল ইমলাম বলেন, 'দর্শকের কোনো দোষ নাই। প্রতিদিন দর্শক কোনো না কোনো উপায়ে সিনেমা দেখছে। দর্শক সিনেমাহলের বাইরে বিনোদনের বিকল্প মাধ্যম খুঁজে নিচ্ছে। এটা তারা কখন করছে, যখন এই সিনেমা থেকে তারা হতাশ হয়েছে। তাই নিরুপায় হয়ে সিনেমাহল বিমুখ হয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৮)।'

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড়ো যে সমস্যাটি দেখা দিয়েছে, তা হলো মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের যে জাদুময়তা তা নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিশেষ শব্দে বিশাল পর্দায় চলচ্চিত্র যে বাস্তবতা নির্মাণ করতো, সেটা আর এই ১২/১৪ ইঞ্চি কিংবা তার চেয়ে আরো ছোটো মনিটরে বোঝা সম্ভব নয়। কিংবা পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে থেকে একাগ্রচিত্তে চলচ্চিত্র দেখাও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। কবি, সাংবাদিক আবুল মোমেন বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

> প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র দেখার একটা মস্ত বড় প্রাপ্তি হলো, একসঙ্গে বহু মানুষ মিলে আবেগ-অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া-ভাবনা এবং স্মৃতির ঐক্যে এক নান্দনিক আনন্দের বন্ধন। বহু মানুষের চিন্তা ও কল্পজগৎ এবং রুচি ও নান্দনিক বোধের যৌথ রসায়ন ঘটিয়ে সমাজে সমরুচি ও সমনান্দনিকতার পরিবেশ তৈরি হয় এভাবে। ঘরে বসে নিজের টিভিতে নাটক/চলচ্চিত্র দেখার দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে মানুষ হয়ে পড়ছে বীপষঁংরারংঃ—নিতান্ত আপনাতে আবদ্ধ মানুষ (মোমেন, ২২ মে ২০১০)।

ফলে দিনের পর চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তা চলচ্চিত্রকে কতোখানি উপভোগ্য করেছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

এই দশকের শুরুতে দেশের পত্রপত্রিকা প্রকাশনায় বড়ো ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সংবাদপত্র প্রকাশনায় দেশে আমূল পরিবর্তন আসে। এই সময় অনেকগুলো দৈনিক সংবাদপত্র খুব আড়ম্বরভাবে প্রকাশ হয়। উদাহরণ হিসেবে 'যুগান্তর', 'প্রথম আলো', 'সমকাল, 'ডেইলি স্টার' এর নাম বলা যায়। পুরনোদের মধ্যে 'ইত্তেফাক', 'জনকণ্ঠ' তো ছিলোই। এসব সংবাদপত্রে প্রতিদিন বিনোদনের জন্য একটি পাতা রাখা হয়। এছাড়া সপ্তাহে একদিন তারা মহাসমারোহে বিনোদনের জন্য

কমপক্ষে চার পৃষ্ঠার রঙিন বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। প্রতিদিনের বিনোদন পাতায় দৈনন্দিন খবরের সঙ্গে বিশেষ ক্রোড়পত্রে নিয়মিত খবরের সঙ্গে কিছু বিশ্লেষণধর্মী লেখাও প্রকাশ হয়। অবশ্য এখন আর সংবাদপত্রে চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় না, তবে প্রোমোশনাল সংবাদ প্রকাশ করা হয়। খুলনার 'সঙ্গীতা' ও 'লিবার্টি'র মালিক ও প্রযোজক শাহাজান আলী বলেন, "আগে 'ইত্তেফাক'-এ নিয়মিত সিনেমার বিজ্ঞাপন প্রকাশ হতো। পরের দিকে 'প্রথম আলো' কোনো কোনো সিনেমার ক্ষেত্রে মহরত থেকে রিলিজ পাওয়া পর্যন্ত নিয়মিত নিউজ করতো। এগুলো করার জন্য অবশ্য খরচ আছে। সেটা আর এখন প্রযোজক-পরিচালকরা করতে চান না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩০)।"

এই দশকে 'বিনোদন ধারা' (২০০২), 'টেলিভিশন' (২০০৫), 'আনন্দ আলো' (২০০৫) ইত্যাদি সাপ্তাহিক পত্রিকা বেশ জনপ্রিয় হয়। সপ্তাহজুড়ে বিনোদনের নানা খবরের চাহিদা এই পত্রিকাগুলো পূরণ করতো। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বাড়ির বসার ঘরে এসব পত্রিকা নিয়মিত দেখা যায়।

৬.৫) চলচ্চিত্র আমদানি ও অন্য ভাষার চলচ্চিত্র

শূন্য দশকেও ভারতীয় চলচ্চিত্র ছাড়া অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্র আমদানি অব্যাহত ছিলো। তবে মাত্র দুই–একটি প্রেক্ষাগৃহে ও সিনেপ্লেক্সে এসব চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সুযোগ আছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে, আইনিভাবে দেশে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানি বা প্রেক্ষাগৃহে দেখানোর সুযোগ না থাকলেও এসব চলচ্চিত্র দেখা কিন্তু থেমে থাকেনি।

> হলিউড বা বলিউডের একটি ভালো ছবি কিন্তু বাংলাদেশের আগ্রহী দর্শকরা সিনেমা হলে না হলেও কোনো না কোনোভাবে দেখার সুযোগ পাচ্ছে। এখানে গলির দোকানে গত সপ্তাহের হলিউড বা বলিউডের সুপার হিট ছবির ডিভিডি পাওয়া যাচ্ছে। পাইরেসি হলেও দর্শক কিন্তু দেখার সুযোগটি হাতছাড়া করছে না (ঘটক ২০১৬, পৃ২৫২)।

ফলে দর্শক হলিউড ও বলিউডের চলচ্চিত্র দেখছে ঠিকই, কেবল সরকার রাজস্ব হারিয়েছে। একই সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়ে এই নিষেধাজ্ঞা অপরিণামদর্শীর মতো ভারতীয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন দেখাতেও দর্শককে উৎসাহিত করছে।

২০০৪ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে একটি গেজেট প্রকাশ করে। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে কিছু মানুষের যেমন ভারত প্রেম আছে, একই সঙ্গে এখানে ভারত বিদ্বেষও চরম। ফলে কোনো সরকারই ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানির পথ উন্মুক্ত করে ঝুঁকি নিতে চায়নি—যদি তারা জনগণের কাছে ভারত প্রেমী হিসেবে স্বীকৃত হয় এই ভয়ে। রংপুরের শাহাবুদ্দীন মোল্লা মনে করেন,

> যৌথ প্রযোজনার সিনেমাগুলো ভালোই ব্যবসা করছিলো, সেটা নিয়েও সমস্যা শুরু হয়েছে। আমরা আসলে কারো ভালো দেখতে পারি না। সিনেমা বাঁচাতে গেলে এখন ভারতে সিনেমা আনা ছাড়া আর বুদ্ধি নাই।

> ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কাট কাট মার মার সম্পর্ক, অথচ ভারত-পাকিস্তানে একই দিনে সিনেমা মুক্তি পায়। দুই দেশের মধ্যে যা হয় হোক, ব্যবসার জায়গায় তারা এক। আজ যদি সরকার বিষয়টাকে একটু এভাবে দেখতো। তাই বলে আমি বলছি না, আমাদের শিল্প মার খাক। কিন্তু প্রতিযোগিতা হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২০)।

তবে মোল্লার মতের বিরোধিতা করেন খুলনার মো. হালিম। তার মতে,

> এখন যে অবস্থা তাতে কয়েকদিন পরে আমাদের এখানে চলবে কলকাতার সিনেমা। তো কলকাতার সিনেমা চলে আমাদের কী বেনিফিট। আমাদের দেশের শিল্প তো আর বাঁচলো না। দেশের শিল্প নিয়ে তো আমরা গর্ব করতে চাই। ভারতের মেশিন আসবে, সিনেমা চলবে; তারা অনলাইনে সিনেমা চালাবে, এখানে কোনো অপারেটরও লাগবে না। তাতে আমাদের কী লাভ (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৬)।

আগেই বলেছি আমদানি না হলেও ভারতীয় চলচ্চিত্র দেখা থেমে নেই। শূন্য দশকের মাঝামাঝির পর থেকে ঢাকা শহরে অলিগলিতে প্রচুর সিডির দোকান গড়ে উঠে। এরা সিডি ভাড়া দেওয়ার পাশাপাশি বিক্রিও করতো। এছাড়া ঢাকার বসুন্ধরা সিটি, রাইফেল স্কয়ারের মতো বিলাসবহুল শপিংমল, শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে বড়ো বড়ো সিডি, ডিভিডি'র দোকান দেখা যায়। ৭০ থেকে ১২০ টাকার মধ্যে এসব দোকানে বিদেশি সব ধরনের চলচ্চিত্র পাওয়া যেতো। এখানে বলিউড ও টালিগঞ্জের চলচ্চিত্র যেমন পাওয়া যেতো তেমনি হলিউড, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়ার চলচ্চিত্র পাওয়া যেতো।

এছাড়া জেলা ও মফস্বলের শহরগুলোতেও তখন সিডি ভাড়া ও বিক্রির দোকান দেখা যায়। ওই সব দোকানে হলিউডের অ্যাকশন, বলিউড ও টালিগঞ্জের চলচ্চিত্রের ভালো ব্যবসা হতো। এই পরিস্থিতিতে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের গোপেন্দ্র চন্দ্র দাশ মনে করেন, 'বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে একটাই উপায় আছে; সরকার যদি হিন্দি সিনেমা আনে, তাহলে একমাত্র এই সিনেমাহলগুলো টিকে যেতে পারে। তাছাড়া সম্ভব নয় (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.২৫)।' তবে উল্টো কথা বলেন নওগাঁর মিলন কুমার মণ্ডল বলেন, 'কিছু দিন আগে আমরা ভারতের পুরনো হিন্দি সিনেমা *ওয়ান্টেড* এখানে চালিয়েছি। লোকসান হয়েছে, দর্শক দেখতে আসে নাই। তবে নতুন হিন্দি বা ভারতীয় বাংলা সিনেমা চালালে কী হবে সেটা ঠিক বলতে পারছি না (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৭)।'

২০১০ সালের পর দেশের প্রেক্ষাগৃহের অবস্থার চরম সঙ্কটের মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানির ব্যাপারে আবারও আলোচনা শুরু হয়। ওই বছরের ২১ জানুয়ারি প্রণীত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি নীতিমালা অনুযায়ী সাবটাইটেল ব্যবহার করে উপমহাদেশের চলচ্চিত্র আমদানির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্প সংশ্লিষ্টদের আন্দোলনের মুখে সরকার ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানি নিষিদ্ধ করে। একই বছরের ১৭ জুন আবার নতুন করে আমদানি নীতিমালা করে উপমহাদেশের চলচ্চিত্র দেশে আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়।

কিন্তু জানুয়ারি থেকে ১৭ জুনের মধ্যে কয়েকজন প্রেক্ষাগৃহ মালিক এলসি (বিদেশি পণ্য আমদানির জন্য বিশেষ ধরনের ঋণপত্র) করে ভারতীয় তিনটি চলচ্চিত্র দেশে আমদানি করে। কিন্তু বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সেন্সর বোর্ড থেকে অনাপত্তিপত্র না পাওয়ায় ওই তিনটি চলচ্চিত্রকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয় না। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আদালতে গড়ায়। ২০১০-এর ১২ আগস্ট হাইকোর্টের বিচারপতি এইচ এম শাসমুদ্দিন চৌধুরী ও শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ তিনটি ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্রকে বাংলাদেশে আমদানির অনুমতি দিতে এবং সেন্সর বোর্ডকে তা দেখার নির্দেশ দেন (*প্রথম আলো* ১৯ অক্টোবর ২০১০)। চলচ্চিত্র তিনটি হলো—*বদলা*, *সংগ্রাম* ও *জোর*। এই পরিস্থিতি নিয়ে খুলনার আনোয়ার হোসেন শঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,

> দিন যতো যাচ্ছে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। আবার এটা ইন্ডিয়ার চালও হতে পারে। ইন্ডিয়া যেমন পাকিস্তান, দুবাইয়ের বাজার দখল করে নিয়েছে; বাংলাদেশেও নিতে পারে। কারণ সিনেমাহল মালিক যখন বাংলা সিনেমায় ব্যবসা করতে পারবে না, তখন ইন্ডিয়ান সিনেমা আমদানি করতে বাধ্য হবে। কিন্তু সেটা ঠেকাতে গেলে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে সচেতন হতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৪)।

২০১১ সালের আগস্টে তিনটি ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্র সেন্সরের জন্য বোর্ডে জমা করা হয়। ৭ থেকে ৯ আগস্ট সেন্সর বোর্ডে *জোর*, *বদলা* ও *সংগ্রাম* প্রদর্শন করা হয়। এরপর তিনটি চলচ্চিত্রের একাধিক জায়গায় কর্তন সাপেক্ষে ছাড়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় (*প্রথম আলো* ১১ আগস্ট ২০১১)। এই ঘটনার পরই শুরু হয় নানা ধরনের রাজনীতি। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ হতে থাকে। এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেন রংপুরের 'শাপলা'য় জাজ-এর অপারেটর আ. রহমানের সঙ্গে। তিনি মনে করেন,

> এই সিনেমাহলে আর কিছুই হবে না। তবে ভারতের নতুন নতুন বাংলা সিনেমাগুলো যদি এখন মুক্তি পায়, তাহলে কিছু ব্যবসা হতে পারে। তাছাড়া ভারতের ওই পুরনো সিনেমা দিয়ে কিছু লাভ হবে না। ওইসব সিনেমা টিভিতে দেখে দেখে মানুষ ভোতরা (একঘেয়ে) হয়ে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৮)।

রাজশাহীর এম এ মোমিন রাঙ্গা বলেন, 'ভারতে মুক্তির দিনেই যদি আমাদের এখানেও মুক্তি দেওয়া যায়—সে হিন্দি, বাংলা যাই হোক—তাহলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে। তবে এটা ঠিক, এরফলে হয়তো আমাদের সিনেমা বলে কিছুই থাকবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৬)।'

২০১১-এর ২৪ সেপ্টেম্বর ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শন বন্ধ, ভিডিও পাইরেসি নির্মূল ও চলচ্চিত্র নির্মাণে এফ ডি সি থেকে সবধরনের কারিগরি সুবিধা আদায়ের জন্য চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিবেশক সমিতি, পরিচালক সমিতি, শিল্পী সমিতি, চিত্রগ্রাহক সংস্থা, এডিটরস গিল্ডের কর্মকর্তারা সভা করে। সভায় এসব দাবি আদায়ে গঠন করা হয় 'চলচ্চিত্র একতা পরিষদ'। নতুন এই সংগঠনটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন প্রযোজক-পরিবেশক সমিতির সভাপতি মাসুদ পারভেজ (*প্রথম আলো* ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১১)।

এই পরিস্থিতিতে প্রযোজক ও প্রদর্শক সমিতি মুখোমুখি অবস্থান নেয়। তৎকালীন চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির সভাপতি কে এম আর মঞ্জুর বলেন, "সেন্সর পাওয়া ছবিগুলো প্রদর্শনে কোনো আইনগত বাধা নেই। শিগগিরই আমরা ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী শুরু করতে পারব। বন্ধ হওয়া প্রেক্ষাগৃহগুলো আবারও চালু হবে" (*প্রথম আলো* ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১)। এর বিপরীতে প্রবীণ অভিনয়শিল্পী রাজ্জাক বলেন, "বঙ্গবন্ধু যে আইনকে নিষেধ করেছেন সেটা চালু হতে পারে না। ভারতীয় ছবি প্রদর্শন শুরু হলে প্রায় ৪ লাখ মানুষ বেকার হয়ে যাবে। একটি চক্র অনেক বছর ধরে চেষ্টা করছে। আমরা এর বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলনে যাব" (*প্রথম আলো* ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১)। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে একেবারে অন্য কথা বলেন সিলেটের হারুন অর রশীদ—'এখন একমাত্র হিন্দি সিনেমা আসলে সিনেমাহলগুলো চলবে। বছর পাঁচেক চলার পর হয়তো হিন্দি সিনেমাও ভালো চলবে না। তখন দেখবেন, এই সিনেমাহলই থাকবে না। দুই-চারটা সিনেপ্লেক্স থাকবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৫)।'

উভয় পক্ষের মধ্যে কাঁদা ছোড়াছুড়ির পর শেষ পর্যন্ত ২০১১-এর ২৩ ডিসেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় *জোর* চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়। নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে এই তিনটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেলেও বাণিজ্যিক উদ্দেশে উপমহাদেশের চলচ্চিত্র আমদানির সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের হিসাব মতে, ২০১০ থেকে সাত বছরে দেশে দুটি হিন্দি চলচ্চিত্রসহ কমপক্ষে ১৫টি ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। তবে আমদানি করা এসব চলচ্চিত্রের কোনোটিই দর্শক টানতে পারেনি বা ব্যবসায়িকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। রাজশাহীর এম এ মোমিন রাঙ্গা বলেন,

> আমরা তো ভারতের নতুন সিনেমা আনছিলাম *বেপরোয়া*; কলকাতা ও বাংলাদেশে একসঙ্গে রিলিজ। মোটামুটি টাকা উঠে আসছে। তবে এখন একটাই পথ আছে সিনেমাহল বাঁচানোর, সেটা হলো হিন্দি সিনেমা। ভারত-বাংলাদেশে একসঙ্গে হিন্দি সিনেমা রিলিজ দিলে, আবার সিনেমাহল চাঙা হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৬)।

রাজশাহীর মো. জাহাঙ্গীর বলেন,

> ভারতের সিনেমাগুলো ভালোই চলছে। তবে ভারতে মুক্তি পাওয়ার সাত দিন, ১৪ দিনের মধ্যেই এখানে চালাতে হবে। কিন্তু যেগুলো টিভিতে হয়ে গেছে ৫০–৬০ বার, একশো বার—সেসব ছবি চলবে না। এছাড়া ভারতীয় সিনেমা যদি বাংলাদেশে আসে, তবে বাংলাদেশের সিনেমার লাভ হবে। কারণ তখন বাংলাদেশের ডিরেক্টরদেরও ওদের মতো ছবি করতে হবে। যদি এরাও ওদের মতোই ছবি করে, তাইলে বাংলাদেশের ছবি 'মার খাবে' কী করে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৩)?

কলকাতার 'শিল্প ও বাণিজ্য চেম্বার ফেডারেশন'-এর একটি দল ২০১৩ সালে ১০ জানুয়ারি ঢাকা সফরে আসেন (দীপ, ২৫ জানুয়ারি ২০১৩)। গৌতম ঘোষ, প্রসেনজিৎ, জিৎসহ ১২ সদস্যের দলটি পরদিন এফ ডি সিতে তৎকালিন তথ্যমন্ত্রী, এফ ডি সির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শিল্পী, প্রযোজক, পরিচালকসহ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেয়। সেখানে বাংলাদেশ ও কলকাতার চলচ্চিত্র নিয়ে

সুদূরপ্রসারী বেশ কিছু পরিকল্পনার কথা বলা হয় এবং দুই দেশে একই সঙ্গে চলচ্চিত্র মুক্তির ব্যাপারেও কথা হয়। কিন্তু এতে উপস্থিত অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেন। শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই আলোচনা শেষ হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানির পক্ষে কড়াভাষায় যুক্তি দেন নেত্রকোণার 'হিরামন'-এর গেইটম্যান গোপাল রায়। তিনি কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তার যুক্তি হলো—

> একদিকে বাংলাদেশে সিনেমা নাই; অন্যদিকে ভারতের সিনেমা আনলে তারা আন্দোলন করে। এই আন্দোলন করার অধিকার তো তাদের মানুষের নাই। এরা সিনেমাও ভালো বানাতে পারে না, আবার আন্দোলন করে। এই যে আজকের পর থেকে সিনেমার অভাবে'হিরামন' আবার বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের তো আর চলার কোনো পথ নাই। সিনেমাহল বন্ধ হলে আমরা কী করে খাবো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২৮)!

চলচ্চিত্র আমদানি নিয়ে এই ধরনের দোটানার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে শূন্য দশক ও এর পরের সময়টা। কিন্তু ঘটনা যাই হোক বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ধ্বংসের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। মূলত এখানকার চলচ্চিত্রকে সম্পূর্ণ প্রটেকশন না দিয়ে প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। প্রটেকশনের ফলেই মুনাফার বাসনায় অশ্লীলতা ও সহিংসতাকে পুঁজি করে নির্মাতারা এফ ডি সিতে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়েছেন। একই ধরনের মত পাওয়া যায় আবুল মোমেনের (মোমেন ২২ মে ২০১০) কথায়। এছাড়া ৯০-এর দশকে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সব ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উদারীকরণ করা হলেও বাকি ছিলো কেবল চলচ্চিত্র। সেই সময় এটা হলে হয়তো তখনই দেশের চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়তো। কিন্তু তা হয়নি কিংবা করতে দেওয়া হয়নি।

৬.৬) তারকা-কুশীলব

শূন্য দশকের ঢাকাই চলচ্চিত্রে গত দশকের অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে নাম না জানা অনেক অভিনয়শিল্পী কাজ করতে শুরু করেন। এই সময়ে অভিনয় করা বেশিরভাগ নায়ক-নায়িকার নাম দর্শক জানতো না। কারণ নায়ক-নায়িকার নাম বা অভিনয় নয়, এসময় দর্শকের কাছে তাদের অন্যকিছু গুরুত্ব হয়ে ওঠে। ফলে দর্শক যেমন একসময় নায়ক-নায়িকার নাম শুনে চলচ্চিত্র দেখতে যেতো, সেটা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই পরিস্থিতির মধ্যেও নায়ক মান্না প্রতাপের সঙ্গে অভিনয় করে যান। ২০০০ সাল থেকে ২০০৮-এ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মান্না অভিনীত কমপক্ষে ১১৬টি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। মান্না এসব চলচ্চিত্রে মৌসুমী, পূর্ণিমা, পপি, শাবনূর, নদী ও মুনমুনের সঙ্গে জুটি বাধেন। শূন্য দশকের শুরুতে মান্না-ডিপজল জুটিও আলোচনায় আসে। সর্বশেষ ২০০৪ সাল পর্যন্ত মান্না-ডিপজল জুটির চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। ভয়ঙ্কর সহিংসতা ও নোংরা সংলাপের জন্য ডিপজল এসময় বেশ আলোচিত হন। বরিশালের প্রদীপ দাস বলেন, 'আগেও অনেক নায়ক-নায়িকা মারা গেছে জাফর ইকবাল, জসিম। এতে অতো সমস্যা হয়নি। কিন্তু সর্বশেষে সালমান শাহ, মান্না মারা যাওয়ার পর আমাদের সিনেমার খারাপ অবস্থা শুরু হয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.৪)।'

৯০ দশকে প্রচণ্ড প্রতাপ নিয়ে চলা হুমায়ুন ফরিদী এই দশকে অভিনয় কিছুটা কমিয়ে দেন। শূন্য দশকে তাকে মাত্র ৪৮টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। এর মধ্যে কিছু যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রও ছিলো। তবে ৯০ দশকে যেমন ফরিদী একা খলচরিত্রে অভিনয় করে কোনো কোনো চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয় করেছিলেন, এই দশকে তাতে ভাটা পড়ে। নায়ক রুবেল শূন্য দশকে কমপক্ষে ৮৯টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। রুবেলকেও এসময় বেশ কিছু যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। ফলে মার্শাল আর্ট নির্ভর চলচ্চিত্রের নতুন ধারা নিয়ে যে রুবেল ৯০ দশকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তার সেই অবস্থান নষ্ট হয়ে যায়। খুলনার নজরুল ইসলাম বলেন,

> রুবেল প্রথমে ভালোই ছিলো। কিন্তু পরে আর টাল সামলাতে পারে নাই। তাই কাটপিস সিনেমায় অভিনয় শুরু করে। মৌসুমীও ছিলো এ ধরনের সিনেমায়। আমি নিজে রুবেল-মৌসুমীর এধরনের একটা সিনেমা দেখছি। পানির মধ্যে তাদের সে কী অবস্থা! তবে দর্শক কিন্তু রুবেল, মৌসুমীদের কাছ থেকে এধরনের সিনেমায় অভিনয় আশা করে না। তারা একটু এদেরকে অন্যভাবে দেখতো। এরা কেনো জানি সেটা সামাল দিতে পারে নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৯)।

ফরিদী ও ডিপজলের উত্তরসুরী হিসেবে শূন্য দশকে রাজত্ব করতে থাকেন মিশা সওদাগর। যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রগুলোতে তাকে সেই সময় বেশ সরব দেখা যায়। এই দশকে মিশা কমপক্ষে ১১৮টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। গড়ে প্রতি বছর তার ১০টির উপরে চলচ্চিত্র মুক্তি পায়।

৯০ দশকের জনপ্রিয় নায়ক ওমর সানি শূন্য দশকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। তবে এসময় মৌসুমীকে অনেকগুলো চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। এছাড়া আমিন খানও শূন্য দশকে কমপক্ষে ১৩৭টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করলেও আমিন খান সেই অর্থে তেমন জনপ্রিয়তা পাননি। অনেক চলচ্চিত্রে তাকে পার্শ্ব নায়কের চরিত্রেও দেখা যায়। আমিন খানও এসময় যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

সালমান শাহের মৃত্যুর পর শাবনূরকে দীর্ঘ দিন জুটি সমস্যায় ভুগতে হয়। সালমান-শাবনূর জুটি যে পরিমাণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো পরে আর শাবনূর কারো সঙ্গে অভিনয় করে সেই জনপ্রিয়তা পাননি। তবে শূন্য দশকে এসে রিয়াজের সঙ্গে শাবনূর বেশ কিছু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এছাড়া ফেরদৌস, মান্নার সঙ্গে তাকে অভিনয় করতে দেখা যায়। তবে সালমানের সঙ্গে অভিনয় করে শাবনূর যে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন সেটা আর কখনোই পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। সেই সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে সিলেটের 'নন্দিতা'র গেইটম্যান মো. শামীম বলেন,

> আগে দুইটা নায়ক ছিলো সালমান শাহ আর মান্না। সালমানের সঙ্গে শাবনূর খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো। তবে মান্নার সঙ্গে অনেকেই কাজ করতো। এরা মারা যাওয়ার পর থেকে সিনেমার পরিস্থিতি খারাপ হওয়া শুরু

হয়েছে। এই দুই নায়কের সিনেমা সে সময় খুব ব্যবসা করছে। তাদের প্রত্যেকটা সিনেমা ব্যবসা করেছে। এদের সিনেমা দেখার জন্য দর্শকের খুব ভিড় হতো, আমরা ঝামেলায় পড়তাম। তবে বর্তমানে শাকিব খানের সিনেমা কিছুটা চলে। এখন সিলেটের যে কয়জন দর্শক আছে, এরা শাকিবের ওপর কিছুটা ভরসা করে। তাছাড়া আর কেউ নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.২)।

যশোরের তপু হাসান আরো বলেন,

প্রথমে শাবনুরের ভক্ত ছিলাম, তারপর হলাম সাহারার; ও চলে যাওয়ার পর ভালো লাগতো মাহী, ববিকে। এখন এরাও নাই। তাই এখনকার নায়িকাদের টোটালি চিনিও না, জানিও না। আর নায়কদের মধ্যে সায়মন ভাইয়াকে একটু ভালো লাগতো, আর বাপ্পী, ওর ভিতরে কেমন জানি একটা ছোটো মানুষ, ছোটো মানুষ ভাব আছে। নায়কের মতো কোনো ব্যক্তিত্ব নেই (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৬)।

শূন্য দশকজুড়ে রিয়াজকে সেই অর্থে পরিচ্ছন্ন সব চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। দর্শকের অনেকে রিয়াজকে এই সময় সালমানের বিকল্প হিসেবে ভাবতে থাকেন। টিনএজ প্রেমের বেশ কিছু চলচ্চিত্রে অভিনয় করে রিয়াজ এসময় প্রশংসিত হন। ফেরদৌসও এই সময় পরিচ্ছন্ন সব চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হন। শূন্য দশকে এসে শাকিল খান তার ক্যারিয়ার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন। কারণ তার চলচ্চিত্রগুলো আর ব্যবসা করছিলো না। পপি শূন্য দশকে কমপক্ষে ৭২টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এই সময়কালে তার অভিনীত কোনো চলচ্চিত্রই খুব বেশি ব্যবসা করতে পারেনি।

শাবনূরের পরপরই পরিষ্কার ইমেজ নিয়ে চলচ্চিত্রে পূর্ণিমাকে দেখা যায়। রিয়াজ-পূর্ণিমা জুটি এসময় বেশ জনপ্রিয় হয়। বিশেষ করে ২০০৩ সালে *মনের মাঝে তুমি* করার পর এই জুটির জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। তবে এই দশকে সবচেয়ে আলোচিত নায়ক শাকিব খান। শূন্য দশকে আরেক নায়িকা অপু বিশ্বাস যাত্রা শুরু করেন। আমজাদ হোসেনের *কাল সকাল* (২০০৫) এর মধ্য দিয়ে অপুর চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু। পরে তিনি শাকিব খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে জনপ্রিয়তা পান। সিলেটের 'নন্দিতা'র পাবলিসিটির দায়িত্বে থাকা হারুন বলেন, 'এখন বেশিরভাগ সিনেমায় একই নায়ক শাকিব। কিন্তু সিনেমার জন্য নানা ধরনের নায়ক দরকার। একসময় ইলিয়াস কাঞ্চন, জসিমের মতো নায়ক ছিলো। অল্প বয়সে ইলিয়াস কাঞ্চনের সব সিনেমা ভালো ব্যবসা করছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৬)।'

শূন্য দশকে অনেক চলচ্চিত্রে অভিনয় করলেও ২০১০ এর পর মৌসুমী, রিয়াজ, শাবনূর, পপি, ফেরদৌসের মতো শিল্পীদের আর অভিনয় খুব বেশি দেখা যায়নি। ২০০৮-এ মান্নার মৃত্যুর পর থেকে মূলত একক নায়ক হিসেবে শাকিব খান আবির্ভুত হন। তার একাধিপত্যে অনেক নায়ক চলচ্চিত্র থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে থাকেন। ময়মনসিংহের মো. সুমন বলেন,

কেউই চিরকাল বেঁচে থাকে না। ভারতেও অনেক নায়ক-নায়িকা মারা যায়, তাতে সিনেমার কোনো ক্ষতি হয় না। কারণ নতুন নায়ক আসে। আমাদের অবশ্য নতুন নায়ক কম আসতেছে, সেটা একটা সমস্যা। এখন

> আমাদের দেশে একমাত্র নায়ক শাকিব খান। সবাই তাকে নিয়েই সিনেমা করছে। তাকে ছাড়া এখন কোনো সিনেমা চলে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৩)।

এই সময়ের আরেকজন নায়ক অনন্ত জলিল। ২০১০ সালে *খোঁজ দ্য সার্চ* নামে চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে ঢাকাই চলচ্চিত্রে আগমন ঘটে গার্মেন্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এম এ জলিল অনন্ত-এর। প্রথমে অভিনয় ও প্রযোজনা দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি পরিচালক, গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হন। এ নিয়ে খুলনার আনোয়ার হোসেন বলেন, 'এখন তো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে নায়ক বানানো হচ্ছে, আবার অনেকে টাকা দিয়ে নায়ক হচ্ছে। আগে সরাসরি নায়ক হওয়ার ক্ষমতা বেশিভাগ অভিনেতার ছিলো না। প্রথমে সাইড নায়ক হিসেবে কাজ করে তারপর ফুল নায়ক হতে পারতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৪)।' খুলনার শেখ মোতাহার হোসেন বলেন,

> এখান যার বাপের টাকা আছে, সেই সিনেমা বানাচ্ছে। এজন্য তার বডি ফিটনেস, অভিনয় দক্ষতা, আছে কী নাই কেউ ভাবছে না। আসলে চলচ্চিত্র করার জন্য কঠিন প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আসতে হয়। যেমন ধরেন, একটা ক্রিকেট প্লেয়ার প্রশিক্ষণ করে করে কিন্তু এতো দূর আসে। কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্রের মধ্যে সেই জিনিসটা নাই। হুট করে দেখা যায়, একজন নায়ক হয়ে যাচ্ছে; তাকে এর আগে কোনো দিন দেখি নাই। এরফলে চলচ্চিত্রটা মার খেয়ে যাচ্ছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২)।

একই ধরনের কথা বলেছেন যশোরের শওকত আলী,

> আমার টাকা আছে, নায়কের মতো চেহারা, আমি একটা সিনেমা করলাম। ওইভাবে তো আর ব্যবসা হবে না। নায়ক-নায়িকাদের একটা ক্লাস থাকে। সেই হিসেবে তো আমাদের এখানে কোনো নায়ক-নায়িকাই নাই। দেখেন ৭০, ৮০ এর দশকের আর্টিস্টরা ছিলো আলাদা। তারা যাত্রা, মঞ্চনাটকে অভিনয় করতে করতে সিনেমায় আসতো। এখন টাকা থাকলেই নায়ক হওয়া যায়। সেজন্য এসব সিনেমা এখন আর চলে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৭)।

এই দশকে অভিনয়শিল্পী সঙ্কট দেখা দেয়। বিশেষ করে ৯০ দশকে যেমন বেশ কয়েকজন নতুন নায়ক-নায়িকার আগমন ঘটে। শূন্য দশকে এসে তা প্রায় থেমে যায়। ৯০ দশকের শেষের দিকে শাবানা অভিনয় ছাড়ার ঘোষণা দেন। এর পর থেকে আলমগীর, ববিতা, রাজ্জাক, চম্পা অনেকেই চলচ্চিত্র থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে থাকেন। নেত্রকোণার গোপাল রায় বলেন, 'এখন বাংলাদেশে নায়ক একজন শাকিব খান। সায়মন, বাপ্পী এদের সিনেমা এখন আর মানুষ দেখে না। এরা মূলত ভালোভাবে অভিনয়ই করতে পারে না। ফলে দর্শকেরও এদের সিনেমা নিয়ে কোনো আগ্রহ নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২৮)।' ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেন বলেন, 'আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো নায়ক সৃষ্টি করতে পারি নাই। ফলে সালমান শাহ, মান্না, রিয়াজ সিনেমা থেকে সরে যাওয়ার পর, সেই জায়গা কেউ দখলে নিতে পারেনি। অথচ ৯০-এর দশক পর্যন্ত আগে এই সমস্যা ছিলো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।'

তবে বরিশালের ‘অভিরুচি’র বাদামবিক্রেতা আলম হাওলাদার বলেন অন্য কথা। তার ভাষায়, ‘এখনকার সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের কেউ চেনে না। নায়ক-নায়িকাকে না চিনলে কাকে দেখতে সিনেমাহলে আসবে দর্শক। অন্তত দুইজনের মধ্যে যেকোনো একজনকে তো পরিচিত হতে হবে। এখন সবাই নতুন (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১৩)।’ যশোরের মোশারফ খান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন, ‘আমার যেটা মনে হয়, আগের নামীদামী প্লেয়াররা খুব হিংসুটে আছিলো। তারা নিজেরা ভালো ছিলো, কিন্তু ভালো প্লেয়ার সৃষ্টি করে দিয়ে যায়নি। তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম সৃষ্টি করে যায় নাই। ফলে চলচ্চিত্রটা আজ ধ্বংস হয়ে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৮)।’

কোলাজ : সহিংস ও যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র ছবি : সংগৃহীত

যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রগুলোতে **মুনমুন, ময়ূরী, শাপলা, পলি, শাহীন আলম, আলেকজান্দ্রার বো, মেহেদী প্রমুখ** নায়ক-নায়িকারা অভিনয় করলেও তারা চলচ্চিত্রে অভিনয়শিল্পীর উত্তরাধিকার তৈরি করতে পারেননি। এছাড়া শূন্য দশকের ২০০৭ পর্যন্ত চলচ্চিত্রের যে অবস্থা ছিলো তাতে আসলে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে ইচ্ছে থাকলেও তারা চলচ্চিত্রে সম্পৃক্ত হতে সাহস করেনি। ফলে এই দশকে নতুন অভিনয়শিল্পী যোগ হয়নি বললেই চলে। যার খেসারত দিতে হয়েছে পরের দশকে। এই সময়ের নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেনের পর্যবেক্ষণ হলো—

> কিছু নায়িকা বুঝতে পেরেছে রূপ-যৌবন ব্যবহার করে বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই ছয় মাস এক বছরের মধ্যে যেকোনো উপায়ে যতো কামানো যায়, তাতেই লাভ। এই ধরনের মেয়েদের দিয়েই এখন সিনেমা বানানো হচ্ছে। তাদের গায়ে কোনোমতে নায়িকার ছাপটা লাগাতে পারলেই হয়। তারা অভিনয়ের বাইরে অন্য কাজও করে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।

মোটাদাগে এই দশকে যে সমস্যাগুলো দেখা যায় সেগুলো হলো—

প্রথমত, অভিনয়শিল্পীর সংকট;

দ্বিতীয়ত, মান্নার মৃত্যুর পর একক নায়ক হিসেবে শাকিব খানের আধিপত্য;

তৃতীয়ত, নারী অভিনয়শিল্পীদের অভিনয়ের চেয়ে শরীর প্রদর্শনের প্রবণতা;

চতুর্থত, অনেক সম্ভাবনাময় অভিনয়শিল্পী চলচ্চিত্র থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়া;

পঞ্চমত, শুধু টাকার জোরে অনেকের নায়ক হয়ে ওঠা।

কিন্তু সমস্যা হলো এই পরিস্থিতি সমাধানে সে সময় কোনো পক্ষই এগিয়ে আসেনি, সবাই কেবল সমস্যার কথা বলেছে। এছাড়া ৯০ দশকের শেষ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত চলচ্চিত্রে যে ভয়াবহ অস্থিরতা ছিলো সেখানে কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে খুব বেশি কিছু করার সুযোগও ছিলো না। সরকার পদক্ষেপ নিয়েছিলো সেটাও অনেক দেরিতে।

৬.৬.১) বাস্তব বনাম সেলুলয়েডের ডিপজল

৯০ দশকের শেষ থেকে শূন্য দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঢাকাই চলচ্চিত্রে প্রথমে খলঅভিনয়শিল্পী ও পরে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে ডিপজল একা নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৯৩ সালে নির্মাতা মনতাজুর রহমান আকবরের *টাকার পাহাড়*-এর মাধ্যমে নায়ক হিসেবে ডিপজল ব্যবসায়ী থেকে চলচ্চিত্রজগতে আসেন। পরের চলচ্চিত্র *ভয়ংকর বিশু* (১৯৯৯)তে তিনি খলঅভিনয়শিল্পী হিসেবে কাজ করেন এবং জনপ্রিয়তা পান। এরপর ২০০৩ সালে ডিপজল এ ধরনের চরিত্রে কমপক্ষে এক ডজন চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। ডিপজল অভিনীত এসব চলচ্চিত্রে মারামারি, রক্তপাত, সহিংসতায় পূর্ণ ছিলো। ডিপজলের মূল্যায়ন করতে গিয়ে নির্মাতা কাজী হায়াৎ বলেন,

> *তেজী* করে একরাত্রে ডিপজল স্টার হয়ে গেলো। ডিপজলের বেলায় এমন কিছু ঘটনা সেসময় ঘটেছে, যা আমাদের ফিল্মের ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি। *তেজী*র পরে ডিপজল এতোই জনপ্রিয় হয়ে গেলো যে, একটা সিনেমার সেন্সর হয়ে গেছে, সেই সিনেমায় ডিপজলের একটি গান ও দৃশ্য জুড়ে দিয়ে পোস্টারে অন্তত ডিপজলের ছবি রাখা হলো। কারণ এতে ওই সিনেমাটা ভালো টেবিল কালেকশন পাবে। সেসময় এধরনের ঘটনা অন্তত পাঁচ–ছয়টা সিনেমার ক্ষেত্রে ঘটেছে। ডিপজল তখন দিনে ১৮ ঘণ্টা করে কাজ করেছে। এই যে ভিলেন হয়ে হিরো বনে যাওয়া—এরপর কাজী হায়াৎ-মান্না-ডিপজল একটা জুটি তৈরি হলো—এরা যা দেয় মার্কেটে তাই-ই চলে। এটা চলেছে প্রায় ২০০৪ সাল পর্যন্ত (আখ্যানের ক্রম ৫.১; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

এ সময় "মান্না-ডিপজল জুটিনির্ভর 'সহিংসতা-গোলাগুলি-ঢাকাইয়া স্ল্যাং' মার্কা এ্যাকশন ছবিগুলো টিন-এজ প্রেম, পারিবারিক সেন্টিমেন্ট, মার্শাল আর্টনির্ভর খোকনীয় চলচ্চিত্র—সবকিছুকে ম্লান করে দেয়" (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৭৩–৭৪)। শূন্য দশকে নির্মিত বেশিরভাগ চলচ্চিত্রই সহিংস এবং

এগুলো সবই কাজী হায়াৎ প্রবর্তিত ফর্মুলার ব্যর্থ সংস্করণ বলেও গবেষকরা মনে করেন। খুলনার 'শঙ্খ'-এর দর্শক ইমন বলেন, 'ডিপজল যখন অভিনয় করতো, আমি তার সব সিনেমা দেখতাম। ওনাকে আমার খুব ভালো লাগতো। শুধু আমি না ডিপজলের নাম শুনলেই অনেক তখন সিনেমাহলে আসতো। এমনও হয়েছে, তার সিনেমা আমি পরপর তিন শো দেখছি (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৭)।'

চলচ্চিত্রের অভিনয়ে দুই পর্বের দুই ডিপজল ছবি : সংগৃহীত

এসব চলচ্চিত্রে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাত-পা কেটে ফেলা, শ্বাসরোধ করে হত্যা, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, গলায় কামড় দিয়ে হৃদপিণ্ডসহ কণ্ঠনালী বের করে আনা, শিশুকে পুড়িয়ে নির্যাতন ইত্যাদি নানান কায়দায় সহিংসতা দেখানো হতো। সেসময় এর মাত্রাগত দিক নিয়ে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। পর্দায় এইসব কর্মকাণ্ডের মডেল অভিনয়শিল্পী হিসেবে হাজির হন ডিপজল। পটুয়াখালীর 'তিতাস'-এর হিসাবরক্ষক এম ডি রাসেল বলেন, '২০০১ সাল পর্যন্ত সিনেমাহলের ব্যবসা খুব ভালো ছিলো। এরপর ডিপজল সাহেবরা সিনেমায় এসে পরিস্থিতি খারাপ করে দিলো। সেই অবস্থা ভালো হয়েছে পরে, কিন্তু দর্শক সিনেমাহলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২১)।' যশোরের প্রদীপ দাস বলেন,

> এর আগে ডিপজল বেশিরভাগ সিনেমায় ভিলেন হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। ডিপজলের সেসব সিনেমা ছিলো অশ্লীলতায় ভরা। তিনি অশ্লীল দৃশ্যে অভিনয় না করলেও তার ডামি দিয়ে এটা করানো হতো। এভাবে সবাই মিলে তখন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রটাকে বাজেয়াপ্ত করে ফেললো। এই ডিপজলই আবার *কোটি টাকার কাবিন* দিয়ে পরিস্থিতি ভালো করলো। ডিপজল তখন পজেটিভ মুডে দর্শকের সামনে হাজির হলো। ফলে তার চাহিদা বেড়ে গেলো কিছুটা (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১২)।

শুধু সহিংসতাতেই নয়, কোনো খলঅভিনয়শিল্পী এই পর্যায়ের জনপ্রিয়তা বাংলাদেশে এর আগে কেউ পেয়েছেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। "ডিপজল খলনায়ক হিসেবে কাজ করেছেন এমন বহু চলচ্চিত্রের পোস্টার বা বিজ্ঞাপনী কার্যক্রমে তিনি নায়ককেও ছায়ার তলে নিয়ে ফেলেছিলেন। অন্য কিছু বাদ দিলেও, পোস্টারে তার মুখটাই বড় করে ছাপা হওয়ার একাধিক নজির অতীতে ছিল" (চৌধুরী

২০০৭, পৃ১০৯)। তার মানে ঢাকাই চলচ্চিত্রে ডিপজল তুমুল জনপ্রিয়তার কাছে জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকারাও ম্লান হয়েছেন। তবে ডিপজল নিয়ে একেবারে ভিন্ন ধরনের কথা বলেন রাজশাহীর এম এ মোমিন রাঙ্গা বলেন,

> আর একটা লোকের কথা বলি, এই যে ডিপজল সাহেব; উনি কিন্তু একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। উনি বাংলাদেশের ফিল্মের নতুন জীবন দিয়েছেন। কিন্তু একটা চক্র আছে যারা তার বিরোধী। তারা ডিপজলের এসব কার্যক্রম মেনে নেয় নাই, তারা গুলি পর্যন্ত করছিলো ডিপজলকে মারার জন্য। এই ঘটনার পর ডিপজল চলে গেলেন। উনি ইন্ডাস্ট্রিতে থাকার সময় প্রতি মাসে নতুন নতুন গল্প নিয়ে সিনেমা রিলিজ দেওয়ার চেষ্টা করতেন (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৬)।

ডিপজল অভিনীত বেশিরভাগ চলচ্চিত্রে নারী প্রধানত যৌন উপকরণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে থাকে; শাপাপাশি ডিপজলের সংলাপও ছিলো খুবই নোংরা। এই পরিস্থিতিতে যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণে ডিপজল অভিযুক্ত হতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনি খলচরিত্রে অভিনয় থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। ২০০৬ সালের দিকে ডিপজল হঠাৎ করেই নিজেকে আমূল পরিবর্তন করে ফেলেন। নিজের প্রযোজনায় *কোটি টাকার কাবিন* (২০০৬) নির্মাণের মধ্য দিয়ে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে পর্দায় হাজির হন। এ নিয়ে সাতক্ষীরার শ্রী বিশ্বজিৎ কুমার ঘোষ বলেন, 'ডিপজল নিজে প্রডিওসার হয়ে যেসব সিনেমা করছে, সেগুলোও কিন্তু খুব ভালো ব্যবসা করেছে। তার সিনেমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করেছে *চাচ্চু*। এখন আর সেই ধরনের সিনেমা হচ্ছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩৫)।'

যশোরের প্রহ্লাদ দাশ বলেন, 'আগে ডিপজল অনেকগুলো খারাপ সিনেমা তৈরি করে, তারপর কয়েকটা ভালো সিনেমা করলো—*চাচ্চু*, *কোটি টাকার কাবিন*। শাকিবের নাম ফুটলো *কোটি টাকার কাবিন* দিয়ে। তার পরপরই তো মান্না মরে গেলো। মান্না মরে যাওয়ার পর শাকিব এসে বাংলাদেশে একচেটিয়া ব্যবসা করলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫)।'

তবে ডিপজলের এই অবস্থানকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন খুলনার শাহাজান আলী। তিনি বলেন,

> ডিপজল সাহেব আবারও আসতে চাচ্ছে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ডিপজল সাহেব আবার সক্রিয় হয়ে ঢুকলে আমি মনে করি সিনেমাহলগুলো চাঙ্গা হবে। ডিপজল সাহেব কিন্তু একটু অন্য ধরনের মানুষ। অনেকে বলে অশ্লীল সিনেমা তার জন্য হয়েছে। আমি সেটা মনে করি না। তাকে দিয়ে সেসময় পরিচালকরা যা করে নিয়েছেন, তিনি তাই করেছেন। তিনি কিন্তু অশ্লীল সিনেমার প্রডিউসার না। এটা ঠিক তিনি এক সময় এফডিসি নিয়ন্ত্রণ করতেন, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা আর অশ্লীল সিনেমা বানানো এক জিনিস নয় (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩০)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, চলচ্চিত্রে যখন ডিপজলের এই রূপান্তর ঘটছে, একই সময় দেশজুড়ে চলছে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি। ঢাকা-১১ (মিরপুর) আসনে সেসময় ক্ষমতাসীন বিএনপির যে চারজন মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম মনোয়ার হোসেন দিপু ওরফে

ডিপজল। এর আগে অবশ্য ১৯৯৪ সালে ডিপজল বিএনপির হয়ে ঢাকা সিটি করপোরেশনের ৯নং ওয়ার্ডে কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। ফলে নবম জাতীয় সংসদের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে এই সময়টাতে ডিপজলের ছবি সম্বলিত পোস্টার-ব্যানারে ভরে যায় মিরপুর এলাকা।

মজার ব্যাপার হলো, ওইসব পোস্টার-ব্যানারে দুর্দান্ত জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী ডিপজলের চলচ্চিত্রের কোনো খল-ইমেজ ব্যবহার করা হয়নি। বিষয়টাকে লেখক, গবেষক মানস চৌধুরী ব্যাখ্যা করেন এভাবে—

> কিন্তু তিনি একটা আনকোরা ছবিই পোস্টারের জন্য তুলতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় বিষয়টা হলো : এই পোস্টার যখন প্রকাশিত হয়, তার বেশ কিছুকাল আগে থেকে ডিপজল নিজেকে খলচরিত্রের কাঠামো থেকে বের করে এনে চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে কাজ করেছেন। এটা বিশেষ জরুরি তথ্য। ... এসব ছবির পোস্টারে ডিপজলের অবয়ব দেখে বোঝা যায় চরিত্রাভিনেতা বলতে যা বোঝানো হয়ে থাকে, ডিপজল এখন সেখানে স্বাক্ষর রাখতে চাইছেন (চৌধুরী ২০০৭, পৃ১০৯)।

তার মানে ডিপজল তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের স্বার্থে চলচ্চিত্রের তার পরিবর্তিত ইমেজকে ব্যবহার করেছিলেন। রাজনীতিতে চলচ্চিত্রের ইমেজ ব্যবহারের ভুরি ভুরি উদাহরণ অবশ্য ভারতীয় ইন্ডাস্ট্রিতেই আছে। পরিবর্তিত ইমেজ গড়তে ডিপজল এসময় একে একে অভিনয় করেন *চাচ্চু* (২০০৬), *দাদীমা* (২০০৬), *কাজের মানুষ* (২০০৯), *রিকশাওয়ালার ছেলে* (২০১০), *মায়ের চোখ* (২০১০), *জমিদার* (২০১০), *ছোট্ট সংসার* (২০১১) ইত্যাদি চলচ্চিত্রে। এগুলোতে তাকে মানবিক, সৎ, ত্যাগী, প্রতিবাদী চরিত্রে দেখা যায়।

ডিপজল প্রযোজিত ও অভিনীত এসব চলচ্চিত্রে নির্মাতার নাম পর্যন্ত থাকতো না। ডিপজলকে মুখ্য করেই প্রচার-প্রচারণা চালানো হতো। ছবি : সংগৃহীত

নওগাঁর পত্নীতলার 'রংধনু'র কর্মচারী বকুল মনে করেন,

> ডিপজলের সিনেমাগুলো মারাত্মক। *চাচ্চু* এই হলে দুইবার চলছে। একই লোক অনেকবার এই সিনেমা দেখছে। এছাড়া *মায়ের হাতে বেহেস্তের চাবি* সিনেমাতেও খুব ব্যবসা হয়েছে। এই সিনেমাগুলোতে নতুন ডিপজল ছিলো। এগুলো দেখে আগের ডিপজলকে অনেকে ভুলে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২)।

খুলনার নজরুল ইসলাম বলেন,

> এই লোকটা প্রথমে সিনেমাটাকে খারাপ অবস্থায় নিয়ে গেছে; পরে আবার সেটা ঠিক করে রেখে চলে গেছে। কিন্তু সেই ঠিকটা আমরা আর ধরে রাখতে পারি নাই। শেষের দিকে যে কয়টা সিনেমা ডিপজল করছে, সবগুলো সুপারহিট ছিলো। কাটপিস আনছে ডিপজল, সে আবার ভালো করে দিয়ে গেছে। ডিপজল যাওয়ার পর আর কাটপিস সিনেমা হয় নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৯)।

পরের দিকে এসব চলচ্চিত্রে ডিপজল নিজেই অর্থলগ্নিকারক ছিলেন। এছাড়া চরিত্রাভিনেতা হওয়ায় পোস্টারে এবার তিনি শরীরীভাবে নিজের জায়গা করে নেন কখনো চলচ্চিত্রে তার সহঅভিনয়শিল্পী নায়ক রাজ্জাকের সঙ্গে কিংবা একজন শিশুর সঙ্গে (চৌধুরী ২০০৭, পৃ১০৯)। ইমেজের এই রাজনীতি দিয়ে ডিপজল অভিনয়শিল্পী হিসেবে তার অবস্থানকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। অনেকক্ষেত্রে এতে তিনি সফলও হয়েছেন। ফলে সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা ও তারকাখ্যাতিকে তিনি এক সুতোয় বাঁধতে পেরেছিলেন। সব মিলিয়ে ডিপজলের ক্যারিয়ারে চারটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়।

> **প্রথম পর্ব**, ৯০ দশকে ভাইয়ের প্রযোজিত চলচ্চিত্রে ব্যবসায়ী ডিপজলের নায়ক হিসেবে অভিনয় শুরু;
>
> **দ্বিতীয় পর্বে**, নায়ক থেকে খলঅভিনয়শিল্পী হিসেবে কাজ শুরু এবং তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন;
>
> **তৃতীয় পর্বে**, খলঅভিনয়শিল্পী থেকে প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ;
>
> **চতুর্থ পর্ব**, খলঅভিনয়শিল্পী থেকে নিজের প্রযোজিত চলচ্চিত্রে প্রোটাগনিস্ট ও চরিত্রাভিনেতা হিসেবে অভিনয়।

ডিপজলের অভিনয় জীবনের এই চারটি পর্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চলচ্চিত্রে তার অভিনয় কেবলই সাদামাটা কোনো বিষয় হিসেবে এখানে হাজির হয়নি। তা ব্যক্তি ডিপজলের ব্যক্তিস্বার্থকে নানা সময়ে চরমভাবে প্রভাবিত করেছে, সঙ্গে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকেও।

৬.৬.২) **একক নায়ক শাকিব খান**

১৯৯৯ সালে সোহানুর রহমান সোহানের *অনন্ত ভালবাসা*র মধ্য দিয়ে নায়ক হিসেবে পথচলা শুরু করেন শাকিব খান। এরপর নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে তিনি বর্তমানে ঢাকাই চলচ্চিত্রের একক ও এক নম্বর নায়ক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। **১৯৯৯** থেকে **২০১০** পর্যন্ত **১১** বছরে তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন **১৬৪**টি। ২০০৬-এর আগ পর্যন্ত তাকে বিভিন্ন নায়িকার সঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা যায়। শাকিব

খান এসময় কমপক্ষে ৬৮টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করলেও কোনোটাই সেই অর্থে ব্যবসা সফল কিংবা আলোচনায় আসেনি।

২০০৬ সালে ডিপজল প্রযোজিত এফ আই মানিক পরিচালিত *কোটি টাকার কাবিন* সুপারহিট হয়। এই চলচ্চিত্র দিয়েই শাকিব-অপু বিশ্বাস জুটির যাত্রা শুরু করে। এরপর এই নির্মাতা শাকিব-অপু জুটিকে নিয়ে নির্মাণ করেন *পিতার আসন* (২০০৬), *চাচ্চু* (২০০৬), *দাদীমা* (২০০৬)। প্রতিটি চলচ্চিত্র ব্যবসা সফল হয়। এরফলে অন্য নির্মাতারাও এই জুটি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। ময়মনসিংহের 'পূরবী'র টিকেট কালোবাজারি আলম এই পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেন এভাবে—'আগে এক সময় সালমান শাহ, পরে মান্নার সিনেমা খুব চলতো। এখন চলে শাকিব খানের সিনেমা। তার মানে সবার একটা যুগ থাকে। তবে কেউ চলে গেলে কারো জন্য কিছু আটকে থাকে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১২)।' কুষ্টিয়ার রাজন আহমেদ বলেন,

> এক সময় প্রতি মাসে শাকিব-অপুর সিনেমা মুক্তি পেতো। দর্শক দীর্ঘ দিন সেই সিনেমা দেখতে দেখতে, এখন আর মানুষ সেগুলোও দেখতে চায় না। আরেকটা বিষয় শুনি সবার কাছে, শাকিবকে নিয়ে সিনেমা বানালে নাকি কোটির উপর বাজেট পড়ে যেতো। ব্যবসা না করলে তোপ্রোডিওসাররা সেই টাকা আর তুলতে পারতো না। ফলে তারা সমস্যায় পড়ে যায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫১)।

শূন্য দশকের শুরুতে যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রের কারণে এফ ডি সি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র নিয়ে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিলো শাকিব-অপুর এই চলচ্চিত্রগুলো সেই দুর্দিনে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেয়। কিন্তু নায়ক হিসেবে শাকিবের অবস্থান তখনো ততোটা পাকাপোক্ত হয়নি। ঠিক এই সময় ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ঢাকাই চলচ্চিত্রের আরেক জনপ্রিয় নায়ক মান্না। মান্নার অকালমৃত্যুতে গভীর সঙ্কটে পড়ে ঢাকাই চলচ্চিত্র। এই সময় অন্যান্য যে নায়করা ছিলেন—রিয়াজ, ফেরদৌস, আমিন খান, রুবেল—এদের কারো পক্ষেই মান্নার জায়গা দখল করা সম্ভব হচ্ছিলো না। কুড়িগ্রামের দেবলাল রজক দেওয়ান বলেন,

> মান্না মারা যাওয়ার পর এই দীর্ঘ সময় চলচ্চিত্র জগতে শাকিব খান ছাড়া কোনো আর্টিস্ট ছিলো না। শাকিবের বাইরে যে দু-চারজন আর্টিস্ট ছিলো তাদের সিনেমা চলতো না। ফলে শাকিবকে দেখতে দেখতে দর্শক সিনেমাহল থেকে মুখ ফিরে নিয়েছে। এক জিনিস আর দর্শক কতো দেখে! এখন যদিও কিছু সিনেমার মান অনেকটা ভালো হচ্ছে। কিন্তু দর্শকের পকেটে এখন মোবাইল। সিনেমাহলে তো এখন আর কোনো মানুষ নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৮)।

যশোরের 'মণিহার'-এর টিকেট কালোবাজারি মো. ইউসুফ বলেন, 'এই কিছু দিন হলো আসলো শাকিব খান। শাকিব-অপুর সিনেমা ২০১২–১৩ সাল পর্যন্ত খুব চলছে। এখন আর সেগুলোও চলে না। শাকিব এখন একঘেয়ামি সিনেমা করা শুরু করেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৩)।'

রিয়াজ ও ফেরদৌস ছিলেন রোমান্টিক ধাঁচের নায়ক। আর রুবেলের বিশেষত্ব ছিলো মার্শাল আর্টে; অন্যদিকে আমিন খানের মধ্যে অ্যাকশন ও রোমান্টিকতার কিছুটা সমন্বয় থাকলেও দীর্ঘ ক্যারিয়ারে

দর্শক কেনো জানি তাকে একক নায়ক হিসেবে নিতে পারেনি। ফলে তাকে নিয়ে নির্মাতারা খুব বেশি আশাবাদী হতে পারছিলেন না। তারপরও নির্মাতারা আমিন খানকে মান্নার বিকল্প হিসেবে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এই ধরনের একটা পরিস্থিতিতে শাকিব খান তার গত দুই বছরের (২০০৬-২০০৭) জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে ঢাকাই চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেন। **অভিনয়শিল্পী হিসেবে একটা সুবিধা তার ছিলো, শাকিবকে দিয়ে একই সঙ্গে রোমান্টিক ও অ্যাকশনধর্মী চরিত্রে অভিনয় করানো যেতো।**

শাকিব খান ছবি : সংগৃহীত

ফলে মান্নার অভাব পূরণে নির্মাতাদের সামনে শাকিব খান ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিলো না। ২০০৬ থেকে পর পর বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র হিট হওয়ায় শাকিবের পক্ষে এই সুযোগের সৎ ব্যবহার করাও সহজ হয়। ফলে শাকিব-অপুকে জুটি করে একের পর চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে। ২০০৯ ও ২০১০ দুই বছরে শাকিব অভিনীত ৩৪টি চলচ্চিত্রের মধ্যে ২২টিতে অপু বিশ্বাস নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেন। অপুর বাইরে এ সময় শাকিবের সঙ্গে কিছু চলচ্চিত্রে নায়িকা হিসেবে সাহারাকেও (আলম ২০১১, পৃ৩১৩-৩১৪) দেখা যায়। ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেন বলেন,

> বর্তমানে বাংলাদেশের সিনেমা একা বাঁচিয়ে রেখেছে শাকিব খান। এই ধরেন আমাদের এখানে তিনটা সিনেমাহল, দুইটাতে যদি জায়েদ খান, বাপ্পীর নতুন সিনেমা আর অন্যটাতে যদি শাকিবের পুরনো কোনো সিনেমাও লাগে; তাহলেও মানুষ শাকিব খানের সিনেমাই বেশি দেখে। তাই বলা চলে, শাকিবই এই ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।

খুলনার 'সঙ্গীতা'র পাবলিসিটির কাজ করা অলি মাতবর বলেন, 'শাকিব খানের *প্রিয়া আমার প্রিয়া* আমার খুব পছন্দ। ওই সিনেমায় শাকিবের কানে দুল, সামনের চুলে একটা ভাজ থাকে, সেটা আমার খুব পছন্দ ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৭)।' যশোরের মোল্যা ফারুক আহম্মেদ মনে করেন,

> নায়ক হিসেবে এখনো আমাদের এককভাবে শাকিবের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। মাহীর সঙ্গে যদি একটা নায়ক পাওয়া যেতো, তাহলে আগামী কয়েক বছর তারা সিনেমাটাকে ধরে রাখতে পারতো। এর মানে হিরোর অভাব। অনেকে এসেছে কিন্তু টিকে থাকতে পারেনি (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।

এদিকে কুড়িগ্রামের কিনু বাবুর মত হলো—

> পরিচালকরা দীর্ঘ দিন শাকিব ছাড়া আর কোনো নায়ককে নিয়ে সিনেমা বানায়নি। সেসময় মনে করেন যে, অপু বিশ্বাস আর শাকিব ছাড়া কোনো সিনেমাই হয় নাই। ফলে সিনেমার ধসটা এরাই বেশি আনছে। এই ধরেন ইন্ডিয়াতেও তো সিনেমা চলে, সেখানে নিত্য নতুন কতো ধরনের নায়ক। কিন্তু বাংলাদেশে যখন শাকিব আসলো, তার পর থেকে অন্য কোনো নায়ক আসেও নাই বা তারা আনারও চেষ্টা করে নাই। সবার কেবল অপু আর শাকিবের ওপরই ঝোঁক। কিন্তু প্রতিদিন ডাল-ভাত খেতে কী আর ভালো লাগে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৭)।

এই সময় একক নায়ক হিসেবে শাকিব ঢাকাই চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির কয়েক দশকের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক পারিশ্রমিক (৩৫–৪০ লাখ টাকা) দাবি করেন। এবং প্রযোজকরা তা দিতে বাধ্যও ছিলেন। কারণ এই সময়ে শাকিবের বিকল্প কোনো নায়ক ছিলো না—এমনকি আসার সম্ভাবনাও দেখা যায়নি। ময়মনসিংহের ‘পূরবী’র সামনের দোকানি অজয় কুমার মনে করেন, ‘শাকিব প্রযোজকদের কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছে আবার ফেরতও দিয়েছে। তবে পরিচালকরা কেউই শাকিব খানের বিকল্প কাউকে তৈরি করতে পারেনি। তাদের এটা করা দরকার ছিলো। এভাবে তো কোনো ইন্ডাস্ট্রি চলতে পারে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১৬)।’ খুলনার ‘সঙ্গীতা’র পাশের ইলেকট্রিক পণ্যের দোকানদার রুহুল আমিন সরদার বলেন, ‘এখন কেবল একজন নায়ক আছে শাকিব খান, তার নামেই কাটে। আমরা যারা আগে সিনেমা দেখছি, তারা শাকিব খানের সিনেমা মন দিয়ে দেখতেই পারবো না। এখন ১৬ থেকে ২০ বছরের ভিতরে যারা, তারাই শাকিব খানের ভক্ত (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৪)।’

শাকিবের অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার বিষয়টির ভালো ব্যাখ্যা দেন খুলনার মো. হালিম। তিনি মনে করেন,

> শাকিবের লাভ স্টোরি সিনেমাগুলো ভালোই চলেছে। কিন্তু ওর ডিমান্ডটা কমে গেলো রেইট বেড়ে যাওয়ার কারণে। তখন আবার ডিরেক্টররা কম দামী নায়ক খোঁজা শুরু করলো। এখন দুই লক্ষ টাকার নায়ক কী অভিনয় করবে বলেন! যখন শাকিবের ডিমান্ড কম ছিলো, তখন তার সিনেমা কিন্তু চলছে। তখন অ্যানালগের কারণে সিনেমার খরচ বেশি ছিলো। সেইসময় শাকিব খান যদি একটু ছাড় দিয়ে সিনেমা করতো, তাহলে হয়তো আজকের এ অবস্থা হতো না। কিন্তু তখন সে ছাড় দেয় নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৬)।

খুলনার নজরুল ইসলাম বলেন একেবারে ভিন্ন কথা। তার ভাষ্যমতে,

> আমি রাজ্জাক সাহেবের টক শো শুনেছি, তিনি শুটিং করে এফ ডি সিতে শুয়েছিলেন। তিনি আজকে নায়করাজ রাজ্জাক। আজকের কোনো হিরোকে শুটিং করার পর যদি বলেন, এই খুলনা শহরে ভালো হোটেল নাই, একটু খারাপ হোটেলে গিয়ে ঘুমান, দেখেন তো শোনো কিনা! তাহলে এদেরকে দিয়ে আপনি কী আশা করবেন। আমাদের দুই–একজন নায়ক এখন এই ধরনের আচরণ করে। তাদের সিনেমা এক সময় চলতো না। যখনই দুই–একটা সিনেমা ব্যবসা করলো, তখনই তারা আগের সব পরিস্থিতি ভুলে গেলো। এভাবে কী আর শিল্পী হওয়া যায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২২)!

শাকিবকে নিয়ে সৃষ্ট এই পরিস্থিতিকে চলচ্চিত্রের জন্য খুবই খারাপ অবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেন যশোরের প্রদীপ দাস। তার ভাষ্যমতে,

> শাকিবের জন্য অনেক প্রোডিওসারকে সুদের ওপর টাকা নিতে হয়েছে। তার ওপর সেই সিনেমা যদি ব্যবসা না করে, তাহলে ওই প্রোডিওসার কোথায় যাবে বলেন! হয় তাকে পালাতে হবে, নয় বাড়ি, বউয়ের গয়না বেচে

> সুদের টাকা শোধ করতে হবে। কিন্তু শাকিব কেবল টাকা নিয়েছে তাদের দায় নেয়নি। এই কারণে চলচ্চিত্রের আজকের খারাপ অবস্থার জন্য শাকিব কিছুটা হলেও দায়ী (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১২)।

কঠোর ভাষায় শাকিবের সমালোচনা করেন প্রদীপ। তিনি আরো বলেন,

> মনে করেন, একজন প্রোডিওসার দুই বছর আগে শাকিবকে দিয়ে কোনো একটা সিনেমার ৫০ ভাগ করে রেখেছে; কিন্তু শাকিব যখন ফেমাস হলো, তখন আর সে ওই পরিচালকের দিকে কোনোভাবেই ঝুঁকছে না। তার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়ে গেছে শাকিবের, তিনি আর ওই পরিচালককে শিডিউল দিচ্ছেন না। কেনো যাচ্ছেন না? কারণ এই দুই বছরে শাকিবের ডিমান্ড বেড়ে গেছে, তাই তিনি আগের চুক্তিতে আর কাজ করবেন না। পাঁচ লাখের জায়গায় তখন তাকে ৩০ লাখ টাকা দিতে হবে। পরিচালক-প্রোডিওসার তখন কী আর করবে, তারা তো টাকা দিতে বাধ্য। কারণ উপায় নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১২)।

প্রদীপের কথার সমর্থন পাওয়া যায় নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহানের কথায়। শাকিব নিয়ে তার ভাষ্য হলো,

> আমাদের চলচ্চিত্রে যখন ব্যবসা ছিলো—যখন শাবানা ম্যাডাম, রাজ্জাক ভাই, আলমগীর ভাই, জসিম ভাই কাজ করতো—এরা যখন নায়ক-নায়িকা ছিলো, তখন তারা চলচ্চিত্র নিয়ে চিন্তা করতো। চলচ্চিত্রকে ভালোবেসে তারা তাদের রিমুনারেসনটা এমন পর্যায়ে রেখেছিলো, যাতে ইন্ডাস্ট্রির কোনো সমস্যা না হয়। কিন্তু শাকিব এসে এই পুরো পরিস্থিতিটাকে উল্টিয়ে দিলো। সে যখন হিট হয়ে গেল, তখন তার রিমুনারেসন বাড়াতে থাকলো। এটার জন্য অবশ্য আমি শাকিবকে একা দোষ দেবো না, আমাদের অনেক প্রযোজক আছে, তারা নিজেদের স্বার্থে এই প্রতিযোগিতায় নেমে গেল। একজন হয়তো শাকিবকে চার লাখ টাকা দিয়েছে, আরেকজন হয়তো এসে বললো, ওর চার লাখ টাকা ফেরত দেন, আমি ছয় লাখ দিচ্ছি। এভাবে চার–পাঁচ–ছয় করতে করতে ৪০ লাখে উঠে গেল। এরফলে ছবির বাজেট বেড়ে গেল, অনেক পেশাদার প্রযোজক কিন্তু এরফলে আর ব্যবসা করতে পারছিলো না। কারণ দর্শক কমে যেতে থাকলো (আখ্যানের ক্রম ৫.৫; ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

মান্নার সঙ্গে শাকিবের তুলনা করেন নওগাঁর পত্নীতলার সমীর কুমার মণ্ডল। তার ভাষ্যমতে,

> আমাদের সিনেমাকে বেশি নষ্ট করে দিয়েছে শাকিব খান। মান্নার সিনেমা সেসময় যেভাবে চলেছে—তিনি যদি কোনো সিনেমার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করতেন, প্রযোজকরা সেটা দিতে বাধ্য থাকতো। কিন্তু মান্না সেটা করেন নাই। তার লক্ষ্য ছিলো সিনেমাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার দিকে। তাই তিনি টাকা কম নিয়ে প্রযোজকদের ব্যবসা করতে বলতেন। তিনি একটা চলচ্চিত্রের জন্য সর্বোচ্চ সাত–আট লক্ষ টাকা নিতেন। কিন্তু শাকিব খান শেষের দিকে একটা সিনেমার জন্য ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা দাবি করতো। আমি যতোদূর জানি, শেষ পর্যন্ত অনেক পরিচালক শাকিবকে দিয়ে কন্ট্রাক্ট সাইন করার পরও সিনেমা করে নাই টাকার জন্য (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

২০১১ সালে প্রথম ছয় মাসে মুক্তি পায় ১৯টি চলচ্চিত্র। এর মধ্যে শাকিব অভিনীত চলচ্চিত্র ছিলো চারটি। হতাশার কথা হলো, শাকিবের এই চারটি চলচ্চিত্রের একটিও এসময় ব্যবসায়িকভাবে সফলতার মুখ দেখেনি। কুড়িগ্রামের কিনু বাবু বলেন,

> শাকিবকে দেখতে দেখতে আমিই তো বিরক্ত হয়ে গেলাম। দর্শক তো হবেই। তবে শাকিব-অপুকে নিয়ে বেশ কিছু সিনেমা ব্যবসা করছে। আর তাই দেখে সবাই এদের নিয়ে সিনেমা বানাতে গেছে। সবাই শাকিবকে নিয়ে

টানাটানি করছে। অন্য কোনো নায়ক বা নতুন নায়ক-নায়িকা নিয়ে তারা কেউ ভাবে নাই। দু-একজন নতুন নায়ক-নায়িকা নিয়ে সিনেমা বানালেও সেসময় শাকিবের কাছে তারা টিকতে পারে নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৭)।

কিছুটা ভিন্ন কথা বলেন মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের মনির। তার মতে, 'শাকিব খানের তো কোনো দোষ নাই। উনি চেষ্টা করতেছেন ভালো সিনেমা বানানোর। কিন্তু শাকিব একাই তো আর সব কিছু করতে পারবে না। এদিকে সব সিনেমাই যদি শাকিবের হয়, তাহলে তো ফ্লপ হবেই। আমাদের তাই নায়ক তৈরি করতে হবে। আমরা স্বাধীন দেশে, কারো ওপরে নির্ভরশীল থাকবো কেনো (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭)?'

২০১১-এর এপ্রিলের শেষের দিকে শাকিবের *মনের জ্বালা* (২০১১) চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়। বহুল প্রত্যাশিত ও প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মালেক আফসারির এই চলচ্চিত্রটি প্রথম সপ্তাহে প্রেক্ষাগৃহে কিছু দর্শক টানলেও পরের সপ্তাহে মুখ থুবড়ে পড়ে (*প্রথম আলো* ৩০ জুন ২০১১)। একই অবস্থা হয় ২০১১-এর ২০ মে মুক্তি পাওয়া পি এ কাজলের *অন্তরে আছো তুমি* (২০১১), ১০ জুন মুক্তি পাওয়া *মাটির ঠিকানা* ও ২৪ জুন মুক্তি পাওয়া *কোটি টাকার প্রেম* এর ক্ষেত্রেও। তিনটি চলচ্চিত্রই ব্যবসায়িকভাবে ব্যর্থ হয়। বরিশালের অরুণ চন্দ্র গোস্বামী মনে করেন, 'শাকিব বাংলাদেশের সিনেমা শেষ করে ফেলছে। তার সব সিনেমা একঘেয়ামি। আমরা তো টিকেট ছিড়ি; দর্শক সিনেমাহল থেকে বের হয়ে শাকিবের সিনেমা দেখে গালাগালি করে। দর্শক নতুন কাহিনি দেখতে চায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১)।'

আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত *মনের জ্বালা* ব্যবসায়িকভাবে ব্যর্থ হয়

ছবি : সংগৃহীত

তারপরও মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের জহির খন্দকার মনে করেন,

> এখন শাকিব খানের কাছে সিনেমাহল মালিকরা জিম্মি। কারণ ওর সিনেমা ছাড়া কোনো সিনেমা চলে না। এই যে ঈদ আসতেছে, হয়তো পাঁচটা সিনেমা মুক্তি পাবে, এর মধ্যে তিনটাই শাকিবের। ওই সিনেমাগুলো কিছুটা চলবে, বাকিগুলো চলবে না। শাকিবের সিনেমা আনতে গেলে আবার অনেক টাকা লাগে। সেই টাকা তো আমাদের নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৬)।

শাকিবের চলচ্চিত্রের এই অবস্থা দেখে সেসময় প্রখ্যাত নির্মাতা আমজাদ হোসেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেন। তার ভাষ্যমতে,

কয়েক বছর ধরে শাকিব খান একাই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন পুরো চলচ্চিত্র। শোনা যাচ্ছে, এখন নাকি শাকিব খানের ছবি ব্যবসা করছে না। এটি যে শুধু তার ব্যর্থতা তা নয়, এটি নির্মাতা ও কাহিনীকারেরও ব্যর্থতা। গরিব বা বড়লোকের ছেলে শাকিব। ভালোবাসে একটি মেয়েকে। তাদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মেয়ে অথবা ছেলের বাবা। এ গল্পের ছবি শাকিবের ক্যারিয়ারে প্রায় ৪০–৫০টি রয়েছে। দর্শক আর কতো দেখবে একই ছবি, একই মুখ, একই গল্প? এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ভালো গল্প’ (হোসেন, ২২ জুন ২০১১)।

আমজাদের কথার সমর্থন পাওয়া যায় যশোরের নজরুল ইসলাম সোহেলের ভাষ্যে। নজরুল বলেন,

> এক শাকিবের ওপর নির্ভর করে সিনেমা চলতে পারে না। শাকিব কেবল রোমান্টিক সিনেমা করে। সেই ভালোবাসা আর ভালোবাসা, একই কাহিনি। সিনেমা আরম্ভের কিছু সময় পর ভালোবাসা আরম্ভ হয়ে গেলো। তারপর একটু মারামারি, সিনেমা শেষ। কথা হলো, সিনেমার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জিনিস থাকতে হবে, বাস্তব জিনিস। তাহলে না মানুষ দেখবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২৬)।

যশোরের তপু হাসান বলেন, ‘শাকিব ভাইয়া তো আছেই। এক সময় দেখতাম, এখন কম দেখি। কারণ ওনার প্রত্যেকটা সিনেমায় একই ইমোশনাল মুড, একই কান্নাকাটি, একই গল্প। প্রত্যেকটা লাভ স্টোরি নিয়ে করা। শাকিব ভাইয়ার সিনেমা আসলে আমি আর এদিকে আসি না। কারণ বুঝতে পারি পোস্টার দেখেই (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৬)।’

নির্মাতারা শাকিবকে ধরে ভালো গল্প নিয়ে হাজির হতে পারেনি কিংবা বিশেষ কোনো একটি গল্প ব্যবসা করলেই মানপ্রমিতকরণ করে সেই গল্প দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে তারা ঝুঁকেছে। ফলে চলচ্চিত্রের সংখ্যা বেড়েছে, বিনিয়োগ হয়েছে, কিন্তু দর্শক বিরক্ত হয়েছে। রংপুরের শাহাবুদ্দীন মোল্লা বলেন, ‘শাকিবের তো দোষ নাই। কারণ ডিরেক্টর শাকিবকে যেভাবে বলছে, শাকিব তাই করছে। এখানে মূল মেধা থাকতে হবে পরিচালকের। তারা একই ধরনের সিনেমা একের পর এক কেনো বানাবে। তারা কেনো কোনো ভিন্নতা আনতে পারে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২০)!’

একের পর এক চলচ্চিত্র ব্যবসায়িকভাবে ব্যর্থ হওয়ার পরও শাকিবকে সেটা আমলে নিতে দেখা যায় না। ২০১১ সালের ২১ এপ্রিল ‘দৈনিক সমকাল’ এ প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে শাকিবকে বলতে শোনা যায়, “চলচ্চিত্রে এখন আমি একাই রাজা-বাদশা। আলোচনা-সমালোচনা তো আমাকে নিয়েই হবে।

আর এসব ঘটনার জন্ম না হলে সাধারণ মানুষ চলচ্চিত্রকে ভুলেও যেতে পারে” (*সমকাল* ২১ এপ্রিল ২০১১)! এছাড়া শাকিবের বিরুদ্ধে তখন শিডিউল ফাঁকি দেওয়া, কাজে দেরি করে আসার অভিযোগ উঠতে থাকে। এর উত্তরে অবশ্য শাকিবকে খুব যৌক্তিক বক্তব্য দিতে শোনা যায় না—“**চলচ্চিত্রকে আমি এখন একাই টেনে নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে তো একটু ছাড় দিতেই হবে। এভাবে আমাকে নিয়ে কাজ করতে কারও যদি সমস্যা হয় তাহলে তার উচিত অন্য ব্যবসায় যোগ দেওয়া। যেখানে আমার মতো অধিপত্যওয়ালা নেই**” (*সমকাল* ২১ এপ্রিল ২০১১)। শাকিবের এসব কথাবার্তা মোটেও পেশাদারিত্বের পরিচয় বহন করে না। তারপরও বাধ্য হয়ে নির্মাতারা তাকে নিয়ে কাজ করেছেন।

এই সময়টাতে শাকিবের একাধিপত্য এমন জায়গায় ছিলো যে, ২০১১ সালে ১ এপ্রিল এম বি মানিকের *এক টাকার দেনমোহর*-এর শুটিংয়ে ১০ দিনের জন্য ব্যাংকক যান শাকিব-অপু। এই দশ দিন এফ ডি সিতে কোনো শুটিং হয়নি (*কালের কণ্ঠ* ১১ এপ্রিল ২০১১)। এছাড়া কেবল শাকিবের জন্য প্রযোজক-পরিবেশ সমিতি নতুন নিয়ম করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। এই নিয়মের মধ্যে ছিলো, শিডিউল ফাঁসানো ও শুটিংয়ে দেরি করে আসা যাবে না; চলচ্চিত্র প্রতি পারিশ্রমিক ১০ লাখ টাকার মধ্যে রাখতে হবে (*সমকাল* ২১ আগস্ট ২০১১)। মূলত নিরুপায় হয়ে প্রযোজকরা এই ধরনের নিয়ম করতে সে সময় বাধ্য হয়েছিলো। কারণ শুধু নায়ককে ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে নির্মিত বেশির ভাগ চলচ্চিত্র সেসময় ব্যবসা করতে পারছিলো না। রংপুরের শাহাবুদ্দীন মোল্লা বলেন,

> এখনকার নায়ক-নায়িকাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, টাকা রোজগার করা। এরা অভিনয় জানে কী জানে না, এ নিয়ে কথা নাই। এরা টাকার ডিমান্ড খালি বাড়াতেই থাকে। এরা যদি পারিশ্রমিক কম নিয়ে অভিনয়ের দিকে মনোযোগী হতো, তাহলে তবুও কিছু হতো। এই শাকিব খান একসময় ৪০ লাখ টাকাও নিয়েছে একটা সিনেমা করতে। এই মন মানসিকতা থাকলে তো হবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২০)।

মোল্লা আরো বলেন, ‘আমাদের কোনো নায়ক যখনই একটু একটু হিট হয়, তখনই তার আরাম-আয়েশ বেড়ে যায়। তাদের তখন অনেক কিছু লাগে, কিন্তু আগের অনেক হিরো শ্যুটিংয়ে গিয়ে রাতে মাঠেই ঘুমিয়েছে। তাদের কাছে অভিনয়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২০)।’

একদিকে শাকিব খান ছাড়া আর কোনো নায়ক নেই, অন্যদিকে শূন্য দশকে শুরু হওয়া যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রগুলো ২০০৭-এর পর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সারাদেশের প্রেক্ষাগৃহগুলো ভয়ংকর রকমভাবে দর্শক সঙ্কটে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ২০০৭-এর পর থেকে সারাদেশে প্রেক্ষাগৃহ বন্ধের গতি বেড়ে যায়। ফলে **শাকিবের চড়া পারিশ্রমিক, উল্টো দিকে ব্যবসায়িক ব্যর্থতা এবং প্রেক্ষাগৃহ স্বল্পতা ও দর্শকশূন্যতা**—এতো সব সঙ্কটে পড়ে একে একে প্রযোজকরা তাদের ব্যবসা গোটাতে থাকেন। যে দুই চারজন প্রযোজক এর মধ্যেও ব্যবসা করতে চেয়েছেন, তারা শাকিবের পারিশ্রমিক কমানোর দাবি নিয়ে

হাজির হন। কিন্তু তাতে খুব বেশি কাজ হয়নি। ২০১২ সালের ঈদ উল ফিতরে মুক্তি পায় পাঁচটি চলচ্চিত্র। এর মধ্যে তিনটিরই নায়ক ছিলেন শাকিব খান (*সমকাল* ২৩ অক্টোবর ২০১২)! এছাড়া এই সময়ে শাকিবের বিপরীতে ঠিক নায়িকা কে হবে তাও নাকি ঠিক করতেন শাকিব খান নিজেই। এখানে চলচ্চিত্রের প্রয়োজন কিংবা প্রযোজকদের পছন্দের কোনো ব্যাপার ছিলো না (*কালের কণ্ঠ* ২০ মার্চ ২০১৩)। কিন্তু নির্মাতারা সেসময় শাকিবের বিপরীতে আপু আর সাহারার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। নতুন চলচ্চিত্রগুলোতে তারা ববি ও মাহির মতো নতুন নায়িকাদের চুক্তিবদ্ধ করতে চান।

২০১৪ সালে মুক্তি পায় মোট ৭৭টি চলচ্চিত্র। এ বছরও সর্বাধিক নয়টি চলচ্চিত্রের নায়ক শাকিব খান। এছাড়া নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরুর কারণে বছরজুড়ে তিনি আলোচনায় ছিলেন। শাকিবের দৌরাত্ম্যে অন্য নায়করা এবছরও খুব বেশি দ্যুতি ছড়াতে পারেননি। ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঢাকাই চলচ্চিত্র এই সময় যে সংকটের মধ্যেই থাকুক না কেনো, শাকিব কিন্তু তার একনায়কতন্ত্র বজায় রেখেছিলেন।

৬.৬.৩) নায়ক-নির্মাতা-প্রযোজক অনন্ত জলিল

অনন্ত জলিলের প্রথম চলচ্চিত্র *খোঁজ দ্য সার্চ* মুক্তি পায় ২০১০ সালে। চলচ্চিত্রটি মুক্তির বছর দুয়েক আগে থেকে এর প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রচারের পাশাপাশি এই প্রথম বাংলাদেশের কোনো চলচ্চিত্রে রাস্তায় বড়ো বড়ো বিলবোর্ড টাঙিয়ে প্রচার করা হয়।

এছাড়া প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোনো চলচ্চিত্রের ট্রেইলার মুক্তি দেওয়া হয় ইউটিউবে। ফলাও করে প্রচার করা হয়, ডিজিটাল সাউন্ড ও ডিজিটাল ফটোগ্রাফি নিয়ে আসছে *খোঁজ দ্য সার্চ*। খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে *খোঁজ দ্য সার্চ* মুক্তি পেলেও চলচ্চিত্রটির মধ্যে প্রাযুক্তিক কিছু পরিবর্তন ছাড়া নতুন কিছুই চোখে পড়ে না। আর অনন্তের অভিনয়ও ছিলো একেবারে আনকোরা, অদক্ষ। ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেন বলেন, 'অনন্তর দুই–একটা সিনেমা ভালো ব্যবসা করেছিলো ঠিকই। কিন্তু সেইসব সিনেমার মান খুব একটা ভালো ছিলো না। মানুষ হুজুগে দেখেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।'

পরের বছর মুক্তি পায় অনন্তের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র *হৃদয় ভাঙ্গা ঢেউ* (২০১১)। এক সময়ের জনপ্রিয় নির্মাতা গাজী মাজহারুল আনোয়ারকে দিয়ে প্রথাগত সামাজিক অ্যাকশন চলচ্চিত্র নির্মাণ করান নায়ক ও প্রযোজক অনন্ত। খলনায়ক স্বামীর অনৈতিক অবস্থানের বিপরীতে সন্তানকে নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তোলেন এক সাহসী মা। তারপর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেই সন্তানের আবির্ভাব হয় এবং শেষে অপরাধী বাবার আত্মসমর্পণ করেন। এই গল্পের *হৃদয় ভাঙ্গা ঢেউ* ব্যবসায়িকভাবে ব্যর্থ হয়।

পরের বছর অনন্ত নির্মাণ করে দুটো চলচ্চিত্র—*দ্য স্পিড* (২০১২), *মোস্ট ওয়েলকাম* (২০১২)। *দ্য স্পিড* মালেশিয়ার সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত। এটাকে হলিউড ও বলিউডের অ্যাকশন ঘরানার চলচ্চিত্রের কপি-পেস্ট বলা যায়, গল্পটা কেবল নির্মাতা নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করেছেন।

এখানেও চিরায়িত বাংলা চলচ্চিত্রের সমাপ্ত দৃশ্য—নায়কের শক্তিবলে খলনায়ক পর্যুদস্ত এবং শেষে সব জয় করে কারাগার থেকে নায়কের মুক্তি। তবে *দ্য স্পিড*-এ পার্থক্য কেবল কারাগারটা ঢাকায় না হয়ে মালেশিয়ার। যাহোক, বড়ো বাজেট আর চোখ ধাঁধানো লোকেশনের প্রচারের কারণে কিছু দর্শক *দ্য স্পিড* গ্রহণ করে।

২০১২-এর আগস্টে আসে অনন্তের চতুর্থ চলচ্চিত্র *মোস্ট ওয়েলকাম*। অনন্য মামুনের পরিচালনায় তামিল চলচ্চিত্র *কান্থা স্বামী*র অনুকরণে এটি নির্মিত। চলচ্চিত্রটি দেখতে শহুরে মধ্যবিত্ত দর্শক সাড়া দেয়। *মোস্ট ওয়েলকাম* মুক্তি পাওয়ার আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনন্ত জলিলের উচ্চারণ ভঙ্গি নিয়ে অনেকে ট্রল করেন। ফেইসবুকে তার বিশেষ উচ্চারণ ভঙ্গির ভিডিও ভাইরাল হয়। এরকম একটা পরিস্থিতিতে অনন্তকে নিয়ে অনেকের মধ্যে এক ধরনের হাস্য রসাত্মক আমেজ সৃষ্টি হয়। চলচ্চিত্রটি নিয়ে দর্শকের আগ্রহের পিছনে হয়তো এ বিষয়টিও কারণ হিসেবে ছিলো। অনন্তের চলচ্চিত্র নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দেন যশোরের 'মণিহার'-এর প্রধান ফটকের গেইটম্যান সমরেশ বাহাদুর সত্য। প্রধান ফটকে দাঁড়িয়েই কথা হয় তার সঙ্গে। সত্য খুব মজা করে বলেন,

> কিছুদিনের জন্য আরেকজন নায়ক আসছিলো, তার নাম অনন্ত জলিল। তার সিনেমায় কোনো কিছুই হয় না—অভিনয়, ফাইটিং, পোশাক-আষাক। তারপরও কিছু মানুষ হাসি-ঠাট্টা করার জন্য এই সিনেমা দেখতে আসছিলো। আমার মনে আছে, পর্দায় কষ্টের অভিনয় চলতেছে, অথচ দর্শক কেমন জানি হাসাহাসি করে। আমি প্রথম দিকে বুঝি নাই। তারপর একদিন পুরা সিনেমাটা দেখলাম। তারপর বুঝলাম মানুষ হাসে কেনো। সিনেমার ভিতরে তো কিছু নাই, খালি উপরে উপরে একটা খোলস (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৩০)।

২০১৩ সালে মুক্তি পায় *নিঃস্বার্থ ভালোবাসা*। এই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে অনন্ত পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রযোজক অনন্ত তার আগের চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রগুলোকে খানিকটা নিষ্প্রভ করে রেখেছিলেন, মানে চলচ্চিত্রগুলো ছিলো একেবারেই নায়ক প্রধান। এই প্রথমবারের মতো তিনি চলচ্চিত্রের গল্পে নায়িকাকে সমানভাবে ফোকাস করেন। মজার ব্যাপার হলো, *নিঃস্বার্থ ভালোবাসা* মুক্তির আগে অনন্ত ও তার স্ত্রী নায়িকা বর্ষার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়েছে—এরকম খবর গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়। এ নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন অনন্ত-বর্ষা দম্পতি। বাস্তবের মতো *নিঃস্বার্থ ভালোবাসা*তেও ওই দম্পতির বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক দেখানো হয়।

অনন্তের চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবসা সফল হয়। নির্মাতা এখানে ' ... ডিজিটাল স্পেশাল ইফেক্ট, অ্যানিমেশন-গ্রাফিকসের সাহায্য নিয়ে দৃশ্যখণ্ড নির্মাণ করেছেন। বিদেশের মাটিতে ব্যয়বহুল লোকেশনে গান ও অ্যাকশন দৃশ্যের চিত্রায়ণ করেছেন' (আউয়াল ২০১৭, পৃ১৫০)। সবমিলিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার দর্শককে আকৃষ্ট করে। ২০১৪ তে মুক্তি পায় তার এখন পর্যন্ত শেষ চলচ্চিত্র *মোস্ট ওয়েলকাম ২*। বড়ো বাজেটে নির্মিত এই চলচ্চিত্র ব্যবসায়িকভাবে চরম ব্যর্থ হয়। ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেন বলেন,

অনন্ত জলিলের সিনেমার যে কাহিনি এবং উনি যেভাবে সিনেমা বানাতে চাইতেন; সেখানে যদি উনি নায়ক না হয়ে অন্য কেউ নায়ক হতো তাহলে হয়তো আরো ভালো হতো। কারণ নায়ক হিসেবে অনন্ত জলিল সাহেবের অভিনয়ের মান মোটেও ভালো ছিলো না। উনি প্রযোজক হিসেবে থাকলেই সবচেয়ে ভালো হতো। কিন্তু আমার ধারণা এটা তিনি বুঝতে পারতেন না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।

ছবি : সংগৃহীত

প্রযোজক, পরিচালক, অভিনয়শিল্পী অনন্ত জলিল যেভাবে চলচ্চিত্রে অর্থলগ্নি করেছেন তা ঢাকাই চলচ্চিত্রের জন্য একদিকে সুসংবাদই বটে। কিন্তু তাতে চলচ্চিত্রের যে খুব বেশি লাভ হয়েছে বলা যায় না। যদিও অনন্ত সগৌরবে প্রচার করেছেন, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে তিনি মৃত্যুদশা থেকে উদ্ধার করেছেন, মান বদলে দিয়ে দর্শককে প্রেক্ষাগৃহমুখি করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন কথা বলে। নওগাঁর পত্নীতলার সমীর কুমার মণ্ডল বলেন,

> তার সিনেমার দৃশ্যগুলো ভালোই; মনে হয় টেকনিকাল হ্যান্ডসগুলো ভালো; অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো। কিন্তু তার পরেও তো চললো না। উনি অনেক চেষ্টা করছেন, ভর্তুকিও দিয়েছেন। আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে যে সিনেমার দাম এক লক্ষ টাকা হওয়ার কথা, সেখানে তিনি ৩০-৪০ হাজার টাকায় সেটা দিয়েছেন। তিনি এরকম কথা বলতেন, এই সিনেমার যে ইনভেস্ট সেটা আমি এই দেশে উঠাবো না, অন্য দেশে উঠাবো; আপনারা শুধু আমার সিনেমা চালান, সিনেমাহল বাঁচুক, শিল্প থাকুক। তারপরেও তো খুব একটা ভালো করতে পারলেন না (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

চলচ্চিত্রে তিনি এমনসব বিষয় উপস্থাপন করেন যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-অনন্ত আর চলচ্চিত্রের অনন্তকে একীভূত করার একটা প্রয়াস দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে তিনি ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি নির্মাণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। চলচ্চিত্রের বাইরে বাস্তব জীবনেও তিনি নায়কই হতে চেয়েছেন। যদিও চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করে অনন্য ইমেজ তৈরির এই ব্যাপারটি নতুন নয়।

অন্যদিকে চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নেওয়ার কথা বলে তিনি দেশীয় কাঠামোতে 'হলিউডি ফর্মুলা' ব্যবহার করে একটা জগাখিচুড়ি অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন (টুম্পা ২০১৩)। চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নেওয়ার বদলে বরং তা বিদ্যমান রূপটিকে অনেকক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

৬.৭) চলচ্চিত্রের দর্শক, প্রেক্ষাগৃহ এবং ব্যবসা

শুন্য দশকে চলচ্চিত্র ব্যবসায়িক দিক থেকে খুবই ভয়াবহ এক সময় পার করেছে। এই দশকের শুরুতে প্রেক্ষাগৃহগুলোর দখলে ছিলো যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র। সেসময় যে প্রেক্ষাগৃহগুলো কোনো বাছবিচার ছাড়া এসব চলচ্চিত্র চালিয়েছে, তারা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রচুর টাকা রোজগার করেছে ঠিকই, কিন্তু ২০০৭ সালের পর থেকে এসব প্রেক্ষাগৃহের বেশিরভাগই বন্ধ হওয়া শুরু হয়। রংপুরের শাহাবুদ্দীন মোল্লা বলেন,

> ২০০৫ সালে অন্য সিনেমাহলগুলোতে ব্যবসা ছিলো, আমাদের 'শাপলা'য় লোকজন খুব একটা ছিলো না। কারণ আমরা তখন কোনো ন্যাংটা ছবি চালাই নাই। আবার আমরা যখন ২০০৬-এর দিকে টুকটাক শাকিব খানের সিনেমা দিয়ে ব্যবসা শুরু করলাম, ওরা তখন সিনেমাহলই বন্ধ করে দিলো। ২০১০ সালের মধ্যে ন্যাংটা সিনেমা চালানো ওইসব সিনেমাহলের বেশিরভাগ বন্ধ হয়ে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২০)।

একই ধরনের কথা বলেন যশোরের মোল্যা ফারুক আহম্মেদ—

> যশোরে সেসময় পাঁচটা সিনেমাহল ছিলো। এর মধ্যে 'মণিহার' ছাড়া চারটিই পাল্লা দিয়ে এসব সিনেমা চালিয়েছে। তাদের কেউ কিন্তু এখন টিকে নাই মার্কেটে। অথচ 'মণিহার' সেসময়ও যেমন ভালো সিনেমা

চালিয়েছে, এখনো চালাচ্ছে। সেসময় কোনো সিনেমা আনলে, বৃহস্পতিবার রাতে সেই সিনেমা আমরা আগে দেখেছি। কোনো খারাপ দৃশ্য থাকলে তা কেটে দিয়েছি (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।

কুষ্টিয়া সদরের মোখলেছুর রহমান বকুল বলেন,

> 'বনানী'তে কখনো আমরা কাটপিস সিনেমা চালাইনি। কুষ্টিয়ার বাকি তিনটি সিনেমাহল 'রক্সি', 'বাণী', 'কেয়া'তে তখন এইগুলো চলতো। ওরা সেই সময় ব্যবসাও করে খুব। কিন্তু কাটপিসওয়ালা সিনেমাগুলো বন্ধ হওয়ার পর ওই সিনেমাহলগুলো আর ব্যবসা ধরে রাখতে পারেনি। ফলে সবগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এতো কিছুর পরেও 'বনানী' এখনো টিকে আছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৫২)।

৯০-এর দশকের শেষ থেকে শূন্য দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র চলেছে। এসব চলচ্চিত্র দেখার জন্য সেসময় বৃহৎ শ্রেণির দর্শকও তৈরি হয়েছিলো। সেই সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করেন যশোরের বন্ধ প্রেক্ষাগৃহ 'মানসী'র গেইটম্যান মনিরুল। মনিরুল এখন ক্যারম বোর্ড বানানোর কাজ করেন। তারা তিন ভাই একসময় 'মানসী'তে কাজ করতেন। 'মানসী'র খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায়, প্রেক্ষাগৃহটির অর্ধেক ভেঙে ফেলা হয়েছে। তারই সামনের অংশে মনিরুলের দুই ভাইয়ের দোকান। তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে সেই সময়ের কথা বলেন। তার ভাষ্যমতে,

> ২০০০ সালের পর হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম যে, সিনেমার প্রিন্টের সাথে ১০-১৫ মিনিটের ছোটো একটা অ্যাডাল্ট প্রিন্ট ঢাকা থেকে পাঠানো হচ্ছে। আমাদের বুকিং এজেন্টরা বুকিং দিলে এই প্রিন্টটা দিয়ে দিতো। ধরেন, সিনেমা চলছে ইন্টারভেলের আগে না হয় পরে, এই প্রিন্ট চালানো হতো। সাধারণত গানের সাথে এগুলো চলতো। এতে যেটা হলো, ইয়াং ছেলেপেলের বেশ আনন্দ পাওয়া শুরু হলো। তারা চিৎকার করে, শিস দিতো। কিন্তু ওই যে মেয়েছেলেরা, পরিবার নিয়ে যারা আসতো তারা মুখ ঢেকে সিনেমাহল থেকে বাইরে যাওয়া শুরু করলো। তখন **সিনেমাহলের লোকজনকেও বোঝানো হলো, মহিলা দর্শকের আর দরকার নাই** (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৩)।

খুলনার শাহাজান আলী বলেন,

> ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে রুচিশীল সিনেমা তৈরি হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে নামসর্বস্ব কিছু নির্মাতা রুচিহীন সব সিনেমা বানাতে শুরু করে। ২০০৪-এ গিয়ে এই পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এরফলে এক শ্রেণির দর্শক সিনেমাহল থেকে সরে যায়। কিন্তু কিছু দর্শক সিনেমা দেখতে ভিড় করে। এই পরিস্থিতি ২০০৫-০৬ এর দিকে কিছুটা কাটিয়ে উঠলেও, তখন শুরু হয় ভিডিও পাইরেসি। সিনেমা মুক্তি পাওয়ার এক দিনের মাথায় ডিভিডিতে সেটা পাওয়া শুরু হয় (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩০)।

এই সময় নতুন কোনো চলচ্চিত্র মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের একটা শ্রেণি প্রেক্ষাগৃহে হুমড়ি খেয়ে পড়তো। একারণে প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের পকেটে সেসময় প্রচুর কাঁচা টাকা আসতে থাকে। তারা ভাবতে থাকেন, এই পরিস্থিতি বোধ হয় স্থায়ী হবে। তখন প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্টদের কেউই দীর্ঘমেয়াদে কোনো চিন্তা করেননি। শ্রীমঙ্গলের মঞ্জু চৌহান বলেন,

> কাটপিসের সময় খুব ভালো ব্যবসা হয়েছে। তবে কাটপিস চালিয়ে ক্ষতি হয়েছে আমাদের। কারণ মহিলা দর্শক সব শেষ হয়ে গেছে। সেসময় অনেক মহিলা দর্শক না জেনে সিনেমাহলে ঢুকে খুব খারাপ পরিস্থিতির

> মধ্যে পড়ে। তারা আর কোনো দিন সিনেমাহলে ফিরে আসে নাই। তখন প্রত্যেক সিনেমার সঙ্গে দুই-তিনটা করে কাটপিস দৃশ্য ছিলো। রিলের সঙ্গে এগুলো লাগিয়ে দেওয়া হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.২২)।

তখনকার ব্যবসা নিয়ে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের জহির খন্দকার বলেন, 'তখন একটা সিনেমা লাগাইছিলাম *নিষিদ্ধ নারী*। যেটাতে মুনমুনের বেল মাথা ছিলো। এতো লোক যে, মানুষকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বিদায় করতে হয়েছে। মান্নার *ফায়ার*ও একইরকম ব্যবসা করছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৬)।' লাকসামের শামসুল ইসলাম বলেন, '২০০১ সালের পর ভারতের ভোজপুরি সিনেমার আদলে আমাদের কিছু নেংটা সিনেমা তৈরি হয়। এই সিনেমার কারণে বড়ো-ছোটো মিলে সিনেমা দেখা, পরিবারের লোকজন নিয়ে সিনেমা দেখা এবং মহিলারা সিনেমা দেখা বাদ দেয়। ২০০৮ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৭)।' ময়মনসিংহের স্বপন মিয়া বলেন, 'তখনকার নেকেট সিনেমায় কোনো নামিদামি নায়ক-নায়িকা ছিলো না। তাদের লোকের কম চিনতো। খুব অল্প টাকায় ওইসব সিনেমা আনা হতো। কিন্তু লাভ হতো প্রচুর (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২০)।' খুলনার মো. হালিম পরিস্থিতিটাকে বর্ণনা করেন এভাবে—

> শুরুতে সিনেমার সঙ্গে একটা-দুইটা গান দেওয়া হতো কাটপিস হিসেবে। তারপর প্রযোজকরা দেখলো ব্যবসা ভালো হচ্ছে। কারণ তখন তো আজকের মতো মোবাইল ফোনের মধ্যে টু এক্স, থ্রি এক্স নিয়ে ছেলেমেয়েরা ঘুরতো না। আগের সিনেমায় নায়িকার গায়ের ওড়না পড়ে গেলে দর্শকের কী চিৎকার! কারণ তখন একটা আকর্ষণ ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৬)।

যশোরের 'মণিহার'-এ যৌনকর্মী হিসেবে দীর্ঘ দিন কাজ করছেন নাসিমা। প্রেক্ষাগৃহের সামনে একটা চা দোকানে বসে তার সঙ্গে কথা হয় নানা বিষয় নিয়ে। নাসিমা বলেন,

> একটু খোলামেলা সিনেমা হলে মানুষ সিনেমাহলে ভেড়ে। সেগুলো তো এখন আর হয় না। তাই মানুষও কমে গেছে। মানুষ তো সিনেমাহলে আসে আনন্দ-ফূর্তি করতে। এখনকার সিনেমায় তো আনন্দ নাই। গান-টানে একটু আকর্ষণ থাকলে ছেলেরা ভেড়ে। ... সিনেমায় একটু কষ্ট হবে, একটু সুখ হবে, একটু খোলামেলা হবে। এগুলো সব না থাকলে তো আর হবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২৯)।

পটুয়াখালীর 'তিতাস'-এর বর্তমান ব্যবস্থাপক মোতালেব হোসেন। এর আগে তিনি 'নুপুর' নামে আরেকটি প্রেক্ষাগৃহের মালিক ছিলেন। বর্তমানে প্রায় নিঃস্ব মোতালেব কথা বলতে পছন্দ করেন। প্রথম একটা চায়ের দোকানে ও পরে প্রেক্ষাগৃহের ভিতর তার অফিসে কথা হয়। মোতালেব বলেন,

> ২০০০ সালের দিকে 'নুপুর' সিনেমাহল দেওয়ার পর আমার অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। সেই সময় কয়েক বছর কিছু অন্যরকম সিনেমায় আমরা টানা খুব ভালো ব্যবসা করি। ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোটামুটি ভালো ব্যবসা গেছে। এরপর লোকসান হওয়া শুরু হলো। দর্শক সিনেমাহলে আসা বন্ধ করে দিলো। ২০১০ সালে আমরা সিনেমাহলটা বিক্রি করে দিলাম (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২০)।

সাতক্ষীরার শাহরুখ হোসেন রাজা বলেন,

> এখন নাইট শো চলে না। তবে যখন আলেকজান্ডার, ময়ুরী, সোহেল, মেহেদীর সিনেমা চলতো তখন নাইট শো চলতো। তখন টিকেটের দাম ছিলো আট টাকা। এরা সিনেমা বন্ধ করে দেওয়ায় অনেক দর্শক আশা বন্ধ

> হয়ে গেছে। তার ওপর মান্না মারা গিয়ে চলচ্চিত্রজগত কানা হয়ে গেছে। আগে নারী দর্শক অনেক আসতো, এখন কম আসে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩৩)।

খুলনার মো. হালিম শেষের দিকের পরিস্থিতি বর্ণনা করেন এভাবে—

> কাটপিসওয়ালা একটা গান দেখে যখন দর্শক হুড়মুড় করে পড়লো, তখন প্রযোজক-পরিচালকরা মনে করলো তাহলে আরেকটু উলঙ্গ করি। তখন তারা আরেকটু উলঙ্গ করলো। শেষের দিকে এসে সেটা তো থ্রি এক্সের মতো হয়ে গেলো। তখন কিন্তু পাবলিকের বমি আসা শুরু হলো। কারণ এতো খারাপ সিনেমা! তখন পাবলিকেরই মন খারাপ হয়ে গেলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৬)।

তবে এই সময় নিয়ে কিছু ভিন্ন মতও আছে। শ্রীমঙ্গলের মনির বলেন,

> তখনো যে খুব বেশি ব্যবসা হয়েছে এমন নয়। সপ্তাহের প্রথম দুই দিন ব্যবসা চলতো, তারপর নাই। সেসময় সিনেমায় কুত্তার বাচ্চা, মাদার চোদ, হারামজাদা, বাইনচোদ এধরনের খারাপ ভাষা ব্যবহার করা হতো। প্রথম দিকে দর্শক এসে এগুলো দেখে হাসাহাসি করে চলে গেছে। তারা ওই যে গেলো আর ফিরে আসে নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭)।

যশোরের মোল্যা ফারুক আহম্মেদ মনে করেন,

> সেসময়ের প্রশাসন ও সেন্সর বোর্ড যদি আজকের মতো শক্ত থাকতো, তাহলে এরা কোনো পাত্তা পেতো না। সামান্য কয়েকজন লোক সিনেমার মতো এতো বড়ো একটা মাধ্যমকে ধ্বংস করে দেবে, এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সেসময় সব নয়, কিছু কিছু সিনেমাহল বাম্পার ব্যবসা করেছে। ন্যাংটা ছবি চালালে তো ভদ্র ফ্যামিলির লোকজন আর আসবে না। ওই সিনেমার দর্শক ছিলো একেবারে আলাদা (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।

যশোরের 'তসবির মহল'-এর বাদাম বিক্রেতা আব্দুর রশীদ বলেন,

> এখন যদি ন্যাংটা ছবিও সিনেমাহলে লাগান, তবুও দর্শক হয় না। কারণ এখন সব ধরনের সিনেমা মেমোরি কার্ডে নিয়ে দেখা যায়। ফলে সিনেমাহলে আসার দরকার নাই। যখন ন্যাংটা সিনেমাগুলো চলতো, তখন ছেলেদের কাছে মোবাইলফোন ছিলো না। পরে যুবক ছেলেরা মোবাইলফোনে চলে গেলো আর মহিলারা ঘরের মধ্যে ডিসলাইন দেখা শুরু করলো। ফলে তারা আর সিনেমাহলে আসার প্রয়োজন মনে করে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২৮)।

যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সবচেয়ে বড়ো যে ক্ষতি হয়েছে সেটা হলো,নারী দর্শক প্রেক্ষাগৃহে আসা একেবারেই বন্ধ করে দেয়। শ্রীমঙ্গলের 'ভিক্টোরিয়া'র গেইটম্যান মঞ্জু চৌহান বলেন, 'সিনেমাহল চলেই কিন্তু মহিলা দর্শক দিয়ে। সারা বাংলাদেশে মহিলা দর্শকের একই অবস্থা। এই মহিলারা এখন সারা দিন টেলিভিশন দেখে। ওই সব বাজে সিনেমার কারণে অনেক দর্শকের মন মানসিকতা সিনেমাহলের দিকে থেকে উঠে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.২২)।'

রংপুরের আ. রহমান যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রের আগের অবস্থা সম্পর্কে বলছেন এভাবে—

> একসময় শত শত নারী দর্শক হতো। ডিপজল সাহেব সিনেমায় ঢোকার পর থেকে কাটপিস আসা শুরু হলো। এরফলে আগে যেমন পুরো পরিবার নিয়ে মানুষ সিনেমা দেখতে আসতো, সেটা বন্ধ হয়ে গেলো। বিশেষ করে

> লেডিস দর্শক আসা একেবারে বন্ধ হলো। আগে নায়িকাদের শরীরের কাপড় হাটুর অনেক নীচে ছিলো, আর এখন তো কাপড় খুঁজে পাওয়া যায় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৮)।

বরিশালের মো. জুলু মিয়া বলেন, 'এখন ভালো সিনেমা তৈরি হলেও নারীরা ওই চিন্তা করে আর সিনেমাহলে আসে না। আর সন্ধ্যা হলেই এক ভাবী আরেক ভাবীকে বলে, টুপুরের কী হবে ভাবী? সারা দিন কাজ করে এগুলো দেখে ওরা আর সিনেমাহলে আসতে চায় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.৭)।' বরিশালের প্রদীপ দাস বলেন, 'সিনেমাহলের লক্ষ্মী হলো মহিলা দর্শক। পাঁচজন মহিলা দর্শক আসলে, ১০জন পুরুষ আসে। ন্যাংটা সিনেমা এসে সব শেষ হয়ে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.৪)।' কুষ্টিয়ার রাজন বলেন,

> একজন নারী দর্শকের সঙ্গে এমনি দুই–তিন জন পুরুষ দর্শক আসে; এটা পারিবারিকভাবেই আসে। এখন দর্শক খালি স্টুডেন্ট আর বেকার ছেলেপেলে। এরা কিছু সময় কাটানোর জন্য সিনেমাহলে আসে। কিন্তু এদের দিয়ে তো আর ইন্ডাস্ট্রি চলতে পারে না। ইন্ডাস্ট্রি চালাতে হলে, সব শ্রেণির দর্শক টানতে হবে, সব শ্রেণির দর্শকের জন্য সিনেমা নির্মাণ করতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫১)।

খুলনার মহিউদ্দিন আহমেদ পান্না মনে করেন,

> সব মিলিয়ে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সিনেমাটা দেখার মতো ছিলো। কিন্তু তারপর কিছু নোংরা সিনেমা আসে। সেই সিনেমাগুলোর পর থেকেই ধস নামা শুরু হয়। নারী দর্শক এরপর থেকেই বিদায় নিলো। এরপর অনেক দিন কিন্তু নারী দর্শকের বিনোদনের খুব ভালো মাধ্যম ছিলো না। তারপরেই ঢুকলো ভারতীয় সিরিয়াল। নারীরা সেটাতে মজে গেলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৫) ।

চট্টগ্রামের আবদুল আউয়াল বিষয়টা একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। তার ভাষ্যমতে,

> কোনো মহিলা সিনেমা দেখতে এসে যদি দেখে তাকেই উলঙ্গ করে সেখানে দেখানো হচ্ছে, তাহলে সে কোনো সেই সিনেমা দেখতে আসবে? তখন সেই মহিলা লজ্জা পাচ্ছে, নিজেকে ছোটো মনে করছে। সিনেমার দর্শক কমার পিছনে এটাও একটা কারণ। তখন বেশি দর্শক টানার জন্য হয়তো তারা এটা করছে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেই দর্শক হয়তো সিনেমাহলে আসছেও; কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটি ভালো কিছু বয়ে আনেনি (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১)।

বরিশালের ফারুক হোসেন বলেন, 'এটা ইসলামি রাষ্ট্র, মুসলমানের রাষ্ট্র; তাই শর্ট কাপড় পরা মেয়েদের ওইসব সিনেমা মানুষজনের খুব খারাপ লেগেছে। বিশেষ করে মহিলারা এটা মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা বাড়িতে টেলিভিশন দেখা শুরু করে দেয়। পরে অবশ্য এইসব সিনেমা আর চলেনি (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১০)।'

আবদুল আউয়াল আরো বলেন,

> একসময় এমন অনেক পরিবার ছিলো, যারা সপ্তাহে, পনেরো দিনে; না হলে কমপক্ষে মাসে একবার হলেও সপরিবারে সিনেমাহলে সিনেমা দেখতে আসতো। এই পরিবারগুলো গত ২৫–৩০ বছরে একবারও সিনেমাহলে এসেছে বলে মনে হয় না। এখন যারা সিনেমাহলে আসে, তাদের বেশিরভাগেরই বিনোদনের আর কোনো

উপায় নেই। সিনেমাহলের বেশিরভাগ দর্শক এখন দিনমজুর, গামেন্ট কর্মী, রিকশা-সিএনজি চালক। যেমন সিনেমা, তেমনই তার দর্শক (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১)।

২০০৭ সালের শেষের দিকে সরকারি উদ্যোগে যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র বিরোধী অভিযান শুরু হলে, এধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ বন্ধ হওয়া শুরু হয়। এবং ধীরে ধীরে তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। এই পরিস্থিতিতে **প্রেক্ষাগৃহগুলো যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রের সেই দর্শকও হারিয়ে ফেলে। আর শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত এবং নারী দর্শক তো আগেই প্রেক্ষাগৃহ আসা বন্ধ করে দিয়েছে**। ফলে যেটা হয় প্রেক্ষাগৃহ দর্শক শূন্য হয়ে পড়ে। যশোরের আলী হোসেন নদু বলেন,

আগে তিন শ্রেণির মানুষ সিনেমা দেখতো—উঁচু, নীচু আর মধ্যম শ্রেণি। এখন উঁচু শ্রেণির দর্শক নেই বললেই চলে। এই শ্রেণির যারা এখনো সিনেমা দেখে, তারা টিভিতে দেখে। তারপরও মাঝে মাঝে টেলিফিল্ম জাতীয় কিছু সিনেমা আসলে এই দর্শকও সিনেমাহলে আসে। এরজন্যও 'মণিহার'-এর মতো ভালো হাউস, পরিবেশের দরকার পড়ে। আর যারা মধ্যম শ্রেণি, তারা এখন সিনেমা দেখে কম। এখন মূলত সিনেমা দেখে নীচু শ্রেণি—রিকশাওয়ালা, দিনমজুর। শোনেন, আপার ও মিডল ক্লাস দর্শক না হলে সিনেমার ব্যবসায় পোষাবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৭)।

ময়মনসিংহের অলক চন্দ্র দে বলেন,

এক সময় ওইসব সিনেমা খুব চলছে। পরে যখন সিনেমার মধ্যে ওইসব সিন বন্ধ হয়ে গেলো, তখন দর্শক তো চেয়ার ভাঙা শুরু করলো। কারণ অনেকে আশা নিয়ে আসছে ওই সিন দেখার জন্য, কিন্তু এসে দেখে নাই; তো মাথা খারাপ। কী আর করবে চেয়ার ভাঙলো। এভাবে ওইসব দর্শক আসাও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১৬)।

ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেন বলেন, 'অনেক নারী দর্শক এখনো সিনেমাহলে আসতে ভয় পায়। এখনো আমি যখন গেইটে বসে থাকি, অনেক নারী দর্শক জিজ্ঞাসা করে, ভাই খারাপ কোনো সিন নাই তো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)?'

কাটপিস বন্ধের পরের পরিস্থিতি বর্ণনা করেন যশোরের মনিরুল। তার ভাষ্যমতে,

২০০৭-এর পর ব্যবসার খারাপ হলে সিনেমাহলের কিছু লোকজন, যারা এর আগে ম্যানেজার, সুপারভাইজার ছিলো, তারা লিজ নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো। প্রথম মাসে এরা ভাড়া নিলো ৩০ হাজার টাকায়। কিন্তু এদেরই ব্যবসা হয় না; মালিকরে টাকা দিবে কোথা থেকে! ওরা মালিকরে গিয়ে কোনো মাসে ২০ হাজার, কোনো মাসে ১৫ হাজার টাকা দিয়ে আসতো। এরপর 'মানসী' একসময় বন্ধ হয়ে গেলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৩)।

এই সময়ের অপেকক্ষাকৃত ভালো নির্মাতাদের অবস্থা সম্পর্কে খুলনার শাহাজান আলী বলেন, '২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর অশ্লীল সিনেমার নির্মাতারা গা ঢাকা দেয়। কিন্তু এই কয় বছরে ইন্ডাস্ট্রির মূল যে নির্মাতারা ছিলো, তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তারা আর সিনেমা বানাতে পারে না

(আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩০)।' খুলনার মো. হালিম বলেন, 'এটা নিয়ে লেখালেখি শুরু হলো; পুলিশ, র‍্যাব, প্রশাসন মিলে এধরনের রিল জব্দ করলো। ততোদিনে আগের পরিচালকরা সিনেমা করা বাদ দিয়েছে।' যশোরের মনিরুল বলেন, 'দুই–তিন বছরের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রশাসনের চাপ বেড়ে গেলো, অ্যাডাল্ট দেখানো যাচ্ছিলো না; দর্শক কমা শুরু হলো। তারপর অ্যাডাল্ট ছাড়া সিনেমা লাগালে আর ভিড় হয় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৬)।'

তবে রাজশাহীর মো. জাহাঙ্গীর মনে করেন কাটপিসের কারণে চলচ্চিত্রের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। তার ভাষ্যমতে,

> কাটপিসের কারণে সিনেমা কিংবা সিনেমাহলের ক্ষতি হয়নি। সিনেমাহলের ক্ষতি হয়েছে ডিশ লাইন থেকে। সব থেকে বেশি ক্ষতি করে ফেলেছে ডিশ লাইন, পরে মোবাইলফোন। কাটপিস হয়তো একটা নির্দিষ্ট সময়ে ছিলো। কিন্তু এখন তো আর সেই সিস্টেম নাই। বাংলাদেশে এখন ওগুলো চলছে না, সব বন্ধ। কোথাও চলে না এ জিনিস। আগের যুগে ছিলো। তখন দর্শক দেখেছে কিছু। বাস্, এই শেষ আর নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৩)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, ৯০-এর শেষ থেকে শূন্য দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রগুলো চলার কারণে প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে মানুষের মনে এক ধরনের খারাপ চিন্তার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলো সামাজিকভাবে হেয় হতে থাকে। এ নিয়ে বরিশালের শেখ মাসুম বলেন,

> ওইসব আসামাজিক সিনেমা দেখার জন্য তখন খুব লোক হতো। কিছু দিন পরে সেই সিনেমা বন্ধ হয়ে গেলো। ভালো সিনেমা যখন লাগানো হলো তখন সামাজিক লোকজনও আসে না ওই অসামাজিক সিনেমার দর্শকও আর আসে না। সিনেমাহলের লোকজন পড়ে গেলো সমস্যায়। সামাজিকভাবে তাদেরকে লোকজন অসম্মান করতে শুরু করলো। ব্যাপারটা এমন হলো, তারাই যেনো এগুলো করেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২)!

লাকসামের শামসুল ইসলাম বলেন,

> আগে যেকোনো উৎসবে, বিশেষ করে ঈদের সময় সাত দিন আগে থেকে বন্ধু-বান্ধব, পাড়ার লোকজন বলতো, তিনটা কি ছয়টায় সিনেমা দেখবো টিকেট রাখতে হবে। অনেকে আগেই টাকা দিতো। তাদের জন্য টিকিট কেটে রাখতাম। তারা পরে এসে টিকিট নিয়ে যেতো। এখন কেউ আর সিনেমাহল নিয়ে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে না। বরং এড়িয়ে চলে (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৭)।

ময়মনসিংহের বিপ্লব হোসেন বলেন, 'আর একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ; আমি হয়তো সিনেমা দেখতে আসছি, আমার কোনো বন্ধু সেটা দেখেছে, সে বলে—'কীরে তুই বাংলা সিনেমা দ্যাখোছ'—এভাবে ইনসাল্ট করা হয়। এধরনের ইনসাল্টের কারণেও অনেক দর্শক হারিয়ে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৪)।'

আগেই আলোচনা হয়েছে ২০০৮ সালে মান্না মারা গেলে চলচ্চিত্রে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। মান্নার জায়গা তখন কেউই পূরণ করতে পারেনি। তবে ২০০৬ থেকে ডিপজলের প্রযোজনায় শাকিব-অপুর কিছু চলচ্চিত্র ব্যবসা করলেও পরে একঘেয়ামিতে ভুগতে থাকে দর্শক। শাকিব খান তখন মূলত একক নায়ক হিসেবে ইন্ডাস্ট্রির নেতৃত্ব দিতে থাকেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তার চলচ্চিত্রগুলো একের পর এক মার খেতে থাকে। শাকিবের চলচ্চিত্র নিয়ে লাকসামের 'পড়শি'র গেইটম্যান আবুল খায়ের বলেন,

> শাকিবের সব সিনেমায় কেবল অ্যাকশন দেখানো হয়। সেই সিনেমা দেখার জন্য মানুষ কেনো টাকা খরচ করবে। সেটা তো বাড়িতে বসে দেখা যায়। কারণ এখন ঘরে ঘরে টেলিভিশন। সেখানে সারা দিন বিভিন্ন ধরনের সিনেমা হয়। মানুষ সেগুলো ঘরে বসেই দেখে। তাই এমন কিছু এখন বানাতে হবে দর্শক যেনো সেটা দেখার জন্য আগ্রহ বোধ করে (আখ্যানের ক্রম ৪.২.২৩)।

ময়মনসিংহের বদিউল আলম চৌধুরী বলেন, 'এখন যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করি সিনেমার আর্টিস্ট কে, ওই শাকিব খান। আর নায়িকার নাম কেউ জানেই না। আর ভিলেন মিশা সওদাগর। আগে কিন্তু ভিলেনকে আর্টিস্টের ক্যাটাগরিতে ধরাই হতো না। আগে সবাই প্রধান আর্টিস্টদের নাম বলতো. ভিলেনের নাম কেউ বলতো না। ফলে এসব সিনেমা আর চলে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৫)।'

এই দশকে শ খানেক দেশি-বিদেশি স্যাটেলাইট চ্যানেলে দর্শক ভারতসহ সারা বিশ্বের চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পায়। এছাড়া নারীদের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ভারতীয় কয়েকটি চ্যানেলের ডেইলি সোপ অপেরা। এছাড়া ইন্টারনেট, মোবাইল ফোনসেট, ল্যাপটপ তো আছেই। এগুলোর একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব চলচ্চিত্রের ব্যবসায় পড়ে। ময়মনসিংহের মো. রবি মনে করেন, 'কাটপিসের কারণে সিনেমার আজকের এই অবস্থা কিংবা নারী দর্শক কমে গেছে, আমি এই যুক্তি মানি না। নারী দর্শক আসে না টেলিভিশনের কারণে। সারা দিন টেলিভিশনে যা দেখায়, সে কারণে নারীরা আর সিনেমাহলে আসতে চায় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১০)।'

নওগাঁর সমীর কুমার মণ্ডল বলেন, 'ডিশ আসার পরও সিনেমা চলেছে, কিন্তু মোবাইলে মেমোরি কার্ড আসার পর এই অবস্থা হয়েছে! এটাই সিনেমাহলের ব্যবসা ধ্বংসের মূল কারণ। এই মেমোরি কার্ডে বৈধ-অবৈধ অনেক চলচ্চিত্র ভরে নিয়ে ছেলেমেয়েরা বাসায়, মাঠে-ঘাটে বসে দেখতেছে। প্রেক্ষাগৃহে আর আসতেছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১২)।'

প্রযুক্তির ধারাবাহিক উন্নতির কারণে এর প্রভাব চলচ্চিত্রের ওপর পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তবে ওইসব ডিভাইসে কিন্তু দর্শক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রই দেখছে। চলচ্চিত্রের দর্শক কিন্তু কমেনি, দেখার স্থান, মাধ্যম পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে প্রযুক্তির উন্নতিকে খুব বেশি দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই পরিস্থিতির সঙ্গে কীভাবে অভিযোজন করা যাবে সেটাই প্রধান বিষয়। নির্মাতা কামার আহমাদ সাইমনের ভাষ্যে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হয়। তিনি বলেন,

> লেট এইটটিজ-এ ঢাকা শহরের প্রতিটি বাড়ির ছাদে টিভি এন্টেনায় মানুষ হাড়ি-সরা লাগাতো 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' দেখার জন্য। মানুষের কনটেন্টের যে প্রয়োজন, সেটা থেকেই এটা হয়েছে। ৯৬-এর পর পৌনঃপৌনিকের মতো টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বেড়েছে। এগুলো অডিও ভিজুয়াল মিডিয়ামে এক ধরনের ডিস্ট্রাকশন তৈরি করেছে; যেটা এখন ইন্টারনেটের কারণে অ্যাবসুলেট একটা জেনিথে পৌঁছে গেছে। এখন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইন্সটিটিউটের একজন সিনিয়র টিচারও দেখি মোবাইলে করে রাতের বেলা একটুখানি সিনেমা দেখে ঘুমাইয়া যায়। এখন ইন্সটিটিউটের সিনিয়র টিচারকে যদি আমি দেখি মোবাইলে সিনেমা দেখে ঘুমাইয়া যেতে, তাহলে বুঝতে হবে ইট ইজ নট অ্যাবাউট দ্য ক্রাইসিস অব কনটেন্ট অনলি। এটা অডিওভিজ্যুয়াল মিডিয়ামের যে ওভারঅল এক্সপেরিয়েন্সটা চেঞ্জ হয়ে গেলো, সেটার একটা অ্যাবসুলিউট লাস্ট আঘাত। এটাকে বুঝতে হবে এবং এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই (আখ্যানের ক্রম ৫.২; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

শূন্য দশকে এফ ডি সি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের যখন রুগ্ন দশা, তখন চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো। চলচ্চিত্রশিল্পে নতুন একটি দিকের উন্মোচন হয়। যদিও এই প্রচেষ্টা দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্পে খুব বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি (এ নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা আছে)।

২০১০-এর পর থেকে শাকিব অভিনীত চলচ্চিত্রগুলো ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়। মূলত একই ধরনের ধরনের কাহিনি, অভিনয় ও নায়িকার কারণে দর্শক চলচ্চিত্রগুলো নিতে পারছিলো না। ঠিক এই সময় ২০১১ সালে আসে প্রযোজনা ও পরিবেশনার প্রতিষ্ঠান 'জাজ মাল্টিমিডিয়া'। তারা প্রযোজনা, পরিবেশনা ও ডিজিটাল প্রজেক্টর স্থাপন ব্যবসা শুরু করে অল্প সময়ের মধ্যে একক আধিপত্যে বিস্তার করে। ফলে ছোটো পুঁজির অনেক প্রযোজক, পরিবেশক হারিয়ে যায় (এ নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা আছে)।

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে চলচ্চিত্র নির্মাণের কারণে পাইরেসি সহজ হয়ে যায়। কোনো চলচ্চিত্র মুক্তির এক সপ্তাহ বা কখনো কখনো তারও কম সময়ের মধ্যে তা ইন্টারনেটে চলে আসা শুরু হয়। এটা প্রযোজকদের ভয়াবহ সমস্যায় ফেলে। এই সময় যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়টি আলোচনায় আসে। যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত কয়েকটি চলচ্চিত্র বেশ ব্যবসাও করে। কিন্তু সঠিক নীতিমালার অভাবে এই ধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণ নিয়ে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

৬.৭.১) প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ নিয়ে বিতর্ক

নানা সংকটের ফল হিসেবে দশকজুড়ে সারাদেশে একের পর এক প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হতে থাকে। ১২০০ প্রেক্ষাগৃহ কমে হয় ৪৫০টি। সেখান থেকে প্রতি মাসে এর সংখ্যা কমতে থাকে। এই অবস্থায়

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্প ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। কথা উঠে প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ নিয়ে। এ নিয়ে দুই ধরনের মত পাওয়া যায়। সেই বিতর্কে যাওয়ার আগে দেখা দরকার প্রেক্ষাগৃহের বর্তমান পরিস্থিতি কী? যশোরের 'মণিহার'-এর মালিক জিয়াউল হক মিঠু বলেন,

> বাংলাদেশে একের পর এক সিনেমাহল যেভাবে বন্ধ হচ্ছে, একদিন 'মণিহার'ও বন্ধ হয়ে যাবে। 'মণিহার' এখনো টিকে আছে, এর কারণ হলো, সিনেমাহল ছাড়াও এর অনেক কিছু আছে। 'মণিহার' একটা কমপ্লেক্স—এর আরো অনেক ব্যবসার কারণে সিনেমাহল ভালো না চললেও অন্যদিক থেকে এর খরচটা চলে আসে। এই কারণেই এটা টিকে আছে, তাছাড়া এতোদিন বন্ধ হয়ে যেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২১)।

নওগাঁর পত্নীতলার 'রংধনু'র সামনের দোকানি আব্বাস আলী বলেন, 'সিনেমাহলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যবসার অবস্থাও এখন খারাপ। তখন সিনেমাহলকে ঘিরে ১৯টি দোকান ছিলো। সেই দোকানদাররা মিলে সমিতিও করেছিলো। এখন সিনেমাহলের সামনে মাত্র দুটি দোকান। তাও ভালো চলে না (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৫)।' আব্বাসের কথার মিল পাওয়া যায় সিলেটের নুরুল ইসলামের কথায়। তিনি বলেন, 'আগে আমার ছোটো দোকানে এক প্যাকেট করে গোল্ড লিফ নিয়ে আসতাম, সেই সিগারেট দর্শকের ভিড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যেতো। আবার নিয়ে আসতাম। আর এখন অর্ধেক দিন লাগতেছে এক প্যাকেট সিগারেট বিক্রি করতে। আগে এক ফ্ল্যাস্ক চা দিয়ে এক শো চলতো, এখন সারা দিন চলে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৫)।'

প্রেক্ষাগৃহের সার্বিক পরিস্থিতি যখন এই, এবার এর ভিতরের পরিবেশ নিয়ে কথা বলা যাক। এটা অনেকখানি ঠিক যে দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোর পরিবেশ সেই ৮০'র দশক থেকেই পড়তির দিকে। খুব বেশি সংস্কার হয়েছে সেটাও বলা যায় না। তবে এর পিছনে নানা কারণও আছে। এ ব্যাপারে প্রেক্ষাগৃহ মালিক সমিতির নেতা সুদীপ্ত কুমার দাস বলেন,

> প্রদর্শকরা অনুভব করে কারিগরি উৎকর্ষতার এই যুগে আধুনিক প্রযুক্তি ও দর্শকের আরামের ব্যবস্থা করা ব্যবসায়িক স্বার্থেই প্রয়োজন। কিন্তু দেড় যুগ ধরে মানসম্মত ছবির অভাবে লোকসান গুনে সিনেমা হল সংস্কার কীভাবে সম্ভব? এ জন্য ছবি আমদানি এবং বিদেশী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গিয়ে মানসম্মত ছবি নির্মাণ করলে হল মালিকরা দর্শক পেয়ে ঋণ করে হলেও সব সিনেমা হল আধুনিক করতে সাহস পাবে এবং সিনেমা হল বন্ধ রোধ ও নতুন সিনেমা হল নির্মাণ শুরু হবে' (দাস, ১৬ এপ্রিল ২০১৮)।

সুদীপ্ত কুমারের আলোচনায় প্রেক্ষাগৃহের সঙ্কটটা পরিষ্কার হয়। এই তর্কটা অনেকটা 'ডিম আগে, না মুরগী আগের' মতো। মানে **প্রেক্ষাগৃহ আগে ঠিক হবে, না চলচ্চিত্রের মান?** যদিও ভালো চলচ্চিত্র হলে দর্শক যেকোনো পরিস্থিতিতেই তা দেখে, দেখেছে। এ নিয়ে খুলনার 'শঙ্খ'-এর চলচ্চিত্র প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম বলেন,

> অনেকে বলে সিনেমাহলের পরিবেশ খারাপ। সেজন্য দর্শক আসে না। এটা ভুল কথা। আমি চ্যালেঞ্জ করবো, সিনেমাহল দেখতে লোক যায় না, সিনেমা দেখতে লোক যায়। আপনার সিনেমা যদি ভালো হয়, তাহলে সিনেমাহলে সিট না থাকলেও দর্শক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিনেমা দেখবে। *আয়নাবাজি* এই সিনেমাহলে মানুষ দেখে নাই! তাহলে সমস্যা কোথায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২২) !

নজরুল ইসলাম আরো বলেন,

> শোনেন, সিনেমাহলে যদি একটা বাথরুম, একটা সিট নাও থাকে; আপনি সিনেমা আনেন, সেই সিনেমা যদি হিট হয়; তাহলে মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিনেমা দেখবে; নিজেরা পেপার বিছিয়ে বসে সিনেমা দেখবে। আমি আবারো বলতেছি, আপনি শোনেন, সিনেমাহল কোনো ব্যাপার না। সিনেমাহল যতো উন্নতই করেন, যদি সিনেমা না থাকে, তাহলে সেটা দিয়ে কী লাভ (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২২)?'

একই ধরনের কথা বলেন বরিশালের শেখ মাসুম, 'ভালো সিনেমাহলে অবশ্যই দর্শক আসবে। অনেকে বলে সিনেমাহলের পরিবেশ নাই, এটা ভুল। কারণ ব্যবসা ভালো হলে সিনেমাহলের অবস্থা এমনি ভালো হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২)।' খুলনার মো. হালিম একটু ভিন্ন কথা বলেন, 'সিনেমাহলের সিট, লাইট, সাউন্ড ভালো না। এটা দেখার পর তাদের তো সিনেমাহলের প্রতি আর কোনো আকর্ষণ থাকবে না। এখন হলমালিককেও দোষ দেওয়ার কিছু নাই। কারণ তারা প্রত্যেকটা সিনেমা লোকসান দিয়ে চালাচ্ছে। তারা যে কিছু টাকা ইনভেস্ট করবে, কোন সাহসে। এখন তো সিনেমাই নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৬)।' ময়মনসিংহের বিপ্লব হোসেন বলেন,

> মূল কথা, সিনেমা হলো বিনোদন। আপনি যদি সিনেমা দেখে বিনোদন না পান, তাহলে আপনি সিনেমাহলে আসবেন কেনো! এখানে *আয়নাবাজি*র প্রতিনিধি ছিলাম আমি। শুক্রবারে বিক্রি হয়েছে ৫০ হাজার, শনিবারে ৬০ হাজার, রবিবারে গিয়ে ৮০ হাজার, মঙ্গলবারে সেল হয়েছে এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা। দিনের পর দিন বিক্রি বাড়ছে। অগ্রীম টিকেট নেওয়ার জন্য দর্শক এসে কতো হাউ-কাউ করছে। এই ভাঙাচোরা 'ছায়াবাণী'তেই কিন্তু সেটা হয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৪)।

ময়মনসিংহের বিপ্লব হোসেন আরো বলেন, "আরেকটা সিনেমা ছিলো *ভালোবাসার রঙ*। এই সিনেমা কোনো সিনেমাহল থেকে দুই মাসের আগে নামানো যায় নাই। 'ছায়াবাণী'তে এক মাস সাত দিন চলছে *আয়নাবাজি*। ডিসি, এসপি, জজ সবাই আসছে সিনেমা দেখার জন্য। এই ধরনের সিনেমা বানাতে হবে, তাহলে পাবলিক এমনি হলমুখী হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৪)।" কুড়িগ্রামের দেবলাল রজক দেওয়ান বলেন,

> যদি *মনপুরা*র মতো সিনেমা করা যায়, তাহলে দর্শক আবার আসবে। ২০০৯-এর দিকে *মনপুরা* চালালাম; বিশ্বাস করবেন না, যারা গত ২০ বছর সিনেমাহলে আসে নাই, তারা এই সিনেমা দেখতে আসছে। সেই পরিষ্কার সিনেমা! কিন্তু সেই সিনেমা আর হচ্ছে না। *মনপুরা*র লোকেশনগুলো কী সুন্দর, ক্যামেরাম্যানও ঠিকঠাক মতো সব ছবি তুলছে। এই *মনপুরা* আমাদের সিনেমাহলে ২৯ দিন

> চলছিলো। সেই সময় ডিসি, এসপি সাহেবরা মানে যতো ভালো মানুষ আছে তারা সবাই এই সিনেমা দেখছে। তার মানে সিনেমার মান ভালো হলে তা দর্শক অবশ্যই দেখবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৮)।

খুলনার নজরুল ইসলাম প্রেক্ষাগৃহের সংস্কার নিয়ে আরো যুক্তি দেন এভাবে—"এই যে ঢাকায় 'শ্যামলী' সিনেমাহল আছে না, ওটা তো উন্নত মানের, তাহলে সেখানে লোক যায় না কেনো! কারণ সিনেমা নাই; যেগুলো আছে, সেগুলোতে গল্প নাই। এটাই হলো মেইন কথা (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৯)।"

তবে ভিন্ন কথাও আছে। ময়মনসিংহের 'পূরবী'র দর্শক এনামুল হক বলেন, 'সিনেমাহলের অবস্থাও ভালো না। সিনেমার অনেক সংলাপ বোঝা যায় না। কেবল নামেই ডিজিটাল হয়েছে, কিন্তু ভিতরে ডিজিটালের ছাপ নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১৪)।' যশোরের 'মণিহার'-এর চলচ্চিত্র প্রদিনিধি মাসুদ বলেন, 'বর্তমানের দর্শক কিন্তু রুচিশীল। তাই কেবল ভালো সিনেমা বানালেই চলবে না; সঙ্গে সিনেমাহলের পরিবেশও ভালো করতে হবে। এই প্রজন্ম ভালো পরিবেশও চায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৩৩)।' তবে যশোরের শামীম আনোয়ার মনে করেন,

> ভালো সিনেমা যদি আসে; তাহলে দর্শক আবার ফিরে আসবে। টেলিভিশন, ইন্টারনেটে দর্শক সিনেমা দেখতেছে, সেখানে কিন্তু দর্শক তিন ঘণ্টা সময় কাটায় না। এখন বেশিরভাগ মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে সিরিয়ালে। তারপরও আমার মনে হয়, সিনেমার প্রতি দর্শকের আগ্রহ আছে, সেটা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। একটা বিষয় আপনি খেয়াল করেছেন কিনা, এখন কিন্তু নীচে আমাদের খুব একটা দর্শক হয় না। সবাই উপরে মানে ডিসি'তে সিনেমা দেখে। সিনেমার দর্শক শ্রমিক হলে সেও উপরে দেখতে চায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২০)।

ফলে চলচ্চিত্রের মান ভালো না করে প্রেক্ষাগৃহ ভালো করলেই হবে না। চলচ্চিত্র ব্যবসা করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রেক্ষাগৃহ ঠিক হয়ে যাবে—সুদীপ্তের এ বক্তব্যে নিঃসন্দেহে যুক্তি আছে। তারপরও বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহগুলোর যে অবস্থা, তার থেকে কিছুটা হলেও উত্তরণ প্রয়োজন। গবেষণা মাঠ হিসেবে সারাদেশের প্রেক্ষাগৃহ ঘুরে এগুলোর অবস্থা খুব বেশি ভালো মনে হয়নি। বেশিরভাগ প্রেক্ষাগৃহে দর্শক সুবিধার ন্যূনতম ব্যবস্থাও নেই। অথচ সময়ের সঙ্গে দর্শক রুচির পরিবর্তন হয়েছে। রংপুরের শাহাবুদ্দীন মোল্লা বলেন,

> চলচ্চিত্র হলো যৌথ মাধ্যম। এখানে অনেক লোক জড়িত থাকে। সিনেমাহলের লোক হিসেবে আমাদেরও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেমন, সিনেমাহল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, দর্শকের দিকে নজর রাখা, দর্শককে নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আমি পরিবার নিয়ে এসে যদি সমস্যায় পড়ি, তাহলে তো আমি আর আসবো না। এসব ঠিকঠাক মতো চলার জন্য সবার আন্তরিকতা থাকতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২০)।

রংপুরের তসলিম উদ্দিন বলেন, 'সিনেমার সঙ্গে এখন শিক্ষিত লোকজন যুক্ত হতে হবে। শিক্ষিত লোকজন ছাড়া ভালো সিনেমা বানানো যেমন সম্ভব না, সিনেমাহলের লোকজনকেও শিক্ষিত হতে হবে।

তাদেরকে জানতে হবে একজন দর্শকের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২৪)।'

তবে প্রেক্ষাগৃহ সংস্কারে সরকারের ঋণ দেওয়ার বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন না রংপুরের শাহাবুদ্দীন মোল্লা। তার মতে,

> মাঝে শুনলাম সংস্কারের জন্য সরকার ঋণ দেবে। তাতে খুব বেশি লাভ হবে বলে মনে হয় না। তাতে খালি মালিকের পকেট ভারি হবে। তবে ঋণ দিয়ে তদারকি করতে হবে, যেনো সেই টাকায় কাজ হয়। আর সিনেমাহলের যে বয়স, তাতে আসলে এটা সংস্কার করাও কঠিন। আর সবচেয়ে বড়ো কথা সিনেমা না থাকলে, এগুলো করে কী হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২০)।

মোটকথা চলচ্চিত্র ও প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ দুটোই প্রয়োজন। এটা হাতের এপিঠ-ওপিঠের মতো অপরিহার্য। ঢাকায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত দর্শকের চলচ্চিত্র দেখার জন্য তো কয়েকটি সিনেপ্লেক্স রয়েছে, সেগুলোও যে খুব ভালো ব্যবসা করছে এমন নয়, কারণ সেগুলোতে বেশিরভাগ সময় চলে বিদেশি চলচ্চিত্র। ফলে একক প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ আর অনেকগুলো সিনেপ্লেক্স হলেই যে অবস্থার রাতারাতি পরিবর্তন হবে, বিষয়টা মোটেও এতো সহজ নয়।

৬.৭.২) **বিচিত্র দর্শক মন**

'দর্শকের মন বোঝা বড়ো দায়। কোথায় কোন পরিস্থিতিতে তারা আগ্রহী হবে, সেটা আন্দাজ করা একটু কঠিনই। সময়ের সঙ্গে নানা দিকে নানা ভঙ্গিতে তারা বিস্তার করে। তবে একটা বিষয়ে অনেকে একমত হয়েছেন যে, ভালো চলচ্চিত্র হলে কীভাবে যেনো দর্শক সেটা বুঝে যান; তখন তারা প্রেক্ষাগৃহে আসেন। আবার এটাও ঠিক জবরদস্তি নয়, দর্শকের পছন্দকে সম্মান করতে হয় এবং তাকে বেছে নেয়ার সুযোগও দিতে হয়।' আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত থেকে দর্শক সম্পর্কে এমন ধারণা পাওয়া যায়। খুলনার নাঈম বলেন,

> এখন তিন ক্যাটাগরির সিনেমা বানাতে হবে—সামাজিক, দেশের কাহিনি আর কমার্শিয়াল। মনে করেন তিনটা সিনেমাহলে তিনটা সিনেমা লাগবে; আপনার যেটা মনে চায় আপনি সেটা দেখবেন। আপনি আমারে জোর করে বিরিয়ানি খাওয়াবেন, আমিতো সেটা খাবো না। আমি তো সাদা ভাত খাবো, কেউ খিচুড়ি খাবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৭)।

যশোরের নজরুল ইসলাম সোহেল বলেন,

> আগে এক সপ্তাহে তিন-চারটা সিনেমা মুক্তি পেতো। যশোরে পাঁচটা সিনেমাহল ছিলো; সেখানে চলতো। দর্শক পছন্দ মতো সিনেমা বেছে নিতো। তখন সিনেমাহল মালিকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লাগতো, কে কতো ভালো সিনেমা আনতে পারবে। দর্শকও ইচ্ছে মতো এসব সিনেমা দেখতো। ডিপজলের *কোটি টাকার কাবিন*

> আনা নিয়ে এখানে সমস্যা হয়েছিলো। তখন লাস্টে আমরা সিনেমাটা ছেড়ে দিই। সিনেমাটা অবশ্য ব্যবসা করেছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২৬)।

শ্রীমঙ্গলের অসেন দাশ বলেন, 'আমার আশ্চর্য লাগে, ভালো সিনেমা আনলেই কীভাবে যেনো সিনেমাহলে দর্শক চলে আসে। ভালো সিনেমা বছরে আসে সব মিলে দুইটা। দুইটা সিনেমা দিয়ে কি আর সিনেমাহল টেকানো সম্ভব (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.২০)!' রাজশাহীর আখলাক বলেন, 'চলচ্চিত্রের দর্শক বাড়ার একটি অন্যতম কারণ হলো দর্শক নিজে। একজন দর্শক চলচ্চিত্র দেখে বাইরে গিয়ে ভালো বললে, অন্যরা তা দেখতে উৎসাহিত হয়। সিনেমার ব্যবসা মূলত এভাবেই হয় (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১৭)।'

খুলনার মহিউদ্দিন আহমেদ পান্না মনে করেন,

> এতো কিছুর পরও ভালো সিনেমা হলে কিন্তু দর্শক আসে। এই যে কিছু দিন আগে *আয়নাবাজি* চালানো হলো, এটা অন্য ধাঁচের সিনেমা ছিলো। তখন যে দর্শক সিনেমাহলে আসছে, এরা আগে কখনোই তারা সিনেমাহলে আসে নাই। এই 'সঙ্গীতা'তেই সাত সপ্তাহ চলছে *আয়নাবাজি*। এরকম সিনেমা বানালে, সিনেমাহল চলবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৫)।

খুলনার 'সঙ্গীতা'র দর্শক কামরুল ইসলাম বলেন,

> *মনপুরা* বলে একটা সিনেমা আসছিলো; কী বলবো আপনাকে টানা চার মাস এই সিনেমাহলে চলছে। তখন এই সিনেমাহলে লোকজনকে আমরা বলেছিলাম, কীরে ভালো সিনেমার দর্শক নাকি নাই? তোরা খালি শাকিব খানের সিনেমা আনিস, ১০–১৫ জন দর্শক হয়। তারপর সিনেমা নামাইয়া দিস। ভদ্র সিনেমা হলে ভদ্র দর্শক অবশ্যই আছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১০)।

সংকটের মধ্যেও একটা চলচ্চিত্রকে কীভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তার বর্ণনা করেন নওগাঁর সমীর কুমার মণ্ডল। তার ভাষ্যমতে,

> দর্শক আনার জন্য আমি এখানে অনেক চেষ্টা করেছি। একটা সিনেমা ছিলো *চুড়িওয়ালা*; ফেরদৌস আর ইন্ডিয়ান নায়িকা মনিকা দেবি। ওই সিনেমা আনলাম, মেয়ে-ছেলেরা তো আসলো না। আমি এই এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকিট দিয়ে আসছি। বলেছি, যান আপনারা সিনেমাহলে গিয়ে সিনেমাটা দেখেন; যদি ভালো লাগে তাহলে সিনেমা দেখে টাকা দিয়ে আসবেন, না হলে দেওয়া লাগবে না। এতে কাজ হয়েছিলো; বেচাকেনা হয়েছিলো অনেক (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

দর্শক যে আসলেই রহস্যময় তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন প্রখ্যাত নির্মাতা, কাহিনিকার, প্রযোজক দেলোয়ার জাহান ঝন্টু। তার ভাষ্যমতে,

> চলচ্চিত্র ও তার দর্শক কী জিনিস এটা কল্পনাই করতে পারবা না। তোমাকে একটা ঘটনা বলি *সবুজ সাথী*র। শাবানা-জসিম ভাইবোন—সবুজ আর সাথী। সৎ মায়ের ঘরে বড়ো হয়েছে। তাদের সৎ ভাই আছে, ভাইটা

দুশ্চরিত্র। ওই ভাই একদিন শাবানার গায়ে হাত দিছে। এই কথা শাবানা ভাইকে বলছে। জসিম গিয়ে সেই সৎ ভাইকে তিনটা ঘুষি মারছে। আমি সিনেমাহলে সেদিন সিনেমা দেখতেছিলাম। জসিম ঘুষি মারার সঙ্গে সঙ্গে ওই ছেলে ছিটকে পড়ছে, পুরো সিনেমাহল তালি দিয়ে ফাটাইয়া ফেলছে, আর চিৎকার—মার মার, আরো মার। আনোয়ার হোসেন এদের বাবা; উনিদেখে বড়ো ছেলে ছোটো ছেলেকে মারতেছে। উনি জসিমকে একটা থাপ্পড় মারে। পাবলিক তখন কী করছে জানো, চিৎকার করে জসিমকে বলতেছে—ওই শুয়োরের বাচ্চারে (বাবা আনোয়ার হোসেন) এবার মার। আমার নিজের কানে শোনা। এবার তুমি ভাবো, অডিয়েন্স কোথায়, কোন জায়গায় অবস্থান করে—বাবাকে মারতে বলতেছে! তাদের প্রশ্ন তুই (বাবা) জিজ্ঞাসা না করে জসিমরে মারলি ক্যান? দর্শক হলো এই জিনিস! তারা কোন জিনিস পছন্দ করে এটা বলা যেমন সহজ, আবার খুব কঠিন (আখ্যানের ক্রম ৫.৪; ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

খুলনার মো. নাসিম বলেন, দুই-একটা সিনেমা বানাইয়ে দর্শককে মাঝে মাঝে সিনেমাহলে আনলে চলবে না। রেগুলার আনতে হবে। তা না হলে এ সেক্টর শেষ (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩)।' তবে কুড়িগ্রামের হাবিবুর রহমান টিটু দর্শক নিয়ে ভিন্ন কথা বলেন। তার ভাষ্য হলো, 'মানুষের এখন এক টানা তিন ঘণ্টা সময় দেওয়ার সময় নাই। সবাই এখন ব্যস্ত। এখন সবার চিন্তা, পয়সা কোন দিক দিয়ে আসবে সেটা নিয়ে। বিনোদন নিয়ে কেউ চিন্তা ভাবনা করছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৬)।' দর্শক ও চলচ্চিত্র নিয়ে একেবারে ভিন্ন ধরনের সংকটের কথা বলেন কুড়িগ্রামের রবিউল। তার ভাষ্যমতে,

এখনকার সিনেমা দেড়–দুই ঘণ্টার। ১২টার শো দুইটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এক শোয়ের দর্শকের সঙ্গে আরেক শো দর্শকের দেখা হয় না। দর্শক যদি দর্শককে না দেখে, তাহলে সিনেমার ব্যবসা হবে না। দর্শক দেখেই তো দর্শক সিনেমা দেখতে আগ্রহী হয়। সিনেমা কমপক্ষে আড়াই ঘণ্টা না হলে হয়! দর্শক এসে একটু ঘোরাঘুরি করে সিনেমা দেখতে ঢুকে গেলো। কিন্তু সেই অবস্থা নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১০)।

আসলেও চলচ্চিত্রের দর্শকের বৈচিত্র্য বোঝা একটু কঠিন। নানা পরিপ্রেক্ষিত থেকে নানা দিক বিবেচনা করে দর্শককে বিশ্লেষণ করতে হয়। এখানে সময়, কাল যেমন একটা ব্যাপার, সংস্কৃতি, দর্শকের বয়স, আর্থ-সামাজিক অবস্থান সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। এসব কিছু ভিন্ন ভিন্ন দর্শককে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে প্রভাবিত করে। দর্শকের নানামুখী চরিত্র নিয়ে নির্মাতা কামার আহমাদ সাইমনের কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তার ভাষ্যমতে,

'সোসাইটি'তে কিছু দর্শক সিনেমাহলে বারবার ফেরত যায়, যেটা আপনি আপনার মায়ের কথা বলছেন কিংবা আমিও আমার মা-খালাদের কাছ থেকে শুনেছি। এরা কিন্তু ফিক্সড দর্শক, এরা এইজ ওপর নির্ভর করে না। এরা টানা সব ধরনের সিনেমা দেখে। এই দর্শকটা আমরা এখন পাচ্ছি না। আরেক ধরনের দর্শক আছে যারা ট্রেন্ডি দর্শক। যেমন, সালমান শাহ ট্রেন্ড, কখনো মান্না ট্রেন্ড। ট্রেন্ডের সঙ্গে যে দর্শক যায়, তাদের কিন্তু বয়স ও ইনকাম গ্রুপের সঙ্গে একটা কানেকশন আছে। মানে আমার পকেটে যখন কাঁচা টাকা থাকে এবং ওই বয়সে যে ট্রেন্ড হয়, আমি তাকেই ফলো করি। এই দর্শক সব সময়ই ফ্লটিং (আখ্যানের ক্রম ৫.২; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

দর্শকের চরিত্র বিবেচনায় সংস্কৃতির ওপর জোর দেন কামার আহমাদ। এটা দেশ কাল ভেদে নানা ধরনের হতে পারে। তিনি বিষয়টি পরিষ্কার করেন এভাবে—

> যে ফিক্সড দর্শকের কথা আপনি বলছেন, যেটা সাধারণত কালচারের কারণেতৈরি হয়; যেমন দক্ষিণ ভারতে রজনীকান্তের একটা সিনেমা রিলিজের সময় যে ঘটনাগুলো ঘটে, এর সঙ্গে কিন্তু ৭০ বছরের পৌঢ় থেকে ১৫ বছরের কিশোর, শিশু সবাই জড়িত। এক ধরনের কালচারকে ওরা কন্টিনিও করছে বলেই ৬০ বছরের লোকটা যে সিনেমা দেখতে চাচ্ছে, ১৫ বছরের একজনও সেই সিনেমাই দেখছে। অথচ তারা কনটেন্ট হিসেবে দেখছে *রোবট*-এর মতো একটা ছবি! এটা কিন্তু একটা কালচারের ব্যাপার—এটা একেবারে ভিন্ন একটা জিনিস (আখ্যানের ক্রম ৫.২; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

দর্শকের এই সংস্কৃতি কিন্তু তার চর্চার মধ্যে থাকতে হয়। সাইমন একটা পার্কের উদাহরণ দেন। যেকোনো একটা পার্কে যদি সব সময় লোকজন যায়, ওই পার্কে নিরাপত্তার সমস্যা হয় না; গাজার আসর বসে না, দেহ ব্যবসা হয় না। লোকজন না গেলেই কিন্তু সমস্যা হয়। সাইমনের ভাষ্যমতে,

> সিনেমাহলগুলো যখন উঠতির দিকে ছিলো, তখন এগুলো ঠিকই দর্শককে আকর্ষণ করেছে। নারী দর্শক পৌনঃপৌনিক হারে রিভার্স করেছে। পরে যখন ছবি কমে গেছে, নারীরাও কমে গেছে। এবার ধরেন ফেনসিডিলের ব্যবসা শুরু হয়েছে, নারীরা আরো কমে গেছে। এফ ডি সি'তে একসময় ডিক্লিয়ার দিয়ে রিকশাওয়ালাদের জন্য সিনেমা বানানো হয়েছে। ফলে নারী দর্শক, অন্যান্য দর্শক আরো কমে গেছে। ফলে এখানে কিন্তু বহুমুখী ঘটনা ঘটেছে (আখ্যানের ক্রম ৫.২; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

৬.৭.৩) **প্রযোজক, পরিবেশক এবং প্রেক্ষাগৃহ**

যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র, মান সম্পন্ন চলচ্চিত্রের অভাব, প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ খারাপ, এগুলোর কারণে চলচ্চিত্র ব্যবসায় যেমন মন্দা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে; ঠিক একই সঙ্গে আরো কিছু কারণ রয়েছে, যার ফলে কোনো কোনো চলচ্চিত্র ব্যবসা সফল হলেও প্রযোজকরা সেখান থেকে খুব বেশি মুনাফা পাচ্ছেন না। পরিচালক সমিতির মহাসচিব বদিউল আলম খোকন বলেন,

সিনেমা ব্যবসার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে রিপ্রেজেন্টেটিভ, যাদের পরিবেশকের তরফ থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়। কথা থাকে প্রযোজকের লোক হিসেবে কাজ করবে তারা, কিন্তু তারা হয়ে যায় সিনেমা হলের লোক। ৫০ [টি] টিকিট বিক্রি হলে তারা দেখায় ৩০টি। বাকি টিকিটের টাকা হল মালিক ও তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন কর দেখিয়ে অনেক টাকা কেটে নেওয়া হয়। ৮০ টাকা মূল্যের টিকিটের প্রবেশ মূল্য ১২ টাকা। এই ১২ টাকা থেকে প্রযোজকের পাওয়ার কথা ছয় টাকা। এর মধ্যে আবার জাজ মাল্টিমিডিয়ার তিন টাকা। এরপর সপ্তাহ হিসেবে প্রযোজককে দিতে হয় প্রজেক্টর ভাড়া (জামান, ১৫ মার্চ২০১৮)।

ফলে এই পরিস্থিতিতে প্রযোজকের পক্ষে প্রেক্ষাগৃহ থেকে টাকা তুলে আনা খুবই কষ্টকর হয়ে যায়। এই সমস্যা সময়ের সঙ্গে আরো প্রকট হয়েছে। ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেনের কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তার ভাষ্যমতে,

> আমাদের এখানে বেশিরভাগ সিনেমা চলে পার্সেন্টেজের ভিত্তিতে। ফলে প্রত্যেক সিনেমায় প্রযোজকের পক্ষ থেকে একজন করে লোক থাকে সিনেমাহলে। ওই লোকই মূলত সিনেমার যাবতীয় বিষয় দেখাশোনা করে।

> ওই লোকই যাবতীয় হিসাব মানে কতোজন লোক আসলো, কতো টাকা টিকিট বিক্রি হলো—এর সবকিছুর হিসাব রাখেন। এখন ওই লোক যদি সিনেমাহলের সঙ্গে যোগসাজশ করে কিছু অংশ কেটে রাখে, তাহলে তো আমাদের কিছু করার নাই। কারণ ওই লোক তো প্রযোজকের নিজের (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।

তবে এসব কথার প্রতিবাদ জানান রাজশাহীর 'উপহার সিনেমা'য় প্রতিনিধি হিসেবে আসা এম এ মোমিন রাঙ্গা। তার ভাষ্যমতে,

> সিনেমা চলুক আর না চলুক তাতে প্রতিনিধির কিছু আসে যায় না। তার খরচা দিতেই হবে। আবার যখন ভালো চলবে, আপনি হয়তো এক লক্ষ টাকা এম জি দিয়ে কোনো সিনেমা নিয়ে আসছেন, ব্যবসা করছেন তিন লক্ষ টাকা, তখন তো আপনি আমাকে বেশি টাকা দিবেন না। তখনো আপনি আমাকে ওই একশো ৫০ টাকাই দিবেন। তাই আমাদেরকে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রত্যেক প্রযোজকই দেয়, এটা জোরের কিছু নয় (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৬)।

মোমিন রাঙ্গা তার রোজগারের হিসাব দিয়ে আরো বলেন,

> আমি এখানে ('উপহার') প্রতিদিন একশো ৫০ টাকা করে পাচ্ছি। এখন বলেন, এই একশো ৫০ টাকায় আমার চলবে? চলবে না। তাই সিনেমাহল মালিক আমাকে প্রতিদিন খাওয়া বাবদ দিচ্ছে তিনশো টাকা করে। তাহলে কতো হলো—চারশো ৫০ টাকা; আর ওই যে বললাম প্রত্যেক টিকিট থেকে হলমালিক বিভিন্ন খাতে দুই টাকা করে পায়, সেখান থেকে আমি আরো ২৫ শতাংশ পাই। এইসব দিয়ে সিনেমাহল থেকে আমি যে বিলটা পাই সেটা আর খরচ হয় না। তবে সিনেমাহল থেকে যে তিনশো টাকা খাওয়া বাবদ দেওয়া হয়, সেটা কিন্তু পুরোটাই সিনেমাহল মালিক দেয় না। এর অর্ধেক প্রযোজক, অর্ধেক হলমালিক দেয় (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৬)।

এখন এই বাস্তবতায় প্রযোজকের কাছে খুব সামান্য টাকাই পৌঁছে। ফলে দৃশ্যত চলচ্চিত্র ব্যবসা সফল হয় ঠিকই, প্রযোজক আর টাকা পায় না। আর প্রযোজক পুঁজি ফেরত পাওয়ার পাশাপাশি মুনাফা না পেলে পরবর্তী চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করতে পারে না। এদিকে প্রতি সপ্তাহে নতুন চলচ্চিত্র না থাকলে আবার প্রেক্ষাগৃহ চলে না। এই পুরো পরিস্থিতির জন্য প্রযোজক-পরিচালক এবং প্রেক্ষাগৃহ মালিকরা দায়ী। তারা কোনো না কোনোভাবে এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত। চলচ্চিত্রের এই সংকট বর্ণনা করেন নেত্রকোণার অজয় সরকার বলেন,

> নতুন সিনেমা না থাকায় পরদিন শুক্রবার থেকে সিনেমাহল বন্ধ হয়ে যাবে। যে সিনেমাটা এখন চলছে, সেটা যদি আমরা আগামী এক সপ্তাহ চালাই, তাহলে আরো লোকসান হবে। তাই লোকসানের মাত্রা কমানোর জন্য আমরা আজকের পর সিনেমাহল বন্ধ করে দিবো। আবার নতুন ভালো সিনেমা আসলে আমরা এটা চালাবো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৩২)।

কুষ্টিয়ার 'বনানী'র চলচ্চিত্র প্রতিনিধি রাজন আহমেদ এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে বলেন,

> ঢাকা শহরে এখন পার্সেন্টেজে সিনেমা চলছে, একশো টাকার একটা টিকেট বিক্রি করলে প্রডিওসার পায় ৪৪ টাকা। বাকি টাকা বিভিন্ন খাতে খরচ দেখানো হয়। আমার মনে হয়, ঢাকায় যদি এমজি (গ্যারান্টি মানি) প্রথা

চালু করে তাহলে সেখান থেকে কিছু টেবিল মানি উঠে আসতে পারে। এতে প্রোডিওসারদের কিছু লাভ হতো। এতে করে যেটা হবে সিনেমার মান কিছুটা বৃদ্ধি পাবে, প্রোডিওসাররা নতুন সিনেমা বানাতে আগ্রহী হবে এবং বাজেটও বাড়বে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫১)।

এছাড়া বুকিং এজেন্টরাও বর্তমানে চলচ্চিত্র ব্যবসায় বড়ো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে। এই মধ্যসত্ত্বভোগীরা নানাভাবে প্রযোজকদের ঠকায়। প্রযোজক সমিতির নেতা খোরশেদ আলম খসরু বলেন,

> দেশে এখন সব মিলিয়ে হল আাছে তিন শ, রেগুলার আড়াই শ। এর মধ্যে মাত্র ২৪ জন হল মালিক নিজে এসে দরদাম করেন। বাকিগুলো চালায় বুকিং এজেন্ট। তাদের মধ্যে সিন্ডিকেট। এরা ভাগ করে নেয়, এ ছবিটা আমরা করব, খবরদার কেউ যাবা না। অপজিশন যাবে না। ফলে তারা ইচ্ছেমতো দাম ধরতে পারে। যা দেয় তাই নিতে হয়। হলিউডে এ সিস্টেম ছিল ৩০ বছর আগে (জামান, ১৫ মার্চ ২০১৮)।

প্রেক্ষাগৃহ মালিকরাও বুকিং এজেন্ট নিয়ে সমস্যায় থাকেন। এ নিয়ে কুষ্টিয়ার 'বনানী'র ব্যবস্থাপক মোখলেছুর রহমান বকুল বলেন, 'বুকিং এজেন্টরা অনেকক্ষেত্রে মালিকদের জিম্মি করে সিনেমাহল ভাড়া নিচ্ছেন (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫২)।' তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন,

> বুকিং এজেন্টরা সিনেমার ব্যবসাটাকে ধ্বংস করে দিলো। এরা সিনেমাহলের মালিক ও সিনেমার মালিকের মধ্যে মধ্যসত্ত্বভোগী হিসেবে কাজ করে। সিনেমা চলার আগেই এরা দালালি করে ১০-১৫ হাজার টাকা রোজগার করে নেয়। এভাবে ওদের এই দালালির কারণে না পাই আমরা টাকা, না পায় সিনেমার মালিক টাকা। এদের দৌরাত্ম বন্ধ করা দরকার (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫২)।

এদিকে বুকিং এজেন্ট সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন আনু (জামান, ১৫ মার্চ ২০১৮) জানান, কিছু বুকিং এজেন্ট আছে, যারা ব্যবসাটা জিম্মি করে রেখেছে। তবে ভালো চলচ্চিত্রও নেই, ফলে প্রেক্ষাগৃহ চলে না ঠিকমতো। তারপরও যে পরিমাণ টাকা আয় হয়, তাতে কিছুই থাকে না। তবে বর্তমানের প্রযোজকরাও ঠিক নেই। কে কারটা মেরে খাবে সবাই সেই চিন্তায় ব্যস্ত। অনেকে আছে পাঁচ-সাতটা প্রেক্ষাগৃহে বুকিং করে। ব্যবসার খাতিরে তাদের বাকিতে চলচ্চিত্র দেয়। সিকিউরিটি মানি না নিয়ে বাকি দেওয়া তো সমস্যা। এই নিয়মটা ভেঙেছে প্রযোজক ও তাদের ম্যানেজাররা । সিলেটের রাশেদুল কবির মন্টু বলেন,

> আমরা যখন অ্যানালগে সিনেমা চালাইছি, তখন একটা সিনেমা কিছু দিন চালানোর পর মার্কেট গরম হয়ে যেতো। একই এলাকার তিন-চারটা সিনেমাহল ঢাকায় যেতো একটা সিনেমা আনার জন্য। তখন ওখান থেকে পরিবেশকরা সিনেমাহল বাছাই করতো, কোন হলে ব্যবসা ভালো? চারটি সিনেমাহল থেকে তখন ওটাকে সিনেমা দেওয়া হতো। তখন সে কী কম্পিটিশন! অথচ এখন সিনেমা রিলিজ করলে ওই একটা সিনেমাহল, তাকে দেওয়া ছাড়া তো কোনো উপায় নাই। অনেক সময় সিনেমাহলের মালিকদের ডেকে নিয়ে সিনেমা দিতে হয় (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১১)।

তবে প্রযোজকদের সমস্যার উল্লেখ করেন খুলনার শেখ মোতাহার বলেন,

> আগে যারা প্রেডিওসার ছিলো, তারা সম্মানিত লোক ছিলো; এখন যারা আছে এদের মধ্যে ভদ্রতা, আন্তরিকতা বলে কিছু নাই। আগে আমরাও প্রোডিওসারদের কাছে গেলে তারা সুবিধা-অসুবিধার কথা জানতো, বুঝতো। এখন কোনোভাবে একটা সিনেমা হিট হলে, সেই প্রেডিওসারের অহংকারে থাকা যায় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২)।

তবে পরিবেশকদের দোষ দেন না নির্মাতা দীপংকর দীপন। তিনি মনে করেন, পরিবেশক নয়, দোষ সিস্টেমের।

> নেট সেলের অর্ধেক প্রযোজকের পাওয়ার কথা। কিন্তু এর ভেতর আছে প্রজেক্টর ভাড়া, হল রিপ্রেজেন্টেটিভ, বুকিং এজেন্টসহ অন্যদের টাকা। দিন শেষে ১০০ টাকা মূল্যের টিকিটে আমরা ১৫–২০ টাকা পাই। এটা অনেক বড় বৈষম্য, পৃথিবীর কোথাও এমন সিস্টেম নেই। কত টাকার টিকিট বিক্রি হলো তার স্পষ্ট চেহারা পাওয়ার উপায়ও নেই। ... কাকরাইলে পরিবেশনার জায়গা থেকে অনেক রকম খরচ আছে, সবই প্রযোজককে বহন করতে হয়। সব মিলিয়ে প্রযোজক যদি গ্রস টিকিট সেলের ১৫–২০ শতাংশ টাকা পায়, তাহলে এটাকে কিভাবে লাভজনক জায়গায় নিয়ে যাবে? এ কারণে ছবি সফল হওয়ার পরও প্রযোজকের মুখ কালো থাকে (জামান, ১৫ মার্চ ২০১৮)।

তবে নতুন চলচ্চিত্র মুক্তি ও সেটার ব্যবসা নিয়ে একেবারে নতুন একটি কৌশলের কথা বলেন নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী ও প্রযোজক কাজী হায়াৎ। তার ভাষ্যমতে,

> হয়তো একদিন এমন হতে পারে—মনে করেন আমার *বীর* সিনেমার প্রযোজক বাংলালিংক কিংবা গ্রামীণফোনের সঙ্গে কনটাক্ট করলো যে আপনারা আমাকে এক কোটি টাকা দেবেন, এর বিনিময়ে আপনাদের গ্রাহকদের প্রত্যেকটা সিমে কোনো এক মাসের ১০ তারিখ বেলা ১২টার সময় *বীর* সিনেমার কনটেন্টটা দিয়ে দিবেন। আপনি এই সিনেমাটা আপনার গ্রাহকের সিমে দেওয়ার জন্য ১০–২০ টাকা করে কেটে নেবেন। আপনার দুই কোটি সিম আছে, সেখান থেকে ২০ কোটি টাকা পাবেন আপনি, কিন্তু প্রযোজককে দেবেন মাত্র এক কোটি টাকা। দেখবেন এক সময় এই ব্যবসাও হয়তো হবে (আখ্যানের ক্রম ৫.১; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

সবমিলিয়ে এই ধরনের অপরিচ্ছন্ন ও ভঙ্গুর একটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র ব্যবসায় একজন নির্মাতা, প্রযোজক ও প্রেক্ষাগৃহের মালিককে চলতে হয়। আর এর সামগ্রিক প্রভাবটা গিয়ে পড়ে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির ওপর। ফলে একদিকে চলচ্চিত্র নির্মাণ কমে যায়, অন্যদিকে দর্শক কমে, সঙ্গে বন্ধ হয় প্রেক্ষাগৃহ। ময়মনসিংহের বিপ্লব হোসেন বলেন, 'প্রোডিওসারদের সমস্যা হলো, বাংলাদেশে রিলিজ সিনেমা চলে সর্বোচ্চ ৫০টা সিনেমাহলে; মানে এসব সিনেমাহল থেকে কিছু টাকা পাওয়া যায়। এর বাইরে টাকা পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই। ফলে প্রোডিওসাররাও সমস্যায় আছে, হলমালিকরাও (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৪)।' যশোরের মনিরুল বলেন, 'এই ব্যবসাটা নষ্ট করে দিছে সিনেমার মূল জায়গার লোকজন। এফ ডি সিতে কিছু চক্র ঢুকে ব্যবসাটা নষ্ট করে ফেলছে। সিনেমাহলের কোনো দোষ নাই, দোষ সিনেমার (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৩)।'

প্রযোজকদের ব্যাপারে আরো অভিযোগ হলো, **বর্তমানে কোনো পেশাদার প্রযোজক নেই**। যারা আছেন তাদের ব্যাপারে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মনোয়ারা ফিল্মস এর কর্ণধার আবদুল আলীম বলেন, "এখন বেশির ভাগ প্রযোজক আসেন কালো টাকা সাদা আর ফুর্তি করতে। ... আমার প্রযোজনা সংস্থা থেকে ৩৯টি ছবি নির্মাণ করেছি। সবই ব্যবসাসফল। এসব ছবি থেকে কোটি কোটি টাকা আয় করেছি। এখন আর ঝুঁকির কারণে সাহস হচ্ছে না" (মাজিদ, ৯ নভেম্বর ২০১৫)। ফলে যেটা হচ্ছে চলচ্চিত্র নির্মাণ ভয়াবহভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেন একই ধরনের কথা বলেন,

> এছাড়া অনেক প্রযোজক আছে, সিনেমার ব্যবসা নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নাই। তারা এই নায়িকাদের ব্যবহার করে অন্য কাজ করে। আবার অনেকে শুটিং চলাকালীনই নায়িকাকে দিয়ে তার সিনেমার ইনভেস্টের টাকা তুলে ফেলে। তাদের দিয়ে বড়ো বড়ো কোম্পানির বসদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে ওই সিনেমা দিয়ে ব্যবসা হোক আর না হোক তাতে তার কিছুই আসে যায় না। ফলে সিনেমা রিলিজের পর দেখা গেলো, সিনেমার কোনো আগা-মাথা নেই (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।

কাজী দেলওয়ার আরো বলেন, 'আমি ৭০–৮০'র দশকে যখন পরিবেশনার সঙ্গে ছিলাম, তখন চলচ্চিত্রের যে এক্সট্রারা আছেও তারা কোনো দিন অভিনয়ে সুযোগ পাবার জন্য কোনো প্রযোজকের অফিসে অফিসে ঘোরে নাই। অথচ এখন নায়িকারা প্রযোজকদের অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়ায়। তাদের পোশাকের দিকে তাকানো যায় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।' খুলনার 'লিবার্টি'র মালিক ও প্রযোজক শাহাজান আলী বলেন, 'এখানে ইন্টার্নাল কিছু বিষয় আছে। তারা আসে ঝড়ের পাখির মতো, আর্টিস্টদের নিয়ে আনন্দ-ফূর্তি করে। মনে করেন, তারা কোনো সিনেমায় ৪০ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করলো, ওই টাকা তারা রেখে যায়; আর ফেরত নিতে পারে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩০)।' রাজশাহীর এম এ মোমিন রাঙ্গা আরো পরিষ্কার করে বলেন,

> আগে কোনো প্রযোজক সিনেমা বানালে প্রথমে নায়িকাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হতো, তারপর মহরত হতো। এখন আর সেই মহরত হয় না। এখন নায়িকাকে সিনেমার প্রযোজক-পরিচালক বলে, তুমি আগে আমার সঙ্গে তিন–চার রাত থাকো, আনন্দ-ফুর্তি করি; মহরত পরে হবে। এই চিন্তাভাবনা নিয়ে এখন শতকরা ৭৫ ভাগ পরিচালক-প্রযোজক আসতেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৬)।

ময়মনসিংহের বদিউল আলম চৌধুরী প্রযোজকদের বর্তমান অবস্থাকে বর্ণনা করেন এভাবে—

> আগের যারা প্রোডিওসার ছিলো তারা আসলেই সিনেমার ব্যবসা করতো। কিন্তু এখন যারা প্রোডিওসার তারা আসলে প্রোডিওসার না। তারা আগের সেই প্রোডিওসারের হয় ম্যানেজার, না হলে পিয়ন। এখন ভাবেন পিয়ন আর ম্যানেজার এখন প্রোডিওসার! বিভিন্নভাবে তারা পয়সার মালিক হয়েছে, এখন তারা সিনেমা বানাচ্ছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৫)।

এম এ মোমিন রাঙ্গা বলেন, 'ফিল্মপাড়ায় যারা একসময় লেবার ছিলো তারা আজ প্রযোজক, তারা কী সিনেমা বানাবে বলেন! আমজাদ হোসেন কি আর দ্বিতীয় কেউ হবে? হবে না। এ জে মিন্টু কি আর হবে এদেশে? হবে না। ইবনে মিজানও হবে না। সেই ডিরেক্টর আর এদেশে নাই, তাই সিনেমাও ভালো হবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৬)।' খুলনার নজরুল ইসলাম বলেন,

> রাজনীতির সঙ্গে জড়িত লোকজন নানাভাবে কোটি কোটি টাকা জোরগার করছে। সেই টাকা দিয়ে ওই লোক এখন কী করবে, তাই সিনেমা বানায়। তার উদ্দেশ্য সিনেমা বানানো নয়। তিনি প্রযোজকের সিল লাগাতে চান। এসব প্রযোজক, পরিচালকের কাছে কোনোদিন সিনেমার গল্পও শুনতে চায় না। সে কেবল বলতে চায়, আমার সিনেমার ব্যবসা আছে। অথচ সিনেমা থেকে ওই প্রযোজক কোনোদিন এক টাকাও ফেরত পান নাই। তার তো ওখান থেকে টাকা ফেরত পাওয়ারও দরকার নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৯)।

প্রযোজকদের আরেকটি প্রবণতার কথা বলেছেন নওগাঁর আমিনুল ইসলাম—'আবার অনেক প্রোডিওসার সিনেমায় অভিনয়ও করছে। তাদের হয়তো সিনেমার আশপাশে আসার কথা না, তারাই নায়ক বনে যাচ্ছে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৮)।' যশোরের প্রদীপ দাসও একই ধরনের কথা বলেন,

> এখন অল্প টাকায় সিনেমা তৈরি হচ্ছে। ফলে গল্পের দরকার নাই। কিন্তু সিনেমার ব্যবসা করতে হলে ভালো গল্প, ভালো অভিনেতা থাকতে হবে। আগে সিনেমার প্রতি প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা সবার গুরুত্ব ছিলো। কারণ এতো টাকা দিয়ে সিনেমা বানাবো, সেটা যদি ব্যবসা না করে তাহলে তো আমি শেষ। এখন এতো টাকা খরচ হয় না সিনেমায়। ফলে সেই টাকা ফেরত পাওয়া নিয়ে কারো মাথা ব্যাথা নেই। টাকা যাক, নায়ক তো হলাম; এখন অনেকের এই চিন্তা (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১২)।

খুলনার আনোয়ার হোসেন মনে করেন,

> ২০০০ সালে পর থেকে এখানে ব্ল্যাক মানির ব্যবহার বেড়ে গেছে। আগে যারা ডিরেক্টর কিংবা প্রোডিওসার ছিলো, এরা কিন্তু নিজেদের সিনেমা নিজেরাই করতো। এখন যারা প্রোডিওসার, ডিরেক্টর হয়, এরা যে কখন কোথা থেকে কীভাবে আসে আমরাও জানি না। তারা সিনেমা বানিয়ে রিলিজ করে দিলো; তারপর দেখা গেলো এটা নাটকও না! এই সিনেমা চালিয়ে হলমালিক, প্রোডিওসার মার খেলো; সঙ্গে সিনেমারও একটা ক্ষতি হয়ে গেলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৪)।

রাজশাহীর আখলাক একটু অন্যভাবে বলেন,

> আমার মনে হয় কী ভাই, পোস্টারে যাদের নাম ও ছবি দেখতেছেন মানে এখন যারা সিনেমা বানায়, তারা আসলে জানে না, সিনেমা কতো বড়ো জিনিস। এই যে প্রত্যেক দিন শোনেন না, বিমানবন্দরে সোনা ধরা পড়ে, এইগুলা যারা আনে তারাই মূলত টাকা জায়েজ করার জন্য এই সিনেমা বানায়। কারণ লস করার জন্য গাটের টাকা খরচ করে মানুষ নিশ্চয় এতো ফালতু সিনেমা বানাবে না।

আমিনুল ইসলাম আরো বলেন,

> সিনেমা ব্যবসায় এখন আর আগের সেই পেশাদার প্রোডিওসাররা নেই। আগের প্রোডিওসাররা ইনভেস্ট করতো সিনেমার ওপর, তাদের টার্গেট থাকতো সেখান থেকে মুনাফা আনার। তারা কোনো সিনেমা তৈরির আগে গল্প, স্ক্রিপ্ট, লোকেশন এমনকি পরিচালককে যাচাই-বাছাই করতো। তারা এরজন্য সময় নিতো, বাজার যাচাই করতো, দর্শকের গল্পের চাহিদা বোঝার চেষ্টা করতো; তারপর তারা সিনেমায় টাকা ইনভেস্ট করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১৭)।

তবে চট্টগ্রামের আবদুল আউয়াল মনে করেন, 'প্রযোজকরা কীভাবে এখন সিনেমা বানাবে। কমপক্ষে দুই কোটি টাকা লাগে একটা সিনেমা বানাতে, সেই টাকা তারা তুলবে কীভাবে! সারা দেশে তো সেই টাকা তোলার মতো সিনেমাহলই নাই। আমাদের দেশের বাজার তো খুব ছোটো (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১)।'

৬.৭.৪) বন্ধ প্রেক্ষাগৃহ

প্রদর্শক সমিতির হিসাব অনুযায়ী ২০০০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দেশে বন্ধ হয়েছে ৩০০টি প্রেক্ষাগৃহ (সারণী ৬.১.৩)। ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৫টি জেলা শহর এখন একেবারে প্রেক্ষাগৃহ শূন্য। এসব জেলার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হচ্ছে—নরসিংদী, বরগুনা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঝালকাঠি, নাটোর, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, নড়াইল, মৌলভীবাজার, মাদারীপুর, মুন্সীগঞ্জ, রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার।

সারণী ৬.১.৩ : শূন্য দশকে প্রেক্ষাগৃহ বন্ধের তালিকা

বন্ধের বছর	বন্ধ হওয়া প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা
২০০০ সাল	৩৩
২০০১ সাল	১৫
২০০২ সাল	১৮
২০০৩ সাল	২৪
২০০৪ সাল	১৮
২০০৫ সাল	২৪
২০০৬ সাল	২৭
২০০৭ সাল	৩৬
২০০৮ সাল	৪২
২০০৯ সাল	৪৬
২০১০ সাল	৫০
২০১১ সাল	৯

সূত্র : হকি ও আবদুল্লাহ, ৩ জুলাই ২০১১

পরিবেশক সমিতির নেতা মিঞা আলাউদ্দিন জানান, প্রেক্ষাগৃহ ভেঙে ফেলা শুরু হয়েছিলো ১৯৯৯ সালে, সেটা তৎকালীন সরকারই শুরু করেছিলো (কাদের ও সিদ্দিক, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬)। সরকারিভাবে রাজধানীর 'গুলিস্তান' ও 'নাজ সিনেমা হল' ভাঙার মাধ্যমে প্রেক্ষাগৃহ ভাঙার কাজ শুরু হয়। কথা ছিলো এই দুটি প্রেক্ষাগৃহের জায়গায় বিপণিবিতান এবং তার ওপর প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হবে। কিন্তু ২০ তলা ভবন দাঁড়িয়ে গেলেও সেখানে নেই কোনো প্রেক্ষাগৃহ।

ইলিয়াস কাঞ্চন অবশ্য একটু অন্যভাবে এই বিষয়টি অবতারণা করেন। তার ভাষ্যমতে,

> ১৯৮৯ পর্যন্ত জমির দাম অত বেশি ছিল না। মানুষ তখন সিনেমা হলের জন্য জায়গা কিনেছে। ২০০১ সালের পর থেকে ঢাকা শহরে এবং সারা দেশে জমির দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে। মানুষ জমিতে বিনিয়োগ করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে। প্রেক্ষাগৃহের চেয়ে তাই অন্য বিনিয়োগে মনোযোগী হন মালিকেরা (কাদের ও সিদ্দিক ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬)।

ফলে যখনই প্রেক্ষাগৃহ মালিকেরা ব্যবসা মন্দ অবস্থা দেখেছে তারা আর ঝুঁকি নেয়নি, প্রক্ষাগৃহ বন্ধ করে দিয়েছে, দিচ্ছে। একই কথা বলেন শ্রীমঙ্গলের মনির। তার মতে,

> দেখবেন বাংলাদেশের বেশিরভাগ সিনেমাহল শহরের মূল জায়গায়। দামী জায়গায় তখন সিনেমাহল হয়েছিলো। এখন সেই জায়গায় তারা যদি ব্যবসা করতে না পারে, তাহলে সেই জায়গা তারা ফেলে রাখবে? আপনি ভালো সিনেমা বানাবেন না, ইন্ডিয়ার সিনেমাও আসতে দেবেন না, তাহলে সিনেমাহল চলবে কী দিয়ে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭)?

একই ধরনের কথা বলেন লেখক, অভিনয়শিল্পী, শিক্ষক মানস চৌধুরী। তার ভাষ্যমতে,

> প্রোপার্টি হিসেবে ল্যান্ডের অভ্যুদয় হওয়াতে সিনেমাহলগুলোর যে মূল্য সেটা রিডিফাইন হলো। 'শ্যামলী' সিনেমাহল ক্যান বি এ ভেরি গুড এক্সামপল। যদি 'শ্যামলী' সিনেমাহলের মালিকের নিজের সিনেমা প্রীতি না থাকতো, তাহলে কোনো কারণ নাই ওর মধ্যে একটা ডিজিটাল সিনেমাহল বসানোর। কারণ আমি হিসাব করে দেখেছি, ওখানে প্রায় ৩০টি দোকান বসানো সম্ভব। ঢাকা শহরের কারণে এর প্রতিটির পজিশন কমপক্ষে ২০ লাখ টাকা। ২০ লাখ ইনটু ৩০ মানে ছয় কোটি টাকা। সিনেমাহলটা না করলেই তিনি ছয় কোটি টাকার পজিশন মানি পেতে পারতেন। তার ওপর প্রতিটি দোকানের ভাড়া মাসে কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা। মানে মাসে আরো ছয় লাখ টাকা। এখন ওই ছয় কোটি ব্যাংকে রাখলে মিনিমাম পাঁচ লাখ আর ভাড়া থেকে ছয় লাখ, মাসে মোট ১১ লাখ। 'শ্যামলী' সিনেমাহল থেকে মাসে তিনি মোটেও এই পরিমাণ টাকা আনতে পারবেন না। বরং কোনো কোনো মাসে হয়তো লস যায়। এটা জাস্ট সিনেমা প্রীতির কারণে হয় (আখ্যানের ক্রম ৫.৬; ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

মানস চৌধুরী আরো মনে করেন, ৯০ পরবর্তী সময়ে জমির দাম যেভাবে পুনর্সংজ্ঞায়িত হয়েছে তাতে প্রেক্ষাগৃহগুলোর জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা জরুরি। তার ভাষায়, 'প্রোপার্টি হিসেবে নতুন যে ডিফিনেশন তাতে সিনেমাহল কেবল একটা রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত জনপদ হিসেবে/পাবলিক হল হিসেবে/জনজমায়েত হিসেবে ব্যাপৃত না হয়ে উপায় নেই, যেমন টাউনহলগুলো আছে। এক্ষেত্রে একটা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র সিনেমাহলগুলোকে ওয়ন করতে পারতো পাবলিক ওনারসিপে (আখ্যানের ক্রম ৫.৬; ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।' মানস চৌধুরীর এই প্রস্তাব নিয়ে মনে হয় ভাববার সময় এসেছে।

বোমা হামলার পর ময়মনসিংহের 'অলকা' প্রেক্ষাগৃহ এখন অলকা নদী বাংলা কমপ্লেক্স

ছবি : গবেষক, ১২ জুলাই ২০১৭

চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির হিসাব অনুযায়ী ৯০ দশক পর্যন্ত সারাদেশে প্রেক্ষাগৃহ ছিলো ১৪৩৫টি। ২০১০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে চালু ছিলো ৭২২টি প্রেক্ষাগৃহ। বর্তমানে (২০১৭ পর্যন্ত) আছে ২৭৮টি। রাজধানী ঢাকায় প্রেক্ষাগৃহ ছিলো মোট ৪৪টি, বর্তমানে আছে ২৬টি (মাজিদ, ৪ মে ২০১৭) (হকি ও আবদুল্লাহ, ৩ জুলাই ২০১১)।

রাজধানীর পরেই চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, যশোরকে 'চলচ্চিত্র দর্শকের স্বর্গ' (আলী, ২৯ জুন ২০১৭) বলে গণ্য করা হতো। ২০০০ সালে পর্যন্ত টাঙ্গাইল এলাকায় ৪৭টি প্রেক্ষাগৃহ ছিলো। এখন সেখানে আছে মাত্র ১২টি। এই পরিস্থিতি নিয়ে যশোরের শামীম আনোয়ার বলেন, "'মণিহার'ও এতোদিন বন্ধ হয়ে যেতো, কিন্তু এখনো টিকে আছে এর চারপাশের দোকান, আবাসিক হোটেল, কনফারেন্স রুম এগুলো দিয়ে। এই মালিক আসলে খুব ভালো মানুষ; কর্মচারীদের কথা চিন্তা করে তিনি এটা ছেড়ে যাননি (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২০)।"

এই পরিস্থিতিতে সরকারের করণীয় নিয়ে যশোরের মোল্যা ফারুক আহম্মেদ বলেন, 'এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের এখন ৬৪টি জেলায় কমপক্ষে একটি মানসম্মত সিনেপ্লেক্স তৈরি করা উচিত। এইসব সিনেমাহলে যদি মানসম্মত সিনেমা চলে, তাহলে সেখানে দর্শক যেতে বাধ্য। কারণ মানুষ এখন অনেক সচেতন (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।' মোল্যা ফারুকের মতো মানস চৌধুরীও প্রেক্ষাগৃহ রক্ষায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন। তার মত হলো,

> সিনেমাহলগুলোকে রাষ্ট্রের বিশেষ নজরপ্রাপ্ত অঞ্চল হিসেবে দেখতে হবে। ধরে নেন, আপনি মোহনগঞ্জের একটি সিনেমাহলের মালিক—আপনি কৃষি খাতে লোন দিতে পারেন, এতোগুলো ব্রিজ বানাতে পারেন—ওনাকে তো ৫০ লাখ টাকার ভর্তুকি দেওয়া সম্ভব। তাকে বলা যেতেই পারে, তুমি সিনেমাহলটা চালাবা, তুমি এখানে একটা কমপ্লেক্স বানাবা, এই সিনেমাহল চালানোর কারণে তোমাকে ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না, আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা পাবা। এখন কথার কথা বাংলাদেশে থানা যদি হয় ৬০০টা, তাহলে ৬০০ থানায় ৬০০ সিনেমাহল রাষ্ট্র রক্ষা করতেই পারে। এটাতে রাষ্ট্রের সরাসরি মালিকানা দরকার নেই, আর পাঁচটা জিনিসের মতো গ্রুপ অব মালিকানা হলেই হয়।
>
> আরেকটা জিনিস দেখেন, যখন প্রযুক্তি বদল হলো, তখন প্রজেক্টর কিন্তু জাজ আনলো। আপনি যখন সিনেমাহল রাখলেন, তখন আপনি সরকারের নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রজেক্টর আনতে বলতে পারেন। আমি এই যে মডেলটার কথা বলছি, তখন আমি জানিও না, কিন্তু পশ্চিমবাংলা অপটেড দ্যাট মডেল (আখ্যানের ক্রম ৫.৬; ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

এখনো যে কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহ চালু আছে তার কারণ সম্পর্কে নওগাঁর পত্নীতলার মিলন কুমার মণ্ডল বলেন,

> আগে যখন ৩৫ মিলিমিটার প্রজেক্টরে প্রেক্ষাগৃহ চলতো, প্রথম দিকে এক জোড়া কার্বন ছিলো ১৫ টাকা। পরে বাড়তে বাড়তে সেটা ৬৫–৭০ টাকা হয়। এক শো চলচ্চিত্রে এক জোড়া কার্বন লাগে, তিন শো চললে গড়ে দুই শো টাকা। তার ওপর ওই প্রজেক্টর চালানোর জন্য কমপক্ষে দুইজন কর্মচারী দরকার। ডিজিটাল না হয়ে আজকের দিনে যদি ওই ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে মফস্বলের অনেক প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হয়ে যেতো (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৭)।

এ নিয়ে নওগাঁর সমীর কুমার মণ্ডল বলেন,

> এখন প্রেক্ষ্যগহ চালানোর খরচ অনেক কম। আগে একটা চলচ্চিত্র আনার জন্য ঢাকায় যাওয়া-আসা করতেই চার–পাঁচ হাজার টাকা খরচ হতো। এখন সেটা লাগে না। প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র চালাতেও দুই–তিনজন লোক লাগতো। এখন একজন লোক হলেই চলে। ডিজিটাল প্রজেক্টর; পেনড্রাইভে ঢাকা থেকে চলচ্চিত্র আসে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

চলচ্চিত্রের ব্যবসা, ভূমির মূল্য বৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ সব মিলিয়ে প্রেক্ষাগৃহের বর্তমান অবস্থায় মোটেও ভালো জায়গায় নেই। ফলে কোনো একক পক্ষের ভূমিকায় এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ খুব সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

৬.৭.৫) প্রসঙ্গ সিনেপ্লেক্স

ঢাকাই চলচ্চিত্রের যখন এহেন দুরবস্থার তখন ২০০৪ সালে পথচলা শুরু করে বাংলাদেশের প্রথম মাল্টিপ্লেক্স 'স্টার সিনেপ্লেক্স'। ঢাকার পান্থপথে অত্যাধুনিক শপিংমল বসুন্ধরা সিটিতে তিনটি হল নিয়ে তারা যাত্রা শুরু করে। 'স্টার সিনেপ্লেক্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুব উর রহমান বলেন, "আমরা যখন শুরু করি সে সময় বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে। আর যে কয়টা ছবি মুক্তি পাচ্ছিল সেগুলো আমাদের থিয়েটারে দেখানোর মতো ছিল না" (রহমান, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১)। তারপরও ঝুঁকি নিয়ে সেসময় সিনেপ্লেক্সটির যাত্রা শুরু করেন মাহবুব। মাহবুবের এই সিদ্ধান্তকে একটু ঘুরিয়ে সমর্থন করেন যশোরের পলাশ কুমার বোস। তার ভাষ্য হলো—

> ছোটোবেলায় আমরা যখন টেলিভিশনে টারজান দেখতে যেতাম; তখন পাড়াজুড়ে একটা টেলিভিশন ছিলো। এখন যারা রিকশা, অটোবাইক চালায়, তাদের বাড়িতেও রঙ্গীন টেলিভিশন আছে। মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়েছে। পুরনো সিনেমাহল আর চলবে না। পুরনো পরিবেশ পরিবর্তন করতে হবে, সিনেপ্লেক্স না কী জানি হয়েছে, প্রয়োজনে সেটা বানাতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৬)।'

ছবি : সংগৃহীত

খুলনার শাহজাহান আলী খালিশপুরে একটা সিনেপ্লেক্স করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা যখন তার সঙ্গে কথা বলি তখন এর কাজ প্রায় শেষের দিকে। শুরুতে তিনি একটি থিয়েটার করার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যবসা হলে পরে পর্দা বাড়াবেন বলে জানান। শাহজাহান বলেন,

> 'লিবার্টি' তো আমি বন্ধ করেই দিয়েছিলাম। তারপর ভাবলাম দেখি না একটা সিনেপ্লেক্স করে। এখানে ভার্সিটি, কুয়েট, মেডিকেল কলেজ ও আরো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে; ভালো দর্শক আছে। এই ছেলেমেয়েরা যায় ঢাকায় সিনেমা দেখতে। যদি তাদের আকৃষ্ট করা যায়, তাহলে হয়তো ব্যবসা হবে। আর সঙ্গে চাইনিজ ও ফাস্ট ফুডের দোকানও থাকবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৬)।

তবে সিনেপ্লেক্স নিয়ে সমস্যার কথা বলেন সিলেটের হারুন অর রশীদ। তার মতে, 'সিনেপ্লেক্স সমাজের সব শ্রেণির মানুষের জন্য নয়। সিনেপ্লেক্সে কোনো রিকশাওয়ালা ঢুকে সিনেমা দেখতে পারবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৫)।' তিনি আরো বলেন, 'সিনেপ্লেক্সে সিনেমা চলে গেলে সিনেমা আর সর্বজনীন থাকবে না। সাধারণ দর্শক আর সেখান থেকে শিখতে পারবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৫)।' হারুনের এই বক্তব্য একেবারে ফেলে দেয়ার মতো নয়। সিনেপ্লেক্সের যে পরিবেশ এবং টিকেটের যে দাম সেটা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে নির্বাহ করা কঠিনই। ফলে দর্শকের একটা বিশাল অংশ প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখা থেকে হয়তো বঞ্চিত হবেন। তবে পুঁজি প্রাধান্যশীল সমাজ দর্শকের এই বঞ্চিত হওয়াকে খুব বেশি মাথায় নেয় না। তারা পুঁজির বৃদ্ধির পথ খোঁজে। সেই দিক বিবেচনায় হয়তো সিনেপ্লেক্স মালিক ও প্রযোজকদের খুব বেশি সমস্যা হবে না। কারণ তারা একক প্রেক্ষাগৃহগুলোর টিকেটের কয়েক গুণ দামে সিনেপ্লেক্সের টিকেট বিক্রি করে থাকেন। অবশ্য শপিংমলের বাইরে একক মাল্টিপ্লেক্স হলে সেখানে সাধারণ দর্শকের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকতে পারে।

বাংলাদেশে মাল্টিপ্লেক্স হওয়ার মাত্র এক বছর আগে ২০০৩ সালে ভারতে প্রথম মাল্টিপ্লেক্স হয়—পি ভি আর। ভারতে এরপর ২০১১ সাল পর্যন্ত মাল্টিপ্লেক্স হয় তিন শতাধিক। বিপরীতে বাংলাদেশে সব মিলিয়ে ১০টাও হবে না। মাল্টিপ্লেক্স শুধু মার্কেটকেন্দ্রিক নয়, ভারতের নয়া দিল্লিতে কয়েক মাইল দূরে দূরে একক মাল্টিপ্লেক্সও রয়েছে। সেখানে এক সঙ্গে আটটি স্ক্রিনে চলচ্চিত্র দেখানো হয় (রহমান, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১)। মজার তথ্য হলো বাংলাদেশে অনেক আগেই সিনেপ্লেক্সের কথা চিন্তা করা হয়েছে—এমন কথা বলেন যশোরের জিয়াউল হক মিঠু। তার ভাষ্যমতে,

> যতোটা গল্প শুনেছি, আব্বা ভারতে গিয়ে খুব ভালো বেশকিছু সিনেমাহলে সিনেমা দেখেছিলেন। সেখান থেকে ফেরত এসে তিনি চিন্তা করেছিলেন, দেশে ওই ধরনের একটা সিনেমাহল করবেন। সেই ইচ্ছা থেকেই মূলত 'মণিহার' করা। একটা ভালো পরিবেশে অনেক লোক এক সঙ্গে সিনেমা দেখবে। এটা তো শুধু একটা সিনেমাহল নয়, এখানে আবাসিক হোটেল, রেস্টুরেন্ট, কমিউনিটি সেন্টার, মার্কেট—সবকিছু মিলে একটা আয়োজন আর কী। কেবল পর্দা একটা ছিলো, কিন্তু আজ থেকে ৩৫–৪০ বছর আগে তিনি মূলত আজকের যে সিনেপ্লেক্সের কথা আমরা বলছি, সেটার কথা ভেবেছিলেন (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২১)।

৮০'র দশকেই সিনেপ্লেক্সের কথা চিন্তা করেছিলেন যশোরের 'মণিহার'-এর মালিকপক্ষ। তারই প্রমাণ মেলে প্রেক্ষাগৃহের কমপ্লেক্সে দোকান, আবাসিক হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও ভিতরের বিলাসবহুল সাজসজ্জায়।

ছবি : গবেষক, ২৩ জানুয়ারি ২০১৭

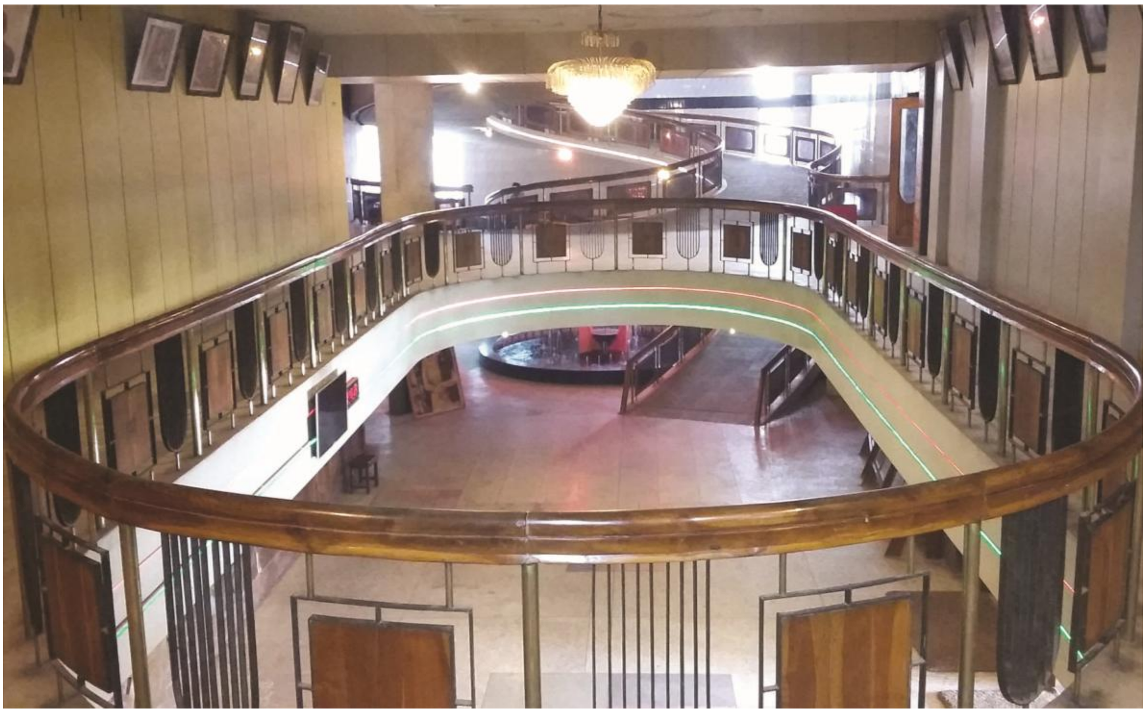

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই চোখে পড়ে এই দৃশ্য।

ছবি : গবেষক, ২৩ জানুয়ারি ২০১৭

প্রেক্ষাগৃহের ভিতরের এই ঝর্ণাতে ছয় ঋতুতে ছয় রঙের আলো জ্বলে।

ছবি : গবেষক, ২৩ জানুয়ারি ২০১৭

তার মানে অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে কেউ না কেউ এটা ভেবেছিলেন। কিন্তু 'মণিহার' ছাড়া কেউ সেভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এই ধরনের চিন্তা থাকলে হয়তো বাংলাদেশের বড়ো, বিখ্যাত অনেক প্রেক্ষাগৃহকেই আজকের দিনে এতো সমস্যায় পড়তে হতো না।

সিনেপ্লেক্স নিয়ে সম্ভাবনার কথা বলেন নওগাঁর সমীর কুমার মণ্ডল। মফস্বলের দর্শকও সিনেপ্লেক্সে যাবে এমনটাই তার প্রত্যাশা। সমীরের যুক্তি হলো—

> দর্শক তো এখন সব কিছুই উন্নত চায়; তাই ছোটো ছোটো সিনেমাহল করে সুন্দর পর্দা, সিট, টলয়েট, কার্পেট বিছিয়ে এসি লাগাতে হবে। আগে যেখানে তিন টাকা, পাঁচ টাকা টিকেট ছিলো, এখন সেখানে ৪০ টাকা। আরো ভালো মান দিতে পারলে হয়তো ৭৫-১০০ টাকা পর্যন্ত টিকেট করা যাবে। ফলে সিনেপ্লেক্স করা যেতেই পারে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১২)।

অন্যদিকে রাজশাহীর এম এ মোমিন রাঙ্গা প্রেক্ষাগৃহের ভালো পরিবেশ নিয়ে বলেন,

> আপনি 'বলাকা' সিনেমাহলে যান, সেখানকার দর্শক কিন্তু আলাদা। ওখানে ডিসি'র টিকিট দুইশো টাকা, তার পরও জায়গা দেওয়া যায় না। ওখানকার বাথরুমে যাবেন, সেখানে বসে আপনি নির্দ্বিধায় পোলাও-কোরমা-বিরিয়ানি খেতে পারবেন। আর এই সিনেমাহলের বাথরুমে যান, আপনি একবার ঢুকলে আর দ্বিতীয়বার ঢুকবেন না। হলমালিকদেরও দোষ আছে। দেশের বেশিরভাগ সিনেমাহলের পরিবেশ ভালো না। তাই খালি সিনেমার দোষ দিলেই হবে না। অবশ্য এর কারণও আছে, লোকসান দিতে দিতে তাদের মন নষ্ট হয়ে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৬)।

এদিকে প্রেক্ষাগৃহের বর্তমান খারাপ অবস্থা নিয়ে সিলেটের রাশেদুল কবির মন্টু বলেন,

> এই 'নন্দিতা' সিনেমাহলে দেখেন শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ কাউন্টার চেনে না। এখানকার ব্ল্যাকাররা সিস্টেম করে টিকেট বিক্রি করতেছে। অথচ এখন ব্ল্যাকারই থাকার কথা নয়। সব সময় কাউন্টার খোলা থাকবে।

মানুষ যেকোনো দিনের টিকেট যেকোনো সময় যেনো কাটতে পারে। যে কেউ এসে বললো, ভাই আমি অমুক তারিখের ম্যাটিনি শোয়ের চারটা টিকেট চাই। বুকিং ক্ল্যার্ক তালিকা এনে তাকে সেদিনের চারটি টিকেট দিয়ে দিলো। সিনেপ্লেক্স হলে এইসব সমস্যা আশা করি মিটে যাবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১১)।

ঢাকায় অবস্থিত সিনেপ্লেক্সগুলো এখন ইংরেজি চলচ্চিত্রের ওপর নির্ভরশীল। কালেভদ্রে সেখানে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র চলে। তবে 'স্টার সিনেপ্লেক্স' এর জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, "ছবি চলার ক্ষেত্রে ভালো ছবি গুরুত্বপূর্ণ। হলিউড কোনো বিষয় নয়। এখানে হলিউডের ছবি বেশি চলে। কারণ বিশ্বজুড়ে যখন ছবি মুক্তি দেওয়া হয়, তখন আমরাও মুক্তি দিই। স্বভাবতই হলিউডের ছবি বেশি মুক্তি পায় বাংলা ছবির তুলনায়। তাই হলিউডের ছবি বেশি দেখানো হয়। তবে দেশি ও হলিউড দুই দিকেরই ভালো ছবির আলাদা দর্শক আছে" (নাসরুল্লাহ, ২ জুন ২০১৮)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দর্শক সিনেপ্লেক্সের এসব চলচ্চিত্র দেখছে এবং অনেক টাকা টিকিট কেটেই দেখছে। এটা একটা ইতিবাচক দিক। ময়মনসিংহের বিপ্লব হোসেন বলেন,

বসুন্ধরায় 'স্টার সিনেপ্লেক্সে' তো মানুষ তিনশো টাকায় টিকেট কেটে সিনেমা দেখছে। কারণ সেখানে একটা পরিবেশ আছে। মানুষ এখন অনেক সচেতন, তাদের হাতে এখন টাকা আছে। আপনি এখানে প্রসাবখানায় যেতে পারবেন না, গন্ধ; ভিতরে ছারপোকা! এই দিয়ে কী আর লোক আসে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৪)!

একই ধরনের কথা বলেন রাজশাহীর এম এ মোমিন রাঙ্গা। তার ভাষ্য হলো,

বসুন্ধরা সিটির 'স্টার সিনেপ্লেক্সে' এতো টাকা টিকিটের দাম, তার পরও কোনো সিট ফাঁকা থাকে না। সিনেপ্লেক্সে চলার মতো সিনেমা তৈরি করতে পারলে আর পরিবেশ দিতে পারলে সিনেমা চলবে। ওখানে কিন্তু *পদ্ম পাতার জল*, *কৃষ্ণপক্ষ* হাউসফুল থাকে; কিন্তু এই যে *মিয়া বিবি রাজি* ওখানে চলবে না। ওরা এ ধরনের সিনেমা চালাবেও না (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৬)।

দর্শকের চলচ্চিত্র দেখার সংস্কৃতি সম্পর্কে খুলনার 'শঙ্খ'-এর সামনের দোকানি গোপাল দাস রাজু বলেন,

এখন মোবাইলে সারাবিশ্ব দেখা যাচ্ছে। তাই আগের মতো ডেইলি সিনেমা দেখার সময় কিন্তু মানুষের নাই। দুই-তিন মাসে একটা ভালো সিনেমা আসলে, তখন কিন্তু মানুষ সাতশো টাকা হোক আর তিন শো টাকা হোক, তা খরচ করে সিনেমা দেখতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু ভালো সিনেমা ও সিনেমাহল হতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৯)।

রাজুর কথাকে সমর্থন করেন যশোরের মোল্যা ফারুক আহম্মেদের মতে,

এক শ্রেণির দর্শকের কাছে টাকা এখন কোনো ব্যাপার না। কারণ তাদের পকেটে টাকা আছে; ফলে খরচ করতে সমস্যা নাই। কিন্তু তারা চায় বিলাসিতা। অর্থাৎ মানুষের চোখ এখন উপরের দিকে। ১০ টাকা বেশি হোক আমি ভালো জিনিসটা নেবো। এই বিষয়টা কিন্তু এখন আমাদের মাথায় ঢুকেছে—ভালো জিনিস পরবো, খাবো। সেই দিক থেকে মানসম্মত সিনেমাহলেরও অভাব হয়ে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।

সিলেটের ‘নন্দিতা’র গেইটম্যান শামীম আফসোস করে বলেন, ‘দর্শক সিনেমা দেখতে এসে মাঝে মাঝেই আমাদের বলে সিনেমাহলটাতে এসি লাগানোর জন্য, রঙ করার জন্য। বাথরুম থেকে এসে অনেকে গালাগালি করে। এসব ঠিকঠাক করলে নাকি অনেক দর্শক হবে বলেও তারা মত দেয়। কিন্তু এগুলো করার ক্ষমতা তো আমাদের নেই (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.২)।’

৬.৭.৬) **শিল্প (Industry) হিসেবে চলচ্চিত্র**

২০১০ সাল থেকে চলচ্চিত্রশিল্পের তীব্র মন্দার কারণে এটিকে শিল্প খাত হিসেবে ঘোষণার জোর দাবি ওঠে। ২০১২ সালের ৩ এপ্রিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন। ওই বছরের ২৪ এপ্রিল শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এখন থেকে চলচ্চিত্র শিল্প অন্যান্য শিল্পের মতোই যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাবে। অথচ ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাণকেন্দ্র এফ ডি সি এখনো শিল্প হিসেবে নিবন্ধিত হয়নি। এটিকে বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় বাণিজ্যিক হারে—প্রতি ইউনিট ৮.৩০ টাকা। শিল্পের জন্য প্রযোজ্য নমনীয় ৮.০৫ টাকা হারে নয় (আলী, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)।

এছাড়া যারা চলচ্চিত্রের পরিবেশন ও প্রদর্শনের সঙ্গে যুক্ত তাদেরও প্রজেক্টর, শব্দযন্ত্র, ডিজিটাল পর্দা ইত্যাদি যন্ত্রপাতি আমদানির সময় প্রতিটি পণ্যের ক্যাটাগরির ওপর আলাদা হারে শুল্ক দিতে হচ্ছে। অথচ এসব পণ্যে শুল্ক ছাড় পাওয়ার কথা। কুষ্টিয়ার মোখলেছুর রহমান বকুল ক্ষোভ নিয়ে বলেন, ‘সরকার সিনেমাকে শিল্প ঘোষণা করেই খালাস। এরপরে যেনো আর কোনো কাজ নেই। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। শিল্প হয়েছে, কিন্তু উৎপাদন, লাভ, ব্যবসা সেগুলো আর হচ্ছে না। আর শিল্প ঘোষণার পরও সরকার বাণিজ্যিক খাজনা নিচ্ছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫২)।’ তিনি আরো বলেন, ‘২০১০ সাল থেকে সরকার সম্পূরক শুল্ক তুলে নিয়েছে। কিন্তু পৌরসভা এখনো প্রমোদকর নেয় ১৫ শতাংশ। এটা প্রবেশ মূল্য থেকে দিতে হয়। ব্যবসা হলে করের এই টাকা দিতে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু এখন তো সেই ব্যবসা নেই। তাহলে আমরা এখন কী করবো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫২)!’

নির্মাতা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ব্যবসায়ী নাসির উদ্দীন ইউসুফ মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে একটি সিনেপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি জানান, বিদেশ থেকে সিনেপ্লেক্সের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি করতে কোনোরকম শিল্পসুবিধা তিনি পাননি (আলী, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)। অন্যদিকে একেবারে ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন প্রখ্যাত নির্মাতা তারেক মাসুদ। তার ভাষায়,

> *মাটির ময়না* (২০০৩) অর্থায়নের জন্য আমরা বেশ কয়েকটি বড়ো ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। গ্যারান্টি, মর্টগেজ, কোলেটারাল সব কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম আমরা। কিন্তু নিয়ম বলে কথা! সব ব্যাংকের এক কথা, সিনেমার জন্য ‘ঋণ দেওয়ার কোনো প্রভিশন নেই’, এছাড়া ‘ঋণখেলাপী ইস্যু নিয়ে আমরা খুব বিব্রত আছি’

> ইত্যাদি ইত্যাদি। বড়োলোকদের ব্যাংকের কাছ থেকে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে আমরা গেলাম বিকল্পধারার একটি বিখ্যাত ব্যাংকের কর্ণধারের কাছে। উনি বললেন, 'আমরা তো গরীবদের ঋণ দেই শুধু'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যাংক ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টিতে সৃজনশীল চলচ্চিত্র একদিকে 'নেয়াহত আর্ট', তথ্য-মন্ত্রণালয়ের কাছে 'সেন্সর-সংক্রান্ত উৎকট ঝামেলা', আর সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের চোখে 'স্রেফ তথ্য-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার' (মাসুদ ২০০৬, পৃ১১০)।

তার মানে চলচ্চিত্রকে নামেই কেবল শিল্প ঘোষণা করা হয়েছে, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এ প্রসঙ্গে তারেক আরো বলেন, "আমরা ইরানি চলচ্চিত্র নির্মাণের দিগ্বিজয়ের কথা জানি। ইরানের স্থানীয় বাণিজ্যিক সিনেমাও ক্রমশ আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করে নিচ্ছে। এর পেছনে সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা আমরা অনেকেই জানি না" (মাসুদ ২০০৬, পৃ১১০)। ফলে চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হলেও তা কেবল খাতা-কলমেই রয়েছে, বাস্তবে নেই। অথচ সারা পৃথিবীতে অনেক দেশই তাদের জিডিপি'তে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড়ো ধরনের অবদান রাখছে।

৬.৭.৭) চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের সামাজিক মর্যাদা

সরাসরি রুপালি পর্দায় কাজ করেছে কিংবা এর সঙ্গে অন্য কোনোভাবে জড়িত অনেক ব্যক্তিই শূন্য দশকে এসে সামাজিকভাবে নানা সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। এদের মধ্যে যেমন চলচ্চিত্রের জুনিয়র আর্টিস্টরা (এক্সট্রা) আছেন, তেমনই আছেন প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষেরা। এর বাইরে নির্মাতা, নায়ক-নায়িকা, চরিত্রাভিনেতারাও যে খুব ভালো আছেন এমন নয়। তবে শূন্য দশকের মাঝামাঝির পর থেকে প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলো সামাজিকভাবে ভয়াবহ রকমের সমস্যার মধ্যে পড়েন। অথচ এই মানুষগুলো একসময় মাথা উঁচু করে সমাজে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সিলেটের হারুন অর রশীদ এ নিয়ে দুঃখ করে বলেন, 'আগে মানুষ সিনেমাহলের লোকজনদের সম্মান করতো। রাস্তা দিয়ে গেলে বলতো অমুক সিনেমাহলের মালিক, ম্যানেজার যাচ্ছে। এখন সব শেষ হয়ে গেছে। তাই এখন আমি আর পরিচয় দিই না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৫)।' শ্রীমঙ্গলের 'ভিক্টোরিয়া'র ৩৫ মি মি অপারেটর মনির বলেন,

> ডিজিটাল আসার পর আমরা অজেকো হয়ে গেলাম। কম্পিউটার আসলো, আমি তো লেখাপড়া জানি না। কী করবো! সেটা চালানোর জন্য আলাদা লোক রাখতে হয়েছে। এক সময়ের লাইসেন্স করা ৩৫ মিলিমিটারের মেইন অপারেটর এতো বছর পরে এসে এখন সহকারি অপারেটর! এই কষ্টের কথা আমি কীভাবে বলবো! আমি সেই সময় কোনো দিন চিন্তাই করি নাই, আজকের এ অবস্থা হবে। এই যে এতোগুলো সিনেমাহলের অপারেটর এখন কীভাবে চলছে, সরকারও তাদের খোঁজ নেয় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭) ।

কুড়িগ্রামের সাইদুল ইসলাম বলেন,

> শেষের দিকে এসে সিনেমাহল আর চলছিলো না, মালিকও বেতন দিতে পারে না। কিন্তু আমার সংসারে ছোটো ছেলেমেয়ে ছিলো। তারা তো আর এভাবে চলতে পারে না। তাই অন্য চিন্তা করতে হয়েছে। তবে সিনেমাহল

যে এইভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, এটা আমি কোনো দিনও চিন্তা করিনি। কারণ মানুষের বিনোদন কীভাবে বন্ধ হয়। অথচ বন্ধ হয়ে গেলো। এখন মানুষ সিনেমাহলে আসতেও সংকোচ করে। এখানে কেউ বসে থাকলেও মানুষজন তাকে খারাপভাবে দেখে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৫)।

যশোরের 'মণিহার'-এর কালোবাজারি মো. ইউসুফ বলেন,

এক সময় প্রচুর ব্যবসা করেছি। তখন যৌবন ছিলো; পয়সাকে পয়সা মনে করিনি। একবারও চিন্তা করিনি এই ব্যবসার অবস্থা একসময় এতো ভাটা পড়বে। মনে করছিলাম, সারা জীবন এভাবেই চলতে পারবো। তখন সিনেমাহলের অনেক লোকই টাকাকে টাকা মনে করে নাই। এখন গু'র মধ্যে এক টাকা পড়ে থাকলেও সেটা তুলে নিচ্ছি (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৩)।

চট্টগ্রামের হাজী আবুল হোসেন বলেন,

এই সিনেমাহল আমরা অনেক আগেই বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু পারি নাই। কারণ আমার নিজেরও সিনেমাহলের ওপর একধরনের মায়া পড়ে গেছে। এছাড়া এখানে এখনো ১৫–২০ জন কর্মচারী কাজ করে। তারা সিনেমাহলের বাইরে আর কোনো কাজ জানে না। সিনেমাহল বন্ধ হয়ে গেলে, এই মানুষগুলো কী করবে, মালিক হিসেবে সেকথাও আমাকে ভাবতে হয় (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৬)।

৯০ দশকের শেষ দিকে এবং শূন্য দশকের শুরু থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়, এর ফলে প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের খারাপ ধারণা তৈরি হয়। অনেক সাধারণ মানুষ প্রেক্ষাগৃহকে এখন 'পতিতাপল্লী'র সমান্তরাল মনে করেন। অথচ এক সময় প্রেক্ষাগৃহে চাকরি করার বিষয়টি সম্মানের ছিলো। শ্রীমঙ্গলের মনির বলেন,

আমাদেরকে এখন মানুষ মাগীর দালাল বলে। আগে তারা আমাদের সম্মান করতো। অনেকে বলতো, ভাই আপনি আমার ভাই লাগেন, একটা সিটের ব্যবস্থা করে দেন। অথচ সেই মানুষ এখন আমাদের ঘেন্না করে। আমার ছেলে বলে, বাবা তুমি সিনেমাহলের চাকরি ছেড়ে দাও, আমি এখন কলেজে পড়ি। আমরা এই পরিস্থিতির কথা জীবনে কখনো কল্পনাও করি নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭)।

একই ধরনের কথা বলেন যশোরের অনুপ সিংহ। তার ভাষ্যমতে, 'এখন অনেকে প্রশ্ন করে সিনেমাহল এখনো চলে! সিনেমাহল যেহেতু চলে না, তাহলে নিশ্চয় এ লোক অন্য কিছু করে। তখন লজ্জা লাগে। মানুষ খারাপ ইঙ্গিত করে। অথচ আমরা যারা সিনেমাহলে কাজ করি, তারা জীবনে কোনোদিন কিছু করলাম না, আজ এধরনের কথা শুনতে হচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে যায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৬)।'

সিলেটের 'নন্দিতা'র ব্যবস্থাপক মোস্তফা চৌধুরী বলেন,

এই সিনেমাহলের ৩৫ মিলিমিটার প্রজেক্টরের আমদানিকারক ছিলেন ঢাকার আসলাম সাহেব। তিনি আমাকে বলেছিলেন, দেখবেন মোস্তফা, আপনি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন, তখন লোকজন বলবে ওই যে 'নন্দিতা' সিনেমাহলের ম্যানেজার যায়। এই পরিস্থিতি কিন্তু আসলেই ছিলো। সেটা একেবারে আলাদা ব্যাপার, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু ২০০১-এ ওই সিনেমাগুলো আসার পর আমাদের সামাজিক সম্মানটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৩)।

অভিমান রাগ ও ক্ষোভ নিয়ে খুলনার মো. হালিম বলেন,

> এখন আর ভালো লাগে না। বেতন ঠিকমতো পাই না। কোনো ইনকাম নাই। বেতনের বাইরে আমরা কর্মচারীরা টিকেট প্রতি এক টাকা করে পাই। সারাদিন একশো টিকেট বিক্রি হলে, আমরা কর্মচারীরা একশো টাকা পাই। সেটা সবাই ভাগ করে নিই। কিন্তু এখনতো টিকেটই বিক্রি হয় না। তাই সব মিলিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতেও আমাদের আর ভালো লাগে না। কথা বলে কী হবে বলেন (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৬)।

কুষ্টিয়ার 'বনানী'র ব্যবস্থাপক মোখলেছুর রহমান বকুল বলেন,

> আমার বড়ো ছেলেটা স্কুলে পড়ে। ওকে হয়তো কেউ জিজ্ঞাসা করলো, তোমার বাবা কী করেন? ও বললো ব্যবসা। কী ব্যবসা? এর উত্তর দিতে গেলে আমার ছেলেটা লজ্জা পায়। কেবল ছেলে না, আমি নিজেও এখন লজ্জা পাই। সিনেমাহলের ব্যবসা শোনার পর মানুষ যেভাবে বলে—'হল চলে (!)'—এটা শোনার পর নিজেরই মাথাটা গরম হয়ে যায়। অথচ আগে আমাদের যেকোনো জায়গায় উঁচু আসনে বসার জায়গা দিয়েছে মানুষ (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫২)।

যশোরের পলাশ কুমার বোস ক্ষোভ নিয়ে বলেন, 'কারো সঙ্গে দেখা হলে আমি যখন পরিচয় দিই, সিনেমাহলে আছি; তখন মানুষ একটা কেমন তাচ্ছিল্যের হাসি দেয়। অথচ আগে বড়ো বড়ো নেতারা আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইতো। তাদের পাঁচটা ছেলেকে ফ্রিতে সিনেমা দেখানোর জন্য (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৬)।'

কুড়িগ্রামের দেবলাল রজক দেওয়ান অন্য ধরনের একটা সমস্যার কথা বলেন। তার ভাষ্যমতে,

> সামাজিকভাবে আমাদের অবস্থা সেসময় বেশ ভালোই ছিলো। মানুষ সম্মান করতো। কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত এই সময়টাতে সিনেমাহল ছিলো সোজা কথায় ফুর্তি করার জায়গা। ১২টা কিংবা তিনটার শো-এ স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা আসতো, তারা কী আর সিনেমা দেখতো, নিজেদের মতো ফুর্তি করে চলে যেতো। এই সময়ে আমাদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। মানুষজন আমাদের অন্য চোখে দেখতে থাকে। সিনেমাহলের বেতন খুব বেশি ছিলো না। কিন্তু তারপরও আমরা চাকরি করেছি (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৮)।

চট্টগ্রামের 'সিনেমা প্যালেস'-এ ৩৫ মি মি প্রজেক্টর চালাতেন হাজী মো. সেলিম। তিনি তার কষ্টের কথা বলেন এভাবে—

> ডিজিটাল হওয়ার পর অনেকদিন আমার কোনো কাজ ছিলো না। মালিকের কাছে কৃতজ্ঞ, পুরনো কর্মচারী হিসেবে উনি আমাকে বাদ দেননি। তারপর এক সময় আমি মালিককে বললাম, স্যার আমার চাকরিটা কী? তখন মালিক আমাকে একটা চাবির গোছা দিয়ে বললো, এটা নিয়ে আপনি গেইটে বসেন। আসলে আমাদেরও আর যাওয়ার জায়গা নাই। কী করবো বলেন, প্রায় ৪১ বছর পার করে দিয়েছে এই সিনেমাহলে, কোথায় যাবো? আমি তো আর কিছুই জানি না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৬)।

কুড়িগ্রামের হাবিবুর রহমান টিটু কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন,

> সিনেমাহলে চাকরি করে আগে নামাজ-রোজা করলেও মানুষ খারাপভাবে তাকাতো। টাকা যা পেতাম তা নিয়ে কোনো দুঃখ ছিলো না। কিন্তু মানুষের খারাপভাবে তাকানোটা ভালো লাগতো না। মানুষ মনে করতো আমরা

সিনেমাহলের লোক খারাপ পথে আছি। এটা আমাদের খুব খারাপ লাগতো। এখন অন্তত সেটা হয় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৬)।

পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, প্রেক্ষাগৃহে চাকরি করা অনেক বাবা-মা তাদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। অনেকে আছেন যাদের পরিবারের কেউ কখনো প্রেক্ষাগৃহে চাকরি করতো বর্তমানে এটা স্বীকার করতেও লজ্জা পান। যশোরের কাজী শরিফুল ইসলাম খুব দুঃখ নিয়ে বলেন, "আমার মেয়ের ধারণা, বাবা সিনেমাহলে চাকরি করলে তার বিয়ের ভালো সম্বন্ধ আসবে না। আমি 'মণিহার'-এর এখানকার গেটম্যান। আমার ভালো পোস্ট নাই। অথচ একসময় 'মণিহার'-এ চাকরি করায় সম্মানের ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৪)।" একই ধরনের কথা বলেন কুড়িগ্রামের হাবিবুর রহমান টিটু ও যশোরের 'তসবির মহল'-এর হিসাবরক্ষক শ্যামাপদ হালদার। চট্টগ্রামর হাজী মো. সেলিম খুব দুঃখ করে বলেন,

'সনেমাহলে তো এখন কোনো ব্যবসা নাই। আজ আমাদের আগের দিন থাকলে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। আমাদের তকদির খারাপ। এই জগত এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। সিনেমাহলের স্টাফরা ঘৃণার পাত্র হয়ে গেছে। মানুষ মনে করে আমরা লম্পট। কিন্তু সিনেমা তো আর আমরা বানাই না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৬)।

সুসময়ের কথা বলতে গিয়ে রাজশাহীর আখলাক বলেন,

তখন সমাজে সিনেমাহলের লোকজনের অন্যরকম দাম ছিলো। ধরেন, আমি কসাইয়ের কাছে মাংস কিনতে গেছি, জোর করে পাঁচ কেজি দিয়ে দিতো। আর বলতো, শুক্রবারে আসতেছি, দুইটা টিকেট দিয়েন আর টাকা দিয়েন। আর এখন যদি কোনো দোকানের সামনে আমরা যাই, তখন দোকানদার মনে করে আমরা হয়তো বাকি নিতে এসেছি। এখন দেখলে না চেনার ভান করে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১৭)।

কুড়িগ্রামের হাবিবুর রহমান টিটু আরো বলেন,'অশ্লীলতা আসার পর থেকে সিনেমাহলের পরিবেশটা যখন নষ্ট হয়ে গেলো, সাধারণ মানুষজনও আমাদের ঘৃণার চোখে দেখা শুরু করলো। আমরা শুধু টাকার জন্য এই চাকরি করতাম না, একটা ভালোবাসা ছিলো। তাই আমরাও বুঝতে পারলাম, আর বোধ হয় এখানে থাকা ঠিক হবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৬)।'

টানা ৩৮ বছর ধরে প্রেক্ষাগৃহে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন এম এ মোমিন রাঙ্গা। তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সেসময় (১৯৯৯–২০০৭) " ... এমন কিছু সিনেমাতে আমাকে প্রতিনিধি হয়ে যেতে হয়েছিলো, যেগুলো পুরোপুরি পর্নোগ্রাফি। এইসব সিনেমা যখন সিনেমাহলে চলতো, আমি ভয়ে সেখান থেকে খানিকটা ফাঁকে থাকতাম। ভয়ে ভয়ে থাকতাম, কখন র‍্যাব, পুলিশ আসে আর কখন রেইড দেয়। তার পরও আমি দুইবার ধরা খাইছি" (রাঙা ২০১৬, পৃ২৭৬)।

এছাড়া মোমিন ঢাকার কাকরাইলের ফিল্মপাড়ার সেসময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

আমাদের ফিল্মপাড়া হলো কাকরাইল; এই কাকরাইল দিয়ে একসময় ভালো ছেলে-মেয়েরা, ভদ্র লোকজন রিকশা নিয়ে যেতে চাইতো না। কারণ নোংরা সব পোস্টার তখন এসব অফিসের সামনে লাগানো থাকতো।

> একপর্যায়ে মানুষ সিনেমা জগতটাকেই ঘৃণা করা শুরু করলো। একটা উদাহরণ দেই, এই যে এই সিনেমাহলের [রাজশাহীর 'উপহার' সিনেমাহল] মালিক তার একটাই মেয়ে। বিয়ে ঠিক হওয়ার সময় ছেলের বাবা বলছিলো, সিনেমার লোকজনের সঙ্গে আত্মীয়তা করবো! তাহলে চিন্তা করেন, এই জগতটাকে কতো ঘৃণা করে মানুষ (রাঙা ২০১৬, পৃ২৭৬)।

শুধু সামাজিক মর্যাদার দিক থেকেই নয়, প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্ট অনেক মানুষকে এসময় অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব অমানবিক জীবনযাপন করতে হয়েছে। অনেকে এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যোগ দিয়েছে। অনেকে আবার দিনের পর দিন কষ্টের মধ্যেও এই কাজ করে যাচ্ছেন। শ্রীমঙ্গলের জহির খন্দকার বলেন,

> ভাই দেখেন, এই যে সামনে রমজান, এক মাস সিনেমাহল বন্ধ থাকবে। আমরা কী দিয়ে চলবো। আমার একটা ছেলে ক্লাস টেনে পড়তো, ওর লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছি। কী করবো, কিছুই করার নাই। তাই সরকারের কাছে আমার আবেদন, ভালো সিনেমা বানাতে হবে। ভারতের সিনেমা দিয়েও সিনেমাহল চলবে না। আমাদের দেশের সিনেমা লাগবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৬)।

পটুয়াখালীর 'তিতাস'-এর ঝাড়ুদার আ. মান্নানের সঙ্গে দেখা হয় প্রেক্ষাগৃহের বন্ধ গেইটের সামনে। সকাল সাড়ে ১০টায় আমি যখন সেখানে পৌঁছি তখন মান্নান ছাড়া কেউ ছিলেন না। তাকে জিজ্ঞাসা করি একা বসে কী করেন এখানে, প্রথমে তিনি কোনো কথা বলতে রাজি হন না। পরে নানা কথায় কথায় বেরিয়ে আসে তার কষ্টের কথা। একপর্যায়ে কেঁদে ফেলেন ষাটোর্ধ্ব মান্নান। তার ভাষ্য,

> বয়স হয়েছে কারণে বর্তমান মালিক আমাকে তিন মাসের বেতন দিয়ে বের করে দিয়েছে। এখন আমার করার কিছু নাই। তাই রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াই। কিন্তু সিনেমাহলের মায়া ছাড়তে পারি না। এই সিনেমাহলের প্রতি ইটে ইটে আমার রক্ত আছে। আমি এই সিনেমাহল এখনো ভালোবাসি। এটা অনেক বড়ো মায়া। তাই এখনো প্রতিদিন আসি (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১৭)।

বরিশালের শেখ মাসুম বলেন,

> ভাই, দেখেন এই সিনেমাহলে কাজ করে অনেক লোক আজ ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেকে আছে যারা দীর্ঘ দিন সিনেমাহলে কাজ করার পর এখন রিকশা চালিয়ে খায়। কারণ সিনেমাহলে কাজ করলে ওই মানুষের পক্ষে অন্য কাজ করা খুব সমস্যা হয়ে যায়। আবার সিনেমাহল বন্ধ হওয়ার পর তার আর কিছুই করার থাকে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২)।

শ্রীমঙ্গলের 'রাধানাথ'-এর সুপারভাইজার জহির খন্দকার বলেন,

> এতো বছর চাকরির পর আমাদের তো এখন অন্য কোনোখানে যাওয়ার তো জায়গা নাই। সরকারও তো আমাদের দেখে না। দেখেন, বাংলাদেশে এখন কম করে হলেও ৩০০ সিনেমাহল চালু আছে। এই সিনেমাহলগুলোর মালিকের কাছে স্টাফদের কোনো মূল্যায়ন নেই। মালিক বলতেছে, না পোষালে বন্ধ করে দিয়ে চলে যাও। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, আমরা ৩০–৩২ বছর ধরে এখানে চাকরি করে কী পেলাম? কিছুই তো পেলাম না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৬)।

তবে ভিন্ন ধরনের কথা বলেন যশোরের 'তসবির মহল'-এর অনুপ সিংহ। তার ভাষ্যমতে,

> আমরা যে কয়জন পুরনো লোক এখানে আছি, তাদের সবার আব্বা কিন্তু এখানে চাকরি করতো। সেই ভালোবাসার টানেই দু-চারটা পয়সা কম পেলেও আমরা এখনো এখানে পড়ে আছি। আমাদের মালিকেরও তো এখন তেমন কিছু নাই। এই অবস্থায় তাকে যদি আমরা ছেড়ে যাই, তাহলে তো বেঈমানি করা হবে। এখানে আমরা যারা স্টাফ আছি, মালিক তাদের কাউকে কর্মচারী হিসেবে দেখে না। সবাইকে ছোটো ভাই-ভাতিজা হিসেবেই দেখে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৬)।

চলচ্চিত্রের মানুষদের সার্বিক সামাজিক মর্যাদা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন করেছেন গবেষক, সাংবাদিক চিন্ময় মুৎসুদ্দী। চলচ্চিত্র সামগ্রিকভাবে এখনও সামাজিক মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। "চলচ্চিত্র এখনও সামাজিকভাবে সম্মানজনক পেশা নয়। ... এ জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের উন্নাসিকতা যেমন দায়ী, তেমনি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অভিনেত্রীদের দায়িত্বহীনতাও কম নয়"(মুৎসুদ্দী ২০১৩, পৃ৭৬–৭৭)। চলচ্চিত্র ও প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে এই সঙ্কট কিন্তু একেবারে নতুন নয়, ৬০'র দশকেও প্রেক্ষাগৃহকে ধর্মীয়ভাবে খারাপ জায়গাই মনে করা হতো। *রূপবান* (১৯৬৫) সেই পরিস্থিতির কিছু উন্নয়ন ঘটিয়েছিলো। তারপর সময়ের সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা হিসেবে প্রেক্ষাগৃহ দাঁড়াতে থাকে, বিশেষ করে ৭০'র দশকে এই ব্যবসার বিস্তার ঘটে মফস্বল পর্যন্ত। ফলে সাধারণ মানুষ এটাকে মেনে নিয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু কোথায় যেনো একটা খচখচানি ছিলো; যার বেশির ভাগটাই ধর্মীয় অনুভূতি থেকে আসা। কিন্তু তখন এ নিয়ে প্রকাশ্য কথা বলার সুযোগ কম ছিলো। কিন্তু ৯০ দশকের শেষ দিকে সহিংস ও যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রগুলো আসার পর থেকে মানুষের পুরনো বিদ্বেষ যেনো বেরিয়ে আসে। একপর্যায়ে অর্থনৈতিকভাবেও এই প্রতিষ্ঠানটি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সব দিক থেকেই সমস্যা যেনো প্রেক্ষাগৃহ ও এ সংশ্লিষ্টদের জেঁকে বসে।

৬.৭.৮) **যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র**

যৌথ প্রযোজনা নিয়ে শূন্য দশক ও ২০১০-এর দশকের শুরুতে যে চরম বিতর্ক হয়েছে, তা গত কয়েক দশকে হয়নি। এই আলোচনা শুরুর আগে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার, বিশ্বের অন্য দেশের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ নিয়ে খুব বেশি সমস্যা কখনো হয়নি; যা হয়েছে কেবল বাংলাদেশ-ভারত যৌথতা নিয়েই। ১৯৭৩ সালে এদেশে যৌথ প্রযোজনার শুরু হয়। এ সংক্রান্ত প্রথম নীতিমালা হয় ১৯৮৪ সালে।

১৯৮৬ সালে আগের নীতিমালা বাতিল করে যৌথ প্রযোজনার নতুন নীতিমালায় বলা হয়, "যৌথ প্রযোজনায় ছবি নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য হবে উন্নতমানের ছবি উৎপাদনের জন্য কারিগরী বিশেষ দক্ষতা অর্জন, চিত্র শিল্পের উন্নতীকরণ এবং দেশের বাহিরে ছবির বাজার সম্প্রসারণ" (কাদের ১৯৯৩,

পৃ২৭১)। যদিও নীতিমালার এই উদ্দেশ্যগুলো কখনোই বাস্তবায়ন হয়নি। শূন্য দশকের শুরু থেকে যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রে ইন্ডাস্ট্রি ভরে যাওয়া; ২০০৭ সালে তা বন্ধ হলেও এর প্রভাবে চলচ্চিত্র ব্যবসায় ভাটা পড়ে। একদিকে চলচ্চিত্র নির্মাণ কমে যায়, অন্যদিকে প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে যৌথ প্রযোজনার নতুন করে যাত্রা ও এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়।

এই আলোচনা শুরুতে শূন্য দশকে যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্রের অবস্থা দেখে নেওয়া যাক। ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে দেশে মুক্তি পেয়েছে মোট ৫০৯টি চলচ্চিত্র। এর মধ্যে যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র ছিলো মাত্র ১০টি। ২০০৬ থেকে ২০১০ সালে যৌথ প্রযোজনার মাত্র দুটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। এই পাঁচবছরে মোট ৩৬৬টি চলচ্চিত্র মুক্তি পায় (খান ২০১৬, পৃ২৪২)। এই এক দশকে যৌথ প্রযোজনার ১২টি চলচ্চিত্রের বেশির ভাগই ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে নির্মিত।

শূন্য দশকের শেষের দিকে চলচ্চিত্র ব্যবসা চরম মন্দাভাবের কারণে দেশীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের একটি অংশ ভারত থেকে চলচ্চিত্র আমদানির ব্যাপারে চেষ্টা চালায়। এরই অংশ হিসেবে ২০১০-এ সরকার উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্র আমদানির ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা ছিলো তা তুলে নেয়। ব্যবসায়ীদের একটি পক্ষ ভারত থেকে *জোর*, *বদলা* ও *সংগ্রাম* নামে তিনটি চলচ্চিত্র আমদানিও করে। এর তীব্র বিরোধিতা করে দেশীয় প্রযোজক, পরিচালক, কলাকুশলীদের একটি পক্ষ এবং তা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। চাপের মুখে সরকার ২০১০ সালের ১৮ জুন আমদানির ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই পরিস্থিতিতে একটি পক্ষ এবার ভারতের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হয়। সিলেটের ময়না মিয়া বলেন, ‘এখন মানুষ আমাদের দেশের সিনেমার চেয়ে ভারতের সিনেমা বেশি দেখতে চায়। যৌথ প্রযোজনার সিনেমা আসলে মানুষ দেখে। কারণ ওরা ভালো ভালো জায়গায় গিয়ে সিনেমাটা বানায়, আইটেম সঙ থাকে, অভিনয় ভালো করে, তাই দর্শক এগুলো দেখতে পছন্দ করে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৭)।’

যশোরের শওকত আলী মনে করেন, ‘বাংলাদেশের সিনেমা আর চলবে না। বিগ বাজেটের কোনো সিনেমা বানালে সেই সিনেমা চালানোর সিনেমাহল কোথায়? আর সিনেমাহল না থাকলে টাকা উঠবে কীভাবে। এখন একটাই বুদ্ধি যৌথ প্রযোজনার সিনেমা যদি বানানো যায়, তাহলে দুই দেশে চালিয়ে কিছু টাকা তোলা যাবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৭)।’

এই পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট লোকজন যৌথ প্রযোজনার বিদ্যমান নীতিমালা (সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে প্রণীত) সংশোধনের চেষ্টা চালায়। যৌথ প্রযোজনার পথকে সুগম করতে বিদ্যমান নীতিমালাকে পরিমার্জন করে ‘যৌথ প্রযোজনা চলচ্চিত্র নির্মাণ নীতিমালা ২০১২’ জারি করা হয় [নং ৩ম/চলচ্চিত্র-১/৯৮/৪৯২] (খান ২০১৬, পৃ২৪৩)। নতুন এ নীতিমালায় উল্লেখযোগ্য সংশোধনী ছিলো—যৌথ

চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মুখ্য শিল্পী এবং কলাকুশলীর সংখ্যা প্রযোজকরাই চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করবে। অথচ আগের নীতিমালায় বলা ছিলো—"ছবি নির্মাণের জন্য নিয়োজিত মুখ্য শিল্পী ও কলাকুশলীদের সংখ্যা অংশগ্রহণ করা দেশের শিল্পী ও কলাকুশলীর সংখ্যার চাইতে আনুপাতিক হারে কম সংখ্যক হওয়া চলবে না। ছবির মুখ্য ভূমিকায় বাংলাদেশের শিল্পীদেরকে সমভাবে অংশ গ্রহণ করতে দিতে হবে" (কাদের ১৯৯৩, পৃ২৭২)। দেশের স্বার্থ বিবেচনায় সেসময় 'যৌথ প্রযোজনা চলচ্চিত্র নির্মাণ নীতিমালা ২০১২'কে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট একটি পক্ষ প্রত্যাখান করেন। এ বিষয়ে শ্রীমঙ্গলের মনিরের বক্তব্য ছিলো এমন—'এখন যৌথ প্রযোজনার সিনেমা বলে কিছু নাই। এগুলো খালি নামেই যৌথ। সব ইন্ডিয়ান লোকজন অভিনয় করে, বাংলাদেশের তো কেউ নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭)।'

তার পরও এই নীতিমালায় বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার যৌথ প্রযোজনায় অনন্ত জলিলের *দ্য স্পিড* (২০১২), বাংলাদেশ-জার্মানির যৌথ প্রযোজনায় মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর *টেলিভিশন* (২০১৩) মুক্তি পায়। এই দুটি চলচ্চিত্রের আলোচনায় অবশ্য যৌথ প্রযোজনার বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। অন্য আর দশটা দেশী চলচ্চিত্রের মতোই এ দুটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ২০১৪ সালে মুক্তি পায় বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজিত *আমি শুধু চেয়েছি তোমায়*। চলচ্চিত্রটি মুক্তির পর এনিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। **প্রথমত**, এই চলচ্চিত্রের মুখ্য চরিত্রে বাংলাদেশের কাউকে দেখা যায় না। **দ্বিতীয়ত**, বাংলাদেশে ব্যবহৃত চলচ্চিত্রটির পোস্টারে পরিচালকের নাম অশোক পাতি ও অনন্য মামুন লেখা থাকলেও কলকাতার পোস্টারে ছিলো কেবল অশোক পাতির নাম।

আমি শুধু চেয়েছি তোমায় সেসময় খুব ব্যবসা করে। চলচ্চিত্রটি দর্শকের ভিতর আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনেক নারী দর্শক দীর্ঘ দিন পর প্রেক্ষাগৃহে যায়। ময়মনসিংহের বিপ্লব হোসেন বলেন,

> আমি চলচ্চিত্র প্রতিনিধি হিসেবে 'মণিহার'-এ যৌথ প্রযোজনার একটা সিনেমা চালিয়েছিলাম—*আমি শুধু চেয়েছি তোমায়*। কী বলবো আপনাকে, এতো দর্শক আমি এই চাকরি জীবনে দেখি নাই। টিকিট বিক্রি শেষ, কিন্তু বাইরে তার দ্বিগুণ লোক সিনেমা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। এই ধরনের গল্প, নায়ক-নায়িকা নিয়ে সিনেমা বানালে দর্শক আসবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৪)।

রাজশাহীর 'উপহার'-এর গেইটম্যান আখলাক বলেন,

> *আমি শুধু চেয়েছি তোমায়* এর মতো সিনেমা অনেকদিন দর্শক দেখেনি। কাহিনি খুব বেশি নতুন না হলেও দর্শককে আকর্ষণ করে রাখার ক্ষমতা ছিলো। তবে গানগুলোও খুব আকর্ষণীয়। দর্শক মুক্তির আগেই টেলিভিশনে গানগুলো দেখে আগ্রহী হয়েছে। এছাড়া ডিসের কারণে ওই নায়ক-নায়িকাদেরও তারা আগে থেকেই চিনতো। এধরনের সিনেমা বাংলাদেশে বানাতে পারলেও সিনেমাহল চলবে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১৭)।

ভারতে *আমি শুধু চেয়েছি তোমায়*-এর প্রচার থেকে শুরু করে প্রদর্শন পর্যন্ত নির্মাতা হিসেবে কেবল অশোক পাতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশি পরিচালক কিংবা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নামও উল্লেখ ছিলো না। ভারতের চলচ্চিত্র হিসেবেই সেদেশে *আমি শুধু চেয়েছি তোমায়* প্রদর্শিত হয়। অনেকে অভিযোগ করেন, "মাত্র বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে দেশের কোনো পরিচালকের নাম কিনে সিনেমায় ব্যবহার করা হচ্ছে। যেজন্য দেখা যায়, ওই পরিচালক শুটিংয়ের তারিখ থেকে শুরু করে অনেক বিষয়েই কিছু জানেন না। 'আমি শুধু চেয়েছি তোমায়' ছবিতে পরিচালকের নাম সেভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে" (শিশির, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)।

তবে ভারতের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় বাংলাদেশের পরিচালকের নাম ব্যবহার না করার প্রবণতা অবশ্য নতুন নয়। এর আগে ১৯৮৫ সালে শক্তিসামন্ত ও সৈয়দ হাসান ইমাম পরিচালিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনার *অবিচার* ভারতে প্রদর্শনের সময় হাসান ইমামের নাম দেখানো হয়নি (খান ২০১৬, পৃ২৪৩)। তবে একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায়, দুই সময়ের দুটি ঘটনার মধ্যে পার্থক্য আছে।

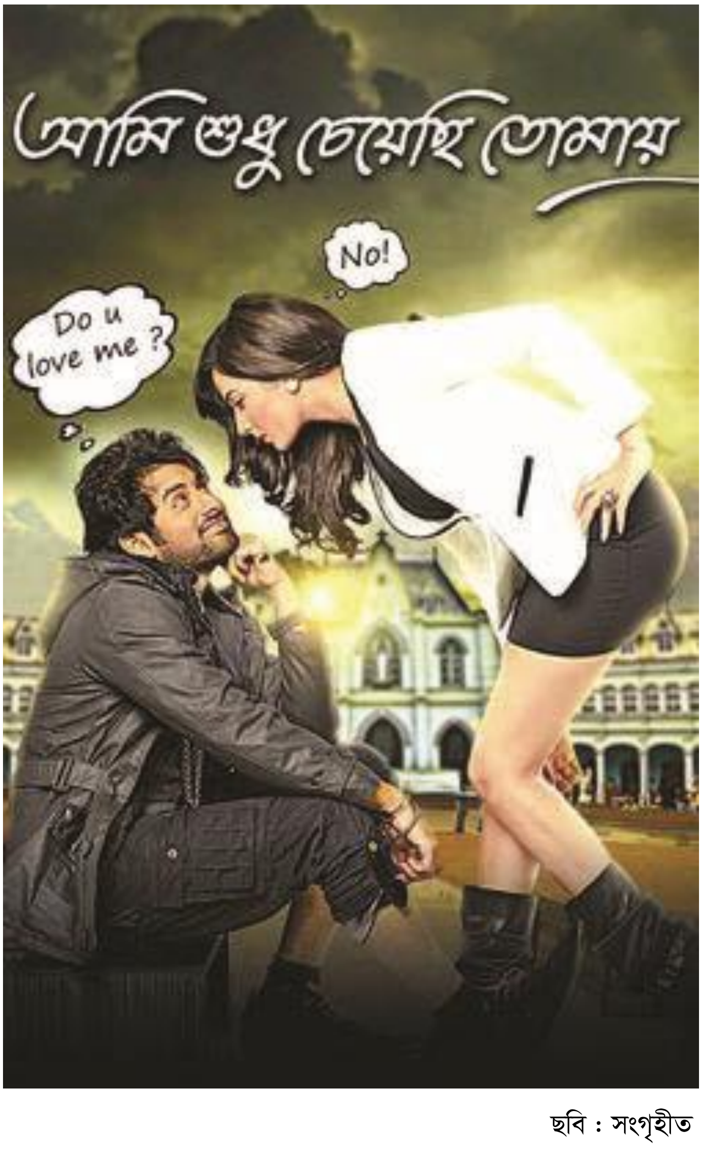

ছবি : সংগৃহীত

আমি শুধু চেয়েছি তোমায়-এর সাফল্যের পর বাংলাদেশের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাজ মাল্টিমিডিয়া ও ভারতের এস কে মুভিজের যৌথ প্রযোজনায় ২০১৫ সালে আরো দুটি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। *রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট* ও *আশিকি* নামে চলচ্চিত্র দুটি ভারতে প্রদর্শনের সময়ও বাংলাদেশের পরিচালক ও প্রযোজক কারো নাম ছিলো না। তবে বাংলাদেশে এই দুটি চলচ্চিত্রের প্রচার ও প্রদর্শনের সময় পোস্টার ও হল প্রিন্টে পরিচালক হিসেবে ভারতের অশোক পাতির সঙ্গে জাজের কর্ণধার আবদুল আজিজের নাম ছিলো। কুড়িগ্রামের মিরাজ বলেন,

> সর্বশেষ আমরা *রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট* ৫৬ হাজার টাকায় এনেছিলাম। ব্যবসা ভালোই হয়েছে। ঈদ ছাড়া আমার দেখায় গত দুই বছরের মধ্যে ৯–১২টার শো হাউসফুল হয়েছিলো একমাত্র *রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট*-এ। *অগ্নি* ২ও ভালোই চলছিলো। *আশিকি* এখানে চলেছিলো, তবে বাংলাদেশের আরেকটা সিনেমা *লাভ স্টোরি* একই কাহিনির হওয়ায় খুব একটা ব্যবসা করেনি (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৪)।

এছাড়া একই বছর মুক্তি পাওয়া *ব্ল্যাক* (২০১৫) চলচ্চিত্রটির প্রচার ও প্রদর্শনে একই ধরনের প্রতারণা লক্ষ করা যায়। কলকাতার দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া ও বাংলাদেশের কিবরিয়া ফিল্মস যৌথভাবে চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করে। পরিচালক হিসেবে ভারতের রাজা চন্দের সঙ্গে বাংলাদেশের কামাল কিবরিয়া লিপুর নাম বলা হয়। এতে ভারতের সোহমের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যা সিনহা মিম অভিনয় করেন। অথচ কলকাতার দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়ার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত *ব্ল্যাক*-এর অফিসিয়াল টিজারে যৌথ প্রযোজনা তো দূরের কথা বাংলাদেশের পরিচালক কিংবা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নামের ছিটেফোঁটাও ছিলো না। টিজারের পরিচালক হিসেবে শুধু রাজা চন্দের নাম দেওয়া হয়েছে। আর প্রযোজক হিসেবে রয়েছেন কলকাতার রানা সরকার। এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বরিশালের আলম হাওলাদার বলেন, 'আগেও তো অনেক যৌথ সিনেমা হয়েছে। আমাদের শাবানাও যৌথ সিনেমা করছে। কিন্তু এখন তো ইন্ডিয়া থেকে সিনেমা বানায়া এনে যৌথ সিনেমা বলছে। এই সিনেমা কীভাবে যৌথ হয়! এখন নিজের স্বার্থের জন্য, পয়সার জন্য তারা এইভাবে যৌথ সিনেমা করছে। এটা হলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.১৩)!'

পত্র-পত্রিকা মারফত আরো জানা যায়, *ব্ল্যাক*-এ যৌথ প্রযোজনার নীতিমালার দুই দেশের শুটিংয়ের শর্ত পূরণ করা হয়নি। বাংলাদেশ বাদ দিয়ে শুধু ভারত আর ব্যাংককে শুটিং করেই চলচ্চিত্রটি শেষ করা হয়। এ নিয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রপাড়ায় কথা হলে এবং সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশ হলে রাজা চন্দ হুট করে বাংলাদেশে একটি গানের শুটিংয়ের ব্যবস্থা করেন। যদিও চলচ্চিত্রের কাজ আগেই শেষ হয়েছে তারপরও লোক দেখানো কায়দায় কক্সবাজারে সোহমকে নিয়ে এসে একটি গানের শুটিং করান (মাজিদ, ১১ নভেম্বর ২০১৫)। অভিযোগ রয়েছে, ২০১৫ এর ৩০ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই শুটিংয়ে ২৫

জন ভারতীয় কলাকুশলী অংশ নেন এবং তাদের বেশির ভাগেরই বাংলাদেশে কাজ করার ওয়ার্ক পারমিট নেই। যদিও নির্মাতা কিবরিয়া দাবি করেন, এসব অভিযোগ অসত্য ।

এছাড়া নিয়ম না মেনে যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণের অভিযোগের পাশাপাশি বাংলাদেশের নির্মাতা, শিল্পী ও কলাকুশলীদের নানাভাবে ঠকানোর অভিযোগও রয়েছে। যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্রে বাংলাদেশের শিল্পীদের ছোটো করে দেখার বিষয়েও অনেকে প্রতিবাদ জানান। তবে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ হলো, যৌথ প্রযোজনার আড়ালে ভয়াবহ রকম অর্থ পাচার করা হচ্ছে (শিশির, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)। যদিও এ নিয়ে সরকারে দিক থেকে তেমন কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। ময়মনসিংহের দর্শক সাখাওয়াত আলী শিবলি বলেন, 'যৌথ প্রযোজনার সিনেমায় ভালো-খারাপ দুটি দিকই আছে। তাই যৌথ প্রযোজনার সিনেমা নির্মাণের সময় আমাদের দেশের স্বার্থ দেখতে হবে। কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই সময় যদি আমরা নিজেদের ইন্ডাস্ট্রির দিকে নজর না দিই, সেটা খুব খারাপ হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২১)।'

২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসেন পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। অনেকের প্রত্যাশা ছিলো, মমতার এ সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা নানা দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে সুরাহা হবে। বিশেষ করে আলোচিত তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির ব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে একটা ভালো ফয়সালা হবে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে মমতা ও তার সফরসঙ্গীদের আগ্রহের বিষয় ছিলো পশ্চিমবঙ্গের বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য বাংলাদেশের বাজার ধরা কিংবা বাজার সৃষ্টি করা। এই সফরে মমতা বলেছিলেন, 'দুই দেশের সিনেমা শিল্প নিয়ে অনেক জট রয়েছে। আমি সেগুলো খোলার চেষ্টা করছি।' এই সময় মমতার সফরসঙ্গী হিসেবে ঢাকায় এসেছিলেন নায়ক দেব। তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের স্বার্থে 'দুই বাংলা'কে এক করে দেওয়ার কথা বলেন। সর্বোপরি মমতা ও তার সফরসঙ্গীরা হিন্দি চলচ্চিত্রের আমদানি ঠেকানোর জন্য বেশি করে যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা মমতার এই উদ্যোগকে সেসময় ইতিবাচকভাবে নেননি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেসময় নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী তার ফেইসবুক আইডিতে লেখেন,

> মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বাংলাদেশ সফরের আগে এক ধরনের মিডিয়া হাইপ তৈরি করা হয়েছে। তার সফরে তিস্তা, সীমান্ত চুক্তি নিয়ে আশাবাদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বাস্তবিক অর্থে এসব ব্যাপারে তার কোনো ক্ষমতাই নেই। এগুলো একান্তই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার। এখন দেখা যাচ্ছে মমতার এ সফর মূলত আমাদের এখানে কলকাতার সিনেমার বাজার সৃষ্টি করার জন্য' (খান ২০১৬, পৃ২৪৫)।

এ নিয়ে কুষ্টিয়ার রাজন আহমেদ মনে করেন, 'কলকাতা যেমন বাংলাদেশে বাজার খুঁজছে, আমাদেরও নতুন বাজার খোঁজা দরকার। যৌথ প্রযোজনার যেসব সিনেমা হচ্ছে, সেগুলো দিয়ে ওরা আমাদের

এখানে ব্যবসা করলেও ওদের ওখানকার ব্যবসার সুযোগ কিন্তু দিচ্ছে না। এখন আমাদের আরো সিনেমাহল লাগবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫১)।'

যৌথ প্রযোজনা নিয়ে কিছুটা ভিন্ন ধরনের কথা বলেন শ্রীমঙ্গলের অসেন দাশ বলেন,

> আপনারা যারা যৌথ প্রযোজনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেছেন করেন, তাতে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু ওই ধরনের সিনেমা তাহলে বানাতে পারেন না কেনো? আমার দেশের সিনেমা যদি ভালো চলে, তাহলে আমি বিদেশি সিনেমা আনবো কেনো? আগে বাংলাদেশে এতো ভালো গল্পের সিনেমা হয়েছে, অথচ এখন আপনারা সবাই অফ হয়ে গেলেন। ব্যবসা করতে গেলে তো সিনেমা লাগবেই (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.২০)।

মূলত যৌথ প্রযোজনার নামে এই দশকে যা ঘটেছে, তা ছিলো ব্যবসায়িক কৌশল মাত্র। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ব্যবসার খারাপ অবস্থার সুযোগ নিয়ে দেশি-বিদেশি দুটি পক্ষ এক হয়ে এই বাজার দখল করতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে তারা সোজা পথে না গিয়ে ভিন্ন পথে পা বাড়িয়েছে। অথচ যথাযথ নিয়মনীতি মেনে যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণ হলে হয়তো দুই দেশের চলচ্চিত্রের জন্যই মঙ্গলই হতো। মান সম্পন্ন যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্রের কারণে বাংলাদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হতে পারতো। যে প্রতিযোগিতা হয়তো স্থানীয় নির্মাতাদের মান সম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণে বাধ্য করতো। কিন্তু এর কোনোটাই হয়নি; বরং অনিয়ম করতে গিয়ে যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণ স্থগিত করা গেছে। ফলে দেশীয় বাজারে কিছুটা হলেও চলচ্চিত্রের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হওয়ার অন্য অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটাও একটি কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

৬.৭.৯) **চলচ্চিত্রের প্রচার-প্রচারণা**

নানা কারণেই চলচ্চিত্রের প্রচার-প্রচারণার ধরন পাল্টে গেছে। আগে চলচ্চিত্রের প্রচারের মাধ্যম ছিলো সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন, রেডিও-টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন, মাইকে প্রচার, পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি। তবে এতো কিছুর বাইরে সব সময়েই চলচ্চিত্রের প্রচার-প্রচারণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিলো স্বয়ং দর্শক। মানে কোনো দর্শক নিজে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে কোনো চলচ্চিত্র দেখে এসে যখন আরেকজনের কাছে ওই চলচ্চিত্র সম্পর্কে ইতিবাচক মূল্যায়ন দেন, তখনই প্রচারের সবচেয়ে বড়ো কাজটা হয়। বর্তমানে আগের মাধ্যমগুলোর সঙ্গে ফেইসবুক, ইউটিউব যুক্ত হওয়ার পরও চলচ্চিত্রের প্রচার-প্রচারণা নিয়ে নানা সমস্যা দেখা যাচ্ছে। কারণ প্রচার-প্রচারণার প্রধান যে মাধ্যম সেই দর্শকই আর প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখছে না। ফলে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আলোচনা-সমালোচনা এখন আর তাদের কথাবার্তার বিষয়বস্তু নয়, ফলে একটা বড়ো অংশ বন্ধ হয়ে গেছে। খুলনার 'শঙ্খ'-এর বুকিং ক্ল্যার্ক কাম প্রচারম্যান ওবায়দুর রহমান বলেন,

> সিনেমার প্রচার কখনো পোস্টার, মাইকিংয়ে হয় না। সিনেমার প্রচার হয় মুখে মুখে। এই যে আজকে শুক্রবার মর্নিং শোতে যে লোকজন এই সিনেমাটা দেখে যাবে। তারাই পরের শোয়ের প্রচার করবে। ১০ জন লোক যদি সিনেমাটা দেখে মজা পায়, তাহলে এরা গিয়ে আর ১০ জনকে সেটা বলবে। ওই ১০জন আরো পাঁচজনকে বলবে; এভাবেই কিন্তু সিনেমার সেল বাড়ে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৩)।

যশোরের মোল্যা ফারুক আহম্মেদ মনে করেন,

> এখন সিনেমার প্রচার হয় না বললেই চলে। আগে সিনেমা মুক্তির আগে অনেক ব্যানার তৈরি হতো। মার্কিন কাপড়ের উপর প্রথমে রঙ, তারপর হাত দিয়ে আর্ট করে এসব ব্যানার তৈরি হতো। এখন তো ডিজিটাল সিস্টেম, এতো কষ্ট করতে হয় না। ওই শিল্পটা কিন্তু মার খেয়ে গেছে, তাদের জীবন এখন খুব কষ্টে চলছে নিশ্চয় (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার শঠিবাড়ীর 'সোহাগ সিনেমা'য় ঈদের চলচ্চিত্রের প্রচার চলছে এভাবেই। ছবিটি ২০ আগস্ট ২০১৮ পীরগঞ্জ উপজেলা থেকে তোলা।

ছবি : গবেষক

এই গাড়িতে করেই ৮০'র দশক থেকে প্রচার চালায় 'মণিহার' কর্তৃপক্ষ।

ছবি : গবেষক, ২৩ জানুয়ারি ২০১৭

শ্রীমঙ্গলের মনির বলেন, "আগে নিয়মিত 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় সিনেমার বিজ্ঞাপন থাকতো, রেডিও, টেলিভিশনেও চলতো। এখন সেগুলো নাই। আপনি যদি কাউকে না জানিয়ে সিনেমা মুক্তি দেন, তাহলে সেটা চলবে কী করে। এখন আমরাই সিনেমার খবর জানি না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭)।" একই ধরনের কথা বলেন কুষ্টিয়ার মোখলেছুর রহমান বকুল বলেন,

> এখন কোনো পত্রিকায় সিনেমা রিলিজের খবর পাওয়া যায় না। মানুষ জানবে কীভাবে সিনেমার কথা। তারা না জানলে সিনেমাহলে আসবে কীভাবে? আগে সিনেমা রিলিজের সময় বড়ো বড়ো ব্যানার, ফটোসেট, হ্যান্ডবিল দেওয়া হতো। এখন খালি কিছু পোস্টার আর একটা ব্যানার দেয়। মানুষ আগে সিনেমাহলের ভিতরে বোর্ডে লাগানো ফটোসেট দেখেও আগ্রহী হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫২)।

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে খুলনার শাহাজান আলী মনে করেন, 'প্রযোজকরা সিনেমা বানানোর পর পাবলিসিটির জন্য আর খরচ বাড়াতে চায় না। তারা ভাবেন, নতুন করে আবার খরচ করবো, যদি না ওঠে। তারা এই শঙ্কার মধ্যে থাকে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩০)।' কুষ্টিয়ার মো. নাঈম বলেন, 'আগে সপ্তাহে সাত দিনই প্রচার করা হতো। এখন তিন-চার দিন করা হয়। কারণ প্রচার করেও তো লোক হয় না। তাই কী লাভ এতো প্রচার করে। একটা সিনেমা ভালো হলে দর্শক পরেরটাও দেখতে আসে। কিন্তু পরপর তো কোনো সিনেমা ভালোই হচ্ছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫৬)।'

পটুয়াখালীর 'তিতাস'-এর গেইটম্যান জয়নাল শরীফ বর্তমান পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেন একেবারে ভিন্নভাবে। তার কথা হলো—

> দর্শককে আমরা আর কতোবার ঠকাবো। আমরা ভালো সিনেমার কথা বলে পাবলিসিটি করে দর্শক আনার চেষ্টা করি। কিন্তু দর্শক সিনেমা দেখার পর হতাশ হয়ে ফেরত যায়। দর্শক যদি সিনেমাহলে এসে বিনোদন, কিছু শিক্ষা পায়, তাহলে সে পরবর্তী সময়ে অবশ্যই সিনেমাহলে আসতে চাইবে। সে নিজে আসবে আরো পাঁচজনকে নিয়েও আসবে। এখন দর্শক তো সেটা করতে পারছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২৩)।

কুষ্টিয়ার মোখলেছুর রহমান বকুলের কথায় শরীফের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'মানুষ যেভাবে সিনেমাহল থেকে ফিরে গেছে, এই মানুষকে ফিরে আনতে হলে নানা ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে সিনেমাহলে আসার জন্য জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন তৈরি করতে হবে। নানাভাবে দর্শককে সিনেমাহলে আসার জন্য উৎসাহিত করতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫২)।' প্রচার নিয়ে ভারতের উদাহরণ টেনে নেত্রকোণার পরিতোষ সাহা রায় বলেন, 'এই যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে একটা সিনেমার নির্মাণ শুরুর সময় থেকে প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়। আমাদের এখানে এরকম ব্যবস্থা এখনো চালু হয় নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২৪)।' খুলনার শাহাজান আলী বলেন, 'প্রচার-প্রচারণার জন্য একটা টেলিভিশন চ্যানেল হলে ভালো হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩০)।'

একথা ঠিক যে, দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে ডেকে নিয়ে বার বার ধোকা দেওয়া হয়েছে। কিংবা একবার ভালো কিছু তাদের সামনে হাজির করে দীর্ঘ দিন বঞ্চিত রাখা হয়েছে। ফলে দর্শক প্রচার-প্রচারণার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার বিকল্প নেই। বিষয়টি যেহেতু চলচ্চিত্রের মানের সঙ্গে জড়িত, তাই সবার আগে সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি। দর্শকের চাহিদা উপযোগী চলচ্চিত্র না নির্মাণ করে যতোই প্রচার চালানো হোক তাতে সাময়িক সফলতা আসলেও দীর্ঘ মেয়াদে ফল শূন্যই হবে। এছাড়া তথ্য-প্রযুক্তি এই যুগে আগের পুরনো মাধ্যমগুলোর সঙ্গে নতুন মাধ্যম হিসেবে ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউবকে ব্যবহার করতে হবে।

৬.৭.১০) **পাইরেসির ভয়াবহতা**

চলচ্চিত্রে পাইরেসি কম-বেশি সব সময়ই ছিলো। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের পর থেকে এই পরিস্থিতি বর্তমানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ওয়ান-ইলেভেনের পর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে পাইরেসি ও 'অশ্লীলতা' নির্মূলে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর সহায়তায় একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। তখন চলচ্চিত্র সংগঠন, বিশেষ করে প্রযোজক সমিতির সহায়তায় র‍্যাব পাইরেসি নির্মূলে জোরালো ভূমিকা রাখে। পরবর্তী সময়ে নানা কারণেই টাস্কফোর্স কাজের গতি হারায়। তবে শুধু আইন করে এটা রোধ করা যাবে না বলে অনেক প্রযোজকের ধারণা। এর জন্য একই সঙ্গে যেমন টাস্কফোর্স মাঠে থাকতে হবে, প্রযোজক সমিতিকে সক্রিয় রাখতে হবে। এই পরিস্থিতি নিয়ে খুলনার শেখ মোতাহারের ভাষ্য হলো,

> বিভিন্নভাবে নির্মাতা-প্রযোজকরা পাইরেসির কবলে পড়ে। অনেক সময় চলচ্চিত্র মুক্তির আগে বিশেষ কোনো মাধ্যমে পাইরেসির সঙ্গে জড়িত লোকজন চলচ্চিত্রের কপি পেয়ে যায়। তখন তারা প্রযোজকের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাইরেসি থামানোর জন্য মোটা অংকের টাকা দাবি করে। পাইরেসির কারণেও চলচ্চিত্রের ব্যবসা নষ্ট হয়েছে। পাইরেসি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রযোজক কোটি টাকা খরচ করে পাইরেসির কারণে ফকির হয়ে যাচ্ছে। অনেকে অভিযোগ করতেছে, সিনেমার ভিতরের লোকজন এটা করে। আবার কখনো সিনেমাহল থেকেও হচ্ছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২)।

কুড়িগ্রামের সাইদুল ইসলাম বলেন, 'এখন ইন্টারনেটে দেখা যাচ্ছে সবকিছু। সিনেমাহলের মাইকিং শুনে দর্শক দোকানে গিয়ে সেই সিনেমার খোঁজ করে। সিনেমাহলে যেতে চায় না। তাই সিনেমাহল ভেঙে মার্কেট করা ছাড়া এখন আর কোনো বুদ্ধি নেই। কারণ এভাবে সিনেমাহল চলতে পারে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৫)।' খুলনার 'শঙ্খ'-এর গেইটম্যান মনিরুজ্জামান মামুন বলেন, 'পাইরেসির কারণে ঘরে বসে যেকোনো সিনেমা দেখা যাচ্ছে। মানুষ চিন্তা করে, এই সিনেমা তো দুই দিন পর বের হবেই। তাহলে সিনেমাহলে যাওয়ার দরকার কী! এগুলো না থাকলে সিনেমাহলের ব্যবসা আরো বাড়তো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১)।' কুষ্টিয়ার 'বনানী'র গেইটম্যান রবিউল বলেন,

> বর্তমানে সিনেমা মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে সেটা দোকানে পাওয়া যায়। ১০ টাকা দিয়া একটা সিনেমা নিয়া ২০ জন মিলে দেখে। তাহলে এই যে সিনেমার একটা টিকেটের দাম ৪০ টাকা। আরো তো খরচ আছে। তাহলে এতো টাকা দিয়া মানুষ কেনো সিনেমা দেখবে। দশজন সিনেমা দেখতে গেলে ৪০ টাকা করি হলেও ৪০০ টাকা লাগতেছে। তার চেয়ে তো মেমোরিতে দেখাই ভালো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫৫)।

ব্ল্যাক নামে একটি চলচ্চিত্রের উদাহরণ টেনে কুড়িগ্রামের ভিডিও দোকানি নয়ন বলেন, "যৌথ প্রযোজনার সিনেমা *ব্ল্যাক* এই 'মিতালী' সিনেমাহলে চলার কথা ছিলো। কিন্তু সিনেমাটা বাংলাদেশে মুক্তি দেওয়ার তিন দিনের মধ্যে এর প্রিন্ট ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা আপনি বলেন, পাঁচ টাকায় যদি এ সিনেমা মেমোরি কার্ডে নিয়ে মোবাইলফোনে দেখা যায়, তাহলে মানুষ কেনো সিনেমাহলে আসবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১১)।"

ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেন একেবারে ভিন্ন কথা বলেন,

> পাইরেসি রোধে র‍্যাবের একটা টাস্কফোর্স একবার প্রস্তাব করেছিলো, আপনারা তো সিনেমা পাইরেসি হলে লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান করেন; তো আমাদেরকে খরচ হিসেবে প্রতি মাসে ৫০ হাজার করে টাকা দেন, আমরা কোনো পাইরেসি হতে দেবো না। তখন র‍্যাবের এ প্রস্তাবে প্রোডিওসাররা রাজি হয় নাই। কারণ সর্ষের ভেতরই ভুত আছে। তাই তারা কী আর ভুত সরানোর জন্য ওঝা ডাকবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।

পাইরেসি হওয়ার আরেকটি প্রক্রিয়া হলো, চলচ্চিত্র মুক্তির পর প্রেক্ষাগৃহের লোকজনের সহায়তায় একটি চক্র ক্যামেরায় পুরো চলচ্চিত্র ভিডিও করে। তারপর তা সিডি করে বাজারে কিংবা ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। শ্রীমঙ্গলের জহির খন্দকারের কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

> ইন্টারনেট সিনেমা কোথায় পাবে, যদি পাইরেসি না হয়। তাই সবার আগে পাইরেসি বন্ধ করতে হবে। কারণ আমরা এখানে সিনেমা চালাই আর লোকজন এসে বলে এই দেখেন আপনার সিনেমা আমার কাছে। আমি *বস ২* লাগিয়েছিলাম ঈদের পরের সপ্তাহে, তারপরও অনেক লোক। জায়গা না পেয়ে লোকজন বেঞ্চ ভেঙে ফেলছে। অথচ দুই দিন পর পাশের দোকানে ওই সিনেমা পাওয়া যাচ্ছে, সিনেমাহলে একটা লোক নাই। সব ঠাণ্ডা (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৬)।

একই ধরনের উদাহরণ দেন সিলেটের হারুন অর রশীদ। তার ভাষ্যামতে,

> গত বছর *আয়নাবাজি* খুব সাড়া ফেলেছিলো। কিন্তু যখন সেটা পাইরেসি হয়ে গেলো, তখন কেউ আর সিনেমাহলে আসে না। তবে সিনেমাহলে বসে কোনো সিনেমা দেখার যে আনন্দ, তা কিন্তু কম্পিউটার কিংবা মোবাইলফোন সেটে দেখে পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ মানুষ ওখানেই সিনেমা দেখছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৫)।

পটুয়াখালীর 'তিতাস'-এর পাবলিসিটির দায়িত্বে থাকা দুলাল বিশ্বাস বলেন, 'এখন প্রচারে গেলে বেশিরভাগ লোক চিৎকার করে বলে, এই সিনেমা তো আমাদের কাছে আছে। তাহলে সিনেমাহলে কেনো মানুষ আসবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২৪)! '

অনেক সময় প্রযোজকের কাছে তার নতুন চলচ্চিত্রের সিডি পাঠিয়ে টাকা দাবি করা হয়। ২০১২ সালে ‘প্রথম আলো’র অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের অসততার জন্যই প্রযোজকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সময় কোনো কোনো প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের সহায়তায় ডিভি ক্যামে মাধ্যমে ভিডিও করে তা বাজারে ছাড়া হয়। এজন্য প্রেক্ষাগৃহের মালিককে এক থেকে দুই লাখ টাকা দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রযোজক যদি ভিডিও চোরদের দাবি মতো টাকা না দেয়, তবে এই ভিডিও বিক্রি করে তারা ১৫ লাখ টাকার মতো আয় করে। আর প্রযোজককে পথে বসে যেতে হয় (মৈত্রী, ১২ জানুয়ারি ২০১২)। কুড়িগ্রামের মিরাজ বলেন,

> কোনো সিনেমা মুক্তি পাওয়ার ছয় মাসের আগে সেটা কোনোভাবেই ইন্টারনেটে পাওয়া উচিত নয়। আমার কাছে অনেক লোক এসে পাইরেসি করার জন্য টাকা পর্যন্ত দিতে চাইছে; আমি কিন্তু তাদের কথা শুনিনি। খুব বেশি সিনেমাহল থেকে কিন্তু পাইরেসি হয় না। গুটিকয়েক সিনেমাহল এই কাজটা করে, সেদিকে সবার খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে সেই সব সিনেমাহলে নতুন সিনেমা মুক্তি দেওয়া যাবে না। নাগেশ্বরী থেকে কিন্তু সিনেমার প্রিন্ট বের হয়। অবশ্য জাজের সিনেমাগুলোর পাইরেসি করতে পারে না, ওদের হলপ্রিন্ট বের হয় (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৪)।

যশোরের ‘মণিহার’-এর প্রধান অপারেটর মো. শফিউজ্জামান মিন্টুর সঙ্গে কথা হয় তার প্রজেক্টর কক্ষে বসে। তিনি ‘মণিহার’-এর বিশাল প্রজেক্টর কক্ষ ঘুরে দেখান। আগের ৩৫ মি মি প্রজেক্টরগুলো পলিথিন দিয়ে বেধে রাখা হয়েছে এক পাশে। বড়ো ঘরটাকে দুই ভাগ করে এক ভাগে এসি লাগিয়ে সেখানে ডিজিটাল প্রজেক্টর বসানো হয়েছে। মিন্টু আগে ৩৫ মি মি প্রজেক্টর চালাতেন এবং ডিজিটালও চালান। তিনি পাইরেসির সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখার সংস্কৃতি নিয়েও কথা বলেন। তার মতে,

> অনেকে কেবল পাইরেসির কথা। তো ভারতেও তো পাইরেসি হয়। ওরা নিজেরাও ইন্টারনেটে সিনেমা ছেড়ে দেয়। তারপরও ওদের সিনেমার ব্যবসা হয়। কারণ সিনেমাহলে গিয়ে সিনেমা দেখার যে মজা সেটা আলাদা। তাই ভারতে কেউ ঘরোয়া পরিবেশে সিনেমা দেখতে চায় না। তারা সিনেমাহলে গিয়েই দেখে। আমাদের দেশে সেই কালচারটা নষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এই কালচার বাংলাদেশে ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৫)।

২০১০ সালে ১০ জুলাই ‘প্রথম আলো’তে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রযোজক-পরিবেশ সূত্রে জানা গেছে, ভিডিও পাইরেসির শিকার হয়ে মোট ২২ জন প্রযোজক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলচ্চিত্র ছেড়ে চলে গেছেন (কামরুজ্জামান, ১০ জুলাই ২০১০)। এই হিসাব নিঃসন্দেহে আশঙ্কা জাগায়। কারণ কোটি টাকা খরচ করে চলচ্চিত্র নির্মাণের পরে যদি কোনো প্রযোজক টাকা ফেরত না পান, তাহলে এই ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকার কথাও নয়। এ নিয়ে শ্রীমঙ্গলের জহির খন্দকার গুরুত্বপূর্ণ মত দেন। তার ভাষ্যমতে,

> তিন মাসের আগে কোনো সিনেমা পাইরেসি হলে সমস্যা। শোনেন, এক *লাইলী মজনু* বাংলাদেশে ২৫ বছর চলেছে। ছয় মাস পর পর বাংলাদেশের বিভিন্ন সিনেমাহলে এটা লাগানো হতো। আমরাও যে কয়বার এটা

> আনছি তা মনেই নাই। আরেকটা সিনেমা ছিলো *আসামী*, ওই সিনেমার একটা গান 'ওরে ও পরদেশী'। যতোবার লাগাইছি বাম্পার সেল পাইছি (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৬)।'

সিলেটের রাশেদুল কবির মন্টু পাইরেসির জন্য সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করে বলেন,

> পাইরেসি কি আমরা করি? পাইরেসি হয় সরকারের কাছ থেকে। আমরা যখন একটা সিনেমা সেন্সরের জন্য পাঠাই সরকারের কাছে—আমার (ডিরেক্টর-প্রোডিওসার) কাছে তো সেটা মহামূল্যবান—কিন্তু সরকার তো সেটা পাইরেসি করে ফেলছে। আর আপনি যদি সরকারকে সন্দেহ করেন, তাহলে তো আপনার গর্দান যাবে। আমার এতো মূল্যবান জিনিস, ওতো বিক্রি করে দিছে পাঁচ–দশ হাজার টাকায়। আপনি তাহলে কী করবেন! অপরাধ কিন্তু সাধারণ মানুষ কম করে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১১)।

২০১১ সালের ৯ এপ্রিল ভিডিও পাইরেসির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৩ জনকে আটকের পর র‍্যাব এফ ডি সি'তে একটি সংবাদ সম্মেলন করে (*প্রথম আলো* ১০ এপ্রিল ২০১১)। সেখানে উপস্থিত তৎকালীন প্রযোজক-পরিবেশক সমিতির সহসভাপতি ও পাইরেসি প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক খোরশেদ আলম খসরু বলেন, র‍্যাবের অভিযানে আটক হওয়া তুষার নামে একজন প্রেক্ষাগৃহ থেকে চুরি করে নতুন একটি বাংলা চলচ্চিত্র ভিডিও করে, তারপর সেটা সিডিতে করে প্রযোজকের কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর সেই প্রযোজকের কাছে এই সিডির বিনিময়ে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করে। *মিয়া বাড়ির চাকর* নামে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এধরনের ঘটনা ঘটে বলে তিনি জানান। নির্মাতা কাজী হায়াৎ দাবি করেন, ২০১৪ সালে মুক্তি পাওয়া তার *সর্বনাশা ইয়াবা* চলচ্চিত্রটি ১০ দিনের মাথায় পাইরেসি হয়ে যায়। ফলে লগ্নিকৃত মূল টাকাই তিনি ফেরত আনতে পারেননি।

নির্মাতা বদিউল আলম খোকন দাবি করেন, বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রের কাজ তার শুরু করার কথা ছিলো, কিন্তু পাইরেসির ভয়ে প্রযোজকরা শুরুর সাহস পাচ্ছেন না। আরেক নির্মাতা ওয়াকিল আহমেদ দাবি করেন, তার নির্মিত *সেরা নায়ক* (২০১৫) দুর্বৃত্তদের অপতৎপরতায় আশানুরূপ ব্যবসা করতে পারেনি। বিশাল অংকের অর্থ দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দিয়েও রেহাই পাচ্ছেন না অনেক নির্মাতা ও প্রযোজক (মাজিদ, ১৪ অক্টোবর ২০১৫)। চট্টগ্রামের হাজী আবুল হোসেন বলেন, 'এখনই ভিডিও পাইরেসি রোধ করতে না পারলেও সিনেমা বাঁচানো সম্ভব নয়। কারণ কোনো সিনেমা মুক্তির তিন দিন পর যদি সেই সিনেমা পাঁচ টাকায় দোকানে পাওয়া যায়, তাহলে দর্শক সিনেমাহলে আসবে কেনো (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৪)!'

পাইরেসি নিয়ে 'মধুমিতা মুভিজ' ও 'মধুমিতা সিনেমা'র মালিক ইফতেখার নওশাদ বলেন, ১৯৯২ সালে বড়ো ভাই সালাউদ্দীন ফারুক মারা যাওয়ার পর থেকে আমরা চলচ্চিত্র নির্মাণ বন্ধ করে দিয়েছি। নির্মাণ বন্ধের পিছনে অন্যতম কারণ ছিলো পাইরেসি। অন্য আরো কারণ তো আছেই। এমনও হয়েছে চলচ্চিত্র মুক্তির তিন দিনের মাথায় বাজারে সেই চলচ্চিত্রের পাইরেসি সিডি পাওয়া গেছে। এই অবস্থায় এতো ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায় বিনিয়োগ করা সম্ভব নয় (মাজিদ, ১৪ অক্টোবর ২০১৫)। যশোরের মো. শফিউজ্জামান

মিন্টু বলেন, ‘পাইরেসি কোথায়, কীভাবে হয় সেটা কিন্তু প্রযোজক-পরিচালকরা জানে। ডাক্তারের শত্রু ডাক্তারই হয়; তাই একজন প্রযোজকের সিনেমা পাইরেসি করে আরেকজন প্রযোজকই (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৫)।’

প্রযুক্তির উন্নতির ফল হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও পাইরেসি বড়ো ধরনের সঙ্কট হিসেবে দেখা দিয়েছে। তারা নানা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়ে সেটা রোধের চেষ্টা করছে। এখনও এর যথাযথ সমাধান তারাও বের করতে পারেনি।

৬.৭.১১) প্রযোজনায় টেলিভিশন চ্যানেল

চলচ্চিত্র প্রযোজনায় টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এগিয়ে আসায় এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয়। শূন্য দশকে ঢালিউডের ব্যবসার খারাপ পরিস্থিতিতে এই ধরনের পদক্ষেপ চলচ্চিত্রে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেছিলেন। টেলিভিশন প্রযোজিত চলচ্চিত্র নির্মাণে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলো বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ‘চ্যানেল আই’। এছাড়া ‘এটিএন বাংলা’, ‘এনটিভি’, ‘আরটিভি’ও অল্পবিস্তর চলচ্চিত্র প্রযোজনা শুরু করে।

সারা পৃথিবীতেই চলচ্চিত্র সংস্কৃতিতে টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কখনো প্রদর্শনে কখনো নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে টেলিভিশন। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের ‘চ্যানেল ফোর’, ফ্রান্সের ‘কানালপুস’ ও ‘আর্তে’, জার্মানির ‘জিডিএফ’, জাপানের ‘এনএইচকে’, অস্ট্রেলিয়ার ‘এবিসি’, কানাডার ‘সিবিসি’ ও যুক্তরাষ্ট্রের ‘এইচবিও’ টেলিভিশন চ্যানেল উল্লেখযোগ্য উদাহরণ (মাসুদ ২০১২, পৃ১১৮)। বিভিন্ন দেশের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতও এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। কিন্তু বাংলাদেশে এই ধরনের চলচ্চিত্র করতে গিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। রাজশাহীর এম এ মোমিন রাঙ্গা বলেন,

> এই যে ‘চ্যানেল আই’ সিনেমা বানাচ্ছে। এরা নাটক বানিয়ে তার মধ্যে একটা কমার্শিয়াল গান ঢুকিয়ে দিয়ে বলতেছে, সিনেমাহলে মুক্তি দেওয়া হবে। এইসব নাটক-ফাটক জাতীয় সিনেমা বানিয়ে আজ ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস হয়ে গেছে। শোনেন, নাটক দিয়ে সিনেমাহল চলে না। সিনেমাহল চালাতে হলে সিনেমাই লাগবে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.২৬)।

টেলিভিশন চ্যানেলের প্রযোজনার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হয় টেলিভিশনে এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার নিয়ে। টেলিভিশনে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারে একটি চলচ্চিত্র দেখার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন দুইজন গবেষক। তাদের বর্ণনাটা এমন—

> ঘোষণাটা হয়েছিল সঠিক সময়েই। কিন্তু প্রদর্শনী শুরু হলো দশ মিনিট পর। টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠলো নিবেদিত প্রতিষ্ঠানটির নাম। শুরু হলো চলচ্চিত্র। কিন্তু বেশিক্ষণ আর দেখা হলো না। মিনিট দশেক যেতে না

যেতেই একটি কোম্পানীর সৌজন্যে সংবাদ বিরতি। চলচ্চিত্র থেকে সংবাদেই মনোযোগ। সেই মনোযোগও ধরে রাখা গেলো না বেশিক্ষণ, আবারো বিজ্ঞাপন বিরতি। এবার চলচ্চিত্রের না, সংবাদের। সংবাদ শেষ হলো। তারপর আশা ছিল এই বুঝি শুরু হবে সিনেমা। সেই আশাতেও গুড়েবালি। আবারও বিজ্ঞাপন বিরতি। এবার দুই–এক মিনিটের নয়, পাক্কা তেরো মিনিট। সংবাদ, বিজ্ঞাপন শেষে সব মিলিয়ে প্রায় বিশ মিনিট সময় লাগলো চলচ্চিত্র শুরু হতে। এতোক্ষণে চলচ্চিত্রের কাহিনীই ভুলে যাবার উপক্রম। কিন্তু এবার বেশ স্বস্তিতে টানা ২৪ মিনিট দেখা গেল সিনেমা। কাহিনীর ক্লাইমেক্স যখন চরমে, তখন আবার বিজ্ঞাপন ... (কর্মকার ও রাকিব ২০১১, পৃ২৩)।

তার মানে চলচ্চিত্রের যে ম্যাজিক তা এই প্রদর্শনে পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

এই ব্যাপারে প্রখ্যাত নির্মাতা তারেক মাসুদ বলেন, "চ্যানেল প্রযোজিত ছবির ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতাটি হচ্ছে, করপোরেট অর্থনীতি বা বিজ্ঞাপন-নির্ভর পরিবেশনা। সব দেশেই বিজ্ঞাপন বিরতি সহ্য করেই টেলিভিশনে চলচ্চিত্র দেখতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে চলচ্চিত্র বিরতি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেখতে হয়। এর কারণ, চলচ্চিত্রটি পুরোপুরি বিজ্ঞাপন অর্থায়নের ভিত্তিতে নির্মিত। বিজ্ঞাপনে ক্ষত-বিক্ষত যে চলচ্চিত্রটি টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয়, তার পুরোটা দেখার ধৈর্য কোনো দর্শকেরই থাকে না।" (তারেক ২০১২, পৃ১২১)। কিন্তু দেশীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সেদিক নজর না দিয়ে লগ্নি করা টাকা কোনোভাবে ফেরত পাওয়াতেই বেশি মনোযোগী। আর এজন্যই ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার। অন্যদিকে পুঁজি ফেরত নিশ্চিত হলে তাদের আর চলচ্চিত্রের প্রদর্শন নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার শেষ, তারপর দু-একটি হলে নাম সর্বস্ব মুক্তি দিয়েই সবকিছুর সমাপ্তি হয়। ফলে অধিকাংশ চলচ্চিত্রই সাধারণ মানুষ দেখতে পারে না।

এর বাইরে আরো একটা সমস্যা হলো—টেলিভিশন প্রযোজিত চলচ্চিত্রগুলো যথাযথ বাজেট পায় না। দেশীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক হোক, সৃজনশীল হোক, নতুন কিছু করতে হলে ফর্মুলা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো নাটকের ক্ষেত্রে ফর্মুলা ভেঙেচুরে নতুন কিছু করলেও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে মোটেও তা করতে পারেনি। এমনকি নাটকের মাধ্যমে তারা যে তারকা বানিয়েছে তাদের ওপরও ভরসা করতে পারেনি (মাসুদ ২০১২, পৃ৯৮)। ফলে টেলিভিশন প্রযোজিত চলচ্চিত্রের মান ও সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

নির্মাতা আবু সাইয়ীদ ইমপ্রেস টেলিফিল্মের চলচ্চিত্রগুলোর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন,

ইমপ্রেসের ২৬টি ছবির মধ্যে ৬টি ছবির মান ভালো বলা যাবে। বাকী ২০টি ছবিই অতি সাধারণ মানের। অনেক বিখ্যাত পরিচালকই তাদের সঙ্গে কাজ করেছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র বেরিয়ে আসেনি। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, তারা 'প্রযোজক'-এর ভূমিকা পালন করছে না। তাদের নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নাই। তাদের মূল লক্ষ্য টিভি প্রিমিয়ার এবং সেখানে প্রচারিত বিজ্ঞাপন থেকে মুনাফা নিশ্চিত করা। তারা যা

> প্রযোজনা করছে, তা না শৈল্পিক, না বাণিজ্যিক। তারা প্যাকেজ ডিল কায়দায় পুরো কাজটি করে, হয়তো তারা চলচ্চিত্রের কাহিনী পর্যন্ত জানে না (উদ্ধৃত, নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৮১)।

এই দর্শন নিয়ে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো চলচ্চিত্র প্রযোজনা করে নিয়মিত জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছে। তারা শিল্প-সংস্কৃতিতে পুঁজি বিনিয়োগের ধোয়া তুলে রাষ্ট্রের কাছে ভালো মানুষ সেজে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সুবিধা নিয়েছে; বিনিয়োগের টাকা লাভসহ অন্য কোনো খাত থেকে তুলে নিয়েছে। কিন্তু তাতে চলচ্চিত্রশিল্পের খুব বেশি লাভ হয়নি।

৬.৭.১২) প্রযোজনা-পরিবেশনা-প্রদর্শন নিয়ে জাজ মাল্টিমিডিয়া

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রশিল্পে ২০১১ সালে যাত্রা করা জাজ মাল্টিমিডিয়া শুরু থেকেই আলোচনা ও সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো। আব্দুল আজিজ নামে এক ব্যক্তি লিমিটেড এই কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি একই সঙ্গে চলচ্চিত্র প্রযোজনা, পরিবেশনা এবং প্রেক্ষাগৃহে প্রজেক্টর ও সার্ভার স্থাপনের ব্যবসা শুরু করে। জাজের প্রথম চলচ্চিত্র *ভালোবাসার রঙ* মুক্তি পায় ২০১২ সালে। নওগাঁর পত্নীতলার আ. রহমান বলেন,

> জাজ থেকে বিগ বাজেটের যেসব সিনেমা হচ্ছে, এগুলো কিন্তু ভালো ব্যবসা করছে। কিন্তু এখনকার ব্যবসায় কোনো প্রতিযোগিতা নাই। প্রতিযোগিতা না থাকলে তো ব্যবসা ভালো চলবে না। এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো প্রযোজনার ঘর জাজ মাল্টিমিডিয়া, তারা মাসে এখন দুইটা করে সিনেমা দেয়; কিন্তু দুইটা সিনেমা দিয়ে তো আর সিনেমাহল চলবে না। এখন এর সঙ্গে অন্যান্য প্রযোজনার ঘরগুলো যদি ভালো সিনেমা বানায়, তাহলে প্রতিযোগিতা হবে, দর্শকও হয়তো সিনেমাহলমুখী হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৪)।

২০১১ সালের আগে চলচ্চিত্র ব্যবসা কিংবা অন্য ব্যবসাতেও আবদুল আজিজ সেই অর্থে কোনো পরিচিত নাম ছিলো না। চলচ্চিত্র ব্যবসায় নাম লেখানোর অল্প দিনের মধ্যে আবদুল আজিজ বাংলাদেশে এক আলোচিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। তার কারণও অবশ্য ছিলো, একটা মৃতপ্রায় ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি যেভাবে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ শুরু করেন, তা দেখে যে কারোরই সন্দেহের অবকাশ ছিলো। জাজের প্রশংসা করে খুলনার মনিরুজ্জামান মামুন বলেন,

> জাজ ছাড়া অন্য যারা সিনেমা বানাচ্ছে, তাদের সিনেমা কেউ দেখতে আসছে না। একমাত্র জাজের সিনেমা হলেই আমরা দুই–চার টাকা রোজগার করতে পারছি। কিছু আনকমন দর্শকও সিনেমাহলে আসতেছে। জাজ ছাড়া অন্য যারা সিনেমা বানাচ্ছে তাদের লাইটিং, সাউন্ড ভালো না। আরো নানা সমস্যা আছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১)।

জাজ যখন এ ব্যবসা শুরু করে তখন চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ করা বেশিভাগ টাকাই ফেরত আসছিলো না। কিংবা এমন সম্ভাবনাও ছিলো না যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকাই চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়াবে! অথচ চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ করতে আবদুল আজিজকে দ্বিধাহীন মনে হয়েছে। অনেকে এর মধ্যে প্রথম থেকেই

কালো টাকার উৎস খুঁজেছেন, কিন্তু সহসা পাননি। আবার অনেকে এটাকে 'বড়লোকের ঘোড়া রোগ' মনে করেছেন। এ নিয়ে নওগাঁর আমিনুল ইসলামের ভাষ্য হলো, 'এই সময়ে জাজ নিয়ে অনেক আলোচনা, সমালোচনা আছে। কিন্তু জাজ এই অস্থির সময়ে যেভাবে প্রফেশনালি সিনেমার ব্যবসাটা করছে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতো কিছুর মধ্যেও জাজ চেষ্টা করছে। গান, গল্পের ক্ষেত্রে তো কিছু পরিবর্তন আসছে। সেই পরিবর্তনের পরিমাণও কম কীসে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৮)।'

চলচ্চিত্র নির্মাণ যখন প্রতি বছর কমছে, এক দশকের ব্যবধানে প্রায় ১২০০ প্রেক্ষাগৃহ কমে ৪৫০-এ এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় ২০১১ সালে ৪০০ প্রেক্ষাগৃহে ডিজিটাল প্রজেকশন পদ্ধতি চালুর ঘোষণা দিয়ে জাজ মাল্টিমিডিয়া প্রথম আলোচনায় আসে। সাতক্ষীরার দেবাহাটার আবু রাহান তিতু বলেন, '২০১৬ সালের জুলাই থেকে জাজ মাল্টিমিডিয়া মাসিক ২০ হাজার টাকায় আমার সিনেমাহলটি ভাড়া নেয়। তারপর তারা সিনেমাহলের আসনগুলো ও পর্দা পরিবর্তনের মাধ্যমে কিছু সংস্কার করে। নতুন প্রজেক্টর ও সার্ভার বসায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩৮)।'

জাজ যখন কাজ শুরু করে তখন দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে চলচ্চিত্র নির্মাণও পুরোপুরি শুরু হয়নি। এফ ডি সিতেও ডিজিটাল প্রযুক্তির তেমন কোনো যন্ত্রপাতিও ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে জাজ মাল্টিমিডিয়া চলচ্চিত্র নির্মাণে নির্মাতাদের ডিজিটাল উপকরণ সরবরাহ করে। তাদের প্রথম চলচ্চিত্র *ভালোবাসার রঙ* (২০১২) ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নির্মাণ হয় এবং এর মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণের সাহস পান নির্মাতারা। এছাড়া শূন্য দশকে ঢাকাই চলচ্চিত্রে অভিনয়শিল্পীর যে সঙ্কট দেখা দেয়, জাজ আসার পর তাও অনেকখানি কমতে শুরু করে। ২০১১ থেকে জাজ একে একে বাপ্পী, মাহিয়া মাহী, শিপন, নুসরাত ফারিয়া, জলি, রোশান, পূজা চেরি, সিয়াম আহমেদ প্রমুখ অভিনয়শিল্পী ঢাকাই চলচ্চিত্রে উপহার দেয়। নতুন নায়ক-নায়িকাকে সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে ময়মনসিংহের বদিউল আলম চৌধুরী বলেন,

> তবে জাজ-এর কিছু বিষয় আমার ভালো লাগে না। যেমন : জাজ মাহী ও বাপ্পীকে একেবারে নিজেদের করে রাখতে চায়। এটা মোটেও ঠিক নয়। আজকে মুক্তবাজারের যুগে কাউকে কোথায়ও আটকে রাখা ঠিক নয়। এর বাইরে জাজ ব্যবসায়ী হিসেবে ভালো প্রতিষ্ঠান। তারা ভালো সিনেমা তৈরি করে। তারা এখন এককভাবে ব্যবসা করছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৫)।

যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্রেও জাজ বিনিয়োগ করে। চলচ্চিত্রের চরম দুর্দিনের মধ্যে শাকিব খান অভিনীত চলচ্চিত্রের বাইরে জাজ মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত চলচ্চিত্রগুলোই কমবেশি ব্যবসা করেছে। বড়ো বাজেটের এসব চলচ্চিত্রের জন্য প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতো। কুড়িগ্রামের নয়ন বলেন, 'এখন জাজের সিনেমাগুলো কিন্তু ভালোই করছে, যেমন : *অগ্নি*, *অগ্নি* ২। এর বাইরে যারা সিনেমা বানাচ্ছে, তাদের অবস্থা খুব খারাপ (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১১)।'

এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকাই চলচ্চিত্রে **একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করে জাজ মাল্টিমিডিয়া**। যা কোনো ইন্ডাস্ট্রির জন্যই মঙ্গলকর ছিলো না। ময়মনসিংহের বদিউল আলম চৌধুরী মামুন বলেন,

‘দুইটা ঈদের সব সিনেমা তাদের; পহেলা বৈশাখ, ভ্যালেন্টাইন ডে’তে জাজ একা সিনেমা মুক্তি দিচ্ছে। এটা অবশ্য ঠিক নয়। এছাড়া দেশের বেশিরভাগ সিনেমাহলও তারা একধরনের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। এধরনের মনোপলি ব্যবসা মোটেও ঠিক নয় (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৫)।’ বদিউল অভিযোগের সুরে আরো বলেন, ‘জাজের কারণে অনেকে সিনেমা বানানো ছেড়ে দিয়েছে। সারা দেশের সব সিনেমাহলে তাদের দেড়শোর বেশি মেশিন রয়েছে। জাজের মালিক তো এখনই বলে, আমি চাইলে সিনেমা আসবে, না হলে আসবে না। আসলেই সে চাইলে এটা করতে পারবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৫)।’

রংপুরের শাহাবুদ্দীন মোল্লা জাজের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে আরো জোরালো অভিযোগ করেন এভাবে—

> এই যে জাজ মাল্টিমিডিয়া নামে একটা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, আমার মনে হয়, এরা পুরো সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিটাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য অনেকটা এমন—আমি যা বলবো তাই হবে। কিন্তু এটা তো ভালো কথা নয়। জাজ যখন প্রথম আসলো, তখন আমরা অনেক আশা নিয়ে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। তারপর ধীরে ধীরে এরা আমাদের ওপর একটার পর একটা শর্ত দিচ্ছে। আমরা কতো কষ্টে আছি, কিন্তু টিকিট প্রতি ওদের তিন টাকা করে দিতে হয়। ওরা কোনো ছাড় দেয় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২০)।

৪০০ প্রেক্ষাগৃহের কথা বললেও জাজ মূলত দেশের প্রধান প্রধান প্রেক্ষাগৃহগুলোসহ শতাধিক প্রেক্ষাগৃহে ডিজিটাল প্রজেকশন চালু করে। এর বিনিময়ে তারা এসব প্রেক্ষাগৃহ থেকে টিকিট প্রতি একটা অর্থ নিতে থাকে। বদিউল আলম চৌধুরী মামুন বলেন, ‘এখানে আমরাও জাজের মেশিন চালাই। মাথাপিছু দর্শকের কাছে জাজ তিন টাকা করে পায়। জাজের বাইরে যারা সিনেমা মুক্তি দেয়, তাদের কাছ থেকেও জাজ একটা টাকা নেয়। এভাবে জাজ চার দিক থেকে ব্যবসা করতেছে। তবে এর ভবিষ্যৎ খুব একটা ভালো নয় (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৫)।’ খুলনার শাহাজান আলী মনে করেন, ‘সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে বর্তমানে জাজ মাল্টিমিডিয়া ছাড়া কেউ নেই। জাজ তাদের নিজেদের প্রজেক্টর, সার্ভার দিয়ে সিনেমাহল চালাচ্ছে, এতে পাইরেসিটা কম হচ্ছে। অনেক প্রেডিওসারও এতে কিছুটা স্বস্তিতে থাকেন। কেউ কেউ ভালো সিনেমা বানিয়ে জাজ এর মাধ্যমে রিলিজ দিচ্ছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩০)।’

প্রেক্ষাগৃহের সার্বিক পরিস্থিতি ও জাজকে নিয়ে কথা বলেন শ্রীমঙ্গলের জহির খন্দকার। তার ভাষ্য হলো—

> আমাদের তো রিলের মেশিন। এই মেশিনে তো ডিজিটাল সিনেমা চালানো যায় না। সিনেমা চালাতে গেলে জাজ মাল্টিমিডিয়ার কাছে যেতে হবে। তখন ওরা আবার টাকা চায়। নিজেরা প্রজেক্টর কিনতে গেলে অনেক টাকা লাগে। একটা ভালো প্রজেক্টরের দাম দুই লাখ টাকা। এতো টাকা তো এখন মালিকরা ইনভেস্ট করতে রাজি নয়। এখন কম দামী প্রজেক্টর ভাড়া এনে আমরা চালাই, যখন-তখন নষ্ট হয়। ছবির অবস্থাও খারাপ। এক শো চলে তো আরেক শো চলে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৬)।

এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকাই চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে জাজ মাল্টিমিডিয়া ও আবদুল আজিজ ‘মিডিয়া মোঘল’ হয়ে উঠেন। তাদের একক আধিপত্যের কাছে অন্য প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান, নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী, পরিবেশকরা সমস্যায় পড়তে থাকে। শাহাজান আলী মনে করেন, ‘সব নিয়ন্ত্রণ এককেন্দ্রীক হয়ে গেছে। যদি জাজের মতো দুই–তিনটা ডিস্ট্রিবিউটর প্রতিষ্ঠান থাকতো তাহলে সমস্যা হতো না; ব্যবসারও প্রসার হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩০)।’

সেসময় জাজ মাল্টিমিডিয়া বা তার ঘরানার বাইরের কোনো প্রযোজক-নির্মাতা চলচ্চিত্র মুক্তি দিতে চাইলে তাদের সমস্যায় পড়তে হতো। যেহেতু জাজের প্রজেক্টরের অধীনে তখন দেশের শতাধিক প্রেক্ষাগৃহ ছিলো, ফলে জাজ এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতো। জাজের পরিবেশনার বাইরে গেলেই প্রেক্ষাগৃহগুলো সেসব চলচ্চিত্র নিতে চাইতো না। শ্রীমঙ্গলের মনিরও একই ধরনের কথা বলেন, ‘জাজ মাল্টিমিডিয়া ভালো করছে, কিন্তু একই সঙ্গে তারা সিনেমাহলগুলোকে জিম্মি করে ফেলেছে। তাদের সিনেমা না চালালে প্রজেক্টর পাওয়া যায় না। আবার তাদের প্রজেক্টরে অন্য সিনেমা চালানো যায় না। এটা কোনো স্বাধীন দেশের নিয়ম (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭)!’ রাজশাহীর ‘উপহার সিনেমা’র টিকেট কালোবাজারি শফিক বলেন, ‘ভাই, সিনেমা ভালো-খারাপ যাইহোক, জাজ এর সিনেমাই উপহারে লাগাতে হবে। কারণ এই হলের সব মেশিনজাজ মাল্টিমিডিয়ার (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১৯)।’

অন্যভাবে বললে জাজ এক ধরনের ‘ব্লক বুকিং’ (সব প্রেক্ষাগৃহে একই সময়ে নিজেদের চলচ্চিত্র মুক্তি দেয়ার কৌশল) শুরু করে। তাই অনেক প্রযোজক অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জাজ মাল্টিমিডিয়াকে পরিবেশক হিসেবে নেয়। পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার বলেন, “জাজ মাল্টিমিডিয়ার সিন্ডিকেটের কারণে ছবি বানিয়ে সুষ্ঠুভাবে মুক্তি দিতে পারছেন না প্রযোজকরা। তাদের কথার বাইরে কোনো হল মালিক ছবি নিতে পারেন না। নিলেও পরবর্তীকালে জাজ তাদের সার্ভার নিয়ে ঝামেলা করে এবং তাদের প্রযোজিত বড় বাজেটের ছবি ওই হলে মুক্তি দেয় না। ... তারা সার্ভার বসানোর মধ্য দিয়ে প্রেক্ষাগৃহগুলোকে জিম্মি করে ফেলেছে। এসব সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্রযোজকদের অনেকেই পুঁজি লগ্নি করতে চাইছেন না’ (মামুন, ১৬ নভেম্বর ২০১৭)। অবশ্য জাজ-এর পক্ষেও যুক্তি আছে। নওগাঁর আ. রহমান মনে করেন,

> এখন আপনি একটা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান চালান, সারা বছর আপনি কোনো সিনেমা বানালেন না, আপনার কোনো খোঁজ-খবর নাই, হঠাৎ করে ঈদের মধ্যে এসে আপনি বললেন, আমার একটা সিনেমা আছে আমি ব্যবসা করতে চাই। তাহলে জাজ সেটা করতে দেবে? জাজ অবশ্যই তখন সমস্যা তৈরি করবে। তখনই জাজ ব্লক ডিস্ট্রিবিউশন করে। তার যুক্তি, আমি তো সারা বছর লোকসান দিয়ে সিনেমা চালিয়েছে, তখন তো তুমি ছিলে না। তাহলে এখন কেনো (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৪)?

তবে এসব অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করেন জাজ মাল্টিমিডিয়ার চেয়ারম্যান আবদুল আজিজ। তিনি বলেন, "কোন ছবি চলবে, কোনটি চলবে না, তার সবকিছুই নির্ভর করে হলমালিকের ওপর" (মামুন, ১৬ নভেম্বর ২০১৭)।

যৌথ প্রযোজনার ক্ষেত্রেও জাজ মাল্টিমিডিয়া দেশে একধরনের অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। যৌথ প্রযোজনার কোনো শর্ত না মেনে জাজ মাল্টিমিডিয়া মূলত কলকাতার নির্মাতা ভাড়া করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে এবং তা যৌথ প্রযোজনা হিসেবে চালাতে থাকে। যৌথ প্রযোজনার নামে ভারত থেকে নির্মাতা ভাড়া করার বিষয়টি প্রথম স্পষ্ট নজরে আসে ২০১৫ সালে নির্মিত *রোমিও বনাম জুলিয়েট*-এর মাধ্যমে। এই চলচ্চিত্রের পোস্টারে পরিচালকের কোনো নাম ছিলো না; ছিলো কেবল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাজ-এর নাম। পরে চলচ্চিত্রের মধ্যে টাইটেল কার্ডে দেখা যায়, পরিচালক হিসেবে নাম এসেছে কলকাতার অশোক পাতি ও বাংলাদেশের আজিজ মোহ। আজিজ মোহ মানে আবদুল আজিজ। এখানে যেহেতু একজন দেশি পরিচালকের নাম দরকার, তাই প্রযোজক ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে নিজে পরিচালক হিসেবে আবির্ভুত হন। এক্ষেত্রে তিনি পুরো নাম ব্যবহার না করে কেবল 'আজিজ মোহ' দেন। নামের এই অর্ধেক ব্যবহার দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, প্রযোজকের এখানে সৎ উদ্দেশ্য ছিলো না।

তবে জাজ-এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে কিছুটা ভিন্ন মত দেন নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহান। তার ভাষ্যমতে,

> জাজের কারণে বাংলাদেশের ফিল্ম ধ্বংস হয়েছে, এটা আমি মনে করি না। তারা এসেছে, সিনেমা করেছে, যার কারণে কিছু সিনেমাহল চলেছে—এটা একেবারেই কারেক্ট কথা। একই সঙ্গে তারা যেটা করেছে, নতুন প্রযুক্তিটাকে ইনভল্ভ করেছে আমাদের মধ্যে। আমরা আগে ফিল্মে কাজ করতাম, এরপর সেটা ডিজিটালে কনভার্ট হয়ে গেছে। আমি মনে করি, ডিজিটালে কনভার্ট হওয়াটা একটু বেশি ফাস্ট হয়ে গেছে। জাজ কিছু নতুন শিল্পী এনেছে, ইন্ডিয়ার সঙ্গে জয়েন্ট ভেনচার করেছে—এইসব নিয়েই কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে তাদের মতভেদ ছিলো। জাজ এই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারতো, কিন্তু তারা সেটা করেনি। দুই পক্ষই নিজেদের মতো করে চিন্তা করেছে। ফলে এদের আর ওদের মধ্যে তফাৎ এইটুকুই ছিলো। তবে যদি দুই পক্ষ এক সঙ্গে কাজ করতে পারতো, তাহলে হয়তো আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না। এখন তো জাজ নেই (আখ্যানের ক্রম ৫.৫; ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

জাজ মাল্টিমিডিয়া যখন দেশের ধ্বংসপ্রায় চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে, ঠিক সেই সময় প্রকাশ পায় জনতা ব্যাংকের পাঁচ হাজার কোটি টাকার ঋণ কেলেঙ্কারির খবর। প্রতিবেদনে বলা হয়, এই কেলেঙ্কারির পর্দার আড়ালে রয়েছে জাজ মাল্টিমিডিয়া (আদনান, ২৭ আগস্ট ২০১৮)। ভুয়া রপ্তানি নথি তৈরি করে জনতা ব্যাংক থেকে গত পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি বের করে নিয়েছে ক্রিসেন্ট গ্রুপ। এ কেলেঙ্কারির বড়ো অংশই হয়েছে রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড নামে একটি

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এই রিমেক্সের চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন আবদুল আজিজ, যিনি জাজ মাল্টিমিডিয়ারও কর্ণধার। জনতা ব্যাংক কেলেঙ্কারির পর্দার আড়ালের প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েছে জাজ মাল্টিমিডিয়া। জনতা ব্যাংকের সূত্রমতে, ব্যাংক থেকে বের করে নেওয়া ঋণই জাজ মাল্টিমিডিয়ার অর্থের মূল উৎস। এছাড়া রপ্তানির আড়ালে ক্রিসেন্ট গ্রুপের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারেরও প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এই কেলেঙ্কারি প্রকাশের পর থেকে জাজের চেয়ারম্যান আবদুল আজিজ পলাতক রয়েছেন। এরফলে প্রায় আট বছর ধরে জাজ নিয়ন্ত্রণ করা এফ ডি সি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রে বড়ো ধরনের ধাক্কা লাগে। ৭০–৮০ এর দশকে চলচ্চিত্রে কালো টাকা বিনিয়োগের যে অভিযোগ পাওয়া যায়, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে ২০১১ তে এসেও।

৬.৮) **প্রেক্ষাগৃহে বোমা হামলা**

এই দশকের শুরুতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা ঘটে—২০০২ সালের ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের চারটি প্রেক্ষাগৃহ ‘ছায়াবাণী’, ‘পূরবী’, ‘অলকা’ ও ‘অজন্তা’য় একযোগে বোমা হামলা হয়। এই আতঙ্ক প্রেক্ষাগৃহ থেকে ছড়িয়ে পড়ে গোটা চলচ্চিত্রাঙ্গনে। মূলত প্রেক্ষাগৃহে বোমা হামলা ছিলো দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতির চরম অবস্থার ফল। বোমা হামলার পর সারাদেশের প্রেক্ষাগৃহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক হ্রাস পায়। ময়মনসিংহের গৌরি চৌহান বলেন, “বোমা হামলার পর থেকে সিনেমাহলে মেয়েদের আসা বন্ধ হয়ে গেছে। যেদিন ‘ছায়াবাণী’তে বোমা হামলা হয়, সেদিনও মেয়েদের ক্লাসের ১২৫টি আসন ভরা ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৬)।” সিলেটের ‘নন্দিতা’র গেইটম্যান ফারুক মিয়া বলেন, ‘সবার প্রথম হুমকিটা আসলো সিনেমাহলে বোমা হামলা থেকে। বোমা হামলার পর অনেক দর্শক ভয় পেলো। অনেকে সিনেমাহলে আসা ছেড়ে দিলো। তার পর আসলো ডিসলাইন ও মোবাইলফোন। এখন ইন্টারনেটে দর্শক অনেক কিছু পায়। ইন্টারনেট আসার পর থেকে দর্শক আরো বড়ো আকারে কমে গেলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১১)।’

বোমা হামলার পর অনেক প্রেক্ষাগৃহ সেসময় নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেয়, ঢোকার মুখে মেটাল ডিটেক্টর বসায়। প্রত্যেক দর্শককে তল্লাশি করে প্রেক্ষাগৃহ ঢোকানো শুরু হয়। এতো কিছুর পরও অনেকে আতঙ্কের মধ্যে পড়ে। অনেকে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে তার বসার জায়গা ও আশপাশ তল্লাশি করতে থাকে। ময়মনসিংহের আলম বলেন, ‘দুই দিন আগে *নবাব* দেখার জন্য এক দর্শক আসছিলো। আমার একটু পরিচিত। টিকিট কেনার পর সে আমাকে বললো, বোমা হামলার পর এই প্রথম তিনি সিনেমাহলে এসেছে। তার মানে ওই লোকের মধ্যে এতোদিন ধরে একটা আতঙ্ক কাজ করছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১২)।’ ময়মনসিংহের নূরজাহান বেগম বলেন, ‘আগে আমরা নিয়মিত সিনেমা দেখতাম; শহরে

সিনেমাহলগুলোতে বোমা হামলার পর গত ১৬ বছর সিনেমা দেখতে আসিনি। এইবার *নবাব* দেখতে আসছি (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১৩)।'

ময়মনসিংহের সুমন বোমা হামলার পরবর্তী অবস্থা নিয়ে বলেন, 'বোমা হামলার পর এখানে অনেক দর্শক কমে গেছে। বিশেষ করে ওই সময় যারা সিনেমাহলে ছিলো কিংবা যারা ওই পরিস্থিতি দেখছে; তারা এখনো সিনেমাহলে আসতে চায় না। আমিও এই চাকরি আর করতে চাইনি। মালিক বাসা থেকে জোর করে এনে আমাকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.৩)।'

'অজন্তা' ভেঙে ফেলা হয়েছে; এখনো টিকে আছে 'ছায়াবাণী' ও 'পূরবী'।

ছবি : গবেষক, ১১ জুলাই ২০১৭

ময়মনসিংহের প্রেক্ষাগৃহে বোমা হামলার পর প্রায় এক বছর সরকারি নির্দেশে সেগুলো বন্ধ রাখা হয়েছিলো। তারপর জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ধীরে ধীরে প্রেক্ষাগৃহগুলো চালু করে মালিকরা। কিন্তু শুরুতে দর্শক প্রেক্ষাগৃহে আসতে খুব একটা সাহস পেতো না। ফলে তারা খুব সমস্যায় পড়ে। দর্শক নেই ব্যবসা চলছে না, একদিকে যেমন এই অবস্থা; অন্যদিকে মালিকরা নতুন এক সমস্যায় পড়ে, বিভিন্ন মহল থেকে প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের ওপর নানা ধরনের চাপ আসতে থাকে। বিশেষ করে দুই–একজন মালিককে প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। এমনকি প্রভাবশালী মহল থেকে পরামর্শ আসে প্রেক্ষাগৃহ ভেঙে শপিং মল করার জন্য (ইসলাম ২০১৬, পৃ৬৩)। প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের বোঝানো হয়, শপিং মল করলে বোমা হামলা নিয়ে যে মামলা আছে, তা তুলে নেওয়া হবে এবং আইনি ও রাজনৈতিকভাবে কোনো হয়রানি হবে না। "এরই ধারাবাহিকতায় সনাতন ধর্মাবলম্বী মালিক ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের মধ্যে সমঝোতায় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে শপিং কমপ্লেক্স করার নামে প্রথম ভেঙে ফেলা হয় 'অলকা'" (ইসলাম ২০১৬, পৃ৬৩)।

২০০৭ সালের দিকে ময়মনসিংহের 'অজন্তা' প্রেক্ষাগৃহ নিয়েও একই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রভাবশালীদের সঙ্গে দ্বন্দের একপর্যায়ে 'অজন্তা'র মালিক এটা ভেঙে ফেলতে বাধ্য হন। এছাড়া

নামমাত্র মূল্যে ২০০৭ সালে মালিকানা হস্তান্তর হয় নগরীর চামড়াগুদাম রাস্তার আরেক প্রেক্ষাগৃহ 'পূরবী'র। বোমা হামলা তো একটা পরিস্থিতি ছিলো, পরে শুরু হয় রাষ্ট্রের সমর্থনে রাজনৈতিক দলগুলোর সন্ত্রাস। প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা বোমার হামলার ক্ষত কাটিয়ে উঠলেও পরেরটা আর সামলাতে পারেননি।

৬.৯) চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী

শূন্য দশকে দেশীয় চলচ্চিত্র একদিকে যেমন মানের দিক থেকে একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো, অন্যদিকে এই দশকেই সম্ভাবনাময় ডিজিটাল পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। শূন্য দশকের শুরু থেকেই একের পর এক নির্মাণ হতে থাকে যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র। ফলে এক শ্রেণির নির্মাতা, শিল্পী আর কলাকুশলীর হাতে বন্দি হয়ে পড়ে ইন্ডাস্ট্রি। এই ধরনের পরিস্থিতিতেও সমকালীন একদল নির্মাতা মান্না, ওমর সানি, মৌসুমী, ফেরদৌস, রিয়াজ, পূর্ণিমা, শাবনূর প্রমুখ অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। তারপরও একদল নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলী কাজ হারাতে থাকে।

এই সময় চলচ্চিত্র নির্মাণের মান, অভিনয়, সঙ্গীত, নায়ক-নায়িকা, এসবের চেয়ে অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে দীর্ঘ দিন এগুলো নিয়ে কথা বলার পরিস্থিতিই তৈরি হয়নি। এই সময়ে এমন অনেক নির্মাতা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, যাদের চলচ্চিত্র নিয়ে সেই অর্থে কোনো জ্ঞানই ছিলো না। খুলনার নাঈম যথার্থই বলেন, 'ধরেন, আপনি একটা সিনেমা বানিয়েছেন, ভালো হয়নি। আপনি জানেন, এটা চলবে না। পরিচালক তখন প্রযোজককে বুঝিয়ে এর মধ্যে দুইটা কমার্শিয়াল গান ঢুকাইয়া দিলো। একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেন, আপনি কখন খারাপ লাইনে যাবেন, যখন আপনার সব কিছু ঠিকঠাক চলতেছে না তখন (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৭)।'

এই সব চলচ্চিত্রে ক্যামেরার ভাষা, শিল্প নির্দেশনা, পোশাক পরিকল্পনা, সঙ্গীত বলে কিছু ছিলো না। কোনো মতে ভিডিও করতে পারলে আর বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ জায়গায় ক্যামেরা ধরতে পারলেই ক্যামেরাম্যান হওয়া যেতো। সুরকার, গীতিকার ও শিল্পী সবাই মিলে যেনো কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিলেন যৌনতা বিক্রি করতে।

> সেকালের ছবির পোশাক কিংবা দেশীয় নারীর পোশাক শাড়ি অথবা সালোয়ারের জায়গা দখল করেছে বেলবটম, ট্রাউজার, টাইট টি-শার্ট অথবা গেঞ্জি। ঝালর লাগানো বক্ষ আবরণীর নিচে ঘাগরার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। যা দিয়ে শুধু লজ্জা ঢাকা যায়, আব্রু রক্ষা করা যায় না। শিহরণ জাগানো নিত্যনতুন কসটিউম ডিজাইনের আবর্তে হারিয়ে গেছে নায়িকার নিজস্ব সত্তা। নাচের ধরনেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন নাচ মানেই নায়িকার শরীর এবং বক্ষযুগলের উথালপাতাল দৃশ্য। বেশিরভাগ ছবিতেই নায়িকারা হয়ে পড়েছেন পরিচালকদের হাতের যৌনপুতুল (জেয়াদ ২০১০, পৃ২৭৮)।

এই পরিস্থিতিতে এক শ্রেণির দর্শক প্রেক্ষাগৃহে গেলেও একটা বড়ো অংশ মুখ ফিরিয়ে নেয়। যশোরের মো. ইউসুফ বলেন, 'প্যান্ট খোলা, জামা খোলা ওইসব সিনেমা বেশি দিন চলে নাকি! ওগুলা দেখে তো

কোনো ভদ্র ফ্যামিলি সিনেমাহলে আসবে না। ভদ্র ফ্যামিলির লোকজন ভালো পোস্টার দেখে সিনেমাহলে ঢোকে। ওরা যদি দেখে নায়ক-নায়িকা জাঙ্গিয়া, ব্রেসিয়ার পরে আছে, তাহলে ওরা আসবে? এতে আসবে দুই–চারজন যুবক ছেলে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৩)।' খুলনার জালাল শিকদার বলেন, 'আমাদের পরিচালকদের কিছু ভুল ছিলো। তারা পলি, ময়ুরী, স্বপ্না এই নায়িকাদের দিয়ে একসময় শর্ট প্যান্ট পরে ন্যাংটা নাচ নাচাইছে। যার কারণে মহিলারা আসা বন্ধ হয়। ওই কারণেও আমাদের ক্ষতি হয়েছে। আর বাকিটা করছে ভারতীয় চ্যানলের সিরিয়াল (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৮)।'

এইসব নায়িকার নাম তখন দর্শক জানতো না বা জানার প্রয়োজন মনে করেনি। কারণ এই নায়িকারা মোটেও তাদের অভিনয়গুণ দিয়ে দর্শকের মন জয় করেনি। তারা শরীর প্রদর্শনের মাধ্যমে দর্শকের মন জয় করতে থাকে। একইভাবে অনেকে নায়ক হয়েছেন কেবল টাকার জোরে। তাদের অভিনয় জানার দরকার পড়ে নাই। ময়মনসিংহের এনামুল হক বলেন, 'তখনকার নায়ক-নায়িকাদের কেউ চিনতো না। আগের রাজ্জাক, শাবানা, আলমগীর সর্বশেষ মৌসুমী পর্যন্ত এদেরকে মানুষ চিনেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১৪)।'

কুষ্টিয়ার রবিউল আরো পরিষ্কার করে বলেন, 'দেশের সিনেমার অবস্থা খুবই খারাপ। আমার টাকা আছে আমি নায়ক। নায়ক হতে এখন অভিনয় জানা লাগে না, টাকা লাগে। এখন ওই লোক যদি হিরো হয়; ওই সিনেমা দেখবে কে! নায়ক হওয়ার জন্য চেহারা, অভিনয় জানা লাগবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫৫)!' নেত্রকোণার স্বপন মিয়া বলেন, 'এখন তো বেশিরভাগ নায়িকা কোনো অভিনয় জানে না। খালি শরীর দেখায় (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২০)।' ফলে নওগাঁর পত্নীতলার সিরাজুল ইসলামের কথায় শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়। তার ভাষ্যমতে, 'এসব খারাপ সিনেমা দেখার জন্য তো আর পরিবার নিয়ে কেউ আসে না। এসব সিনেমা দেখে চেংড়া, পোলাপান; যারা রিকশা-ভ্যান চালায় তারা। এগুলা আগে খুব চলছে। এখন সেই সিনেমাও দেখার মতো দর্শক নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৬)।'

২০০৭-এর পর পরিস্থিতির খানিকটা পরিবর্তন হয়। যে নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীরা চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন, তাদের কেউ কেউ ফিরতে শুরু করেন। কুড়িগ্রামের দেবলাল রজক দেওয়ান এই সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করেন এভাবে—

> সর্বশেষ যে তল্লাশিটা হয়, সেইবার ম্যাজিস্ট্রেট কাটপিস রিল পেয়ে সিনেমাহল সিলগালা করেছিলো। সেই সময় যে ছবিটা আমরা চালাইছিলাম, সেটা একেবারেই খোলামেলা ছিলো। ঘটনার দিনে অন্যান্য স্টাফরা খুব বেশি ছিলো না। আমি সিনেমা চালাচ্ছিলাম। নিচে কথাবার্তা শুনে মেশিন ঘর থেকে বের হয়ে দোতলার বারান্দা থেকে দেখি, একজন ম্যাজিস্ট্রেট আর সঙ্গে বিডিআর। এরা পোস্টার ছিড়ছে, আগুন লাগায় দিচ্ছে। আমি তো সেই ভয় পেয়ে গেছি। এই অবস্থা দেখে আমি কোনোরকমে খালি মেশিনটা বন্ধ করে অন্য একটা সিড়ি দিয়ে নেমে পালাইয়ে গেছি। তারপর থেকে আমরা আর এই সিনেমা চালাই নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৮)।

২০০৭ সালের পর ওই ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ কমে গেলেও পরিস্থিতি আর আগের জায়গায় ফেরেনি। চলচ্চিত্র নির্মাণের মান, কাহিনি, অভিনয়, সঙ্গীত নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা হঠাৎ

করে বদলে ফেলা সম্ভব হয়নি। তারপরও সেই চেষ্টা কোনো কোনো নির্মাতা করেছেন। তেমনি দুটি চলচ্চিত্র এফ আই মানিকের *কোটি টাকার কাবিন* (২০০৬) ও গিয়াসউদ্দিন সেলিমের *মনপুরা* (২০০৯)। গবেষণার সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলোর আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে শূন্য দশক ও ২০১৫ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এই দুটি চলচ্চিত্রের নামই এসেছে (সারণী ৬.১.১)। এই পর্যায়ে চলচ্চিত্র দুটি আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দুই প্রভাবশালী পরিবারের দ্বন্দ্ব নিয়ে গড়ে উঠেছে *কোটি টাকার কাবিন*-এর কাহিনি। শিকদার বাড়ি আর তালুকদার বাড়ির দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। এই দ্বন্দ্ব ক্ষমতার, আধিপত্যের, অভিজাত্যের। এরই মধ্যে শিকদার বাড়ির ছোটোছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক হয় তালুকদার বাড়ির ছোটো মেয়ের। মেঝো তালুকদার সুলতানের মধ্যস্থতায় বিয়েতে রাজি হয় দুই পরিবার। কিন্তু তালুকদার পরিবারের মনে ছিলো খারাপ চিন্তা। তারা বিয়েতে বসে এক কোটি টাকা নগদ কাবিন দাবি করে শিকদার পরিবারের কাছে। তাৎক্ষণিক নগদ এতো টাকা দিতে শিকদার পরিবার অপারগতা প্রকাশ করলে তাদের অপমান করা হয়। এক পর্যায়ে নিজের ভাইয়ের গুলিতে বর মারা যায় ও পরে কনে আত্মহত্যা করে। এভাবে দুই পরিবারের শত্রুতা আরো জোরালো হয়।

ছবি : সংগৃহীত

এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে শিকদার বাড়ির মেয়ে সিমরানের সঙ্গে তালুকদার বাড়ির ছেলে ফাহিমের পরিচয় হয়। সুন্দরবনে শিক্ষাসফরে গিয়ে তারা দুজন হারিয়ে যান এবং ঝড়ের কবলে পড়ে আরো কাছাকাছি আসেন। তাদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি হলে সিমরান-ফাহিম গ্রামে চলে আসেন। জানা যায়, আসলাম শিকদারের মেয়ে সিমরান আর তালুকদার বাড়ির ছেলে ফাহিম। সিমরান-ফাহিমের বিয়ে নিয়ে আবারো মধ্যস্থতা করেন সুলতান তালুকদার।

সুলতান তালুকদার যৌবনে নানা খারাপ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে এখন সৎ জীবনযাপন করেন। তাই পরিবারের অন্য তিন ভাইয়ের সঙ্গে সবকিছুতেই তার মতবিরোধ হয়। পুরো চলচ্চিত্রেই সুলতান তালুকদার সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে হাজির থাকেন।

সিমরান-ফাহিমের বিয়ের আসরে এবার আসলাম শিকদার জানায়, তাদের পরিবারের রীতি অনুযায়ী পাঁচ কোটি টাকার কাবিন করতে হবে এবং তা পরিশোধ করতে হবে নগদে। এদিকে সিমরানও জানিয়ে দেয় পারিবারিক প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশেই এতোদিন তিনি ফাহিমের সঙ্গে মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করেছেন। ফলে বিয়ে ভেঙে যায়।

সিমরানের প্রতারণায় ফাহিম ভেঙে পড়েন। পাশে দাঁড়ায় সুলতান চাচা। তারা দুজনে মিলে নানা উপায়ে সিমরানের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। দেখা করতে গিয়ে এক সন্ধ্যায় সিমরানের চাচার হাতে ধরা পড়ে ফাহিম প্রচণ্ড মার খান। এসব ঘটনায় কষ্ট পান সিমরানও।

এদিকে রাহুল চৌধুরী নামে এক লম্পটের সঙ্গে সিমরানের বিয়ে ঠিক করে শিকদার পরিবার। সিমরান তার ভুল বুঝতে পেরে বাগদান অনুষ্ঠান থেকে ফাহিম-সুলতানের সঙ্গে তালুকদার বাড়ি চলে যান। পুলিশের সহায়তায় শিকদার পরিবার তাকে ফিরিয়ে আনে। সুলতান পাঁচ কোটি টাকা নগদ দিয়ে ফাহিমের সঙ্গে সিমরানকে বিয়ে করে আনার জন্য সময় চান শিকদারের কাছে। শিকদার সময় দেন। এই কথা শুনে বিয়ের দিন সিমরানকে তুলে নিয়ে যান রাহুল। ফাহিম আর সুলতান চাচা মিলে রাহুলের কাছ থেকে সিমরানকে উদ্ধার করেন। শেষে পুরানো শত্রুতা ভুলে গিয়ে ফাহিম, সিমরানের বিয়ে হয় এবং দুই পরিবার মিলে যায়।

শাকিব-অপু থাকলেও এই চলচ্চিত্রের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন ডিপজল। যিনি ফাহিমের চাচা সুলতান। চলচ্চিত্রটি এমন এক সময় নির্মাণ হয় যখন ডিপজলের জনপ্রিয়তা চরমে এবং ঢাকাই চলচ্চিত্র সহিংসতা ও কাপপিসওয়ালা চলচ্চিত্র থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। একেবারে গতানুগতিক কাহিনির এই চলচ্চিত্রে সেই অর্থে নতুন কিছু ছিলো না। এর সংলাপ, অভিনয় সবই ছিলো অত্যন্ত প্রথাগত। চলচ্চিত্রের গানগুলোও সেই অর্থে জনপ্রিয় হয়নি। তারপরও চলচ্চিত্রটি দর্শক দেখেছে।

এই দশকের সবচেয়ে আলোচিত চলচ্চিত্র ***মনপুরা***। এর গানগুলো খুবই জনপ্রিয়তা পায়। এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন টেলিভিশন নাটকের অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী চঞ্চল চৌধুরী। গ্রামীণ সাধারণ খেটে মানুষের জীবন, তাদের শোষণ, সঙ্গে চির সবুজ এক প্রেমের কাহিনি বলেছে *মনপুরা*। চলচ্চিত্রটির এই সরলতা দর্শককে আকর্ষণ করেছে।

প্রভাবশালী গাজী সাহেবের মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলে হালিম খুন করেন বাড়ির কাজের মেয়েকে। গাজী ও তার বউ বুদ্ধি করে সেই দায় বাড়ির কাজের ছেলে সোনাইয়ের ওপর চাপিয়ে তাকে নির্জন মনপুরা দ্বীপে রেখে আসেন। সহজ-সরল সোনাইকে গাজী বোঝায় সেও তার ছেলে মতোই। এতিম সোনাইয়ের

এতেই যেনো শান্তি। নির্জন, জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপে সময় কাটে না সোনাইয়ের। কথা বলার জন্য তার সঙ্গী 'সুখ পাখি' নামের ময়না পাখি, কয়েকটা ছাগল আর গাভী।

ছবি : সংগৃহীত

এভাবেই চলছিলো। হঠাৎই তার সঙ্গে দেখা হয় এক জেলে ও তার মেয়ে পরীর। প্রথম দেখাতেই তাদের মধ্যে ভালোবাসা হয়। সোনাই-পরীর মন উতলা হয়ে ওঠে। বাবাকে ফাঁকি দিয়ে একদিন পরী দেখা করতে আসে সোনাইয়ের সঙ্গে। সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে গাজী সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় পরীর। গাজী সাহেব তার মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলের জন্য মনে মনে পরীকে পছন্দ করেন। অন্যদিকে সোনাইকে খুশি রাখার জন্য গাজী বলেন তিনি পরীর বাড়িতে তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবেন।

পরীর বাড়িতে সোনাইয়ের বিয়ের জন্য গিয়ে হালিমের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেন গাজী সাহেব। সব সম্পতি পরীর নামে লিখে দেওয়ার পরিবর্তেও গাজী বিয়েতে রাজি হন। গাজীর এই বিশ্বাসঘাতকতা কষ্ট দেয় সোনাইকে। নিরুপায় সোনাই নদী/গাঙ পাড়ি দিয়ে পরীর সঙ্গে দেখা করতে যান। দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নেন পালিয়ে যাওয়ার। পরদিন রাতে পরীর মশালের নিশানা অনুযায়ী আসার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন সোনাই। সোনাইকে থামানোর জন্য গাজী সাহেবই পুলিশ পাঠান মনপুরায়। সোনাই না আসায় হালিমের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় পরীর। এই বিয়ে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না পরী।

এদিকে হালিমের মা কৌশলে পরীরে জানান, সোনাইয়ের ফাঁসির রায় হয়েছে। এই শুনে মুষড়ে পড়েন পরী। হালিমের মা বানিয়ে বানিয়ে যে রাতে সোনাইয়ের ফাঁসি হওয়ার কথা পরীকে বলেন, সেই রাতেই পরী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এদিকে জামিন পেয়ে সোনাই গ্রামে এসে দেখেন সব শেষ হয়ে গেছে।

*মনপুরা*র কাহিনি বিয়োগাত্মক হলেও শেষ দৃশ্যে সোনাইয়ের কষ্টে দর্শক কষ্ট পেয়েছে। সেই কষ্টের মধ্যেই দর্শক আনন্দ খুঁজে নিয়েছে। *মনপুরা*র সবচেয়ে বড়ো শক্তি এর গল্পের সরলতা। দর্শক একটা

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই গল্পে বুদ হয়ে ছিলেন। এর বাইরে চলচ্চিত্রটির লোকেশন, শিল্পীদের অভিনয় নিয়েও প্রশ্ন কম উঠেছে।

*মনপুরা*র আরেকটি শক্তিশালী জায়গা ছিলো তার সঙ্গীত। টাইটেল কার্ড দেখানোর সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজে 'নিধুয়া পাথারে নেমেছি বন্ধুরে/ ধরো বন্ধু আমার কেহ নাই/ তোলো বন্ধু আমার কেহ নাই'। এর পর ৪২ মিনিট ২০ সেকেন্ডে দেখা যায় পরীর মন উদাস সোনাইয়ের প্রেমে। দিনে দেখা করে এসেছেন, কিন্তু কথা হয় নাই। এই পরিস্থিতিতে রাতে পাশের বাড়ির গানের দলের দাদীর কণ্ঠে গান, 'সোনারও পালঙ্কের ঘরে/ লিখে রেখেছিলাম দ্বারে/ যাও পাখি বল তারে সে যেনো ভোলে না মোরে'।

সোনাইয়ের জন্য বিয়ে ঠিক করার কথা বলে নিজের ছেলে হালিমের সঙ্গে পরীর বিয়ে ঠিক করেছেন গাজী সাহেব। বিয়ের প্রস্তুতি চলছে। এদিকে সোনাইকে ধরার জন্য পুলিশ হানা দিয়েছে মনপুরার চরে। এই পরিস্থিতিতে গান এক ঘণ্টা ১৭ মিনিট ২৫ সেকেন্ডে সোনাই গাইছেন, 'আমার সোনার ময়না পাখি/ কোন দেশেতে গেইলা উইড়া রে/ দিয়া মোরে ফাঁকি রে আমার'। রাতে গাঙের পাড়ে মশাল নিয়ে অপেক্ষায় আছেন পরী, সোনাই আসবে। সোনাইও তৈরি। কিন্তু সেই সময় পুলিশ আসে সোনাইকে ধরার জন্য। সোনাইয়ের আর আসা হয় না। পরী কষ্ট পান। সেই তীব্র কষ্টে গান এক ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ছয় সেকেন্ডে আবহে বাজে 'আগে যদি জানতাম রে বন্ধু তুমি হইবা পর/ ছাড়িতাম কী বাড়ি আমার ছাড়িতাম না ঘর'। পরী বিষ পানে আত্মহত্যা করেছেন। কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে এসেছেন সোনাই। পরীর লাশ দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুই ঘণ্টা ১০ মিনিটে আবহে বাজতে থাকে 'কেহ লইলো আতর লোবান/ কেহ লইলো জল/ কেহ লইলো বরইপাতা/ কেহ লইলো পরীরে/ সোনাই হায় হায়রে'।

চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভের সঙ্গে মিল রেখে প্রত্যেক গান যে আবহের সৃষ্টি করে, তা দর্শককে কাহিনির সঙ্গে একাত্ম করেছে।

৬.৯.১) চলচ্চিত্র নির্মাণ ও নির্মাতা

এই দশকে যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্রের বাইরেও কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাণ, অভিনয় ও অন্যান্য টেকনিকাল দিকে যে খুব বেশি পরিবর্তন আসে এমন নয়। এ নিয়ে খুলনার মো. মনিরুজ্জামান মামুনের মূল্যায়ন হলো, 'দশটা সাবজেক্টের মোটামুটি রেজাল্ট আসলেই, সেটা মোট করে একটা রেজাল্ট আসে। বর্তমান সিনেমার কোনো সাবজেক্টের অবস্থাই ভালো না; না আছে ফটোগ্রাফি, ক্যামেরার কোনো ভালো কাজ, না আছে সংলাপ, গীত; গল্প তো নেই-ই (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১)।' যশোরের মো. শফিউজ্জামান মিন্টু বলেন, 'সবাই খালি সস্তায় সিনেমা করতে চায়, একজন লোকই সব—নায়ক, পরিচালক, প্রযোজক। এটা করলে হয়! নতুন নায়ক নিলে কমপক্ষে একটু পুরনো, ভালো, অভিজ্ঞতা আছে এমন নায়িকা নিতে হবে। আবার এর উল্টোটাও হতে পারে। নায়ক-নায়িকার যেকোনো একজনকে ভালো হতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৫)।'

খুলনার মো. সুমন হোসেন একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘অনেকে সিনেমার খারাপ অবস্থার জন্য বলছে ডিস, মেমোরি, মোবাইলফোনের কথা; এটা ঠিক নয়। আমার মতে, সিনেমার কাহিনি ও মেকিং ভালো হলে মানুষ সিনেমা দেখবেই। কিন্তু সেটা হচ্ছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২০)।’ লাকসামের শামসুল ইসলাম কথায় এর সমর্থন মেলে। শামসুল মনে করেন, ‘একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, একজন ডিরেক্টর তার দক্ষতা দিয়ে একটা দুর্বল গল্পেও, ভালো সিনেমা বানাতে পারে। কিন্তু সেটা তো ডিরেক্টররা পারছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৭)।’

প্রখ্যাত নির্মাতা শেখ নিয়ামত আলী মনে করেন, “দেশে ভালো ছবি তৈরি হয়নি, এ দায় থেকে আমরা পরিচালকেরা মুক্ত হতে পারি না” (আলী, ১ মে ১৯৯৯)। কারণ নির্মাতানির্ভর এই মাধ্যমটির শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয় নির্মাতার সিদ্ধান্তে। ফলে নির্মাতা না চাইলেও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট কেউই কিছু করার সাহস রাখে না। ফলে দিনশেষে নির্মাতাই কোনো চলচ্চিত্রের সবকিছু দেখভাল করেন। নির্মাতাদের এই যোগ্যতা নিয়ে কথা বলেন যশোরের মো. ইউসুফ। তার ভাষ্যমতে, ‘এখনকার পরিচালক, প্রযোজকরা নায়ক-নায়িকাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। নায়ক-নায়িকাদের দোষ দেওয়ার তো কিছু নাই; দোষ হলো পরিচালকের। পরিচালক যেভাবে চাইবে নায়ক-নায়িকা তো সেভাবেই চলবে। ওরা তো আর নিজে থেকে কিছু করতে পারবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৩)।’

বাংলাদেশের পরিচালকদের বর্তমান কাজের ধরন নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন রাজশাহীর ‘উপহার’-এর গেইটম্যান আখলাক। তার ভাষ্য,

> সিনেমার দর্শক সিনেমা দেখবেই, ফুটবল খেলা-রোজা-বৃষ্টি তা ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু সাফি উদ্দিন সাফি *ফাঁদ* সিনেমায় তো দেখার মতো কিছুই নাই। সাফি সিনেমাটা ভালোভাবে বানাতে পারেন নাই। পারবেনেই বা কীভাবে, গত ছয় মাসে এটা মনে হয় তার তিন কি চার নম্বর সিনেমা। এক পরিচালক ছয় মাসে যদি তিনটা সিনেমার জন্ম দেন, সেই সিনেমাতো অপুষ্টিতে ভুগবেই—এটা আর নতুন কী (আখ্যানের ক্রম ৪.১.১৭)!

আখলাকের কথার সমর্থন পাওয়া যায় বরিশালের আ. মালেক মিয়ার কথায়। তিনি বলেন, ‘এখন সিনেমা দেখে মনে হয়, এগুলো বানানোর জন্য পরিচালকরা কোনো সময় দেয় না; খালি তাড়াহুড়ো করে। সময় নিয়ে একটা কাজ করলে অবশ্যই ভালো হবে। কিন্তু এটা পরিচালকরা করছে না। এরফলে কিছুই হচ্ছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.৩)।’ খুলনার নজরুল ইসলাম এ নিয়ে ভিন্ন ধরনের উদ্বেগের কথা বলেন, ‘আমি পরিচালক হবো আর প্রডিউসারের কিছু টাকা নিয়ে ভেগে যাবো; প্রডিউসারের যা হয় হোক, তাতে আমার কী! এই প্রবণতা থেকে সরে না আসলে কিছুই হবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৯)।’

আগে নানা ধরনের চলচ্চিত্র হলেও এখন নির্মাতা কেবল দুই-একটা ধরনের মধ্যেই আটকে আছেন। অথচ দর্শকের চলচ্চিত্র বেছে নেয়ার সুযোগ না থাকলে তারা প্রেক্ষাগৃহে আসতে চায় না। কারণ বর্তমানে অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমে তাদের বেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। চট্টগ্রামের মো. রফিক বলেন, 'আগে পরিচালকরা রোমান্টিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, ফ্যান্টাসি কতো ধরনের বিষয় নিয়ে সিনেমা করতো। আলাদা আলাদা সিনেমা আলাদা পরিচালকও ছিলো। এখন কেবল প্রেম আর মারামারি (আখ্যানের ক্রম ৪.২.৫)।' রংপুরের তসলিম উদ্দিন বলেন, 'এই যে ভারতে ছোটো একটা সাধারণ গল্পকে তারা অসাধারণভাবে উপস্থাপন করতে পারে। অথচ আমাদের এখানকার পরিচালকরা মনে হয় গল্পই খুঁজে পায় না। গল্প পেলেও সেটা বানাতে পারে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.২৪)।' যশোরের 'যশোর ইন্সটিটিউট' এর সাধারণ সম্পাদক শেখ রবিউল আলম চলচ্চিত্রের কাঠামো নিয়ে কথা বলেন,

> বাংলাদেশের সিনেমায় প্রয়োজন থাক না থাক, পাঁচ-ছয়টা গান থাকতেই হবে, সঙ্গে কিছু মারপিট আর কান্না। তাহলে দর্শক সেটা দেখবে কেনো! সিনেমায় কোনো কাহিনি নেই, কাহিনির বিন্যাস নেই। তাই এখন সিনেমাহলে আপার ক্লাসের কোনো দর্শক ঢোকে না, কেবল কুলি-মজুর-রিকশাওয়ালা ঢোকে—যাদের বিনোদন দরকার (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৮)।

পটুয়াখালীর জয়নাল শরীফের ভাষ্যমতে, 'আমাদের ডিরেক্টররা মেকআপ, পোশাক পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে ধরতে পারে না। একজন রিকশাওয়ালা কী ধরনের পোশাক পরে সেটাও মনে হয় তারা জানে না। একজন রিকশাওয়ালা কিংবা কৃষককে পর্দায় দেখে কৃষক মনে হতে হবে। তাছাড়া তো দর্শক বিশ্বাস করবে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২৩)।' মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের মঞ্জু চৌহান বলেন,

> ইদানিং যৌথ প্রযোজনার সিনেমাগুলো ভালোই ব্যবসা করতেছে। কারণ ওরা যেভাবে গল্পটা তৈরি করে, আমাদের পরিচালকরা সেটা পারছে না। অথচ ওইসব সিনেমায় নায়ক কিন্তু একই থাকে। তাহলে একই নায়ক ওখানে গিয়ে এতো ভালো অভিনয় কীভাবে করে! তার মানে আমাদের এখানকার পরিচালক ভালো নয়। আগে আমাদের সিনেমার গান ভালো ছিলো। এখন সেই গানও ভালো হয় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.২২)।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে নওগাঁর পত্নীতলার আমিনুল ইসলামের মুখে শোনা যায় একেবারে ভিন্ন কথা। তার ভাষ্যমতে,

> সমস্যা হলো প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে গেছে; আগে ব্যবসাসফল সুপার-ডুপার হিট সিনেমা ছিলো কোনটা, *বেদের মেয়ে জোস্না*; এখন আপনি ওই সিনেমা বানান সেই ব্যবসা করা কিন্তু সম্ভব না। ওই মানের সিনেমা এখন একদিন কেনো, এক শোও চলবে না—এটা আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি। কারণ ফোক কাহিনির ওই সিনেমার দিন শেষ হয়ে গেছে, এখন তামিল, হিন্দি, কলকাতার সিনেমার কাহিনি অন্য ধরনের নতুনত্ব

আসছে। দর্শকের রুচি এখন ওই পর্যায়ের। তাই ব্যবসা করতে হলে একজন ডিরেক্টরকে ওই জায়গায় যেতে হবে। কিন্তু সেই সিনেমা আমাদের ডিরেক্টররা বানাতে পারছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৮)।

আমিনুলের কথার সমর্থন পাওয়া যায় নির্মাতা কাজী হায়াতের কথায়। তিনি বর্তমানের দর্শক, প্রযুক্তি, কাহিনি নিয়ে বলছেন এভাবে—

সিনেমা দেখার ক্ষেত্র পরিবর্তন হয়েছে; এর পাত্র-পাত্রীরও পরিবর্তন হয়েছে। এখন রাস্তায় আপনি জুতা ছাড়া কোনো লোক পাবেন না। ২০ বছর আগেও গ্রামের ৯৯ ভাগ মানুষের পায়ে জুতা ছিলো না। বর্তমানে লোক বেড়েছে, কিন্তুলুঙ্গির উৎপাদন কিন্তু বাড়েনি। কারণ আজকের ছেলেমেয়েরা লুঙ্গি পরে না। কৃষকের হাতেও এখন মোবাইল। সে জিন্সের প্যান্ট পরে, ২০ টাকার ফ্লেক্সিলোড করে, ইন্টারনেটও নেয় এবং মোবাইলে সিনেমা দেখে। আমি কিছু দিন আগে গ্রামে গিয়ে এগুলো নিজে দেখে এসেছি। ওরা সিনেমা দেখে, কিন্তু ক্ষেত্র ও জায়গা চেঞ্জ হয়েছে। সিনেমার দর্শক কিন্তু আগের মতোই আছে। এদিকে সিনেপ্লেক্স হয়েছে, কিন্তু সেখানে সবাই যেতে পারে না; পোশাক-পরিচ্ছেদেরও একটা ব্যাপার আছে। বাড়ির কাজের মেয়েটাকে সেখানে নিয়ে গেলে মনে হয় সে সাই ফিল করবে। এখন এসব কিছু মাথায় রেখে সিনেমা বানাতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৫.১; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

তবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে আশাবাদী ময়মনসিংহের 'ছায়াবাণী'র দর্শক পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সাখাওয়াত আলী শিবলী। তিনি বলেন, 'আমাদের মোস্তফা সরয়ার ফারুকী অনেক ভালো সিনেমা বানান। তার সিনেমা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুরস্কার পায়, প্রদর্শিত হয়। ভারতের পরিচালকরাও এখনো এতো সম্মান পায় না। তার মতো আর কয়েকজন পরিচালক থাকলে আমাদের এতো চিন্তা করতে হতো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২১)।' জনপ্রিয় নির্মাতা, কাহিনিকার, প্রযোজক দেলোয়ার জাহান ঝন্টু বর্তমানের নির্মাতাদের নির্মাণ প্রক্রিয়া নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত। তার ভাষ্যমতে,

চলচ্চিত্র এমন একটা মাধ্যম যেটা এককভাবে করা সম্ভব নয়। আমি যে শিল্পীদের কাস্টিং করলাম, তার সঙ্গেও আলোচনা করবো, সেও দুটা পরামর্শ দেবে। একজন ক্যামেরাম্যান, এডিটর সবার পরামর্শ নেওয়ার জায়গা আছে চলচ্চিত্রে। বর্তমানে যারা চলচ্চিত্রে কাজ করে তাদের মধ্যে এই বিষয়টা নাই। তারা যা করে, সেটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। সুভাষ দত্ত আমার সিনিয়র ডিরেক্টর; খান আতাউর রহমান যখন সিনেমা নির্মাণ করে আমি তখন দর্শক। সেই খান আতা, সুভাষ দত্ত গল্প লিখে আমাকে ডেকে নিয়ে বলে, এই ঝন্টু এদিকে আয়, আমি একটা গল্প লিখেছি, একটু শোন তো, কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কিনা? ইবনে মিজান, যার সিনেমা আমি দর্শক হিসেবে দেখতাম, তিনি আমাকে তার গল্প দেখার জন্য ডেকেছেন; কামাল আহমেদ ডেকেছেন। এখন যারা সিনেমা করে তারা আমাদের সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা বলে না। আমি না হয় আজকের ছেলেমেয়েরা কী চায় জানি না, কিন্তু গল্পের মুডটা তো আমি জানি (আখ্যানের ক্রম ৫.৪; ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

এছাড়া বর্তমানের নির্মাতারা চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক দিক নিয়ে মোটেও সজাগ নন। বেশিরভাগ নির্মাতাই বর্তমানের ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কাজে অপেক্ষাকৃত কম খরচ ও কৌশলে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায় তা

বুঝতে বা জানতে চান না। এসব বিষয়ে একমত ছিলেন প্রখ্যাত নির্মাতা তারেক মাসুদ। কারিগরি ব্যাপারে ঢালিউড কেনো, স্বাধীন ধারার নির্মাতারাও এখনও যথেষ্ট সজাগ নয়। নির্মাতাদের অনেকেরই ধারণা নেই চলচ্চিত্র নির্মাণের কারিগরি কৃৎ-কৌশল ও যন্ত্রপাতি কতো দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তারেকের ভাষায়, "কেবল চলচ্চিত্র নয়, সকল শিল্পমাধ্যমে ডিজিটাল টেকনোলজির ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়েছে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শব্দগ্রহণ, শব্দমিশ্রণ, সম্পাদনা, প্রজেকশন, এমনকি চিত্রগ্রহণ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ডিজিটাল অপসন ব্যবহার করা হচ্ছে" (মাসুদ ২০০৬, পৃ১০৭)। কিন্তু দেশীয় নির্মাতারা এসব বিষয়ে মোটেও নিজেদের এগিয়ে নিচ্ছেন বলে তিনি মনে করতেন। অথচ গল্প নির্ধারণ থেকে সম্পাদনা পর্যন্ত সবকিছুর সঙ্গে একজন নির্মাতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকেন। তাই শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় নয়, কারিগরি দিকেও একজন নির্মাতার দক্ষতা থাকা দরকার পড়ে।

৬.৯.২) **প্রসঙ্গ অভিনয়**

এই সময়ের চলচ্চিত্রে অভিনয় নিয়ে প্রচুর সমালোচনা রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, বেশিরভাগ অভিনয়শিল্পী ঠিকঠাক অভিনয় জানেন না। একজন অভিনয়শিল্পী হয়ে ওঠার জন্য যে ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তার কোনোটাই এরা করেননি। বর্তমানের নায়ক-নায়িকাদের অভিনয় নিয়ে যশোরের প্রদীপ দাস বলেন,

> নায়ক হতে হলে যেমন রিকশা চালনা জানতে হবে, তেমনই মাঠে ধান লাগানো জানতে হবে। নায়ক খালি জিন্সের প্যান্ট পরে নায়িকার সঙ্গে মার্সিডিজ গাড়ি চালিয়ে গেলো—সেটাই নায়ক নয়। নায়ক যেমন মার্সিডিজ গাড়ি চালাচ্ছে, ভাগ্য দোষে তাকে রিকশা চালাতে হতে পারে। মোট কথা, এ টু জেড সব বিষয় তাকে জানতে হবে। তার বডি ফিটনেস, গলার ভয়েস হতে হবে ভালো। একই সঙ্গে তাকে ডান্স, মার্শাল আর্টও জানতে হবে। তাহলেই সে হবে পরিপূর্ণ নায়ক (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১২) ।

একই ধরনের কথা বলেন যশোরের অনুপ সিংহ—'এখনকার সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের অভিনয় হয় না। এরা যে অভিনয় করে, সেটা দেখে অতিরঞ্জিত মনে হয়। এই যে মান্না ছিলো, তার অভিনয় কতো বাস্তব সম্মত। অভিনয় দেখেই ভালো লাগতো। এছাড়া সালমান শাহও ভালো নামকরা প্লেয়ার ছিলো। তার অভিনয়ও ছিলো পারফেক্ট (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৬)।'

অভিনয়শিল্পীদের বেশিরভাগেরই অভিনয় নিয়ে ভালো জ্ঞান নেই—আখ্যানের তথ্য-উপাত্তে অভিনয় নিয়ে এমন ধ্যান-ধারণাই পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই মনে হয় অভিনয় হয়ে যায়। কিন্তু এরজন্য যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় তা অনেকেই মানতে চান না। সাতক্ষীরার দেবাহাটার মাহাবুব আলম বলেন, 'যারা অভিনয় করতেছে, দেখে মনে হয় তারা অভিনয় করতেছে। একটা চরিত্রের অনুভূতির যে প্রকাশ সেটা তাদের ভিতরে নেই। ভালো অভিনয় না করায়

সিনেমার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই। ফলে সিনেমা দেখে দর্শক বিশ্বাস করতে পারে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩৪)।'

তবে পটুয়াখালীর জয়নাল শরীফ মনে করেন, 'সিনেমার গল্প ভালো থাকলে কে অভিনয় করলো দর্শক কিন্তু সেটা দেখে না। দর্শক একটা ভালো গল্প চায়, সেই গল্পটা কীভাবে অভিনেতারা ফুটিয়ে তুলেছে, সেটা দেখে। আমাদের আগের অনেক নায়কের চেহারা তো অতো ভালো ছিলো না, কিন্তু তারা অভিনয় ভালো করতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২৩)।'

শুধু অভিনয়শিল্পীদের দোষ দিলেই হবে না। যারা তাদের অভিনয় করিয়ে নেন মানে একজন নির্মাতার ওপরও অভিনয়শিল্পীর অভিনয় নির্ভর করে। কারণ নির্মাতা যদি অল্পতেই সন্তুষ্ট হন কিংবা তার যদি অভিনয় সম্পর্কে ভালো জ্ঞান না থাকে, তার পক্ষে যথাযথ অভিনয় বের করে নেওয়া সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহানের ভাষ্য হলো—

> আমাদের দেশের অনেক পরিচালকই আছে, যাদের নিজেরই অভিনয় সম্পর্কে ভালো জ্ঞান নেই। কোনো শিল্পীকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে নেওয়ার মতোও দক্ষতা তাদের নেই। আমাদের আগে যারা ওস্তাদ ডিরেক্টর ছিলেন তাদের বেশিরভাগেই হয়তো নাটক থেকে, না হয় অন্য কোনো সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে এসেছিলো। তাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিলো। একজন পরিচালক নিজে অভিনয় না করতে পারলেও তাকে অন্তত বুঝতে হবে, আমি যে চরিত্রটা চাচ্ছি সে সেটা করতে পারছে কিনা (আখ্যানের ক্রম ৫.৫; ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

যশোরের 'মণিহারে'র কালোবাজারি মো. ইউসুফ একেবারে ভিন্ন ধরনের একটা প্রস্তাব করেন। তার ভাষ্যমতে,

> ভারতে পরিচালকরা সারাদেশ ঘোরে, নতুন নতুন ছেলেমেয়ে সংগ্রহ করে—তারা সুন্দর ও হ্যান্ডসাম দেখতে। তাদেরকে অভিনয় শেখায়, অভিনয় করায়। আমাদের পরিচালকরা এগুলো পারে না। এরা মনে করে, একজন আছে ওরে দিয়েই করাই। কিন্তু ওই একজনকে নিয়ে পড়ে থাকলে সিনেমা চলবে না। নতুন মুখ আনতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৩)।

তাই কুড়িগ্রামের কিনু বাবু মনে করেন, 'খালি শাকিব-অপুর পেছনে না ছুটে, প্রযোজক-পরিচালকরা যদি নতুন নায়ক-নায়িকা তৈরি করতো, তাহলে আজ এ অবস্থা হতো না (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৭)।'

শূন্য দশকে অভিনয়শিল্পী সঙ্কটের চরম পরিস্থিতিতেও মৌসুমী, রিয়াজ, শাবনূর, পপি, ফেরদৌসের মতো শিল্পীদের হাতে কোনো চলচ্চিত্র ছিলো না। মৌসুমী তার কাজ কমিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন (খান ২০১১, পৃ২৭), এই সময়ের চলচ্চিত্রের গল্পের আর চরিত্রের বৈচিত্র্যহীনতার কথা। এখন নাকি তার আর নায়িকা হয়ে গাছের নিচে প্রেম করা চরিত্রে অভিনয় করতে মন চায় না। একজন শিল্পী হিসেবে মৌসুমীর এই মতের বা ইচ্ছার যথেষ্ট যুক্তি আছে। তারপরও মৌসুমীর যে অভিনয়গুণ তাতে

তাকে দিয়ে তার উপযোগী প্রোটাগনিস্ট চরিত্র সৃষ্টি করে অভিনয় করানো যেতে পারতো। কিন্তু নির্মাতারা সেই কাজটি করেননি। কোনো শিল্পীর বয়স ও অভিনয় দক্ষতা অনুযায়ী যথাযথ চরিত্র নির্বাচন করে, তাকে সেই চরিত্রে ফুটিয়ে তোলার কাজ কিন্তু অভিনয়শিল্পী ও নির্মাতার যৌথতার সফল। ফলে দুই পক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে।

৬.৯.৩) **চলচ্চিত্রের কাহিনি**

এই দশকের বেশিরভাগ নির্মাতার কাছে চলচ্চিত্রের গল্পটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। তারা খুব বেশি যত্নবান ছিলেন না চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রেও। চলচ্চিত্রের কাহিনিতে কোনো বৈচিত্র্য ছিলো না, সব কাহিনি প্রায় একই কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতো। নির্মাতা ও প্রযোজক নায়ক-নায়িকা, লোকেশন ও কারিগরি দিকে প্রচুর পয়সা খরচ করতে আগ্রহী হলেও কাহিনির পিছনে করতে চাইতেন না বললেই চলে। গবেষণ আখ্যানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে চলচ্চিত্রের কাহিনি নিয়ে এমন ধারণাই পাওয়া যায়।

যশোরের মোল্যা ফারুক আহম্মেদ বলেন, ‘পাঁচ–ছয়টা হিন্দি সিনেমা দেখে, এখান থেকে ওখান থেকে নিয়ে পরিচালকরা একটা সিনেমা তৈরি করছে। জনগণ কিন্তু এখন আগের চেয়ে অনেক সচেতন, তারা এগুলো ধরে ফেলে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১)।’ কুড়িগ্রামের নাহিদ বলেন, ‘কলকাতার বাংলা সিনেমাগুলোতে একটার সঙ্গে আরেকটার মিল থাকে না; অথচ এখানে সব সিনেমা একইরকম। বিশেষ করে শাকিব খানের সব সিনেমার কাহিনি একই ধরনের (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৩) ।’

এই সময়ের চলচ্চিত্রে ঘুরেফিরে একই কাঠামোর গল্প নির্মাণ হতে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। মূলত প্রযোজকরা-নির্মাতারা এই খাতে বাজেট রাখতে চাইতেন না। চট্টগ্রামের দিলীপ দে বলেন,

> এখনকার নায়ক-নায়িকারা একই ধরনের গল্পে অভিনয় করে। বাবা হত্যার প্রতিশোধ, না হয় প্রেম; এর বাইরে কোনো গল্প নেই এখন সিনেমায়। আর মাঝখানে যে নাচ-গান হয়, সেগুলোও এখন আর খুব বেশি চলে না। কারণ ভারতের সিনেমায় এতো সুন্দর নাচ-গান দেখে, এরা আর এগুলো দেখতে চায় না। বেয়াদবি নেবেন না, বুক আর পেট দেখালে কিন্তু ড্যান্স হয় না (আখ্যানের ক্রম ৪.২.১৫)।

কাহিনির বৈচিত্র নেই বলে দাবি করে ময়মনসিংহের অলক চন্দ্র দে বলেন, ‘অন্য ধরনের কাহিনি তো লাগবে। জীবনে প্রেম ছাড়াও তো আরো অনেক কিছু আছে। আগে তো খালি প্রেম ছিলো না। প্রেম তো প্রেমই, প্রেম করলে কী চাকরি করা, খাওয়া লাগে না! তাহলে খালি প্রেম দিয়ে কীভাবে চলে (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১৬)।’ নেত্রকোণার জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর অভিযোগ হলো, ‘বর্তমানের সব সিনেমার কাহিনি একইরকম। গ্রাম-বাংলার মানুষের জীবন নিয়ে এখন আর কোনো সিনেমা হয় না। সিনেমার নামের সঙ্গে কাহিনির কোনো মিল নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.২৭)।’ নওগাঁর পত্নীতলার মো. ছাদেকুল ইসলাম কাহিনির সঙ্গে আরও কিছু প্রসঙ্গ টেনে বলেন,

> আগের চলচ্চিত্রে সব ছিলো; মানে গল্প, অ্যাকশন, প্রেম, ক্লাইমেক্স; কিন্তু এখন এসব চলচ্চিত্রে, বিশেষ করে শাকিবের চলচ্চিত্রে প্রেম ছাড়া কিছুই নাই। এর শুরুই হয় প্রেম দিয়ে। কেবল প্রেম দর্শক আর দেখতে চায় না। এর বাইরে চলচ্চিত্রের প্রাণ হলো তার গান। ভারতের কোনো চলচ্চিত্র যদি একটু ব্যবসা কমও করে, কিন্তু গান হিট হয়। সেটা দিয়েই ভালো ব্যবসা হয়। এখানে গান, কাহিনি কিছুই নাই (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৯)।

যশোরের তপু হাসান একই কাহিনির দুই–তিনটা চলচ্চিত্র ধরিয়ে দিয়ে বলেন,

> একই কাহিনি নিয়ে দুই–তিনটা সিনেমা হচ্ছে। এই যে আঁচল একটা সিনেমা করলো, *আজব প্রেম*; ওই একই কাহিনি নিয়ে আরেকটা সিনেমা আছে *আমি শুধু চেয়েছি তোমায়*। আর এসব সিনেমায় কখন কোন ডায়লগ হবে সেটাও এখন দর্শক বুঝতে পারে। প্রত্যেকটা মুভিতে একই কাহিনি। হয় নায়কের বাসায় সমস্যা, নয় নায়িকার বাসায়। আচ্ছা বলেন তো, একটু আলাদা করে কিছু করা যায় না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১৬)।

খুলনার সাব্বির মোল্যা বলেন, ‘বাংলা সিনেমাতো আমাদের মুখস্থ। নায়কের সঙ্গে নায়িকার কথা হচ্ছে, এখনই গান শুরু হবে। নায়িকাকে ভিলেন অ্যাটাক করছে, তখনই নায়ক চলে আসবে। এগুলোতো আমাদের মুখস্থ জিনিস। দেখতে দেখতে অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। কিন্তু হলিউড, বলিউডে আপনি বলতে পারবেন না, এরপরে ঠিক কী হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৫)।’ কুষ্টিয়ার সুবোধ চন্দ্র প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে বলেন, ‘কোনো একটা ঘটনাকে তো আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ঠিকভাবে দেখাতে হবে। মাঝখানে যদি গোজামিল থাকে, ঘটনা এক পরিবেশ থেকে যদি আরেক পরিবেশে চলে যায়, তাহলে চলবে! এখন এটাই হয়েছে সমস্যা। পাবলিক সিনেমা দেখে বের হয়ে বলে, কী দেখলাম (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৪৯)!’

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহের আগে নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিলো। ওই পরিসরে গিয়ে দর্শক শুধু চলচ্চিত্রই দেখতো না; তারা নানা বিষয়ে আলোচনাও করতো। চলচ্চিত্র শুরুর আগে ও পরে দেখা চলচ্চিত্র নিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা হতো। কুষ্টিয়ার মোখলেছুর রহমান বকুল সেই সময়ের স্মৃতি বর্ণনা করেন এভাবে— ‘আগে সিনেমা দেখে যাওয়ার পর সেই গল্প আরেকজন শুনে সিনেমা দেখতে আসতো। সিনেমাহল থেকে বের হওয়ার সময় গল্প নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া করতো। এখন সব ভুলে যায়। ডিজিটাল সিনেমা আসার পর থেকে এখন এই অবস্থা আরো বেড়ে গেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.৫২)।’

আরেক ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায় যশোরের নজরুল ইসলাম সোহেলের কাছ থেকে। তার মতে, ‘বর্তমানে সিনেমার কাহিনির সঙ্গে নামের কোনো মিল নাই। আগে একটা সিনেমার নামের সঙ্গে গল্পের, গানের মিল ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২৬)।’ নজরুলের কথায় সমর্থন দেন সাতক্ষীরার দেবাহাটার মাহাবুব আলম। তিনি বলেন, ‘কিছু দিন আগে একটা সিনেমা আসলো, নাম *যে গল্পে ভালোবাসা নেই*; এখন সেই অনুযায়ী তো সিনেমাটা হওয়া দরকার। কিন্তু তা হচ্ছে না; তাতে ভালোবাসা ভরপুর ছিলো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৩৪)।’

বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে অন্যান্য অনেক মাধ্যমে দর্শকের চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ফলে এই দর্শককে কোনো কাহিনি দিয়ে সন্তুষ্ট করা কঠিন। তাই কাহিনি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্মাতা, প্রযোজককে খুবই সচেতন থাকতে হয়। অনেকক্ষেত্রে ওই কাহিনির বা চলচ্চিত্রের উদ্দিষ্ট দর্শক কে বা কারা হবে সেটাও মাথায় রাখতে হয়। এসব বিষয় নিয়ে শ্রীমঙ্গলের মনির বলেন,

> ঘরে ঘরে এখন 'স্টার জলসা', 'জলসা মুভিজ'। এসব আসার পর থেকে মহিলা দর্শক কমতে শুরু করেছে। ওইসব নাটকে সব পারিবারিক কাহিনি। মহিলারা ওগুলোই বেশি পছন্দ করে, তাই তারা বের হচ্ছে না। সিনেমাতে এখন এই ধরনের কাহিনি তো আর নেই। এখন খালি প্রেম-ভালোবাসা! ওই মহিলাদের আনতে হলে একেবারে নতুন গল্প বলতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১৭)।

ময়মনসিংহের রণজিৎ চন্দ্র দে এই কথায় আরো জোর দেন এভাবে—'এখন তো কোনো সামাজিক সিনেমা হয় না। এই যে *বস* ২ সিনেমাটা চলছে, এটা দেখতে তো মহিলারা আসবে না। কারণ এই নাম শুনেই তো তারা ভয় পায়। এই সিনেমা দেখতে আসবে ইয়ং ছেলেমেয়েরা (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১৭)।' বরিশালের শেখ মাসুম বলেন, 'আজ থেকে ২৫ বছর আগে দেখা কোনো সিনেমার কথা আপনি আমাকে বলেন, তার গল্প আমি বলে দিতে পারবো। দর্শক সিনেমা দেখে কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে গেছে। সেই দর্শক এখন কেনো সিনেমা দেখবে! কী আছে এই সিনেমার মধ্যে (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২)!'

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নিয়ে এখন বড়ো অভিযোগ হলো, এখানে কোনো কাহিনিকার নেই। যারা আছে তারা মূলত কপি করেন। আর নির্মাতারাও কাহিনির ব্যাপারে সচেতন নন। ফলে নতুন যে কাহিনিকার বেরিয়ে আসবে সেটাও হচ্ছে না। কিছু মানুষ নতুন কোনো চিন্তা না করে একের পর এক কাট-কপি-পেস্ট করে যাচ্ছেন। পটুয়াখালীর জয়নাল শরীফ বলেন, দেশে নাকি এখন একমাত্র কাহিনিকার আবদুল্লাহ জহির বাবু! তার ভাষ্যমতে, 'একজন লোক আর কতো কাহিনি লিখবে! ফলে ঘুরেফিরে একই কাহিনির সিনেমা তৈরি হচ্ছে। কাহিনি দিয়ে বিনোদন দিতে না পারলে দর্শক সিনেমা দেখবে কেনো? তিন ঘণ্টা সে সিনেমাহলে কেনো বসে থাকবে (আখ্যানের ক্রম ৪.৬.২৩)!' জয়নালের কথাকে সমর্থন দিয়ে আরো খানিকটা বাড়িয়ে বলেন খুলনার আনোয়ার হোসেন। তার ভাষ্যমতে,

> এখন তো কেউ গল্পকারদের কাছ থেকে গল্প কেনে না। কারণ পয়সা লাগে। অনেক ডিরেক্টর আছে, যারা এক ঘণ্টায় গল্প লিখে ফেলে। এক ঘণ্টার কোনো গল্প ভালো রেজাল্ট আনতে পারে না। এক গল্পের পিছনে অনেক সময় দিতে হয়। গল্পটার কোথায় প্রাণ দিলে মানুষ মেনে নেবে, সেটা চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কিন্তু এক ঘণ্টায় একটা স্ক্রিপ্ট লিখে বাজারজাত করে দিচ্ছে। সেই স্ক্রিপ্টের উপর সিনেমা হচ্ছে, লোকে গালিগালাজ করছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.১৪)।

একটা গল্প কীভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গতা পায় সেই প্রক্রিয়ার কথা বলেন প্রবীণ নির্মাতা আমজাদ হোসেন। তার ভাষ্যমতে,

> আমার চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারের শুরুতে সৌভাগ্য হয়েছিল জহির রায়হানের সঙ্গে কাজ করার। আমি দীর্ঘদিন তার সঙ্গে কাহিনী লেখার কাজ করেছিলাম। তখন বুঝেছি, একটি ছবি সফল করার ক্ষেত্রে ভাল ও মানসম্মত গল্প কতটা জরুরি। জহির রায়হান একটি ছবির গল্পের পেছনে প্রায় এক–দেড় বছর ধরে শ্রম দিতেন। অথচ এখনকার ছবিগুলোর গল্প তৈরি হয় চার থেকে পাঁচ দিনে। কোনো দর্শক আজ হলে গিয়ে একটি ছবি দেখছে আবার কাল গিয়ে আরেকটা ছবি দেখছে। ওই দর্শকের কাছে মনে হবে, দুইটা একই ছবি। শুধু নাম পরিবর্তন হয়েছে। আসলে তা-ই হচ্ছে (হোসেন, ২২ জুন ২০১১)।

একই ধরনের কথা বলেন আরেক বিখ্যাত নির্মাতা, কাহিনিকার দেলোয়ার জাহান ঝন্টু। তিনি বলেন,

> যখন আমার কাছে কোনো ডিরেক্টর গল্প নেয়, সেটা পড়ার পর বলে ভালো হয়েছে। আমি বলি, কেবল ভালো হলে চলবে না, তুমি এখন গল্পটা আমাকে বলো। সে বলে, কেনো? আমি বলি, তুমি আমাকে গল্পটা বলো, এটাই আমার কারেকশন। তারপর সেই ডিরেক্টর বলতে শুরু করে। গোড়া থেকে বলতে বলতে, একপর্যায়ে বলে, এরপর জানি কী? কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বলে মনে পড়ছে মনে পড়ছে, আবার বলে, আবার থামে। এখন আমি কী করি, যে জায়গাগুলোতে সে থেমেছে, সেই জায়গাগুলো আমি নোট করি। আমি চিন্তা করি, গল্প বলতে গিয়ে ওই জায়গাটাতে তার রিদম ব্রেক হলো কেনো? তার মানে ওই জায়গায় গল্পের কোনো সমস্যা আছে, লেখনী ঠিক হয় নাই। এভাবে আমরা একটা গল্প ঠিক করতাম (আখ্যানের ক্রম ৫.৪; ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

এতো সংকটের মধ্যেও যে দুই–একটি চলচ্চিত্রের কাহিনি ভালো হয়নি এমন নয়। রংপুরের আ. কুদ্দুস মোল্লা বলেন, 'আর্টিস্ট যাই হোক, একটা সিনেমার গল্প ভালো হলে সেটা চলবে। এই ধরেন *বেদের মেয়ে জোস্না*র কথা, কী ছিলো ওই সিনেমার মধ্যে, একটা নদী, একটা জঙ্গল আর একটা রাজবাড়ি। তাই নিয়েই পরিচালক কী সুন্দর একটা গল্প বলেছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১৯)।' কুড়িগ্রামের হাবিবুর রহমান টিটুর ভাষায়, '*মনপুরা*র গল্পটা খুব ভালো ছিলো। কিছু কিছু বিষয় বেশ বোঝার মতো। আর সিনেমাটা পুরো পরিবার নিয়ে দেখার মতো ছিলো। চারদিকে অবশ্য এই আওয়াজটা উঠছিলো *মনপুরা* নিয়ে। কিন্তু *মনপুরা*র পর আবার সেই একই অবস্থা (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.৬)।' ভালো গল্প হলে চলচ্চিত্র ব্যবসা করে এমন দাবি করেন ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেন। তার ভাষ্যমতে, '*নবাব*-এ আমরা ভালো ব্যবসা করেছি। অনেক দর্শক দুই–তিনবার এই সিনেমা দেখছে। ভালো একটা গল্প আছে কারণেই তো মানুষ এই সিনেমা দেখছে। তা না হলে তো দেখতো না। এর বাইরে তো আরো অনেক সিনেমা বাংলাদেশে রিলিজ হয়েছে। দর্শকতো সেগুলো এভাবে দেখতে আসেনি (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।'

চলচ্চিত্রের কাহিনির এই অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিখ্যাত নির্মাতা তারেক মাসুদ। তিনি বলেন, "ভিডিও দেখে হিন্দি ছবির শট ডিভিশন যেখানে হুবহু নকল করা হচ্ছে, এবং তা কেবল সেন্সর ছাড়পত্র পাচ্ছে তাই নয়, জাতীয় পুরস্কারও পাচ্ছে—সেখানে চিত্রনাট্যের দরকারই বা কী? হলিউড এমনকি বলিউডেও একটি চিত্রনাট্যের পেছনে কত অর্থ ও সময় ব্যয় হয় তা ঢালিউডের অনেকেরই জানা নেই। স্বনামে বেনামে ঢালিউড-ধারার ছবির চিত্রনাট্য লিখতেন এক সময় সৈয়দ শামসুল হকের মতো প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক। আজ কারা লিখছেন বলা নিষ্প্রয়োজন। ঢালিউড পরিচালকরা হুমায়ূন আহমেদ বা ইমদাদুল হক মিলনের মতো জনপ্রিয় ধারার লেখকের গল্প নেয়া তো দূরের কথা, তাদেরকে দিয়ে চিত্রনাট্য লিখিয়ে নেয়ার কথা ভাবতেও পারেন না। ... গত এক যুগে যে তিনটি ছবি ব্যবসাসফল হয়েছে সেগুলোর অভিন্ন বিশেষত্ব হচ্ছে তুলনামূলক মৌলিক গল্প' (মাসুদ ২০০৬, পৃ১০৬)। অথচ এই গল্প নিয়ে দেশীয় নির্মাতারা কখনই মাথা ঘামায়নি। ফলে দর্শক বেশিরভাগ চলচ্চিত্রের কাহিনি কল্পনা করে নিয়ে বসে থাকেন। যখন সেই কল্পনার ব্যতয় হয়, আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় ইতিবাচক থাকে; তখনই দর্শকের মস্তিস্ক সক্রিয় হয় এবং দর্শক চলচ্চিত্রটি পছন্দ করে।

৬.৯.৪) **ফারুকী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ**

এই দশকের একজন নির্মাতার নাম আলাদা করে না বললেই নয়। মূলত তার হাত ধরেই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির দর্শক আবার প্রেক্ষাগৃহে আসতে শুরু করেন—তিনি মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। মূলত বিজ্ঞাপন ও টেলিভিশন নাটক নির্মাণের মধ্য দিয়ে তার ক্যারিয়ারের শুরু। ২০০৪ সালে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন *ব্যাচেলর*। চলচ্চিত্রটি সেসময় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত দর্শকের মধ্যে আলোচনার সৃষ্টি করে। পরে তিনি একে একে নির্মাণ করেন *মেড ইন বাংলাদেশ* (২০০৭), *থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার* (২০০৯), *টেলিভিশন* (২০১৩), *পিঁপড়াবিদ্যা* (২০১৪), *ডুব* (২০১৭)। এর মধ্যে *টেলিভিশন* ছাড়া অন্য সব চলচ্চিত্রে শহুরে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের গল্প বলেছেন ফারুকী। সেই অর্থে দেশে সিনেপ্লেক্স বাণিজ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণে তিনি এগিয়ে ছিলেন। ধারাবাহিকভাবে ফারুকীর এসব চলচ্চিত্রের একটা দর্শক শ্রেণিও তৈরি হয়। তবে একথা ঠিক যে, এই ধারার চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু ৯০ দশকে হয়েছিলো জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ নির্মিত তার *আগুনের পরশমণি*র (১৯৯৪) মধ্য দিয়ে। এই উত্তরাধিকার এসেছে ৭০ দশকের জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যর্থ চলচ্চিত্রকর্মী, ৮০'র দশকের বিকল্পধারার নির্মাতাদের মাধ্যমে।

ফারুকীর সমসাময়িক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী তৌকীর আহমেদ। ২০০৪ সালে *জয়যাত্রা* দিয়ে তৌকীরের চলচ্চিত্রযাত্রা শুরু। এরপর তিনি *রূপকথার গল্প* (২০০৬),

দারুচিনি দ্বীপ (২০০৭), *অজ্ঞাতনামা* (২০১৬), *হালদা* (২০১৭), *ফাগুন হাওয়া* (২০১৭) নির্মাণ করেন। বিষয় বিবেচনায় তৌকীকের চলচ্চিত্রগুলোতে ভিন্নতা থাকলেও এসব চলচ্চিত্র দিনশেষে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে পৌঁছেনি। এসব চলচ্চিত্রেরও দর্শক ছিলো শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি।

ছবি : সংগৃহীত

এই প্রসঙ্গে আরেকটি আলোচনা না করলেই নয়, বাংলাদেশে যখন এই ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে, তার কিছুটা আগে থেকেই ভারতের কলকাতায় এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে শুরু করে। টালিগঞ্জে ঋতুপর্ণ ঘোষ, অর্পণা সেন, গৌতম ঘোষ, কৌশিক গাঙ্গুলিরা মূলত সিনেপ্লেক্সের দর্শককে লক্ষ্য করেই চলচ্চিত্র নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতায় পুঁজি প্রাধান্যশীল জিৎ-দেবের চলচ্চিত্রের সমান্তরালে এই চলচ্চিত্রগুলো ব্যবসা করতে থাকে। এমনকি পুঁজি প্রাধান্যশীল চলচ্চিত্রের এক সময়ের সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, ঋতুপর্ণ সেনগুপ্ত এসব চলচ্চিত্রে নিয়মিত অভিনয় শুরু করেন। কলকাতার চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি এখন এই ঘরানার চলচ্চিত্রের নিয়ন্ত্রণে। ফলে দর্শকও শহুরে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তরাই বেশি। একই সঙ্গে একক পর্দার প্রেক্ষাগৃহগুলোও এখন পড়তির দিকে। নির্মাতা কামার আহমাদ সাইমন এই পরিস্থিতিকে ব্যাখা করেছেন এভাবে,

> পশ্চিম বাংলায় যখন ২০০৫-এ পোস্ট ঋতুপর্ণ ঘোষ একটা ওয়েভ আসলো; যে ওয়েভটার মধ্যে সৃজিত, কৌশিক ও আরো অনেকেই ছিলো। ওরা যে খুব আহামরি সিনেমা বানাচ্ছে, সেটা আমি মোটেও বিশ্বাস করি না, কিন্তু ওরা একটা ঢেউ আনতে পেরেছে। ঢেউটা ছোটো করে হলেও কলকাতা ও ঢাকায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনেক সুন্দর সুন্দর প্রেমিজ নিয়ে ওরা কাজ করেছে। আমি কৌশিকের *কিশোর কুমার জুনিয়র* বা

শব্দ এর কথা বলতে পারি, এই সিনেমাগুলোর প্লট অসাধারণ ছিলো। এই প্লটগুলো আমাদের নতুন গল্প বলার শক্তি দেখাচ্ছিলো। কিন্তু ফাইনালি এগুলোও 'আমাদের সিনেমা' বলে কিছু হয়ে ওঠা পর্যন্ত পৌঁছায়নি (আখ্যানের ক্রম ৫.২; ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

সাইমনের সূত্র ধরে বলা যায়, সামনের দিনে কোন চলচ্চিত্র আসলে আমাদের হয়ে উঠবে সেটা বলা একটু কঠিনই। সেখানে ফারুকী, তৌকীর কিংবা হুমায়ূনের চলচ্চিত্র কোন অবস্থানে থাকবে সেটা সময়ই বলে দেবে।

৬.৯.৫) কাটপিসের দৌরাত্ম

শূন্য দশকে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং সেখানে কাটপিস সংযোজন। মূলত ৯০ দশকের শেষের দিকে এই অবস্থার শুরু হয়ে তা শূন্য দশকে চরম আকার ধারণ করে। এই সময়ের চলচ্চিত্রে দুইটি ঘটনা ঘটে; **প্রথমত**, পর্নো উপাদান সম্বলিত চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে; **দ্বিতীয়ত**, প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সময় অননুমোদিত দৃশ্য সংযোজন করা হয়। অননুমোদিত এইসব দৃশ্যকে বলা হয় 'কাটপিস'।

> কাটপিস হলো মূল প্রিন্টের সঙ্গে উপস্থাপিত নয় এরকম কোনো ফুটেজ। কিন্তু পরিবর্তিত অর্থে, কাহিনীর-সঙ্গে-একেবারে-সম্পর্কহীন, জুড়ে দেয়া পর্নোগ্রাফিক রিলকেই আমরা কাটপিস বুঝে থাকি। এটি ছবির যেকোনো পর্যায়ে দেখানো হতে পারে, সাধারণত মাঝামাঝি, বিরতির আগে বা পরে এটি দেখানো হয়ে থাকে। সাধারণত এটি একটি গানের দৃশ্য হয়ে থাকে, তবে স্নানের দৃশ্যও হতে পারে; এমনকি সঙ্গমের দৃশ্যও হতে পারে' (নাসরীন ও হক ২০০৮, পৃ৬৯)।

বাংলাদেশে অবশ্য কাটপিস নুতন কোনো বিষয় নয়। কিংবা প্রেক্ষাগৃহে এই কাটপিসের প্রদর্শনীও নতুন নয়। ১৯৭৬ সালের পর থেকে আমদানির আওতায় দেশে যেসব চলচ্চিত্র এসেছে, তার শতকরা ৯৫ ভাগই যৌনতা, ভয়াবহতা, পাশবিকতা, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ দৃশ্যে পরিপূর্ণ ছিলো। ১৯৯২ সালের জুলাই–আগস্টে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এসব চলচ্চিত্র বেশি আমদানি করা হয়। সেন্সর বোর্ড বাতিল করা যৌনতায় ভরপুর কাটপিস জুড়ে দিয়ে এসব চলচ্চিত্র ঢাকা ও থানা পর্যায়ের প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শন করা হতো। মোহাম্মদ আজম সেই সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> আমরা যারা ছাত্রবয়সে ভিসিআর দেখার সুবিধা করে উঠতে পারতাম না, তাদের জন্য ঢাকার আর ঢাকার বাইরের মার্কামারা বহু সিনেমাহল যুগিয়েছে 'এক টিকেটে দুই ছবি'। সেই সুবাদে অনেকেই জানেন, বড় পর্দায় নীল ছবি দেখার মজাই আলাদা। মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে ওপরের দিকের ঘরগুলোতে এক কালে ভিসিআর, পরে ভিসিডি, আরও পরে কম্পিউটার খুব ব্যক্তিগত পর্যায়ে এসবের এনতেজাম করেছে; আর বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত আমজনতার জন্য পাঁচ টাকার বিনিময়ে আছে চমৎকার ব্যবস্থা। এগুলোর কোনোটাই গলিঘুপচির মামলা নয়। রীতিমত প্রকাশ্য ব্যবস্থাপনায়, উৎপাদন-বিপননের প্রতিষ্ঠিত ছকে এসব টিকে আছে (আজম ২০১১, পৃ১০৩)।

কোনো কোনো আমদানিকারক এসব বিদেশি চলচ্চিত্রের সঙ্গে বাড়তি কাটপিস পর্যন্ত আমদানি করতো। তারা এগুলো ইংরেজি চলচ্চিত্রের অন্যান্য আমদানিকারকদের ভাড়া দিতো প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের জন্য।

এই সময়েই সবচেয়ে বেশি আমদানি করা হয় হংকং এর চলচ্চিত্র (কাদের ১৯৯৩, পৃ৪৫০)। তার মানে কাটপিস নিয়ে একটা ক্ষেত্র দেশে প্রস্তুত করাই ছিলো। দেশীয় নির্মাতা, প্রযোজক, প্রদর্শক আর দর্শক কেবল সুযোগ ও সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন। ক্রমাগতভাবে বিমুখ দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে টানার জন্য চলচ্চিত্রশিল্পের কিছু মানুষ অন্য কোনো সৃজনশীল বা পরিশ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা না করে যৌনতানির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের এই সহজ পথটি বেছে নেন। যশোরের প্রদীপ দাস বলেন, 'সেসময়ের অনেক প্রোডিওসার ভালো সিনেমা নির্মাণে সহযোগিতা করে নাই। তারা তখন ন্যাংটা সিনেমা বানানোতেই উৎসাহী করে। ফলে এক শ্রেণির ডিরেক্টর কোনো কিছু চিন্তা না করেই এসব সিনেমা বানিয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১২)।' কুড়িগ্রামের সেলিম বলেন, '২০০২–২০০৩ এর দিকে *ফায়ার* নামে একটা কাটপিসওয়ালা সিনেমা চলেছিলো। এই সিনেমার আগে-পিছে এ অবস্থার শুরু। সেই সময় বেশ কিছু দিন এই সিনেমা চলে। প্রথম দিকে কিছু দর্শক হলেও ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে (আখ্যানের ক্রম ৪.৩.১২)।'

এই সময়ে কাটপিস নিয়ে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ব্যাপক অসন্তুষ্টি দেখা যায়। কিন্তু যে এলিট ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি সেসময় ঢাকাই চলচ্চিত্রের যৌনতা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামিয়েছিলো, তারা কিন্তু মোটেও এই চলচ্চিত্রের দর্শক ছিলো না। এরা ঘরে বসে স্যাটেলাইট চ্যানেলে বলিউডের যৌন উপাদান সম্বলিত রিমিক্স কিংবা আইটেম সঙ দেখেছে। হলিউডের অ্যাঞ্জেলিনা জলি, পামেলা এন্ডারসন, ম্যাডোনা কিংবা শ্যারন স্টোনের যৌনতাকে স্বাভাবিক মনে করে উপভোগ করেছে। এই শ্রেণিটি আসলে ঢাকাই চলচ্চিত্রকে কখনোই আপন করে নিতে পারেনি। এদের একটা অংশ আবার সেই ৭০ দশক থেকেই উচ্চ শিল্পমান সম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহ দেখিয়েছে। এই চিন্তার সমর্থন পাওয়া যায় মোহাম্মদ আজমের (আজম ২০১১, পৃ১১৩) বক্তব্যেও। এই পরিস্থিতিতে 'ইমপ্রেস টেলিফিল্ম' গঙরা বানিয়েছে 'সুস্থ' চলচ্চিত্র। যার সঙ্গে পুঁজি আর করপোরেটের সম্পর্কের বাইরে সাধারণ দর্শকের কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

৬.৯.৬) **ডিজিটাল প্রযুক্তির চলচ্চিত্র**

শূন্য দশকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ডিজিটাল প্রযুক্তির চলচ্চিত্র নির্মাণ। চলচ্চিত্রে প্রাযুক্তিক পরিবর্তনের বিষয়টি যে সময়ে ঘটেছে, ঠিক সেই সময়ে বড়ো ধরনের একটা সঙ্কট থেকে ঢাকাই চলচ্চিত্রের সাময়িক একটা উত্তরণ হয়েছে বলে মনে হয়। ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তি খুব জোরেশোরেই প্রয়োগ হতে শুরু করে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে। কিন্তু এদেশে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নিয়ে পরিষ্কার ধারণা এখনো তৈরি হয়েছে বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশের নির্মাতারা ডিজিটাল প্রযুক্তির চলচ্চিত্রকে কেবল মনে করেছেন স্বল্প বাজেটে, সহজ ব্যবস্থাপনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের কৌশল। কিন্তু এই ফরমেটের নন্দনতাত্ত্বিক সম্ভাবনার ব্যাপারে তারা মোটেও খুব বেশি সচেতন বলে মনে হয়নি (নাসরীন ও হক ২০১৩, পৃ৭৯)। আর এটাই এখন ডিজিটাল চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। ফলে নির্মাতারা স্বল্প বাজেট ও সহজ ব্যবস্থাপনায় চলচ্চিত্রের নামে ঠিক কী নির্মাণ করছেন সেটা বলা মুশকিল। এ ধরনের চলচ্চিত্র নিয়ে যশোরের 'মণিহার'-এর মালিক জিয়াউল হক মিঠু বলেন,

> ডিজিটাল এসে এরা মূলত নাটক তৈরি করছে; ওই নাটকটাকে সিনেমার মতো করে রিলিজ করছে। তাদের কথা হলো, যদি চললে চললো, না চললে চ্যানেলে দিয়ে দেবো। এরা এখন এইভাবে এগুলো করছে। কিন্তু মূলত যেটাকে আমরা সিনেমা বলি, সেটা বাংলাদেশে এখন কম হচ্ছে। আরো সিনেমা দরকার। প্রতি মাসে কমপক্ষে চারটা করে সিনেমা দরকার। কিন্তু সে সিনেমা হচ্ছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.২১)।

একই ধরনের অভিযোগ করেন খুলনার 'শঙ্খ'-এর বিকাশ। তার ভাষায়, "এগুলো 'চ্যানেল আই' থেকে সংগ্রহ করে জাজ সিনেমা হিসেবে চালাচ্ছে। এগুলো আসলে টেলিফিল্ম হিসেবে বানানো। ওরা পূর্ণাঙ্গ সিনেমা করতে পারে নাই, তাই জাজকে দিয়েছে। জাজ কয়েকটা গান লাগিয়ে সিনেমাহলে মুক্তি দিয়েছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৩)।" ময়মনসিংহের কাজী দেলওয়ার হোসেন পরিষ্কারভাবে বলে দেন, 'প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মান বাড়লেও দেশে সামগ্রিক সিনেমার মান বাড়েনি (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১)।' এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় খুলনার মো. হালিমের কথায়। তিনি বলেন, 'ডিজিটাল আসার পর সব শেষ। ডিজিটাল মানে এক মাসের মধ্যে সিনেমা কমপ্লিট। শট দেখলে বোঝা যায়, এগুলো কম্পিউটার দিয়ে করা (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২৬)।'

চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির সাবেক জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি খোরশেদ আলম খসরু এ নিয়ে বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তার ভাষায়, "ডিজিটাল চলচ্চিত্রের নামে টেলিফিল্ম বানিয়ে দর্শকদের বোকা বানানো হচ্ছে" (মাজিদ ২০১৫)। একই ধরনের কথা বলেছেন ঢাকার 'আনন্দ সিনেমা'র সামসুল আলম (মাজিদ ২৭ অক্টোবর ২০১৫)। খুলনার নজরুল ইসলাম পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন,

> অ্যানালগ প্রজেক্টর থাকলে *তুখোড়*, *কত আশা কত স্বপ্ন*, *ভালোবাসা এমনই হয়* এর মতো সিনেমা মুক্তিই পেতো না। কারণ এতো টাকা দিয়ে ফিল্ম প্রিন্ট করাও হতো না, সিনেমা মুক্তিও পেতো না। প্রিন্ট করাতে তো তখন অনেক টাকা লাগতো। এখন এই ডিজিটালের কারণেই এসব সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.২২)।

খুলনার আতিয়ার রহমান বলেন, 'ডিজিটাল হওয়ার কারণে সিনেমা ভূয়া হয়ে গেছে। কারণ ডিজিটাল হওয়ার পরে অল্প ও কম বাজেটে নাম না জানা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে তারা সিনেমা বানিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। আগে মনে করেন, একটা প্রিন্ট বানাতে লাখ টাকা খরচ হতো, তখন ৭০–৮০টা প্রিন্ট

করতে হতো। তখন খরচ যেমন হতো, আয়ও হতো (আখ্যানের ক্রম ৪.৫.৯)।' একই কথা বলেন যশোরের প্রদীপ দাস—

> এখন মেমোরিতে করে সিনেমা এনে চালালেই হয়। অর্থাৎ ব্যয় অনেক কমে গেছে। যে কারণে সবাই সিনেমা বানাচ্ছে। ধরেন, যে নায়কের সিনেমা (তখন *তুখোড়* চলছিলো) এখন 'মণিহার'-এ চলতেছে, ও কি নায়ক হওয়ার যোগ্য? এই নায়কের ভিতরে কী কিছু আছে! তার মানে আমার টাকা আছে, আমি সিনেমা তৈরি করবো (আখ্যানের ক্রম ৪.৪.১২)।

এই ধরনের আশঙ্কার কথা অবশ্য বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি যাত্রার শুরুর দিকেই করেছিলেন নির্মাতা নূরুল আলম আতিক। তার ভাষায়, "কেউ যদি এই ফর্মাটে বানানো টিভি নাটক বানিয়ে বলেন নতুন সিনেমা, ডিজিটাল ছবি, তাহলে? আশংকা অমূলক নয়। ইদানিং স্রেফ টেলিভিশনে আরো বেশি পাত্তা চাইবার প্রয়োজনে অনেকেরই ডিজিটাল সিনেমা নিয়ে মাথাব্যাথা শুরু হয়েছে" (আতিক ২০০৯, পৃ৫১)।

অবশ্য এর উত্তরও তিনি নিজেই দিয়েছেন এভাবে—"... চূড়ান্ত বিচারে দর্শকই বলবেন, কোনটা সিনেমা আর কোনটা নাটক। সিনেমা বলতে আমি কী বুঝি, কোন সিনেমা আমি দেখতে চাই, দেখাতে চাই। যন্ত্র কিছু নয়, উপলক্ষ্যমাত্র" (আতিক ২০০৯, পৃ৫১)। আতিকের কথাকে সমর্থন করে পত্নীতলার আমিনুল ইসলাম বলেন, 'আজ যদি সিনেমায় ডিজিটাল প্রযুক্তি না আসতো, তাহলে এই সিনেমাহলটা হয়তো বন্ধ হয়ে যেতো। আমি আজ যে আপনার সঙ্গে এখানে বসে কথা বলতে পারছি, তা এই ডিজিটাল সিনেমার কারণে। তবে এখন সিনেমা বানাতে গেলে বিশ্ব মানের সিনেমা বানাতে হবে (আখ্যানের ক্রম ৪.১.৮)।' তবে উল্টো কথাও আছে। ময়মনসিংহের রণজিৎ চন্দ্র দে বলেন, 'এখনকার ছবি ঝকঝকে, সংলাপও পরিষ্কার কিন্তু সেটা কেবল সিনেমা হচ্ছে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৮.১৭)।'

আতিকের এ মূল্যায়ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ; তেমনি একই সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে শুরুতেই যদি লাগাম টানা না হয়, তাহলেও সমস্যা। লাগাম না টানার এই সমস্যাই বাংলাদশে হয়েছে। বিশেষ করে চলচ্চিত্র নির্মাণ মানে ক্যামেরা, সম্পাদনা, ইন্টারনেটের বদৌলতে প্রদর্শন সহজ হওয়ায়, অনেকে চলচ্চিত্রটাকে খুবই সহজ মনে করছেন। আর এ কারণেই অনেকক্ষেত্রেই চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে।

বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রযুক্তির যাত্রার শুরুর দিকে তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ তাদের চলচ্চিত্র *অন্তর্যাত্রা* (২০০৬) শ্যুট করেছিলেন ডিজিটাল ফরমেটে। কিন্তু পরে তাদেরকে এই চলচ্চিত্রটি ৩৫ মিলিমিটারে রুপান্তর করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর মোরশেদুল ইসলাম ২০০৯ সালে ডিজিটাল ফরমেটে *প্রিয়তমেষু* নির্মাণ করেন। পরে প্রেক্ষাগৃহে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নিয়ে গিয়ে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন করা হয়। সেই অর্থে *প্রিয়তমেষু* (২০০৯) প্রথম চলচ্চিত্র, যার নির্মাণ ও প্রদর্শন ডিজিটাল ফরমেটে হয়েছে।

এই শুরু, এরপর প্রচুর চলচ্চিত্র ডিজিটালে নির্মাণ হতে শুরু করে। এরফলে ধীরে ধীরে যেটা ঘটতে থাকে, চলচ্চিত্র নির্মাণের অতিযান্ত্রিক চরিত্রটি নির্মাতার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। নির্মাতা ও কৃৎকৌশলীদের মধ্যে বিভাজন ও দূরত্ব কমে আসে। একজন নির্মাতা খুব সহজেই টেকনিশিয়ানের দায়িত্বেরও ভাগ নিতে পারেন। ডিজিটাল প্রযুক্তির আরো সুবিধা নিয়ে ইরানের নির্মাতা সামিরা মাখমালবাফ বলেন,

> ডিজিটাল সিনেমার কারণে আমরা চলচ্চিত্রের কেন্দ্রবিন্দু—চিত্রনাট্য, দৃশ্যায়ন, সৃজনশীল সম্পাদনা, অভিনয়সহ কোনো কিছুই হারাব না। ডিজিটাল ছবি যা বদলে দেবে তা হলো চিত্রগ্রহণের ধরন, আলোর প্রয়োজন, পোস্ট প্রোডাকশন ল্যাবের কাজ ইত্যাদি। চলচ্চিত্র উৎপাদনযন্ত্রের এই কারিগরি বিপ্লবের ফলে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে হয়তো চলচ্চিত্রের মৃত্যু হবে, তবে এই বিপ্লব চলচ্চিত্রকে সৃজনশীল শিল্প হিসেবে বরং বাঁচিয়ে দেবে (উদ্ধৃত, মাসুদ ২০১২, পৃ১২৬)।

সামিরার কথার সমর্থন পাওয়া যায় সিলেটের 'নন্দিতা'র গেইটম্যান ফারুক মিয়ার কথায়। তিনি বলেন, 'অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তি হওয়ার পর অনেক দর্শক সিনেমাহলে আসছিলো। এই দর্শককে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। ইন্টারনেটের কারণে এরা ধীরে ধীরে সিনেমাহল থেকে দূরে সরে গেছে। কারণ এরা এখন সব কিছু সেখানেই দেখে (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.১০)।' সিলেটের 'নন্দিতা'র প্রজেক্টর অপারেটর জাভেদ বলেন, 'ডিজিটাল হওয়ার কারণে অনেক অ্যানালগ অপারেটরের পেটে লাথি মারা হয়েছে। তারা বেকার হয়ে গেছে। এই মানুষগুলো এখন কী করবে? এরা তো অন্য কোনো কাজ জানে না (আখ্যানের ক্রম ৪.৭.৮)।' ফলে ফারুক আর জাভেদের কথা ফেলে দেয়ার মতো নয়।

দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি আসার পর হয়তো টেকনিকালি অনেকগুলো বিষয়ই সহজ হয়েছে, প্রচুর তরুণ নির্মাতা এখন চলচ্চিত্র নির্মাণে সাহস দেখাচ্ছেন; কিন্তু মূল যে বিষয় চলচ্চিত্র নিয়ে বোঝাপড়া, সেটা কমে গেছে। কিন্তু তার পরও সব মিলিয়ে অপার সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি।

৬.১০) বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ

চলচ্চিত্রিক পরিসরে ভয়াবহ একটা সংকটের মধ্য দিয়ে এই দশক শুরু হয়। ৯০ দশকের ধারাবাহিকতায় একদিকে যেমন সহিংসতা ও যৌনদৃশ্য সম্বলিত চলচ্চিত্র নির্মাণ হতে থাকে, অন্যদিকে এর বাইরে থাকা নির্মাতা-প্রযোজক-শিল্পী-কলাকুশলীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। অনেকে নিজ অবস্থান, কখনো কখনো গোষ্ঠীগতভাবে এই সংকট নিরসনে চেষ্টা করেও সফল হননি। রাষ্ট্রও দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায়নি। তবে তাদের স্বার্থগত জায়গায় সামান্য আঘাত লাগলে সেখানে ছাড়ও দেয়নি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেন্সর বোর্ডের বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ দেখে। বছরের পর বছর ভয়াবহ সহিংসতা ও যৌনদৃশ্য সম্বলিত চলচ্চিত্রকে ছাড়পত্র দিয়েছে যে সেন্সর বোর্ড; তারাই *মাটির ময়না* (২০০২), *মেহেরজান* (২০১১), *রানা প্লাজা*র মতো চলচ্চিত্রকে নিষিদ্ধ করেছে! রাষ্ট্র তথা সেন্সর বোর্ডের এই ধরনের অবস্থান নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

দীর্ঘ দিনের দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে এই দশকে এসে দেশের একমাত্র স্টুডিও ও চলচ্চিত্রের প্রধান প্রতিষ্ঠান এফ ডি সি ভয়াবহ সংকটের মধ্যে পড়ে। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এই প্রতিষ্ঠানটি চলচ্চিত্রের উন্নয়নে যে খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পেরেছিলো, বিষয়টি সেরকমও নয়। অথচ সরকারি-বেসরকারি কোনো পক্ষ থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটির বিপরীতে বা সমান্তরালে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। দুই–একবার একটি পূর্ণাঙ্গ স্টুডিও নির্মাণের বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তাতে অনুমোদন দেয়নি সরকার। তারা সব সময়ই এই প্রতিষ্ঠানটিকে কুক্ষিগত করে রাখতে চেয়েছে। যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটিকে দিনের পর দিন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতায় এই দশকে চলচ্চিত্রের সমান্তরালে অনেকগুলো মাধ্যম দাঁড়িয়ে যায়। এগুলো মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত না করলেও চলচ্চিত্রের যে প্রথাগত প্রদর্শন, বিপণন প্রক্রিয়া আছে সেটাকে ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যে ফেলে। ডিসলাইন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মোবাইল ফোনসেট এগুলো প্রথাগত চলচ্চিত্র ব্যবসায় মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়ে যায়। দেশীয় চলচ্চিত্রের বাইরে এসময় দর্শকের হাতে নানা ধরনের চলচ্চিত্র, বিনোদন উপাদান বেছে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতায় ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানি বন্ধ থাকলেও চলচ্চিত্রসহ তাদের নানা বিনোদন উৎপাদ দেখা বন্ধ ছিলো না। ফলে সরকার রাজস্ব না পেলেও এইসব বিনোদন উৎপাদ ইন্টারনেট, ডিসলাইনের মাধ্যমে দর্শকের হাতের নাগালেই ছিলো। অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবো না বলে যে জুজুর ভয়ে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট একটা পক্ষের চাপে রাষ্ট্র ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানি বন্ধ রেখেছে; তা কেবল নামেই বন্ধ ছিলো; চলচ্চিত্রের পুঁজি বৃদ্ধিতে কিংবা উন্নয়নে তা কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি বরং সমস্যায় ফেলেছে। এর বিপরীতে বাজার উন্মুক্ত করে যদি দেশীয় চলচ্চিত্রকে প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলা যেতো, তাহলেও সময়ের সঙ্গে পোড় খেয়ে হলেও তা এক দশকে দাঁড়িয়ে যেতে পারতো।

শূন্য দশকে অভিনয়শিল্পীর সংকট দেখা দেয়। ৯০ দশকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছেলেমেয়েরা যেভাবে চলচ্চিত্রে আসার আগ্রহ দেখান এবং পুরনো শিল্পীরা জায়গা ছেড়ে দিয়ে যেভাবে তাদের সুযোগ করে দেন; সেই ধারা ওই দশকের শেষের দিকেই বন্ধ হয়ে যায়। বরং শূন্য দশকের শুরুতে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোতে যারা অভিনয় করেন তারা দিনশেষে দর্শকের কাছে পৌঁছেতে পারেননি। অন্যভাবে বললে, এই দশকের শুরুতে অভিনয়ে আসা একটি বিশাল শ্রেণির অভিনয়শিল্পীকে দর্শক সেভাবে চিনতোই না। কারণ এই সময়ের অভিনয়শিল্পীদের কাছে অভিনয় কিংবা সৌন্দর্যের চেয়ে শরীর প্রদর্শন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। যা একদিকে যেমন চলচ্চিত্র অভিনয়ে আসতে ইচ্ছুক অনেককে বিমুখ করেছে, অন্যদিকে যারা সেসময় এই ধরনের চলচ্চিত্রে অভিনয়ের বাইরে ছিলেন তাদের সামাজিক-

সাংস্কৃতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। যা দেশের পুরো চলচ্চিত্রিক পরিবেশকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো।

৯০ দশকে সালমানের মৃত্যুর পর পুরো চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির এগিয়ে নেওয়ার অলিখিত দায় পড়ে নায়ক মান্নার ওপর। মান্নার একার পক্ষে সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিলো না। তারপরও তিনি ও সমকালীন অন্যান্য অভিনয়শিল্পীরা (রিয়াজ, ফেরদৌস, আমিন খান, ওমর সানি, শাবনূর, মৌসুমী, পূর্ণিমা প্রমুখ) মিলে সহিংসতা ও যৌনচলচ্চিত্রের বিপরীতে কিছুটা হলেও অবস্থান নেন। কিন্তু ২০০৮-এ মান্নার মৃত্যুতে পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে ভয়াবহভাবে নায়কের সংকট দেখা দেয়। এই সময়ে নির্মাতারা অনেককে দিয়ে মান্নার অভাব পূরণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এই পরিস্থিতিতে অল্প দিনের মধ্যে নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন শাকিব খান। যদিও ৯০ দশকের শেষ দিক থেকেই শাকিব অভিনয়ে ছিলেন, কিন্তু তিনি দর্শকের মধ্যে কোনো অবস্থান তৈরি করতে পারেননি। ডিপজলের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে তারই প্রযোজনায় পর পর কয়েকটি সুপার হিট চলচ্চিত্রে অভিনয় করে শাকিব নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করেন।

এর কিছু দিনের মধ্যে শাকিব একক নায়ক হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। চলচ্চিত্রের এই সংকটের সময় তিনি রেকর্ড পরিমাণ পারিশ্রমিক নিতে থাকেন এবং একই সঙ্গে নানা ধরনের অপেশাদারী আচরণ করেন। যার প্রভাব পড়তে থাকে চলচ্চিত্রশিল্পে। একই ধরনের গল্পে, একই নায়ক ও নির্দিষ্ট দুই–একজন নায়িকাকে দেখতে দেখতে দর্শক বিরক্ত হন। ফলে শাকিব অভিনীত বড়ো বাজেটের বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র সেসময় ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থা ১০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলেছে। ইন্ডাস্ট্রির কথা মাথায় না নিয়ে শাকিবের এ ধরনের অপেশাদারী আচরণ চলচ্চিত্রের বড়ো ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে অনেক পেশাদার প্রযোজক ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন, চলচ্চিত্র নির্মাণ কমে যায়, বন্ধ হতে থাকে প্রেক্ষাগৃহ।

শূন্য দশকে সহিংসতা ও যৌনদৃশ্য সম্বলিত চলচ্চিত্রগুলো দেখার জন্য এক শ্রেণির দর্শক প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করে। এর ফলে প্রদর্শকরা বেশ কিছু দিন ভালো পয়সা আয়ও করেন। এই পরিস্থিতির ভবিষ্যত কী হবে বেশির ভাগ প্রেক্ষাগৃহের মালিক সেসময় চিন্তা করেননি। তারা বর্তমানের লাভটুকুকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্র দর্শকের অর্ধেক যে নারী, তারা যে প্রেক্ষাগৃহে আসা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছেন, তাও হয়তো তারা খেয়াল করেননি। কিন্তু ২০০৭ সালের পর পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে এসব প্রেক্ষাগৃহ দর্শক শূন্য হয়ে পড়ে। তখন অন্যান্য চলচ্চিত্র আনলেও কোনো দর্শকই আর প্রেক্ষাগৃহে যায়নি। যৌনচলচ্চিত্রের দর্শক যায়নি কারণ সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, আর এর বাইরের দর্শক তো ততোদিনে টেলিভিশনসহ বিকল্প মাধ্যমগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। ফলে এইসব প্রেক্ষাগৃহ অল্প

কিছু দিনের মধ্যে বন্ধ হওয়া শুরু হয়। এই পরিস্থিতি সহিংস ও যৌনদৃশ্য সম্বলিত চলচ্চিত্রের বাইরে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর ওপরে ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। ওইসব চলচ্চিত্র তখন প্রেক্ষাগৃহের অভাবে ব্যবসা করতে ব্যর্থ হতে থাকে।

শূন্য দশক ও তার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে প্রাযুক্তিক বিকাশের ফলে চলচ্চিত্র নির্মাণ সহজ হয়; কিন্তু সেই চলচ্চিত্র সাধারণ মানুষের কাছে কতোটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। এটা ঠিক যে, প্রযুক্তি হাতে পাওয়া আর তার ব্যবহার করা এক জিনিস নয়। কিন্তু চেষ্টা আর লেগে থাকলে সময়ের সঙ্গে তা নিঃসন্দেহে কার্যকারী হয়ে ওঠে। দেশীয় চলচ্চিত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিশাল এক সম্ভাবনার সৃষ্টি করে, যে সম্ভাবনায় সবশ্রেণির মানুষ এখন চাইলেই এই মাধ্যমটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে। ভিজ্যুয়াল ইমেজ ব্যবহার করে তারা এখন নানাভাবেই গল্প বলতে চায়। এটা যেমন একটা সম্ভাবনা, অন্যদিকে এই আগ্রহ, সম্ভাবনাকে যদি যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে না নেওয়া যায়, তাহলে সেটা চলচ্চিত্রের জন্য খুব বেশি সুফল বয়ে আনবে না। প্রাযুক্তিক দিক দিয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এখন এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে আছে। এখন কেবল সময় নিয়ে এই প্রক্রিয়াটাকে এগিয়ে নিতে পারলেই হয়তো আগামীর সম্ভাবনার পথ খুলে যাবে।

শূন্য ও ১০-এর দশকে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে চলচ্চিত্র টিকে থাকার চেষ্টা করছে। সেই সময় এফডিসিতে নির্মিত চলচ্চিত্রের সমান্তরালে আরেকটা ভিন্ন সাংস্কৃতিক বলয় তৈরি হয় সিনেপ্লেক্স কেন্দ্রিক। সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাওয়া এসব চলচ্চিত্র ৮০'র দশকের বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলন প্রভাবিত ছিলো। ওই ধারার বেশ কয়েকজন নানা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এটিকে এগিয়ে নিয়েছেন। পাশাপাশি ৯০ দশকে হুমায়ূন আহমেদের নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো এ ধরনের চলচ্চিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এই ধারার উল্লেখযোগ্য নির্মাতাদের মধ্যে আছেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, তৌকীর আহমেদ, অমিতাভ রেজা চৌধুরী, রুবাইয়াত হোসেন, গিয়াসউদ্দিন সেলিম প্রমুখ। তাদের নির্মিত বেশিরভাগ চলচ্চিত্র মূলত সিনেপ্লেক্সের দর্শকই দেখেছে। এর বিপরীতে এফ ডি সি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের জন্য যে একক প্রেক্ষাগৃহ ছিলো সেগুলো বন্ধ হতে হতে এখন প্রায় শূন্যের কোটায়।

৬.১১) উপসংহার

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের অভিযাত্রাকে সময় ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য নিয়ে এই গবেষণাটি শুরু হয়েছিলো। আরো নির্দিষ্ট করে বললে চলচ্চিত্রের তৃণমূল দর্শক এবং প্রেক্ষাগৃহ কেন্দ্রিক জন-জীবনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে এখানে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে পুনর্পাঠ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাজ-বাস্তবতা যেভাবে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয় আবার চলচ্চিত্র যেভাবে সমাজ-বাস্তবতার পরিগঠনে ভূমিকা রাখে সেটাও দেখার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণায়। এর সঙ্গে আরো যা অনুসন্ধান করা হয়েছে তা হলো, চলচ্চিত্রের প্রকৃতি ও পরিসরকে ক্ষমতা-সম্পর্ক কীভাবে নির্ধারণ করে।

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এথনোগ্রাফির মাধ্যমে তৈরি করা মাঠের অ্যাখ্যানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তা করতে গিয়ে দেখা গেছে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে গেলে মোটাদাগে আটটি থিম ধরে এগোতে হয়—১. সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা; ২. চলচ্চিত্রের কাহিনি, নির্মাতা ও নির্মাণশৈলী; ৩. তারকা-কুশীলব; ৪. চলচ্চিত্রের দর্শক, ব্যবসা ও প্রেক্ষাগৃহ; ৫. চলচ্চিত্রের সমান্তরালে শিল্পকলা ও গণমাধ্যম; ৬. হিন্দি ও অন্য ভাষার চলচ্চিত্র আমদানি; ৭. চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর (রাষ্ট্র, সেন্সর বোর্ড, এফ ডি সি ও চলচ্চিত্রশিক্ষা); ও ৮. চলচ্চিত্রের ধরন। এই আটটি থিমের সঙ্গে এ সংশ্লিষ্ট নানা তত্ত্ব ও গবেষকের নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে তিনের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে এই অভিসন্দর্ভে পাঁচটি দশকে (১৯৫৬–২০১৫) সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যে সামাজিক ইতিহাস সেটাকে চলচ্চিত্রের তৃণমূল দর্শক ও তাদের জায়গা থেকে দেখলে, চলচ্চিত্র নিয়ে যে প্রচলিত আলাপ আছে তার সঙ্গে একটা বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ফলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে আমরা যদি তৃণমূল দর্শক মন ও তার স্মৃতি থেকে দেখি তাহলে শুরুর দশক মানে ৬০ দশকে প্রধানতম প্রবণতা ছিলো চলচ্চিত্রের মূল যে শক্তি প্রযুক্তির জাদু-বাস্তবতা; এবং সেই জাদু-বাস্তবতাকে ব্যবহার করে আমাদের গ্রামীণ যে আখ্যান, উপাখ্যান, যাত্রাপালা, পরিচিত সাহিত্য, মিথলজির সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক সংযোগ সাধন করতে পারা। পাশাপাশি শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তাদের নিজেদের মতো করে চলচ্চিত্রে নিজেদের একটা গল্প বলার চেষ্টা করেছেন। এসব কিছুর সমন্বয় ৬০ দশকের পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ছাপিয়ে সামাজিক ইতিহাসের টানাপড়েনকে চলচ্চিত্রে হাজির করেছিলো।

৭০ দশকে নতুন রাষ্ট্রে, নতুন আকাঙ্ক্ষায় জাতীয় চলচ্চিত্র এবং সেই অর্থে নান্দনিক, মননশীল ও শিল্প (Art) হিসেবে চলচ্চিত্রকে নিয়ে নতুন মধ্যবিত্তের শৈল্পিক মন যে চলচ্চিত্রের স্বপ্ন দেখেছিলো, সেটা শেষ পর্যন্ত ঘটেনি। মুক্তিযুদ্ধের উত্তাপকে নিয়ে তারা দর্শন ও শিল্পবোধকে যতোখানি চলচ্চিত্রের উপজীব্য করেছেন মানে মানুষের জীবনের সমাজ বাস্তবতা নতুন করে আবিষ্কারের যে চেষ্টা করেছেন; সেটার সঙ্গে দর্শকের ঐতিহাসিক স্মৃতি, মননশীলতা কিংবা তার শিল্পবোধের সংযোগ হয়নি। মানে দর্শনের সঙ্গে বিনোদনের যে সংযোগ সেটা ৭০ দশকে ঘটেনি।

৭০ দশকের জাতীয় চলচ্চিত্রের প্রচেষ্টা ও সেই সংশ্লিষ্ট বোঝাপড়া ৮০'র দশকে এসে পুরো চলচ্চিত্র শিল্পে (Industry) প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দেয়। ফলে একটি পক্ষ এই ধারাটিকে খারিজ করে পুরোপুরি বিনোদন বাণিজ্য ও দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হন। এছাড়া ৭০ দশকে চলচ্চিত্রের প্রাযুক্তিক জাদু-বাস্তবতা তবুও ছিলো, কিন্তু ৮০'র দশকে চলচ্চিত্রকে ভিসিআর ও

টেলিভিশনের সঙ্গে পুরোদমে প্রতিযোগিতা করতে হয়, ফলে জাদু-বাস্তবতা সেই অর্থে কাজ করেনি। চলচ্চিত্রের সমান্তরালে এসব গণমাধ্যমের চাপ সামলেও বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্র এই দশকে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে ছিলো—সেটা দর্শক, চলচ্চিত্রের বিচিত্র ধরন ও ব্যবসায়। তবে এর মধ্যেও ৭০ দশকে জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রচেষ্টার পক্ষটির উত্তরাধিকাররা বিকল্প ধারা নামে একটি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। যা চলচ্চিত্রের সামগ্রিক ধারাকে পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৮০'র দশকের ব্যাপক বিনোদন বাণিজ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহের ভিত্তিটাকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলো। এছাড়া সমান্তরাল গণমাধ্যম হিসেবে এই দশকে যুক্ত হয়েছিলো ভিসিআর-এর উন্নত প্রযুক্তি সিডি প্লেয়ার ও স্যাটেলাইট টেলিভিশন। এসব কিছু মিলিয়ে প্রেক্ষাগৃহ হয়ে উঠেছিলো একমাত্র তাদেরই বিনোদন কেন্দ্র, যাদের প্রাযুক্তিক এসব সুবিধাকে ব্যবহারের সামর্থ্য ছিলো না। বিশেষ করে এসময় প্রেক্ষাগৃহ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী দর্শক কমতে শুরু করে। ফলে ৯০ দশকের শেষে নারী দর্শকবিহীন প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্রে বিনোদন হাজির হলো একেবারে দেহজ রূপে; মনের বিনোদনের চেয়ে চলচ্চিত্র দেহজ বিনোদনের ক্ষেত্র হয়ে উঠলো। নারীকে এসময় কেবল বস্তু (Object) হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে এমন নয়, পুরুষ দর্শককেও নিষ্ক্রিয় সত্তা ভাবা হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রেক্ষাগৃহ তার সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শেষ চরিত্রটুকুও হারিয়ে ফেললো।

শূন্য দশকে এসে গত ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ক্রান্তিকাল পার করছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র উপভোগের জন্য প্রেক্ষাগৃহের বিকল্প না থাকলেও দেশে বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহ নেই বললেই চলে। প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের সংগঠন প্রদর্শক সমিতির তথ্য মতে, ২০২০ সালে সারাদেশে নিয়মিত প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ৬০ থেকে ৭০টি। আর মৌসুমী (মৌসুমী প্রেক্ষাগৃহ মানে দুই ঈদ, পুজা, নববর্ষে কেবল এগুলো চালু থাকে) প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা প্রায় ৩০টি (*প্রথম আলো* ৩ জানুয়ারি ২০২০)। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দুই–এক বছরের মধ্যে দেশে হয়তো কোনো প্রেক্ষাগৃহই থাকবে না।

এর বিপরীতে দেশে সিনেপ্লেক্স রয়েছে হাতেগোনা কয়েকটি। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, খুলনার খালিশপুর ও মুন্সিগঞ্জে সিনেপ্লেক্স রয়েছে। এর মধ্যে মুন্সিগঞ্জের সিনেপ্লেক্সটি চালুর পর চলচ্চিত্রের জোগান না থাকায় সাময়িক বন্ধ রয়েছে। তবে ঢাকার প্রথম সিনেপ্লেক্স 'স্টার সিনেপ্লেক্স' তাদের কার্যক্রম দিন দিন বর্ধিত করছে। এছাড়া ঢাকার শ্যামলী ও যমুনা ফিউচার পার্কে আরো দুটি সিনেপ্লেক্স রয়েছে। বগুড়াতেও একটি সিনেপ্লেক্স নির্মাণাধীন।

একদিকে একক পর্দার প্রেক্ষাগৃহের বিলুপ্তি, অন্যদিকে ধীর গতিতে হলেও সিনেপ্লেক্সের বৃদ্ধি—দেশীয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যত পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। অবশ্য এই চিত্র কেবল বাংলাদেশের নয়, বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রির পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেরও। ফলে ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্রের ট্রেন্ড কিছুটা হলেও এতে বোঝা যায়। এছাড়া

কলকাতা, এমনকি বলিউডের চলচ্চিত্রেও এখন আগের সেই ফর্মুলার ব্যবহার কমতে শুরু করেছে। সেখানে নতুন ধারার, নতুন আধেয় নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে। সালমান-শাহরুখ-আমিরের সঙ্গে পুরো দাপট নিয়ে অশীতিপর অমিতাভ বচ্চন, নাসিরউদ্দিন শাহ যেমন আছেন, তেমনই অপেক্ষাকৃত নতুন অভিনয়শিল্পী মনোজ বাজপাই, নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী, রাজকুমার রাও, আয়ুষ্মান খুরানা, রিটা চাড্ডা, রাধিকা আপ্তে, কালকি কচলিনও আছেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রেও সায়মন-বাপ্পী-শাকিবের বিপরীতে একটা শ্রেণির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন চঞ্চল, মোশাররফ করিম, জয়া আহসান, তিশা এবং ফারুকী-অমিতাভ ঘরানা। এসব চলচ্চিত্রের আধেয়তেও এসেছে পরিবর্তন। অনেকক্ষেত্রে চলচ্চিত্র এখন নিজে নিজেদের ইন্ডাস্ট্রির গল্পও বলছে।

এই চলচ্চিত্রের দর্শক কিন্তু একেবারেই শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি। যারা ২৫০ থেকে ৭৫০ টাকায় টিকেট কেটে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে কিংবা শুয়ে (স্টার সিনেপ্লেক্সের নতুন প্রেক্ষাগৃহগুলোতে ইজি চেয়ারের মতো শুয়ে শুয়ে চলচ্চিত্র দেখারও ব্যবস্থা রয়েছে) পপকর্ন আর কোক খেতে খেতে চলচ্চিত্র দেখেন; এবং শো শেষে পোস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলে ফেইসবুকে দিতে পছন্দ করেন। আর এই মূল্যে টিকিট বিক্রি করে অল্প সংখ্যক দর্শক দিয়ে ব্যবসা করাও এখন খুব একটা কঠিন কোনো বিষয় নয়; সঙ্গে নানা ধরনের স্পন্সর, টেলিভিশন স্বত্ব তো আছেই।

এছাড়া প্রযুক্তির বদৌলতে নতুন প্রেক্ষাগৃহ হিসেবে হাজির হয়েছে দেশি-বিদেশি অনেকগুলো অনলাইন স্ট্রিমিং প্লাটফর্ম—নেটফ্লিক্স, জি ফাইভ, এ এল টি বালাজি, হটস্টার, আইফ্লিক্স, বায়োস্কোপ, হইচই প্রভৃতি। যেখানে চাইলেই যেকোনো পরিস্থিতিতে দর্শক ইন্টারনেটের ডাটা চালু করে মোবাইল ফোনসেট, ল্যাপটপ, কিংবা স্মার্ট টেলিভিশনে নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে সরাসরি চলচ্চিত্র দেখতে পারেন। এছাড়া একটি নির্দিষ্ট সময় প্রেক্ষাগৃহে ব্যবসার পর প্রযোজক-নির্মাতা এসব প্লাটফর্মে তাদের চলচ্চিত্র বিক্রি করেও দিতে পারেন। তাই প্রেক্ষাগৃহে এসে অনেক সংখ্যক দর্শক না দেখলে চলচ্চিত্রের ব্যবসা হবে না, এই চিন্তা আর প্রযোজক-নির্মাতাদের নেই।

ফলে শহুরে মধ্যবিত্তকে ঘিরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ঘুরে দাঁড়ানোর যে চেষ্টা, তাতে গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র তার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। যে কারণে দেশীয় চলচ্চিত্রের কেন্দ্রে গণমানুষ আর থাকছে না বললেই চলে।

বন্ধ হয়ে গেছে ৪০০ প্রেক্ষাগৃহ
দুঃসময় কাটছে না সিনেমার এক্সট্রা শিল্পীদের
পাইরেসি সন্ত্রাস
রাজশাহীর সিনেমা হল এখন মার্কেট
নকল সন্ত্রাসে নাকাল চলচ্চিত্র
প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় চলচ্চিত্র
মুক্তি-৬২, ব্যবসা সফল-২, গড় ব্যবসা-৮
প্রেক্ষাগৃহের বাজে পরিবেশ
দক্ষ নির্মাতার অভাব
একতা পরিষদ গঠিত

গ্রন্থপঞ্জি

অ

‘অবশেষে ঈদে পাঁচ ছবি’, *সমকাল*, ২৩ অক্টোবর ২০১২।

আ

আউয়াল, সাজেদুল ২০১১, *চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

আউয়াল, সাজেদুল ২০১৭, *চলচ্চিত্রচর্যা*, জার্নিম্যান বুক্‌স, ঢাকা।

আখতারুজ্জামান ১৯৭৮, ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ক্রমবিবর্তনের ধারা’, *সাপ্তাহিক চিত্রালী* ২৫তম বর্ষ শুরু সংখ্যা, ঢাকা।

আজম, মোহাম্মদ ২০১১, “‘অশ্লীলতা’-বিরোধী প্রপাগান্ডা ও ‘সুস্থ’ চলচ্চিত্রের যুগ”, *যোগাযোগ*, সংখ্যা ১০, জানুয়ারি, ঢাকা।

আদনান, হাছান, ‘জনতা ব্যাংকে ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৫ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি : পর্দার আড়ালে জাজ মাল্টিমিডিয়া’, *বণিক বার্তা*, ২৭ আগস্ট ২০১৮।

আতিক, নূরুল আলম ২০০৯, *নতুন সিনেমা, সময়ের প্রয়োজন*, ঐতিহ্য, ঢাকা।

আলম, মো. ফখরুল ২০১১, *আমাদের চলচ্চিত্র*; চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

আলী, এ এম এম শওকত আলী ২০০৭, ‘আধুনিক যুগ’, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩ : রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি*, সম্পা. : এমাজউদ্দীন আহমদ ও হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

আলী, শেখ নিয়ামত, ‘ফিরোজ জামান চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার’, *ভোরের কাগজ*, ১ মে ১৯৯৯, ঢাকা।

আলী, মাসুম, ‘সালমান যদি ফিরে আসতেন ...’ *প্রথম আলো*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

আলী, মাসুম, ‘অনেক শহরে একটিও সিনেমা হল নেই’, *প্রথম আলো*, ২৯ জুন ২০১৭।

আলী, মাসুম, ‘শিল্প ঘোষণায় কী লাভ হলো’, *প্রথম আলো*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

আলী, মাসুম, “‘ঘুড্ডি’ নয়, তবে সুবর্ণার মতো নায়িকা খুঁজছেন নির্মাতা”, *প্রথম আলো*, ১৫ জানুয়ারি ২০২০।

আলী ২০১৫, ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : গোলটেবিল আলোচনা’, *বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

আহসান, আসলাম ২০১৬, *বাংলাদেশের সিনেমাতে স্মৃতি জাগানিয়া গান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

আহমদ, আবদাল ১৯৯০, ‘নিম্নবিত্তরা থাকবে কোথায়’, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৮ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২ মার্চ।

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন ২০০৭, ‘নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী’; *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১ : তৃতীয় খণ্ড সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*; সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.); বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

আহমেদ, কামাল উদ্দিন ২০০৭, ‘স্বায়ত্তশাসনের সন্ধানে’; *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১ : প্রথম খণ্ড রাজনৈতিক ইতিহাস*; সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.); বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

আহমেদ, রেহনুমা ও চৌধুরী, মানস ২০০৩, *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ : সমাজ ও সংস্কৃতি*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

আহমেদ, রেহনুমা ২০০৪, ‘রেপ্রিজেন্টেশন (ও বাস্তবতা) : কিছু পরিসর, কিছু প্রসঙ্গ’, *কাউন্টার ফটো*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা।

আহমেদ, তারেক ১৯৯৮, ‘চলচ্চিত্রের দর্শক—সৎ চলচ্চিত্র আন্দোলন ও বর্তমান বেনিয়া চলচ্চিত্র’; *চলচ্চিত্রে স্বদেশ ভাবনা*; তারেক আহমেদ (সম্পা.), পরাগ প্রকাশনী, ঢাকা।

আহমেদ, হুমায়ূন ১৯৯৬, *ছবি বানানোর গল্প*, সুবর্ণ, ঢাকা।

আহমেদ, তারেক ২০১৮, *চলচ্চিত্রের চারদিক*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

আহমেদ, তারেক, ‘সুস্থ-চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং সরকারি প্রচেষ্টা’, *সংবাদ*, ২৭ আগস্ট ১৯৯২।

‘আমি একাই রাজা-বাদশা’ *সমকাল* ২১ এপ্রিল ২০১১।

ই

ইসলাম, আহমেদ আমিনুল ২০০৮, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর্থসামাজিক পটভূমি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ইসলাম, মইনুল ২০১৬, “ময়মনসিংহের প্রেক্ষাগৃহ : ‘অলকা’ থেকে ‘অলকা নদী বাংলা শপিং কমপ্লেক্স’”, *ম্যাজিক লণ্ঠন*, সংখ্যা ১০, বর্ষ ৫, জানুয়ারি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইভান্স-প্রিচার্ড, ই. ই. ২০০৯ (১৯৪৮), *সমাজ নৃবিজ্ঞান*, সাদাত উল্লাহ খান (অনু.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ইফতেখার ১৯৭৩, ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প : এর ভূত-ভবিষ্যত’, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২য় বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ঢাকা।

ঈ

‘ঈদের পর মুক্তি পাচ্ছে ভারতীয় তিনটি ছবি’, *প্রথম আলো*, ১২ আগস্ট ২০১১।

উ

উদ্দীন, মাহতাব ১৯৭৩, ‘অবক্ষয়ে মধ্যবিত্ত’, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২য় বর্ষ, সংখ্যা ২৬, ২৭ ডিসেম্বর।

উমর, বদরুদ্দীন ১৯৮১, ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে’, *কণ্ঠস্বর*, ঢাকা।

উমর, বদরুদ্দীন ২০১৫, ‘অধঃপতিত মধ্যবিত্ত ও জাতীয় সংকট’, *সংস্কৃতি*, ৪১ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জানুয়ারী, ঢাকা।

এ

এখনো অভিনয় ভালোবাসি'; *কালের কণ্ঠ*'র শুক্রবারের ক্রোড়পত্র 'কথায় কথায়' ১১ আগস্ট ২০১৭।

'এত মানুষ, এত ভালোবাসা, কেন?', প্রথম আলোর বৃহস্পতিবারের বিশেষ ক্রোড়পত্র আনন্দ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

'এফডিসির সব শাখা এখন খুঁড়িয়ে চলছে', *সমকাল*, ১৩ মার্চ ২০১১।

ক

কর্মকার, শুভ ও রাকিব, রোকনুজ্জামান ২০১১, 'টেলিভিশন চ্যানেল প্রযোজিত চলচ্চিত্র : কানা মামা নাকি শকুনি মামা', *ম্যাজিক লণ্ঠন*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কাদের, মনজুর ও সিদ্দিক, হাবিবুল্লাহ, 'নেই প্রেক্ষাগৃহ নেই দর্শক', *প্রথম আলো*র বৃহস্পতিবারের বিনোদন ক্রোড়পত্র *আনন্দ*, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

কবির, আলমগীর, *চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি : রচনা সংগ্রহ ১ম খণ্ড*, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান ও প্রিয়ম প্রীতিম পাল (সম্পা.) আগামী প্রকাশনী ও মধুপোক, ঢাকা।

কবির, আলমগীর ১৯৮১, *প্রক্ষেপণ*; ৪র্থ বর্ষ, শেষ সংখ্যা, ৫ম পর্ব।

কবির, আলমগীর ১৯৭৮, 'গত একুশ বছরের চলচ্চিত্রাংগন—একটি সমীক্ষা', *চলচ্চিত্রকার*, ঢাকা।

কাদের, মির্জা তারেকুল ১৯৯৩, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কামরুজ্জামান, 'বাংলা ছবির অবৈধ ভিডিও সিডি : অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি', *প্রথম আলো*, ১৫ জুলাই ২০১০।

খ

খান, জামান ১৯৭০; 'সেন্সর : মুকুরে অপদেবতার প্রতিচ্ছবি'; *ধ্রুপদী*, ঢাকা।

খান, আরিফ ২০১১, 'মিডিয়ার সেদিন এদিন', *সাপ্তাহিক ২০০০*, বর্ষ ১৪, সংখ্যা ২৬, ৪ নভেম্বর, ঢাকা।

খান, মো. আরিফুর রহমান ১৪২২/২০১৬, 'বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র : ১৯৭১ সাল থেকে ২০১৫', *পথরেখা*, বর্ষ ১৯, প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা।

খালেক, এম এ ২০১৫, 'মধ্যবিত্তের বিকাশ উন্নয়নের নির্দেশক', *যুগান্তর*, ১২ নভেম্বর।

খালেক, ড. আবদুল, সরকার, নীহাররঞ্জন ও অন্যান্য ১৯৯৮, *সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি*, হাসান বুক হাউস, ঢাকা।

গ

গায়েন, অদিতি ফাল্গুনী ও বিলকিস, হুমায়রা ২০০৯, *বাংলাদেশের জনপ্রিয় ধারার চলচ্চিত্র ও সিনে সাংবাদিকতা আন্তঃপ্রভাব*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

গায়েন, কাবেরী ২০১৩, *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

গায়েন, কাবেরী ১৯৯৭, "ফ্রাংকফুর্ট স্কুলের 'সংস্কৃতি-ইন্ডাস্ট্রি' ধারণা : একটি তত্ত্বীয় পর্যালোচনা", *ADCOMSO Journal*, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, রাজশাহী।

ঘ

ঘটক, রেজা ২০১৬, 'বাংলাদেশের সিনেমা বাজার ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা', *পথরেখা*, ঊনবিংশ বর্ষ, প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা।

ঘোষ, ড. প্রদ্যোত ২০০৪, *বাংলার লোকশিল্প*, পুস্তক বিতান, কলকাতা।

ঘোষ, অজিতকুমার ২০০০, 'যাত্রা : লোকনাট্য কি?', *বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক*, শ্রীসনৎকুমার মিত্র (সম্পা.), লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা।

চ

'চলচ্চিত্রে মনিটরিং সেল', *সমকাল*, ১১ মার্চ ২০১১।

চক্রবর্তী, বিভাস ১৯৯৬, 'থিয়েটার ও সিনেমা', *শতবর্ষে চলচ্চিত্র* ১, নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত (সম্পা.); আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

চক্রবর্তী, শান্তনু ১৪১৫, 'জনপ্রিয় চলচ্চিত্র-চর্চা', বলিউডের জন-গণ-মন : একটি সাংস্কৃতিক পাঠ, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা।

চক্রবর্তী, দীপেশ ২০১১, 'ইতিহাসের জনজীবন', *ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

চক্রবর্তী, দীপেশ ২০১১, 'স্মৃতি ও বাঙালির পাবলিক কালচার', *ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

চৌধুরী, মাহফুজ ১৯৯০, 'বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন : বাংলাদেশ পঞ্চম দরিদ্রতম দেশ', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ৩ আগস্ট।

চৌধুরী, মানস ২০০৭, 'নিজ-অবয়ব, সংঘাত ও সংশ্লেষ : ডিপজল প্রপঞ্চ', *যোগাযোগ*, সংখ্যা ৮, ফেব্রুয়ারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

চৌধূরী, শৈবাল ২০১৬, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-সংগীত, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, নবম বর্ষ, সংখ্যা ১০/জুন, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

ছ

ছফা, আহমদ ২০০৭, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা', *বেহাত বিপ্লব*, সলিমুল্লাহ খান (সম্পা.) অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

ছফা, আহমদ ২০০৮, *সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা।

জ

জামান, রূপক, 'অনুদান নাকি সম্প্রদান', *কালের কণ্ঠ*-এর বৃহস্পতিবারের বিশেষ বিনোদন ক্রোড়পত্র *রঙের মেলা*, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

জামান, রূপক, 'লাভের গুড় কে খায়?', *কালের কণ্ঠ*-এর সাপ্তাহিক বিনোদন ক্রোড়পত্র *রঙের মেলা*, ১৫ মার্চ ২০১৮।

জসীমউদ্‌দীন ১৯৯৭, 'রূপবান যাত্রা'; *জসীমউদ্‌দীনের প্রবন্ধ*; পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।

জেয়াদ, আবদুল্লাহ ২০১০, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : পাঁচ দশকের ইতিহাস, জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা।

ঝ

ঝুমা, জান্নাতুল ফেরদৌস ২০০৯, 'বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ : অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ', *বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৬, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

ঝুমা, জান্নাতুল ফেরদৌস ২০১৪, *বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ : অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

ট

টুম্পা, মুর্শিদা, ২০১৩, অপ্রকাশিত গবেষণা : 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের উদ্ধারকল্পে 'সুপারম্যান' ধারণা : অনন্ত জলিল ও তার চারটি চলচ্চিত্রের বিচারমূলক পাঠ'।

ঢ

'ঢালিউডের ছয় মাস : শাকিবের জন্য অশনিসংকেত' *প্রথম আলো*, ৩০ জুন ২০১১।

ত

তুহিন, কামরুল হাসান, সিনেমার দর্শক চরিত্র বদলে গেছে, *দৈনিক বাংলা*, ২ মে ১৯৯১, ঢাকা।

তুহিন, কামরুল হক, 'সিনেমা হলগুলোতে কি হচ্ছে', *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৩ অক্টোবর ১৯৮৯, ঢাকা।

দ

দত্ত, গুরুসদয় ২০০৮, 'পটুয়া সঙ্গীত', *বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য*, ছাতিম বুক্‌স্‌, কলকাতা।

দাস, সুদীপ্ত কুমার, 'সিনেমা হল কেন দর্শকশূন্য', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৬ এপ্রিল ২০১৮।

দীপ, সুদীপ কুমার, 'তৈরি হচ্ছে সাব-কমিটি : ঢালিউড-টালিগঞ্জের নতুন অধ্যায় শুরু আগামী মাসেই', *কালের কণ্ঠ*, ২৫ জানুয়ারি ২০১৩।

দৈনিক বাংলা, ২৫ আগস্ট ১৯৮২, ঢাকা।

দৈনিক বাংলা, ৭ জুলাই ১৯৮২, ঢাকা।

দৈনিক বাংলাবাজার, ২৪ আগস্ট ১৯৯২, ঢাকা।

ন

'নতুন বছরের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জী', *চিত্রালী*, বিশেষ সংখ্যা, ১৮ অক্টোবর ১৯৬৮, ঢাকা।

নাসরীন, গীতি আরা ও হক, ফাহমিদুল ২০০৮, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প, সংকটে জনসংস্কৃতি*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।

নাসরীন, গীতি আরা, 'একজন নায়কের মৃত্যু, অসংখ্য ভক্তের মুখ', *প্রথম আলো*র বৃহস্পতিবারের বিশেষ ক্রোড়পত্র *আনন্দ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

নাসরীন, গীতি আর ও হক, ফাহমিদুল ২০১৩, 'বাংলাদশের চলচ্চিত্র : সঙ্কটসূত্র ও উত্তরণপ্রকল্প', *যোগাযোগ*, সংখ্যা ১১, ডিসেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নাসরুল্লাহ্‌, শরীফ, 'ভালো ছবির কদর মাল্টিপ্লেক্সে', *প্রথম আলো*, ২ জুন ২০১৮।

নির্ঝর, খায়রুল বাসার, 'অনুদান নাকি বলিদান', *কালের কণ্ঠ* এর বৃহস্পতিবারের বিনোদন ক্রোড়পত্র *রঙের মেলা*, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

প
‘পর্নোগ্রাফি নির্মাণের হোতা’, *কালের কণ্ঠ*, ২৬ মার্চ ২০১১।

‘প্রসঙ্গ ভারতীয় চলচ্চিত্র : রায়ের কপির জন্য অপেক্ষা’, *প্রথম আলো*, ১৯ অক্টোবর ২০১০।

ফ
ফিল্ম ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট ১৯৬১, পাকিস্তান সরকার, শ্রমদপ্তর, রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান।

ব
‘বছরজুড়ে শাকিব-মাহি’, *সমকাল*, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪।

বর্মন, তপতী ও ফিরদাউস, ইমরান ২০০৯, *বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

বাগচী, তপন ২০১১, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর : লোকজীবনের উপস্থাপনা*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

বাগচী, তপন ২০০৭, *বাংলাদেশের যাত্রাগান : জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বেঞ্জামিন, ওয়াল্টার ২০০৭, ‘যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে শিল্পকলা’; ভাষান্তর : জাকির হোসেন মজুমদার ও মোহাম্মদ আজম; *যোগাযোগ*, সংখ্যা ৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বিশ্বাস, উৎপল ২০০১, ‘বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যা’, *সংস্কৃতি*, বর্ষ ২৮, পঞ্চম সংখ্যা, ঢাকা।

ভ
ভট্টাচার্য, ড. শাশ্বত ও রহমান, শাহীন ২০১১, ‘বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন’, *কমরেড*, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ঢাকা।)

‘ভারতীয় ছবির প্রদর্শন বন্ধে একতা পরিষদ গঠিত’, *প্রথম আলো*, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১১।

‘ভারতীয় ছবি প্রদর্শন : প্রযোজক ও প্রদর্শক সমিতি মুখোমুখি’, *প্রথম আলো*, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১।

‘ভিডিও পাইরেসির অভিযোগে ১৩ জন আটক’, *প্রথম আলো*, ১০ এপ্রিল ২০১১।

ম
মজহার, ফরহাদ ২০১১, ‘শোকার্ত পূর্ণিমায় খণ্ড চিন্তা ...’, https://arts.bdnews24.com/?p=3935; retrieved on: 15/11/2019

মজহার, ফরহাদ ২০০৮, ‘পাঠ : *বেদের মেয়ে জোস্না*’, https://arts.bdnews24.com/?p=1306; retrieved on: 18.01.2020

মকসুদ, সৈয়দ আবুল ১৯৮৬, ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র’, *চতুরঙ্গ*, কলকাতা।

মাসুদ, তারেক ২০১২, *চলচ্চিত্রযাত্রা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

মাসুদ, তারেক ২০০৬, ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : নির্মাণের সঙ্কট, সঙ্কটের নিরাময়’, *চলচ্চিত্রের সময়, সময়ের চলচ্চিত্র*, ঐতিহ্য, ঢাকা।

মাসুদ, ক্যাথরিন, ‘চলচ্চিত্রের চালচিত্র : বাংলাদেশ’, *প্রথম আলো*, ২৮ অক্টোবর ২০১১।

মামুন, শফিক আল, ‘যে কারণে সিনেমা নির্মাণ কমে যাচ্ছে’, *প্রথম আলো*, ১৬ নভেম্বর ২০১৭।

মামুন শফিক আল, 'আমদানি করা ছবি ব্যর্থ, *প্রথম আলো*, ১২ অক্টোবর ২০১৭।

মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ ১৯২৯, *ইতিহাস ও অভিব্যক্তি*, যাদবপুর জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গ্রন্থাবলী, ভারত।

মুহম্মদ, আনু ও খান, সেলিম ওমরাও ১৯৯১, 'অব্যাহত লুণ্ঠন ও পুঁজি পুঞ্জিভবনের বছর', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৪ জানুয়ারি, ঢাকা।

মুরশিদ, গোলাম ২০০৬, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা।

মুৎসুদ্দী, চিন্ময় ১৯৮৭, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সামাজিক অঙ্গীকার*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

মুৎসুদ্দী, চিন্ময় ও শাহেদ, ইমরুল ৪ জুন ১৯৮২, 'চলচ্চিত্রের নতুন কাঠামো', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা।

মুৎসুদ্দী, চিন্ময় ২০১৩, 'নতুন শতকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র', *বাংলাদেশের অন্য সিনেমা ১ম খণ্ড*, সম্পাদনা : সুমীল সাহা, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা।

মাজিদ, আলাউদ্দীন, 'চলচ্চিত্র হারিয়েছে যেসব গল্প ও চরিত্র', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১২ আগস্ট ২০১৮।

মাজিদ, আলাউদ্দীন, 'নকল সন্ত্রাসে নাকাল চলচ্চিত্র', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২১ অক্টোবর ২০১৫।

মাজিদ, আলাউদ্দীন, 'চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ সংকট', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৯ নভেম্বর ২০১৫।

মাজিদ, আলাউদ্দীন, 'ঢাকার সিনেমা হলের দৈন্যদশা', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৪ মে ২০১৭।

মাজিদ, আলাউদ্দীন, 'নকল সন্ত্রাসে ফের নাকাল ঢাকাই ছবি', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

মাজিদ, আলাউদ্দীন, 'যৌথ প্রযোজনার নামে যৌথ প্রতারণা', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১১ নভেম্বর ২০১৫।

মাজিদ, আলাউদ্দীন, 'পাইরেসি সন্ত্রাস চলছেই', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৪ অক্টোবর ২০১৫।

মাজিদ, আলাউদ্দীন, 'কাটছে না বাণিজ্যিক ছবির দুর্দিন', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৭ অক্টোবর ২০১৫।

মাহমুদ, জাহিদ হাসান ১৯৯২, 'ষাট দশকের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র', *মন্তাজ*, সংখ্যা ৪, ঋত্বিক চলচ্চিত্র সংসদ, ঢাকা।

মাযহার, আহমাদ ২০০৮, *বাঙালির সিনেমা*, অনন্যা, ঢাকা।

ম্যাগানা, আলেজান্দ্রা রামিরেজ ১৪১০, 'জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্পসমূহে বিশ্বায়নের প্রভাব', *দৃশ্যরূপ*, মাহমুদুল হোসেন (সম্পা), অনুবাদ : এম হোসেন, মানজারে হাসীন, ঢাকা।

'মেহেরজান বিতর্ক', *কালের কণ্ঠ*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

মো. জাহাঙ্গীর ২০১৫, 'গরিব-দুখিরা এখনকার এই বই দেখে না, এই বই তারা আগে দেখেছে', *ম্যাজিক লণ্ঠন*, সংখ্যা ৯, বর্ষ ৫, জুলাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মোমেন, আবুল, 'চলচ্চিত্রশিল্প : পূর্ণ সংরক্ষণ নাকি সুস্থ প্রতিযোগিতা', *প্রথম আলো*, ২২ মে ২০১০।

মোকাম্মেল, তানভীর ১৯৮০, 'সেন্সর প্রথা এবং চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন', *ক্যামেরা যখন রাইফেল*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ, ঢাকা।

মোকাম্মেল, তানভীর, 'দুর্গত সিনেমার পরিত্রাণ কোন পথে', *প্রথম আলো*, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

মোস্তফা, কল্লোল ২০১৫, "'রানা প্লাজা' চলচ্চিত্রের সেন্সর কাহিনী", *সর্বজনকথা*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নভেম্বর, ঢাকা।

মৈত্রী, সাগর, 'সিনেমা পাইরেসি হয় কোথা থেকে?', *প্রথম আলো*, ১২ জানুয়ারি ২০১২।

যুবায়ের, আবদুল্লাহ্-আল ২০১১, 'সংকটে এফডিসি সংকটে বাংলা চলচ্চিত্র', *ম্যাজিক লণ্ঠন*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

র

রহমান, মুহম্মদ হাবিবুর ২০১৩, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১–২০১১*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

রহমান, খান ফেরদৌসর ২০১৬, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বাণিজ্যিক স্বরূপ অনুসন্ধান*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

রহমান, মাহবুব উর, 'প্রথম দিকে আমার পাঁচটি সিনেমা হল দিয়ে শুরু করার চিন্তা ছিল', *কালের কণ্ঠ*-এর বিশেষ ক্রোড়পত্র *বাতিঘর*, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১।

রহমান, এ এস এম আতীকুর ও শওকতুজ্জামান, সৈয়দ ২০০৪, *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

রাঙা, এম এ মোমিন ২০১৬, 'ফিল্মপাড়ায় যারা একমসময় লেবার ছিলো তারা আজ প্রযোজক, তারা কী সিনেমা বানাবে!', *ম্যাজিক লণ্ঠন*, সংখ্যা ১১, বর্ষ ৬, জুলাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রনি, দাউদ হোসাইন, 'নকলেই মূলমন্ত্র', *কালের কণ্ঠ*, ২ ডিসেম্বর ২০১০।

রহিম, এনায়েতুর ২০০৭, 'মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব'; *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১ : প্রথম খণ্ড রাজনৈতিক ইতিহাস*; সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.); বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

রায়, সত্যজিৎ ২০০২, *বিষয় চলচ্চিত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

রায়, সত্যজিৎ ১৯৮১, পুনের সমাবর্তনে—সত্যজিৎ রায়, *চলচ্চিত্রপত্র*, ঢাকা।

রায়হান, অনল ১৯৯১, সেন্সর বোর্ডের সামনে বিক্ষোভ, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, বর্ষ ২০, সংখ্যা ২৯, নভেম্বর. ঢাকা।

রাজু, জাকির হোসেন ২০০২, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস : একটি পুনর্পঠন'; *গণমাধ্যম ও জন সমাজ*; গীতি আর নাসরীন ও অন্যান্য (সম্পা.); শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।

রাজু, জাকির হোসেন ২০১৩, 'বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সিনেমা : জঁরা ও জাতীয়তার বন্ধনে', *যোগাযোগ*, সংখ্যা ১১, ডিসেম্বর ২০১৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

রাজু, জাকির হোসেন ১৯৯০, *চলচ্চিত্রের চালচিত্র*, চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি, ঢাকা।

রাজু, জাকির হোসেন ১৪১০, "'জাতি' প্রশ্নের আলোকে জাতীয় চলচ্চিত্রের ধারণা", *দৃশ্যরূপ*, মাহমুদুল হোসেন (সম্পা), অনুবাদ : সৈয়দ হাদীউজ্জামান; মানজারে হাসীন, ঢাকা।

রায়, রীপা ২০১৭, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে পোশাক ও রূপসজ্জা : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

রীয়াজ, আলী ২০১৭, 'বাংলাদেশের রাজনীতি, বিকাশমান মধ্যবিত্ত এবং কয়েকটি প্রশ্ন', *প্রতিচিন্তা*, সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ঢাকা।

রুমন, শাহাদৎ ২০১৫, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গান', *বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, বর্ষ ৮. সংখ্যা ৯, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

রোবের্জ, গাস্তঁ ১৯৮৪, *নতুন সিনেমার সন্ধানে*, সুস্মিতা ভট্টাচার্য (অনু.), বাণীশিল্প, কলকাতা।

রোবের্জ, গাঁস্ত ২০০৫, 'জনপ্রিয় সিনেমার আলোকে শোলে', *চলচ্চিত্র সমালোচনা ১৫*, অজয় সরকার (সম্পা.), বাণীশিল্প, কলকাতা।

রোবের্জ, গাস্তঁ ২০০৪, সংযোগ সিনেমা উন্নয়ন, অনুবাদ : কৃষ্ণপদ শাণ্ডিল্য, বাণীশিল্প, কলকাতা।

ল

লাবলু, আসাদ ২০১৫, ‘হারায়ে তাহারে খুঁজিয়া ফিরি, সালমান শাহ : ভাটির আগে উজানের শেষ ঢেউ’, *ম্যাজিক লণ্ঠন*, সংখ্যা ৮, বর্ষ ৪, জানুয়ারি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

লেভি-স্ত্রস, ক্লদ ২০০৭ (১৯৭৭), *মিথ এন্ড মিনিং*, প্রিসিলা রাজ (অনু.), বাঙলায়ন, ঢাকা।

শ

‘শাকিব-অপু নেই, এফডিসিও বন্ধ!’ *কালের কণ্ঠ*, ১১ এপ্রিল ২০১১।

‘শাকিবের জন্য আসছে নতুন নিয়ম’ *সমকাল*, ২১ আগস্ট ২০১১।

‘শাকিবের ইচ্ছাতেই সব নয়’ ২০১৩, *কালের কণ্ঠ*, ২০ মার্চ।

আকন্দ, শাওন ২০১৭, *বাংলাদেশের সিনেমার ব্যানার পেইন্টিং :বিলুপ্ত-প্রায় শিল্পশৈলী*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

শুভ, শাতিল সিরাজ ১৪১৬, ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র দর্শক : রুচির বিচারে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সমান’, *মাধ্যম*, ইন্সটিটিউট অব মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন স্টাডিজ, ঢাকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

শুভ, শাতিল সিরাজ ও মাহ্মুদ, শামীম আল ২০০৬, “চলচ্চিত্র নেহায়েতই ‘সংস্কৃতি-ইন্ডাস্ট্রি’র উৎপাদ : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ”, *চলচ্চিত্রের সময় সময়ের চলচ্চিত্র*, ফাহমিদুল হক ও শাখাওয়াত মুন (সম্পা.), ঐতিহ্য, ঢাকা।

শিশির, শিহাবউদ্দিন, ‘যৌথ প্রযোজনার ছবি নিয়ে সংশয়’, *সমকাল* এর বৃহস্পতিবারের বিনোদন ক্রোড়পত্র *নন্দন*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

স

সমকাল ৩ জুলাই ২০১১, ‘চলচ্চিত্র শিল্পের ঘোরতর দুর্দিন’।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৯৭৯, ৮ম বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ঢাকা।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৯৭৪, ৩য় বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ঢাকা।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৯৭৩, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৫ মে, ঢাকা।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২১ জুলাই ১৯৭৬, ঢাকা।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৯৭৯, ৮ম বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ঢাকা।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা বর্ষপত্র, ১৯৮৫, ঢাকা।

সাপ্তাহিক চিত্রালী ১৩ এপ্রিল ১৯৯০, ঢাকা।

সাপ্তাহিক চিত্রালী প্রতিবেদন, ১৯ জানুয়ারি ১৯৬২, ঢাকা।

সাপ্তাহিক চিত্রালী প্রতিবেদন, ২ আগস্ট ১৯৬৩, ঢাকা।

সাপ্তাহিক চিত্রালী প্রতিবেদন, ৯ আগস্ট ১৯৬৪, ঢাকা।

সাপ্তাহিক পূর্বাণী, ২১ অক্টোবর ১৯৮২, ঢাকা।

সাপ্তাহিক চিত্রালী প্রতিবেদন, ২৩ অক্টোবর ১৯৮১, ঢাকা।

সামাদ, আবদুস ১৯৭৪, ‘চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আমার পদ্ধতিগত শিক্ষাই প্রধান ভূমিকা পালন করবে’, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা ২৬।

সেন, তিলোত্তমা ২০১৫, ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গান : সময়ের প্রেক্ষিতে সমকালীন বাস্তবতা’, *বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৯, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

সেন, তিলোত্তমা ২০১৭, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে লোকসংগীত, *বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, বর্ষ ১০, সংখ্যা ১৩, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

‘সিনেমা তাহলে চলবে কোথায়’, *প্রথম আলো* ৩ জানুয়ারি ২০২০।

হ

হক, ফাহমিদুল ২০১৫, ‘বাংলাদেশে চলচ্চিত্র গবেষণা : একটি পর্যালোচনা’, *বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, ঢাকা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ২০১৫, বর্ষ ১, সংখ্যা ১।

হক, ফাহমিদুল ২০০৬, “বাংলাদেশের এইসব চলচ্চিত্র : ‘বিকল্প’ নাকি ‘স্বাধীন’”, *চলচ্চিত্রের সময় সময়ের চলচ্চিত্র*, ফাহমিদুল হক ও শাখাওয়াত মুন (সম্পা.), ঐতিহ্য, ঢাকা।

হক, ফাহমিদুল ২০১৩, *চলচ্চিত্র সমালোচনা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হক, ফাহমিদুল, ‘বিনির্মাণের বিপত্তি ও জাতীয়তাবাদী আবেগ’, *প্রথম আলো*, ৩০ জানুয়ারি ২০১১।

হক, মফিদুল ১৯৮৯, ‘একুশে ফেব্রুয়ারী ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র’; *ইন্টারকাট*, চট্টগ্রাম।

হক, মফিদুল ১৯৮২, ‘সাংস্কৃতিক পরনির্ভরতা, সংগীত সংস্কৃতি’, *দ্বিতীয় জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মেলন সংখ্যা*, ঢাকা।

হকি, হকিকত জামান ও আবদুল্লাহ, মঈন, ‘চলচ্চিত্র শিল্পের ঘোরতর দুর্দিন’, *সমকাল*, ৩ জুলাই ২০১১।

হালদার, শ্রাবণী ২০১০, ‘যৌথ প্রযোজনার যত ছবি’, *কালের কণ্ঠ* এর বৃহস্পতিবারের বিনোদন ক্রোড়পত্র *রঙের মেলা*, ৭ অক্টোবর।

হায়াৎ, অনুপম ১৯৭৯, ‘তস্কর ব্যবসায়ীর কবলে ছবির দর্শক’, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ বর্ষ, সংখ্যা ২০।

হায়াৎ, অনুপম ১৯৮৭, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।

হায়াৎ, অনুপম ২০০৪, ‘মুখবন্ধ’, *চলচ্চিত্রবিদ্যা*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা।

হায়দার, কাজী মামুন ২০১৩, ‘পটের গান : চলচ্চিত্র উদ্ভব-ইতিহাসের নিম্নবর্গীয় পাঠ’, *ম্যাজিক লণ্ঠন*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

হায়দার, কাজী মামুন ২০১৫, ‘বৃত্তাবদ্ধ বৃত্তের বাইরে : বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের ফাঁদে চলচ্চিত্র গুমরে কাঁদে’, *ম্যাজিক লণ্ঠন*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ৯, বর্ষ ৫।

হাসানউজ্জামান ১৯৯১, *বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

হাসান, রাজিবুল ২০১৫, ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : গোলটেবিল আলোচনা’, *বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

হাসান, মো. রাজিবুল ২০১৪, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

হোসেন, মাহমুদুল ২০১০, *সিনেমা*, মাহমুদুল হোসেন, ঢাকা।

হোসেন, মোহাম্মদ মোশাররফ ও সুলতানা, তানিয়া ২০১৬, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পোস্টারের বিবর্তন : চিত্রকলা থেকে ডিজিটাল পুনরুৎপাদনের স্বরূপ বিশ্লেষণ*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

হোসেন, বশির ১৯৭৪, ‘পদ্ধতিগত শিক্ষা থাকলে এখন যা করছি সেগুলো দশ বছর আগেই করতে পারতম’, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা ২৬, ঢাকা।

হোসেন, ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও ম. হামিদ ২০১৫, ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পথপরিক্রমা’, *বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ঢাকা।

হোসেন, আমজাদ, ‘তবুও আলোর হাতছানি’, *সমকাল*, ২২ জুন ২০১১।

চলচ্চিত্র

সন্ধে নামার আগে ২০১৫, ঋতব্রত ভট্টাচার্য, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

A

Atkinson, Paul & Coffey Amanda 1998, `Analysis Documentry Realities', *Qualitative Research: Theory, Method and Practice*, SAGE Publications, New Delhi.

Adorno, Theodor & Max Horkheimer 1972, *The Dialectic of Enlightenment*, English edition: Herder & Herder, New York.

B

BTV Profile 1989, Silver Jubilee Publication, Dhaka.

Babb, L. 1981, `Glancing: Visual Interaction in Hinduism'; *Journal of Anthropological Research* 37(4).

Barthes, Roland 1977, *Image, Music, Text*, trans. Stephen Heath, Fontana Paperbacks, London.

Barthes, Roland 1996, `The Photographic Message', *The Communication Theory Reader*, Paul Cobley (ed.), Routledge, London, New York.

Barthes, Roland and Duisit, Lionel 1975, *An Introduction to the Structural Analysis of Narrative*, The Johns Hopkins University Press. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/468419. Accessed: 18/08/2008 13:44

Bhowmick, Bikash Chandra (2009); Women on Screen : Representing women by women in Bangladesh; Bangladesh Film Archive, Dhaka.

C

Cassar, Dr. Carmel n.d.,`Why Anthropological Hitory?', https://www.um.edu.mt/__data/assets/ pdf_file/0007/161863/annualreport2004d.pdf, retrieved on : 16/11/2015 18:30

Camara Nacional de la Industria Cinematografica, Encuesta sobre Preferencias del Publico, Corvarrubias y Asociados Octubre, 1998.

Censorship and Cinematography Manual 1977, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Ministry of Information.

Chakravarty, Sumita S. (1993); *National Identity in Indian Popular Cinema, 1947-1987*, University of Texas Press.

Clifford, James & Marcus, George E. (eds) 1986, *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*, Oxford University Press, London.

Czarniawska, Barbara 2004, *Narratives in Social Science Research*, SAGE Publications Ltd, London.

D

Dino, Felluga 2011, `Terms Used by Narratology and Film Theory', *Introductory Guide to Critical Theory.*Purdue Univarsity.

Dani, Ahmed Hasan, Dacca—A Record of Its Changing Fortunes, Dacca.

Dodona Research, `Cinema Going Europe', 1998.

http://www.purdue.edu/guidetotheory/narratology/terms. Retrieved on. 10/01/2012 10:20

E

Eight Five year plan, 1992-1997, Volume 2, Govt. of India, p274.

F

Frank, A. W. n.d., `Practicing Dialogical Narrative Analysis'.

http://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/41823_2.pdf, retrieved on 26/03/2016 16:50

G

Gray, Gordon 2010, *Cinema: A Visual Anthropology*, Berg, New York.

Gupta, Akhil & Ferguson, James 1997, ``Dicipline and Practice: `The Field' as Site, Method and Location in Anthropology'', *Anthropological Locations, Boundaries and Grounds of a Field Science*, Akhil Gupta& James Ferguson (eds), University of California Press, Berkeley, Los Angeles and London.

H

Habermas, Jurgen 1991, `The public sphere', *Rethinking popular culture: Contemporary perspectives in cultural studies*, Mukerji, C & Schudson, M (ed.), University of California apress, Berkeley/Los Angeles .

Hall, Struart 1997, `The Work of Representation', *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, Struart Hall (ed.), SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.

Hall, Struart 1992, `The West and the Rest', *Formation of Modernity*, Struart Hall & B. Gieben (ed.), Polity Press/The Open University, Cambridge.

Haq, Fahmidul 2010, `Representing Identity in Cinema: The Case Of Selected Independent Films of Bangladesh', Unpublished PhD dissertation, Penang, University of Sains Malaysia.

Hayward, Susan 2000, *Cinema Studies: The Key Concepts*, Routledge, London.

Heinen, Sandra & Sommer, Roy 2009, `Introduction :Narratology and Interdiciplinarity', *Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research*, Sandra Heinen & Roy Sommer (ed.) Walter de Gruyter, Berlin and New York.

Hoek, Lotte 2014, *Cut-pieces : Celluloid Obscenity and Popular Cinema in Bangladesh*, Colombia University Press, New York.

Horstkotte, Silke 2009, `Seeing or Speaking: Visual Narratology and Focalization, Literature to Film', *Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research*, Sandra Heinen & Roy Sommer (ed.) Walter de Gruyter, Berlin and New York.

Hovland, Carl I. et al 1949; *Experiments on Mass Communication*; Princeton University Press, Princeton, N.J.

J

Jaikumar, P. 2006, *Cinema at the End of Empire: A Politics of Transition in Britan and India*, Dhuram, NC; Duke University Press.

K

Kabir, Alamgir 1979; *Film in Bangladesh*; Bangla Academy, Dhaka.

Kabir, Alamgir 1969, *The Cinema in Pakistan*; Shandhani Publications, Dhaka.

Kabir, Ananya Jahanara 2003; http://dx.doi.org/10.1080/1474668032000132724; retrieved on: 16.09.2013, At: 14:53)

Kracauer, Siegfried 1965, *Theory of Film*, Oxford University Press, London.

L

Lent, J. A. 1990, *The Asian Film Industry*, Christopher Helm, London.

M

Manning, Petter K. & Cullun-Swan,Besty 1994, `Narrative, Content, and Semiotic Analysis', *Handbook of Qualitative Research*, Norman K. Dezin & Yvonna S. Lincoln (eds), SAGE Publications,Thousand Oaks, London, New Delhi.

Marlial law Regulation 7, Published in all National Dailies on 26th july, 1982.

MWENGENMEIR, `17 HABERMAS' PUBLIC SPHERE, https://opentextbc.ca/mediastudies101/chapter/habermas-public-sphere/, retrieved on: 21.03.2020, 10.57AM

N

Naficy, H (2001); An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking, NJ: Princeton University Press, Princeton.

P

Pettersson, Bo 2009, `Narratology and Hermeneutics: Forging the Missing Link', *Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research*, Sandra Heinen & Roy Sommer (ed.) Walter de Gruyter, Berlin and New York.

Powdermaker, H. 2002, `Hollywood and the USA', K. Askew & R. Wilk (eds), *The Anthropology of Media: A Reader*, Blackwell Publishing, Oxford.

Propp, Vladimir 1958, *Morphology of the Folktale*, Publications of the American Folklore Society.

R

Raju, Zakir Hossain 2015, *Bangladesh Cinema and National Identity: In Search of The Modern?*, Routledge, London.

S

Said, Edward 1977, *Orientalism*, London, Penguin.

Sen, K & Hill, D 2007, *Media, Culture and Politics in Indonesia*, Equinox Publishing, Jakarta.

Statistical Disest of Bangladesh 1973, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, No.9

Vasudevan, Ravi S. 2001, `An Imperfect Public: Cinema and citizenship in the `third world', *Sarai Reader 2001: The Public Domain*.

T

Television Research Study, No 1 1982, National Broadcasting Academy (Present, National Institute of Mass Communication), Dhaka.

V

Vanny, Arthur de and Walls David 1996, `Bose-Einstein Dynamics and Adaptive Contracting in the Motion Picture Industry." *The Economic Journal*, November.

Website

http://www.mediapage24.com/others/cinema_history_details/15; retrieved on 25.11. 2013 18:40

বন্ধ হয়ে গেছে ৪০০ প্রেক্ষাগৃহ
দুঃসময় কাটছে না সিনেমার এক্সট্রা শিল্পীদের
পাইরেসি সন্ত্রাস
রাজশাহীর সিনেমা হল এখন মার্কেট
নকল সন্ত্রাসে নাকাল চলচ্চিত্র
১২ প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় চলচ্চিত্র
চলচ্চিত্রের আরেকটি দুর্যোগের বছর
মুক্তি-৬২, ব্যবসা সফল-২, গড় ব্যবসা-৮
একতা পরিষদ গঠিত

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট ১

আখ্যানের তথ্য-উপাত্তের থিমেটিং ইনডেক্সিং ও প্রাবল্যের ক্রম

ক্রম	বিষয়বস্তু	প্রাবল্য
১.	চলচ্চিত্রের কাহিনি	৩১৫
২.	টিভি ও স্মার্ট মোবাইল ফোনসেট	২৫১
৩.	কাটপিস	১৮৬
৪.	শাকিব খান	১৫৪
৫.	দর্শক	১৪৯
৬.	নারী দর্শক	১৩৬
৭.	প্রেক্ষাগৃহ	১১১
৮.	প্রযোজক	১১০
৯.	প্রেক্ষাগৃহ ব্যবসা	১০৬
১০.	নির্মাতা	১০৪
১১.	অভিনয়	১০৩
১২.	বন্ধ প্রেক্ষাগৃহ	৯৪
১৩.	পাইরেসি	৯২
১৪.	নায়ক মান্না	৯১
১৫.	চলচ্চিত্রের গান	৮৮
১৬.	নায়ক-নায়িকা	৮১
১৭.	চলচ্চিত্র ব্যবসা	৭১
১৮.	প্রেক্ষাগৃহের অসহায় কর্মচারী	৭১
১৯.	ভালো চলচ্চিত্র এবং দর্শক রুচি	৬৯
২০.	সামাজিক দুর্নাম	৬৬
২১.	যৌথ প্রযোজনা	৬৩
২২.	নায়ক সালমান শাহ	৫৭
২৩.	জাজ মাল্টিমিডিয়া	৫৫
২৪.	প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ	৫৫
২৫.	ভারতীয় চলচ্চিত্র	৫২
২৬.	প্রেক্ষাগৃহের মালিক	৫১
২৭.	ডিজিটাল প্রযুক্তি	৫০
২৮.	বিনোদন মাধ্যম	৪৪
২৯.	সামাজিক মর্যাদা	৪৪
৩০.	প্রচার-প্রচারণা	৪৪
৩১.	খারাপ মানের চলচ্চিত্র	৪০
৩২.	ভালো চলচ্চিত্র	৩৯
৩৩.	প্রেক্ষাগৃহের কর্মচারী	৩৮
৩৪.	চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থা	৩৭
৩৫.	চলচ্চিত্র ব্যবসা ৯০'র দশক	৩৭

ক্রম	বিষয়বস্তু	প্রাবল্য
৩৬.	চলচ্চিত্র ব্যবসা ৮০'র দশক	৩৬
৩৭.	চলচ্চিত্র নির্মাণ	৩৫
৩৮.	সরকার ও চলচ্চিত্র	৩২
৩৯.	জুটি প্রথা	৩১
৪০.	চলচ্চিত্র আমদানি	৩০
৪১.	নতুন নায়ক-নায়িকা	২৯
৪২.	সিনেপ্লেক্স	২৬
৪৩.	সামাজিক চলচ্চিত্র	২৩
৪৪.	প্রেক্ষাগৃহে বোমা হামলা	২৩
৪৫.	ভি সি আর	২১
৪৬.	ভারতীয় সোপ অপেরা	২১
৪৭.	ট্যাক্স	২১
৪৮.	প্রজেকশন প্রযুক্তি	২১
৪৯.	প্রেক্ষাগৃহের ব্যবসা ২০০০	১৯
৫০.	চলচ্চিত্র এবং বাস্তবতা	১৯
৫১.	শিক্ষা ও চলচ্চিত্র	১৮
৫২.	নকল চলচ্চিত্র	১৮
৫৩.	চলচ্চিত্রের ধরন	১৭
৫৪.	স্ক্রিপ্টরাইটার নাই	১৭
৫৫.	ফিল্ম ইন্সটিটিউট	১৬
৫৬.	প্রচার-প্রচারণা এবং দর্শক	১৫
৫৭.	প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র দেখা	১৫
৫৮.	ডিপজল	১৫
৫৯.	আমাদের চলচ্চিত্র	১৫
৬০.	চলচ্চিত্র এবং টিভি নাটক	১৫
৬১.	দর্শকের হাতে সময় নেই	১৪
৬২.	চলচ্চিত্র ও ধর্ম	১৪
৬৩.	শ্রেণিভেদে দর্শক	১৪
৬৪.	চলচ্চিত্রে কালো টাকা বিনিয়োগ	১৩
৬৫.	চলচ্চিত্র ব্যবসা ৭০'র দশক	১২
৬৬.	ডিপজল এবং কাটপিস	১২
৬৭.	কলাকুশলী নির্বাচন	১২
৬৮.	অ্যানালগ প্রযুক্তি	১২
৬৯.	চলচ্চিত্র ব্যবসা ২০১০	১১
৭০.	ভারতীয় টিভি চ্যানেল	১০
৭১.	যৌন নির্যাতন ও নায়িকা	১০
৭২.	চলচ্চিত্র বিপণন	১০
৭৩.	আইটেম সঙ্	৯
৭৪.	সেন্সর	৯

ক্রম	বিষয়বস্তু	প্রাবল্য
৭৫.	অনন্ত জলিল	৯
৭৬.	চলচ্চিত্রের অভাব	৯
৭৭.	প্রেমনির্ভর চলচ্চিত্র	৯
৭৮.	প্রেক্ষাগৃহের নিরাপত্তা	৮
৭৯.	পোশাক পরিকল্পনা	৮
৮০.	চলচ্চিত্র ব্যবসা ৬০’র দশক	৭
৮১.	হিরোইজম	৭
৮২.	শিল্পনির্দেশনা	৭
৮৩.	ভারতীয় নায়ক-নায়িকা	৭
৮৪.	একমুখী চলচ্চিত্র বিপণন	৭
৮৫.	অনেক নায়ক	৭
৮৬.	টিকিটের উচ্চ মূল্য	৬
৮৭.	প্রেক্ষাগৃহে যাওয়ার অভ্যাস	৫
৮৮.	নায়িকাদের স্বল্পমেয়াদী পেশাজীবন	৫
৮৯.	মার্শাল আর্ট নির্ভর চলচ্চিত্র	৫
৯০.	নায়ক রুবেল	৫
৯১.	মারদাঙ্গা চলচ্চিত্র	৫
৯২.	ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্র	৫
৯৩.	সরকারী অনুদান	৫
৯৪.	নতুন প্রজন্ম ও চলচ্চিত্র	৫
৯৫.	চলচ্চিত্রের বিপণন পদ্ধতি	৫
৯৬.	দর্শকও তাচ্ছিল্যের স্বীকার	৫
৯৭.	চলচ্চিত্র অ্যাওয়ার্ড	৪
৯৮.	চলচ্চিত্র ও ঐতিহ্য	৪
৯৯.	যাত্রা ও চলচ্চিত্র	৪
১০০.	এফ ডি সি’র ভূমিকা	৪
১০১.	পুরনো চলচ্চিত্র নতুন করে নির্মাণ	৪
১০২.	দেখানোর মতো চলচ্চিত্র নেই	৪
১০৩.	প্রেক্ষাগৃহের নিবন্ধন	৪
১০৪.	জাতীয় পতাকা এবং দর্শক	৪
১০৫.	কাটপিস এবং বর্তমানের দর্শক	৪
১০৬.	বিশেষ সময়ে ব্যবসা	৪
১০৭.	নায়ক রিয়াজ	৩
১০৮.	চলচ্চিত্রে উত্তরাধিকারের অভাব	৩
১০৯.	পর্নোগ্রাফি	৩
১১০.	প্রেক্ষাগৃহকে ঘিরে ব্যবসা	৩
১১১.	গবেষণা এবং চলচ্চিত্র	৩
১১২.	প্রচার-প্রচারণা এবং টিভি	৩
১১৩.	শ্যুটিংয়ের স্থান নির্ধারণ	৩

ক্রম	বিষয়বস্তু	প্রাবল্য
১১৪.	চলচ্চিত্র ব্যবসায় প্রতিযোগিতা না থাকা	৩
১১৫.	প্রেক্ষাগৃহে একই চলচ্চিত্র কয়েকবার আনা	২
১১৬.	চলচ্চিত্র ব্যবসা ৫০'র দশক	২
১১৭.	পারিবারিক পরম্পরা	২
১১৮.	শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্র	২
১১৯.	নায়িকা নাই	২
১২০.	নায়কের সঙ্কট	২
১২১.	বেহিসাবি প্রেক্ষাগৃহ	২
১২২.	বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র	২
১২৩.	ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র	২
১২৪.	খেলা এবং চলচ্চিত্র ব্যবসা	২
১২৫.	সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহ	২
১২৬.	স্বল্প বিনিয়োগ ও ব্যবসা	২
১২৭.	ভালো চলচ্চিত্র কিন্তু খারাপ ব্যবসা	২
১২৮	টেকনিশিয়ানের অভাব	২
১২৯.	অপেশাদার অভিনয়শিল্পী	২
১৩০.	প্রেক্ষাগৃহের বাইরে চলচ্চিত্র দেখা	১
১৩১.	নায়ক-নায়িকা এবং দর্শক	১
১৩২.	প্রেক্ষাগৃহ-মালিক যখন প্রযোজক	১
১৩৩.	উর্দু চলচ্চিত্র	১
১৩৪.	বুকিং এজেন্ট	১
১৩৫.	চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য	১
১৩৬.	নতুন প্রেক্ষাগৃহ	১
১৩৭.	চলচ্চিত্রের অভূতপূর্ব ক্ষমতা	১
১৩৮.	কম বাজেটে চলচ্চিত্র নির্মাণ	১
১৩৯.	চলচ্চিত্রের সংলাপ	১
১৪০.	সিনেমাটোগ্রাফার	১
১৪১.	ক্ষমতা প্রয়োগ ও চলচ্চিত্র	১
১৪২.	ডিস লাইনের ব্যবসা	১
১৪৩.	বিশ্ব মানের চলচ্চিত্র	১
১৪৪.	চলচ্চিত্র ও প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে প্রচার	১
১৪৫.	শাবানা এবং নারী দর্শক	১
১৪৬.	দর্শকের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে	১
১৪৭.	ইন্ডাস্টিতে পারস্পারিক আস্থার অভাব	১
১৪৮.	অনেক নায়ক-নায়িকা	১
১৪৯.	নায়ক-নায়িকা থেকে চরিত্রাভিনেতা	১
১৫০.	অভিনয়শিল্পীর মান	১
১৫১.	অভিনয়শিল্পীকে নিজ প্রতিষ্ঠানের আওতায় রাখা	১
১৫২.	আকর্ষণের কেন্দ্রে নায়িকা	১

ক্রম	বিষয়বস্তু	প্রাবল্য
১৫৩.	দর্শক ও জাতীয় পতাকা	১
১৫৪.	প্রেক্ষাগৃহে যৌন হয়রানি	১
১৫৫.	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী	১
১৫৬.	ধারাবাহিকভাবে ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ	১
১৫৭.	কাটপিসের বর্তমান অবস্থা	১
১৫৮.	অভিনয়শিল্পীদের পোশাক	১
১৫৯.	চলচ্চিত্র ব্যবসা এবং রাজস্ব	১
১৬০.	নকল নাচ	১
১৬১.	নায়ক যখন প্রযোজক	১
১৬২.	রাজনৈতিক অবস্থা ও চলচ্চিত্র ব্যবসা	১
১৬২.	ভারত-বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা	১
১৬৩.	বিশ্ব মানের চলচ্চিত্র	১
১৬৪.	গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের সংযোগ এবং প্রেক্ষাগৃহ	১
১৬৫.	সিক্যুয়েল চলচ্চিত্র নির্মাণ	১
১৬৬.	নায়িকা নির্বাচন	১
১৬৭.	কালোবাজারী ও টিকিট বিক্রি	১
১৬৮.	মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র	১

নির্ঘণ্ট ২

বিষয় ধরে থিমের বিন্যাস

চলচ্চিত্র নির্মাণ	প্রাবল্য
শৈল্পিক নির্মাণ	
চলচ্চিত্রের কাহিনি	৩১৫
নির্মাতা	১০৪
অভিনয়	১০৩
চলচ্চিত্রের গান	৮৮
চলচ্চিত্রের সংলাপ	১
স্ক্রিপ্টরাইটার নাই	১৭
নকল চলচ্চিত্র	১৮
আইটেম সঙ্	৯
নকল নাচ	১
মোস্তফা সরয়ার ফারুকী	১
কারিগরি নির্মাণ	
কলাকুশলীর অভাব	১২
টেকিনিশিয়ানের অভাব	২
পোশাক পরিকল্পনা	৮
সিকুয়্যাল চলচ্চিত্র নির্মাণ	১
শিল্পনির্দেশনা	৭
অভিনয়শিল্পীদের পোশাক	১
সিনেমাটোগ্রাফার	১
বিদেশে শ্যুটিংয়ের স্থান নির্ধারণ	৩
চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য	১
প্যারালাল মিডিয়া	
টিভি ও স্মার্ট মোবাইল ফোনসেট	২৫১
ভারতীয় চলচ্চিত্র	৫২
যাত্রা ও চলচ্চিত্র	৪
চলচ্চিত্র ও টিভি নাটক	১৫
ভি সি আর	২১
ভারতীয় সোপ অপেরা	২১
ভারতীয় টিভি চ্যানেল	১০
প্রচার-প্রচারণা ও টিভি	৩
ডিস লাইনের ব্যবসা	১
প্রিন্ট মিডিয়া	
পত্রিকার বিজ্ঞাপন	
রেডিও অনুষ্ঠান	

অভিনয়শিল্পী	
অপেশাদার অভিনয়শিল্পী	২
অভিনয়শিল্পীর মান	১
নতুন নায়ক-নায়িকা	২৯
নায়ক-নায়িকা	৮১
জুটি প্রথা	৩১
ভারতীয় নায়ক-নায়িকা	৭
চলচ্চিত্রে উত্তরাধিকারের অভাব	৩
নায়ক-নায়িকা ও দর্শক	১
অভিনয়শিল্পীকে নিজ প্রতিষ্ঠানের আওতায় রাখা	১
নায়ক-নায়িকা থেকে চরিত্রাভিনেতা	১
নায়ক	
শাকিব খান	১৫৪
নায়ক মান্না	৯১
নায়ক সালমান শাহ	৫৭
ডিপজল	১৫
অনন্ত জলিল	৯
হিরোইজম	৭
নায়ক রুবেল	৫
নায়ক রিয়াজ	৩
নায়কের সঙ্কট	২
অনেক নায়ক	৭
নায়ক নয়, কেবল নায়িকা নাচতো কেনো	
নায়কের নাচা শুরু ও নায়ক জাভেদ	
নায়িকা	
যৌন নির্যাতন ও নায়িকা	১০
নায়িকাদের স্বল্পমেয়াদী পেশাজীবন	৫
নায়িকা সঙ্কট	২
আকর্ষণের কেন্দ্রে নায়িকা	১
শাবানা ও নারী দর্শক	১
নায়িকা নির্বাচন	১
একসময় নায়িকার নাম দর্শক জানতো, এখন জানে না	
নায়িকার নাম নয়, তার দেহ জরুরি	
প্রেক্ষাগৃহ	
প্রেক্ষাগৃহ	১১১
প্রেক্ষাগৃহ ব্যবসা	১০৬
বন্ধ প্রেক্ষাগৃহ	৯৪
প্রেক্ষাগৃহের অসহায় কর্মচারী	৭১
প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্টদের সামাজিক দুর্নাম	৬৬

প্রেক্ষাগৃহ সংশ্লিষ্টদের সামাজিক মর্যাদা	৪৪
প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ	৫৫
প্রেক্ষাগৃহের মালিক	৫১
প্রেক্ষাগৃহের কর্মচারী	৩৮
সিনেপ্লেক্স	২৬
প্রেক্ষাগৃহে বোমা হামলা	২৩
প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র দেখা	১৫
চলচ্চিত্রের অভাব	৯
প্রেক্ষাগৃহের নিরাপত্তা	৮
প্রেক্ষাগৃহে যাওয়ার অভ্যাস	৫
দেখানোর মতো চলচ্চিত্র নেই	৪
প্রেক্ষাগৃহের নিবন্ধন	৪
জাতীয় পতাকা ও দর্শক	৪
প্রেক্ষাগৃহকে ঘিরে ব্যবসা	৩
প্রেক্ষাগৃহে একই চলচ্চিত্র কয়েকবার আনা	২
বেহিসাবি প্রেক্ষাগৃহ	২
সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেক্ষাগৃহ	২
প্রেক্ষাগৃহের বাইরে চলচ্চিত্র দেখা	১
নতুন প্রেক্ষাগৃহ	১
চলচ্চিত্র ও প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে প্রচার	১
প্রেক্ষাগৃহে যৌন হয়রানি	১
গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ ও প্রেক্ষাগৃহ	১
টিকিটের উচ্চমূল্য	৬
চলচ্চিত্র ব্যবসা	**প্রাবল্য**
বিনিয়োগ	
প্রযোজক	১১০
চলচ্চিত্র ব্যবসা	৭১
চলচ্চিত্রে কালো টাকা বিনিয়োগ	১৩
যৌথ প্রযোজনা	৬৩
জাজ মাল্টিমিডিয়া	৫৫
ডিপজল	১৫
অনন্ত জলিল	৯
স্বল্প বিনিয়োগ ও ব্যবসা	২
কম বাজেটে চলচ্চিত্র নির্মাণ	১
নায়ক যখন প্রযোজক	১
প্রেক্ষাগৃহের মালিক যখন প্রযোজক	১
মুনাফা	
খারাপ মানের চলচ্চিত্র	৪০
ভালো চলচ্চিত্র	৩৯

বিশেষ সময়ে ব্যবসা	৪
ভালো চলচ্চিত্র কিন্তু খারাপ ব্যবসা	২
ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র	২
চলচ্চিত্র ব্যবসায় প্রতিযোগিতা না থাকা	৩
রাজনৈতিক অবস্থা ও চলচ্চিত্র ব্যবসা	১
কালোবাজারি ও টিকিট বিক্রি	১
চলচ্চিত্র ব্যবসা এবং রাজস্ব	১
খেলা ও চলচ্চিত্র ব্যবসা	২
ধারাবাহিক ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ	১
পাইরেসি	
পাইরেসি	৯২
চলচ্চিত্র বিপণন	
চলচ্চিত্র বিপণন	১০
একমুখী চলচ্চিত্র বিপণন	৭
চলচ্চিত্রের বিপণন পদ্ধতি	৫
বুকিং এজেন্ট	১
প্রচার-প্রচারণা	
প্রচার-প্রচারণা	৪৪
প্রচার-প্রচারণা এবং দর্শক	১৫
সংবাদপত্রের বিনোদন পাতা	
বিনোদন নির্ভর ম্যাগাজিন	
সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন	
টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন ও বিশেষায়িত চ্যানেল	
রেডিও	
দর্শক	**প্রাবল্য**
দর্শক	১৪৯
নারী দর্শক	১৩৬
ভালো চলচ্চিত্র ও দর্শক রুচি	৬৯
দর্শকের হাতে সময় নেই	১৪
চলচ্চিত্র ও ধর্ম	১৪
শ্রেণিভেদে দর্শক	১৪
দর্শকও তাচ্ছিল্যের শিকার	৫
পারিবারিক পরম্পরা	২
দর্শকের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে	১
চলচ্চিত্রের আধেয়	**প্রাবল্য**
চলচ্চিত্র ও বাস্তবতা	১৯
চলচ্চিত্র ও শিক্ষা	১৮
চলচ্চিত্র ও ঐতিহ্য	৪
প্রযুক্তি	**প্রাবল্য**

ডিজিটাল প্রযুক্তি	৫০
প্রজেকশন প্রযুক্তি	২১
অ্যানালগ প্রযুক্তি	১২
কাটপিস	**প্রাবল্য**
কাটপিস	১৮৬
ডিপজল	১৫
কাটপিস এবং বর্তমানের দর্শক	৪
পর্নোগ্রাফি	৩
কাটপিসের বর্তমান অবস্থা	১
ডিপজল ও কাটপিস	১২
হংকংয়ের চলচ্চিত্র থেকে কাটপিস	
এক টিকিটে দুই ছবি	
চলচ্চিত্রে ভালোয়েন্সের বিক্রি শুরু	
চলচ্চিত্রের ধরন	**প্রাবল্য**
সামাজিক চলচ্চিত্র	২৩
চলচ্চিত্রের ধরন	১৭
আমাদের চলচ্চিত্র	১৫
মারদাঙ্গা চলচ্চিত্র	৫
ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্র	৫
পুরনো চলচ্চিত্র নতুন করে নির্মাণ	৪
প্রেম নির্ভর চলচ্চিত্র	৯
মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র	১
রাষ্ট্র ও চলচ্চিত্র	**প্রাবল্য**
সরকার ও চলচ্চিত্র	৩২
ট্যাক্স	২১
সেন্সর	৯
সরকারি অনুদান	৫
ক্ষমতা প্রয়োগ ও চলচ্চিত্র	১
বিদেশের প্রভাব	**প্রাবল্য**
চলচ্চিত্র আমদানি	৩০
ভারতীয় নায়ক-নায়িকা	৭
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র	২
উর্দু চলচ্চিত্র	১
বিশ্ব মানের চলচ্চিত্র	১
ভারত-বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা	১
চলচ্চিত্র শিক্ষা	**প্রাবল্য**
ফিল্ম ইন্সটিটিউট	১৬
নিমকো	
চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন	

বি এফ ডি সি	প্রাবল্য
এফ ডি সি'র ভূমিকা	৪
ইন্ডাস্ট্রিতে পারস্পারিক আস্থার অভাব	১
চলচ্চিত্র ও গবেষণা	**প্রাবল্য**
গবেষণা এবং চলচ্চিত্র	৩
চলচ্চিত্রের অভুতপূর্ব ক্ষমতা	১
শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্র	২
চলচ্চিত্রে পুরষ্কার	**প্রাবল্য**
চলচ্চিত্র অ্যাওয়ার্ড	৪
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরষ্কার	

নির্ঘণ্ট ৩

আখ্যানের তথ্য-উপাত্তে দর্শক স্মৃতিতে থাকা তারকা-কুশীলবদের প্রাবল্য

নম্বর	অভিনয়শিল্পীর নাম	প্রাবল্য
১.	শাবানা	৩৭
২.	রাজ্জাক	৩৪
৩.	আলমগীর	৩১
৪.	জসিম	৩১
৫.	মান্না	৩১
৬.	সালমান শাহ	২৫
৭.	আরেফীন শুভ	২১
৮.	মাহিয়া মাহী	১৫
৯.	ইলিয়াস কাঞ্চন	১৪
১০.	শাকিব খান	১২
১১.	ফারুক	১০
১২.	ববিতা	১০
১৩.	বাপ্পী চৌধুরী	১০
১৪.	রিয়াজ	৯
১৫.	রুবেল	৯
১৬.	ওয়াসিম	৮
১৭.	সোহেল রানা	
১৮.	উজ্জল	৭
১৯.	রাজীব	৫
২০.	কবরী	৫
২১.	আনোয়ার হোসেন	৫
২২.	জাফর ইকবাল	৫
২৩.	শাবনূর	৪
২৪.	সুচন্দা	৪
২৫.	সায়মন	৪
২৬.	আমিন খান	৪
২৭.	আজিম	৪
২৮.	ববি	৩
২৯.	ফারুক	৩
৩০.	সুজাতা	৩
৩১.	মিশা সওদাগর	৩
৩২.	রোজিনা	৩
৩৩.	অঞ্জু ঘোষ	২

নম্বর	অভিনয়শিল্পীর নাম	প্রাবল্য
৩৪.	বুলবুল আহমেদ	২
৩৫.	ফেরদৌস	২
৩৬.	বাপ্পারাজ	২
৩৭.	খলিল	২
৩৮.	ওয়াসিম	২
৩৯.	চঞ্চল	২
৪০.	ডিপজল	২
৪১.	অপু বিশ্বাস	২
৪২.	আলেকজান্ডার বো	২
৪৩.	অমিত হাসান	২
৪৪.	দিতি	২
৪৫.	সুচরিতা	২
৪৬.	জাভেদ	২
৪৭.	সাহারা	১
৪৮.	কামিনী কুশল	১
৪৯.	মতি	১
৫০.	অলিভিয়া	১
৫১.	দিলদার	১
৫২.	মতি	১
৫৩.	বুলবুল আহমেদ	১
৫৪.	খসরু	১
৫৫.	মারুফ	১
৫৬.	জিৎ	১
৫৭.	অঙ্কুশ	১
৫৮.	ফারিয়া	১
৫৯.	শাকিল খান	১
৬০.	জায়েদ খান	১
৬১.	চম্পা	১
৬২.	প্রবীর মিত্র	১
৬৩.	গোলাম মোস্তফা	১
৬৪.	মোস্তফা	১
৬৫.	সুভাষ দত্ত	১
৬৬.	শবনম	১
৬৭.	রহমান	১
৬৮.	আলী রাজ	১
৬৯.	মিজু আহমেদ	১
৭০.	টেলিসামাদ	১

নম্বর	অভিনয়শিল্পীর নাম	প্রাবল্য
৭১.	দিলদার	১
৭২.	হাসমত	১
৭৩.	নুসরাত ফারিয়া	১
৭৪.	শাহনাজ	১
৭৫.	মৌসুমী	১
৭৬.	শওকত আকবর	১
৭৭.	তিশা	১
৭৮.	তৌকীর	১

নির্ঘণ্ট ৪

এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

সারণী ৪.১ : সাংস্কৃতিক অঞ্চল ১ : রাজশাহী-নওগাঁ

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয় ও পেশা	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.১.১	১৮ জানুয়ারি ২০১৬ বিনোদন সিনেমা, পত্নিতলা, নওগাঁ	রাজীব	বিনোদন-এর কর্মচারী	২৯ মিনিট ২৫ সেকেন্ড
৪.১.২	১৯ জানুয়ারি ২০১৬ রংধনু, পত্নিতলা, নওগাঁ	বকুল হোসেন	কর্মচারী, রংধনু	১৭ মিনিট
৪.১.৩	১৯ জানুয়ারি ২০১৬ রংধনু, পত্নিতলা, নওগাঁ	আবু বকর সিদ্দিক	সাবেক ব্যবস্থাপক, রংধনু	১১ মিনিট ২০ সেকেন্ড
৪.১.৪	১৯ জানুয়ারি ২০১৬ রংধনু, পত্নিতলা, নওগাঁ	আবদুর রহমান	দর্শক, রংধনু	৩ মিনিট ৪১ সেকেন্ড
৪.১.৫	১৯ জানুয়ারি ২০১৬ রংধনু, পত্নিতলা, নওগাঁ	আব্বাস আলী	রংধনুর সামনের দোকানি	০৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড
৪.১.৬	১৯ জানুয়ারি ২০১৬ রংধনু, পত্নিতলা, নওগাঁ	সিরাজুল ইসলাম	দর্শক, পেশায় সার্ভেয়ার	৯ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড
৪.১.৭	১৯ জানুয়ারি ২০১৬ বিনোদন, পত্নিতলা, নওগাঁ	মিলন কুমার মণ্ডল	কর্মচারী, বিনোদন সিনেমা	১৪ মিনিট ০৭ সেকেন্ড
৪.১.৮	২০ জানুয়ারি ২০১৬ বিনোদন সিনেমা, পত্নিতলা, নওগাঁ	আমিনুল ইসলাম	মালিক, বিনোদন সিনেমা	০৬ মিনিট ০৩ সেকেন্ড
৪.১.৯	২০ জানুয়ারি ২০১৬ বিনোদন সিনেমা, পত্নিতলা, নওগাঁ	মো. ছাদেকুল ইসলাম	কর্মচারী, বিনোদন সিনেমা	১৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড
৪.১.১০	২০ জানুয়ারি ২০১৬ বিনোদন, পত্নিতলা, নওগাঁ	ফিরোজ মিয়া	প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘদিনের আইসক্রিম বিক্রেতা, এখন বেকার, বিনোদন সিনেমা	০৫ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড
৪.১.১১	২০ জানুয়ারি ২০১৬ বিনোদন, পত্নিতলা, নওগাঁ	বকুল চন্দ্র সাহা	বিনোদন সিনেমার সামনের দোকানদার	০৭ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড
৪.১.১২	২০, ২১, ২২ জানুয়ারি ২০১৬ বিনোদন, পত্নিতলা, নওগাঁ	সমীর কুমার মণ্ডল	ব্যবস্থাপক. বিনোদন সিনেমা	৭০ মিনিট ১২ সেকেন্ড
৪.১.১৩	২২ জানুয়ারি ২০১৬ রঙধনু, পত্নিতলা, নওগাঁ	আবু মুসা	ব্যবস্থাপক, রংধনু সিনেমা	৮ মিনিট
৪.১.১৪	২৩ জানুয়ারি ২০১৬ বিনোদন, পত্নিতলা, নওগাঁ	দিলদার	দর্শক, বিনোদন সিনেমা	১৫ মিনিট ১৩ সেকেন্ড
৪.১.১৫	২৩ জানুয়ারি ২০১৬ বিনোদন, পত্নিতলা, নওগাঁ	বাবু	দর্শক, বিনোদন সিনেমা	১৮ মিনিট ০৩ সেকেন্ড
৪.১.১৬	২ নভেম্বর ২০১৩, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ উপহার সিনেমা, রাজশাহী	সোহাগ	গেইটম্যান, উপহার সিনেমা	১৫ মিনিট ২৭ সেকেন্ড, ২৭ মিনিট ১৭ সেকেন্ড, ৪৫ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড
৪.১.১৭	২ নভেম্বর ২০১৩, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩, উপহার সিনেমা, রাজশাহী	আখলাক	গেইটম্যান, উপহার সিনেমা	১৪ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড এবং ৩৫ মিনিট ২৭ সেকেন্ড
৪.১.১৮	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, উপহার সিনেমা	কালাম মিয়া	রুটি ও বট বিক্রেতা, উপহার সিনেমা	১৭ মিনিট ০৭ সেকেন্ড
৪.১.১৯	৭ আগস্ট ২০১৪, উপহার সিনেমা	শফিক	টিকেট কালোবাজারি, উপহার সিনেমা	২৫ মিনিট ১৩ সেকেন্ড
৪.১.২০	১১ নভেম্বর ২০১৪, উপহার সিনেমা	রাসেল	দর্শক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৩৫ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয় ও পেশা	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.১.২১	১৮ নভেম্বর ২০১৮, উপহার সিনেমা, রাজশাহী	জব্বার	টিকিট কালোবাজারি, উপহার সিনেমা	১৫ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড
৪.১.২২	২৩ জানুয়ারি ২০১৫. উপহার সিনেমা, রাজশাহী.	মুকুল	দর্শক, উপহার সিনেমা	২৫ মিনিট ০৭ সেকেন্ড
৪.১.২৩	১৩ মে ২০১৫, উৎসব সিনেমা, রাজশাহী	মো. জাহাঙ্গীর	নৈশপ্রহরী ও টিকেট কালোবাজারি, উপহার সিনেমা	এক ঘণ্টা ১০ মিনিট ১৩ সেকেন্ড
৪.১.২৪	৯ এপ্রিল ২০১৫, উৎসব সিনেমা, রাজশাহী	দেলোয়ার	দর্শক, উপহার সিনেমা	১৫ মিনিট ১৭ সেকেন্ড
৪.১.২৫	১৫ এপ্রিল ২০১৫, উপহার সিনেমা, রাজশাহী	আরিফ	গ্যারেজের মালিক, উপহার সিনেমা	৩৫ মিনিট ১৭ সেকেন্ড
৪.১.২৬	৪ এপ্রিল ২০১৬, উপহার সিনেমা, রাজশাহী	এম এ মোমিন রাঙ্গা	প্রতিনিধি, উপহার সিনেমা	৪২ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড এবং ০৩ মিনিট ০৩ সেকেন্ড
৪.১.২৭	১৫ জুলাই ২০১৬, উপহার সিনেমা, রাজশাহী	রমজান	দর্শক, সিএনজি অটোরিকশা চালক, উপহার সিনেমা	১৫ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড
৪.১.২৮	১ নভেম্বর ২০১৭, উপহার সিনেমা, রাজশাহী	মাসুদার রহমান শান্তি	প্রতিনিধি, উপহার সিনেমা	৩০ মিনিট ১৭ সেকেন্ড
৪.১.২৯	১৫ নভেম্বর ২০১৬, উপহার সিনেমা, রাজশাহী	লতিফ মিয়া	হিসাবরক্ষক কাম বুকিং ক্ল্যার্ক, উপহার সিনেমা	১৫ মিনিট ০৭ সেকেন্ড

সারণী ৪.২ সাংস্কৃতিক অঞ্চল ২ : চট্টগ্রাম-কুমিল্লা

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয়	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.২.১	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ আলমাস, চট্টগ্রাম	আবদুল আউয়াল	আলমাস ও দিনার প্রেক্ষাগৃহের ব্যবস্থাপক ও মুক্তিযোদ্ধা	১৬ মিনিট ১৭ সেকেন্ড
৪.২.২	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সিনেমা প্যালেস, চট্টগ্রাম	আলমগীর আলম	সিনেমা প্যালেসের বুকিং ক্লার্ক	৯ মিনিট ০৮ সেকেন্ড
৪.২.৩	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সিনেমা প্যালেস, চট্টগ্রাম	পি জি চৌধুরী	সিনেমা প্যালেসের ব্যবস্থাপক	০৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড
৪.২.৪	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সিনেমা প্যালেস, চট্টগ্রাম	হাজী আবুল হোসেন	সিনেমা প্যালেসের মালিক	১০ মিনিট ১৫ সেকেন্ড
৪.২.৫	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সিনেমা প্যালেস, চট্টগ্রাম	মো. রফিক	সিনেমা প্যালেসের গেটম্যান	১০ মিনিট ১১ সেকেন্ড
৪.২.৬	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সিনেমা প্যালেস, চট্টগ্রাম	হাজী মো. সেলিম	সিনেমা প্যালেসের একসময়ের ৩৫ মি. লি. প্রজেক্টর অপারেটর বর্তমানে গেটম্যান	১৬ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড
৪.২.৭	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ দিনার, চট্টগ্রাম	আমির হামজা	দিনার প্রেক্ষাগৃহের গেটম্যান	৫ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড
৪.২.৮	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ আলমাস, চট্টগ্রাম	পিন্টু মারমা	আলমাস প্রেক্ষাগৃহে পাবলিসিটির কাজ করেন	৫ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড
৪.২.৯	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ আলমাস, চট্টগ্রাম	এ টি এম ফারুক	আলমাস এর সবচেয়ে পুরনো কর্মী	৪৩ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড
৪.২.১০	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ দিনার, চট্টগ্রাম	আ. মতিন	দিনার এর বুকিং ক্ল্যার্ক	০৮ মিনিট

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয়	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.২.১১	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ আলমাস, চট্টগ্রাম	দুলাল কান্তি দাস	আলমাস-এর মেকানিক	০৭ মিনিট ১৪ সেকেন্ড
৪.২.১২	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ আলমাস, চট্টগ্রাম	সাবের আহমেদ	আলমাস এর একসময়ের বুকিং ক্ল্যার্ক, বর্তমানে কয়েকজন মালিকের একজন	৫ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড
৪.২.১৩	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সিনেমা প্যালেস, চট্টগ্রাম	সিরাজউদ্দৌলা	সিনেমা প্যালেসের টেকনিশিয়ান	০৬ মিনিট
৪.২.১৪	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সিনেমা প্যালেস, চট্টগ্রাম	আ. শুক্কুর	সিনেমা প্যালেসের সামনের পান-সিগারেট বিক্রেতা	৫ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড
৪.২.১৫	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭, আলমাস, চট্টগ্রাম	দিলীপ দে	আলমাস প্রেক্ষাগৃহের প্রহরী	৯ মিনিট ৫২ সেকেন্ড
৪.২.১৬	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পলাশ সিনেমাহল, লাকসাম, কুমিল্লা	প্রদীপ শিকদার	পলাশ প্রেক্ষাগৃহের পুরনো কর্মচারী	১৩ মিনিট ৩০ সেকেন্ড
৪.২.১৭	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পলাশ সিনেমাহল, লাকসাম, কুমিল্লা	শামসুল ইসলাম	পলাশের ব্যবস্থাপক	২৪ মিনিট ০৩ সেকেন্ড এবং ২ মিনিট ০৩ সেকেন্ড
৪.২.১৮	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পলাশ সিনেমাহল, লাকসাম, কুমিল্লা	তোফায়েল হোসেন	পলাশ প্রেক্ষাগৃহের পুরনো কর্মচারী	১৬ মিনিট ২৯ সেকেন্ড এবং ০১ মিনিট ০৫ সেকেন্ড
৪.২.১৯	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পড়শি সিনেমাহল, লাকসাম, কুমিল্লা	উত্তম কাহার	পড়শি প্রেক্ষাগৃহের সুপারভাইজার	০৬ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড
৪.২.২০	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পড়শি সিনেমাহল, লাকসাম, কুমিল্লা	অঞ্জন দাস	পড়শির মালিক	২৫ মিনিট ০২ সেকেন্ড
৪.২.২১	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পড়শি সিনেমাহল, লাকসাম, কুমিল্লা	জামান আহমেদ	পড়শির নৈশপ্রহরী	০৩ মিনিট ০৩ সেকেন্ড
৪.২.২২	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পড়শি সিনেমাহল, লাকসাম, কুমিল্লা	মহরম আলী	পড়শির নৈশ্যপ্রহরী	০৩ মিনিট ৫০ সেকেন্ড
৪.২.২৩	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পড়শি সিনেমাহল, লাকসাম, কুমিল্লা	আবুল খায়ের	পড়শির গেটম্যান	০৬ মিনিট ৫২ সেকেন্ড

সারণী ৪.৩ : সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৩ : রংপুর-কুড়িগ্রাম

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয় ও পেশা	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৩.১	১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ স্বর্ণমহল, কাঠালি, কুড়িগ্রাম সদর	মো. দুলাল হোসেন	নৈশ্যপ্রহরী, স্বর্ণমহল	০৯ মিনিট ৩২ সেকেন্ড
৪.৩.২	১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ স্বর্ণমহল, কাঠালি, কুড়িগ্রাম সদর	বিজয় অধিকারী	সহকারি প্রজেক্টর অপারেটর, স্বর্ণমহল	১০ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড
৪.৩.৩	১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ স্বর্ণমহল, কাঠালি, কুড়িগ্রাম সদর	মো. রফিকুল ইসলাম	সাবেক প্রজেক্টর অপারেটর, স্বর্ণমহল	১১ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড
৪.৩.৪	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মিতালী সিনেমা, কুড়িগ্রাম সদর	মিরাজ	মালিকের লোক, মিতালী সিনেমাহল	১৫ মিনিট ১৩ সেকেন্ড
৪.৩.৫	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মিতালী সিনেমা, কুড়িগ্রাম সদর	সাইদুল ইসলাম	সাবেক অপারেটর, মিতালী সিনেমা	১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড
৪.৩.৬	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মিতালী সিনেমা, কুড়িগ্রাম সদর	হাবিবুর রহমান টিটু	সাবেক ব্যবস্থাপক, মিতালী সিনেমা	২৪ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয় ও পেশা	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৩.৭	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ স্বর্ণমহল, কাঠালি, কুড়িগ্রাম সদর	কিনু বাবু	৩৫ মি মি প্রজেক্টর অপারেটর, স্বর্ণমহল	১৯ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড
৪.৩.৮	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মিতালী সিনেমা, কুড়িগ্রাম সদর	দেবলাল রজক দেওয়ান	সহকারী অপারেটর, স্বর্ণমহল	১৮ মিনিট ৪২ সেকেন্ড
৪.৩.৯	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, মিতালী সিনেমা, কুড়িগ্রাম সদর	জোবায়ের হোসেন	মালিক, মিতালী সিনেমা	১৫ মিনিট ২১ সেকেন্ড
৪.৩.১০	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, মিতালী সিনেমা, কুড়িগ্রাম সদর	রবিউল ইসলাম	দর্শক, মিতালী সিনেমা	১০ মিনিট ৫০ সেকেন্ড
৪.৩.১১	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মিতালী সিনেমা, কুড়িগ্রাম সদর	নয়ন	ভিডিও দোকানদার, মিতালি সিনেমাহলের পাশে, কুড়িগ্রাম সদর	১১ মিনিট ১৫ সেকেন্ড
৪.৩.১২	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, মিতালী সিনেমা, কুড়িগ্রাম সদর	সেলিম	সাবেক বুকিং ক্ল্যার্ক, মিতালী সিনেমা	০৮ মিনিট ১৮ সেকেন্ড
৪.৩.১৩	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মিতালী সিনেমা, কুড়িগ্রাম সদর	নাহিদ	দর্শক, অনার্স শিক্ষার্থী, মিতালী সিনেমা	০৪ মিনিট ২৬ সেকেন্ড
৪.৩.১৪	৩ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	রফিকুল বারী	সাবেক বুকিং এজেন্ট, শাপলা	২০ মিনিট ১১ সেকেন্ড
৪.৩.১৫	৩ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	আ. বারেক	বাদামওয়ালা, শাপলা সিনেমা	০৭ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড
৪.৩.১৬	৩ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	শফিকুল ইসলাম	বুকিং ক্ল্যার্ক, শাপলা সিনেমা	১৫ মিনিট ১১ সেকেন্ড
৪.৩.১৭	৩ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	সুকুমার চন্দ্র দাস	গেইটম্যান, শাপলা সিনেমা	০৯ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড
৪.৩.১৮	৩ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	আ. রহমান	জাজ এর অপারেটর, শাপলা সিনেমা	১১ মিনিট ৫০ সেকেন্ড
৪.৩.১৯	৩ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	আ. কুদ্দুস মোল্লা	পাবলিসিটি ম্যান, শাপলা সিনেমা	০৯ মিনিট
৪.৩.২০	৩ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	শাহাবুদ্দিন মোল্লা	ব্যবস্থাপক, শাপলা সিনেমা	২৭ মিনিট ১৫ সেকেন্ড
৪.৩.২১	৩ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	নাঈম ইসলাম	দর্শক, শাপলা সিনেমা	৬ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড
৪.৩.২২	৩ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	তাপস সরকার	গেইটম্যান. শাপলা সিনেমা	০৬ মিনিট ৩১ সেকেন্ড
৪.৩.২৩	৩ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	রেজাউল করিম	গ্যারেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত, শাপলা সিনেমা	০৮ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড
৪.৩.২৪	৪ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	তসলিম উদ্দিন	গেইটম্যান, শাপলা সিনেমা	১৪ মিনিট ১২ সেকেন্ড
৪.৩.২৫	৪ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	আ. কাদের	ঝালমুড়ি দোকানি. শাপলা সিনেমা	১০ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড
৪.৩.২৬	৪ মার্চ ২০১৮, শাপলা সিনেমা, রংপুর	মোস্তাফিজুর রহমান	দর্শক, শাপলা সিনেমাহল, গঙ্গাচড়ার সিনেমাহল ব্যবসায়ী	০৯ মিনিট ২৫ সেকেন্ড

সারণী ৪.৪ : সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৪ : যশোর-কুষ্টিয়া

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয় ও পেশা	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৪.১	২২, ২৩, ২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	মোল্যা ফারুক আহম্মেদ	পাবলিসিটি বিভাগের প্রধান, মণিহার	৩০ মিনিট ১২ সেকেন্ড
৪.৪.২	২২ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	মো. গোলাম রসুল	প্রেক্ষাগৃহের সামনের ভ্রাম্যমাণ দোকানি, মণিহার	১১ মিনিট ২২ সেকেন্ড
৪.৪.৩	২২ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	জুয়েল হোসেন	প্রেক্ষাগৃহের সামনের ভ্রাম্যমাণ দোকানি, মণিহার	১৫ মিনিট ০৩ সেকেন্ড
৪.৪.৪	২২ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	নুর ইসলাম	রিকশাওয়ালা, যশোর সদর	০৮ মিনিট ২৬ সেকেন্ড
৪.৪.৫	২২ জানুয়ারি ২০১৭, তসবির মহল, যশোর	প্রহ্লাদ দাশ	গেইটম্যান কাম প্রচারম্যান, তসবির মহল	১৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড
৪.৪.৬	২২ জানুয়ারি ২০১৭, তসবির মহল, যশোর	অনুপ কুমার সিংহ	প্রজেক্টর অপারেটর, তসবির মহল	১৪ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড
৪.৪.৭	২২ জানুয়ারি ২০১৭, তসবির মহল, যশোর	আলী হোসেন নদু	ব্যবস্থাপক, তসবির মহল	১৬ মিনিট ২৮ সেকেন্ড
৪.৪.৮	২২ জানুয়ারি ২০১৭, তসবির মহল, যশোর	শেখ রবিউল আলম	তসবির মহল যাদের অডিটরিয়ামে চলে সেই যশোর ইন্সটিটিউটের সাধারণ সম্পাদক	২০ মিনিট ০১ সেকেন্ড
৪.৪.৯	২৩ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	রাকিব	অর্থনীতিতে অনার্স পড়ুয়া দর্শক, মণিহার	১৬ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড
৪.৪.১০	২৩ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	দিলীপ কুমার মণ্ডল	মনিরামপুরের কৃষক দর্শক, মণিহার	০৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড
৪.৪.১১	২৩ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	কামাল হোসেন	দর্শক. মণিহার	০৯ মিনিট ২৫ সেকেন্ড
৪.৪.১২	২৩ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	প্রদীপ দাস	পাবলিসিটি বিভাগের প্রধান,মণিহার	২৭ মিনিট ১১ সেকেন্ড
৪.৪.১৩	২৩ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	মো. ইউসুফ	টিকিট কালোবাজারি, মণিহার	১২ মিনিট ৩১ সেকেন্ড
৪.৪.১৪	২৩ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	কাজী শরিফুল ইসলাম	গেইটম্যান, মণিহার সিনেমা	১৯ মিনিট ১১ সেকেন্ড
৪.৪.১৫	২৩, ২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	মো. শফিউজ্জামান মিন্টু	প্রধান অপারেটর, মণিহার	১৪ মিনিট ৩০ সেকেন্ড
৪.৪.১৬	২৩ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	তপু হাসান	দর্শক, মণিহার	১৭ মিনিট ০৫ সেকেন্ড
৪.৪.১৭	২৩ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	শওকত আলী	পাবলিসিটিতে ব্যবহৃত গাড়ির চালক, মণিহার	১৫ মিনিট ৩০ সেকেন্ড
৪.৪.১৮	২৩ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	মোশারফ খান	দর্শক, মণিহার	১৩ মিনিট ২৫ সেকেন্ড
৪.৪.১৯	২৩ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	মো. তোফাজ্জল	প্রধান হিসাব কর্মকর্তা, মণিহার	১৫ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড
৪.৪.২০	২৩ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	শামীম আনোয়ার	বুকিং ক্লার্ক, মণিহার	১৭ মিনিট ৩০ সেকেন্ড

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয় ও পেশা	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৪.২১	২৩ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	জিয়াউল হক মিঠু	বর্তমান মালিক, মণিহার	১৯ মিনিট ২১ সেকেন্ড
৪.৪.২২	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	লতা	দর্শক, মণিহার	১৩ মিনিট ৩২ সেকেন্ড
৪.৪.২৩	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	পাপিয়া পিয়া	দর্শক, মণিহার	১১ মিনিট ২৩ সেকেন্ড
৪.৪.২৪	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	শারমিন	দর্শক, মণিহার	১১ মিনিট ০৫ সেকেন্ড
৪.৪.২৫	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	নাসিফ	দর্শক, মণিহার	০৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ড
৪.৪.২৬	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	নজরুল ইসলাম সোহেল	গেইটম্যান, মণিহার	১২ মিনিট ৩০ সেকেন্ড
৪.৪.২৭	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	ওমর সানি বিশ্বাস	দর্শক, মণিহার	১৩ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড
৪.৪.২৮	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	মো. আব্দুর রশীদ	দর্শক, মণিহার	৯ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড
৪.৪.২৯	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	নাসিমা	যৌনকর্মী, মণিহার	১১ মিনিট ২৯ সেকেন্ড
৪.৪.৩০	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	সমরেশ বাহাদুর সত্য	প্রধান ফটকের গেইটম্যান, মণিহার	২২ মিনিট ১৩ সেকেন্ড
৪.৪.৩১	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	সঙ্গীত	দর্শক, মণিহার	১৫ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড
৪.৪.৩২	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	কে এম হাসান	দর্শক, মণিহার	০৭ মিনিট ৩১ সেকেন্ড
৪.৪.৩৩	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	মাসুদ শেখ	প্রতিনিধি, মণিহার	১৪ মিনিট ৪১ সেকেন্ড
৪.৪.৩৪	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, তসবির মহল, যশোর	চিত্তরঞ্জন দাস	প্রেক্ষাগৃহের সামনের দোকানি, তসবির মহল	১৩ মিনিট ১৮ সেকেন্ড
৪.৪.৩৫	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, তসবির মহল, যশোর	দামোদার সাহা	প্রবীণ গেইটম্যান, তসবির মহল	১০ মিনিট ৫২ সেকেন্ড
৪.৪.৩৬	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, তসবির মহল, যশোর	বকুল কুমার বোস	সামনের দোকানি, তসবির মহল	১০ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড
৪.৪.৩৭	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, তসবির মহল, যশোর	শ্যামাপদ হালদার	হিসাবরক্ষক, তসবির মহল	১২ মিনিট ১৭ সেকেন্ড
৪.৪.৩৮	২৪ জানুয়ারি ২০১৭, তসবির মহল, যশোর	আ. রশীদ	বাদাম বিক্রেতা, তসবির মহল	০৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ড
৪.৪.৩৯	২৫ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	লিকু	টিকিট কালোবাজারি, মণিহার	১২ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড
৪.৪.৪০	২৫ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	সিরাজুল ইসলাম	বাদাম বিক্রেতা, মণিহার	১৭ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড
৪.৪.৪১	২৫ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	মো. ইব্রাহীম	ঘড়ি, চশমার ভ্রাম্যমাণ দোকানি, মণিহার	১২ মিনিট ৩০ সেকেন্ড
৪.৪.৪২	২৫ জানুয়ারি ২০১৭, মণিহার, যশোর	শহিদুল ইসলাম	ডি সি'র গেইটম্যান, মণিহার	১০ মিনিট
৪.৪.৪৩	২৫ জানুয়ারি ২০১৭, মানসী, যশোর	মনিরুল	সাবেক গেইটম্যান, মানসী	১৫ মিনিট ৩০ সেকেন্ড
৪.৫.৪৪	২৫ জানুয়ারি ২০১৭, মানসী, যশোর	রাজ্জাক	সাবেক কর্মচারী, বর্তমানে চা-পান দোকানদার, মানসী	১৪ মিনিট ৩০ সেকেন্ড

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয় ও পেশা	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৪.৪৫	২৫ জানুয়ারি ২০১৭, মানসী, যশোর	মমতাজ আলী	সাবেক কর্মচারী, নিরালা সিনেমা	১৩ মিনিট ২৩ সেকেন্ড
৪.৪.৪৬	২৩, ২৪, ২৫ জানুয়ারি ২০১৭, তসবির মহল, যশোর	পলাশ কুমার বোস	সুপারভাইজার, তসবিল মহল	৩৩ মিনিট ৩২ সেকেন্ড
৪.৪.৪৭	৩ এপ্রিল ২০১৭, রুপাঞ্জলি সিনেমা, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া	মোবারক	বন্ধ রুপাঞ্জলি'র সামনের চা দোকানদার	১৫ মিনিট ২৭ সেকেন্ড
৪.৪.৪৮	৩ এপ্রিল ২০১৭, রুপাঞ্জলি, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া	উমর আলী	বন্ধ রুপাঞ্জলি'র সাবেক ব্যবস্থাপক	২৫ মিনিট ১২ সেকেন্ড
৪.৪.৪৯	৩ এপ্রিল ২০১৭, বনানী, কুষ্টিয়া সদর	সুবোধ চন্দ্র	৩৫ মি মি প্রজেক্টরের অপারেটর, বনানী	১০ মিনিট ২৮ সেকেন্ড
৪.৪.৫০	৩ এপ্রিল ২০১৭, বনানী, কুষ্টিয়া সদর	আমিনুল ইসলাম	জাজের নিয়োগ করা ডিজিটাল প্রজেক্টর অপারেটর, বনানী	১২ মিনিট ১৯ সেকেন্ড
৪.৪.৫১	৩, ৪ এপ্রিল ২০১৭, বনানী, কুষ্টিয়া সদর	মো. রাজন আহমেদ	প্রতিনিধি, বনানী	২০ মিনিট ৩০ সেকেন্ড
৪.৪.৫২	৩ এপ্রিল ২০১৭, বনানী, কুষ্টিয়া সদর	মোখলেছুর রহমান বকুল	ব্যবস্থাপক, বনানী	১৩ মিনিট ২৩ সেকেন্ড
৪.৪.৫৩	৩ এপ্রিল ২০১৭, বনানী, কুষ্টিয়া সদর	সনাতন অধিকারী	ঝালমুড়ি বিক্রেতা, বনানী	১৮ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড
৪.৪.৫৪	৩ এপ্রিল ২০১৭, বনানী, কুষ্টিয়া সদর	ইয়াকুব	দর্শক, বনানী	১৩ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড
৪.৪.৫৫	৪ এপ্রিল ২০১৭, বনানী, কুষ্টিয়া সদর	রবিউল	গেইটম্যান, বনানী	১৬ মিনিট ৩১ সেকেন্ড
৪.৪.৫৬	৪ এপ্রিল ২০১৭, বনানী, কুষ্টিয়া সদর	মো. নাঈম	প্রচারম্যান, বনানী	১৮ মিনিট ৩১ সেকেন্ড

সারণী ৪.৫ : সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৫ : খুলনা-সাতক্ষীরার দেবাহাটা

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয়	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৫.১.	২৬ জানুয়ারি ২০১৭, শঙ্খ সিনেমা, খুলনা	মো. মনিরুজ্জামান মামুন	গেইটম্যান, শঙ্খ সিনেমা	১২ মিনিট ৩০ সেকেন্ড
৪.৫.২	২৬ জানুয়ারি ২০১৭, শঙ্খ সিনেমা, খুলনা	শেখ মোতাহার হোসেন	প্রতিনিধি, শঙ্খ সিনেমা	১২ মিনিট ৫০ সেকেন্ড
৪.৫.৩	২৬ জানুয়ারি ২০১৭, সোসাইটি সিনেমা, খুলনা	মো. নাসিম	হিসাবরক্ষক, সোসাইটি সিনেমা	১৫ মিনিট ২৩ সেকেন্ড
৪.৫.৪	২৬ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	রুহুল আমিন সরদার	সঙ্গীতার পাশের ইলেকট্রনিক দোকানি	১৪ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড
৪.৫.৫	২৬ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	সৈয়দ নাসির উদ্দিন	বুকিং ক্ল্যার্ক, সঙ্গীতা সিনেমা	১৩ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড
৪.৫.৬	২৬ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	রায়হান মালিক	দর্শক, সঙ্গীতা	১২ মিনিট ০৪ সেকেন্ড
৪.৫.৭	২৬ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	অলি মাতবর	চলচ্চিত্রের পোস্টার লাগানোর কাজ করেন, সঙ্গীতা	১১ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড
৪.৫.৮	২৬ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	ইমরান হোসেন	দর্শক, সঙ্গীতা	১৩ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয়	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৫.৯	২৬ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	আতিয়ার রহমান	ক্যান্টিন পরিচালক, সঙ্গীতা	১৩ মিনিট ৪১ সেকেন্ড
৪.৫.১০	২৬ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	কামরুল ইসলাম	দর্শক ও সঙ্গীতার পাশেই বাড়ি	১১ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড
৪.৫.১১	২৬ জানুয়ারি ২০১৭, সোসাইটি সিনেমা, খুলনা	জাফর আলী	মালিক, সোসাইটি সিনেমা,	২৮ মিনিট ০৫ সেকেন্ড
৪.৫.১২	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, শঙ্খ সিনেমা, খুলনা	শেখ জাহিদ	সুপারভাইজার, শঙ্খ	২১ মিনিট ২৭ সেকেন্ড
৪.৫.১৩	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, শঙ্খ সিনেমা, খুলনা	মো. ওবায়দুর রহমান	বুকিং ক্ল্যার্ক কাম প্রচারম্যান, শঙ্খ	০৯ মিনিট ১১ সেকেন্ড
৪.৫.১৪	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, শঙ্খ সিনেমা, খুলনা	আনোয়ার হোসেন	বুকিং এজেন্ট. শঙ্খ	১৫ মিনিট ০১ সেকেন্ড
৪.৫.১৫	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, শঙ্খ সিনেমা, খুলনা	সাব্বির মোল্যা	দর্শক, শঙ্খ	১৭ মিনিট ১২ সেকেন্ড
৪.৫.১৬	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, শঙ্খ সিনেমা, খুলনা	সুকুমার ভট্টাচার্য	গেইটম্যান, শঙ্খ	০৯ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড
৪.৫.১৭	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, শঙ্খ সিনেমা, খুলনা	ইমন	দর্শক, শঙ্খ	১১ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড
৪.৫.১৮	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	জালাল শিকদার	দর্শক, সঙ্গীতা সিনেমা	১০ মিনিট ০৪ সেকেন্ড
৪.৫.১৯	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	নজরুল ইসলাম	গেইটম্যান, সঙ্গীতা	০৮ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড
৪.৫.২০	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	মো. সুমন হোসেন	দর্শক, শঙ্খ	১৪ মিনিট ৩২ সেকেন্ড
৪.৫.২১	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	বর্ষা	দর্শক, শঙ্খ	০৯ মিনিট ১১ সেকেন্ড
৪.৫.২২	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	মো. নজরুল ইসলাম	প্রতিনিধি, শঙ্খ	১৩ মিনিট ২০ সেকেন্ড
৪.৫.২৩	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	বিকাশ	ব্যবস্থাপক, শঙ্খ	১৩ মিনিট ২২ সেকেন্ড
৪.৫.২৪	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	মো. কাসেম	ভ্যানচালক দর্শক, সঙ্গীতা	০৮ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড
৪.৫.২৫	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	মহিউদ্দিন আহমেদ পান্না	ব্যবস্থাপক, সঙ্গীতা	১৫ মিনিট ৪১ সেকেন্ড
৪.৫.২৬	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা সিনেমা, খুলনা	মো. হালিম	প্রধান অপারেটর, সঙ্গীতা	১৯ মিনিট ০১ সেকেন্ড
৪.৫.২৭	২৭ জানুয়ারি ২০১৭, সোসাইটি সিনেমা, খুলনা	নাঈম	সুপারভাইজার, সোসাইটি সিনেমা	২৯ মিনিট ৫১ সেকেন্ড
৪.৫.২৮	২৮ জানুয়ারি ২০১৭, শঙ্খ, খুলনা	মানিক সাহা	প্রেক্ষাগৃহের সামনের দোকানি, শঙ্খ	১৩ মিনিট ৩২ সেকেন্ড
৪.৫.২৯	২৮ জানুয়ারি ২০১৭, শঙ্খ, খুলনা	গোপাল দাস রাজু	প্রেক্ষাগৃহের সামনের দোকানি, শঙ্খ	১৬ মিনিট ০৭ সেকেন্ড
৪.৫.৩০	২৮ জানুয়ারি ২০১৭, লিবার্টি, খালিশপুর, খুলনা	শাহজাহান আলী	মালিক, লিবার্টি	৩৩ মিনিট ০৮ সেকেন্ড
৪.৫.৩১	২৮ জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা, খুলনা	মারুফ হোসেন	দর্শক, সঙ্গীতা	১৪ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড
৪.৫.৩২	২৯ জানুয়ারি ২০১৭, লাইট হাউজ, দেবাহাটা, সাতক্ষীরা	আফজাল হোসেন	দর্শক, লাইটহাউজ	১৫ মিনিট ১৩ সেকেন্ড
৪.৫.৩৩	২৯ জানুয়ারি ২০১৭, লাইট হাউজ, দেবাহাটা, সাতক্ষীরা	মো. শাহরুখ হোসেন রাজা	গেইটম্যান, লাইটহাউজ	০৯ মিনিট ২২ সেকেন্ড

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয়	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৫.৩৪	২৯ জানুয়ারি ২০১৭, লাইট হাউজ, দেবাহাটা, সাতক্ষীরা	মাহাবুব আলম	ব্যবস্থাপক, লাইটহাউজ	১০ মিনিট ০৯ সেকেন্ড
৪.৫.৩৫	২৯ জানুয়ারি ২০১৭, লাইট হাউজ, দেবাহাটা, সাতক্ষীরা	শ্রী বিশ্বজিৎ কুমার ঘোষ	কর্মচারী, লাইটহাউজ	১৪ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড
৪.৫.৩৬	২৯ জানুয়ারি ২০১৭, লাইট হাউজ, দেবাহাটা, সাতক্ষীরা	মহিবুল্লাহ সরদার	দর্শক, লাইটহাউজ	১৩ মিনিট ৩২ সেকেন্ড
৪.৫.৩৭	২৯ জানুয়ারি ২০১৭, লাইট হাউজ, দেবাহাটা, সাতক্ষীরা	জাহিদ হোসেন	দর্শক, লাইটহাউজ	১১ মিনিট ৪১ সেকেন্ড
৪.৫.৩৮	৩০ জানুয়ারি ২০১৭, লাইটহাউজ, দোবহাটা, সাতক্ষীরা	আবু রাহান তিতু	মালিক, লাইটহাউজ	২২ মিনিট ০৩ সেকেন্ড
৪.৫.৩৯	৩০ জানুয়ারি ২০১৭, লাইটহাউজ, দোবহাটা, সাতক্ষীরা	শ্রী শিবু কুমার দাস	প্রেক্ষাগৃহের পাশের দোকানি, লাইটহাউজ	০৯ মিনিট ০২ সেকেন্ড
৪.৫.৪০	৩০ জানুয়ারি ২০১৭, লাইটহাউজ, দোবহাটা, সাতক্ষীরা	আ. রহিম	দর্শক, লাইটহাউজ	১১ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড
৪.৫.৪১	৩০ জানুয়ারি ২০১৭, ইছামতি, দোবহাটা, সাতক্ষীরা	মজিবর রহমান	বন্ধ ইছামতির সামনের দোকানি	১৩ মিনিট ০৭ সেকেন্ড

সারণী ৪.৬ : সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৬ : বরিশাল-পটুয়াখালী

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয়	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৬.১	১০, ১১ আগস্ট ২০১৭, অভিরুচি, বরিশাল	অরুণ চন্দ্র গোস্বামী	গেইটম্যান, অভিরুচি	১৮ মিনিট ১৭ সেকেন্ড
৪.৬.২	১০ আগস্ট ২০১৭, অভিরুচি, বরিশাল	শেখ মাসুম	পাবলিসিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত, অভিরুচি	২৬ মিনিট ০১ সেকেন্ড
৪.৬.৩	১০ আগস্ট ২০১৭, অভিরুচি, বরিশাল	আ. মালেক মিয়া	পয়েন্টম্যান, অভিরুচি	০৮ মিনিট ২৫ সেকেন্ড
৪.৬.৪	১০, ১১ আগস্ট ২০১৭, অভিরুচি, বরিশাল	প্রদীপ দাস	গেইটম্যান, অভিরুচি	২৩ মিনিট ০৫ সেকেন্ড
৪.৬.৫	১১ আগস্ট ২০১৭, অভিরুচি, বরিশাল	রেজাউল কবির	ব্যবস্থাপক, অভিরুচি	১৪ মিনিট ৪১ সেকেন্ড
৪.৬.৬	১০ আগস্ট ২০১৭, অভিরুচি, বরিশাল	জিয়াদ	দর্শক, অভিরুচি	০৭ মিনিট ১৩ সেকেন্ড
৪.৬.৭	১০ আগস্ট ২০১৭, অভিরুচি, বরিশাল	মো. জুলু মিয়া	ভাড়া নিয়ে চালান, অভিরুচি	১২ মিনিট ১৫ সেকেন্ড
৪.৬.৮	১১ আগস্ট ২০১৭, অভিরুচি, বরিশাল	তোতা মিয়া	সাবেক কালোবাজারি, অভিরুচি	১৪ মিনিট ১৫ সেকেন্ড
৪.৬.৯	১১ আগস্ট ২০১৭, কাকলি, বরিশাল	মালেক হাওলাদার	বন্ধ হওয়া কাকলি প্রেক্ষাগৃহের অপারেটর	১৫ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড
৪.৬.১০	১১ আগস্ট ২০১৭, বিউটি, বরিশাল	ফারুক হোসেন	বন্ধ হওয়া বিউটি প্রেক্ষাগৃহের ব্যবস্থাপক	১২ মিনিট ১৭ সেকেন্ড
৪.৬.১১	১১ আগস্ট ২০১৭, অভিরুচি, বরিশাল	আ. খালেক	দর্শক, সবজি ব্যবসায়ী, অভিরুচি	১৭ মিনিট ০৯ সেকেন্ড
৪.৬.১২	১১ আগস্ট ২০১৭, অভিরুচি, বরিশাল	চায়না বেগম	হকার, অভিরুচি	১১ মিনিট ৪০ সেকেন্ড

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয়	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৬.১৩	১১ আগস্ট ২০১৭, অভিরুচি, বরিশাল	আলম হাওলাদার	ছোলা-বাদাম বিক্রেতা, অভিরুচি	১২ মিনিট ৫০ সেকেন্ড
৪.৬.১৪	১১ আগস্ট ২০১৭, প্রেসক্লাব, বরিশাল	এস এম ইকবাল	দর্শক ও সভাপতি, বরিশালের সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদ	২৫ মিনিট ১৬ সেকেন্ড
৪.৬.১৫	১১ আগস্ট ২০১৭, অভিরুচি, বরিশাল	এবায়দুল হক চাঁন	মালিক, অভিরুচি	১৪ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড
৪.৬.১৬	১২ আগস্ট ২০১৭, তিতাস, পটুয়াখালী সদর	তালেব	কেয়ারটেকার, তিতাস	১৫ মিনিট ৫০ সেকেন্ড
৪.৬.১৭	১২ আগস্ট ২০১৭, তিতাস, পটুয়াখালী সদর	আ. মান্নান	সাবেক ঝাড়ুদার, তিতাস	০৭ মিনিট ১৩ সেকেন্ড
৪.৬.১৮	১২ আগস্ট ২০১৭, তিতাস, পটুয়াখালী সদর	মো. মামুন খান	বুকিং ক্ল্যার্ক, তিতাস	১০ মিনিট ২৫ সেকেন্ড
৪.৬.১৯	১২ আগস্ট ২০১৭, তিতাস, পটুয়াখালী সদর	মজিবর রহমান	অপারেটর ও সাবেক প্রতিনিধি, তিতাস	১৫ মিনিট ১৭ সেকেন্ড
৪,৬.২০	১২ আগস্ট ২০১৭, তিতাস, পটুয়াখালী সদর	মোতালেব হোসেন	ব্যবস্থাপক, তিতাস	১৫ মিনিট ০২ সেকেন্ড
৪.৬.২১	১২ আগস্ট ২০১৭, তিতাস, পটুয়াখালী সদর	এম ডি রাসেল	হিসাবরক্ষক, তিতাস	১৪ মিনিট ২৫ সেকেন্ড
৪.৬.২২	১২ আগস্ট ২০১৭, রূপালি, পটুয়াখালী সদর	খোকন দে	বন্ধ হওয়া রূপালি প্রেক্ষাগৃহের সামনের দোকানি	১৪ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড
৪.৬.২৩	১৩ আগস্ট ২০১৭, তিতাস, পটুয়াখালী	জয়নাল শরীফ	গেইটম্যান, তিতাস	১৭ মিনিট ০৮ সেকেন্ড
৪.৬.২৪	১৩ আগস্ট ২০১৭, তিতাস, পটুয়াখালী	দুলাল বিশ্বাস	পাবলিসিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত, তিতাস	১৪ মিনিট ১৬ সেকেন্ড

সারণী ৪.৭ : সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৭ : সিলেট-মৌলভীবাজার (শ্রীমঙ্গল)

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয়	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৭.১	৭, ৮ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট	মিহির চক্রবর্তী	গেইটম্যান, নন্দিতা	০৯ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড
৪.৭.২	৭ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট	মো. শামীম	গেইটম্যান, নন্দিতা	১৩ মিনিট ০৮ সেকেন্ড
৪.৭.৩	৭ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট	আইয়ুব আলী	প্রধান ফটকের গেইটম্যান, নন্দিতা	০৮ মিনিট ২১ সেকেন্ড
৪.৭.৪	৭ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট	আ. রহমান	টিকেট কালোবাজারি, নন্দিতা	১৩ মিনিট ০৯ সেকেন্ড
৪.৭.৫	৭, ৮ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট	নুরুল ইসলাম	নন্দিতা প্রেক্ষাগৃহের প্রতিবেশি	১২ মিনিট ১৩ সেকেন্ড
৪.৭.৬	৭ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট	হারুন	পাবলিসিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত, নন্দিতা	০৯ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড
৪.৭.৭.	৭ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট	ময়না মিয়া	গেইটম্যান, নন্দিতা	১৪ মিনিট ০৭ সেকেন্ড
৪.৭.৮	৭ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট	জাভেদ	প্রজেক্টর অপারেটর, নন্দিতা	১১ মিনিট ১৭ সেকেন্ড

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয়	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৭.৯	৭ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট	আ. রশীদ	দোকানি, নন্দিতা	১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড
৪.৭.১০	৭ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট	ফারুক মিয়া	গেইটম্যান, নন্দিতা	১০ মিনিট ২৪ সেকেন্ড
৪.৭.১১	৭ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট	রাশেদুল কবির মন্টু	প্রতিনিধি, নন্দিতা	১৪ মিনিট ১২ সেকেন্ড
৪.৭.১২	৭ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট	মণীন্দ্র ঘোষ	বুকিং ক্ল্যার্ক, নন্দিতা	১৬ মিনিট ০৯ সেকেন্ড
৪.৭.১৩	৮ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট সদর	মোস্তফা চৌধুরী	ব্যবস্থাপক, নন্দিতা	২৩ মিনিট ২২ সেকেন্ড
৪.৭.১৪	৮ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট সদর	শুকুর মিয়া	মালিকের ভাই, নন্দিতা	১৩ মিনিট ১৬ সেকেন্ড
৪.৭.১৫	৮ মে ২০১৮, নন্দিতা, সিলেট সদর	হারুন অর রশীদ	সুপারভাইজার, নন্দিতা	২২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড
৪.৭.১৬	৯, ১০ মে ২০১৮, রাধানাথ সিনেমা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	জহির খন্দকার	সুপারভাইজার, রাধানাথ সিনেমা	২৫ মিনিট ২৫ সেকেন্ড
৪.৭.১৭	৯ মে ২০১৮, রাধানাথ সিনেমা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	মনির	৩৫ মি মি প্রজেক্টর অপারেটর, রাধানাথ	১৫ মিনিট ২৭ সেকেন্ড
৪.৭.১৮	৯ মে ২০১৮, রাধানাথ সিনেমা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	অজিত নন্দী	বুকিং ক্ল্যার্ক, রাধানাথ	১৬ মিনিট ১৮ সেকেন্ড
৪.৭.১৯	৯ মে ২০১৮, রাধানাথ সিনেমা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	বশির মিয়া	গেইটম্যান, রাধানাথ	১৪ মিনিট ১১ সেকেন্ড
৪.৭.২০	১০ মে ২০১৮, ভিক্টোরিয়া সিনেমা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	অসেন দাশ	বুকিং ক্ল্যার্ক, ভিক্টোরিয়া	১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড
৪.৭.২১	১০ মে ২০১৮, ভিক্টোরিয়া সিনেমা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	রঞ্জু	পান দোকানি, ভিক্টোরিয়া	১৫ মিনিট ২৮ সেকেন্ড
৪.৭.২২	১০ মে ২০১৮, ভিক্টোরিয়া সিনেমা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	মঞ্জু চৌহান	গেইটম্যান, ভিক্টোরিয়া	১১ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড
৪.৭.২৩	১০ মে ২০১৮, ভিক্টোরিয়া সিনেমা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	আল আমিন	অপারেটর. ভিক্টোরিয়া	১৩ মিনিট ০৬ সেকেন্ড
৪.৭.২৪	১০ মে ২০১৮, ভিক্টোরিয়া সিনেমা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	জয়নাল	সাবেক অপারেটর ভিক্টোরিয়া, বর্তমানে রিকশা চালক	১৪ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড
৪.৭.২৫	১০ মে ২০১৮, ভিক্টোরিয়া সিনেমা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	গোপেন্দ্র কুমার দাশ	মালিক, ভিক্টোরিয়া	৩০ মিনিট ১৪ সেকেন্ড
৪.৭.২৬	১০ মে ২০১৮, ভিক্টোরিয়া সিনেমা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	নারায়ণ দত্ত	সামনের দোকানি, ভিক্টোরিয়া	১২ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড

সারণী ৪.৮ : সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৮ : ময়মনসিংহ-নেত্রকোণা

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয়	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৮.১	১০, ১১, ১২ জুলাই ২০১৭, পূরবী, ময়মনসিংহ	কাজী দেলওয়ার হোসেন	ব্যবস্থাপক, পূরবী	৩০ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড
৪.৮.২	১১ জুলাই ২০১৭, ছায়াবাণী, ময়মনসিংহ	স্বপন কুমার দে	গেইটম্যান, ছায়াবাণী	১৩ মিনিট ০৯ সেকেন্ড
৪.৮.৩	১১ জুলাই ২০১৭, ছায়াবাণী, ময়মনসিংহ	মো. সুমন	অপারেটর, ছায়াবাণী	০৯ মিনিট ০৪ সেকেন্ড
৪.৮.৪	১১ জুলাই ২০১৭, ছায়াবাণী, ময়মনসিংহ	বিপ্লব হোসেন	প্রতিনিধি, ছায়াবাণী	১২ মিনিট ০৪ সেকেন্ড
৪.৮.৫	১১ জুলাই ২০১৭, ছায়াবাণী, ময়মনসিংহ	বদিউল আলম চৌধুরী মামুন	মালিক, ছায়াবাণী	২৩ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড
৪.৮.৬	১১ জুলাই ২০১৭, ছায়াবাণী, ময়মনসিংহ	গৌরি চৌহান	নারী কর্মী, ছায়াবাণী	১০ মিনিট ৫২ সেকেন্ড
৪.৮.৭	১১ জুলাই ২০১৭, ছায়াবাণী, ময়মনসিংহ	দীপক বসাক	নৈশ্যপ্রহরী, ছায়াবাণী	১৫ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড
৪.৮.৮	১১ জুলাই ২০১৭, ছায়াবাণী, ময়মনসিংহ	ইসমাঈল আলী	গেইটম্যান, ছায়াবাণী	১০ মিনিট ২৮ সেকেন্ড
৪.৮.৯	১১ জুলাই ২০১৭, পূরবী, ময়মনসিংহ	আবুল মনসুর	ডি সি'র গেইটম্যান, পূরবী	১০ মিনিট ০৮ সেকেন্ড
৪.৮.১০	১১ জুলাই ২০১৭, পূরবী, ময়মনসিংহ	মো. রবি	বুকিং ক্ল্যার্ক, পূরবী	১৪ মিনিট ২৯ সেকেন্ড
৪.৮.১১	১১ জুলাই ২০১৭, পূরবী, ময়মনসিংহ	রাজু আহমেদ	গেইটম্যান, পূরবী	১৫ মিনিট ১৯ সেকেন্ড
৪.৮.১২	১১ জুলাই ২০১৭, পূরবী, ময়মনসিংহ	আলম	টিকিট কালোবাজারি, পূরবী	১১ মিনিট ১৭ সেকেন্ড
৪.৮.১৩	১১ জুলাই ২০১৭, পূরবী, ময়মনসিংহ	নুরজাহান বেগম	দর্শক, পূরবী	১৩ মিনিট ২৩ সেকেন্ড
৪.৮.১৪	১১ জুলাই ২০১৭, পূরবী, ময়মনসিংহ	এনামুল হক	দর্শক, পূরবী	১৪ মিনিট ২৮ সেকেন্ড
৪.৮.১৫	১১ জুলাই ২০১৭, পূরবী, ময়মনসিংহ	মো. শহীদ	প্রেক্ষাগৃহের সামনের দোকানি, পূরবী	১৫ মিনিট ১৮ সেকেন্ড
৪.৮.১৬	১১ জুলাই ২০১৭, ছায়াবাণী, ময়মনসিংহ	অলক চন্দ্র দে	প্রেক্ষাগৃহের সামনের বাদাম-বুট- ছোলা বিক্রেতা, ছায়াবাণী	১৪ মিনিট ২৮ সেকেন্ড
৪.৮.১৭	১১ জুলাই ২০১৭, ছায়াবাণী, ময়মনসিংহ	রণজিৎ চন্দ্র দে	প্রেক্ষাগৃহের সামনের চটপটি বিক্রেতা, ছায়াবাণী	০৮ মিনিট ১৪ সেকেন্ড
৪.৮.১৮	১২ জুলাই ২০১৭, পূরবী, ময়মনসিংহ	অজয় কুমার	প্রেক্ষাগৃহের সামনের দোকানি, পূরবী	১৩ মিনিট ২৭ সেকেন্ড
৪.৮.১৯	১২ জুলাই ২০১৭, পূরবী, ময়মনসিংহ	ইউসুফ	প্রেক্ষাগৃহের সামনের হোটেলের কারিগর, পূরবী	১৬ মিনিট ২৮ সেকেন্ড
৪.৮.২০	১২ জুলাই ২০১৭, পূরবী, ময়মনসিংহ	স্বপন মিয়া	বুকিং ক্ল্যার্ক, পূরবী	১৩ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড
৪.৮.২১	১২ জুলাই ২০১৭, ছায়াবাণী, ময়মনসিংহ	সাখাওয়াত আলী শিবলী	দর্শক, ছায়াবাণী	১৫ মিনিট ০৯ সেকেন্ড
৪.৮.২২	১২ জুলাই ২০১৭, ছায়াবাণী, ময়মনসিংহ	নিধিরঞ্জন সরকার	গেইটম্যান, ছায়াবাণী	১৪ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড

আখ্যানের ক্রম	এথনোগ্রাফিক সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয়	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৪.৮.২৩	১২ জুলাই ২০১৭, ছায়াবাণী, ময়মনসিংহ	সুশান্ত কুমার চৌধুরী	ভেঙে ফেলা প্রেক্ষাগৃহ অলকার মালিক	১৩ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড
৪.৮.২৪	১৩ জুলাই ২০১৭, হিরামন, নেত্রকোণা	পরিতোষ সাহা রায়	ব্যবস্থাপক, হিরামন	১৯ মিনিট ২৮ সেকেন্ড
৪.৮.২৫	১৩ জুলাই ২০১৭, হিরামন, নেত্রকোণা	শেখ ফকরুল হাসান	কর্মচারী, হিরামন	০৯ মিনিট ১৮ সেকেন্ড
৪.৮.২৬	১৩ জুলাই ২০১৭, হিরামন, নেত্রকোণা	আ. খালেক	গেইটম্যান, হিরামন	০৮ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড
৪.৮.২৭	১৩ জুলাই ২০১৭, হিরামন, নেত্রকোণা	জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী	সুপারভাইজার, হিরামন	১১ মিনিট ২১ সেকেন্ড
৪.৮.২৮	১৩ জুলাই ২০১৭, হিরামন, নেত্রকোণা	গোপাল রায়	গেইটম্যান, হিরামন	০৮ মিনিট ০৯ সেকেন্ড
৪.৮.২৯	১৩ জুলাই ২০১৭, হিরামন, নেত্রকোণা	সৈয়দ হোসেন	দোকানি, হিরামন	১৬ মিনিট ২৮ সেকেন্ড
৪.৮.৩০	১৩ জুলাই ২০১৭, হিরামন, নেত্রকোণা	নুরুল ইসলাম	দোকানি, হিরামন	১৩ মিনিট ১৮ সেকেন্ড
৪.৮.৩১	১৩ জুলাই ২০১৭, হিরামন, নেত্রকোণা	বাচ্চু মিয়া	গেইটম্যান, হিরামন	১৫ মিনিট ০৯ সেকেন্ড
৪.৮.৩২	১৩ জুলাই ২০১৭, হিরামন, নেত্রকোণা	অজয় সরকার	জেনারেল ম্যানেজার, হিরামন	১২ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড
৪.৮.৩৩	১৩ জুলাই ২০১৭, হিরামন, নেত্রকোণা	আ. গণি	দর্শক, হিরামন	১৩ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড

নির্ঘণ্ট ৫

নিবিড় সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা ও পরিচয়

অ্যাখ্যানের ক্রম	নিবিড় সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান	সাক্ষাৎকারদাতার নাম	পরিচয় ও পেশা	সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি
৫.১	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সকাল ১০টা নিউ ইস্কাটন, ঢাকা	কাজী হায়াৎ	নির্মাতা, প্রযোজক ও অভিনয়শিল্পী	এক ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড
৫.২	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিকেল তিনটা বারিধারা, ঢাকা	কামার আহমাদ সাইমন	নির্মাতা	এক ঘণ্টা চার মিনিট ৩২ সেকেন্ড
৫.৩	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সন্ধ্যা ছয়টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা	জাকির হোসেন রাজু	চলচ্চিত্র গবেষক ও নির্মাতা	এক ঘণ্টা ছয় মিনিট ৪৬ সেকেন্ড
৫.৪	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সকাল ১০টা প্রযোজক সমিতি কার্যালয় এফ ডি সি, ঢাকা	দেলোয়ার জাহান ঝন্টু	নির্মাতা, প্রযোজক ও কাহিনিকার	৪০ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড
৫.৫	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সন্ধ্যা ছয়টা পরিচালক সমিতি কার্যালয় এফ ডি সি, ঢাকা	সোহানুর রহমান সোহান	নির্মাতা ও প্রযোজক	৪৬ মিনিট ২৩ সেকেন্ড
৫.৬	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সকাল ১০টা আদাবর, মোহাম্মদপুর ঢাকা	অধ্যাপক ড. মানস চৌধুরী	শিক্ষক, চিন্তক, লেখক ও অভিনয়শিল্পী	দুই ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড

নির্ঘণ্ট ৬

আখ্যানের দর্শক স্মৃতিতে থাকা চলচ্চিত্র ও তার প্রাবল্য

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম ও মুক্তির দশক	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
		৬০ এর দশক		
১.	চান্দা	৪	১৯৬২	এহতেশাম
২.	জোয়ার এলো	১	১৯৬২	আব্দুল জব্বার খান
৩.	সূর্যস্নান	১	১৯৬২	সালাহউদ্দিন
৪.	তালাশ	৪	১৯৬৩	মুস্তাফিজ
৫.	সুতরাং	৪	১৯৬৪	সুভাষ দত্ত
৬.	সঙ্গম	১	১৯৬৪	জহির রায়হান
৭.	রূপবান	১০	১৯৬৫	সালাউদ্দিন
৮.	বেহুলা	৫	১৯৬৬	জহির রায়হান
৯.	ডাকবাবু	১	১৯৬৬	মুস্তাফিজ
১০.	কাগজের নৌকা	২	১৯৬৬	সুভাষ দত্ত
১১.	আয়না ও অবশিষ্ট	১	১৯৬৭	সুভাষ দত্ত
১২.	চকোরি	১	১৯৬৭	এহতেশাম
১৩.	কাঞ্চনমালা	১	১৯৬৭	সফদার আলী ভূঁইয়া
১৪.	দুই ভাই	১	১৯৬৭	আমজাদ হোসেন নুরুল হক, মুস্তাফিজ প্রমুখ
১৫.	নয়নতারা	২	১৯৬৭	কাজী জহির
১৬.	আবির্ভাব	২	১৯৬৮	সুভাষ দত্ত
১৭.	এতটুকু আশা	৯	১৯৬৮	মিতা
১৮.	সাত ভাই চম্পা	৩	১৯৬৮	খান আতাউর রহমান
১৯.	রাখালবন্ধু	৫	১৯৬৮	ইবনে মিজান
২০.	নীল আকাশের নীচে	৮	১৯৬৯	মিতা
২১.	ময়নামতি	৮	১৯৬৯	কাজী জহির
২২.	জোয়ারভাটা	১	১৯৬৯	খান আতাউর রহমান
		৭০ এর দশক		
২৩.	দর্পচূর্ণ	৫	১৯৭০	নজরুল ইসলাম
২৪.	দ্বীপ নেভে না	১	১৯৭০	মিতা
২৫.	জীবন থেকে নেয়া	৩	১৯৭০	জহির রায়হান
২৬.	পিচ ঢালা পথ	২	১৯৭০	এহতেশাম
২৭.	ক খ গ ঘ ঙ	৩	১৯৭০	মিতা
২৮.	মধুমিলন	৪	১৯৭০	কাজী জহির
২৯.	নাচের পুতুল	১	১৯৭১	অশোক ঘোষ
৩০.	স্বরলিপি	২	১৯৭১	নজরুল ইসলাম

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম ও মুক্তির দশক	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
৩১.	ওরা ১১ জন	৪	১৯৭২	চাষী নজরুল ইসলাম
৩২.	অশ্রু দিয়ে লেখা	২	১৯৭২	কামাল আহমেদ
৩৩.	অবুঝ মন	২৯	১৯৭২	কাজী জহির
৩৪.	বাঘা বাঙ্গালী	১	১৯৭২	আনন্দ
৩৫.	রংবাজ	১০	১৯৭৩	জহিরুল হক
৩৬.	আবার তোরা মানুষ হ	১	১৯৭৩	খান আতাউর রহমান
৩৭.	ঝড়ের পাখি	২	১৯৭৩	জামান
৩৮.	দস্যুরানী	১	১৯৭৩	সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া
৩৯.	অবাক পৃথিবী	৬	১৯৭৪	মুস্তফা মেহমুদ
৪০.	জিঘাংসা	৩	১৯৭৪	ইবনে মিজান
৪১.	আলোর মিছিল	২	১৯৭৪	মিতা
৪২.	বেঈমান	৫	১৯৭৪	রুহুল আমিন
৪৩.	ডাকু মনসুর	৫	১৯৭৪	ইবনে খসরু নোমান
৪৪.	এপার ওপার	১	১৯৭৫	মাসুদ পারভেজ
৪৫.	সুজনসখি	২	১৯৭৫	প্রমোদকর
৪৬.	দুই রাজকুমার	১	১৯৭৫	ইবনে মিজান
৪৭.	বাহাদুর	৭	১৯৭৬	ইবনে মিজান
৪৮.	আগুন	১	১৯৭৬	মোহসীন
৪৯.	দ্য রেইন	৪	১৯৭৬	এস এম সফী
৫০.	একমুঠো ভাত	১	১৯৭৬	ইবনে মিজান
৫১.	নয়নমণি	২	১৯৭৬	আমজাদ হোসেন
৫২.	সূর্যকন্যা	১	১৯৭৬	আলমগীর কবির
৫৩.	সমাধি	৩	১৯৭৬	দিলীপ বিশ্বাস
৫৪.	জীবন সাথী	১	১৯৭৬	নূরুল হক বাচ্চু
৫৫.	গুন্ডা	১	১৯৭৬	আলমগীর কুমকুম
৫৬.	দোস্ত দুশমন	১১	১৯৭৭	দেওয়ান নজরুল
৫৭.	কুয়াশা	১	১৯৭৭	আজিজুর রহমান
৫৮.	সীমানা পেরিয়ে	২	১৯৭৭	আলমগীর কবির
৫৯.	বসুন্ধরা	১	১৯৭৭	সুভাষ দত্ত
৬০.	মতিমহল	৫	১৯৭৭	অশোক ঘোষ
৬১.	নিশান	৫	১৯৭৭	ইবনে মিজান
৬২.	বধূবিদায়	৯	১৯৭৮	কাজী জহির
৬৩.	গোলাপী এখন ট্রেনে	৩	১৯৭৮	আমজাদ হোসেন
৬৪.	রাজদুলারী	৪	১৯৭৮	শফি বিক্রমপুরী
৬৫.	তুফান	২	১৯৭৮	অশোক ঘোষ
৬৬.	ডুমুরের ফুল	১	১৯৭৮	সুভাষ দত্ত
৬৭.	বন্ধু	৩	১৯৭৮	দিলীপ বিশ্বাস

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম ও মুক্তির দশক	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
৬৮.	সারেং বউ	২	১৯৭৮	আবদুল্লাহ আল মামুন
৬৯.	আসামী	৪	১৯৭৮	দিলীপ বিশ্বাস
৭০.	ঈমান	৩	১৯৭৯	মমতাজ আলী
৭১.	বারুদ	১	১৯৭৯	দেওয়ান নজরুল
৭২.	মাটির ঘর	৩	১৯৭৯	আজিজুর রহমান
৭৩.	রুপালী সৈকত	১	১৯৭৯	আলমগীর কবির
৭৪.	বুলবুল ই বাগদাদ	১	১৯৭৯	এফ কবীর চৌধুরী
৭৫.	শীষনাগ	১	১৯৭৯	এফ কবীর চৌধুরী
৭৬.	নাগ-নাগিনী	১	১৯৭৯	ইবনে মিজান
৮০'র দশক				
৭৭.	কথা দিলাম	৫	১৯৮০	আকবর কবীর পিন্টু
৭৮.	নাগিন	১	১৯৮০	শেখ নজরুল ইসলাম
৭৯.	বৌরাণী	৩	১৯৮০	সাইফুল আজম কাশেম
৮০.	এতিম	২	১৯৮০	শেখ নজরুল ইসলাম
৮১.	কসাই	৩	১৯৮০	আমজাদ হোসেন
৮২.	ছুটির ঘণ্টা	১২	১৯৮০	আজিজুর রহমান
৮৩.	যাদুনগর	১	১৯৮০	মাসুদ পারভেজ
৮৪.	রাজনন্দিনী	২	১৯৮০	এফ কবীর চৌধুরী
৮৫.	ভাই ভাই	১	১৯৮০	স্বপন সাহা
৮৬.	লুটেরা	১	১৯৮০	ফখরুল হাসান বৈরাগী
৮৭.	গায়ের ছেলে	১	১৯৮০	আকবর কবীর পিন্টু
৮৮.	আলিফ লায়লা	১	১৯৮০	এফ কবীর চৌধুরী
৮৯.	এখনই সময়	১	১৯৮০	আবদুল্লাহ আল মামুন
৯০.	শাহাজাদা গুলবাহার	১	১৯৮০	শহীদুল আমিন
৯১.	ছক্কা পাঞ্জা	১	১৯৮০	নূর হোসেন বলাই
৯২.	আল্লাহ মেহেরবান	১	১৯৮১	মহসিন
৯৩.	বিনি সুতার মালা	১	১৯৮১	ফখরুল হাসান বৈরাগী
৯৪.	দুই পয়সার আলতা	২	১৯৮২	আমজাদ হোসেন
৯৫.	সওদাগর	১	১৯৮২	এফ কবীর চৌধুরী
৯৬.	সবুজ সাথী	৪	১৯৮২	সুভাষ দত্ত
৯৭.	আল হেলাল	২	১৯৮২	দেলওয়ার জাহান ঝন্টু
৯৮.	রাজসিংহাসন	১	১৯৮২	এফ কবীর চৌধুরী
৯৯.	তাসের ঘর	২	১৯৮২	মিতা
১০০.	নালিশ	২	১৯৮২	মমতাজ আলী
১০১.	রজনীগন্ধা	১	১৯৮২	কামাল আহমেদ
১০২.	মান সম্মান	১	১৯৮৩	এ জে মিন্টু
১০৩.	লাইলী মজনু	২	১৯৮৩	ইবনে মিজান

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম ও মুক্তির দশক	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
১০৪.	বদনাম	১	১৯৮৩	রাজ্জাক
১০৫.	গলি থেকে রাজপথ	১	১৯৮৩	শামসুদ্দীন টগর
১০৬.	প্রতিহিংসা	১	১৯৮৩	এ জে মিন্টু
১০৭.	জনি	১	১৯৮৩	দেওয়ান নজরুল
১০৮.	আবে হায়াত	২	১৯৮৩	এফ কবীর চৌধুরী
১০৯.	হাসু আমার হাসু	১	১৯৮৩	এইচ আকবর
১১০.	প্রাণসজণী	১	১৯৮৩	জহিরুল হক
১১১.	লালু ভুলু	১	১৯৮৩	কামাল আহমেদ
১১২.	ভাত দে	৭	১৯৮৪	আমজাদ হোসেন
১১৩.	নসীব	১৩	১৯৮৪	মমতাজ আলী
১১৪.	সকাল সন্ধ্যা	১	১৯৮৪	সুভাষ দত্ত
১১৫.	চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা	৩	১৯৮৪	ইবনে মিজান
১১৬.	মান অভিমান	১	১৯৮৪	নারায়ণ ঘোষ মিতা
১১৭.	নয়নের আলো	১	১৯৮৪	বেলাল আহমেদ
১১৮.	রসের বাঈদানী	১	১৯৮৪	সফদর আলী ভূঁইয়া
১১৯.	অবিচার	১	১৯৮৫	শক্তি সামন্ত ও সৈয়দ হাসান ইমাম
১২০.	রাধাকৃষ্ণ	১	১৯৮৫	মতিন রহমান
১২১.	ঝিনুক মালা	৩	১৯৮৫	আবদুস সাত্তার খোকন
১২২.	সোনাবউ	১	১৯৮৫	দিলীপ সোম
১২৩.	দহন	১	১৯৮৫	শেখ নিয়ামত আলী
১২৪.	অন্যায়	১	১৯৮৫	এ জে মিন্টু
১২৫.	রাই বিনোদিনী	১	১৯৮৫	মহম্মদ হাননান
১২৬.	চোর	১	১৯৮৫	গাজী মাজহারুল আনোয়ার
১২৭.	আক্রোশ	১	১৯৮৬	মোতালেব হোসেন
১২৮.	পুষ্পমালা	১	১৯৮৬	মোস্তফা আনোয়ার
১২৯.	লড়াকু	১	১৯৮৬	শহিদুল ইসলাম খোকন
১৩০.	নিষ্পাপ	২	১৯৮৬	আলমগীর
১৩১.	ওগো বিদেশীনি	১	১৯৮৬	আকবর কবীর পিন্টু
১৩২.	উসিলা	১	১৯৮৬	মমতাজ আলী
১৩৩.	সারেন্ডার	৩	১৯৮৭	জহিরুল হক
১৩৪.	দেশ বিদেশ	১	১৯৮৭	আজিজুর রহমান বুলি
১৩৫.	স্বামী স্ত্রী	২	১৯৮৭	সুভাষ দত্ত
১৩৬.	দায়ী কে	২	১৯৮৭	আফতাব খান টুলু
১৩৭.	নিয়ত	২	১৯৮৭	মমতাজ আলী
১৩৮.	লালু মাস্তান	১	১৯৮৭	এ জে মিন্টু
১৩৯.	হারানো সুর	২	১৯৮৭	নারায়ণ ঘোষ মিতা

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম ও মুক্তির দশক	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
১৪০.	অপেক্ষা	৬	১৯৮৭	দিলীপ বিশ্বাস
১৪১.	বিরাজ বউ	১	১৯৮৮	মহিউদ্দীন ফারুক
১৪২.	তোলপাড়	১	১৯৮৮	কবীর আনোয়ার
১৪৩.	আলী বাবা চল্লিশ চোর	১	১৯৮৮	আজিজুর রহমান
১৪৪.	দুই জীবন	২	১৯৮৮	আবদুল্লাহ আল মামুন
১৪৫.	ভেজা চোখ	৭	১৯৮৮	শিবলি সাদিক
১৪৬.	নীতিবান	২	১৯৮৮	শিবলী সাদিক
১৪৭.	বিরোধ	১	১৯৮৮	প্রমোদ চক্রবর্তী
১৪৮.	বেদের মেয়ে জোস্‌না	৩২	১৯৮৯	তোজাম্মেল হক বকুল
১৪৯.	ভাইজান	১	১৯৮৯	রায়হান মুজিব
১৫০.	কালা খুন	১	১৯৮৯	দারাশিকো
১৫১.	মাস্টার সামুরাই	১	১৯৮৯	আল মাসুদ
১৫২.	সত্য মিথ্যা	৩	১৯৮৯	এ জে মিন্টু
১৫৩.	রাঙাভাবী	৩	১৯৮৯	মতিন রহমান
১৫৪.	সত্য মিথ্যা	২	১৯৮৯	এ জে মিন্টু
১৫৫.	সোনার নাও পবনের বৈঠা	১	১৯৮৯	আলমগীর কুমকুম
৯০-এর দশক				
১৫৬.	শিমুল পারুল	১	১৯৯০	দেলোয়ার জাহান ঝন্টু
১৫৭.	দোলনা	১	১৯৯০	শিবলী সাদিক
১৫৮.	বাদশা ভাই	১	১৯৯১	দারাশিকো
১৫৯.	ন্যায় অন্যায়	১	১৯৯১	এ জে মিন্টু
১৬০.	চাঁদনী	২	১৯৯১	এহতেশাম
১৬১.	মধু মালা মদনকুমার	১	১৯৯১	সাইদুর রহমান সাইদ
১৬২.	পিতা মাতা সন্তান	৪	১৯৯১	এ জে মিন্টু
১৬৩.	অকৃতজ্ঞ	১	১৯৯১	শাহাদত খান
১৬৪.	মালেকা বানু	১	১৯৯১	কামরুজ্জামান
১৬৫.	কাসেম মালার প্রেম	২	১৯৯১	মোস্তফা আনোয়ার
১৬৬.	কাজের বেটি রহিমা	১	১৯৯১	রায়হান মুজিব
১৬৭.	নিঃস্বার্থ	১	১৯৯১	দেলোয়ার জাহান ঝন্টু
১৬৮.	রুবেল আমার নাম	১	১৯৯১	আমেদ সাত্তার
১৬৯.	দাঙ্গা	৭	১৯৯২	কাজী হায়াৎ
১৬৯.	গাড়িয়াল ভাই	২	১৯৯২	তোজাম্মেল হক বকুল
১৭০.	মাটির কসম	১	১৯৯২	শিবলী সাদিক
১৭১.	বেনাম বাদশা	২	১৯৯২	সোহানুর রহমান সোহান
১৭২.	ত্রাস	১	১৯৯২	কাজী হায়াৎ
১৭৩.	আজকের হাঙ্গামা	১	১৯৯২	মোহাম্মদ হোসেন
১৭৪.	টাকার অহংকার	১	১৯৯৩	হাফিজ উদ্দিন

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম ও মুক্তির দশক	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
১৭৫.	পাগল মন	১	১৯৯৩	তোজাম্মেল হক বকুল
১৭৬.	বাংলার বধূ	৯	১৯৯৩	এ জে মিন্টু
১৭৭.	নয়া লায়লা নয়া মজনু	১	১৯৯৩	হোসেইন আনোয়ার
১৭৮.	প্রেম দিওয়ানা	১	১৯৯৩	মনতাজুর রহমান আকবর
১৭৯.	কেয়ামত থেকে কেয়ামত	১১	১৯৯৩	সোহানুর রহমান সোহান
১৮০.	হিংসা	১	১৯৯৩	মোতালেব হোসেন
১৮১.	আগুনের পরশমণি	১	১৯৯৪	হুমায়ূন আহমেদ
১৮২.	কালিয়া	১	১৯৯৪	দেওয়ান নজরুল
১৮৩.	রঙ্গীন সুজনসখী	১	১৯৯৪	শাহ আলম কিরণ
১৮৪.	সিপাহী	২	১৯৯৪	কাজী হায়াৎ
১৮৫.	আখেরী রাস্তা	১	১৯৯৪	সোহানুর রহমান সোহান
১৮৬.	বিদ্রোহী বধূ	১	১৯৯৪	ইস্পাহানী আরিফ জাহান
১৮৭.	অন্তরে অন্তরে	১	১৯৯৪	শিবলী সাদিক
১৮৮.	দেনমোহর	৩	১৯৯৫	শফি বিক্রমপুরী
১৮৯.	সত্যের মৃত্যু নাই	৭	১৯৯৫	ছটকু আহমেদ
১৯০.	বাংলার নায়ক	১	১৯৯৫	দেওয়ান নজরুল
১৯১.	স্বপ্নের ঠিকানা	৪	১৯৯৫	আবদুল খালেক
১৯২.	তোমাকে চাই	৮	১৯৯৬	মতিন রহমান
১৯৩.	স্বপ্নের পৃথিবী	১	১৯৯৬	বাদল খন্দকার
১৯৪.	বিদ্রোহী কন্যা	১	১৯৯৬	সোহানুর রহমান সোহান
১৯৫.	খলনায়ক	১	১৯৯৬	মনতাজুর রহমান আকবর
১৯৬.	সৈনিক	১	১৯৯৬	এহতেশাম
১৯৭.	জীবন সংসার	৩	১৯৯৬	জাকির হোসেন রাজু
১৯৮.	বিচার হবে	১	১৯৯৬	শাহ আলম কিরণ
১৯৯.	মায়ের অধিকার	১	১৯৯৬	শিবলী সাদিক
২০০.	স্বজন	১	১৯৯৬	সোহানুর রহমান সোহান
২০১.	স্বামী কেন আসামী	১	১৯৯৭	মনোয়ার খোকন
২০২.	প্রাণের চেয়ে প্রিয়	১	১৯৯৭	মোহাম্মদ হান্নান
২০৩.	বাবা কেন চাকর	২	১৯৯৭	রাজ্জাক
২০৪.	দেশদ্রোহী	১	১৯৯৭	কাজী হায়াৎ
২০৫.	কুলি	২	১৯৯৭	মনতাজুর রহমান আকবর
২০৬.	কমলার বনবাস	২	১৯৯৭	ফিরোজ আল মামুন
২০৭.	লুটতরাজ	৩	১৯৯৭	কাজী হায়াৎ
২০৮.	মেয়েরাও মানুষ	১	১৯৯৮	মনোয়ার খোকন
২০৯.	তেজী	২	১৯৯৮	কাজী হায়াৎ
২১০.	মধুরমিলন	২	১৯৯৮	বাদল খন্দকার
২১১.	ভালোবাসার ঘর	১	১৯৯৮	মোতালেব হোসেন

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম ও মুক্তির দশক	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
২১২.	গরীবের বিচার নাই	১	১৯৯৮	তোজাম্মেল হক বকুল
২১৩.	আম্মাজান	১১	১৯৯৯	কাজী হায়াৎ
২১৪.	ধর	২	১৯৯৯	কাজী হায়াৎ
২১৫.	বিয়ের ফুল	১	১৯৯৯	মতিন রহমান
২১৬.	ভালোবাসি তোমাকে	১	১৯৯৯	মহম্মদ হান্নান
২১৭.	রাজা	১	১৯৯৯	মালেক আফসারী
শূন্য দশক				
২১৮	বর্তমান	৬	২০০০	কাজী হায়াৎ
২১৯.	নারীর মন	১	২০০০	মতিন রহমান
২২০.	কষ্ট	১	২০০০	কাজী হায়াৎ
২২১.	সুলতান	১	২০০১	এফ আই মানিক
২২২.	শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ	১	২০০১	দেবাশীষ বিশ্বাস
২২৩.	মাটির ফুল	২	২০০২	মতিন রহমান
২২৪.	ধ্বংস	১	২০০২	বদিউল আলম খোকন
২২৫.	মাস্তানের ওপর মাস্তান	১	২০০২	মনতাজুর রহমান আকবর
২২৬.	মনের মাঝে তুমি	১	২০০২	মতিউর রহমান পানু
২২৭.	ফায়ার	২	২০০২	মহম্মদ হোসেন
২২৮.	স্বামী-স্ত্রীর যুদ্ধ	১	২০০২	এফ আই মানিক
২২৯.	ভাইয়া	১	২০০২	এফ আই মানিক
২৩০.	বউ শাশুড়ির যুদ্ধ	১	২০০৩	আজাদী হাসনাত ফিরোজ
২৩১.	নসিমন	১	২০০৩	আলী আজাদ
২৩২.	খায়রুন সুন্দরী	৪	২০০৪	এ কে সোহেল
২৩৩.	নিষিদ্ধ নারী (অশ্লীলতার কোনো সংজ্ঞা নেই! নগ্নতাই অশ্লীলতা নয়!)	১	২০০৪	মোহাম্মদ হোসেন
২৩৪.	রং নাম্বার	১	২০০৫	মতিন রহমান
২৩৫.	আমি জেল থেকে বলছি	১	২০০৫	মালেক আফসারী
২৩৬.	কাবুলিওয়ালা	১	২০০৬	কাজী হায়াৎ
২৩৭.	মাথা নষ্ট	১	২০০৬	সাফি ইকবাল
২৩৮.	চাচ্চু	৬	২০০৬	এফ আই মানিক
২৩৯.	পিতার আসন	১	২০০৬	এফ আই মানিক
২৪০.	কোটি টাকার কাবিন	৯	২০০৬	এফ আই মানিক
২৪১.	দাদীমা	৪	২০০৬	এফ আই মানিক
২৪২.	মা আমার স্বর্গ	২	২০০৭	জাকির হোসেন রাজু
২৪৩.	আমার প্রাণের স্বামী	১	২০০৭	পি এ কাজল
২৪৪.	শান্ত কেন মাস্তান	২	২০০৭	সালাউদ্দিন
২৪৫.	প্রিয়া আমার প্রিয়া	৫	২০০৮	বদিউল আলম খোকন
২৪৬.	তুমি স্বপ্ন তুমি সাধনা	১	২০০৮	শাহাদৎ হোসেন লিটন

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম ও মুক্তির দশক	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
২৪৭.	এক টাকার বউ	১	২০০৮	পি এ কাজল
২৪৮.	মনপুরা	২৭	২০০৯	গিয়াসউদ্দিন সেলিম
২৪৯.	গরীবের ছেলে বড়লোকের মেয়ে	১	২০০৯	আহমেদ নাসির
২৫০.	মা বড় না বউ বড়ো	১	২০০৯	শেখ নজরুল ইসলাম
২৫১.	থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার	২	২০০৯	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
২৫২.	ভালোবাসা দিবি কিনা বল	১	২০০৯	উত্তম আকাশ
২৫৩.	সাহেব নামের গোলাম	১	২০০৯	রাজু চৌধুরী
	২০১০ এর দশক			
২৫৪.	মনের মানুষ	১	২০১০	গৌতম ঘোষ
২৫৫.	ভালোবাসলে ঘর বাধা যায় না	৪	২০১০	জাকির হোসেন রাজু
২৫৬.	চাচ্চু আমার চাচ্চু	১	২০১০	পি এ কাজল
২৫৭.	নষ্ট জীবন	১	২০১০	রাকিবুল আলম রাকিব
২৫৮.	মনের জ্বালা	২	২০১০	মালেক আফসারী
২৫৯.	গহীনে শব্দ	১	২০১০	খালিদ মাহমুদ মিঠু
২৬০.	হায় প্রেম হায় ভালোবাসা	১	২০১০	নজরুল ইসলাম খান
২৬১.	নাম্বার ওয়ান শাকিব খান	১	২০১০	নাম্বার ওয়ান শাকিব খান
২৬২.	মাটির ঠিকানা	১	২০১১	শাহ আলম কিরণ
২৬৩.	এক মন এক প্রাণ	১	২০১১	সোহানুর রহমান সোহান
২৬৪.	মনের ঘরে বসত করে	১	২০১১	জাকির হোসেন রাজু
২৬৫.	একবার বলো ভালোবাসি	২	২০১১	বদিউল আলম খোকন
২৬৬.	ভালোবাসার রঙ	৪	২০১২	শাহিন-সুমন
২৬৭.	লালটিপ	১	২০১২	স্বপন আহমেদ
২৬৮.	খোদার পরে মা	১	২০১২	শাহিন-সুমন
২৬৯.	পিঁপড়াবিদ্যা	১	২০১২	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
২৭০.	পোড়ামন	৬	২০১৩	জাকির হোসেন রাজু
২৭১.	মাই নেম ইজ খান	১	২০১৩	বদিউল আলম খোকন
২৭২.	টেলিভিশন	১	২০১৩	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
২৭৩.	আমি শুধু চেয়েছি তোমায়	৭	২০১৪	অশোক পাতি ও অনন্য মামুন
২৭৪.	হিরো দ্য সুপার স্টার	১	২০১৪	বদিউল আলম খোকন
২৭৫.	শুনতে কী পাও	১	২০১৪	কামার আহমাদ সাইমন
২৭৬.	অনেক সাধের ময়না	১	২০১৪	জাকির হোসেন রাজু
২৭৭.	দেশা দ্য লিডার	৩	২০১৪	সৈকত নাসির
২৭৮.	অগ্নি	৫	২০১৪	ইফতেখার চৌধুরী
২৭৯.	অগ্নি ২	৫	২০১৫	ইফতেখার চৌধুরী
২৮০.	ছুঁয়ে দিলে মন	৫	২০১৫	শিহাব শাহীন
২৮১.	আশিকী	১	২০১৫	অশোক পাতি ও আবদুল আজিজ

নম্বর	চলচ্চিত্রের নাম ও মুক্তির দশক	দর্শক স্মৃতিতে প্রাবল্য	মুক্তির বছর	পরিচালক
২৮২.	লাভ ম্যারেজ	২	২০১৫	শাহীন সুমন
২৮৩.	ওয়ার্নিং	১	২০১৫	সাফি উদ্দিন সাফি
২৮৪.	জিরো ডিগ্রী	১	২০১৫	অনিমেষ আইচ
২৮৫.	রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট	৬	২০১৫	অশোক পাতি ও আবদুল আজিজ
২৮৬.	ভালোবাসার গল্প	১	২০১৫	অনন্য মামুন
২৮৭.	আরো ভালোবাসবো তোমায়	১	২০১৫	এস এ হক অলিক
২৮৮.	নিয়তি	১	২০১৬	জাকির হোসেন রাজু
২৮৯.	শ্যুটার	১	২০১৬	রাজু চৌধুরী
২৯০.	অনেক দামে কেনা	১	২০১৬	জাকির হোসেন রাজু
২৯১.	শিকারী	২৪	২০১৬	রাজেশ কুমার যাদব ও আবদুল আজিজ
২৯২.	সম্রাট	১	২০১৬	মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ
২৯৩.	আয়নাবাজি	৫৮	২০১৬	অমিতাভ রেজা চৌধুরী
২৯৪.	বাদশা দ্য ডন	২৯	২০১৬	রাজেশ কুমার যাদব ও আবদুল আজিজ
২৯৫.	বসগিরি	৩	২০১৬	শামীম আহমেদ রনি
২৯৬.	অজ্ঞাতনামা	১	২০১৬	তৌকীর আহমেদ
২৯৭.	রানা পাগলা দ্য মেন্টাল	১	২০১৬	শামীম আহমেদ রনি
২৯৮.	সুইটহার্ট	১	২০১৬	ওয়াজেদ আলী সুমন
২৯৯.	নবাব	১৪	২০১৭	জয়দীপ মুখার্জী ও মো. আবদুল আজিজ
৩০০.	রাজনীতি	১	২০১৭	বুলবুল বিশ্বাস
৩০১.	ভুবন মাঝি	২	২০১৭	ফাখরুল আরেফিন খান
৩০২.	প্রেমী ও প্রেমী	১	২০১৭	জাকির হোসেন রাজু
৩০৩.	বস ২	৬	২০১৭	বাবা যাদব ও আবদুল আজিজ
৩০৪.	ঢাকা অ্যাটাক	২১	২০১৭	দীপংকর দীপন
৩০৫.	ডুব	১	২০১৭	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
৩০৬.	স্বপ্নজাল	৩	২০১৮	গিয়াসউদ্দিন সেলিম
৩০৭.	একটি সিনেমার গল্প	১	২০১৮	আলমগীর
৩০৮.	আমি নেতা হব	১	২০১৮	উত্তম আকাশ

নির্ঘণ্ট ৭

একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ন্যারেটিভের নমুনা

সাংস্কৃতিক অঞ্চল ৭ : বরিশাল

মাঠ এলাকা : **বরিশাল সদর ও পটুয়াখালী সদর**

প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা : **বরিশালে একটি; পটুয়াখালীতে একটি**

১০ আগস্ট ২০১৭ রাজশাহী থেকে তুহিন এন্টারপ্রাইজের বাসে যাত্রা শুরু করি সকাল সাতটায়। দীর্ঘ পথ বাসে ভ্রমণ করা একটু কষ্টকরই বটে। বিশেষ করে বসে থাকা। কিন্তু এছাড়া কোনো উপায়ও ছিলো না। মাঝখানে কুষ্টিয়ার বটতৈলে একটা রেস্টুরেন্টে সামান্য বিরতি ছাড়া টানা প্রায় নয় ঘণ্টা ভ্রমণ করে যখন বরিশালে পৌছালাম, তখন পৌনে চারটা। তারপর বাসস্ট্যান্ড থেকে একটা রিকশায় করে আগে থেকে ঠিক করে রাখা আবাসিক হোটেলে চলে আসি। বরিশাল প্রেসক্লাবের পাশেই আমার হোটেল। আর হোটেল থেকে সামান্য দূরত্বে অভিরুচি সিনেমাহল। বর্তমানে টিকে থাকা বরিশালের একমাত্র সিনেমাহল এটি।

হোটেলে পৌঁছে গোসল সেরে বাসা থেকে আনা সকালের নাস্তা রুটি আর আলুভাজি দিয়ে শেষবেলায় দুপুরের খাবার সেরে ফেলি। এরপর সামান্য বিশ্রাম নিয়ে বের হই অভিরুচি'র উদ্দেশে। অভিরুচিতে তখন ৬.৩০–৯টার শোয়ের দর্শক ঢুকছে। অভিরুচি অনেকটা সিনেপ্লেক্সের মতো সিনেমাহল। চারতলা ভবনের নীচতলা জুড়ে খাবার দোকান, কফিশপ ও আরো কয়েকটি শো রুম। দোতলা থেকে সিনেমাহল। দোতলায় 'সুধী-সৌখিন'; তিন তলায় টিকেট কাউন্টার এবং চারতলায় বিলাস। বিলাসের সঙ্গেই রয়েছে সিনেমাহলের ক্যান্টিন। দোতলার সাজসজ্জা দেখে বোঝা যায়, সেখানেও একসময় ক্যান্টিন ছিলো। কিন্তু এখন বন্ধ রয়েছে।

দোতলায় উঠেই দেখি, 'সুধী-সৌখিন' এর গেইটের সামনে স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে জিন্স পরা এক ব্যক্তি বসা। মাথার চুলে কিছুটা পাক ধরেছে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। টুলে বসা ওই ব্যক্তির কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলতে চাই। তিনি জানান, নীচের কফি হাউজে কবির সাহেব নামে একজন আছেন, তার সঙ্গে যেনো আগে কথা বলে আসি। তারপর সিনেমাহলের লোকজন কথা বলবে। তার কথা মতো নীচে নেমে কফি হাউজে গিয়ে কবির সাহেবের দেখা পাই এবং তার সঙ্গে কথা বলি। সজ্জন মানুষ কবির সাহেব জানান, কোনো সমস্যা নেই, আপনি কথা বলতে পারেন। বিদায় নেওয়ার সময় তিনি অবশ্য কফি পানের জন্য বেশ জোরাজুরি করেন। পরে আসবো বলে, ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসি।

এরপর দোতলায় উঠে কথা হয় ওই ব্যক্তির সঙ্গে, কবির সাহেবের কথা শুনে তিনি আশ্বস্ত হন। এবং শো শুরু হলে আমার সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান। এই ফাঁকে আমি তিন ও চার তলা ঘুরে দেখার জন্য উঠি। চার তলায় গিয়ে প্রথমেই কথা হয়, ক্যান্টিনের মালিকের সঙ্গে। তিনি আরো দুই জনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। ওই দুই ব্যক্তি সে সময় অবশ্য ৬.৩০–৯টার শোয়ের দর্শকের টিকেট পরীক্ষা করে বিলাসে ঢুকাচ্ছিলো। আমি কিছু সময় বিলাসের গেইটের সামনে থাকা বেঞ্চে বসে থাকি।

মিনিট দশেকের মধ্যে সিনেমা শুরু হয়। তারপর অরুণ চন্দ্র গোস্বামী নামে একজন গেইটম্যান আমার কাছে এসে কথা বলার আগ্রহ দেখান। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় তার সঙ্গে। অরুণ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই সিনেমাহলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শুরুতে তিনি সিনেমাহলে টিকেট কালোবাজারি করতেন।

অরুণ জানান, তখন এই সিনেমাহলের নাম ছিলো নূর মহল। তারও আগে এটির নাম ছিলো দিপালী। এখন যে ভবনে এই সিনেমাহল সেটা ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। এরপর এর নাম দেওয়া হয় অভিরুচি। মূলত দিপালী সিনেমাহলের মালিক ছিলেন জমিদার জগদীশ বাবু। তার আরেক ভাইয়ের কাকলি নামে বরিশালে সিনেমাহল ছিলো। জগদীশ বাবুর দিপালী সিনেমাহলের ম্যানেজার ছিলেন নুরু মিয়া।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর নুরু মিয়া এই সিনেমাহলটা দখল করে নাম রাখেন নুর মহল। নুরু মিয়া এই সিনেমাহল বেশি দিন দখলে রাখতে পারেননি। পরে এই সিনেমাহল ভেঙে আরেকপক্ষ এর নাম রাখে অভিরুচি। সেই পক্ষের কাছ থেকে বর্তমান মালিক এবায়দুর হক চাঁন মিয়া নিয়ে এখন সিনেমাহল চালাচ্ছে।

অরুণ বলেন, ৮০'র দশকে এই সিনেমাহলে প্রত্যেক সিনেমায় অনেক টাকা করে লাভ হতো। দর্শক ভিড়ের মধ্যে ব্লেড দিয়ে আরেকজনের হাত কেটে টিকেট সংগ্রহ করতো।

সেই দিন শেষ হয়ে গেলো সালমান শাহ মারা যাওয়ার পর থেকে। তারপর আসলো মান্না। মান্নার সিনেমাও বেশ ভালো ব্যবসা করছে। মান্নাও মরে গেলো। এই দুইজন মারা যাওয়ার পর চলচ্চিত্র জগতের যশটা কমে গেলো।

আর এখন তো সব সিনেমা ইন্টারনেটে পাওয়া যায়; তাহলে যুবক ছেলেমেয়েরা সিনেমাহলে কেনো আসবে! পাইরেসি বন্ধ হলেই আবার দর্শক সিনেমাহলে আসবে। পাইরেসি না থাকলে তো মানুষ সিনেমা দেখতে পারবে না। তাকে তখন সিনেমাহলে আসতেই হবে। অরুণের ভাষ্যমতে, 'শাকিব খান বাংলাদেশের সিনেমা শেষ করে ফেলছে। তার সব সিনেমা একঘেয়ামি। আমরা তো টিকেট ছিড়ি; দর্শক সিনেমাহল থেকে বের হয়ে শাকিবের সিনেমা দেখে গালাগালি করে। দর্শক নতুন কাহিনি দেখতে চায়।

সালমান শাহ যখন সিনেমা করছে তখন তার মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা যেমন ছিলো, জীবনের অন্য অনেক বিষয়ও ছিলো। এখন তো খালি প্রেম। তাছাড়া আমাদের দেশে ভালো কোনো নায়ক নাই।

এখন যৌথ প্রযোজনার সিনেমাগুলোতে একটু ব্যবসা হয়। কারণ ওইসব সিনেমায় নাচ-গান, অভিনয়, অ্যাকশন সব দেখে দর্শক একটু আনন্দ পায়। তাই হয়তো আসে।

এখন বাংলাদেশের পরিচালকের কোনো ঠিক নাই। এরা খালি নামেই পরিচালক, কাজের নয়। এখনকার সিনেমার কোনো আগা-মাথা নাই। কোনো কাহিনি শেষ পর্যন্ত মেলে না। একটা কাহিনিকে দর্শকের সামনে মেলাতে হবে। সেটা তারা পারে না।

আগের পরিচালক কাজী জহির, খান আতা, কাজী হায়াতের প্রত্যেকটা সিনেমা হিট ছিলো। এই যে সালমান শাহের *কেয়ামত থেকে কেয়ামত*; এই সিনেমাহলে একটা শো চলছে আর বাইরে তার চেয়ে বেশি লোক দাঁড়িয়ে ছিলো।

এছাড়া ওর *তোমাকে চাই*, *দেনমোহর*ও বাম্পার ব্যবসা করছে। ভালো পরিচালক দিয়ে সিনেমা বানালে দর্শক আসবে না কেনো!

বেদের মেয়ে জোস্না নামে একটা সিনেমা ছিলো, এই সিনেমাহলে এটা টানা ৮৫ দিন চলছে। তারপরও লোক আর লোক। পর্দার সামনের ফাঁকা জায়গাটা থাকে না, ওখানে দেড়-দুইশো দর্শক মাটিতে বসে সিনেমা দেখছে।'

স্মৃতি হাতড়িয়ে অরুণ বলেন, রাজ্জাকের *রংবাজ*, *বেঈমান* এই সিনেমাগুলো চলার সময় এই সিনেমাহলে চার সপ্তাহ ধরে দর্শক কী ভিড়! তখন বরিশালে চারটা সিনেমাহল ছিলো– বিউটি, কাকলি, সোনালী ও অভিরুচি। তারপরও ব্যবসা হতো। এখন একটা সিনেমাহলে কোনো ব্যবসা নাই।

সিনেমা দেখায় মানুষের চাহিদা কমে গেছে। অথচ দেখেন, আমাদের সিনেমাহলের পরিবেশ কিন্তু খারাপ না; আমরা দর্শকের সঙ্গে সব সময় ভালো ব্যবহার করি। এখানে নতুন সিনেমাও মুক্তি পায়।

তাহলে সিনেমাহল চলে না কেনো! তারপরও আমরা সিনেমাহলে আছি; কারণ আমাদের তিন কালের দুইকাল এখানে গেছে, এখন এই বয়সে আমরা কোথায় যাবো? তাই বাধ্য হয়ে এখানেই পড়ে আছি।

অরুণের সঙ্গে কথা শেষ করে তার পাশে বসা আরেকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে, তিনি একটু পরে কথা বলতে চান। আমি এই ফাঁকে আবার দোতলায় নেমে আসি। ততোক্ষণে খালি গায়ে থাকা ওই ব্যক্তি কিছুটা ফাঁকা হয়েছেন। তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি পাশে থাকা বেঞ্চে এসে বসেন। জানতে পারি তার নাম শেখ মাসুম। অভিরুচি'র পাবলিসিটির দায়িত্বে আছেন।

সিনেমাহলের সঙ্গে মাসুমের পথ চলা দীর্ঘ ৩৬ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে সিনেমা ও সিনেমাহল নিয়ে অনেক অনুযোগ, অভিমান যোগ হয়েছে মাসুমের মনে। মাসুমের ভাষায়, 'ভাই, দেখেন এই সিনেমাহলে কাজ করে অনেক লোক আজ ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেকে আছে যারা দীর্ঘ দিন সিনেমাহলে কাজ করার পর এখন রিকশা চালিয়ে খায়। কারণ সিনেমাহলে কাজ করলে ওই মানুষের পক্ষে অন্য কাজ করা খুব সমস্যা হয়ে যায়। আবার সিনেমাহল বন্ধ হওয়ার পর তার আর কিছুই করার থাকে না।

আমরা যারা এখনো চাকরি করছি, এই বেতনে আমাদের সংসার চলে না। কারণ বাংলাদেশের সিনেমার এখন আর কোনো মান নাই। কলকাতাতেও যে খুব ভালো সিনেমা হচ্ছে, এমন নয়।

ঢাকায় আমাদের চলচ্চিত্র থেকেও অনেক শিল্পী বিদায় নিয়েছে, কেউ মারা গেছে, কেউ চলতে না পেরে চলে গেছে। এদের অনেকে এখন ভাত পায় না, চিকিৎসা করার টাকা নাই।

আর সিনেমাহলের মালিকই বা কী করবে; এই এতো বড়ো সিনেমাহল চালাতে তো খরচ আছে। বিদ্যুৎ বিল কর্মচারী বেতন। সিনেমাহলে রোজগার না থাকলে মালিক এটা চালাবে কী করে।

অভিরুচি'তে এক সময় ৪২ জন কর্মচারী ছিলো, এখন আছে ১২ জন। সিনেমাহল চলে না, আগে যাত্রা নামে একটা জিনিস ছিলো, সেটাও চলে না।

কারণ এখন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে টেলিভিশন ও ডিশের লাইন। সেই টেলিভিশনে সারা দিন ভারতীয় চ্যানেল চলে অথচ আমাদের দেশের চ্যানেলগুলোতে কতো সুন্দর সুন্দর নাটক হয়; সেটা কেউ দেখে না। আমাদের দেশের নাটকের কাহিনি এতো সুন্দর, অথচ সিনেমার কোনো কাহিনি নাই। নাটকের কাহিনি নিয়েও যদি সিনেমা হতো, তাহলেও অনেক লোক সিনেমা দেখতে আসতো। কিন্তু সেটা কেউ করতেছে না। অন্যদিকে সব সিনেমা পাইরেসি হয়ে যাচ্ছে, সেটাও রোধ করা যাচ্ছে না। তাহলে এই আমি ৩৬ বছর চাকরি করে এখন কোথায় যাবো?'

মাসুমের সঙ্গে কথা যখন কেবল জমে উঠেছে, ঠিক সেই সময় বিদ্যুৎ চলে যায়। প্রথমে অন্ধকারেই মাসুম কিছু সময় কথা বলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ ও জেনারেটরের সমস্যা হওয়ায় সিনেমা শুরু হতে কিছুটা দেরি হলে মাসুম কথা বন্ধ করে উঠে যান। কারিগরি কিছু সমস্যার জন্য কিছু সময় দেরি হয়। আমি সেই সময় চা পানের জন্য একটু নীচে নেমে আসি। তারপর বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক হলে আবার সিনেমাহলে ঢুকে পড়ি। এসে দেখি মাসুম নতুন সিনেমার পোস্টার নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন। পরে এসে কথা বলবেন, জানিয়ে তিনি চলে যান। আমি এই ফাঁকে চার তলায় চলে যাই বাকি একজনের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

চার তলা তখন ফাঁকা; ক্যান্টিনের সেই লোক আর পয়েন্টম্যান আ. মালেক মিয়া ছাড়া কেউ নেই। মালেক মিয়া নিজে আগ্রহ নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। পঞ্চাশোর্ধ্বো মালেক মিয়া ২৭ বছর ধরে কাজ করছেন অভিরুচি'তে। আগে ব্যবসা করতেন সামান্য একটু কথা বলতেই বিরতির বেল বেজে উঠে; মালেক মিয়া কথা ছেড়ে গেইট খুলে দিতে যান। একটু পরে ফিরে এসে আবার কথা শুরু হয়।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে গেইটম্যান হিসেবে অভিরুচি'তে কাজ শুরু করেন মালেক। বছর দুইয়ের মধ্যে তিনি পয়েন্টম্যান হয়ে যান। মালেক মনে করেন, বাংলাদেশের সিনেমায় এখন ভালো নায়ক-নায়িকা, পরিচালক, প্রযোজক কেউ নাই। ফলে ভালো সিনেমা হচ্ছে না।

অন্যদিকে ডিস, সিডি আর মেমোরি কার্ড দিয়ে দেশ ভরে গেছে। তাই লোকজন আর সিনেমাহলে আসে না। এখন সিনেমা দেখে মনে হয়, এগুলো বানানোর জন্য পরিচালকরা কোনো সময় দেয় না; খালি তাড়াহুড়ো করে। সময় নিয়ে একটা কাজ করলে অবশ্যই ভালো হবে। কিন্তু এটা পরিচালকরা করছে না। এরফলে কিছুই হচ্ছে না।

মালেক মিয়ার সঙ্গে বেশি দূর কথা এগোনো যায় না। তাই কথা শেষ করে আবার দোতলায় চলে আসি। সেখানকার গেইটম্যান প্রদীপ দাসের সঙ্গে আগে পরিচয় হয়েছিলো। বলেছিলাম পরে কথা বলবো। এবার এসে তাকে ফাঁকা পেয়ে যাই। বেশ সময় নিয়ে কথা বলেন প্রদীপ দাস।

প্রদীপ আগে চকবাজারের বিউটি সিনেমাহলে কাজ করতেন, সেখানেই তার বাসা। বিউটির মালিক ছিলেন জুলু চৌধুরী, তিনি স্বাধীনতার আগে এই সিনেমাহলটি প্রতিষ্ঠা করেন। ৭০'র দশকের মাঝামাঝিতে বিউটি'তে প্রদীপ সরাসরি চাকরি করতেন না; চেয়ার, গদি নষ্ট হলে সেগুলো ঠিক করতেন, তার ভিত্তিতে বেতন পেতেন। পরে

বিউটি সিনেমাহলেই পয়েন্টম্যানের কাজ শেখেন প্রদীপ। তারপর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে অভিরুচি'তে পয়েন্টম্যান হিসেবে মালেক কাজে যোগ দেন।

বিউটিতে কাজ করার সময় নিয়মিত সিনেমা দেখতেন মালেক। তিনি জানান, সেসময় *অবাক পৃথিবী*, *বৌরানী*, *এতোটুকু আশা*, *দ্য রেইন*, *কুয়াশা*, *বধুবিদায়*, *প্রতিহিংসা*, *রাজদুলারী*, *প্রাণ সজনী*, *বেদের মেয়ে জোস্‌না* খুব ব্যবসা করেছিলো।

প্রায়ই দিনই দর্শকের মধ্যে টিকেট নিয়ে মারামারি হতো। ওইসব সিনেমার কাহিনি এখনো পেটের মধ্যে জমা আছে, কিন্তু এখন যেসব সিনেমা হচ্ছে তা দেখার ১০ মিনিট পরেই মনে থাকে না।

অলিভিয়া, ওয়াসিম অভিনীত দ্য রেইন সিনেমার গান এখনো মনে আছে প্রদীপের। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি সুর করে গাইতে শুরু করেন, 'বন্ধু ঘুমিয়ে আছে দে ছায়া তারে।' প্রদীপ এই গানের দৃশ্যের বর্ণনাও দিতে থাকেন।

এছাড়া *এতোটুকু আশা* সিনেমার 'তুমি কী দেখেছো কভু জীবনের পরাজয়' শিরোনামের গানটিও তিনি সুর করে গাইতে থাকেন। প্রদীপ বলেন, "সেসময় এই সিনেমা মানুষ দেখছে কেবল গানের জন্য। আর এখন তো গান শুনলে দর্শক উঠে যায়।

আরেকটা সিনেমা ছিলো দোস্ত *দুশমন*। এটা নাকি ভারতের *শোলে*'র নকল। কিন্তু আমাদের এখানে *শোলে*'র চেয়ে ভালো সিনেমা হয়েছে *দোস্ত দুশমন*; বিশেষ করে ওয়াসিম আর সোহেল রানা অভিনয় খুব ভালো হয়েছে।

এই সিনেমা দেখার জন্য আমি নিজে বিউটি সিনেমাহলে তিনটায় ঢুকছি, একটানা রাত ১২টা পর্যন্ত তিন শো দেখছি। এর মধ্যে কোনো খাওয়া-দাওয়াও নাই। বিউটিতে তখন সিনেমা দেখতে তো আমার টাকা লাগতো না। জাফর ইকবালের একটা সিনেমা ছিলো *একমুঠো ভাত*; এই সিনেমার একটা গান হলো, 'নাচ আমার ময়না তুই পয়সা পাবি রে।' এখনো এই গান আমি ভুলতে পারি না।"

মালেক মনে করেন, আগেও অনেক নায়ক-নায়িকা মারা গেছে জাফর ইকবাল, জসিম। সবশেষে সালমান শাহ, মান্না মারা যাওয়ার পর আমাদের সিনেমার খারাপ অবস্থা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে রিয়াজ ও ফেরদৌসের কারণে কিছু সিনেমা ব্যবসা করছে। তারপর আবার ব্যবসা খারাপ হয়ে গেছে। তারপরও কিছু সিনেমা ভালো ব্যবসা করছে, ভারতের প্রসেনজিতের *মনের মানুষ*, *মনপুরা*।

কাটপিসওয়ালা সিনেমার সময় প্রচুর দর্শক হতো বলে জানান প্রদীপ। তবে সেসময় নারী দর্শক একেবারে কমে যায়। প্রদীপের ভাষায়, 'সেসময় যুবক ছেলেরা সিনেমাহলে বেশি আসতো। কিন্তু মহিলা আসে নাই।

অথচ সিনেমাহলের লক্ষ্মী হলো মহিলা দর্শক। পাঁচজন মহিলা দর্শক আসলে, ১০জন পুরুষ আসে। *টাইটানিক* নামে একটা ইংরেজি সিনেমা আসছিলো, সেটা দেখার জন্য অনেক মহিলা দর্শক আসছিলো। সিনেমাহলে দর্শক আসলে আমাদের ভালো লাগে, না আসলে মন ভালো থাকে না।'

প্রদীপ দাসের সঙ্গে কথার শেষের দিকে দুই তরুণ সিনেমা দেখতে আসে। তাদের ধারণা ছিলো, আজ থেকেই *প্রেমী ও প্রেমী* সিনেমাটি অভিরুচি'তে চলছে। কিন্তু তারা এসে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। দুই বন্ধু গোলাম সাফায়েত ও জিয়াদ মধ্যে থেকে জিয়াদ বেশ আগ্রহ নিয়ে কথা বলেন। জিয়াদ বরিশাল পলিটেকনিকালে পড়াশোনা করেন।

জিয়াদ জানান, বর্তমানে যৌথ প্রযোজনার সিনেমাগুলো তার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। এছাড়া বাংলাদেশের সিনেমার মধ্যে *মনপুরা*, *আয়নাবাজি* তার পছন্দের। তবে জিয়াদ মনে করেন, বর্তমানে বাংলাদেশে যে মানের ভালো টেলিভিশন নাটক হয়, সেই মানের সিনেমা হয় না। তারপরও বাংলাদেশের সিনেমা দেখতে তার ভালো লাগে।

চতুর্থ শ্রেণিতে বাবা-মার সঙ্গে প্রথম সিনেমাহলে গিয়ে সিনেমা দেখেন জিয়াদ। সিনেমার নাম *খায়রুন সুন্দরী*। জিয়াদ বলেন, সেই সময় আমার বন্ধু-বান্ধবরাও বাবা-মার সঙ্গে সিনেমা দেখতে আসতো। অনেক দিন আমার খালামণি, ফুফুও সিনেমা দেখতে আসছে। এখন আর বাবা-মার সঙ্গে কেউ সিনেমা দেখতে আসে না।

এর অবশ্য কারণও আছে, এখন অনেক সিনেমাই বাবা-মার সঙ্গে দেখার মতো অবস্থা নাই। বাসায় টেলিভিশনেও যে খুব ভালো কিছু দেখায় এমন নয়। তবে ওখানে চ্যানেল পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে। কিন্তু সিনেমাহলে তো সেই সুযোগ থাকে না।

এই যে *মধু হই হই বিষ খাওয়াইলি* নামে যে সিনেমাটা গত রবিবার দেখছি, এটা কোনো সিনেমা হলো। এই সিনেমা দেখার জন্য তো আমারই আসার ইচ্ছে হয় না, পরিবারের লোকজন কীভাবে আসবে। তারপরও আমার মন একটু খারাপ ছিলো, তাই সিনেমাটা দেখতে আসছিলাম।

জিয়াদের সঙ্গে কথা শেষ করে ওখানেই বসেছিলাম প্রদীপ আর আমি। ঠিক সেই সময় পোস্টার সাটানো শেষ করে আসেন মাসুম। ঘর্মাক্ত মাসুম ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য ফ্যানের নীচে আমাদের সঙ্গে বেঞ্চে এসে বসেন। তার কাছেই জানতে পারি প্রায় প্রতিদিনই তাদের প্রচার করতে হয়। তবে এখন রেকর্ডিং করে প্রচার করা যায় কারণে কিছুটা স্বস্তি পান বলে জানান মাসুম।

মাসুম বলেন, সিনেমার প্রচারটাকে এখন এটাকে ভালোভাবে নেয় না। অনেকেই মুখের ওপর কটু কথা বলে। কিন্তু আমাদের কিছু করার থাকে না। দেখেন ৩০ বছর ধরে এই কাজ করছি। সব চাকরিতেই তো অবসর আছে, আমাদের কোনো অবসর নাই। এখন বয়স হয়েছে, কিন্তু উপায় নাই। তাই এই কাজই করতে হচ্ছে।

বরিশাল শহরের কাঠপট্টিতে টেইলারিংয়ের দোকান ছিলো মাসুমের বাবার। স্কুল থেকে ফিরে বাবার সঙ্গে তাকে দোকানে বসতে হতো। তবে সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সিনেমা দেখার খুব নেশা ছিলো মাসুমের। মাসুম বলেন, দোকানে আব্বা যখন ঘুমাইয়া যেতো, আমি চুপ করে বাহির হয়ে সিনেমা দেখতে যেতাম।

আগে মর্নিং শো চলতো, এই শো চলার সময় স্কুলে থাকতাম। কিন্তু একটার পর সিনেমাহলে চলে যেতাম। বেশিরভাগ দিন সারা দিন না খেয়ে সিনেমা দেখছি। তখন টিকেটের দাম ছিলো এক টাকা, দেড় টাকা।

সিনেমাহলে গিয়ে সিনেমা দেখতাম আর এলাকায় এসে বন্ধুরা মিলে সেই সিনেমা বানাতাম। বেশিরভাগ সময় আমি নায়ক হতাম, অন্য বন্ধুকে ভিলেন বানাতাম।

সেসময় *নিশান*, *বাহাদুর*, *যাদুনগর* সিনেমা দেখে এসে আমরা কাঠ দিয়ে তলোয়ার বানাতাম। সেই তলোয়ার দিয়ে নায়ক আর ভিলেনের ফাইট করতাম। সিনেমা নিয়ে তখন কতো আনন্দ হতো! এইসব করতে গিয়ে আমি ঠিকমতো পড়াশোনাও করতাম না, দোকানেও যেতাম না।

তো আমার এক বন্ধুকে দিয়ে আমার মা বললো, ও যেহেতু কোনো কাজ করে না, ওর ব্যবস্থা ওকেই করতে বল। এই কথা শুনে আমার খুব রাগ হয়েছে, আমি বাড়িতেই যাই নাই, ভাতও খাই নাই। চার আনা দিয়ে একটা পুরি কিনে খেয়ে আমার সিনেমাহলের যে মালিক চান সাহেবের বাসার সামনের একটা কালভার্টে বসে আছি। ওখানে তার সাথে আমার দেখা হয়, আমাকে বলে তুই এখানে কী করিস। আমি বলি দাদা এমনি বসে আছি। উনি বলেন, তুই নাকি খালি দুষ্টুমি করিস। আমি বলি, দাদা আপনি তো সিনেমাহল নিয়েছেন, সেখানে আমারে একটা কাজ দেন। তার পরের দিন থেকে আমি সিনেমাহলে কাজ শুরু করি। প্রথমে আমি ব্যাংকের সব কাজ করতাম। তারপর ধীরে ধীরে এখন এই পাবলিসিটির দায়িত্বে। এভাবেই ৩৬ বছর চলছে, এখানে আমার।

মাসুম আরো বলেন, সিনেমাহলে চাকরি করতে গিয়ে কোনো দিন ভাবি নাই, আমিও একদিন বুড়া হবো, আমি অসুস্থ হলে টাকার প্রয়োজন হবে। নিত্য দিন নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে; এসব কথা মনে করার সুযোগই ছিলো না। এটাও আবার ঠিক এই সিনেমাহল দিয়েই আমি জীবনে সবকিছু করছি। ভাইবোনদের বড়ো করছি, বোনদের বিয়ে দিয়েছি, নিজে বিয়ে করছি। কিন্তু ধীরে ধীরে আজকের যে অবস্থা তাতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করার পরিস্থিতি এখন আর নাই।

সিনেমার আজকের এই অবস্থা কেনো এমন হলো–এই প্রশ্নের উত্তরে মাসুম বলেন, সিনেমার ব্যবসা ভালোই ছিলো। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তাদের নিজেদের কালো টাকা সাদা করার জন্য অসামাজিক সিনেমা নির্মাণ করছে। এই আসামাজিক সিনেমাগুলো তৈরি করার পর আস্তে আস্তে দেশের সামাজিক দর্শকেরা সিনেমাহলে আসা বন্ধ করে দিলো। তবে কিছু লোক এই সিনেমা খুব দেখছে।

এইসব অসামাজিক সিনেমা দেখার জন্য তখন খুব লোক হতো। কিছু দিন পরে সেই সিনেমা বন্ধ হয়ে গেলো। ভালো সিনেমা যখন লাগানো হলো তখন সামাজিক লোকজনও আসে না ওই অসামাজিক সিনেমার দর্শকও আর আসে না। সিনেমাহলের লোকজন পড়ে গেলো সমস্যায়।

এদিকে ঢাকার প্রযোজকরা ধরেন শাবনূর, রিয়াজকে নিয়ে অনেক টাকা খরচ করে একটা সিনেমা করলো; কিন্তু সিনেমাটা চললো না। ফলে প্রযোজকের বড়ো ধরনের লস হয়ে গেলো। এভাবে দুই–তিনটা সিনেমার লস খেতে খেতে ওই প্রযোজক সিনেমার ব্যবসা বন্ধ করে দিলো। এভাবে বাংলাদেশের বড়ো বড়ো সব প্রযোজক সিনেমা বানানো বন্ধ করলো।

আবার অনেক ডিরেক্টর তো নিজেই প্রযোজক ছিলো– কাজী জহির, গাজী মাযহারুল আনোয়ার, দিলীপ বিশ্বাস, কাজী হায়াৎ, এ জে মিন্টু। এরা লস খেতে সিনেমার ঘর গুছিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

এরপর ধীরে ধীরে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলো। কিন্তু সিনেমাহলের দর্শক নস্ট করছে ভারতীয় চ্যানেলগুলো। এখন আমাদের দেশের এতো সুন্দর নাটক কেউ দেখে না; সন্ধ্যা হলেই মা, খালা, বোনেরা সেই স্টার জলসা দেখে।

এখন ভালো সিনেমা আসলেও তারা সিনেমাহলে আসতে চায় না, কারণ সিনেমা দেখতে গেলেই তো এক পর্ব দেখা হলো না। এটা তো ভয়ঙ্কর নেশার মতো। আর এখন যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট, ১০ টাকা ভরলেই তিনটা সিনেমা দেখা যায়। ভারতের সিনেমা মুক্তির তিন দিন পর ইন্টারনেটে চলে আসে। লোকজন ঘরে বসে সেটা দেখে।

বর্তমানের সিনেমা নিয়ে মাসুম বলেন, এখন যেসব সিনেমা হয়, সেগুলো খালি চোখের দেখা; মনে রাখার মতো নয়। এখনকার প্রযোজকরা ব্যবসার জন্য সিনেমা বানায় না। কারণ টাকা খরচ করে এই সিনেমা বানাতে পারে না।

আর ডিরেক্টররা সিনেমা বানায় পেটের দায়ে। একটা সিনেমা দেখার পর এখন দর্শক আরেকজনকে বলতে পারে না, এই সিনেমাটা ভালো, আপনি দেখতে যান। গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ কিংবা ভারতে এই ধরনের সিনেমা তৈরি হয় নাই।

এই যে দেখেন ভারতের *বস ২*, *ডন* সিনেমাগুলো আমরা এখানে চালিয়েছি; এগুলো কোনো সিনেমা! এসব সিনেমার গল্প সিনেমাহল থেকে বের হয়ে দর্শক বলতে পারবে না। কিন্তু আজ থেকে ২৫ বছর আগে দেখা কোনো সিনেমার কথা আপনি আমাকে বলেন, তার গল্প আমি বলে দিতে পারবো।

দর্শক সিনেমা দেখে কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে গেছে। সেই দর্শক এখন কেনো সিনেমা দেখবে! কী আছে এই সিনেমার মধ্যে। ভালো সিনেমাহলে অবশ্যই দর্শক আসবে। অনেকে বলে সিনেমাহলের পরিবেশ নাই, এটা ভুল। কারণ ব্যবসা ভালো হলে সিনেমাহলের অবস্থা এমনি ভালো হতো।

এখন এক মাসে কোনো সিনেমায় হয়তো মালিকের তিন লক্ষ আয় হয়েছে, বাকি ১১ মাসে ১০ লক্ষ দেনা হয়েছে। তাহলে কীভাবে চলবে। তারপরও সিনেমাহলের কী পরিবেশ চায় দর্শক। এখানে এসে কি কেউ অপমান, হয়রানি হয়? মহিলারা অসম্মান হয়? কোনো দিন না।

লম্বা সময় নিয়ে কথা বলেন মাসুম। তার সেই কথার মধ্যে ক্ষোভ, অভিমান, জীবনের কাছে পরাজিত হওয়া নানা বিষয় উঠে আসে। মাসুমের সঙ্গে কথার একেবারে শেষের দিকে প্যান্ট-শার্ট পরা পরিপাটি এক ব্যক্তি এসে আমার পরিচয় জানতে চান। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারি তিনি বর্তমানে অভিরুচি ভাড়া নিয়ে চালান। আগে এই সিনেমাহলের কর্মচারী ছিলেন; মাঝখানে কিছুদিন দুবাই ছিলেন। কয়েক বছর আগে ফিরে এসে মালিকের কাছ থেকে সিনেমাহলটি ভাড়া নিয়েছেন। ভদ্রলোকের নাম মো. জুলু মিয়া। অত্যন্ত নম্র-ভদ্র জুলু আমার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ দেখান। তারপর আমাকে নিয়ে তার টিকেট কাউন্টার কক্ষে চলে যান। বুঝলাম যে, টিকেট বিক্রির কাজটি তিনি নিজেই করেন। সেখানে বসে কথা হয় জুলুর সঙ্গে। এর আগে অবশ্য তিনি অনেকটা জোর করে আমাকে পিঠা ও পানীয় খাওয়ান।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের দিকে গেইটম্যান হিসেবে অভিরুচিতে চাকরি শুরু করেন জুলু। তিনি জানান, সেসময় রোজগার খুব ভালো ছিলো। বেতনের বাইরে প্রতিদিন খুব ভালো অঙ্কের টাকা তারা বাড়িতে নিতে পারতেন। এভাবে ১৩ বছর চাকরির পর টাকা জমিয়ে তিনি দুবাই চলে যান।

২০১১ খ্রিস্টাব্দে দুবাই থেকে ফিরে আসেন। তারপর কিছু দিন অন্য ব্যবসা করেন জুলু। গত তিন বছর তিনি অভিরুচি সিনেমাহল ভাড়া নিয়েছেন। জুলুর ভাষ্যমতে, আমি যে সময় চাকরিতে জয়েন করি, তার কিছুদিন পরেই সালমান শাহের সিনেমা মুক্তি পায়। সালমান শাহ, শাবনূরের সিনেমা সেই সময় খুব ভালো ব্যবসা করছে। প্রত্যেকটা সিনেমায় প্রচুর দর্শক হতো।

২০০১ সালের পর কিছু নেংটা সিনেমা আসলো, এই সিনেমায় সব কিছু নস্ট করে দিলো। এখন যাদের বয়স ৩০–৪০ বছরের মধ্যে তারা আর এখন সিনেমা দেখতে আসে না। ওই সিনেমাগুলোর কারণে তাদের একধরনের ঘৃনা তৈরি হয়েছে। এখন ভালো সিনেমা তৈরি হলেও তারা ওই চিন্তা করে আর সিনেমাহলে আসে না।

আর এখন নারী দর্শক তো অনেক কমে গেছে। কারণ সন্ধ্যা হলেই এক ভাবী আরেক ভাবীকে বলে, টুপুরের কী হবে ভাবী? সারা দিন কাজ করে এগুলো দেখে ওরা আর সিনেমাহলে আসতে চায় না।

তার ওপর পাইরেসি তো আছেই। এখন অবশ্য শাকিব খানের সিনেমা ভালো চলতেছে। তবে বর্তমানে তো কোনো সিনেমাই নাই। সিনেমাহল চলবে কী দিয়ে!' জুলুর সঙ্গে কথা শেষ করে নীচে নেমে দেখি ৬.৩০–৯টা শো শেষ হয়ে গেছে। কাল আসবো এই বলে বিদায় নিই প্রদীপ ও মাসুমের কাছে।

পরদিন ১১ আগস্ট ২০১৭ অভিরুচিতে যখন পৌঁছি, তখন বেলা ১১.৪৫ মিনিট। নতুন সিনেমার ব্যানার, পোস্টার লাগানো হয়েছে *প্রেমী ও প্রেমী*। সিনেমাহলের লোকজন অনেকেই এসে গেছেন; গেটের বাইরেই দেখা হলো বিলাসের গেইটম্যান অরুণ কুমার গোস্বামীর সঙ্গে। তিনি প্রধান ফটকের সামনের পানের দোকানের বসেছিলেন। দর্শকরা আসতে শুরু করেছে। পানের দোকানের সামনেই কথা হয়, অভিরুচি সিনেমাহলের এক সময়ের কালোবাজারি তোতা মিয়ার সঙ্গে। ৫০ বছরের তোতা মিয়া খুব ছোটো সময় থেকেই সিনেমাহলের সঙ্গে ছিলেন। বছর দশেক হলো সিনেমাহল ছেড়ে দিয়েছেন। বর্তমানে সিনেমাহলের পাশে ভ্যানে করে কাচামাল বিক্রি করেন।

তোতা মনে করেন, এখন পাবলিকের পকেটে পকেটে সিনেমাহল। তারা সেখানেই সিনেমা দেখে তাই আর সিনেমাহলে আসে না। তার ওপর টেলিশিভনে বিনা পয়সায় সিনেমা দেখতে পারে। এখন ধনী-গরীব সবার ঘরে টেলিশিভন আছেই।

স্মৃতি হাতড়িয়ে তোতা বলেন, 'আগে আমরা *অবুঝ মন*, *দোস্ত দুশমন* এধরনের কতো সিনেমা দেখছি। এসব সিনেমার তখন খুব চাহিদা ছিলো। এসব সিনেমার গল্প তখন অনেক ভালো ছিলো। মানুষ আনন্দ নিয়ে সিনেমা দেখতো।

তখন কাজী জহির, দিলীপ বিশ্বাস, সুভাষ দত্ত সিনেমা বানাতো। এখনকার সিনেমার কোনো আগা-মাথা নাই। এই সিনেমা মানুষ টাকা দিয়ে কেনো দেখবে।' তোতার সঙ্গে কথা বেশি দূর এগোয় না। তাই তার সঙ্গে কথা শেষ করে উপরে উঠি।

বিদ্যুৎ নেই, তাই তখনো কর্মচারীদের কাজের গতি নেই। আমি এই ফাঁকে সিনেমাহলের ভিতরটা দেখার জন্য সুধী-সৌখিনে ঢুকি। বেশ পরিচ্ছন্ন। নারীদের বসার জন্য পর্দা ঘেরা আলাদা জায়গা। আসনগুলো বেশ ভালো।

জানা গেলো, নীচের আসন প্রায় সাড়ে ছয়শো। তখনো অবশ্য নীচে দর্শক প্রবেশ করেনি। সেখান থেকে বের হয়ে চার তলায় বিলাসে যাই। ততোক্ষণে সেখানে মর্নিং শোয়ের দর্শক বসে গেছে। বিলাসের অবস্থাও ভালো। সেখান থেকে বের হয়ে এবার বিলাসের সামনের বেঞ্চে বসি। সেখানে কিছু সময় বসে থাকতে থাকতেই *প্রেমী ও প্রেমী*র প্রথম শো শুরু হয়ে যায়। দর্শক খুব একটা বেশি নয়। সিনেমাটি দ্বিতীয়বারের মতো অভিরুচিতে চলছে। এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে এটি চলেছে। সেসময় ব্যবসা খুব ভালো হয়েছিলো বলে জানা যায় সিনেমাহলের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে।

বিলাসের গেইটের সামনে বসা প্রদীপের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে বরিশালের সোনালী সিনেমাহলের উদ্দেশে বের হই। এটি শহরের অমৃত লাল সড়কের ঝাউতলা মোড়ে ছিলো। কয়েক বছর আগে সিনেমাহলটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে জায়গাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। আমি ওই স্থানের ছবি তোলার জন্য একটি রিকশায় করে সেখানে যাই। ছবি তোলা শেষে সেখান থেকে হেটে নগরীর আরেক সিনেমাহল কাকলিতে আসি।

কাকলি নামে ওই স্থানের নাম এখন কাকলি মোড়। তবে কাকলি সিনেমাহলের জায়গায় এখন শাহীন শপিং কমপ্লেক্স। কাকলি আসল নাম শুনলাম জগদীশ সিনেমা। দেশভাগের আগে জগদীশ দাস বলে একজন নিজের নামে এই সিনেমাহলটি করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ডা. সোবহান নামে একজনের কাছে জগদীশ এটি বিক্রি করে দেন। ডা. সোবহান পরে সিনেমাহলটির নাম দেন কাকলি। সেখানে কথা হয়, মালেক হাওলাদারের সঙ্গে। শাহীন পশিং কমপ্লেক্সের ঠিক কোণায় ছোটো একটা পান-সিগারেটের দোকান নিয়ে বসে আছেন মালেক। তার কাছে সিনেমাহল সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারি, তিনি একসময় কাকলির অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন। এখন পানের দোকান করছেন। কথা হয় তার সঙ্গে।

মালেক জানান, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি এই সিনেমাহলে কাজ শুরু করেন। পরে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে কাকলি ভেঙে ফেলা হয়। মালেকের ভাষ্যমতে, 'আমি যখন ৯৫ এ জয়েন করি তখনও সিনেমাহলের ব্যবসা জমজমাট ছিলো। যে বছর সিনেমাহল ভাঙা, তখন ব্যবসা খুব একটা খারাপ ছিলো না। কিন্তু আমাদের মালিক ডা. সোবহান মারা যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে তার ছেলেরা কেনো জানি সিনেমাহলটা ভেঙে ফেললো।'

মালেক জানান, এক জীবনে তিনি অনেক সিনেমা দেখেছেন। তবে *গাঁয়ের ছেলে*, *অবুঝ মন*, *পিতা মাতা সন্তান* এই সিনেমাগুলো তার খুব ভালো লেগেছিলো।

তবে বর্তমানে টেলিভিশন ছাড়া অন্য কোথাও সিনেমা দেখেন না মালেক। তার মতে, এখন সিনেমাহলে যাওয়ার কোনো পরিবেশ নাই। সিনেমাহলে সব সময় নোংরা সিনেমা দেখানো হয়। এই কাকলি সিনেমাহলে

আগে দর্শকের মধ্যে প্রত্যেক দিন মারামারি হতো। দর্শকের যন্ত্রণায় আমি কাজ করতে পারতাম না। সেই সিনেমাহল এখন শূন্য।

ক্রেতার কারণে খুব বেশি কথা বলতে পারি না মালেকের সঙ্গে। পরে কাকলি বিহীন কাকলি মোড়ের ছবি তুলে আবার অভিরুচিতে ফিরে আসি। সিনেমাহলে তখন ১২.৩০–৩টার শো চলছে। কিছু সময় সেখানে থেকে দুপুরের খাবারের জন্য বের হই। খেয়ে আবার সিনেমাহলে ফিরে আসি। সিনেমাহলের সামনে আজিম নামে স্থানীয় এক সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, বিউটি সিনেমাহলের ব্যবস্থাপক ফারুক হোসেন এখন বিরিয়ানির দোকান দিয়েছেন। তার সাহায্য নিয়ে ফারুকের সঙ্গে দেখা করতে যাই। দোকানের সামনেই পেয়ে যাই ফারুককে। লম্বা দাঁড়ি, মাথায় টুপি, পাঞ্জাবি পরা ফারুক এখন তাবলিগ করেন। তবে সিনেমাহলের কথা শুনে আমাদের খুব সাদরে গ্রহণ করেন তিনি। এবং দোকানের ভিতরে নিয়ে বসান। কথা হয় তার সঙ্গে।

ফারুক জানান, তিনি সিনেমাহলের ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে থাকলেও প্রায় সব ধরনের কাজ তাকে করতে হতো। স্মৃতি হাতড়িয়ে ফারুক বলেন, সালশান শাহ মারা যাওয়ার পর *সত্যের মৃত্যু নাই* নামে একটা সিনেমা মুক্তি পায়। সালমানের মৃত্যুর কারণে ওই সিনেমাটা খুব হিট হয়েছিলো।

ওই সিনেমাটা যারা ডিস্ট্রিবিউট করছিলো, সেই অফিসের একজনের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। তো আমি বিউটিতে এই সিনেমা লাগাবো, সেজন্য কথাবার্তা পাকা করে ফেললাম। যেহেতু সিনেমাটা সুপারহিট হয়েছে, এখন অভিরুচি, সোনালিও এই সিনেমা লাগাতে চায়। তখন রেন্টালে সিনেমা আনতে হতো। দাম অনেক বেড়ে গেলো *সত্যের মৃত্যু নাই*-এর। এখন আমার কথা হলো, আমি যেহেতু আগে কথা বলছি, আমি এ সিনেমা আনবোই। শেষ পর্যন্ত তিন লক্ষ টাকা দিয়ে ওই সিনেমা আমাদের আনতে হয়েছিলো। তারপরও অবশ্য আমরা অনেক টাকা লাভ করছি ওই সিনেমা দিয়ে। দর্শকের জন্য সিনেমাহলে থাকা দায়। যতো লোক সিনেমা দেখছে, তার চেয়ে বেশি লোক বাইরে। এই ছিলো সেসময়ের সিনেমার অবস্থা।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিউটির সঙ্গে যুক্ত হন ফারুক। স্বাধীনতার আগে কামালউদ্দিন চৌধুরী এই সিনেমাহলটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কামালউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার ছেলে জুলফিকার উদ্দিন চৌধুরী এর মালিক হন। জুলফিকারের সময় থেকে ফারুক এই সিনেমাহলের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথমে সিনেমাহলের সাধারণ স্টাফ হিসেবে ঢোকেন ফারুক।

তার ভাষ্যমতে, ‘সে সময় সিনেমাহলের ব্যবসার কথা এখন কাউকে বললে বিশ্বাস করানো যাবে না। আগের দিনে টিকেট বিক্রির টাকা পরদিন সকালে আমি দুইটা ব্রিফকেসে ভর্তি করে ব্যাংকে নিয়ে যেতাম। এটা ছিলো আমার নিয়মিত কাজ।

প্রথমে বিউটিতে তিনটা শো চলতো, পরে চারটা করা হয়। প্রত্যেকটা শো হাউসফুল ছিলো। যেকোনো সিনেমা আনলেই ব্যবসা ভালো হতো।

এরশাদ সরকারের সময় ভিসিপি আসার পর প্রথমবারের মতো সিনেমাহলের ব্যবসায় একটু সমস্যা দেখা দেয়। তার কয়েক বছর পরে আসে সিডি।

আর এখন তো মোবাইল ফোন, মেমোরি কার্ড। ফলে এখন কোনো ভালো সিনেমা আসলেও পরিবেশের কারণে দর্শক আর সিনেমাহলে যেতে চায় না।

কয়েক দিন পর পাইরেসি হলে তারা মোবাইলফোনে নিয়ে সেটা দেখে ফেলে। সিনেমার ব্যবসা খারাপ হওয়ার পর থেকে মালিকরা এসব সিনেমাহলের উন্নয়নে কোনো খরচ করেনি। ফলে এগুলোর অবস্থাও এখন ভালো নয়। বিউটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ধুক ধুক করে চলতে চলতে ২০১৪ সালের দিকে এটা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর মালিক এটা বিক্রি করে দিলে, নতুন মালিক সেটা ভেঙে ফেলছে।'

কাটপিসওয়ালা সিনেমার কারণেও এ ব্যবসার খুব ক্ষতি হয়েছে বলে ফারুক মনে করেন। তার মতে, ২০০১ সালের পর এই ধরনের সিনেমাগুলো খুব চলছে। এতে গরীব শ্রেণির দর্শকের সংখ্যা সিনেমাহলে বাড়লেও শিক্ষিত লোকজন এখান থেকে চলে গেছে।

এই শিক্ষিত লোকজনেরা পরে টেলিভিশন দেখা শুরু করছে। আর এখন অনেক কিছুই দর্শকের হাতের নাগালে। তার ওপর এখন ভালো সিনেমাও হচ্ছে না। বেশিরভাগ সিনেমার কাহিনি একইরকম।

এই ধরেন সেই সময় *মনের মাঝে তুমি* নামে সিনেমাস্কোপ ক্যামেরায় একটা সিনেমা হয়েছিলো। একটা প্রেমের কাহিনি, সেই সিনেমা দেখার জন্য জেলা জজ, অতিরিক্ত জজ সবাই সিনেমাহলে আসছিলো। তার মানে একটা ভালো জিনিস হলে সেটা দেখতে মানুষ আসে।

আগে সাধারণ মানুষের কাছে সিনেমাহলের লোকজনের কদর ছিলো বলে জানান ফারুক। যেকোনো সরকারি-বেসরকারি অফিসে এসব লোকজনকে মানুষ সম্মান করতো।

ফারুকের ভাষ্যমতে, 'এখন সিনেমাহলে কাজ করার কথা শুনলে মানুষ তাকে ঘৃনা করে। সিনেমাহলের লোকজন মদ, নারী নিয়ে থাকে– এধরনের একটা ধারণা এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে। এটা কিন্তু একেবারে ভুল কথা।

বরঞ্চ সিনেমাহলের লোকজন কিন্তু অত্যন্ত ভালো ও সাংস্কৃতিমনা ছিলো। তবে এটা ঠিক পরের দিকে কিছু লোকজন খারাপ হয়ে গেছে, এর কারণ হলো হতাশা। দীর্ঘ দিন সিনেমাহলে চাকরি করা এইসব লোকের তো তখন আসলে করার কিছু ছিলো না। তারা একটা ভালো অবস্থা থেকে হঠাৎ করে খারাপ পরিস্থিতিতে চলে আসছে। এটা অনেকেই মেনে নিতে পারেনি।

সিনেমাহলের কর্মচারীদের বেতন কিন্তু খুব বেশি না। তারা বাড়তি রোজগার করতো। কিন্তু সিনেমা যখন মার খাওয়া শুরু হলো, তখন মালিকও তাদের ঠিক মতো বেতন দিতে পারে না, দর্শক না থাকার কারণে বাড়তি রোজগারও নাই। তাই তারা হতাশার মধ্যে পড়ে যায়।'

তবে আবার নতুন করে সিনেপ্লেক্স ও ভালো সিনেমা হলে দর্শক দেখবে বলে ফারুক আশাবাদী। তার ভাষায়, 'টেলিশিভন বলেন আর মোবাইল বলেন, ওই জায়গায় সিনেমা দেখে একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। বড়ো পর্দায় সিনেমা না দেখলে সেটা কোনোভাবেই পূরণ হয় না।'

কথা শেষ করে ফারুক আমাদের বিউটি সিনেমাহলের পরিত্যক্ত জায়গাটি দেখাতে নিয়ে যান। সেখানে ছবি তুলে ফারুকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অভিরুচিতে ফিরে আসি।

এবার এসে সৌখিনের সামনের বেঞ্চে বসি। তখন ৩.৩০–৬টার শো কেবল শুরু হয়েছে। সেখানে বসে নানা বিষয়ে গল্প করতে থাকি অরুণ কুমার গোস্বামীর সঙ্গে। পরে আলোচনায় যোগ দেন প্রদীপ। কয়েকজন মিলে বেশ ভালোই আলোচনা জমে উঠে। তারা নিজেদের ক্ষোভ-আবেগের কথা জানান।

প্রদীপ জানান, *স্বজন* নামে একটা সিনেমা লাগছিলো, ভারতের হিন্দি ভাষার *সাজন* সিনেমার নকল। মৌসুমী, রুবেল আর ইলিয়াস কাঞ্চন ওই সিনেমায় অভিনয় করছে।

প্রদীপের ভাষায়, 'যেদিন এই সিনেমাটা মুক্তি পায় আমি একটু বাইরে ছিলাম। শো আগে সিনেমাহলে আসি। এসে দেখি লোকে লোকারণ্য। টিকেটের লাইন পুকুর পাড় পর্যন্ত চলে গেছে। আমার একটু বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো, এই দেখে আমি আর বাড়ি যাওয়ার সাহস পেলাম না। ওই দিন কী আর ফেরত আসবে।

আরো আগে *নসিব*, *রাধাকৃষ্ণ* এই সিনেমা দুটোও বাম্পার ব্যবসা করছে। *আলী বাবা চল্লিশ চোর* সিনেমাতেও দর্শকের জন্য সিনেমাহলে থাকা যায় নাই। ওইসব সিনেমার তুলনায় এখন ভালো সিনেমা হচ্ছে, তারপরও সিনেমাহলে লোক নাই।'

প্রদীপের পাশেই বসেছিলেন আ. খালেক। তিনি আগে সিনেমাহলে কাজ করতেন, এখন কাচামাল বিক্রি করেন। তিনিও সবার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেন।

তার ভাষায়, 'আর যতো ভালো সিনেমাই আসুক লোক আসবে কেনো, এখন সবাই ইন্টারনেটে মোবাইলে সিনেমা দেখে, মহিলারা তো সারাদিন দেখে স্টার জলসা। সেখানে একই কাহিনি ঘুরে ঘুরে দেখায়। আর সব কাহিনিতেই কোনো না কোনোভাবে পরকীয়া প্রেম আছেই।

বাংলাদেশের মহিলা-পুরুষরা এখন কেউ দেশের কোনো চ্যানেলও দেখে না। ভারতে একটা সিনেমা আছে না নায়ক, অনিল কাপুরের; সেখানে রাস্তার এক ফকির অনিল কাপুরকে বলে, আমি তো পঙ্গুই, তবে আমার দেশও পঙ্গু হয়ে গেছে। আসলে আমাদের দেশ পঙ্গু হয়ে গেছে।' এখানে আড্ডা শেষ করে চা পানের জন্য একটু বাইরে যাই। কিছু সময় পর আবার ফিরে আসি।

অভিরুচির দোতলায় টুকটাক কাজ আর বিরতির সময় ভিতরে খাবার বিক্রি করেন চায়না বেগম। তার মা আগে এখানে নারীদের বসানোর কাজ করতেন। অসুস্থ হওয়ায় সেই জায়গায় কাজ পেয়েছেন চায়না। কথা হয় তার সঙ্গে। চায়না জানান, আগে ভালো সিনেমা লাগলে মায়ের সঙ্গে দেখতে আসতেন। *অবাক পৃথিবী*, *রংবাজ*, *ঝড়ের পাখি* এইসব সিনেমা কথা এখনো মনে আছে চায়নার।

অভিরুচি ছাড়াও সেসময় সোনালিতেও চায়না সিনেমা দেখতেন। কেমন ছিলো সেসব সিনেমা– এমন প্রশ্নের জবাবে চায়না বলেন, 'আগের সিনেমা ছিলো সংসার নিয়ে। আর এখনকার সিনেমা খালি যুবক ছেলেমেয়েদের

জন্য। তাই সবাই তো এই সিনেমা দেখে না।' অনেক অনুরোধ করেও বেশি সময় নিয়ে কথা বলা যায় না চায়নার সঙ্গে। কথা শেষে তার ছবি তুলতে চাইলেও তিনি রাজি হন না।

চায়নার সঙ্গে কথা শেষ করে বিকেলে নাস্তার জন্য নীচে নেমে আসি। চা পান শেষে কথা হয় আলম হাওলাদারের সঙ্গে। আগে থেকে তার সঙ্গে কথা বলার বিষয়টি জানিয়ে রেখেছিলাম। পঞ্চার্ধ্বো আলম প্রায় ৪০ বছর ধরে অভিরুচির সামনে বাদাম-ছোলা বিক্রি করছেন। তিনি জানান, আগে আরো কয়েকজন ছিলো, এখন একমাত্র তিনিই আছেন। আগে সব সিনেমাই দেখতেন আলম।

তিনি জানান, সেসময় *ঝড়ের পাখি*, *অবুঝ মন*, *সীমানা পেরিয়ে*, *বসুন্ধরা*, *সূর্যকন্যা*, *রুপালি সৈকত*, *এখনই সময়* এর মতো সিনেমা ছিলো অন্যরকম কাহিনি নিয়ে। আজকের দিনে এধরনের কাহিনির সিনেমা হচ্ছে না।

আগের এইসব সিনেমার পরিচালক আলমগীর কবির, আবদুল্লাহ আল মামুন ছিলো অনেক বড়ো, শিক্ষিত মানুষ। আর এখনকার পরিচালকরা তো শিক্ষিত না।

আলম বলেন, আর একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখনকার সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের কেউ চেনে না। নায়ক-নায়িকাকে না চিনলে কাকে দেখতে সিনেমাহলে আসবে দর্শক। অন্তত দুইজনের মধ্যে যেকোনো একজনকে তো পরিচিত হতে হবে। এখন সবাই নতুন। তবে নতুন-পুরাতন মিলে ভালো কাহিনি দিয়ে সিনেমা বানালে এখনো দর্শক আছে।

যৌথ সিনেমা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আলম। তার ভাষায়, 'আগেও তো অনেক যৌথ সিনেমা হয়েছে। আমাদের শাবানাও যৌথ সিনেমা করছে। কিন্তু এখন তো ইন্ডিয়া থেকে সিনেমা বানায়া এনে যৌথ সিনেমা বলছে। এই সিনেমা কীভাবে যৌথ হয়! এখন নিজের স্বার্থের জন্য, পয়সার জন্য তারা এইভাবে যৌথ সিনেমা করছে। এটা হলো!'

আলমের সঙ্গে কথা শেষ করে আবার সিনেমাহলে উঠি। সেখানে কিছু সময় বসে থাকি। ৬.৩০-৯টার শো চলছিলো। দর্শক খুব বেশি নেই। গেইটম্যান কবির জানালেন, পুরনো সিনেমা হিসেবে দর্শক খারাপ না। অভিরুচি থেকে বের হয়ে এবার রবিশাল প্রেসক্লাবে চলে আসি সেখানে আজিমের মাধ্যমে আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো বরিশালের সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট এস এম ইকবালের সঙ্গে কথা বলার বিষষটি। রাত আটটায় সেখানে যাই। সেখানে বসে কথা হয় ষাটর্ধ্বো ইকবালের সঙ্গে।

ইকবাল জানান, বরিশালে সিনেমাহলের ইতিহাস বেশ পুরনো। এখানকার কমপক্ষে দুটি সিনেমাহল দীপালি ও জগদীশ দেশ ভাগের আগে প্রতিষ্ঠা হয়। দীপালি পরে নূরমহল হয়ে অভিরুচি নামে এখনো চলছে। আর জগদীশ বিক্রির পর নাম পরিবর্তন করে কাকলি হয়। এটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই দুটো সিনেমাহলের মালিক ছিলেন হিন্দু। সেই তুলনায় অপেক্ষাকৃত নতুন সিনেমাহল সোনালি; তবে সেটাও ১৯৪৬ এর আগে নয়। সোনালির মালিক ছিলেন সুকুমার দাস। এছাড়া আরেকটি সিনেমাহল ছিলো বিউটি। এটি পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠা হয়। এটি ছিলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

ইকবাল বলেন, ৬২ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে কিন্তু সিনেমার তেমন কোনো সেট আপ তৈরি হয়নি। তখন মূলত পুরোপুরি নির্ভরতা ছিলো ভারতের সিনেমার ওপর। আমি নিজে এখানে দিলীপ কুমারের সিনেমা দেখেছি, আর উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা বলতে তো সবাই পাগল। তখন সারা দেশের অবস্থা কী ছিলো জানি না, তবে বরিশালের লোকজন তখন উত্তমের মতো করে ঢোলা পায়জামা পড়তো।

আমার মনে আছে, সেইসময় একবার আমি ঢাকা গেলাম, ওখানে গাড়িতে এক লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার বাড়ি কি বরিশাল? আমি বললাম, কেনো? উনি বললেন, আপনার পরনের ঢোলা পায়জামা দেখে মনে হলো। আমরা তখন ঢোলা পায়জামা আর শার্ট পরতাম। তখন যেকোনো নতুন সিনেমা আসলে সিনেমাহলে মারামারি বেধে যেতো।

আর উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা হলে তো কথাই নাই। তখন টিকেট খুব কালোবাজারি হতো। তখন *হারানো সুর*, *পথে হলো দেরি*'র মতো সিনেমা খুব চলছে। আমি এমন দর্শকও পেয়েছি, যিনি দিন ১২টায় সিনেমাহলে ঢুকে একেবারে রাত ১২টায় বের হতো। একই সিনেমা চারবার দেখতো।

জগদীশ সিনেমাহল আমাদের বাড়ির পাশেই। তখন টিকেট ছিলো ১৪ আনা। সেই টাকাও আমরা অনেক সময় জোগাড় করতে পারতাম না। তখন দরজার ফুটো দিয়ে আমরা সিনেমা দেখার চেষ্টা করতাম। ১৯৬৪ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এই সিনেমা বন্ধ হয়ে গেলো।

তারপর হঠাৎই বাংলাদেশের সিনেমার উত্থান দেখা গেলো। সেই সময় ঢাকার সিনেমা হয়তো এতো ভালো ছিলো না, তবে মোটামুটি চলতো। জহির রায়হানের *সঙ্গম* নামে একটা উর্দু সিনেমা সেই সময় খুব ব্যবসা করে। আমিও সেটা দেখেছিলাম। আর পাকিস্তানি সিনেমা তো ছিলোই।

সেই সময় আরেকটা সিনেমা খুব ব্যবসা করছে *রূপবান*। তখন তো *রূপবান* যাত্রাপালাও হতো। আমি শুনেছি, রূপবান যাত্রাপালায় যে বাঁশটা ধরে নায়িকা রূপবান কাঁদতো, সেটাও নাকি কয়েক শো টাকায় বিক্রি হতো।'

ইকবাল জানান, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কিছু দিন ভারতের সিনেমা চলেছে। তার ভাষায়, 'ভারতের সিনেমা, টেলিভিশন সব বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষের একটা ঝোঁক সব সময় ছিলো। তারা এসব চ্যানেল সব সময় দেখেছে, এখনও দেখছে। আমাদের এখানে অনেক টিভি হয়েছে, কিন্তু মানে বাড়েনি।

হুমায়ূন আহমেদ তার সাহিত্যে, নাটক ও সিনেমায় একটা পরিবর্তন কিন্তু এনেছিলেন। অয়োময়, কোথাও কেউ নেই নিয়ে সেসময় খুব আলোচনা ছিলো। বাকের ভাইকে নিয়ে তো সারা দেশে তোলপাড় হলো। তারপর তো আর কেউ এভাবে করতে পারলো না। আর এখন তো ঘরে ঘরে ভারতের চ্যানেল ছাড়া কিছুই চলে না। তবে এটা মোটেও আমাদের সংস্কৃতির জন্যে ভালো কিছু বয়ে আনছে না। এগুলো আমাদের পারিবারিক জীবনে প্রভাব ফেলছে। সব মিলিয়ে আমরা সিনেমাহলে কোয়ালিটি কোনো সিনেমা দেখাতে পারছি না। কোয়ালিটি সিনেমা হলে দর্শক দেখতে বাধ্য।'

দীর্ঘ সময় নিয়ে কথা বলেন ইকবাল। তার সঙ্গে কথা শেষ করে প্রেমক্লাব থেকে আবার অভিরুচিতে ফিরে আসি। সকাল থেকে চেষ্টা করছিলাম অভিরুচির মালিক এবায়দুল হক চাঁনের সঙ্গে কথা বলার। খোঁজ নিয়ে

জানতে পারি তিনি রাতে সিনেমাহলের নীচের একটি রেস্টুরেন্টে আসবেন। রাত সাড়ে নয়টার দিকে সেখানে গিয়ে খোঁজ করে তার দেখা পাই। পঞ্চার্ধ্বো এবায়দুল খুব আগ্রহ নিয়ে কথা বলেন।

এবায়দুল জানান, মানুষের বিনোদনের ব্যবস্থা, সঙ্গে ব্যবসা– দুটো বিষয় চিন্তা করেই সেসময় তারা সিনেমাহল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে সরাসরি প্রায় ৪০–৫০ জন লোকের কর্ম সংস্থানেরও ব্যবস্থাও হয়েছিলো।

এর বাইরে আগে অভিরুচির সামনে প্রায় ২০–২৫ জন মানুষ কালোবাজারি, বাদাম, পান, সিগারেট বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেছে। কারণ একটা সিনেমা মুক্তি দেওয়ার পর ১৫–২০ দিন হাউসফুল থাকতো। ফলে যারা কালোবাজারি করতো এটা কিছু মানুষের পেশা হয়ে গিয়েছিলো বলে মনে করেন এবায়দুল।

এবায়দুল মনে করেন, ডিস আসার পরে যখন থেকে বিভিন্ন চ্যানেলে কোনো বিধি-নিষেধ না মেনে সিনেমা দেখানো শুরু হলো, তখন থেকে সিনেমাহলের ব্যবসা কমতে থাকে।

এবায়দুলের ভাষ্যমতে, যখন একজন লোক ১০ মিনিট চায়ের দোকানে বসে চা খায়, একই সঙ্গে সে টেলিভিশনে কোনো সিনেমাও দেখে। ওই লোক সারাদিনে দুই কাপ চা খাওয়ার সময়ের মধ্যেই সে বিনোদন নিয়ে নেয়। চা পানও হয় সিনেমা দেখাও হয়।

ফলে আলাদাভাবে টাকা খরচ করে ওই লোক কেনো সিনেমাহলে আসবে! এছাড়া ডিসের মাধ্যমে আমাদের পাশ্ববর্তী দেশের নানা চ্যানেলে সারা দিন সিনেমা হতে থাকে। অনেকে বাড়িতে বসেও সেটা দেখে।

আমি পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ ভ্রমণ করেছি। কিন্তু কোনো দেশে আমি দেখেনি যে পার্শ্ববর্তী বা বাইরের দেশের কোনো চ্যানেল তারা এভাবে বিনা পয়সায় দেখে। ওখানকার বেশিরভাগ চ্যানেল দেখার জন্য গ্রাহককে টাকা দিতে হয়।

আমাদের দেশে আপনি একটা ডিস সংযোগ নিলেই দেশ-বিদেশের যেকোনো চ্যানেলের অনুষ্ঠান, সিনেমা দেখতে পারছেন। তাহলে মানুষ কেনো সিনেমাহলে যাবে! এগুলো আসলে দেশের স্বার্থে বন্ধ করা দরকার। এতে কী হবে অন্তত আমাদের দেশের শিল্পীরা উপকৃত হবে, সিনেমার উন্নতি হবে। শিল্পীরা যদি ঠিক মতো টাকা না পায়, তারা ভালো কাজ করবে কীভাবে? সেজন্য আমার মনে হয়, এভাবে ঢালাও সব চ্যানেল না চালিয়ে কিছু বন্ধ করে দেয়া উচিত। তাতে অনেকক্ষেত্রেই উপকার হবে।'

ভালো সিনেমাহলে এখনো অনেক নারী সিনেমাহলে আসে বলে জানান এবায়দুল। তিনি বলেন, তবে তারপরও আগের সেই নারী দর্শক আর নাই। মহিলারা এখন চাইলেই যেকোনো সিনেমা, নাটক দেখতে পারে। তাদের আসার আগ্রহ কমে গেছে।

তবে সিনেমার এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এখন আমাদের বহুভাষার মান সম্পন্ন সিনেমা নির্মাণ করতে হবে বলে এবায়দুল মনে করেন। সেই সিনেমা শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতে চলবে। এবায়দুলের সঙ্গে কথা শেষ করে সেদিনের মতো অভিরুচি থেকে বিদায় নিই।

১২ আগস্ট ২০১৭ আজ যাত্রা শুরু পটুয়াখালীর উদ্দেশে। পটুয়াখালীর বাউফল ছাড়া আর কোনো উপজেলায় সিনেমাহল না থাকায়, সদরকেই বেছে নিতে হয়। তাই পটুয়াখালীর উদ্দেশে বরিশালের রুপাতলী বাসস্ট্যান্ড

থেকে আমি যাত্রা শুরু করি সকাল পৌনে আটটায়। সরাসরি রবিশাল থেকে পটুয়াখালী রুটে চলে এসব বাস। যাত্রা শুরুর পর বাসটি সেরনিয়াবাত ব্রিজ পার হয়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ধরে এগিয়ে যেতে থাকলো। ঘণ্টাখানেক চলার পর পাওয়া গেলো লেবুখালি নদী। সেখানে ব্রিজ নির্মাণের কাজ চলছে পুরোদমে। পাশেই ফেরিঘাটের চিরচেনা পরিবেশ – হকার, ভিক্ষুক ও অস্থায়ী নানা খাবার দোকান। সামান্য বিরতি দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ফেরি পার হওয়া গেলো। ফেরি পারের পর পটুয়াখালী পৌঁছোতে খুব বেশি দেরি হলো না। বাস গিয়ে চৌরাস্তায় থামতেই নেমে পড়লাম।

তারপর অটোরিকশায় তিতাস সিনেমাহল। ওই মোড়টির নাম এখন সিনেমাহলের নাম অনুযায়ী তিতাস মোড়। তিতাস মোড়ে যখন পৌঁছালাম তখন সকাল পৌনে দশটা। রাস্তা থেকে সিনেমাহলটি দেখা যায়। বিশালকৃতি ওই ভবনটির মলিনতায় সিনেমার বর্তমান অবস্থার কথা মনে করে দেয়।

মূল রাস্তা থেকে হাত দশেক ভিতরে তিতাস। ইট বিছানো একটা রাস্তা গিয়ে মিলেছে সিনেমাহলের প্রধান ফটকে। প্রধান ফটকের সামনে ঘেরা খানিকটা ফাঁকা জায়গা; দুর্বাঘাসে ভরা। তবে সেখানে পানি জমে আছে। চারদিকটা কেমন একটা বোটকা গন্ধ, স্যাঁতসেতে।

সিনেমা চলছে জাকির হোসেন রাজুর *প্রেমী ও প্রেমী*। প্রধান ফটকেই আমার পরিচয় জানতে চান তালেব মিয়া। সিনেমাহলের ঝাড়ুদার ও প্রহরীর কাজ করেন তিনি। ষাটোর্ধ্বো তালেব নিজে থেকেই সিনেমাহল নিয়ে নানা ক্ষোভের কথা জানান।

বাউফলের শহীদ মিয়া জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে এই সিনেমাহল প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানান তালেব। তখন এর নাম ছিলো সৈকত সিনেমা। মালিক অনেক টাকা ঋণ নিয়ে এই সিনেমাহলটি করেছিলো। ঋণ শোধ করতে না পারায় সিনেমাহলটি পরে নিলামে উঠলে ঢাকার এক লোক এটি কিনে নেন এবং নাম রাখেন তিতাস। ওই মালিকও কয়েক বছর আগে মারা যান, এখন আমিন মিয়া বলে একজন সিনেমাহলটি পরিচালনা করছেন।

ঢাকার মালিক যখন সিনেমাহল কেনে তখন থেকে তিতাসের সঙ্গে আছেন তালেব। এর মধ্যে অবশ্য কয়েকবার সিনেমাহল ছেড়ে অন্য কাজও করেছেন। কারণ এখানে যে বেতন পান তা দিয়ে তার চলে না। তবে আবার ফিরে এসেছেন।

তালেব বলেন, সিনেমাহলে লোকজন খুব কমে গেছে। এখন দুই ঈদে ছাড়া এখানে তেমন লোকজন হয় না। তার মধ্যে আবার রোজার ঈদে বেশি হয়, কোরবানির ঈদে সবাই ব্যস্ত থাকে মাংস নিয়ে। তাই খুব বেশি লোক হয় না।

পটুয়াখালিতে এখন আর রিলিজ সিনেমা কেউ চালায় না। বেশিরভাগ সময় পুরানো সিনেমা চলে। এটা দিয়ে কারো পেটই চলে না। এছাড়া মোবাইলের কারণেও কেউ আর এখন সিনেমা দেখতে আসে না। এখন সিনেমাহল মানুষের পকেটে। এখন ঘরে ঘরে টেলিভিশন, ডিস। মেয়েরা এখন সারা দিন ওগুলো দেখে। ওগুলো বাদ দিয়ে এসে কে এখন এই ছারপোকার কাপড় খায়! মেয়েরাও এখন অনেক হিসাবি।

তালেবের সঙ্গে কথা শেষ করে সিনেমাহলের ভিতরে ঢুকি। বোটকা গন্ধটা কেমন জানি তীব্র হয়। অগত্যা বাইরে চলে আসি। সেখানেই দেখা হয়, আ. মান্নানের সঙ্গে। মান্নান এই সিনেমাহলে দীর্ঘদিন সাইকেল গ্যারেজ, ঝাড়ুদারের কাজ করতেন। বয়স হওয়ায় কিছুদিন আগে মালিক তাকে তিন মাসের বেতন দিয়ে চাকরিচ্যুত করেছে; এ নিয়ে তার বেশ ক্ষোভ।

মান্নান জানান, প্রায় ৪০ বছর হলো তিনি এই সিনেমাহলে কাজ করেছেন। শুরু থেকেই তিনি এই সিনেসাহলের সঙ্গে ছিলেন। তার ভাষায়, 'এখন বয়স হয়েছে কারণে বর্তমান মালিক আমাকে তিন মাসের বেতন দিয়ে বের করে দিয়েছে। এখন আমার করার কিছু নাই। তাই রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াই। কিন্তু সিনেমাহলের মায়া ছাড়তে পারি না। এই সিনেমাহলের প্রতি ইটে ইটে আমার রক্ত আছে। আমি এই সিনেমাহল এখনো ভালোবাসি। এটা অনেক বড়ো মায়া। তাই এখনো প্রতিদিন আসি।'

মান্নান জানান, এই সিনেমাহলে এক সময় অনেক লোক হতো। সে সময় সিনেমার কাহিনি ভালো ছিলো। তার ভাষায়, 'এখন তো দেখা হওয়ার আগেই প্রেম হয়। তারপর খালি মারামারি, কাটাকাটি। এই সিনেমা দেখতে কেউ আসে নাকি।

আগে রাজ্জাক, শাবানা, সুজাতার সিনেমা কতো ভালো ছিলো। ওই সিনেমা দেখে দেখে মানুষের চোখ দিয়ে পানি পড়তো। আর এখন কান্নার দৃশ্য আসলে মানুষ হাসে। কী যে অভিনয় করে, সেটা ওরাই জানে না। এভাবে ধীরে ধীরে লোক কমতে শুরু করলো।

সিডি, ডিভিডি সর্বশেষ তক্তার মতো বড়ো মোবাইল ফোনের কারণে সিনেমার ব্যবসার আজ এই অবস্থা হয়েছে।'

কথা শেষ করে মান্নান জানান, ১১টার দিকে সিনেমাহলের অন্যান্য লোকজনেরা আসবে। তখন তাদের সঙ্গে কথা বলা যাবে। এই ফাঁকে আমি সকালের নাস্তার জন্য তিতাস মোড়ে যাই। নাস্তা শেষে দ্রুতই সিনেমাহলে ফিরে আসি। প্রধান ফটকের পাশে একটা ছোটো বেঞ্চ রাখা, সেখানে বসতেই সিনেমাহলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একজন। নাম মো. মামুন খান, তিতাসের টিকেট মাস্টার। মামুনের বাড়ি বরিশালের বাকেরগঞ্জ। সম্পর্কে তিনি বর্তমান মালিকের আত্মীয়। আট বছর ধরে মামুন সিনেমাহলের সঙ্গে যুক্ত। যখন এখানে মামুন কাজ শুরু করেছিলেন তখনও ব্যবসা ভালোই ছিলো বলে তিনি জানান।

মামুন বলেন, এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যবসা করছে *মনপুরা* নামে একটা সিনেমা। তবে এর আগে অন্য সিনেমাহলে আমি সিনেমা দেখছিলাম, দুইটা সিনেমার কথা আমার মনে আছে *বেদের মেয়ে জোস্না* আর *কাসেম মালার প্রেম*। অল্প কিছুক্ষণ কথা হয় তার সঙ্গে।

মামুন জানান, তিনতলায় মালিকের ভাই ও অপারেটর মজিবর রহমান আছে। চাইলে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমি সুযোগ পেয়ে যাই। মামুন আমাকে এবার তিনতলায় নিতে যেতে থাকে।

সিনেমাহলের ভিতরে যতো উঠতে থাকি, ততো কেনো জানি বোটকা গন্ধটা বাড়তে থাকে। লজ্জায় আমি আর কিছু বলতেও পারি না। তিনতলায় গিয়ে দেখা হয় মজিবরের সঙ্গে। তিনি কেবল গোসল সেরে কাপড় পরে

নীচে নামার জন্য তৈরি হচ্ছেন বলে মনে হলো। পরিচয় দেওয়ার পর খুব একটা গুরুত্ব দিলেন বলে মনে হলো না। তবে নিজে থেকেই প্রজেক্টর কক্ষে নিয়ে গিয়ে সব দেখালেন। আমি সেই সুযোগে ছবি তুললাম।

তারপর নিজে থেকেই নিয়ে গেলেন দোতলায় তার থাকার কক্ষে। সেখানেই নানা বিষয়ে কথা হলো তার সঙ্গে। শুরু থেকেই চলচ্চিত্রের লোকজনের ওপর খুব রাগ দেখাচ্ছিলেন মজিবর। তার ভাষায়, 'এখন যেসব সিনেমা তৈরি হচ্ছে, তার একটাও ব্যবসা করার জন্য নয়। এরা কেউই ফিলিম বানাতে আসে নাই, ফুর্তি করতে আসছে। আর কেউ কেউ আসছে কালো টাকা সাদা করতে।'

মজিবর ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে টানা ২৫ বছর ধরে প্রতিনিধির কাজ করেছেন। গত দুই বছর হলো তিনি তিতাসে কাজ করছেন। মজিবর জানান, ঢাকার তিতাস কথাচিত্রের মালিক আবুল কালাম আজাদ প্রথমে এই সিনেমাহলটি কিনে নাম দেন তিতাস।

আট বছর আগে মজিবরের ভাই আমীর হোসেন এই সিনেমাহলটি আবুল কালামের কাছ থেকে কিনে নেন। তিতাস কথাচিত্র কমপক্ষে ১৭-১৮টি সিনেমা প্রযোজনা করেছিলো। এখন তারা আর এই ব্যবসা করে না। এভাবে বাংলাদেশে এখন আর কোনো প্রযোজক নাই। এখন যে দুই-একজন কাজ করছে, তাদের কোনো সিনেমা একটু ব্যবসা করলেই অন্যরা শত্রু হয়ে যায়। এরফলে ব্যবসার অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে গেছে।

৯০ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করেন, তখন ব্যবসা অনেক ভালো ছিলো বলে জানান মজিবর। সালমান শাহের মৃত্যুর পর রিয়াজ, শাকিল খানও অনেক সিনেমায় ভালো ব্যবসা করছে। পরে মান্নার সিনেমাও ভালো ব্যবসা করছে।

মজিবর জানান, *বর্তমান* ও *মাস্তানের উপর মাস্তান* নামে দুইটা সিনেমা ছিলো, এগুলো সেসময় খুব ব্যবসা করছিলো। যতো লোক সিনেমাহলের ভিতরে ছিলো, তার চেয়ে বেশি লোক ছিলো বাইরে।

কথা শেষে মজিবর চা পানের জন্য আমাকে তিতাস মোড়ে নিয়ে যান। সেখানেই দেখা হয় তিতাসের ম্যানেজার মোতালেব হোসেনের সঙ্গে। চা শেষে মোতালেব, মজিবর মিলে আমরা চলে আসি তিনতলার ম্যানেজারের কক্ষে। সেখানে দীর্ঘ সময় কথা হয় মোতালেবের সঙ্গে। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে থেকে তিনি এই সিনেমাহলের সঙ্গে যুক্ত।

মোতালেব জানান, যতোদূর সম্ভব ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সৈকত প্রতিষ্ঠা হয়। এর কিছু দিন আগে তার বাবা মারা যান। পরিবারের অবস্থা তখন খুব সঙ্কটাপূর্ণ ছিলো, তাই তখন একটা চাকরির খুব দরকার ছিলো। তাই তখন বুকিং ক্ল্যার্ক হিসেবে তিনি সিনেমাহলে চাকরি নেন।

মোতালেব বলেন, সেই সময় স্থানীয় মস্তানদের সঙ্গে সিনেমাহলের মালিকের একটা সমস্যা হয়। আমার বাড়ি যেহেতু শহরের কাঠপট্টিতে এবং আমাদের বংশের লোকজন অনেক, আমি সেসময় মালিককে খুব সাহায্য করি। মালিক খুশি হয়ে কিছু দিন পর আমাকে ম্যানেজারের দায়িত্ব নিতে বলে। কিন্তু আমি তো লেখাপড়া জানি না, তাই এ দায়িত্ব নিতে আমি অপারগতা প্রকাশ করি। মালিকের এক ভাই ছিলো শিক্ষিত। মালিক বলে, তুমি সিনেমাহল দেখবে আর আমার ভাই হিসাব দেখবে। এই শর্তে আমি রাজি হই।

তারপর টানা তিন বছর ম্যানেজারের কাজ করি। এই সময় পটুয়াখালীর আরেকটি সিনেমাহল মুকুলের মালিকের ছেলে আমাকে ডেকে প্রস্তাব দিলো, উনি মির্জাগঞ্জে একটা সিনেমাহল করবে আমি যেনো সেখানে ম্যানেজার হিসেবে যাই। নতুন সিনেমাহলের কারণে আমি রাজি হই এবং সৈকত ছেড়ে দিই।

সিনেমাহল তৈরি করতে গিয়ে নানা সমস্যা হচ্ছিলো, আমার বাবা ভালো ব্যবসায়ী ছিলো, সেই সূত্রে আমাদের কিছুটা নামডাক ছিলো। আমি সেগুলো ব্যবহার করে সেসব সমস্যা মেটাচ্ছিলাম। অনেকের কাছ থেকে আমি নিজের দায়িত্বে বাকিতে জিনিস কিনে দিচ্ছিলাম। কিন্তু ওই ব্যবসায়ীরা আমাকে এটা করতে নিষেধ করলো। আমি ব্যাপার বুঝে চাকরি ছেড়ে চলে আসলাম। কিন্তু আমার ওই মালিক ছাড়লো না।

তিনি আমার কাছে এসে ওই সিনেমাহলে চার আনা শেয়ার দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। আমি এতে রাজি হয়ে গেলাম। এবার ম্যানেজার থেকে মালিক হয়ে গেলাম। ১৯৯০ সালের ৪ মার্চ আমরা মির্জাগঞ্জে পায়রা সিনেমাহল উদ্বোধন করলাম। প্রথম সিনেমা ছিলো *শিমুল পারুল*। এই সিনেমাহল দিয়ে আমি খুব ভালো ব্যবসা করতে পারছিলাম না। বছর তিনেক পরে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসি।

এরপর কিছু দিন বসেই ছিলাম। টাকা-পয়সার খুব কষ্ট গেছে সেসময়। পরে ব্যাংকের এক ম্যানেজারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কী একটা কারণে তার চাকরি চলে গেছে। তার হাতে টাকা ছিলো। তাকে নিয়ে মহীপুরে আমি আবার একটা সিনেমাহল প্রতিষ্ঠা করি; নাম দিই নুপুর।

এই সিনেমাহল দেওয়ার সময় ঢাকার সজীব ফিল্মস এর মালিক জাহাঙ্গীর আলম আমাকে খুব সাহায্য করেছিলো। অনেকভাবে টাকা দিয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করেন। ২০০০ সালের দিকে নুপুর সিনেমাহল দেওয়ার পর আমার অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। সেই সময় কয়েক বছর কিছু সিনেমায় আমরা টানা খুব ভালো ব্যবসা করি। ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোটামুটি ভালো ব্যবসা গেছে। এরপর লোকসান হওয়া শুরু হলো। ২০১০ সালে আমরা সিনেমাহলটা বিক্রি করে দিলাম। এরপর দুই বছর বসে ছিলাম। একদিন তিতাসের মালিকের কাছে এসে চাকরি চাইলাম। আমি বললাম, বেতন দিতে হবে না। আমি নিজে থেকে যা পাই, তাই দিয়ে চলবো। মূলত বসে থাকতে আমার আর ভালো লাগছিলো না। তারপর থেকে এখানেই আছি।

মোতালেব জানান, তিনি যখন সিনেমাহলে ঢুকছিলেন, তখন সব সিনেমাই ভালো ব্যবসা করতো। এগুলোর মধ্যে *অশ্রু দিয়ে লেখা*, *অবাক পৃথিবী*, *নীতিবান*, *অপেক্ষা* এসব সিনেমার কথা এখনো ভুলতে পারেন না মোতালেব। তার ভাষায়, ‘এখনকার ডিরেক্টররা তো আগের দিনের সুপারহিট সিনেমাগুলো আবার নতুন করে বানাতে পারে। তাহলেও তো অনেক সিনেমা ভালো চলতো।’

পটুয়াখালীর প্রথম সিনেমাহল লাইট হাউস বলে জানান মোতালেব। এর মালিক ছিলো রাজা মিয়া। এরপর মকবুল মিয়া প্রতিষ্ঠা করেন মুকুল সিনেমাহল। লাইট হাউস পরে বিক্রি হয়ে গেলে, নতুন মালিক নাম রাখে রুপালি। পরে রুপালিও বন্ধ হয়ে যায়। মুকুল বিক্রি হলে নতুন মালিক এর নাম রাখে মনপুরা সিনেমাহল। মনপুরাও পরে বন্ধ হয়ে যায়।

মোতালেব বলেন, কাটপিসওয়ালা সিনেমাগুলো সে সময় খুব ভালো চলছিলো। কিন্তু নারী দর্শক সিনেমাহল থেকে চলে গেছে। তবে ডিজিটাল হওয়ার পর কিন্তু এখন আবার নারী দর্শক আসতেছে।

ভালো সিনেমা তৈরি না হলে নারী দর্শক আসবে কেনো? নারী-পুরুষ কোনো দর্শকই তখন সিনেমাহলে আসবে না।

আমাদের দেশে এখন কোনো ভালো নায়ক-নায়িকা নেই। কাহিনির অবস্থাও খারাপ। এই যে কিছুদিন আগে *ময়নামতি* সিনেমাটা রিমেক করলো *অনেক সাধের ময়না* নামে। আগের *ময়নামতি*র মতো কোনোকিছুই এই সিনেমায় ফুটে তুলে পারে নাই। তারপরও মানুষ কিন্তু দেখছে। এইভাবে যদি পুরনো দিনের সিনেমাগুলো আবার বানায়, তাহলেও কিছু দর্শক সিনেমাহলে আসবে।

মোতালেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ১২.৩০–৩টার শোয়ের সময় হয়। মামুন কাউন্টারে না বসে প্রধানফটক পেরিয়ে সিনেমাহলের ফাঁকা জায়গাটায় একটা চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে টিকেট বিক্রি করতে বসে যান। সিনেমাহলে ডিসি ও সুধী-সৌখিনের গেইট খুলে দেওয়া হয়েছে। গান বাজছে। আমি এই ফাঁকে পুরো সিনেমাহলটা ঘুরে দেখি।

ডিসির অবস্থা ভালো না, অনেক আসন ভাঙা। কোনো আসনেই গদি নাই। বোটকা একটা গন্ধ। নীচে সৌখিনের অবস্থা আরো খারাপ; বেশিরভাগ চেয়ার ভাঙা আর বোটকা গন্ধটাতো আছেই।

বাইরে এসে দেখি দুই-চারজন দর্শক আসা শুরু হয়েছে। মামুন তাদের টিকেট দিয়ে উপরে যেতে বলছেন। ততোক্ষণে আরো কয়েকজন কর্মচারী চলে এসেছেন। তাদের একজন হিসাবরক্ষক এম ডি রাসেল। কথা হয় তার সঙ্গে।

রাসেল ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই সিনেমাহলে কাজ শুরু করেন। তিনি জানান, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিনেমাহলের ব্যবসা খুব ভালো ছিলো। এরপর ডিপজল সাহেবরা সিনেমায় এসে পরিস্থিতি খারাপ করে দিলো। সেই অবস্থা ভালো হয়েছে পরে, কিন্তু দর্শক সিনেমাহলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। আর বর্তমানে তো সিডি, মোবাইল আর পাইরেসি। সেজন্য দর্শক আর আসে না।

রাসেলের সঙ্গে কথা শেষ করার কিছু সময় পর আটজন দর্শক নিয়ে শুরু হয় *প্রেমী ও প্রেমী*র ১২.৩০–৯টার শো। আমি কিছু সময় অপেক্ষার পর একটা রিকশা নিয়ে বের হই পটুয়াখালী সদরে বন্ধ হয়ে যাওয়া আরো দুটি সিনেমাহল রুপালী ও মনপুরার ছবি তুলতে।

শহরের ভিতরে মনপুরা সিনেমাহল ভেঙে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে খান মহল কমিউনিটি সেন্টার। সিনেমাহল সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার মতো তেমন কোনো লোক সেখানে পাওয়া গেলো না। কারণ সিনেমাহলটির অনেকবার হাত বদল হয়েছে। নতুন প্রজন্মের অনেকে তাই এ নিয়ে কিছু বলতে পারে না।

সেখানে ছবি তুলে চলে আসি রুপালী সিনেমাহলে। সদর রোডে রুপালী সিনেমাহলের অস্তিত্ব এখনো আছে। তবে তা বন্ধ প্রায় ১২ বছর হলো। এই সিনেমাহলের প্রথম নাম ছিলো ছায়াবাণী।

শোনা যায়, ছায়াবাণী ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হীরালাল বাবু। এরপর এটি কিনে নেন আহসান তালুকদার। তিনি এর নাম পরিবর্তন করে রাখেন লাইট হাউস। সর্বশেষ ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে এটি কিনে নেন কলম শরীফ নামে একজন। তিনি এর নাম দেন রুপালী সিনেমা।

পরে ২০০5 খ্রিস্টাব্দের দিকে এটি বন্ধ হয়ে যায়। রুপালী সিনেমাহলটি পুরোটা টিন দিয়ে তৈরি। এখনো পুরো কাঠামোটি আছে। তবে সামনের অংশটাতে দোকান করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। রুপালীর সামনে কথা হয় মুদি দোকানদার খোকন দে'র সঙ্গে।

প্রায় ৬০ বছর ধরে সিনেমাহলের সামনে দোকান করছে খোকনের পরিবার। বাবার দোকানের সূত্রে খোকনের শৈশব, কৈশোর, যৌবন কেটেছে এই সিনেমাহলের সঙ্গেই।

খোকন বলেন, এক সময় এই সিনেমাহলে দর্শক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মাসে দুই-তিনবার পুলিশ আনতে হতো। ৮০'র দশক পুরোটা এখানে জমজমাট ব্যবসা ছিলো।

বেদের মেয়ে জোস্না এই সিনেমাহলে তিন মাস চলছে। *বিরোধ* সিনেমাটা চলছে প্রায় দেড় মাস। লাইট হাউস থেকে রুপালি হওয়ার পর এই সিনেমাহলটা উদ্বোধন হয়েছিলো *যোগাযোগ* সিনেমা দিয়ে।

রুপালি সিনেমাহল সেসময় খুব নীচু ছিলো, টিন দিয়ে বানানোর কারণে সেসময় জোয়ার হলে নীচ দিয়ে পানি ঢুকতো। দর্শক ওই পানির মধ্যে বসেই সিনেমা দেখতো। অথচ সেই সিনেমাহল চোখের সামনে বন্ধ হয়ে গেলো। এখন তো সিনেমায় কোনো কাহিনি নাই। এক নায়ক শাকিব খান, সেই সব সিনেমা করে। এক নায়কের চেহারা দেখতে দেখতে মানুষ অতিষ্ঠ। তাহলে দর্শক সিনেমা দেখবে কেনো!

খোকন মনে করেন, কাটপিসওয়ালা সিনেমার দর্শক বাংলাদেশে আছে। তবে এসব সিনেমার কারণে আবার এই ব্যবসায় ধসও নামছে। বিশেষ করে নারী দর্শক নাই বললেই চলে।

তবে এখনকার খারাপ অবস্থার জন্য দায়ী স্মার্ট ফোন। এখন মানুষের হাতে সময় কম। তারা তাই মোবাইলে সিনেমা দেখে। তবে সিনেমাহল আবার সক্রিয় করতে গেলে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।

মানুষকে সিনেমা সম্পর্কে বোঝাতে হবে। অন্যদিকে ভালো সিনেমা বানাতে হবে। যাতে দর্শক সিনেমা দেখে হতাশ হয়ে ফেরত না যায়। মষুলধারে বৃষ্টি নামায় সেদিনের মতো রুপালী সিনেমা থেকে বিদায় নিতে হয়।

বৃষ্টি এড়িয়ে যখন তিতাসে আসি তখন বিকেল সাড়ে তিনটা। শো শেষ হয়েছে। সিনেমাহল ফাঁকা, সেখানে দেখা হয় মজিবর আর মামুনের সঙ্গে। তারা জানান, বৃষ্টির কারণে আজ আর মনে হয় কোনো লোক আসবে না। কিছুক্ষণ বসে থেকে সেদিনের মতো তিতাস থেকে বিদায় নিই।

১৩ আগস্ট ২০১৭ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তিতাসে পৌঁছি। তখনো মামুন ছাড়া আর কেউ। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে দুই-চারজন দর্শক আসেন। আমি বসে থাকি। ১২টার দিকে নতুন একজন লোক আসেন। তাকে অবশ্য গতকাল দেখিনি।

মামুন জানান, জয়নাল শরীফ গেইটম্যান। কথা হয় জয়নালের সঙ্গে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে সিনেমাহলের সঙ্গে আছেন জয়নাল। এর আগে তিনি সৌদি আরব প্রবাসী ছিলেন। ভিসার জটিলতার কারণে অল্প সময় পরেই সেখান থেকে তাকে ফিরে আসতে হয়েছিলো। দেশে ফিরে কোনো কাজ ছিলো না জয়নালের। তাই একধরনের নিরুপায় হয়ে তৎকালীন ম্যানেজার নাসিরের সহায়তায় তিনি সিনেমাহলে কাজ শুরু করেন। নাসির তার প্রতিবেশি ছোটোভাই।

জয়নাল জানান, শুরুর সময়ে সিনেমাহলের ব্যবসা ভালোই ছিলো। ২০০১ এর দিকে কাটপিস সিনেমা আসার পর ব্যবসা ভালো হয়। কিন্তু কাটপিস বন্ধ হওয়ার পর সিনেমাহল দর্শক শূন্য হয়ে পড়ে।

তারপর আবার ডিজিটাল হওয়ার পর কিছু দিন ব্যবসা ভালোই চলছিলো। কিন্তু তখন সিনেমা ভালো তৈরি হচ্ছিলো না। সিনেমার কাহিনি একইরকম হতে থাকে। বিশেষ করে একই নায়কের সিনেমা হতে থাকে। ধীরে ধীরে দর্শক কমতে থাকে। বর্তমানে অবস্থা একেবারে শোচনীয়।

জয়নাল মনে করেন, এখন আগেরকার দিনের *ক খ ঘ ঙ*, *কাগজের নৌকা*, *সত্য মিথ্যা*'র মতো সিনেমাগুলো রিমেক করা উচিত। কারণ এখন কাহিনির খুব অভাব।

দেশে এখন এক আবদুল্লাহ জহির বাবু ছাড়া আর কোনো লোক নাই সিনেমার কাহিনি লেখার। একজন লোক আর কতো কাহিনি লিখবে! ফলে ঘুরেফিরে একই কাহিনির সিনেমা তৈরি হচ্ছে। কাহিনি দিয়ে বিনোদন দিতে না পারলে দর্শক সিনেমা দেখবে কেনো? তিন ঘণ্টা সে সিনেমাহলে কেনো বসে থাকবে।

জয়নাল বলেন, দর্শককে আমরা আর কতোবার ঠকাবো। আমরা ভালো সিনেমার কথা বলে পাবলিসিটি করে দর্শক আনার চেষ্টা করি। কিন্তু দর্শক সিনেমা দেখার পর হতাশ হয়ে ফেরত যায়।

দর্শক যদি সিনেমাহলে এসে বিনোদন, কিছু শিক্ষা পায়, তাহলে সে পরবর্তী সময়ে অবশ্যই সিনেমাহলে আসতে চাইবে। সে নিজে আসবে আরো পাঁচজনকে নিয়েও আসবে। এখন দর্শক তো সেটা করতে পারছে না।

সিনেমার গল্প ভালো থাকলে কে অভিনয় করলো দর্শক কিন্তু সেটা দেখে না। দর্শক একটা ভালো গল্প চায়। আমাদের আগের অনেক নায়কের চেহারা তো অতো ভালো ছিলো না। আনোয়ার হোসেনের কথাই ধরেন। কিন্তু মানুষ তাদের সিনেমা কেনো দেখছে অভিনয়ের জন্য।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার কারণে কলকাতাকে পর্যন্ত তাকে সংবর্ধনা দিয়েছে। ওয়াসিম দেখতেও তো সুন্দর নয়, কিন্তু *চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা* মার-মার কাট-কাট ব্যবসা করছে।

এছাড়া *দোস্ত দুশমন*, *জিঘাংসার* মতো সিনেমাগুলো কাহিনি ছিলো অন্যরকম। দর্শক সেগুলো দেখছে। আমাদের ডিরেক্টররা মেকআপ, পোশাক পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে ধরতে পারে না। একজন রিকশাওয়ালা কী ধরনের পোশাক পরে সেটাও মনে হয় তারা জানে না। একজন রিকশাওয়ালা কিংবা কৃষককে পর্দায় দেখে কৃষক মনে হতে হবে। তাছাড়া তো দর্শক বিশ্বাস করবে না।

বর্তমান পরিস্থিতি দেখে এখন আমার কেনো জানি মনে হয়, আমাদের অনেক প্রযোজক সিনেমা বানাতে আসে না। তারা কালো টাকা সাদা করার জন্য আসে। কারণ একটা সিনেমা বানাতে গেলে এখন কমপক্ষে এক কোটি টাকা খরচ হয়। এই সিনেমা বানানোর পর তো সেটা ব্যবসা করতে হবে; তার মূলধনটা অন্তত ঘরে নিতে হবে না? অথচ মূলধন তো দূরের কথা পোস্টারের পিছনে যে টাকা খরচ হয় সেটাও কোনো কোনো সিনেমা তুলতে পারে না। এর কারণটা কী! একেবারে সবাই নতুন হলেও চলবে না। নতুন-পুরাতন মিলে সিনেমা বানাতে হবে। নতুনদেরও সুযোগ দিতে হবে। তাছাড়া উত্তরাধিকার তৈরি হবে কীভাবে?

জয়নালের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বৃষ্টি আরো বেড়ে যায়। আমি একটু প্রধান ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। সেখানে কথা হয় দুলাল বিশ্বাসের সঙ্গে। দুলাল পাবলিসিটি করে তিতাসের।

দুলাল জানান, এখন প্রচারে গেলে বেশিরভাগ লোক চিৎকার করে বলে, এই সিনেমা তো আমাদের কাছে আছে। তাহলে সিনেমাহলে কেনো মানুষ আসবে! এখন সিনেমা মুক্তির তিন-চার দিনের মধ্যে সেটা দোকানের পাওয়া যায় বলে জানান দুলাল।

দুলাল বলেন, এক সময় অনেক ভালো ভালো সিনেমা আমি নিজে দেখছি। সুচরিতা আর মান্নার একটা সিনেমা ছিলো *দাঙ্গা*। এই সিনেমাটা খুব ভালো লাগছিলো।

এছাড়া *কাশেম মালার প্রেম*, *মধুমালা মদন কুমার*, *ঝিনুক মালা*র মতো সিনেমাগুলো খুব ভালো ছিলো। এসব সিনেমার তখন খুব চাহিদাও ছিলো। আর এখন যেসব সিনেমা করে তার তো কোনো গল্প নাই। সিনেমার মেইন হলো গল্প, সেই গল্প যদি ভালো না হয় তাহলে মানুষ দেখবেটা কী! এখনো ভালো সিনেমা হলে দর্শক আছে।

দুলালের সঙ্গে কথা শেষে ভিতরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি সাড়ে ১২টায় ছয়জন দর্শক নিয়ে শো শুরু হয়েছে। আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বরিশালের উদ্দেশে যাত্রা করি।

বরিশালে যখন পৌঁছি তখন বিকেল পৌনে চারটা। সারা রাস্তায় বৃষ্টি, তাই বাস খুব ধীরে ধীরে আসে। বাসস্ট্যান্ড থেকে নেমেই আমি সোজা চলে যাই অভিরুচিতে। সেখানেই দেখা হয় অরুণ চন্দ্রের সঙ্গে। তিনি আজ সুধী-সৌখিনের দায়িত্বে আছেন। এক সপ্তাহ পর পর তাদের দায়িত্ব পালনের স্থান পরিবর্তন হয় বলে তিনি জানান। গত সপ্তাহে অরুণ ডিসি'তে ছিলেন; তাই এই সপ্তাহে সুধী-সৌখিনে।

অরুণের মন খারাপ, কারণ বৃষ্টির কারণে দর্শক নেই বললেই চলে। অথচ আজ কেবল সিনেমার তৃতীয় দিন। বেতনের বাইরে দর্শকের কাছ থেকে কিছু আয় না হলে তাদের খুব সমস্যা হয় বলে তিনি জানালেন। অরুণের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে ডিসি'তে যাই, সেখানে প্রদীপেরও একই অবস্থা। তিনিও প্রায় হতাশ হয়ে বসে আছেন। সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে এবার নীচে নেমে আসি। এরপর বাইরে চা পান করে আবার সিনেমাহলে গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলে বিদায় নিই। কারণ নয়টার লঞ্চে আমাকে ঢাকা ফিরতে হবে।